

শ্রীঅরবিন্দ

গীতা-নিবন্ধ

শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম
পণ্ডিচেরী

মূল অনুবাদক: অনিলবরণ রায়

প্রথম সংস্করণ (পাঁচটি খণ্ডে) ১৯২৪-৪৮
পঞ্চম সংস্করণ ২০০১
চতুর্থ মুদ্রণ ২০১৩

Rs 190
ISBN 978-81-7058-637-1

© শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম ট্রাস্ট ১৯২৪-৪৮, ২০০১
প্রকাশক: শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম প্রকাশন বিভাগ, পণ্ডিচেরী ৬০৫ ০০২
মুদ্রক: শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম প্রেস, পণ্ডিচেরী

Gita-Nibandha (Bengali)
Essays on the Gita by Sri Aurobindo
Translator: Anilbaran Roy

First edition (in 5 volumes) 1924-48
Fifth edition 2001
Fourth impression 2013

© Sri Aurobindo Ashram Trust 1924-48, 2001
Published by Sri Aurobindo Ashram Publication Department
Pondicherry 605 002
Web http://www.sabda.in

Printed at Sri Aurobindo Ashram Press, Pondicherry
PRINTED IN INDIA

নিবেদন

ভাবতে নবজাতি গঠন করিতে হইলে ধর্মের গ্লানি দূর করিতে হইবে এবং ইহার জন্য গীতা শিক্ষাব বহুল প্রচার একান্ত উপযোগী। ইহা উপলব্ধি করিয়া শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ মহাশয পণ্ডিচাবীতে তাঁহার নির্জন সাধন মন্দিরে বসিযা গীতা হইতে যে সকল তথ্য সাধনবলে উদ্ধার কবিয়া অপূর্ব ভাষায় ব্যক্ত করিতেছেন, শুধু ভারতবাসীর পক্ষে নহে, সমস্ত জগদ্‌বাসীর পক্ষেই তাহা কল্যাণকব হইবে। তাই যেদিন শ্রীঅরবিন্দের ইংরেজী গ্রন্থ *Essays on the Gita* বঙ্গ ভাষায অনুবাদ করিবার অনুমতি পাই সেদিন নিজেকে ধন্য মনে কবিযাছিলাম। শ্রীঅরবিন্দের বহি এখনও শেষ হয় নাই; আবও খণ্ড বাহির হইবে। তিনি বঙ্গানুবাদটিও খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশ করিবাব পরামর্শ দেওযায় প্রথম খণ্ড প্রকাশ কবিলাম।

যিনি মূককে বাচাল কবেন, পঙ্গুকে গিরিলঙ্ঘন কবান, তাঁহারই কৃপায় যদি আমাব দ্বাবা গীতা শিক্ষা প্রচাবেব কিঞ্চিন্মাত্র সহাযতা হয তাহা হইলে আমার জীবন সার্থক মনে কবিব।

৯ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩১
কলিকাতা

অনুবাদক
শ্রীঅনিলবরণ বায়

"সারথি"তে প্রকাশিত "শ্রীঅরবিন্দের গীতা" নিয়মিত পাঠ করিয়া শ্রীঅববিন্দ ঘোষ পণ্ডিচারী হইতে জানাইয়াছেন—

"অনুবাদ খুবই ভাল হইতেছে। সাধারণ পাঠকেরা আপনার অনুবাদের সাহায্যে সহজেই গীতা বুঝিতে পারিবে।"

সূচীপত্র

প্রথম খণ্ড

১।	গীতার উপযোগিতা	...	৩
২।	ভগবান গুরু	...	৮
৩।	মানব শিষ্য	...	১৪
৪।	গীতাব মূলশিক্ষা	...	২৩
৫।	কুরুক্ষেত্র	...	৩৩
৬।	মনুষ্য ও জীবন-যুদ্ধ	...	৪০
৭।	ক্ষত্রিয়ের ধর্ম	...	৪৭
৮।	সাংখ্য ও যোগ	...	৫৭
৯।	সাংখ্য, যোগ ও বেদান্ত	...	৭২
১০।	বুদ্ধিযোগ	...	৮০
১১।	কর্ম ও যজ্ঞ	...	৯১
১২।	যজ্ঞেব মর্ম	...	৯৯
১৩।	যজ্ঞেব অধীশ্বর	...	১০৯
১৪।	দিব্য কর্মের নীতি	...	১১৭
১৫।	অবতারের সম্ভাবনা ও প্রয়োজন	...	১২৮
১৬।	অবতবণের প্রণালী	...	১৪১
১৭।	দিব্যজন্ম ও দিব্যকর্ম	...	১৫০
১৮।	দিব্য কর্মী	...	১৫৮
১৯।	সমতা	...	১৬৯
২০।	সমতা ও জ্ঞান	...	১৮২
২১।	প্রকৃতির নিয়ন্তৃত্ব	...	১৯৪
২২।	ত্রিগুণাতীত	...	২০৬
২৩।	নির্বাণ ও সংসারের কাজ	...	২১৫
২৪।	কর্মযোগেব সারতত্ত্ব	...	২২৯

দ্বিতীয় খণ্ড (পূর্বার্ধ)

১। দুই প্রকৃতি ... ২৪৩
২। ভক্তি ও জ্ঞানের সমন্বয় .. ২৫৭
৩। পরম পুরুষ ... ২৬৮
৪। গুহ্যাদ্ গুহ্যতরং .. ২৮১
৫। দিব্য সত্য ও পন্থা ... ২৯১
৬। কর্ম ভক্তি ও জ্ঞান .. ৩০২
৭। গীতার পরম বাক্য ... ৩১৭
৮। বিভূতিরূপে ভগবান .. ৩৩৪
৯। বিভূতি তত্ত্ব ... ৩৪৪
১০। বিশ্বরূপ দর্শন—সংহারক মহাকাল ... ৩৫৫
১১। বিশ্বরূপ দর্শন—দুই ভাব ... ৩৬৭
১২। পথ ও ভক্ত . ৩৭৫

দ্বিতীয় খণ্ড (উত্তরার্ধ)

১৩। ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ ... ৩৮৯
১৪। গুণাতীত ... ৪০২
১৫। পুরুষত্রয় ... ৪১৬
১৬। অধ্যাত্ম কর্মের পরিপূর্ণতা . ৪৩০
১৭। দেব ও অসুর ৪৪২
১৮। গুণ, শ্রদ্ধা ও কর্ম ... ৪৫৫
১৯। গুণ, মন ও কর্ম . ৪৭১
২০। স্বভাব ও স্বধর্ম ৪৮৬
২১। পরম রহস্যের পথে ... ৫০৪
২২। পরম রহস্য . ৫১৮
২৩। গীতা-শিক্ষার সারমর্ম . ৫৩৯
২৪। গীতার বাণী .. ৫৪৯
নির্দেশিকা . ৫৭১

প্রথম খণ্ড

প্রথম অধ্যায়

গীতার উপযোগিতা

জগতে বহু ধর্মগ্রন্থ বহু দার্শনিক মতবাদ প্রচলিত আছে। যেসকল লোকের জ্ঞানের গভীরতা বড় অধিক নহে তাঁহারা ভাবেন একমাত্র তাঁহাদের ধর্মগ্রন্থেই ভগবানের পরম বাক্য নিহিত আছে, আর সব জুয়াচুরি বা ভ্রান্ত। অনেক সময় বিজ্ঞ দার্শনিকেরাও মনে করেন যে তাঁহাদের মতই জগৎতত্ত্ব সম্বন্ধে শেষ কথা। তবে আজকাল মানুষ এ বিষয়ে একটু নরম হইতেছে। এখন আর আমরা অস্ত্রের সাহায্যে ধর্মপ্রচার করি না, মতের সহিত না মিলিলে আমরা কাহাকেও পোড়াইয়া মারিতে চাহি না। এখন আমরা শিখিয়াছি যে সত্য কাহারও একচেটিয়া নহে—সকল মতে, সকল ধর্মগ্রন্থেই কিছু না কিছু সত্য নিহিত থাকিতে পারে। তবে এখনও অনেকের এই অভিমানটুকু আছে যে অন্যত্র আংশিক সত্য থাকিলেও—আমাদের যাহা তাহাই অখণ্ড পূর্ণ সত্য এবং তাহা ছাড়া গতিমুক্তির আর পথ নাই। আমরা যে ধর্মগ্রন্থের আদর করি, যে দার্শনিক মত পোষণ করি তাহার সবটাই আমরা অন্যের ঘাড়ে চাপাইয়া দিতে চাই—এতটুকু ছাঁটিয়া দিতেও আমরা নারাজ।

অতএব, বেদ, উপনিষদ্, গীতা প্রভৃতি প্রাচীন ধর্মগ্রন্থের আলোচনা করিতে হইলে আমরা এগুলিকে কি চক্ষুতে দেখি এবং জীবনসমস্যার সমাধানে ইহাদের উপযোগিতা কতটা উপলব্ধি করি, সর্বাগ্রে তাহা পরিষ্কার করিয়া বলা প্রয়োজন।

সত্য যে এক এবং সনাতন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। হিন্দুর সত্য, মুসলমানের সত্য, খ্রীষ্টানের সত্য ভিন্ন নহে। লক্ষ বৎসর পূর্বে যাহা সত্য ছিল তাহা আজও সত্য। তবে দেশ কাল পাত্র ভেদে এক সনাতন সত্য বিভিন্ন রূপ ধারণ করে। আবার, সেই এক সনাতন সত্য হইতে অন্য অনেক সত্য উদ্ভূত ও উদ্ভাসিত হইয়াছে। সেসবই কোন এক বিশেষ গ্রন্থে বা কোন এক বিশেষ অবতারের দ্বারা নিঃশেষে কথিত হওয়া সম্ভব নহে। অতএব সত্যজ্ঞান যাহা কিছু লাভ করিবার আছে তাহার সবই যে গীতায় আছে তাহা আমরা বলি না। আবার গীতার ভিতর যাহা আছে তাহার সবই যে সকল দেশ, সকল কালের জন্য সত্য তাহাও আমরা বলি না।

তবে কোন বিশেষ কাল বা স্থানের বাহিরে প্রযোজ্য নহে এমন কথা গীতাতে খুব কমই আছে এবং যেখানে এরূপ কথা আছে সেগুলিও সহজেই সর্ব দেশে সর্ব কালের করিয়া লওয়া যাইতে পারে অথচ তাহাতে অর্থের কোন হানি হয় না। দুই একটি দৃষ্টান্ত দেখা যাউক।

গীতার তৃতীয় অধ্যায়ে যজ্ঞের স্বরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে। মানব হোমের দ্বারা

দেবতাগণেব তৃপ্তি সাধন কবিবে, দেবতাবা তুষ্ট হইযা বৃষ্ট্যাদি দানে মানুষেব পোষণ করিবে—এইরূপ পবস্পরের আদানপ্রদানে সকলেব অভীষ্ট লাভ হইবে। প্রাচীন ভারতে এইরূপ প্রথা, যজ্ঞ সম্বন্ধে এইরূপ ধাবণা প্রচলিত ছিল বটে কিন্তু এখন ভারত হইতেই ইহা একরকম লুপ্ত হইযা গিযাছে। দেবতাবা ঘৃতাহুতিতে তুষ্ট হইয়া বৃষ্টি প্রদান কবে, এই বিজ্ঞানের যুগে একথা সকলে হাসিযা উডাইযা দিবে। কিন্তু পুরাকালে প্রচলিত যজ্ঞপ্রথা অবলম্বন কবিয়া গীতায় এখানে যে সত্য উক্ত হইয়াছে তাহা সার্বজনীন। পবস্পরের আদানপ্রদানে শুধু মানবসমাজ নহে—এই বিশ্বপ্রকৃতিই যে টিকিযা আছে তাহা আধুনিক বৈজ্ঞানিকেবাই স্বীকার কবিবেন এবং গীতাকথিত যজ্ঞের অর্থ এইরূপ আদানপ্রদান ধরিয়া লইলে গীতাব বক্তব্যেব কোন হানি হয় না। জননীর আত্মদানে সন্তানেব সৃষ্টি হইতেছে। বৃক্ষলতা মাটি, জল, বায়ু হইতে আহার্য সংগ্রহ কবিয়া জীবজন্তুর আহাব যোগাইতেছে, জীবজন্তু মরিয়া লতা বৃক্ষেব সাব হইতেছে। সূর্য গ্রহনক্ষত্রকে আলো ও উত্তাপ প্রদান করিতেছে—গ্রহগণ পরস্পবের আকর্ষণেব দ্বাবা সৌবমণ্ডলকে ধবিযা বাখিযাছে। সমুদ্র হইতে মেঘ হইতেছে—মেঘ হইতে সমুদ্র হইতেছে ইহাই প্রবর্তিত জগচ্চক্র। ইহাতেই সকলে উত্তরোত্তব বাডিযা চলিতেছে। যে ব্যক্তি জীবেব মঙ্গলেব জন্য জগতের মঙ্গলের জন্য কিছু দান না কবিযা শুধু নিজেব ইন্দ্রিয-সুখভোগ ও স্বার্থ লইয়া আছে—

অঘাযুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি॥

"পাপময় জীবন ইন্দ্রিয়পরাযণ সে ব্যক্তি বৃথা জীবিত থাকে।"

ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ॥

"যাহারা কেবল আপনার জন্যই পাক কবে সেই পাপিষ্ঠগণ পাপই ভোজন কবে।"

গীতার ষোডশ অধ্যায়ের শেষে কথিত হইয়াছে "তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্যাকার্য ব্যবস্থিতৌ"—"অতএব ইহা কর্তব্য, ইহা অকর্তব্য, এই তত্ত্ব নির্ণয বিষয়ে শাস্ত্রই তোমার প্রমাণ।" এখানে শাস্ত্র বলিতে যদি ভাবতেব তৎকালে প্রচলিত শ্রুতি স্মৃতি মাত্র ধবা যায তাহা হইলে গীতাকে খুব সঙ্কীর্ণ কবা হয। —মানুষেব মনে কত সময় কত কামনাব উদ্রেক হইতেছে, "লক্ষ্যশূন্য লক্ষ বাসনা ছুটিছে গভীব আঁধারে"। যাহা ইচ্ছা হইল তাহাই কবিলে মানুষে আব পশুতে কোন প্রভেদ থাকে না। তাই মানুষ নিজেদের কার্যাকার্য নির্ণযেব জন্য বিচাব যুক্তির দ্বাবা কতকগুলি বিধি স্থিব করিয়াছে। এই সকল বিধিনিষেধ দেশকালভেদে কিছু কিছু ভিন্ন হইতে পাবে কিন্তু কাম ক্রোধেব বশে কার্য না করিয়া এই সকল বিধিনিষেধ মানিযা কার্য কবিলে পাশবিক প্রবৃত্তিগুলি ক্রমেই

সংযত হয় এবং সেই জন্যই এই সকল বিধিনিষেধকে শাস্ত্র বলা হইযাছে। তাই, গীতা যখন বলিযাছে শাস্ত্রই কার্যাকার্যে প্রমাণ, সেখানে প্রাচীন হিন্দু সমাজে যাহা শাস্ত্র বলিযা প্রচলিত ছিল শুধু তাহাই বুঝিবার কোন প্রযোজন নাই। খ্রীষ্টান যথেচ্ছাচারী না হইযা খ্রীষ্টান শাস্ত্রানুসাবে কার্য করুক, মুসলমান কর্তব্যাকর্তব্য নির্ণযে মুসলমান শাস্ত্রের অনুসবণ করুক, হিন্দু হিন্দুব শাস্ত্রবিধি মত কার্য করুক —মোটকথা ইন্দ্রিয়চবিতার্থতাব পবিবর্তে কোন নির্দিষ্ট বিধিনিষেধকে কার্যাকার্যের মানদণ্ড ও প্রবর্তক করুক, তাহা হইলেই তাহাদের সদ্‌গতি লাভ হইবে।

গীতায যে চাবিবর্ণেব বিভাগ দেওযা আছে জগতে তাহা এখন আব কোথাও দেখিতে পাওযা যায না। কিন্তু, একটু অনুধাবন কবিলেই বুঝিতে পারা যায যে এই চাবিবর্ণ বিভাগ একটি আধ্যাত্মিক সত্যেব বাহ্য আকার মাত্র। সে সত্য এক যুগে এক আকাব ধারণ করিয়াছিল। এখন অবস্থাব পরিবর্তনানুসাবে অন্য আকার ধাবণ করিযাছে। সত্ত্ব, বজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়ের বিভাগানুসাবে মনুষ্যেরা বিভিন্ন প্রকৃতিশালী হইযা থাকে। প্রত্যেক ব্যক্তির, প্রত্যেক জাতির প্রকৃতি অনুযায়ী কর্ম ও কর্মেব ধাবা আছে, প্রত্যেকেবই প্রকৃতিগত একটা বৈশিষ্ট্য আছে এবং কর্মের দ্বাবা সেই বৈশিষ্ট্যেব বিকাশই ব্যক্তিগত বা জাতিগত সার্থকতা। প্রাচীনকালে এইরূপ বৈশিষ্ট্যানুসারে সমাজকে চাবি ভাগ কবা চলিত। এখন সমাজের কর্ম বাডিযা যাওযায প্রকৃতিগত বৈচিত্র্যও বাডিযা গিয়াছে—ফলে সে চাবিবর্ণ বিভাগেব আব কোনও সার্থকতা নাই। তবে প্রত্যেক ব্যক্তির, প্রত্যেক জাতির যে একটা প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য আছে এবং স্বভাবনির্দিষ্ট কর্মেব দ্বারা সেই বৈশিষ্ট্যের বিকাশ কবিতে পাবিলেই যে পরমার্থ লাভ হইতে পারে গীতা প্রচারিত এই সত্য, সর্ব কাল সর্ব যুগেরই উপযোগী।

আমাদেব পূর্বপুরুষদেব বুদ্ধি ও মানসিক অবস্থা হইতে আমাদের বুদ্ধি ও মানসিক অবস্থা ভিন্ন হইযাছে। যে সত্য যে ভাবে তাঁহাদের নিকট প্রচাবিত হইযাছিল, উহা তাঁহাবা যেমন বুঝিযাছিলেন—আমাদেব পক্ষে তাহা ঠিক সেইভাবে বুঝা অসম্ভব। অতএব গীতার ন্যায একখানি পুরাতন গ্রন্থের অর্থ লইযা যে মতভেদ হইবে তাহাতে বিস্মিত হইবাব কিছু নাই। গীতাকে লইযা কত বিভিন্ন ভাষ্য, বিভিন্ন টীকা বচিত হইযাছে এবং আজও হইতেছে। ইহা হইতে বুঝা যায যে গীতাকথিত দার্শনিক তথ্যসমূহেব ঠিক অর্থ বোঝা এখন আর সম্ভব নহে।

তবে, কিসেব জন্য আমবা গীতা পডিব? দর্শনশাস্ত্র শিক্ষা ও আলোচনা কবিবাব নিমিত্ত গীতা পাঠেব কোন বিশেষ আবশ্যকতা নাই। সে সকল সত্য শুধু বুদ্ধিগম্য নহে—যোগলব্ধ দৃষ্টিতেই যেগুলি জানিতে পারা যায়—যাহা হইতে মানুষ আধ্যাত্মিক জীবনগঠনে অনেক সহাযতা পাইতে পারে—এইরূপ সত্যসমূহেব সন্ধান গীতাব ভিতর আছে এবং এই সকল সত্য বর্তমান ভাব ও ভাষাব ভিতব দিযা প্রচাব কবাই গীতা-আলোচনার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত—মানুষ বুদ্ধিব চালনায জগৎতত্ত্ব সম্বন্ধে যত প্রশ্ন, যত সমস্যা তুলিতে পাবে গীতার মধ্যে

সে সকলের সমাধান নাই বটে, কিন্তু বাস্তব জীবনে, কর্মক্ষেত্রে দেখা যাইতে পারে, আধ্যাত্মিক উন্নতিতে সহায়তা করিতে পারে, এরূপ যত সত্য গ্রহণ করিবার শক্তি আমাদের আছে সে সমুদায়ই গীতার ভিতর আছে এবং এইখানেই গীতাপাঠের সার্থকতা।

যোগলব্ধ, যোগজীবনের সহায় সার্বজনীন সত্যসমূহ প্রচার করিতে হইলে, দেশকালোপযোগী ভাব ও ভাষা অবলম্বন করিতে হয় এবং প্রচলিত দার্শনিক পরিভাষা ও মতবাদসমূহেরও সাহায্য লইতে হয়। তবে কোন বিশেষ দেশ বা কালের বাহিরে প্রযোজ্য নহে, গীতাতে এমন কথা খুব কম আছে এবং গীতার ভাব এরূপ উদার ও গভীর যে এইগুলি সহজেই সর্বযুগ সর্বদেশের করিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে, ইহা আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি। গীতায় যেসকল দার্শনিক মতবাদের উল্লেখ আছে সেগুলিকেও আমাদিগকে এইভাবেই লইতে হইবে। গীতা যেখানে যোগদর্শন বা সাংখ্যদর্শনের উল্লেখ করিয়াছে সেখানে পুরাকালে প্রচলিত সমগ্র যোগদর্শন বা সাংখ্যদর্শনের কথা ভাবিয়া কোন প্রয়োজন নাই। বৈদান্তিক সত্যের প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত সাংখ্য ও যোগের মধ্যে সার বস্তু যতটা পাওয়া গিয়াছে, গীতায় তাহাই লওয়া হইয়াছে। গীতা সাংখ্য ও যোগকে একই বৈদান্তিক সত্যে পৌঁছিবার দুইটি পথ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছে—জ্ঞানের পথই সাংখ্য, কর্মের পথই যোগ।

টীকাকারেরা গীতাকে কোন এক বিশেষ দার্শনিক মতবাদের প্রামাণ্য গ্রন্থ বলিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু সকল মতের লোকই যে নিজেদের মত সমর্থন করিতে গীতার আশ্রয় গ্রহণ করেন, ইহা হইতেই বুঝা যায় যে কোন বিশেষ দার্শনিক মতবাদকে সমর্থন করিবার জন্য গীতা লিখিত হয় নাই। তৎকালপ্রচলিত সমস্ত মতবাদের উদার সমন্বয় গীতার ভিতরে দেখা যায় এবং এই সমন্বয়ের সাহায্যে গীতা যে চিরন্তন সত্যসমূহ প্রকাশ করিয়াছে—তাহার প্রমাণ শুধু যুক্তিতর্ক নহে। গীতাপ্রদর্শিত পথে যাঁহারা অগ্রসর হইবেন তাঁহারাই ঐ সকল সত্য প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিয়া নিজেদের সন্দেহভঞ্জন করিয়া আরও অগ্রসর হইতে পারিবেন।

গীতার ভাষা, গীতার চিন্তার ধারা, গীতার ভাবপ্রকাশের রীতি-পদ্ধতি এরূপ যে কোন বিশেষ মতবাদের ভিতর গীতা সীমাবদ্ধ নহে, কোন মতবাদকে গীতা সম্পূর্ণভাবে বর্জন করে না। এক অনাদি ব্রহ্ম হইতে সমগ্র জগতের উৎপত্তি একথা গীতা স্বীকার করিলেও অদ্বৈতবাদ গীতার মত নহে এবং যদিও গীতা ত্রিগুণময়ী মায়ার কথা বলিয়াছে তথাপি গীতা মায়াবাদী নহে, যদিও গীতার মত এই যে, সেই এক ব্রহ্মের পরা প্রকৃতিই জীব হইয়াছে এবং ব্রহ্মে মিশিয়া এক হইয়া যাওয়ার উপরে জোর না দিয়া তাহাতে বাস করার কথাই গীতা বিশেষভাবে বলিয়াছে তথাপি বিশিষ্টাদ্বৈতবাদও গীতার মত নহে। পুরুষ ও প্রকৃতির সংযোগ হইতেই যে সংসার হইয়াছে একথা স্বীকার করিলেও গীতা সাংখ্য নহে, পুরাণে

যাহাকে বিষ্ণুর অবতার বলা হইয়াছে সেই কৃষ্ণকেই গীতা পূর্ণ ভগবান বলিয়াছে এবং অনাদি অনন্ত ব্রহ্ম হইতে কৃষ্ণকে ভিন্ন বা কোন অংশে ছোট বলে নাই—তথাপি গীতা বৈষ্ণব ধর্মগ্রন্থ নহে। দার্শনিক মতবাদের তর্কযুদ্ধে কোন পক্ষের অস্ত্ররূপে ব্যবহৃত হইবার জন্য গীতা লিখিত হয় নাই। ইহার ভিতর সকল মতবাদের অপূর্ব সমন্বয় আছে এবং এমন তথ্যের সন্ধান আছে যাহার সাহায্যে সমস্ত আধ্যাত্মিক সত্যের জগতে প্রবেশ লাভ করা যাইতে পারে।

ভারতের চিন্তার ইতিহাসে এইরূপ সমন্বয় অন্য সময়েও হইয়াছে। প্রাচীন ঋষিগণের আধ্যাত্মিক সাধনার ফলে বাহ্যজগতের অন্তরালে যে দেবজগতের সন্ধান মিলিয়াছিল তাহাই তৎকালোচিত ভাব ও ভাষায় বেদে বর্ণিত হইয়াছে। এই সকল আধ্যাত্মিক সত্যের সংগ্রহ এবং তাহাদের মধ্যে গভীর সামঞ্জস্যের সমাধান করিয়া উপনিষদ্ বৃহত্তর সমন্বয় সৃষ্টি করিল। এই অপূর্ব রত্নের আকর উপনিষদ্‌সমূহকে মন্থন করিয়া বিচার যুক্তির সাহায্যে গীতা পরমার্থ লাভের উপায় স্বরূপ কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তি এই তিন শক্তির সামঞ্জস্য বিধান করিয়াছে। তন্ত্র আবার আধ্যাত্মিক জীবনের বাধাসমূহকে ধরিয়া সেইগুলিকে পূর্ণতর জীবনের সহায়রূপে ব্যবহার করিবার পথ দেখাইয়াছে—সমগ্র জীবনকে ভগবানের লীলা স্বরূপ উপলব্ধি করিবার সন্ধান দিয়াছে। মানুষ যে পূর্ণ দেবত্ব লাভ করিতে পারে বৈদিক ঋষিরা তাহা জানিতেন, তন্ত্র আবার এই সত্য ধরিয়াছে এবং অতঃপর মানবজাতির ভবিষ্যৎ গঠনে এই সত্য বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিবে।

যে যুগে মানুষ পূর্ণ দেবত্বের দিকে অগ্রসর হইবে এখনই তাহার সূচনা হইয়াছে। বেদ বা উপনিষদ্, গীতা বা তন্ত্রের চতুঃসীমার মধ্যে আমাদিগকে বদ্ধ থাকিতে হইবে না। কত নূতন স্রোত আমাদের ভিতর প্রবেশ করিয়াছে। শুধু ভারতের নহে, সমগ্র জগতের মহান ধর্মনীতিগুলি আমাদের উপর প্রভাব বিস্তার করিতেছে। বর্তমান যুগের অনুসন্ধিৎসার ফলে যে সকল শক্তিপূর্ণ তথ্য আবিষ্কৃত হইতেছে সেগুলিও আমরা অবহেলা করিতে পারি না; পুরাতন, অতি পুরাতন যুগের কত গুপ্ত রহস্য, নূতন আলোক আমাদের সম্মুখে উদ্ভাসিত হইতেছে। এই সকল হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে আবার আমরা আর এক মহান—অতি মহান সমন্বয়ের সম্মুখীন হইয়াছি। কিন্তু, পূর্বপূর্ব কালে যেমন শেষের সমন্বয়কে ভিত্তি করিয়াই নূতন বৃহত্তর সমন্বয় গড়িয়া উঠিয়াছে—এবারেও সেইরূপ আমাদিগকে ভবিষ্যৎ বিরাট সমন্বয়ের জন্য গীতাকেই ভিত্তি করিতে হইবে—গীতা হইতেই আরম্ভ করিতে হইবে।

অতএব, পাণ্ডিত্যের সহিত দার্শনিক গূঢ়তত্ত্বের সূক্ষ্ম আলোচনার নিমিত্ত আমরা গীতা পাঠ করিতে চাহি না। গীতার মধ্যে যে সার্বজনীন চিরন্তন সার সত্য নিহিত রহিয়াছে, যাহার সাহায্যে মানুষ আধ্যাত্মিক জীবন গঠন করিতে পারে, পূর্ণ দেবত্বের দিকে অগ্রসর হইতে পারে—তাহার সন্ধান করাই আমাদের গীতা পাঠের উদ্দেশ্য।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভগবান গুরু

জগতেব অন্য সমস্ত ধর্মপুস্তক হইতে গীতার বিশেষ তফাত এই যে গীতা, বেদ, উপনিষদ্, কোরাণ বা বাইবেলেব মত নিজেই একটি স্বতন্ত্র পুস্তক নহে—ইহা একটি জাতিব জীবন ও যুদ্ধেব ইতিহাস মহাকাব্য মহাভাবতেব অংশ। তৎকালীন এক মুখ্য ব্যক্তি তাহাব জীবনেব সর্বপ্রধান কর্মেব সম্মুখীন হইযাছে, সে কর্ম অতি ভীষণ, তাহাতে বিষম অনর্থ ও বক্তপাতেব সম্ভাবনা, এমন সময উপস্থিত যে—হয তাহাকে পশ্চাৎপদ হইতে হইবে নতুবা অচল অটল ভাবে সেই কর্ম শেষ পর্যন্ত সম্পন্ন করিতে অগ্রসব হইতে হইবে—এই সন্ধিক্ষণে গীতাব উৎপত্তি।

কেহ কেহ বলেন গীতা স্বতন্ত্রভাবে রচিত হইযাই প্রতিষ্ঠাব জন্য গ্রন্থকাব কর্তৃক বিখ্যাত মহাকাব্য মহাভারতেব ভিতব প্রক্ষিপ্ত হইযাছিল। এই মতেব পক্ষে বিশেষ কোন প্রমাণ নাই। কিন্তু, যদিও একথা সত্য হয, তাহা হইলে আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে যে গ্রন্থকাব অতি যত্নেব সহিত গীতাকে মহাভাবতেব সহিত মিশাইযা দিয়াছেন এবং যে ঘটনা অবলম্বন কবিযা গীতাব শিক্ষা কথিত হইযাছে তাহা পুনঃ পুনঃ স্মবণ করাইযা দিয়াছেন। "তুমি যুদ্ধ কব" একথা শুধু যে গীতায প্রথমে বা শেষে আছে তাহা নহে—যখন গভীব দার্শনিক তত্ত্বেব আলোচনা হইতেছে, তাহার মধ্যেও গ্রন্থকাব অনেক সময় স্পষ্টভাবেই এই কথাব উল্লেখ করিযাছেন। অতএব, গীতা বুঝিতে হইলে এই যে ঘটনা গুরু ও শিষ্য উভযে সকল সময়েই মনে বাখিয়াছিলেন—তাহাব হিসাব আমাদিগকে কবিতেই হইবে। গীতায় আধ্যাত্মিক ও নৈতিক তত্ত্বসমূহ সাধারণভাবে আলোচিত হয নাই, জীবনেব বাস্তব সমস্যা সমাধানে ঐ সকল তত্ত্বের প্রযোগ কবা হইযাছে। সেই সমস্যা কি, কুরুক্ষেত্রেব যুদ্ধেব অর্থ কি, অর্জুনেব আভ্যন্তবিক জীবনেব উপবেই বা ইহাব প্রভাব কি—তাহা বুঝিতে না পাবিলে গীতাব মর্ম হৃদযঙ্গম কবা সম্ভবপব নহে।

জীবনের কোন সামান্য ব্যাপার লইযা যে সকল প্রশ্ন বা সংশয উঠে, ধর্মাধর্ম সম্বন্ধে প্রচলিত সাধাবণ ধাবণার দ্বারাই সে সকলেব সমাধান হইতে পাবে। কিন্তু এরূপ সাধারণ ঘটনা প্রসঙ্গে জীবনের গূঢ় বহস্য সম্যক আলোচনা কবা যায না। বহুমুখী গভীরতম জ্ঞানেব প্রচাব কবিতে হইলে এরূপ অসাধাবণ ঘটনা প্রযোজন, যে প্রসঙ্গে কঠিন প্রশ্ন, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক তত্ত্বেব জটিল সমস্যাসমূহ আপনিই উঠিতে পারে। গীতার গুরু এবং শিষ্য, এবং যে অবস্থায গীতাব শিক্ষা দেওযা হইযাছে এই তিনটিব বিশেষ নিগূঢ় অর্থ আছে। মানবেব জীবন ও আধ্যাত্মিকতাব

গূঢ় সমস্যাসমূহ এই তিনটিব সাহায্যে কতকটা রূপকচ্ছলে ব্যাখ্যাত হইযাছে। মানবরূপে অবতীর্ণ ভগবানই গীতাব গুরু। ভগবান তাঁহার গূঢ় উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত যে বিবাট যুদ্ধেব আয়োজন কবিয়াছেন এবং অলক্ষ্যে চালনা কবিতেছেন—সেই কর্মেব নায়ক এবং সেই যুগেব মুখ্য ব্যক্তি অর্জুন হইতেছেন গীতাব শিষ্য। যুদ্ধক্ষেত্রে ভীষণ জ্ঞাতিহত্যার সম্ভাবনা দেখিয়া অর্জুনেব মনের ভিতর যখন তোলপাড উপস্থিত, ধর্মাধর্ম সম্বন্ধে তাঁহার অভ্যস্ত ধারণাসমূহ ধাক্কা খাইযা যখন ওলটপালট হইযা গিযাছে, জগৎ কি, ঈশ্বব কি, মানবের জীবনের, মানবেব কর্মেব অর্থ কি, উদ্দেশ্য কি—এই সমস্ত প্রশ্ন যখন স্বতঃই উঠিযাছে সেই সন্ধিক্ষণ অবলম্বন কবিযা গীতাব শিক্ষা প্রচাবিত হইয়াছে।

ভগবানেব অবতাব্ সম্বন্ধে বিশ্বাস ভারতবর্ষে প্রাচীনকাল হইতেই সুপ্রচলিত আছে। পাশ্চাত্য দেশে এ বিশ্বাস কখনই তেমন দৃঢ হয় নাই, কাবণ সেখানে লোকে অবতাবেব কথা শুধু ধর্মগ্রন্থেই পডিযাছে, যুক্তির দ্বারা বা জীবনে তাহারা ইহাব মর্ম উপলব্ধি কবে না। ভাবতবাসীর জীবনের উপব বেদান্ত প্রচাবিত সত্যেব প্রভাব অত্যন্ত বেশী এবং সেই সত্যেব সহিত অবতারবাদেব বিশেষ সম্পর্ক থাকায ইহা সহজেই ভাবতবাসীব বুদ্ধিতে বদ্ধমূল হইযা গিয়াছে। জগতে যাহা কিছু আছে সবই ভগবানেব প্রকাশ। তিনিই একমাত্র সদ্বস্তু এবং তাঁহার মূর্তি বা অংশ ভিন্ন আব কিছুবই অস্তিত্ব নাই। তবে, ভগবানেব প্রকাশেবও ক্রম আছে। ভগবান নিত্য, শুদ্ধ, পবব্রহ্ম। সাধাবণ জীবে ভগবানেব অংশ মায়ার আববণে আবদ্ধ বহিযাছে, অজ্ঞানান্ধ জীব তাহাব দেবত্ব উপলব্ধি করিতে পাবে না। স্থানে স্থানে ভগবানের বিশেষ শক্তিব আবির্ভাব—সেগুলি বিভূতি বলিয়া পবিচিত। কিন্তু, যখন সেই অজ অব্যযাত্মা ভূতগণেব ঈশ্বব জগতেব কল্যাণের নিমিত্ত নিজ মাযাকে বশীভূত কবিযা (সাধারণ জীবের মত মায়ায় বশীভূত হইযা নহে) মায়িক দেহ গ্রহণ কবেন—মানবশবীবে জন্মগ্রহণ কবিয়াছেন বলিযা প্রতীত হন—সর্ব-শক্তিমান হইয়াও মানবোচিত শরীব মন বুদ্ধির ভিতব দিযা কর্ম কবেন—তখনই তাঁহাকে অবতাব বলা হয।

মানুষেব মধ্যেই ভগবান বহিযাছেন। মানুষ যেদিন তাহা সম্যকরূপে উপলব্ধি কবে—সেই দিন হইতেই সে ভগবানেব মধ্যে বাস কবে। বেদান্তবাদীদেব মধ্যে যাঁহাবা বৈষ্ণব তাঁহাবা নব-নাবাযণেব রূপক অবলম্বন কবিযা এই তত্ত্বটি বেশ পবিস্ফুট কবিয়াছেন। নব নারায়ণের চিরসাথী। নব অর্থাৎ জীবাত্মা যেদিন বুঝিতে পাবে যে সে নাবাযণ অর্থাৎ পবমাত্মাব সখা তখনই সে স্ব-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন হইতেই সে ভগবানেব নিকট বাস করে—"নিবসিষ্যসি মযেব"। সখারূপে ভগবান সকল সময়েই আমাদেব কাছে কাছে রহিযাছেন—আমাদের হৃদয়-বথে সর্বদাই তিনি সাবথিরূপে বর্তমান থাকিযা আমাদিগকে চালাইতেছেন—

ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।

তিনি যে আমাদেব কত আপনার, কত নিকট বন্ধু, আমাদেব হাত ধবিযা কেমন করিয়া তিনি আমাদিগকে চালাইতেছেন—তাহা আমবা বুঝি না। যেদিন এই মাযাব আবরণ, এই অজ্ঞানেব অন্ধকাব টুটিয়া যায, মানুষ হৃদিস্থিত হৃষীকেশের সম্মুখীন হয়, তাঁহাব বাণী শুনিযা প্রমাদ ঘুচায, তাঁহাব শক্তিতে কর্ম কবে—তখনই সে তাহার মনবুদ্ধি ভগবানে সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ কবিতে এবং ভগবানের মধ্যে বাস কবিতে সক্ষম হয এবং ইহাকেই গীতা "উত্তম বহস্য" বলিয়াছেন। মানুষের মধ্যে হৃষীকেশ অন্তর্যামীরূপে চিবদিনেব জন্যই অবতাব—এই অন্তর্যামী ভগবান যখন মানবশবীব, মানব-মন-বুদ্ধি গ্রহণ কবিযা জগৎকে শিক্ষা দেন, পথ দেখান, চালিত কবেন তখন তিনি বাহ্যজগতে অবতাবরূপে প্রকট হন।

অতএব অবতাববাদেব দুইটি দিক আছে। সকল মানবেব মধ্যেই ভগবান বহিয়াছেন—যদি আমরা এই অন্তর্যামী ভগবানকে অবতাব বলিযা ধবিযা লই তাহা হইলে ভগবান বাস্তবিকই স্বযং মানবশবীব গ্রহণ কবেন, একথা না মানিলেও গীতাব অর্থ বুঝিতে বিশেষ কোন অসুবিধা হয না। বাস্তবিক যীশুখ্রীষ্ট নামে কোন মানব পৃথিবীতে কখনও ছিলেন কি না ইহা লইযা ইউবোপে যে বাগ্‌বিতণ্ডা হইয়াছে ভাবতেব পণ্ডিতেরা তাহাকে পণ্ডশ্রম বলিযাই মনে কবিবেন। আমাদেব হৃদযেব ভিতব যীশু বহিয়াছেন, তাঁহাকে যদি আমবা উপলব্ধি কবিতে পাবি, তাঁহাব শিক্ষার আলোকে নিজেদেব আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন কবিতে পাবি, দেবভাব পাইবাব জন্য মানুষভাব হইতে মুক্ত হইতে পাবি, তাহা হইলে যীশু বলিয়া কেহ মেবীব পুত্র জন্মগ্রহণ কবিযাছিল কিনা, বাজদ্রোহ অপবাধে তাহাকে ক্রুশে বিদ্ধ কবিযা মাবা হইয়াছিল কিনা তাহাতে আমাদেব কিছুই আসিযা যাইবে না। সেইরূপ যে কৃষ্ণ চিবন্তন অবতাবরূপে মানব মাত্রেবই হৃদযে বর্তমান তাঁহাকেই আমাদের প্রয়োজন—বাস্তবিক জগতে কোন যুগে কৃষ্ণ বলিযা কোন নেতা বা গুরু ছিলেন কি না তাহা লইযা মাথা ঘামাইবাব কোন আবশ্যকতা নাই।

কৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রেব যুদ্ধস্থলে অর্জুনকে গীতা শিক্ষা দিযাছিলেন—মহাভাবতে ইহাই কথিত হইযাছে। কিন্তু এই নবদেবতা কৃষ্ণেব কেবল আধ্যাত্মিক অর্থ ধরিলেই গীতা-প্রচাবিত শিক্ষার মর্ম গ্রহণ করিতে পারা যায। কৃষ্ণ যে ঐতিহাসিক ব্যক্তি তাহাতে কোন সন্দেহই নাই। ছান্দোগ্য উপনিষদেই তাঁহার নামেব প্রথম উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। সেখান হইতে বুঝা যায যে কৃষ্ণ একজন ব্রহ্মবেত্তা বলিযা বিখ্যাত ছিলেন। বাস্তবিক তিনি এবং তাঁব জীবনেব কোন ব্যাপাব লোকেব নিকট এত পরিচিত ছিল যে শুধু দেবকীনন্দন বলিলে লোকে তাঁহাকেই বুঝিত। ঐ উপনিষদেই বিচিত্রবীর্যের পুত্র ধৃতবাষ্ট্রেবও উল্লেখ আছে। দুইজনেই মহাভাবতের প্রধান ব্যক্তি। অতএব, কুরুক্ষেত্রেব যুদ্ধ যে বাস্তবিকই ঘটিযাছিল, মহাভাবতের প্রধান নাযকেবা যে ঐতিহাসিক ব্যক্তি এবং লোকেব মনে দৃঢ়রূপে অঙ্কিত এই সকল ব্যক্তিব জীবন-ইতিহাস অবলম্বন কবিযাই যে মহাকাব্য

মহাভাবত বচিত তাহা স্বীকাব করা যাইতে পাবে। খ্রীষ্টীয় শতাব্দীর পূর্বে ভাবতবাসী কৃষ্ণ ও অর্জুনকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করিত বলিযা জানিতে পাবা যায। খুব সম্ভব কৃষ্ণ ধর্মপ্রচারক ছিলেন এবং তিনি যেরূপ ধর্ম প্রচাব কবিযাছিলেন গীতাকাব তাহা হইতেই গীতাব অনেক উপাদান সংগ্রহ কবিযাছেন। গীতাতে জ্ঞান, ভক্তি ও কর্মের যে সমন্বয কবা হইযাছে, বোধ হয় কৃষ্ণ প্রচাবিত ধর্মই তাহাব ভিত্তি। গীতার বর্তমান আকার যাহাই হউক না কেন, কৃষ্ণেব শিক্ষা হইতেই ইহাব উৎপত্তি এবং অর্জুনকে কুরুক্ষেত্রেব যুদ্ধে প্রবৃত্ত কবিবার জন্যই কৃষ্ণ তাঁহাব নিকট এই ধর্ম ব্যাখ্যা কবিয়াছিলেন—এ কথাটা নিছক কবিকল্পনা নাও হইতে পাবে। মহাভাবতের কৃষ্ণকে ঐতিহাসিক ব্যক্তিও বলা হইয়াছে, অবতাবও বলা হইযাছে। ইহা হইতেই বুঝা যায যে যখন মহাভাবত লিখিত হয় (খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম হইতে প্রথম শতাব্দীব মধ্যে) তখন কৃষ্ণেব পূজা ও তাঁহাকে অবতাব বলিযা বিশ্বাস সাধাবণেব মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হইযাছিল। বৃন্দাবনে কৃষ্ণের প্রথম জীবনেবও কিঞ্চিৎ আভাস ঐ কাব্যের মধ্যে পাওযা যায। পৌবাণিকেবা কৃষ্ণেব সেই বাল্যজীবন লইযা যে গভীব আধ্যাত্মিক অর্থপূর্ণ রূপকেব সৃজন কবিযাছেন তাহা ভাবতবাসীর ধর্মজীবনেব উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তাব কবিয়াছে। হবিবংশেও আমবা কৃষ্ণের জীবনেব বর্ণনা পাই—সেখানে অনেক কল্পিত বিস্ময়-কব ঘটনাব সমাবেশ আছে, বোধ হয সেইগুলিই পৌরাণিক বর্ণনাসমূহেব ভিত্তি।

কিন্তু, ঐতিহাসিক গবেষণাব জন্য এ সকলের মূল্য অধিক হইলেও বর্তমানক্ষেত্রে এসব তর্কবিতর্কের কোন প্রযোজন নাই। গুরুরূপী ভগবানকে গীতা যে ভাবে আমাদেব সম্মুখে ধবিযাছে এবং মানবজীবনকে আধ্যাত্মিক আলোকে উদ্ভাসিত কবিবাব যে শক্তি তাহাব আছে—শুধু সেইটি বুঝিলেই চলিবে। গীতা অবতাব স্বীকাব কবে। গীতায় ভগবান বলিয়াছেন—বহুবার তাঁহার জন্ম হইযা গিযাছে। তাঁহাব জন্ম মরণ না থাকিলেও তিনি অঘটন-ঘটন-পটীয়সী ত্রিগুণময়ী মাযাকে স্বকীয চিদাভাসযোগে আশ্রয় করিয়া দেহীর ন্যায আবির্ভূত হন। এই অনাদ্যা মাযা তাঁহার উপাধি মাত্র, ব্যবহারকাল পর্যন্ত উহা তাঁহাতে থাকিযা জগতেব কার্য সম্পাদন কবে। কার্য শেষ হইলেই মায়া তিরোহিত হইয়া যায। এই মাযিক আবির্ভাব ও তিবোভাবেব নাম তাঁহাব জন্ম মরণ। কিন্তু এই অবতাবত্বের উপব গীতাব ঝোঁক নাই। যাহা হইতে সর্বভূতেব আবির্ভাব, যিনি সর্বভূতেব ঈশ্বব, মনুষ্যের গোপন হৃদযবিহাবী সেই অতীন্দ্রিয়, অন্তর্যামী ভগবানই গীতা প্রচাবিত শিক্ষাব কেন্দ্র। এই অন্তর্যামী ভগবানকে নির্দেশ করিয়াই গীতার সপ্তদশ অধ্যায়, ষষ্ঠ শ্লোকে বলা হইযাছে—"অত্যুগ্র আসুবিক তপস্যাকাবীবা দেহমধ্যস্থিত আমাকে কৃশীকৃত কবে"। এই অন্তর্যামীকে লক্ষ্য কবিয়া ষোডশ অধ্যাযে অষ্টাদশ শ্লোকে বলা হইয়াছে—"আসুর পুরুষগণ নিজ ও অন্যেব দেহস্থিত আত্মারূপী আমাকে দ্বেষ করিয়া থাকে"। দশম অধ্যাযে একাদশ শ্লোকে বলা হইযাছে—"আমি তাহাদেব অজ্ঞানজনিত অন্ধকাব তত্ত্বজ্ঞানরূপ অত্যুজ্জ্বল

প্রদীপ দ্বারা বিনষ্ট করিয়া থাকি"। —এখানে সেই মানুষের অন্তঃকরণে স্থিত ভগবানেরই কথা বলা হইয়াছে। এই চিরন্তন অবতার, মনুষ্যের ভিতরের ভগবান সর্বকালে মনুষ্যের মধ্যস্থিত এই দৈবচৈতন্য বাহ্য দৃশ্যরূপে গীতায় মানবাত্মার সহিত কথা কহিয়াছেন, জীবন ও দৈবকর্মের গূঢ়তত্ত্ব বুঝাইয়াছেন, সংসারের বিষম রহস্যের সম্মুখীন কিংকর্তব্যবিমূঢ় মানবকে ভগবদ্বাক্য, ভগবদ্‌জ্ঞানের আলোক দিয়াছেন, অভয় দিয়াছেন, সান্ত্বনা দিয়াছেন। ভগবান যে গুরু, সখা ও সহায় রূপে সকলের হৃদয়ে রহিয়াছেন ভাবতের ধর্ম তাহাই পরিস্ফুট করিবার নিমিত্ত কোথাও মন্দিরে ভগবানের মানবমূর্তি স্থাপন করিয়াছে, কোথাও অবতারের পূজা করিতেছে, কোথাও মানবগুরুর মুখ দিয়া সেই এক জগদ্‌গুরুর কথা শুনিবার জন্য শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত গুরুর অর্চনা করিতেছে। এই সকল আচরণের দ্বারা চেষ্টা হইতেছে যেন আমরা সেই হৃদিস্থিত ভগবানের ডাকে সাড়া দিতে পারি, মায়ার আবরণ ভেদ করিয়া সেই অরূপের রূপ দর্শন করিতে পারি, সেই ভগবৎ-শক্তি, ভগবৎ-প্রেম, ভগবদ্‌জ্ঞানের সম্মুখীন হইয়া দাঁড়াইতে পারি।

দ্বিতীয়ত, নররূপী কৃষ্ণ যে মহাভারত বর্ণিত বৃহৎ কর্মের গুপ্ত কেন্দ্র, তিনি নায়ক না হইয়াও অন্তরালে থাকিয়া যে সমস্তই পরিচালনা করিতেছেন ইহারও নিগূঢ় আধ্যাত্মিক অর্থ রহিয়াছে। ঐ বৃহৎ কর্মে বহুলোক, বহু জাতি জড়িত। কেহ নিজে কোন লাভের আকাঙ্ক্ষা না করিয়া একটা কার্যোদ্ধারে সাহায্য করিতে আসিয়াছে, কৃষ্ণ এই দলের নেতা। কেহ প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া আসিয়াছে, কৃষ্ণও তাহাদের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে তাহাদের কৌশল ব্যর্থ করিতেছেন, তাহাদের বিনাশ সাধন করিতেছেন। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ কৃষ্ণকে সকল অন্যায়ের প্রবর্তক এবং প্রতিষ্ঠিত সমাজ ও ধর্মের ধ্বংসকর্তা বলিয়া মনে করিতেছে। ঐ কর্মের সাফল্যই যাহাদের উদ্দেশ্য, কৃষ্ণ তাহাদের উপদেষ্টা, সহায়, সুহৃদ্। ঐ কর্ম যখন স্বভাবনির্দিষ্ট পথে চলিয়াছে, কর্মের কর্তৃগণ যখন শত্রুহস্তে নির্যাতিত হইয়া এবং নানা সঙ্কটের মধ্য দিয়া ভবিষ্যৎ জয়ের জন্য তৈয়ারী হইতেছে—অবতার তখন অদৃশ্য, কখনও কেবল সান্ত্বনা ও সাহায্যের জন্য দেখা দিয়াছেন। কিন্তু, প্রত্যেক সন্ধিক্ষণেই তিনি হস্তক্ষেপ করিতেছেন—তাহাও এরূপ অলক্ষ্যে যে সকলেই আপনাকে সম্পূর্ণ কর্তা বলিয়া মনে করিতেছে। এমনকি তাঁহার প্রিয়তম সখা ও প্রধান যন্ত্র অর্জুনও নিজেকে যন্ত্রমাত্র বলিয়া বুঝিতে পারেন নাই এবং শেষে তাঁহাকেও স্বীকার করিতে হইয়াছে যে এতকাল তিনি তাঁহার সখারূপী ভগবানকে চিনিতে পারেন নাই। তাঁহার উপদেশ হইতে জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তাঁহার শক্তি হইতে সাহায্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহাকে ভালবাসিয়াছেন, তাঁহার ভালবাসা পাইয়াছেন, এমনকি তাঁহার ভগবৎপ্রকৃতি না বুঝিয়াও তাঁহাকে পূজা করিয়াছেন। কিন্তু, তিনিও অপরের ন্যায় অহঙ্কারের বশেই চলিয়াছেন। অজ্ঞানীকে যেভাবে উপদেশ দেওয়া হয়, সাহায্য দেওয়া হয়, পরিচালনা করা হয়, অজ্ঞানী তাহা যেভাবে গ্রহণ করে—অর্জুনের পক্ষে তাহাই হইয়াছে। যতক্ষণ না সব আসিয়া

কুরুক্ষেত্রের ভীষণ যুদ্ধের ফলাফলের উপর নির্ভর করিল, এবং ভগবান সারথিরূপে (তখনও যোদ্ধারূপে নহে) ঐ যুদ্ধের নায়কের রথে না নামিলেন —ততক্ষণ তিনি তাঁহার প্রিয়তমদের নিকটও আত্মস্বরূপ প্রকাশ করেন নাই।

অতএব মানুষের সহিত ভগবান কিরূপ ব্যবহার করেন—নররূপী কৃষ্ণ যেন তাহারই রূপক, প্রকৃষ্ট উদাহরণ। আমাদের অহঙ্কারের ও অজ্ঞানের বশেই আমরা চলি—ভাবি বুঝি আমরাই কর্তা, আমরা সকল ফলের প্রকৃত কারণ। প্রকৃতপক্ষে যাহা আমাদিগকে চালিত করে, তাহাকে আমরা একটা অস্পষ্ট, এমনকি একটা মানুষিক ও পার্থিব জ্ঞান আকাঙ্ক্ষা বা শক্তির উৎস, কোন নীতি, জ্যোতিঃ বা তেজ বলিয়া মাঝে মাঝে দেখি, না জানিয়া, না বুঝিয়া পূজাও করি। শেষে এক দিন আসে যখন এই রহস্যের সম্মুখে আমাদিগকে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইতে হয়।

ভগবান শুধু মানুষের আভ্যন্তরীণ জীবনেই নাই—সংসারের দুর্জ্ঞেয় বিশাল কর্মক্ষেত্র যাহা মানুষ বুদ্ধির সাহায্যে অতি অল্পটুকুই অস্পষ্টভাবে বুঝিয়া প্রতিপদে সংশয়ের সহিত অগ্রসর হয়—ভগবান সমুদয়ই ব্যাপিয়া রহিয়াছেন। এইরূপ এক কর্ম যখন বিষম সন্ধিক্ষণে উপস্থিত তখনই গীতার শিক্ষার উৎপত্তি এবং ইহাই গীতার বিশেষত্ব। গীতা যে কর্মবাদ প্রচার করিয়াছে—এইরূপ ঘটনার সমাবেশে তাহা অতি পরিস্ফুট হইয়াছে। ভারতের আর কোন ধর্মগ্রন্থে এরূপটি দেখিতে পাওয়া যায় না। শুধু গীতাতে নহে, মহাভারতের অন্যান্য স্থানেও দেখিতে পাওয়া যায় যে কৃষ্ণ কর্মের প্রয়োজনীয়তা বিশেষ জোরের সহিত প্রচার করিয়াছেন। কিন্তু, শুধু গীতাতেই তিনি কর্মের গূঢ় রহস্য এবং আমাদের কর্মের অন্তরালে যে ভগবৎ-শক্তি রহিয়াছে তাহার পরিচয় দিয়াছেন।

ভারতীয় চিন্তার ইতিহাসে ও অন্যান্য স্থানেও অর্জুন ও কৃষ্ণের, জীবাত্মা ও পরমাত্মার সাহচর্য অন্যান্য রূপকের দ্বারা বর্ণিত হইয়াছে। কোথাও ইন্দ্র ও কুৎস এক রথে উপবিষ্ট হইয়া স্বর্গের দিকে চলিয়াছেন, কোথাও এক বৃক্ষের উপরে দুইটি পক্ষী বসিয়া রহিয়াছে, কোথাও যুগলরূপী নর ও নারায়ণ জ্ঞানের জন্য এক সঙ্গে তপস্যা করিতেছেন। এই সকল স্থানে লক্ষ্য হইতেছে জ্ঞান লাভ; কিন্তু গীতার অর্জুন ও কৃষ্ণের লক্ষ্য জ্ঞান নহে, যে কর্মের দ্বারা জ্ঞানে পৌঁছান যায়, যে কর্মের ভিতরে পরম জ্ঞানী স্বয়ং ভগবান রহিয়াছেন—সেই কর্মই লক্ষ্য। অর্জুন এবং কৃষ্ণ জ্ঞানলাভের নিমিত্ত ধ্যানের উপযোগী কোন নির্জন শান্তিময় আশ্রমে উপস্থিত হন নাই, কিন্তু যোদ্ধা ও সারথিরূপে রণক্ষেত্রে শস্ত্র-সম্পাতের মধ্যে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। অতএব, যিনি গীতার গুরু, তিনি মানুষের অন্তর্যামী ভগবানরূপে শুধু জ্ঞানের জগতেই নিজ-স্বরূপ প্রকাশ করেন না—সমগ্র কর্মজগতও তিনিই চালনা করেন। তাঁহার দ্বারা এবং তাঁহার জন্যই আমরা সকলেই জীবিত রহিয়াছি, কর্ম করিতেছি, যুদ্ধ করিতেছি—সকল মানবজীবন তাঁহারই অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। তিনিই সকল কর্মের, সকল যজ্ঞের অজ্ঞাত প্রভু—তিনি সকল মানবেরই সুহৃদ্।

তৃতীয় অধ্যায়

মানব শিষ্য

গীতাব গুরু কিরূপ তাহা দেখিলাম। তিনি চিরন্তন অবতাব, মানবচৈতন্যে অবতীর্ণ ভগবান, সর্বভূতের হৃদিস্থিত ঈশ্বব। দৃশ্য ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু ও শক্তিসমূহেব অন্তরালে থাকিয়া তিনি যেমন বিরাট বিশ্বব্যাপী কর্ম পবিচালনা করিতেছেন, তেমনই আবরণের অন্তবালে থাকিয়া তিনি আমাদেব সমস্ত চিন্তা, কর্ম, বাসনা পবিচালিত কবিতেছেন। যখন আমবা এই অন্তবাল—এই আববণ ঘুচাইযা আমাদেব অপ্রকৃত "আমি"ব পশ্চাতে প্রকৃত "আমি"ব সন্ধান পাইব, আমাদেব ব্যক্তিত্ব আমাদেব জীবনেব প্রকৃত অধীশ্বব সেই একমাত্র সত্য পুরুষেব মধ্যে সমর্পণ করিতে পাবিব, আমাদেব চঞ্চল বিক্ষিপ্ত মনকে তাঁহাব পূর্ণজ্যোতিতে ডুবাইতে পাবিব, আমাদের সকল ভ্রান্ত ইচ্ছা, সকল নিষ্ফল চেষ্টাকে তাঁহার বিরাট জ্যোতির্ময অখণ্ড ইচ্ছাশক্তিব ভিতব ছাড়িযা দিতে পাবিব,—যখন তাঁহার অফুরন্ত আনন্দেব মধ্যে আমাদের সকল আবেগেব সকল বহির্মুখী বাসনাব পরিতৃপ্তি হইবে—তখনই আমাদেব ঊর্ধ্বগতি লাভেব সকল চেষ্টা সফল ও সমাপ্ত হইবে। তিনি জগদ্‌গুরু। অন্য সমস্ত শ্রেষ্ঠজ্ঞানই তাঁহাব অনন্ত জ্ঞানেব বিভিন্ন প্রতিচ্ছায়া এবং আংশিক বিকাশ। তাঁহাবই বাণী শুনিবার জন্য আমাদেব আত্মাকে জাগাইয়া তুলিতে হইবে।

একদিকে মানবের হৃদযবিহারী ভগবান যেমন গীতাজ্ঞানেব গুরু, অন্যদিকে তেমনই মানবপ্রধান অর্জুন গীতাব শিষ্য। কুরুক্ষেত্রেব যুদ্ধস্থলেই তাঁহাব দীক্ষা হইয়াছে। যে সকল মানব এখনও জ্ঞান লাভ কবে নাই কিন্তু হৃদিস্থিত ভগবানেব সাহচর্যে সংসাবে কর্ম কবিয়া ক্রমশ তাঁহাব দিকে অগ্রসব হইযাছে এবং জ্ঞানলাভের যোগ্য হইযাছে, সন্দেহ ও সংশযে পীড়িত হইয়া প্রকৃত পথ ধবিবাব জন্য ব্যগ্র হইয়াছে, অর্জুন তাহাদের প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। শুধু গীতাকে নহে, সমগ্র মহাভারতকেই মানবের আভ্যন্তবিক জীবনেব রূপক ভাবে ব্যাখ্যা কবিবাব একটা রীতি আছে। এই মতানুসারে মহাভারত ও গীতা মানবের বাহ্য জীবন ও কর্ম লইয়া লিখিত নহে—আধ্যাত্মিক জীবনে আমাদিগকে বিপুগণেব সহিত যে সংগ্রাম কবিতে হয এখানে তাহাই বিস্তৃত রূপকেব সাহায্যে বর্ণিত হইযাছে। কিন্তু মহাভারতেব ভাষা ও সাধাবণ ধরন হইতে এরূপ ব্যাখ্যা কবিতে হইলে সকল সময়ই টানিয়া অর্থ কবিতে হয় এবং গীতাব সহজ সবল দার্শনিক ভাষাকে অদ্ভুতভাবে বিকৃত কবিতে হয়। বেদেব ভাষা এবং কতক অংশে পুবাণেব ভাষা যে রূপক তাহা স্পষ্টই বুঝা যায—সেখানে অদৃশ্য জগতেব বস্তুসমূহ বাহ্য মূর্তি ও ঘটনাব রূপকেব ভিতব দিযা বর্ণিত হইযাছে। কিন্তু গীতার শিক্ষা সোজা কথায

লিখিত হইযাছে এবং মানুষেব বাস্তব জীবনে যে সকল নৈতিক ও আধ্যাত্মিক প্রশ্ন উঠিতে পাবে তৎসমূহেব সমাধানেব চেষ্টা হইয়াছে। এই স্পষ্ট সহজ ভাষাকে নিজেদেব খেযালমত টানিযা রূপক বাহিব কবিলে চলিবে না। তবে যে অবস্থা অবলম্বন কবিয়া গীতাব শিক্ষা দেওয়া হইযাছে সেটি আদর্শ অবস্থা। বাস্তবিক এরূপ একটা আদর্শ অবস্থা না ধবিলে তাহাব সহিত গীতার শিক্ষার সামঞ্জস্য থাকে না। আমবা পূর্বেই দেখিযাছি, একটি বৃহৎ যুদ্ধেব, জাতির জীবনে ভগবান কর্তৃক চালিত এক বৃহৎ ব্যাপারেব প্রধান কর্মী অর্জুন। কর্মের পথে মানুষ এমন ভীষণ সঙ্কটস্থলে উপস্থিত হয যখন বিশ্বসমস্যা, সুখ-দুঃখ সমস্যা, পাপ-পুণ্য সমস্যা লইযা তাহাকে বিব্রত হইয়া পড়িতে হয়। গীতার শিষ্য অর্জুন এরূপ অবস্থায পতিত মানবেব প্রকৃষ্ট উদাহবণ।

যে বথে ভগবান কৃষ্ণ সাবথি, অর্জুন সেই রথেব যোদ্ধা। মানব এবং দেবতা এক বথে চড়িযা গন্তব্যস্থানে যাইবার নিমিত্ত মহাযুদ্ধ করিতেছে—এরূপ ছবি বেদেও চিত্রিত হইযাছে, কিন্তু সেখানে ইহা নিছক রূপক। আলোক ও অমবত্বেব দেশ স্বর্গেব অধীশ্বব ইন্দ্রই দেবতা। মানব যখন উচ্চ জীবনের পরিপন্থী মিথ্যা, অন্ধকার, সঙ্কীর্ণতা, মৃত্যু প্রভৃতিব সহিত যুদ্ধ করে তখন মানবের সাহায্যের নিমিত্ত সেই দিব্য জ্ঞানেব মূর্তি ইন্দ্র নামিযা আসেন। ইন্দ্র যেখানকার অধীশ্বব সেই পবম জ্ঞানেব আলোকে উদ্ভাসিত, অমবত্বেব রাজ্য স্বর্গই গন্তব্য স্থান। কুৎস মানব। কুৎস নামের অর্থ এই যে, সে সর্বদা প্রকৃত জ্ঞানের অনুসন্ধান করিতেছে। অর্জুন অর্থাৎ শ্বেত পুরুষ তাঁহাব পিতা, শ্বিত্রা অর্থাৎ শ্বেত জননী তাঁহার মাতা। অর্থাৎ সে সাত্ত্বিক, পবিত্র, জ্ঞানময আত্মা—দৈবজ্ঞানের অখণ্ড ঐশ্বর্যের অধিকাবী। যাত্রাশেষে বথ যখন গন্তব্য স্থান ইন্দ্রেব বাজত্বে উপস্থিত হইল, তখন মানব কুৎস তাহাব দেব সঙ্গীব এরূপ সাদৃশ্য লাভ কবিযাছে যে ইন্দ্রেব স্ত্রী সত্যজ্ঞানী শচী ভিন্ন আব কেহ উভযেব মধ্যে তফাত বুঝিতে পারিল না। এই গল্পটি যে মানুষেব আভ্যন্তবিক জীবনেব রূপক তাহা স্পষ্টই বুঝা যায। জ্ঞানেব আলোক যত বর্ধিত হয ততই যে মানব দেবতার সাদৃশ্য লাভ কবে তাহাই এখানে রূপকেব সাহায্যে বর্ণিত হইযাছে। কিন্তু গীতার সূচনা কর্ম হইতেই, এবং অর্জুন জ্ঞানেব লোক নহেন, কর্মেব লোক। তিনি মোটেই দ্রষ্টা বা জ্ঞানপিপাসু নহেন, তিনি যোদ্ধা।

শিষ্যের চবিত্রেব বিশেষত্ব গীতার প্রথমেই পরিস্ফুট করা হইযাছে এবং ববাবর এই বৈশিষ্ট্যেব দিকে লক্ষ্য বাখা হইযাছে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধস্থানে সমবেত জ্ঞাতিগণকে দেখিযা অর্জুনেব যে ভাব, যে বিকাবের উদয় হয়, তাহা হইতেই স্পষ্ট বুঝা যায যে অর্জুনেব প্রকৃতি জ্ঞানীব নহে, কর্মীর। যে সকল ভাবপ্রবণ চরিত্রবান বুদ্ধিমান মনুষ্য সংসাবেব গূঢ় বহস্য সম্বন্ধে গভীর চিন্তা কবিতে অভ্যস্ত নহে—কিন্তু, উচ্চ আদর্শ মানিযা লইয়া সমাজে প্রচলিত বিধিনিষেধ অনুসরণ কবিযা সকল পতন অভ্যুত্থানেব মধ্যে নিশ্চিন্তমনে আপন আপন কর্তব্য করিয়া

যায়—অর্জুনেব প্রকৃতি তাহাদেরই মত। —এই সকল লোকেব ধ্যানধাবণা আঘাত পাইয়া যখন ওলটপালট হইয়া যায়, এতদিন তাহাবা যে বিধিনিষেধ, যে আদর্শ মানিয়া কার্য করিয়া আসিতেছিল তাহাতে যখন ঘোব সন্দেহ উপস্থিত হয, তখন কর্মজীবনের সকল অবলম্বন হাবাইযা তাহারা যেমন বিমূঢ় হইযা পড়ে, অর্জুনের অবস্থাও তদ্রূপ হইয়াছিল।

গীতার ভাষায অর্জুন ত্রিগুণেব অধীন। সাধাবণ মনুষ্যেব মত এই ক্ষেত্রেই তিনি এতদিন নিশ্চিন্তভাবে বিচরণ করিয়া আসিয়াছেন। অর্জুন শুধু এতদূব পবিত্র ও সাত্ত্বিক যে জীবনে তিনি উচ্চ আদর্শ, উচ্চ নীতিব বশে চলিযাছেন এবং উচ্চ ধর্ম সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞান যতদূব তদনুসাবে তিনি তাঁহাব পাশবিক প্রবৃত্তিগুলিকে সংযত রাখিতে অভ্যাস কবিয়াছেন—এবং শুধু এইখানেই তাঁহাব অর্জুন নামেব সার্থকতা। তিনি উগ্র অসুর প্রকৃতির লোক নহেন, রিপুব বশ নহেন। শান্ত, সংযত এবং অবিচলিতভাবে কর্তব্য সাধনে তিনি অভ্যস্ত। অন্যান্য মানবেব মত তাঁহাবও অহং জ্ঞান আছে—তবে তাহা সাত্ত্বিক অহঙ্কাব। ইহাব বশে তিনি নিজেব স্বার্থ বা বৃত্তি চবিতার্থতার জন্য বিশেষ ব্যগ্র না হইযা—অপবেব মঙ্গলসাধনে তৎপব হইয়াছেন—সামাজিক এবং নৈতিক বিধিনিষেধ অনুসবণ কবিযাছেন, শাস্ত্রোক্ত বিধান অনুসারে তিনি জীবনযাপন কবিযাছেন, নিজেব কর্তব্য নির্ধাবণ কবিযাছেন। মানবজীবনের কর্তব্য সম্বন্ধে আধ্যাত্মিক, সামাজিক, নৈতিক যে সকল আইনকানুন বিধিবদ্ধ আছে তাহাদেব সমষ্টিকেই ভাবতবর্ষে ধর্ম বলা হয। মানবেব ধর্ম কি, বিশেষত উচ্চহৃদয, আত্মজয়ী, জননায়ক, যুদ্ধবিশাবদ ক্ষত্রিয বীবেব ধর্ম কি—অর্জুনের প্রধান চিন্তা তাহাই এবং জীবনে তিনি সেই ধর্মেবই অনুসবণ কবিয়াছেন। এই নীতিব অনুসবণ কবিয়া তিনি স্থিবনিশ্চয ছিলেন যে যাহা ঠিক যাহা সৎ তিনি এতদিন তাহাই কবিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু, এই নীতি আজ তাঁহাকে এক ভীষণ অঘটিতপূর্ব নৃশংস হত্যাকাণ্ডেব মধ্যে আনিযা ফেলিযাছে—যে যুদ্ধেব ফলে আর্য সভ্যতা, আর্য সমাজ ধ্বংস হইবে, ভারতেব ক্ষত্রিযবংশেব যাহাবা গৌবব তাহাবা বিনষ্ট হইবে, অর্জুনকে সেই সর্বনাশকব যুদ্ধেব নাযক হইতে হইযাছে।

অর্জুন যে কর্মী তাহার একটি প্রধান লক্ষণ এই যে যতক্ষণ না সমস্ত ব্যাপাব তাঁহার চক্ষুব গোচর হইল, ততক্ষণ তিনি কি গুরুতব কর্ম কবিতে অগ্রসব হইয়াছিলেন তাহা উপলব্ধি হইল না। তিনি যখন তাঁহাব সখা ও সাবথিকে উভয সৈন্যেব মধ্যে বথস্থাপন করিতে বলিলেন, তখন তাঁহাব অন্য কোন গভীব মতলব ছিল না। তিনি গর্বের ভবে দেখিতে চাহিলেন যে অধর্মেব পক্ষে কত সহস্র লোক যুদ্ধ কবিতে আসিযাছে এবং তাহাদিগকে হেলায পরাজয় কবিযা তাঁহাকে ধর্মেব প্রতিষ্ঠা কবিতে হইবে। যাহাবা জ্ঞানীব প্রকৃতিসম্পন্ন চিন্তাশীল—তাহাবা যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইবাব পূর্বেই চিন্তাব দ্বাবা সমস্ত অবস্থা হৃদযঙ্গম কবিতে পাবিত। কিন্তু, কর্মবীব অর্জুন যখন চক্ষু চাহিযা দেখিতে লাগিলেন, তখনই সেই

ভীষণ গৃহবিবাদেব প্রকৃত মর্ম প্রথম তাঁহার উপলব্ধি হইল। তিনি দেখিলেন—সে যুদ্ধক্ষেত্রে শুধু একই দেশেব একই জাতিব লোক সমবেত হয নাই, একই কুলের একই পবিবাবেব লোকই পবস্পরকে যুদ্ধে হত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছে। সামাজিক মনুষ্যেব নিকট যাহারা সর্বাপেক্ষা স্নেহ, ভালবাসা, শ্রদ্ধা ও ভক্তির পাত্র, শত্রুভাবে তাহাদেব সকলেব সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে, তাহাদিগকে বধ কবিতে হইবে। আত্মীয়, গুরুজন, বন্ধু, বাল্যসহচব—সব ভালবাসা, স্নেহ, ভক্তির সম্বন্ধ অসিব আঘাতে ছিন্ন কবিতে হইবে। অর্জুন যে পূর্বে ইহা জানিতেন না, তাহা নহে—তবে, তিনি ইহাব গুরুত্ব যথার্থভাবে উপলব্ধি কবিতে পাবেন নাই। তাঁহাব দাবীব ন্যায্যত্ব, ন্যাযেব বক্ষা, অন্যায়ের দমন, দুষ্টের শাসনরূপে তাঁহাব ক্ষত্রিয়ের ধর্ম, ধর্মপক্ষ সমর্থনরূপ তাঁহাব জীবনেব নীতি—এই সকলের চিন্তায় তিনি এমনই মগ্ন ছিলেন যে এই যুদ্ধেব প্রকৃত মর্ম তিনি গভীরভাবে দেখেন নাই, হৃদয়ে অনুভব কবেন নাই, তাঁহাব অন্তরেব অন্তঃস্থলে উপলব্ধি করেন নাই। এখন সাবথিরূপী ভগবান কর্তৃক সেই দৃশ্য যখন তাঁহার চক্ষের সম্মুখে ধবা হইল—তখন একটা মর্মান্তিক আঘাতের মত সমস্ত ব্যাপারটা তাঁহার হৃদযঙ্গম হইল।

সেই আঘাতেব প্রথম ফল হইল অর্জুনের প্রবল শারীরিক ও মানসিক বিকার। এই বিকাবেব ফলে যুদ্ধেব উপর, যুদ্ধেব উদ্দেশ্য ঐহিক লাভের উপর, এমনকি জীবনেবও উপব অর্জুনেব বিষম বিতৃষ্ণা উপস্থিত হইল। ভোগসুখই সাধাবণ (অহঙ্কৃত) মানবেব জীবনেব প্রধান লক্ষ্য—অর্জুন তাহা অগ্রাহ্য করিলেন। ক্ষত্রিযেব প্রিয বাজ্য, প্রভুত্ব, জয—অর্জুন তাহাও বর্জন করিলেন। এই যুদ্ধকে ন্যাযযুদ্ধ বলা যাইতেছে, কার্যত ইহা কি স্বার্থের জন্যই যুদ্ধ নহে? তাঁহাব নিজের স্বার্থেব জন্য, তাঁহাব ভ্রাতাদেব, তাঁহাব দলের লোকেব স্বার্থেব জন্য রাজ্যভোগ, আধিপত্যেব জন্যই এই যুদ্ধ নহে কি? কিন্তু এই সকল বস্তুব জন্য এত অধিক মূল্য দেওযা চলে না। কাবণ সমাজ ও জাতিকে সুবক্ষিত করিবাব জন্যই এই সব বস্তুব প্রযোজন—ইহাদেব অন্য প্রয়োজনীযতা আব কিছুই নাই—অথচ, যুদ্ধে জ্ঞাতি ও কুল ধ্বংস কবিযা তিনি সেই সমাজ ও জাতিকেই নষ্ট করিতে উদ্যত হইযাছেন।

তাহাব পব হৃদযবৃত্তিব কান্না আরম্ভ হইল। যাহাদেব জন্য রাজ্য, ভোগ, জীবন বাঞ্ছনীয সেই "স্বজন"ই যুদ্ধার্থ উপস্থিত। পৃথিবীব আধিপত্য তো দূবেব কথা ত্রিলোকবাজ্যেব লোভেও এই সকল আপনার লোককে বধ করিতে কে চায়? তাহাব পব বিবেক জাগিযা উঠিয়া যোগ দিযা বলিল—এই সমস্ত ব্যাপাবটাই একটা মহাপাপ। পবস্পবকে হত্যা করা পাপ—ইহাতে ন্যায, ধর্ম কিছুই নাই। বিশেষত যাহাদিগকে হত্যা কবিতে হইবে, তাহাবা সকলে স্নেহ, ভক্তি, ভালবাসার পাত্র। তাহাদিগকে ছাড়িলে জীবনে কোন সুখই থাকে না। হৃদয়েব পবিত্র বৃত্তিগুলিকে দলিত কবিযা তাহাদিগকে বধ কবা কখনই ধর্ম হইতে পারে

না—ইহা অতি ঘৃণ্য, জঘন্য পাপ ভিন্ন আর কিছুই নহে। অপর পক্ষই দোষ করিয়াছে, অত্যাচার করিয়াছে, প্রথম পাপ তাহারাই করিয়াছে—তাহাদের লোভ ও স্বার্থপরতাই এই গৃহযুদ্ধ ঘটাইয়াছে—ইহা সত্য বটে। তথাপি এরূপ অবস্থায় অন্যায়ের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করাই পাপ—এরূপ করিলে তাহাদের অপেক্ষাও অধিক পাপ করা হইবে। কারণ, তাহারা লোভে বুদ্ধিভ্রষ্ট হইয়া জ্ঞাতিবধরূপ মহাপাপ উপলব্ধি করিতেছে না—কিন্তু পাণ্ডবগণ স্পষ্ট জানিয়া বুঝিয়াই সেই মহাপাপ করিবে! কিসের জন্য? কুলের ধর্ম, সমাজের ধর্ম, জাতির ধর্ম বজায় রাখিবার জন্য? ঠিক এই সকল ধর্মই—ভ্রাতৃবিরোধের ফলে বিনষ্ট হইবে; কুল ধ্বংসোন্মুখ হইবে, দুর্নীতি ইত্যাদি দোষ কুলে প্রবেশ করিবে, কুলের পবিত্রতা নষ্ট হইবে—সনাতন জাতিধর্ম সকল ও কুলধর্ম সকল উৎসন্ন যাইবে। এই নৃশংস গৃহবিবাদের ফল শুধু এই হইবে যে জাতি নষ্ট হইবে, জাতিধর্ম নষ্ট হইবে এবং এই মহাপাপের কর্তাদিগকে নরকে যাইতে হইবে। অতএব অর্জুন এই ভীষণ যুদ্ধের জন্য দেবতাগণ তাঁহাকে যে গাণ্ডীব ধনু ও অক্ষয় তূণ দিয়াছিলেন তাহা পরিত্যাগ করিয়া রথে বসিয়া পড়িলেন। বলিলেন—"যদি অশস্ত্র ও প্রতিকারের অনুদ্যোগী আমাকে সশস্ত্র ধার্তরাষ্ট্রগণ রণে সংহার করেন, তাহাও ইহা অপেক্ষা আমার মঙ্গল। আমি যুদ্ধ করিব না।"

অতএব অর্জুনের ভিতর যে ভাবসঙ্কট উপস্থিত তাহা তত্ত্বজিজ্ঞাসুর অনুরূপ নহে। অর্জুন সংসারকে অসার বা মিথ্যা বুঝিয়া প্রকৃত সত্যের সন্ধানে তাঁহার মন ও বুদ্ধিকে বাহ্যজগৎ ও কর্ম হইতে ফিরাইয়া আনিয়া অন্তর্মুখী করেন নাই। জগতের গূঢ় রহস্য ভেদ করিতে না পারিয়া তিনি প্রকৃত সমাধানের নিমিত্ত গাণ্ডীব পরিত্যাগ করিয়া বসিয়া পড়েন নাই। কর্তব্যাকর্তব্যের প্রচলিত মানদণ্ডগুলি মানিয়া লইয়া তিনি এতদিন নিশ্চিন্ত মনে কর্ম করিয়া আসিয়াছেন—কিন্তু এইগুলি শেষকালে তাঁহাকে এমন এক সঙ্কটস্থলে আনিয়া ফেলিয়াছে, যেখানে তাঁহার ধ্যানধারণা ধর্ম-অধর্ম কর্তব্যাকর্তব্যের জ্ঞান ভীষণভাবে গোলমাল হইয়া গিয়াছে, তাঁহার জানা বিভিন্ন কর্তব্যের মধ্যে বিষম বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে। "ধর্ম" শব্দের ধাতুগত অর্থ—যাহা বস্তু সকলকে ধরিয়া রাখে এবং যাহাকে, যে নীতিকে ধরিয়া মানুষ কর্মের পথে সংসারের পথে অগ্রসর হইতে পারে। অর্জুনের সঙ্কট এই যে, এতদিন যে সকল ধর্ম, যে সকল নীতি অবলম্বন করিয়া তিনি নিশ্চিন্তমনে সংসারে কর্ম করিয়া আসিয়াছেন—এখন সেগুলিতে আর কুলাইয়া উঠিতেছে না, সব যেন ভাঙিয়া পড়িতেছে—তাই তাঁহার দেহ মন চিত্ত বিবেক একসঙ্গে বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছে। কর্মীর জীবনে ইহা অপেক্ষা বড় সঙ্কট আর কিছুই নাই। এমনই করিয়া তাহার পরাজয় হয়। অর্জুনের মধ্যে এই বিদ্রোহ খুবই সহজ ও স্বাভাবিক। আত্মীয়বধের নিষ্ঠুরতা উপলব্ধি করিয়া কৃপার বশে তাঁহার শরীর অবসন্ন হইল, মানুষ সংসারে সচরাচর ধন, মান, প্রতিপত্তি যাহা কিছু চায় তাহারই উপর তাঁহার বিতৃষ্ণা উপস্থিত হইল।

যাহাতে স্নেহ ভক্তি ভালবাসা পদদলিত করিতে হইবে সেই কঠোর কর্তব্য করিতে তাঁহার প্রাণ চাহিল না। আত্মীয় ও গুরু বধ করিয়া রুধিরাক্ত ভোগ্যবস্তুসকল উপভোগ করা যে পাপ সেই পাপভয়ে তিনি অভিভূত হইয়া পড়িলেন। যে উদ্দেশ্যের জন্য এই নৃশংস যুদ্ধ, যুদ্ধের ফলে সেই উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইবে—এই ব্যর্থতার আশঙ্কায় তিনি বিচলিত হইলেন। কিন্তু অর্জুন তাঁহার সর্বতোমুখী আন্তরিক অবসন্নতা সংক্ষেপে তখনই প্রকাশ করিলেন, যখন তিনি বলিলেন—

কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ
পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্ম্মসংমূঢ়চেতাঃ।

—"দীনতা দোষে আমার ক্ষত্রিয়স্বভাব অভিভূত হইয়াছে, ধর্মাধর্ম সব বিপর্যস্ত হইয়াছে।" —তিনি ধর্ম কি তাহা খুঁজিয়া পাইতেছেন না, তাঁহার কর্মের যথার্থ মানদণ্ড কি হইবে, কোন্ নীতির অনুসরণ করিলে তিনি নিশ্চিন্ত মনে কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে পারিবেন—তাহা স্থির করিতে পারিতেছেন না। শুধু এই জন্যই তিনি শিষ্যভাবে কৃষ্ণের শরণাপন্ন হইলেন। কার্যত তিনি ইহাই প্রার্থনা করিলেন—"কর্মের একটা সত্য স্পষ্ট নীতি আমাকে দাও—আমি ইহাই হারাইয়া বিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছি। এমন পথ দেখাও, এমন নীতি শিক্ষা দাও যেন আমি নিশ্চিন্তমনে কর্মের পথে অগ্রসর হইতে পারি।" জীবনের গূঢ় রহস্য, সংসারের গূঢ় রহস্য—এই সকলের প্রকৃত মর্ম ও উদ্দেশ্য অর্জুন জানিতে চাহিলেন না—তিনি কেবল চাহিলেন একটা "ধর্ম"।

অথচ যে রহস্য অর্জুন জানিতে চাহেন না, ভগবান অর্জুনকে ঠিক সেইটিই জানাইতে চাহেন। অন্তত উচ্চজীবন লাভের জন্য যতটুকু জ্ঞানের প্রয়োজন, তাঁহার প্রিয় শিষ্যকে সেই জ্ঞানটুকু দেওয়াই ভগবানের উদ্দেশ্য। কারণ, তিনি চান যে অর্জুন সকল "ধর্ম" পরিত্যাগ করিয়া—সজ্ঞানে ভগবানের মধ্যে বাস করা এবং সেই জ্ঞানের বশে কাজ করা—এই একমাত্র বিরাট উদারনীতি গ্রহণ করুক। অতএব, প্রথমে তিনি পরীক্ষা করিয়া লইলেন যে মানুষ সচরাচর যে সকল কর্ম কর্তব্যাকর্তব্যের যে সকল মানদণ্ড অনুসরণ করে, অর্জুন সেইগুলি সম্পূর্ণভাবে অতিক্রম করিতে পারিয়াছেন কিনা। তাহার পর তিনি আত্মার অবস্থার সঙ্গে সম্বন্ধ আছে এমন সব কথা বিশদভাবে বলিতে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু কর্মের বাহ্য আইনকানুনের কোন কথাই বলিলেন না। তাঁহাকে আত্মার সমত্ব লাভ করিতে হইবে অর্থাৎ সুখদুঃখ লাভালাভ জয়পরাজয় তুল্যজ্ঞান করিতে হইবে, ফলকামনা পরিত্যাগ করিতে হইবে, সাধারণ পাপপুণ্য-জ্ঞানের উপরে উঠিতে হইবে, বুদ্ধি একমাত্র পরমেশ্বরে নিশ্চলা ও স্থিরা রাখিতে হইবে, যোগস্থ হইয়া কর্ম ও জীবনযাপন করিতে হইবে। অর্জুন ইহাতে সন্তুষ্ট হইলেন না। তিনি জানিতে চাহিলেন যে এরূপ অবস্থান্তর হইলে মানুষের বাহ্য কর্মে কি পরিবর্তন হইবে, তাহার কথাবার্তা, তাহার কর্ম, তাহার চালচলনের উপর এরূপ পরিবর্তনের কি

প্রভাব হইবে? কৃষ্ণ কিন্তু কর্ম সম্বন্ধে কিছু না বলিযা কর্মেব পশ্চাতে আত্মাব অবস্থা (Soul-state) কিরূপ থাকা উচিত সেই সম্বন্ধে যাহা বলিতেছিলেন শুধু বিস্তার করিযা তাহাই বলিতে লাগিলেন। শুধু বুদ্ধিকে বাসনাশূন্য সমত্বেব অবস্থায স্থিরভাবে বদ্ধ কবিযা বাখিতে পারিলেই চলিবে। অর্জুন চাহিযাছিলেন কর্মেব একটা নিযম কিন্তু কৃষ্ণেব কথায তাহা তো কিছু পাইলেন না ববং তাঁহাব মনে হইল কৃষ্ণ যেন কর্ম নিষেধই কবিতেছেন। তাই তিনি অধৈর্য হইয়া উঠিলেন—"যদি তোমাব অভিমত এই যে কর্ম অপেক্ষা বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ তবে কেন ঘোর হিংসাত্মক কর্মে আমায় নিযুক্ত কবিতেছ? কখনও বা কর্ম-প্রশংসা, কখনও বা জ্ঞান-প্রশংসা, এইরূপ বিমিশ্র বাক্যে আমাব বুদ্ধিকে যেন মোহিত করিতেছ, এই দুইটির যেটি ভাল তাহা নিশ্চয কবিযা বল, যাহাতে আমি শ্রেযঃ লাভ কবিতে পাবি।" অর্জুনেব এই কথায় কর্মীব প্রকৃতিই প্রকাশ পাইতেছে। সংসারের কর্ম কবিবার অথবা প্রযোজন মত প্রাণ বিসর্জন দিবাব একটা নিযম বা ধর্ম যদি শিখিতে না পারা যায, তাহা হইলে কর্মীব নিকট শুধু আধ্যাত্মিক আলোচনা বা আভ্যন্তবীণ জীবনেব কথাব কোন মূল্য নাই। কিন্তু সংসাবে থাকিতে হইবে, কর্ম করিতে হইবে অথচ সংসাবেব উপবে উঠিতে হইবে এরূপ বাক্য বিমিশ্র এবং এরূপ গোলমেলে কথা শুনিবাব ও বুঝিবাব মত ধৈর্য তাহাব নাই।

অর্জুনের বাকি যত প্রশ্ন সব তাঁহাব এই চবিত্রগত বৈশিষ্ট্য, তাঁহাব কর্মীব স্বভাব হইতেই উঠিযাছে। যখন তাঁহাকে বলা হইল যে আত্মাব সমত্ব হইলে কর্মেব বাহ্যত কোন পবিবর্তনেব প্রযোজন হয় না—সকল সময নিজ প্রকৃতি অনুসাবেই তাঁহাব কর্ম করা একান্ত কর্তব্য, পরেব ধর্মেব তুলনায নিজেব ধর্ম সদোষ হইলেও আপন ধর্ম অনুসাবে কর্ম কবাই উত্তম—এই কথা শুনিযা অর্জুন বিচলিত হইযা উঠিলেন। প্রকৃতি অনুসাবে কার্য কবিতে হইবে? কিন্তু তাহা হইলে এই যুদ্ধ কবিতে তাঁহাব মনে যে পাপেব আশঙ্কা হইতেছে, তাহাব কি? মানুষেব এই প্রকৃতিই কি তাহাকে যেন ইচ্ছাব বিরুদ্ধেও জোব কবিযা পাপাচবণ কবায না? কৃষ্ণ যখন বলিলেন যে তিনিই পুবাকালে বিবস্বানকে এই যোগ বলিযাছিলেন, তাহা কালে নষ্ট হয, সেই জ্ঞান তিনি এখন অর্জুনকে কহিতেছেন—এই কথা বুঝা অর্জুনেব ব্যবহাবিক বুদ্ধিতে কুলাইল না। এই সম্বন্ধে প্রশ্ন কবিযা অর্জুন ভগবানেব অবতারত্ব সম্বন্ধে সেই "যদা যদা হি ধর্মস্য" ইত্যাদি সুপবিচিত বাক্যটি বাহিব কবিলেন। কৃষ্ণ যখন কর্মযোগ ও কর্মসন্ন্যাসেব সামঞ্জস্য কবিতে লাগিলেন অর্জুন তখনও আবাব "গোলমেলে" কথা বুঝিতে না পাবিযা বলিযা উঠিলেন—"এতদুভযের মধ্যে যাহা আমাব পক্ষে শ্রেযঃ, নিশ্চয কবিযা সেই একটি উপদেশ দাও।" অর্জুনকে যে যোগ অবলম্বন কবিতে বলা হইতেছে তাহাব প্রকৃত স্বরূপ যখন তিনি উপলব্ধি কবিলেন—মানসিক সঙ্কল্প, অনুবাগ ও বাসনাব বশে কার্য কবিতে অভ্যস্ত কর্মী-প্রকৃতি অর্জুন সেই আধ্যাত্মিক সাধনাব গুরুত্বে

ভীত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—যে ব্যক্তি যোগে প্রবৃত্ত হইয়া পরে মন্দবৈরাগ্যবশত অকৃতকার্য হয তাহার কি গতি হয়?

কচ্চিন্নোভযবিভ্রষ্টশ্ছিন্নাভ্রমিব নশ্যতি।
অপ্রতিষ্ঠো মহাবাহো বিমূঢ়ো ব্রহ্মণঃ পথি॥৬।৩৮

—সে এই সংসাবেব কর্মের, চিন্তাব, প্রেমেব জীবন হাবায, দেবজীবনও লাভ কবিতে পাবে না, সুতরাং উভযের বিভ্রষ্ট হইয়া সেই ব্যক্তি বিচ্ছিন্ন মেঘের ন্যায় নষ্ট হয না কি?

যখন অর্জুনেব সন্দেহ দূব হইল, তিনি জানিলেন যে ভগবানকেই তাঁহার ধর্ম বলিয়া গ্রহণ কবিতে হইবে—তখন তিনি স্পষ্ট জানিতে চাহিলেন যে, সকল কার্যের মূল, সকল কর্মেব মানদণ্ড এই ভগবানকে তিনি কার্যত জানিবেন, বুঝিবেন কেমন কবিযা? সংসাবে সাধারণত যে সকল পদার্থ দেখা যায় তাহাদেব মধ্যে কোথায ভগবানেব অভিব্যক্তি তাহা কিরূপে বুঝা যাইবে? ভগবান যে দিব্য বিভূতি দ্বাবা এই লোক সকল ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছেন, সেই দিব্য বিভূতি সকল কি এবং সর্বদা কিরূপ বিভূতিভেদ দ্বাবা চিন্তা করিলে ভগবানকে জানিতে পাবা যাইবে? যিনি মানবোচিত শরীর ও মনেব আড়ালে থাকিয়া অর্জুনের সহিত কথাবার্তা কহিতেছেন তাঁহাব ঐশ্বরিক বিশ্বরূপ কি অর্জুন এখনই একবার দেখিতে পান না? অর্জুনেব শেষ প্রশ্নগুলিও কর্মের পথ পরিষ্কার করিয়া জানিবার উদ্দেশ্যেই জিজ্ঞাসিত। কর্মত্যাগ কবিতে না বলিয়া অর্জুনকে কর্মে আসক্তি এবং কর্মেব ফল ত্যাগ করিতে বলা হইয়াছে—এই কর্মসন্ন্যাস ও ত্যাগের প্রকৃত প্রভেদটা অর্জুন স্পষ্টভাবে জানিতে চাহিলেন। বাসনারহিত হইয়া ভগবদিচ্ছার প্রেবণাব বশে কর্ম কবিতে হইলে—পুরুষ ও প্রকৃতি, ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ ইহাদের প্রকৃত প্রভেদটা জানা একান্ত আবশ্যক, তাই অর্জুন এইগুলির সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলিলেন। অর্জুনকে যে ত্রিগুণের অতীত হইতে হইবে, সেই তিন গুণের ক্রিয়া কিরূপ তিনি সর্বশেষে তাহাও বিশদভাবে জানিতে চাহিলেন।

এইরূপ একজন শিষ্যকে গীতায় গুরু ঐশ্বরিক জ্ঞান শিক্ষা দিয়াছেন। অহংভাবেব বশে কাজ করিতে কবিতে শিষ্য যখন তাঁহার চরিত্র বিকাশের এমন অবস্থায আসিযা উপস্থিত হইযাছেন যখন সাধারণ সামাজিক মানবের অবলম্বন নীতিসমূহ সহসা দেউলিয়া হইয়া পড়ায় তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছেন এবং যখন এই নিম্নস্তবেব অবস্থা হইতে তাঁহাকে উচ্চজ্ঞান, উচ্চজীবনেব মধ্যে টানিযা তুলিতে হইবে—ঠিক সেই সন্ধিক্ষণে গুরু শিষ্যকে ধরিয়াছেন। সেই সঙ্গে শিষ্য স্বযং যাহা চাহিযাছেন তাহাও দিতে হইবে অর্থাৎ এমন একটা কর্মেব নিয়ম দিতে হইবে, যাহা সাধারণ বিধিনিষেধের মত ভ্রমপ্রমাদ বিরোধপূর্ণ হইবে না—সে নিযমানুসাবে কার্য কবিলে আত্মা কর্মবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিবে অথচ ঐশ্বরীয়

জীবনের বিপুল স্বাধীনতার মধ্যে কর্ম করিতে, জয়লাভ করিতে সমর্থ হইবে। কারণ, কার্য সমাধা করিতে হইবে, জগতের যুগপরিবর্তন সুসম্পন্ন করিতে হইবে, মানবাত্মা যে কর্ম সম্পাদন করিতে আসিয়াছে অজ্ঞানের বশে তাহা না করিয়া যাহাতে পশ্চাৎপদ না হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। সমগ্র গীতার শিক্ষা ঘুরিয়া ফিরিয়া এই তিনটি উদ্দেশ্যকে লক্ষ্য করিয়াই কথিত হইয়াছে।

চতুর্থ অধ্যায়

গীতার মূলশিক্ষা

গীতার গুরু এবং শিষ্যের পরিচয় পাইলাম—এক্ষণে গীতাশিক্ষার মূল কথাটা স্পষ্টভাবে বুঝা প্রয়োজন। গীতার শিক্ষা নানা তথ্যপূর্ণ ও বহুমুখী। গীতায় আধ্যাত্মিক জীবনের নানা ভাবের সমন্বয় করা হইয়াছে। সেইজন্য বিশেষ বিশেষ মতাবলম্বীদের একদেশদর্শিতার ফলে গীতার অর্থ অন্যান্য ধর্মগ্রন্থাপেক্ষাও সহজে বিকৃত করিয়া কোন বিশেষ দার্শনিক মত বা দলের মত পোষণ করা যাইতে পারে। অতএব গীতার মূল শিক্ষা কি, প্রধান কথা কি, সে সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা করা আবশ্যক। আমরা যে মত, নীতি বা ধারণার পক্ষপাতী তাহা অলক্ষ্যে আমাদের উপর এমন প্রভাব বিস্তার করে যে সর্বত্রই আমরা সেই মত বা নীতির পরিপোষক অর্থের সন্ধান করি, ফলে অনেক সময়েই অনেক বিষয়ের প্রকৃত মর্ম আমরা গ্রহণ করিতে পারি না। মানুষের বুদ্ধি বস্তুর অন্তস্তলে প্রবেশ করিতে চায় না—ফলে সত্যটি হারাইয়া ফেলে। বিশেষ সাবধানী ব্যক্তিও এরূপ ভুল এড়াইতে পারেন না—কারণ, মানুষের বুদ্ধি সকল সময়েই নিজের এসব ভুল ধরিতে সতর্ক থাকিতে পারে না। গীতাপাঠে এরূপ ভুল সহজেই হয়। কারণ গীতার কোন অংশের উপর, গীতাশিক্ষার কোন বিশেষ দিকে, এমনকি গীতার কোন বিশিষ্ট শ্লোকের উপর বিশেষ ঝোঁক দিয়া এবং বাকি অষ্টাদশ অধ্যায় অগ্রাহ্য করিয়া আমরা সহজেই নিজেদের মত—নিজেদের দার্শনিক বা নৈতিক বাদের পোষণ করিতে পারি।

এইরূপে কেহ কেহ বলেন যে গীতা মোটেই কর্মশিক্ষা দেয় না—সংসার ও কর্ম পরিত্যাগ করিতে হইলে কিরূপ সাধনা আবশ্যক গীতা শুধু তাহাই শিক্ষা দিয়াছে। শাস্ত্র-বিহিত অথবা যেকোন কার্য হাতের নিকট উপস্থিত হয় যেমনতেমনভাবে সম্পাদন করাই উপায়—সাধনা। শেষ পর্যন্ত কর্ম ও সংসার পরিত্যাগ করাই একমাত্র প্রকৃত উদ্দেশ্য। গীতার এখান-সেখান হইতে শ্লোক তুলিয়া সহজেই এই মতের সমর্থন করা যাইতে পারে। বিশেষত গীতা সন্ন্যাসের যে অভিনব অর্থ দিয়াছে তাহা যদি আমরা লক্ষ্য না করি তাহা হইলে এরূপ মতই সমীচীন বলিয়া বোধ হইবে। কিন্তু নিরপেক্ষভাবে গীতা পাঠ করিলে এরূপ মত সমর্থন করা সম্ভব নহে। কারণ গীতায় শেষ পর্যন্ত বারবার বলা হইয়াছে যে কর্ম না করা অপেক্ষা কর্ম করা ভাল, সমতার দ্বারা বাসনার ত্যাগ এবং সর্বকর্ম ভগবানে সমর্পণ করাই শ্রেয়ঃ।

আবার কেহ কেহ বলেন যে ভক্তিতত্ত্বই গীতার সার কথা। গীতার মধ্যে অদ্বৈতবাদ এবং একব্রহ্মে শান্তিময় অবস্থানের যে সকল কথা আছে সেগুলি

তাঁহারা বিশেষভাবে লক্ষ্য করেন না। এ কথা সত্য বটে যে গীতাতে ভক্তির উপর খুবই জোর দেওয়া হইয়াছে। ক্ষর এবং অক্ষর হইতে পৃথক উত্তম পুরুষ—যিনি পরমাত্মা বলিয়া শ্রুতিতে খ্যাত আছেন, তিনি সর্বলোকের ঈশ্বর, সকলের অধিপতি, তিনি লোকত্রয় পালন করিতেছেন—এই সকল (ভক্তিমূলক) কথা গীতার অত্যাবশ্যক অংশ স্বীকার করি। তথাপি গীতার মতে, এই ঈশ্বর শুধু ভক্তির বস্তু নহেন—এই ঈশ্বরে সকল জ্ঞানেরও পরিসমাপ্তি, তিনি সকল যজ্ঞেরও অধীশ্বর এবং সকল কর্মেরও লক্ষ্য। গীতা যেখানে যেমন প্রয়োজন কোথাও কর্মের উপর, কোথাও জ্ঞানের উপর, কোথাও ভক্তির উপর জোর দিয়া তিনের সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য করিয়াছে—কোনটিকে অপর দুইটি হইতে পৃথক করিয়া উচ্চস্থান দেয় নাই। কর্ম, জ্ঞান, ভক্তি তিনে মিলিয়া যেখানে এক হইয়াছে, তিনিই শ্রেষ্ঠ পুরুষোত্তম। কিন্তু যখন হইতে লোকে বর্তমান যুগোপযোগী মন লইয়া গীতার আদর, গীতার অর্থ করিতে আরম্ভ করিয়াছে—তখন হইতেই গীতাকে কর্মযোগের গ্রন্থ বলিয়া ধরাই রীতি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। গীতায় যে বারবার কর্ম করিতে বলা হইয়াছে সেই সূত্র অবলম্বন করিয়া লোকে গীতার জ্ঞান ও ভক্তির কথা উপেক্ষা করিতেছে এবং গীতাকে শুধু কর্মবাদ, শুধু কর্মের পথ দেখাইবার আলোক বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিতেছে। গীতা যে কর্মবাদের গ্রন্থ তাহাতে সন্দেহ নাই তবে সে কর্মের পরিসমাপ্তি হইতেছে জ্ঞানে—ভগবানে ভক্তি অর্থাৎ সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণই সে কর্মের মূল। নিজের বা অপরের স্বার্থের জন্য যে কর্ম—সংসারের, সমাজের, মানবজাতির মঙ্গলের জন্য যে কর্ম, যে নীতি, যে আদর্শ বর্তমান যুগে প্রশংসিত, গীতার কর্ম বা আদর্শ তাহা হইতে সম্পূর্ণভাবে স্বতন্ত্র। অথচ গীতার আধুনিক ব্যাখ্যাকারেরা দেখাইতে চান যে গীতায় কর্মের আধুনিক আদর্শই ধরা হইয়াছে। বিশিষ্ট পণ্ডিতগণও কেবলই বলিয়া থাকেন যে ভারতের দর্শনশাস্ত্রে, ধর্মশাস্ত্রে সংসার ত্যাগ এবং সন্ন্যাসীর কঠোর জীবনের দিকে যে ঝোঁক আছে গীতা তাহারই তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছে এবং নিঃস্বার্থভাবে সামাজিক কর্তব্যসমূহ সম্পাদন করা, এমনকি আধুনিক আদর্শানুযায়ী সমাজসেবা ও পরোপকার করাই শিক্ষা দিয়াছে। কিন্তু গীতার শিক্ষা যে মোটেই এরূপ নহে, একটু অনুধাবন করিলেই তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইতে পারে। আধুনিক মনোভাব লইয়া প্রাচীন গ্রন্থ গীতার আলোচনা করায় এইরূপ ভুল ব্যাখ্যা সম্ভব হইয়াছে। পাশ্চাত্যভাবাপন্ন বুদ্ধি গীতার সম্পূর্ণভাবে প্রাচ্য, ভারতীয় শিক্ষাকে বিকৃতভাবেই বুঝিয়াছে। গীতা যে কর্মশিক্ষা দিয়াছে তাহা মানবীয় নহে, তাহা ঐশ্বরিক। সামাজিক কর্তব্য সম্পাদন গীতার শিক্ষা নহে। কর্মের, কর্তব্যের অন্য সকল বিধিনিষেধ পরিত্যাগ করিয়া অহংভাবশূন্য হইয়া যন্ত্রস্বরূপ ভগবদিচ্ছা সম্পাদনই গীতার শিক্ষা। ঈশ্বরাশ্রিত, শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষগণ অহংভাবশূন্য হইয়া জগতের হিতের জন্য এবং মানব ও জগতের অন্তরালে অবস্থিত ভগবানের উদ্দেশ্যে যজ্ঞস্বরূপ যে কর্ম করিয়া থাকেন সেই কর্মই গীতার আদর্শ।

একই কথা অন্যভাবে বলা যায় যে গীতা ব্যবহারিক নীতিশাস্ত্র নহে—গীতা আধ্যাত্মিক জীবনের গ্রন্থ। ইউরোপীয় মনোভাবই আধুনিক মনোভাব। গ্রীক ও রোমান সভ্যতার দার্শনিক চিন্তার প্রভাবেই ইউরোপীয় মনোভাব প্রথম তৈয়ারী হয়। তাহার পর মধ্যযুগে খ্রীষ্টীয় ধর্মের ভক্তিপ্রবণতার প্রভাবে ইউরোপীয় মন পুষ্ট হয়। বর্তমানে ইউরোপ এই দুয়েরই প্রভাব অতিক্রম করিয়াছে। ইহাদের পরিবর্তে সমাজসেবা, দেশসেবা, মানবজাতির সেবাই ইউরোপে আদর্শ হইয়াছে। ইউরোপ ভগবানকে ছাড়িয়াছে—বড় জোর একবার কেবল রবিবারে ভগবানের খোঁজ পড়ে। ভগবানের পরিবর্তে মানুষ হইয়াছে তাহাদের উপাস্য, মানবসমাজ হইয়াছে দৃশ্য বিগ্রহ। আধুনিক ইউরোপে নীতিপরায়ণতা, কার্যকুশলতা, পরোপকার, সমাজসেবা, মানবজাতির কল্যাণসাধন ইত্যাদিই শ্রেষ্ঠ আদর্শ, শ্রেষ্ঠ ধর্ম। এই সকলও যে ভাল তাহাতে সন্দেহ নাই। বিশেষত বর্তমান যুগে ইহাদের খুবই প্রয়োজন আছে—এইগুলি ভগবদিচ্ছারই বিকাশ নতুবা মানবসমাজে এখন ইহাদের প্রতিপত্তি কেন হইবে? যিনি ঈশ্বরীয় মানব, দেবজীবন লাভ করিয়াছেন, ব্রহ্মচৈতন্যের মধ্যে বাস করিতেছেন—তিনিও যে কার্যত এই সকল আদর্শই গ্রহণ করিবেন না তাহারও কোন কারণ নাই। বস্তুত ইহাই যদি বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ আদর্শ, যুগধর্ম হয় এবং যতদিন কোন উচ্চতর আদর্শের প্রতিষ্ঠা করিতে না হয়—ততদিন এই আদর্শ তাঁহারও অবলম্বনীয়। কারণ, তিনি হইতেছেন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি—অপরে কিরূপ আচরণ করিবে, তিনি নিজে আচরণ করিয়া তাহা দেখাইয়া দিবেন। বাস্তবিক যে সকল আদর্শ সেই যুগের পক্ষে শ্রেষ্ঠ এবং তৎকালীন সভ্যতার উপযোগী অর্জুনকে তদনুসারেই জীবনযাপন করিতে বলা হইয়াছে। কিন্তু, সাধারণ মানব যেমন কিছু না জানিয়া না বুঝিয়া একটা বাহ্য বিধিনিষেধ মানিয়া কার্য করে, সেরূপ ভাবে না করিয়া, জ্ঞানের সহিত, ভিতরে যে সত্য রহিয়াছে তাহা সম্যক জানিয়াই অর্জুনকে কর্ম করিতে বলা হইয়াছে।

কিন্তু, প্রকৃত কথাটা হইতেছে এই যে, বর্তমান যুগে মানুষ ভগবান এবং আধ্যাত্মিকতাকে আর তাহার কর্মের নিয়ামক করে না—তাহাদের কর্তব্যাকর্তব্য নির্ণয়ে এ সকল ধারণার কোন প্রয়োজনীয়তাই অনুভব করে না। অথচ ঈশ্বর ও ঐশ্বরিক অবস্থা বা আধ্যাত্মিকতা—এই দুইটি গীতার সর্বপ্রধান তত্ত্ব। বর্তমান যুগের মানুষ মনুষ্যত্বের উপর উঠিতে চায় না, কিন্তু গীতা চায় যে আমরা ভগবানের মধ্যেই বাস করি—জগতের কল্যাণ করিতে হউক, তথাপি ভগবানের মধ্যে থাকিয়াই তাহা করিতে হইবে। আধুনিক মানুষ প্রাণ, চিত্ত, মন, বুদ্ধি লইয়াই থাকিতে চায়—গীতা ইহাদের উপরে উঠিয়া আধ্যাত্মিক জীবন লাভ করিতে বলে। যে ক্ষর পুরুষ সর্বভূত—ক্ষরঃ সর্বানি ভূতানি—আজকাল মানুষ তাহাতেই সীমাবদ্ধ থাকিতে চায়। গীতা বলে ইহা ছাড়া মানুষকে অক্ষর এবং উত্তম পুরুষের মধ্যেও বাস করিতে হইবে। অথবা যদিও লোকে এই সকল তত্ত্ব এখন অস্পষ্টভাবে একটুকু আধটুকু বুঝিতে আরম্ভ করিতেছে, তথাপি ইহাদের প্রকৃত

মূল্য তাহারা উপলব্ধি করে না। মানুষ ও সমাজের কাজে লাগিতে পারে এইরূপ ভাবেই এই সকল আধ্যাত্মিক তত্ত্বের আলোচনা হয়। কিন্তু, ঈশ্বর ও আধ্যাত্মিকতার মূল্য শুধু মানুষ ও সমাজের জন্যই নহে—এই সকল তত্ত্বের নিজস্ব মূল্য আছে। আমাদের মধ্যে উচ্চ-নীচ দুই-ই রহিয়াছে, কার্যত নীচকে উচ্চের জন্য রাখিতে হইবে—তবেই উচ্চও নীচকে টানিয়া উচ্চে তুলিয়া লইবে।

অতএব আধুনিক মনোভাবের বশে গীতার ব্যাখ্যা করিয়া গীতা নিঃস্বার্থভাবে কর্তব্য সম্পাদনকেই শ্রেষ্ঠ ধর্ম বলিয়াছে—জোর করিয়া এরূপ বুঝাইলে ভুলই করা হইবে। যে অবস্থা অবলম্বন করিয়া গীতার শিক্ষা কথিত হইয়াছে—তাহা একটু অনুধাবন করিলে বুঝা যায় যে এরূপ অর্থ ঠিক হইতে পারে না। কারণ, বিভিন্ন কর্তব্যের মধ্যে ঘোর বিরোধ উপস্থিত হওয়ায় সাধারণ বুদ্ধি ও নীতিজ্ঞানের দ্বারা যখন কর্তব্য নির্ণীত হওয়া অসম্ভব বোধ হইয়াছিল সেই অবস্থা হইতেই গীতাশিক্ষার উৎপত্তি এবং সেই জন্যই অর্জুন শিষ্যরূপে কৃষ্ণের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। মানবজীবনে কিছু বিরোধ অনেক সময়েই ঘটিয়া থাকে—যেমন, সংসারের প্রতি কর্তব্য এবং দেশের প্রতি কর্তব্য এই দুইয়ের মধ্যে বিরোধ ঘটিতে পারে, অথবা দেশের প্রতি কর্তব্য এবং সমগ্র মানবজাতির প্রতি কর্তব্য বা অন্য কোন উচ্চ ধর্ম বা নীতি সম্বন্ধীয় আদর্শের মধ্যে বিরোধ ঘটিতে পারে। প্রাণের ভিতর ভগবানের ডাক এরূপভাবে আসিতে পারে যে সকল কর্তব্য পরিত্যাগ করিয়া, পদদলিত করিয়াই বাহির হইয়া পড়িতে হয়। বুদ্ধের এই অবস্থা হইয়াছিল। আমরা ধারণাই করিতে পারি না যে গীতা এই অবস্থায় বুদ্ধকে গৃহে যাইয়া তাঁহার স্ত্রী ও পিতার প্রতি কর্তব্য পালন করিতে এবং শাক্যরাজ্য শাসন করিতে বলিয়া বুদ্ধের আন্তরিক সমস্যার মীমাংসা করিত। গীতার মতে কখনই এরূপ মীমাংসা হইতে পারে না যে রামকৃষ্ণের মত লোককে কোন পাঠশালার পণ্ডিত হইয়া নিঃস্বার্থভাবে ছোট ছোট ছেলেদের লেখাপড়া শিখাইতে হইবে অথবা বিবেকানন্দের মত লোককে সংসারে বদ্ধ থাকিয়া পরিবারবর্গ প্রতিপালন করিতে হইবে এবং তজ্জন্য তাঁহার অতুল প্রতিভা লইয়া নির্রিকারভাবে আইন, ডাক্তারি বা সংবাদপত্র পরিচালনের ব্যবসা অবলম্বন করিতে হইবে। নিঃস্বার্থভাবে কর্তব্যের পালন গীতার শিক্ষা নহে। দেবজীবন অনুসরণ করা, সর্বধর্ম পরিত্যাগ করা, কেবলমাত্র পরাৎপরের নিকট সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করা—ইহাই গীতার শিক্ষা। বুদ্ধ, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দের মত লোকের ঐশ্বরীয় জীবন ও কর্মের সহিত গীতার এই শিক্ষার সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য আছে। এমনকি, যদিও গীতা কর্মহীনতা অপেক্ষা কর্মকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়াছে—তথাপি গীতা কর্ম পরিত্যাগকে একেবারে অকরণীয় বলে নাই। বরং কর্ম পরিত্যাগ যে ভগবৎ-জীবন লাভের একটা পথ তাহা স্বীকার করিয়াছে। যদি সংসার ও কর্ম পরিত্যাগ না করিলে ভগবানকে পাওয়া সম্ভব না হয় এবং তাহা পরিত্যাগ করিতে ভিতরে যদি তীব্র ডাক আসে—তখন আর উপায় কি? সংসার ও কর্ম পরিত্যাগ করিতেই হইবে।

ভগবানের ডাক সকলের উপরে—অন্য কোনরূপ যুক্তিতর্কের দ্বারা সে ডাক অবহেলা করা চলে না।

কিন্তু, অর্জুনের যে অবস্থা তাহাতে আর একটা বিষম বাধা এই যে অর্জুনকে ভগবান যে কর্ম করিতে বলিয়াছেন—সেই কর্মটাকে একটা মহাপাপ বলিয়াই অর্জুনের ধারণা হইয়াছে। যুদ্ধ করা তাঁহার কর্তব্য বলিতেছেন। কিন্তু, সেই কর্তব্যটা এখন তাঁহার মনে একটা মহাপাপ বলিয়াই ধারণা হইয়াছে। এখন তাঁহাকে এই কর্তব্য নিঃস্বার্থভাবে নির্রিকারচিত্তে করিতে বলিলে কি লাভ? তাঁহার সন্দেহের কি মীমাংসা হইবে। তিনি জানিতে চাহিবেন তাঁহার কর্তব্য কি। ভীষণ রক্তপাতের দ্বারা আত্মীয়স্বজন, কুল ও দেশকে ধ্বংস করা কেমন করিয়া তাঁহার কর্তব্য হইতে পারে? তাঁহাকে বলা হইল যে তাঁহার পক্ষই ন্যায় পক্ষ, কিন্তু এ কথা অর্জুনকে সন্তুষ্ট করিল না, করিতে পারে না। কারণ তাঁহার যুক্তিই এই যে তাঁহার পক্ষ ন্যায়ের পক্ষ হইলেও—নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের দ্বারা জাতির সর্বনাশ করিয়া সেই ন্যায্য দাবী সমর্থন করা কখনই ন্যায়সঙ্গত হইতে পারে না। তাহা হইলে অর্জুন এখন আর কি করিবেন? তাঁহার কর্মের ফলাফল কি হইবে, পাপ হইবে কি পুণ্য হইবে সেসব সম্বন্ধে কোনরূপ চিন্তা না করিয়া নির্রিকারচিত্তে শুধু সৈনিকের কর্তব্য করিয়া যাইতে হইবে? এরূপ শিক্ষা কোন রাজতন্ত্রের শিক্ষা হইতে পারে—উকীল, রাজনৈতিক, তার্কিকেরা এইরূপ শিক্ষা দিতে পারেন। কিন্তু দার্শনিকতাপূর্ণ যে মহৎ ধর্মগ্রন্থ সংসার ও কর্মের সমস্যার আমূল সমাধান করিতে প্রবৃত্ত, সে গ্রন্থের যোগ্য শিক্ষা এরূপ হইতে পারে না। বাস্তবিক একটি তীব্র নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সমস্যা সম্বন্ধে ইহাই যদি গীতার বক্তব্য হয় তাহা হইলে গীতাকে জগতের ধর্মগ্রন্থের তালিকা হইতে তুলিয়া দিয়া—রাজনীতি, কূটনীতি সম্বন্ধীয় পুস্তকালয়ের তালিকাভুক্ত করাই আমাদের একান্ত কর্তব্য।

এ কথা সত্য যে উপনিষদের ন্যায় গীতাও পাপপুণ্যের উপর উঠিয়া, শুভাশুভের উপর উঠিয়া, সমতালাভ করিতে শিক্ষা দিয়াছে। কিন্তু, সে সমতা ব্রহ্মজ্ঞানেরই অংশ—যাঁহারা সাধনপথে বহুদূরে অগ্রসর হইয়াছেন তাঁহাদের পক্ষেই এরূপ সমতা সম্ভব। সাধারণ মানবজীবনে শুভাশুভ পাপপুণ্যের প্রতি উদাসীনতা গীতার শিক্ষা নহে—কারণ সাধারণ মানব পাপপুণ্য শুভাশুভের বিচার করিয়া কার্য না করিলে নিরতিশয় অনর্থই হইবে। বরং গীতা স্পষ্টই বলিয়াছে যে যাহারা মন্দকারী পাপী তাহারা ভগবানকে পাইবে না। অতএব অর্জুন যদি সাধারণ মানবজীবনে ধর্মই ভালরূপে পালন করিতে চান তাহা হইলে যেটাকে তিনি পাপ, নরকের পথ বলিয়া উপলব্ধি করিতেছেন সেটা সৈনিক হিসাবে তাঁহার কর্তব্য হইলেও তাঁহার পক্ষে নিঃস্বার্থভাবেও সে কর্তব্য করা চলে না। তাঁহার অন্তরাত্মা, তাঁহার বিবেক যেটাকে পাপ বলিয়া ঘৃণা করিতেছে—সহস্র কর্তব্য চুরমার হইয়া যাইলেও সেটা হইতে তাঁহাকে নিবৃত্ত হইতেই হইবে।

আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে যে কর্তব্যের (duty)[১] ধারণা বস্তুত সামাজিক সম্বন্ধেরই উপর প্রতিষ্ঠিত। "কর্তব্য" কথাটার প্রকৃত অর্থ ছাড়িয়া দিয়া ব্যাপকভাবে আমরা "নিজেদের প্রতি কর্তব্যের" কথা বলিতে পারি—বলিতে পারি যে গৃহত্যাগ করাই বুদ্ধের কর্তব্য ছিল অথবা গুহার ভিতর নিশ্চল হইয়া বসিয়া থাকাই তপস্বীর কর্তব্য। কিন্তু স্পষ্টত ইহা শব্দের অর্থ লইয়া খেলা ভিন্ন আর কিছুই নহে। কর্তব্য (duty) সম্বন্ধবাচক শব্দ—অন্যের সহিত আমার যাহা সামাজিক সম্বন্ধ শুধু তাহার দ্বারাই তাঁহার প্রতি আমার কর্তব্য নির্ণীত হয়। পিতা হিসাবে পিতার কর্তব্য সন্তানকে লালনপালন করা, শিক্ষা দেওয়া। মক্কেল দোষী জানিলেও উকীলের কর্তব্য তাহার পক্ষ সমর্থন করা, তাহাকে খালাস করিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করা। সৈনিকের কর্তব্য হুকুমমত গুলি চালান—এমনকি তাহার স্বদেশবাসী তাহার আত্মীয় স্বজনকেও হত্যা করা। বিচারকের কর্তব্য দোষীকে জেলে দেওয়া, হত্যাকারীকে ফাঁসী দেওয়া। যতক্ষণ লোকে এইসকল পদে থাকিতে স্বীকৃত ততক্ষণ তাহাদের কর্তব্য অতি স্পষ্ট—ততক্ষণ ধর্ম বা নীতির আর কোন কথাই উঠে না। কিন্তু, যদি ভিতরের ভাব পরিবর্তিত হয়, উকীলের যদি ধর্মজ্ঞান জাগিয়া উঠিয়া ধারণা হয় যে, যেকোন অবস্থাতেই হউক মিথ্যার সমর্থন করা ঘোরতর পাপ, বিচারকের যদি বিশ্বাস হয় যে মানুষের প্রাণদণ্ড দেওয়া পাপ, যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত সৈনিক যদি টলস্টয়ের মত উপলব্ধি করে যে সকল অবস্থাতেই যেমন নরমাংস ভক্ষণ করা নিষিদ্ধ তেমনই মানুষকে বধ করাও নিষিদ্ধ—তখন তাহারা কি করিবে? এরূপ অবস্থায় কর্তব্যের অবহেলা করিয়াও যে পাপ হইতে নিজেকে বাঁচাইতে হইবে তাহাতে আর কোন সন্দেহই নাই। এরূপ অবস্থায় পাপপুণ্যের বোধ কোন সামাজিক সম্বন্ধ বা কর্তব্যের কোন ধারণার উপর নির্ভর করে না—মানুষের ভিতরে ধর্মজ্ঞান জাগিয়া উঠিলে সে বোধ আপনা হইতেই আসে।

বাস্তবিকপক্ষে জগতে কর্মের দুইটি বিভিন্ন নিয়ম আছে—এবং স্তরভেদে দুইটাই ঠিক। একটি নিয়ম প্রধানত আমাদের বাহ্য সম্বন্ধের উপর প্রতিষ্ঠিত, আর একটি নিয়ম বাহ্য সম্বন্ধের কোন ধার ধারে না—তাহা সম্পূর্ণভাবে বিবেক ও ধর্মজ্ঞানের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। গীতা আমাদিগকে এমন শিক্ষা দেয় না যে উচ্চস্তরকে নিম্নস্তরের অধীন করিয়া রাখিতে হইবে। যখন মানুষের ভিতর ধর্মজ্ঞান জাগিয়া উঠে তখন সামাজিক কর্তব্যের সম্মুখে সেই ধর্মজ্ঞান, পাপপুণ্যবোধকে বলি দিতে হইবে গীতা এমন কথা কখনই বলে না। সাংসারিক কর্তব্যবুদ্ধি ও ধর্মজ্ঞান এই দুইয়ের বিরোধ ছাড়াইয়া উপরে উঠিতে হইবে,

[১] এখানে ইংরাজী duty "কর্তব্য" বলিয়াই অনুবাদ করা হইয়াছে—কারণ ইহাই প্রচলিত প্রথা। কিন্তু "কর্তব্য" শব্দের প্রকৃত অর্থ "যাহা করিতে হইবে"—ইহা duty না হইতেও পারে। কাহারও প্রতি আমার যাহা সামাজিক সম্বন্ধ—সেই সম্বন্ধের জন্য তাহার প্রতি আমাকে যেরূপ ব্যবহার করিতে হইবে তাহার প্রতি শুধু সেইটিই আমার duty।

ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে হইবে, ইহাই গীতার উপদেশ। গীতা সমাজের প্রতি কর্তব্যের পরিবর্তে ভগবানের প্রতি দায়িত্ব শিক্ষা দিয়াছে। কর্মের জন্য কোন বাহ্য আইনকানুনের বশবর্তী না হইয়া অন্তরের মধ্যে ভগবৎপ্রেরণার বশে কর্মই গীতার উপদেশ—আমরা পরে দেখিব যে এই ব্রহ্মজ্ঞান, কর্মবন্ধন হইতে আত্মার মুক্তি এবং আমাদের অন্তরস্থিত এবং ঊর্ধ্বস্থিত ভগবানের প্রেরণায় কর্ম—ইহাই গীতাশিক্ষার সার কথা।

গীতার ন্যায় মহৎগ্রন্থ খণ্ডভাবে লইলে বুঝা যায় না। গীতায় কেমন করিয়া প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত ইহার শিক্ষার ক্রমবিকাশ হইয়াছে তাহা সমগ্রভাবে অনুধাবন করা আবশ্যক। প্রসিদ্ধ লেখক বঙ্কিমচন্দ্র গীতাকে কর্তব্য-পালনের শাস্ত্র (Gospel of Duty) বলিয়া প্রথম এই নূতন ব্যাখ্যা করেন। বঙ্কিমবাবু হইতে আরম্ভ করিয়া যাঁহারা গীতাকে কর্তব্যপালনের গ্রন্থ বলিয়া ব্যাখ্যা করেন গীতার সেই আধুনিক ব্যাখ্যাকারেরা গীতার প্রথম তিন চারটি অধ্যায়ের উপরই সব ঝোঁকটুকু দিয়াছেন। আবার এই সকল অধ্যায়ে যেখানে ফলাফলের দিকে না তাকাইয়া কর্তব্যপালনের কথা আছে সেইখানটিকেই গীতাশিক্ষার কেন্দ্র বলিয়া ধরিয়াছেন। "কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন"—"তোমার কর্মেই অধিকার কর্মফলে যেন কদাচ তোমার অধিকার না হয়"—এই কথাটিই আজকাল গীতার মহাবাক্য বলিয়া সুপ্রচলিত। শুধু বিশ্বরূপ দর্শন ছাড়া গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ের উচ্চ দার্শনিক তত্ত্বপূর্ণ বাকী অধ্যায়গুলির বিশেষ কোন প্রয়োজনীয়তাই তাহারা উপলব্ধি করেন না। তবে এরূপ ব্যাখ্যা খুবই স্বাভাবিক। কারণ আধুনিক যুগে মানুষ দার্শনিক তত্ত্বের সূক্ষ্মবিচার লইয়া মস্তিষ্কের অপব্যবহার করিতে চায় না। তাহারা কর্মে প্রবৃত্ত হইতেই ব্যগ্র এবং অর্জুনের মতই এমন একটা কাজচলা নিয়ম বা ধর্ম চায় যাহাতে তাহাদের কাজ করিবার সুবিধা হইতে পারে। কিন্তু গীতার ব্যাখ্যা এরূপ ভাবে করিলে উল্টা বুঝা হইবে।

গীতা যে সমতার শিক্ষা দেয় তাহা নিঃস্বার্থপরতা নহে। গীতাশিক্ষার ভিত্তি স্থাপন করিবার পর, শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে মহা আদেশ দিলেন,—"উঠ শত্রুগণকে বিনাশ কর, সর্বৈশ্বর্যসম্পন্ন রাজ্য ভোগ কর।" এই আদেশে খাঁটি নিঃস্বার্থ পরোপকার বা নির্বিকার বৈরাগ্যের প্রশংসা নাই। ইহা আভ্যন্তরীণ সাম্য ও উদারতার অবস্থা, ইহাই আধ্যাত্মিক স্বাধীনতার ভিত্তি। "যে কর্ম করিতে হইবে"—এইরূপ স্বাধীনতা ও সমতার সহিতই করিতে হইবে। কার্য্যমিত্যের যৎ কর্ম্ম—"যে কর্ম করিতে হইবে" এই বাক্যের দ্বারা গীতায় শুধু সামাজিক বা নৈতিক কর্ম বুঝায় না—গীতাতে ইহা অতিবিস্তৃত অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে—ইহার মধ্যে সর্ব কর্মানি—মানুষ যাহা কিছু করে সবই পড়িবে। কোন্ কর্ম করিতে হইবে—তাহা ব্যক্তিগত মতামতের দ্বারা নির্ধারণ করা চলিবে না। "কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন"—"কর্মেই তোমার অধিকার, ফলে যেন কদাচ তোমার অধিকার না হয়"—ইহাও গীতার মহাবাক্য নহে। যাহারা যোগমার্গে

আবোহণ কবিতে উদ্যত সেই সকল শিষ্যেব ইহা কেবল প্রথমাবস্থাব উপযোগী শিক্ষা। পববর্তী অবস্থায় এই শিক্ষা একবকম পবিত্যাগই কবিতে হয। কাবণ পবে গীতা খুব জোবেব সহিত বলিয়াছে যে মানুষ কর্ম কবে না, প্রকৃতিই কর্ম করে। ত্রিগুণময়ী মহাশক্তিই মানুষের ভিতর দিয়া কর্ম কবে—মানুষকে শিখিতেই হইবে যে সে কর্ম করে না। অতএব, "কর্মে অধিকাব" এ কথাটা শুধু ততক্ষণই খাটিতে পারে, যতক্ষণ অজ্ঞানের বশে আমবা আমাদিগকেই কর্মেব কর্তা বলিযা মনে কবি। যখন আমরা বুঝিতে পাবিব যে আমবা আমাদেব কর্মেব কর্তা নই—তখনই ফলেব অধিকাবের মত আমাদেব কর্মেবও অধিকাব ঘুচিযা যাইবে। তখন কর্মীর অহঙ্কার—ফলে দাবী বা কর্মে অধিকার, সমস্ত দূব হইযা যাইবে।

কিন্তু প্রকৃতিব কর্তৃত্বই গীতাব শেষ কথা নহে। ইচ্ছাব সমতা এবং কর্মফল পবিত্যাগ, চিত্ত মন বুদ্ধির দ্বাবা ভগবৎ-চৈতন্যে প্রবেশ কবিবাব এবং তন্মধ্যে বাস কবিবার উপায় মাত্র। গীতা স্পষ্ট বলিযাছে যে যতদিন শিষ্য এই উচ্চ অবস্থা লাভ করিতে না পাবিতেছে ততদিনই এইগুলিকে উপায়রূপে ব্যবহাব কবিতে হইবে (দ্বাদশ অধ্যায়ে ৮, ৯, ১০, ও ১১ শ্লোক দেখ)। আবও কথা, কৃষ্ণ যে নিজেকে ভগবান বলিয়া পরিচয দিতেছেন, ইনি কে? ইনি পুরুষোত্তম—যে পুরুষ কর্ম করে না তাহাব উপবে, যে প্রকৃতি কর্ম কবে তাহাবও উপবে। তিনি একটিব ভিত্তি, অপবটিব প্রভু। নিখিল সংসার যাঁহাব প্রকাশ তিনি সেই ঈশ্বব—যিনি আমাদেব মত মায়াবদ্ধ জীবেবও হৃদয়ে বসিযা প্রকৃতিব কর্ম পবিচালনা কবিতেছেন। কুরুক্ষেত্রেব সৈন্যবাহিনী বাঁচিয়া থাকিলেও তাঁহাব দ্বাবাই ইতিপূর্বে নিহত হইয়াছে, তিনিই এই মহা হত্যাকাণ্ডে অর্জুনকে যন্ত্র বা নিমিত্তেব মত ব্যবহাব করিতেছেন। প্রকৃতি কেবল তাঁহাবই কার্যকাবিণী শক্তি (executive force)। শিষ্যকে এই শক্তিব, এবং ইহার তিনগুণেব উপবে উঠিতে হইবে, তাঁহাকে ত্রিগুণাতীত হইতে হইবে, তাঁহাকে প্রকৃতিব নিকট কর্ম সমর্পণ কবিতে হইবে না—সেই শ্রেষ্ঠ পুরুষকে সর্ব কর্ম সমর্পণ করিতে হইবে। মন, বুদ্ধি, চিত্ত, ইচ্ছা সমস্ত তাঁহাতে নিবিষ্ট কবিয়া আত্মা সম্বন্ধে, ঈশ্বব সম্বন্ধে, জগৎ সম্বন্ধে জ্ঞানযুক্ত হইয়া, পূর্ণ সমতা, পূর্ণ ভক্তি, পূর্ণ আত্মদান সহ—সকল কর্মেব, সকল যজ্ঞের ঈশ্বরের পূজাস্বরূপ তাঁহাকে সমস্ত কর্ম কবিতে হইবে। সেই ইচ্ছাব সহিত ইচ্ছা মিলাইতে হইবে, সেই জ্ঞানের সহিত জ্ঞান মিলাইতে হইবে—তাহা হইতেই কর্মাকর্ম স্থিব কবিতে হইবে, কর্মে প্রবৃত্তি হইবে। শিষ্যেব সকল সন্দেহেব মীমাংসা ভগবান এইরূপেই করিযাছেন।

গীতার শ্রেষ্ঠ কথা কি, মহাবাক্য কি তাহা আমাদিগকে খুঁজিযা বাহিব কবিতে হইবে না। কারণ শেষে গীতাই ইহা ঘোষণা করিযা দিযাছে—ইহাই গীতাশিক্ষাব চবম কথা—"হে ভাবত, সর্বান্তঃকরণে হৃদিস্থিত ঈশ্বরের শরণ লও, তাঁহাব প্রসাদে পরম শান্তি এবং পবমেশ্বরেব সম্বন্ধীয় নিত্য স্থান প্রাপ্ত হইবে। এইরূপে

গোপনীয হইতেও গোপনীয জ্ঞান আমি তোমাকে বলিলাম। সর্ববিধ গোপনীয হইতেও গোপনীয়, পবম পুরুষার্থ সাধন, আমার বাক্য পুনরায শ্রবণ কর—

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥
সর্ব্বধর্ম্মান্ পবিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বা সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥১৮।৬৫-৬৬

—তুমি মদেকচিত্ত হইয়া একমাত্র আমাবই উপাসক হও, একমাত্র আমাকেই নমস্কাব কব, তাহা হইলে নিশ্চযই আমাকে পাইবে। তুমি আমার প্রিয়; অতএব তোমাকে সত্যই প্রতিজ্ঞা কবিযা বলিতেছি। সমুদয ধর্মাধর্ম পবিত্যাগপূর্বক একমাত্র আমাকেই আশ্রয কব, আমি তোমাকে সর্ববিধ পাপ হইতে মুক্ত কবিব, শোক কবিও না।"

কর্মকে মানবীয স্তব হইতে ঐশ্বরিক স্তরে তুলিবাব, গীতা তিনটি ধাপ দেখাইযা দিযাছে। এইরূপেই কর্মেব বন্ধন হইতে মুক্ত হইযা দিব্য জীবনের স্বাধীনতা লাভ কবা যাইবে। প্রথম, সকল বাসনা পবিত্যাগ কবিযা সম্পূর্ণ সমতাব সহিত পবমেশ্ববেব উদ্দেশ্যে যজ্ঞ হিসাবে সমস্ত কর্ম কবিতে হইবে। এই অবস্থায় মানুষ নিজেকেই কর্মী বলিয়া মনে কবে, পবমেশ্বরের সহিত একাত্মতা উপলব্ধি কবে না। ইহাই প্রথম ধাপ। দ্বিতীযত, শুধু কর্মফলে নহে, কর্মেও যে অধিকার নাই তাহা উপলব্ধি কবিতে হইবে। প্রকৃতিই সর্বপ্রকারে সর্ববিধ কার্য সম্পাদন করিতেছেন, আত্মা স্বযং কিছু কবেন না—যিনি ইহা জ্ঞানচক্ষুব দ্বাবা অবলোকন করেন, তিনিই এই দ্বিতীয অবস্থা প্রাপ্ত হন। শেষে প্রকৃতি ও পুরুষেব অতীত পুরুষোত্তমকে চিনিতে হইবে। প্রকৃতি সেই পুরুষোত্তমেব দাসী মাত্র, প্রকৃতিস্থ পুরুষ তাঁহাব অংশ বিশেষ। তিনি সকলেব অতীত হইযাও প্রকৃতিব দ্বারাই সর্বকর্ম পরিচালনা কবিতেছেন। তাঁহাকেই ভক্তি কবিতে হইবে, স্তুতি কবিতে হইবে, সর্বকর্ম যজ্ঞরূপে তাঁহাকেই সমর্পণ কবিতে হইবে। সর্বান্তঃকবণে তাঁহাবই শরণ লইতে হইবে—সমগ্র চৈতন্যকে ভুলিয়া সেই দেবচৈতন্যের মধ্যে বাস কবিতে হইবে—যেন মানবাত্মা সেই পুরুষোত্তমের সহিত প্রকৃতিব উপরে উঠিতে পারে এবং তাঁহারই সহচব হইযা সম্পূর্ণ স্বাধীনতার সহিত কর্ম করিতে পারে।

কর্মযোগই প্রথম ধাপ।—এই অবস্থায স্বার্থশূন্য হইযা ভগবানে ফলাফল সমর্পণ কবিযা কর্ম কবিতে হইবে।—গীতা যে বাববাব কর্ম করিবাব কথা বলিযাছে, তাহা এই অবস্থাবই উপযোগী কথা। জ্ঞানযোগ দ্বিতীয় ধাপ। এই অবস্থায আত্মা ও জগৎ সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞানলাভ কবিতে হইবে এবং এই অবস্থায় গীতা বাববাব জ্ঞানলাভেব কথাই বলিয়াছে। কিন্তু, এখানেও যজ্ঞরূপে কর্ম করিতে হইবে—এখানে কর্মের পথ শেষ হয না, জ্ঞানেব সহিত মিলিযা এক হইযা

যায়।—ভক্তিযোগই শেষ ধাপ। এই অবস্থায় ভগবানকে লাভ কবিবার জন্য ব্যগ্রতার উদয হয় এবং এই অবস্থায গীতা বাববার ভক্তির কথাই বলিযাছে। কিন্তু, এখানেও জ্ঞান বা কর্মেব শেষ হয় না।—তবে তাহাদেব উন্নতি ও চবম পরিণতি হয়। জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি এই তিনটি পথ মিলিয়া এক হয়। যে ফলের আকাঙ্ক্ষা সকল সময়েই সাধকের মধ্যে থাকে তখন সেই ফল লাভ হয়—ভগবানেব সহিত মিলন হয়, এবং ঐশ্বরিক প্রকৃতিব সহিত একাত্মতা প্রাপ্তি হয।

পঞ্চম অধ্যায়

কুরুক্ষেত্র

গীতায কিরূপ ক্রমশ কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তিব পথ শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে—তাহা আলোচনা কবিবাব পূর্বে যে অবস্থা অবলম্বন কবিয়া গীতাব শিক্ষা কথিত হইযাছে আব একবাব সেই অবস্থাটি অনুধাবন কবা একান্ত আবশ্যক। সেই অবস্থাটি শুধু মানবজীবনেব নহে—সমস্ত বিশ্বপ্রপঞ্চেরই নমুনাস্বরূপ বুঝিতে হইবে। কাবণ, যদিও অর্জুন শুধু নিজেব কর্তব্যাকর্তব্য নির্ধাবণ করিতেই চাহেন—তথাপি তিনি যে প্রশ্ন তুলিয়াছেন, যেভাবে সে প্রশ্ন তুলিযাছেন—তাহাতে মানবজীবনেব ও কর্মেব গূঢ় বহস্য কি, জগৎ কি, মানুষ জগতে থাকিলেও কেমন কবিয়া আধ্যাত্মিক জীবন যাপন কবিতে পারে—সেই সকল প্রশ্নেব মীমাংসা প্রয়োজন হইয়া পডিয়াছে। গীতাব গুরু অর্জুনকে কোন আদেশ দিবাব পূর্বে এই সকল কঠিন সমস্যারই মীমাংসা করিতে চান।

এখন প্রশ্ন হইতেছে, যে-ব্যক্তি সংসারে থাকিতে চায়, কর্ম কবিতেও চায, অথচ ভিতবে আধ্যাত্মিক জীবন যাপন কবিতে চায—তাহাব প্রতিবন্ধক কি? সৃষ্টিব কোন্ দিকটা প্রত্যক্ষ কবিযা অর্জুনের বিষাদ উপস্থিত হইয়াছিল? সাধারণ পাপপুণ্য, ধর্মাধর্মেব মিথ্যা আববণে বিশ্বজগতেব প্রকৃত স্বরূপ আমাদের নিকটে লুক্কাযিত থাকে। যখন সেই আববণ খুলিযা পডে, প্রকৃত জগৎ যাহা, যখন আমরা তাহাব সম্মুখীন হই—অথচ উচ্চ জ্ঞানেব আলোকে সমস্ত ব্যাপার বুঝিয়া উঠিতে পাবি না—তখন নিদারুণ আঘাতে জাগিযা জগতের প্রকৃত মূর্তি দেখিযা স্তম্ভিত হইতে হয। অর্জুন সহসা এইরূপ জগতের প্রকৃত স্বরূপ দেখিযা অবসন্ন হইয়া পডিযাছিলেন। সেই প্রকৃত স্বরূপ কি? বাহ্যত এই স্বরূপ কুরুক্ষেত্রের হত্যাকাণ্ড ও বক্তপাতে প্রকট হইযাছে। আধ্যাত্মিকভাবে জগতেব এই স্বরূপ অর্জুন দেখিলেন ভগবানেব বিশ্বরূপে—

কালোঽস্মি লোকক্ষযকৃৎ প্রবৃদ্ধো
লোকান্ সমাহর্তুমিহ প্রবৃত্তঃ।১১।৩২

কালরূপী ভগবান নিজেব সৃষ্ট জীবগণকেই সংহাব কবিতেছেন, গ্রাস কবিতেছেন। সর্বভূতেব যিনি ঈশ্বব, সকলেব সৃষ্টিকর্তা, তিনিই আবার সকলেব সংহাবকর্তা। প্রাচীন শাস্ত্রে তাঁহাবই নির্মম ছবি অঙ্কিত কবা হইযাছে—পণ্ডিত ও বীবগণ তাঁহাব খাদ্য, মৃত্যু তাঁহাব ভোজেব চাটনি! ইহা সেই একই সত্য যাহা প্রথমে পবোক্ষভাবে সংসাবেব ব্যাপাবে দৃষ্ট হয় এবং পবে অপরোক্ষভাবে সাক্ষাৎ ও স্পষ্ট আত্মাব দর্শনে প্রতিভাত হয। জগৎ ও মানবজীবন যুদ্ধ, বিবোধ হত্যার

ভিতব দিযা চলিতেছে—ইহাই বিশ্বেব বাহ্য স্বরূপ। বিশ্বসত্তা বিবাট সৃষ্টি এবং বিবাট ধ্বংসের ভিতর দিয়া নিজেকে পবিপূর্ণ করিযা তুলিতেছে—ইহাই ভিতবেব দিক।—জীবন একটি বিশাল যুদ্ধক্ষেত্র এবং মৃত্যুভূমি—ইহাই কুরুক্ষেত্র। সেই হত্যাভূমিতে অর্জুন ভগবানের ভীষণরূপ দর্শন কবিলেন।

গ্রীক দার্শনিক হিবাক্লিটাস বলিযাছেন যে যুদ্ধই সকল বস্তুব জন্মদাতা, যুদ্ধই সকলের রাজা। গ্রীক পণ্ডিতদের অন্যান্য বচনেব ন্যায এই কথাটিব ভিতবেও গভীব সত্য নিহিত বহিযাছে। জড বা অন্যান্য শক্তিব সংঘাতেই জগতেব সমস্ত বস্তুব, এমনকি জগতেবও উৎপত্তি হইযাছে বলিযাই বোধ হয। শক্তি ও বস্তুনিচয়েব পবস্পবেব ঘাত-প্রতিঘাত বিবোধের দ্বাবাই জগৎ চলিতেছে, নূতন সৃষ্টি হইতেছে, পুবাতন ধ্বংস হইতেছে—এই সকলেব উদ্দেশ্য কি, লক্ষ্য কি, তাহা কেহ জানে না। কেহ বলে শেষে আপনা-আপনি সমস্ত ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে—কেহ বলে ধ্বংসেব পব সৃষ্টি আবাব সৃষ্টিব পব ধ্বংস—অনন্তকাল ধবিযা এইরূপে অর্থহীন বৃথা চক্র ঘুবিতেছে। যাহাবা আশাবাদী তাহাবা বলে—সমস্ত বাধা-বিপত্তি ধ্বংসের ভিতব দিয়া জগৎ ক্রমশই উন্নতিব পথে, ভগবানেব কোন অভীষ্ট সিদ্ধিব পথে অগ্রসব হইতেছে। তবে যাহাই হউক এটা ঠিক যে এ জগতে ধ্বংস ছাড়া কোন কিছুরই সৃষ্টি হইতে পাবে না, বিভিন্ন শক্তিব বিবোধ ছাডা কোন সামঞ্জস্য স্থাপিত হইতে পাবে না। শুধু তাহাই নহে, সর্বদা অন্যেব জীবন গ্রাস না কবিলে কাহাবও পক্ষে জীবনধারণ সম্ভব নহে। শাবীবিক জীবনধাবণ কবিতে প্রতি মুহূর্তে আমাদিগকে মবিতে হইতেছে—এবং নবজন্ম গ্রহণ কবিতে হইতেছে। আমাদের শবীব একটি শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত নগবেব ন্যায। একদল ইহাকে আক্রমণ কবিতেছে, আব একদল ইহাকে বক্ষা কবিতেছে—পবস্পবকে বিনাশ কবা, গ্রাস কবাই পরস্পবেব কাজ। সমস্ত জগৎই এইরূপ। সৃষ্টিব প্রথম হইতেই যেন এই আদেশ প্রচাবিত হইযাছে—"তোমাব সহচব, তোমাব পাবিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত যুদ্ধ না করিলে তুমি জযলাভ কবিতে পাবিবে না। এমনকি যুদ্ধ না করিলে, অপরের জীবন গ্রাস না কবিলে তুমি বাঁচিতেই পাবিবে না। জগতেব প্রথম বিধান আমি এই কবিযাছি যে ধ্বংসেব দ্বাবাই সৃষ্টি বক্ষা হইবে।"

প্রাচীন মনীষীগণ জগৎতত্ত্ব আলোচনা কবিযা এইরূপ সিদ্ধান্তেই উপনীত হইয়াছিলেন। প্রাচীন উপনিষদসমূহে ইহা স্পষ্টভাবেই বর্ণিত হইযাছে—সেখানে এই কঠোব সত্যকে মিষ্ট কথায ঢাকিবাব কোনরূপ চেষ্টাই কবা হয নাই। তাঁহাবা বলিয়াছেন যে ক্ষুধারূপী মৃত্যুই জগতেব প্রভু ও সৃষ্টিকর্তা। যজ্ঞেব অশ্বকে তাঁহাবা প্রাণীমাত্রের রূপক কবিযাছিলেন।—জডপদার্থেব তাঁহাবা যে নাম দিযাছিলেন তাহার সাধাবণ অর্থ হইতেছে খাদ্য। তাঁহাবা জডকে খাদ্য বলিযাছেন—কাবণ ইহা জীবকে খায এবং জীব ইহাকে খায। ভক্ষক মাত্রেই ভুক্ত হয—ইহাকেই তাঁহাবা জডজগতের মূল সত্য বলিযা ধবিযাছেন। ডাবউইনেব মতাবলম্বিগণ এই সত্যকে পুনবাবিষ্কাব কবিযা বলিয়াছেন যে বাঁচিবাব জন্য যুদ্ধই বিবর্তনেব বিধান।

হিবাক্লিটাসেব বচন এবং উপনিষদের রূপকেব দ্বারা যে সত্য স্পষ্ট নির্ভুলভাবে তেজেব সহিত প্রকাশিত হইযাছিল—বর্তমান বিজ্ঞান এখন তাহাই অস্পষ্টভাবে প্রচাব কবিতেছে।

বিখ্যাত জার্মান দার্শনিক নীট্‌শে যুদ্ধকেই সৃষ্টিব নীতি এবং যোদ্ধাকে, ক্ষত্রিযকেই আদর্শ মনুষ্য বলিয়াছেন। মনুষ্য প্রথম ও চবম অবস্থায যাহাই হউক—সম্পূর্ণতা লাভ কবিতে হইলে তাহাকে মধ্যজীবনে যোদ্ধা হইতেই হইবে। নীট্‌শেব এই সকল মতকে আমবা এখন যতই গালি দিই না কেন, ইহাদেব ন্যায্যতা অস্বীকাব কবিবাব উপায নাই। এই মতেব অনুসবণ কবিযা নীট্‌শে মানুষেব কর্তব্যাকর্তব্য সম্বন্ধে যে সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন তাহা আমরা মানিযা লইতে না পাবি—কিন্তু, জগতের যে ধ্বংসলীলার দিকে আমরা চক্ষু বুজিযা থাকিতে চাই—নীট্‌শে তাহা অতি স্পষ্টভাবে আমাদেব চক্ষুব সম্মুখে ধবিযা দিযাছেন। আমাদিগকে এই কঠোর সত্য যে মনে পডাইয়া দেওয়া হইযাছে—ইহাতে ভালই হইয়াছে। প্রথমত ইহা আমাদের ক্লৈব্য ও দুর্বলতা দূর কবিবে। যাহারা জগতে দেখে শুধু প্রেম, শুধু জীবন, সত্য ও সৌন্দর্য—কিন্তু প্রকৃতিব কবাল রূপ হইতে চক্ষু ফিবাইয়া লয, যাহারা ভগবানেব শুধু শিবমূর্তির পূজা কবে কিন্তু তাঁহার রুদ্রমূর্তিকে অস্বীকাব করে—তাহাদের স্বভাবতই দুর্বলতা ও জডতা আসিযা থাকে। ভগবানের রুদ্রমূর্তিব পূজা করিলে হৃদয়ে বলের সঞ্চাব হয। দ্বিতীযত, জগৎ যে প্রকৃত কি তাহা সোজাসুজি দেখিবার ও বুঝিবার মত সততা ও সাহস যদি আমাদেব না থাকে তাহা হইলে জীবেব ভিতবে যে অনৈক্য ও বিবোধ বহিযাছে আমরা কখনই তাহাব সমাধান কবিতে পারিব না। প্রথমে আমাদেব দেখিতেই হইবে যে জীবন কি, জগৎ কি। তাহাব পব সেগুলিব যেরূপ হওযা উচিত তাহাতে তাহাদিগকে পবিবর্তিত কবা সহজ হইবে। জগতেব এই যে অপ্রীতিকব দিকটা আমরা লক্ষ্য করিতে চাহি না, হয়তো ইহারই ভিতব এমন বহস্য লুক্কাযিত আছে—চবম সামঞ্জস্য স্থাপনে যাহাব একান্ত প্রয়োজন। আমরা যদি এই দিকে লক্ষ্য না কবি—তাহা হইলে সেই বহস্য হাবাইয়া ফেলিতে পারি এবং তাহাব অভাবে জীবন-তত্ত্ব সমাধানের সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইতে পারে। যদি ইহা শত্রু হয, যদি ইহাকে জয় করিতে হয, দূব করিতে হয়, বিনাশ কবিতে হয—তাহা হইলেও ইহাকে অবহেলা করা চলে না। অতীতে এবং বর্তমানে ইহা কিরূপে জীবনেব সহিত গভীবভাবে জডিত তাহার হিসাব আমাদিগকে লইতেই হইবে।

যুদ্ধ এবং ধ্বংস যে শুধু জডজগতেরই সনাতন নীতি তাহা নহে, ইহা আমাদেব মানসিক ও ধর্মজীবনেবও নীতি। ইহা স্বতঃসিদ্ধ যে মানুষ ধর্ম, সমাজ, বাজনীতি, জ্ঞানচর্চা—কোন ক্ষেত্রেই বিভিন্ন শক্তির মধ্যে সংঘাত ব্যতীত এক পদও অগ্রসর হইতে পাবে না। অহিংসাকেই এখনও মানবজীবনেব শ্রেষ্ঠ আদর্শ ও নীতি বলিযা ধবা হয়—কিন্তু, অন্ততপক্ষে এখন পর্যন্ত মানুষ এবং জগতের

অবস্থা যেরূপ তাহাতে প্রকৃতভাবে এবং সম্পূর্ণভাবে অহিংসনীতি অবলম্বন করিলে এক পদও অগ্রসব হওযা, উন্নতি করা সম্ভব নহে। আমবা কি শুধু আধ্যাত্মিক শক্তিব (Soul force) ব্যবহাব কবিব—কোনরূপ শাবীবিক বলপ্রয়োগ কবিযা যুদ্ধ বা ধ্বংস কবিব না, এমনকি আত্মরক্ষাব জন্যও বলপ্রযোগ কবিব না? কিন্তু বর্তমানে কত মানুষ, কত জাতি আসুরিক শক্তিব প্রযোগ কবিযা কত অত্যাচার করিতেছে, দলন করিতেছে, ধ্বংস করিতেছে, কলুষিত কবিতেছে। যতদিন আত্মিক শক্তি সম্পূর্ণ কৃতকার্য না হইতেছে ততদিন শাবীবিক বল প্রযোগ করিয়া যদি এই আসুরিক শক্তিকে বাধা না দেওয়া যায তাহা হইলে সেই আসুবিক শক্তি অপ্রতিহতভাবে সহজেই ধ্বংস ও অত্যাচারের লীলা করিবে—এবং অপবে বলপ্রযোগ করিয়া যত ধ্বংসসাধন করিতে পাবে, আমবা বলপ্রযোগে বিবত থাকিয়াই হয়তো তদপেক্ষা অধিকমাত্রায় ধ্বংস ও অত্যাচাবেব সহাযক হইব। শুধু তাহাই নহে—আত্মিক শক্তি কার্যকবী হইলেও ধ্বংসসাধন কবে। যাঁহাবা চক্ষু মুদিত না রাখিযা এই শক্তির ব্যবহার কবিযাছেন তাঁহারাই জানেন যে এই আত্মিক শক্তি তববারি ও কামান অপেক্ষা কত অধিক ভীষণ ও ধ্বংসকাবী। যাঁহাবা শুধু কর্ম এবং কর্মের অনতিপরবর্তী ফলের উপবই দৃষ্টি আবদ্ধ না রাখিয়া দূব পর্যন্ত দেখেন তাঁহাবাই জানেন যে আত্মিক শক্তিপ্রযোগেব পবিণাম-ফল কি ভীষণ—কত অধিক ধ্বংসসাধন হয। শুধু পাপকে নষ্ট কবা সম্ভব নয—সেই পাপেব দ্বাবা যাহা কিছু বাঁচিয়া আছে, টিকিযা আছে, পাপেব সঙ্গে সঙ্গে তাহাদেরও বিনাশ সাধন হয়। আমরা নিজের হাতে কবিযা ধ্বংস না কবিলেও ধ্বংস হিসাবে তাহা কিছুই কম নহে।

আরও কথা এই যে, আমবা যখনই কাহাবও বিরুদ্ধে আত্মিক শক্তি প্রযোগ করি, তখনই তাহার বিরুদ্ধে যে প্রবল "কর্ম" শক্তি (Force of Karma) উদ্বুদ্ধ হয় সেটিকে নিয়ন্ত্রিত কবা আমাদের সাধ্যাতীত। বিশ্বামিত্র ক্ষাত্রশক্তি (Military violence) লইয়া বশিষ্ঠকে আক্রমণ কবায বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রেব বিরুদ্ধে আত্মিক শক্তি (Soul force) প্রযোগ করিলেন। ফলে হূন, শক ও পল্লব সৈন্যগণ আক্রমণকারীদের উপব পড়িল। আক্রান্ত ও অত্যাচাবিত হইযা আধ্যাত্মিক প্রকৃতিসম্পন্ন মনুষ্য যখন নীববে সকল সহ্য কবে, তখন জগতেব ভীষণ শক্তিসমূহ তাহাব প্রতিশোধ লইতে জাগিযা উঠে। যাহারা পাপ কবিতেছে, অন্যায অত্যাচার করিতেছে, বলপ্রযোগ কবিযাও যদি তাহাদিগকে বধ কবিতে পাবা যায, তাহা হইলে তাহাদেব প্রতি সদয ব্যবহাবই কবা হয—নতুবা, তাহাদেব অপ্রতিহত অন্যায় অত্যাচারের ফলে তাহাবা নিজেদের উপর ভীষণতব শাস্তি ও ধ্বংস আনয়ন করিবে। শুধু আমবা যদি আমাদের হস্তকে কলুষিত না কবি এবং আত্মাকে হিংসাভাবাপন্ন না কবি তাহা হইলেই জগৎ হইতে যুদ্ধ ও ধ্বংস উঠিযা যাইবে না। মানবজাতির মধ্যে ইহাব যে মূল বহিযাছে তাহা উৎপাটিত কবিতে হইবে। নিজেবা নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিযা থাকিলেই এবং অন্যায অত্যাচাবকে বাধা না

দিলেই—যুদ্ধ ও হিংসা লোপ পাইবে না। অকর্ম, তামসিকতা, জডতা দ্বারা জগতে যত অনিষ্ট হয়, বাজসিকতা ও যুদ্ধ দ্বাবা ততটা হয় না। অন্ততপক্ষে বাজসিকতাব দ্বাবা যত ধ্বংস হয তদপেক্ষা অধিক সৃষ্টি হয। অতএব কোন ব্যক্তি যদি যুদ্ধ ও ধ্বংস হইতে বিবত থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাবই নৈতিক উন্নতি হইতে পাবে, কিন্তু তাহাব দ্বাবা জগৎ হইতে যুদ্ধ ও ধ্বংসের নীতি উঠিয়া যাইবে না।

জগতে যুদ্ধনীতিব প্রভাব কিরূপ অদম্য, সমগ্র মানবজাতির ইতিহাসই তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। সৃষ্টিব এই ভীষণ দিকটা যে আমবা একটু কোমল কবিয়া দেখিতে চাই, অন্যদিকে ঝোঁক দিতে চাই, ইহা খুবই স্বাভাবিক। যুদ্ধ এবং ধ্বংসই সব নহে, একদিকে যেমন বিচ্ছেদ ও বিবোধ অন্যদিকে তেমনি পরস্পরের সহিত মিলন ও সহযোগিতাও বহিযাছে। প্রেমেব শক্তি স্বার্থপরতা অপেক্ষা ন্যূন নহে। নিজেব জন্য অপবকে নাশ করিবাব যেমন প্রবৃত্তি রহিযাছে, তেমনই অপরের জন্য মবিবার প্রবৃত্তিও আমাদের মধ্যে রহিয়াছে। কিন্তু, এই সকল শক্তি কেমনভাবে কার্য কবিযাছে তাহা যদি আমরা লক্ষ্য করি তখন আর তাহাদের বিপরীতগুলিকে উপেক্ষা কবিতে বা সেগুলিকে তেমনভাবে দেখিতে পাবিব না। মানুষ যে শুধু পবস্পবকে সাহায্য করিবার নিমিত্তই সহযোগিতা করে তাহা নহে—শত্রুব বিনাশসাধন কবিতেও লোকে পবস্পরেব সহিত সহযোগিতা করে। সহযোগিতা অনেক সময যুদ্ধ, অহঙ্কাব প্রতিষ্ঠাবই সহাযক হইয়াছে। এমনকি প্রেমই সর্বদা ধ্বংসেব শক্তিরূপে ক্রীড়া করিয়াছে। বিশেষত শুভেব প্রতি প্রেম, ভগবানেব প্রতি প্রেম জগতে বহু যুদ্ধ, হত্যা ও ধ্বংস ঘটাইয়াছে। আত্মবলিদান খুবই মহান, কিন্তু চবম আত্মবলিদানের দ্বাবা কি ইহাই প্রমাণিত হয না যে কোন কার্য উদ্ধাব কবিতে হইলে কোন শক্তির নিকট কাহাকেও বলিদান দেওয়া আবশ্যক, মবণেব ভিতব দিযা জীবনই সৃষ্টিব নীতি? শাবককে রক্ষা করিতে পক্ষিমাতা আততাযী জন্তুব সম্মুখীন হইতেছে, দেশের স্বাধীনতাব জন্য দেশভক্ত প্রাণ বিসর্জন দিতেছে, ধর্মের জন্য, আদর্শেব জন্য লোকে কত দুঃখ, কত নির্যাতন সহ্য কবিতেছে—জীবজগতেব নিম্ন ও উচ্চস্তরে এই সকল আত্মবলিদানেব দৃষ্টান্ত এবং এই সকল হইতে কি প্রমাণিত হয় তাহা সহজেই বোধগম্য।

কিন্তু, আবাব এই সকলেব পবিণামেব প্রতি যদি আমরা দৃষ্টিপাত করি তাহা হইলে জগৎকে সুখময় বলিযা ভাবা আবও কঠিন হইযা পডিবে। দেখুন, যে দেশকে স্বাধীন কবিবাব জন্য শত শত দেশভক্ত একদিন প্রাণ দিযাছে, কিছুদিন পব যখন তাহাদেব কর্মের ফল ফুবাইয়া গেল তখন সেই দেশই অপর দেশের স্বাধীনতা হবণ কবিযা নিজেকে বড় কবিতে ব্যস্ত! সহস্র সহস্র ধর্মপ্রাণ খ্রীষ্টান প্রাণ বিসর্জন দিলেন,—পাশবিক শক্তির বিরুদ্ধে, সাম্রাজ্যেব শক্তির বিরুদ্ধে আত্মিক শক্তিব (Soul force) প্রয়োগ কবিলেন যেন খ্রীষ্টের জয হয, খ্রীষ্টধর্ম সুপ্রতিষ্ঠিত হয। আত্মিকশক্তিব জয বাস্তবিকই হইল, খ্রীষ্টধর্ম প্রচাবিত হইল কিন্তু

খ্রীষ্টের জয় তো হইল না। যে সাম্রাজ্যকে বিনষ্ট করিয়া খ্রীষ্টধর্ম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল সেই সাম্রাজ্য অপেক্ষাও খ্রীষ্টধর্ম এখন অত্যাচারী হইয়া উঠিয়াছে। জগতের ধর্মগুলিই এখন সংঘবদ্ধভাবে পরস্পরের সহিত লড়িতেছে, জগতে আধিপত্য স্থাপন করিবার জন্য ভীষণভাবে যুদ্ধ করিতেছে।

এই সকল হইতেই বেশ বোধ হয় যে জগতে এই যে একটা জিনিস রহিয়াছে, সেটিকে কেমন করিয়া জয় করিতে হইবে তাহা আমরা জানি না। হয়তো ইহাকে জয় করা সম্ভব নয়, নয় আমরা নিরপেক্ষভাবে দৃঢ়তার সহিত এই জিনিসটাকে তাকাইয়া দেখি নাই, এটাকে ভালরূপে জানিবার চেষ্টা করি নাই, তাই এপর্যন্ত জয় করিতে পারি নাই। জগৎসমস্যার প্রকৃত সমাধান করিতে হইলে জগৎটা বাস্তবিক যাহা তাহা আমাদিগকে ভাল করিয়া দেখিতেই হইবে। জগৎকে দেখা আর ভগবানকে দেখা এক—কারণ, দুইটিকে পৃথক করা চলে না। যিনি জগৎকে সৃষ্টি করিয়াছেন তাঁহাকে ভিন্ন আর কাহাকেও এই জগতের আইনকানুন, নীতির জন্য দায়ী করা চলে না। কিন্তু এখানেও আমরা ইতস্তত করি, সত্যকে চাপা দিবার চেষ্টা করি। আমরা বলি ভগবান দয়া, প্রেম ও ন্যায়ের আধার—জগতে যাহা কিছু অশুভ আছে, পাপ আছে, নিষ্ঠুরতা আছে সে সকল তাঁহার কৃত নহে, শয়তানের কৃত। ভগবান কোন কারণে এই শয়তানকে মন্দ করিতে ছাড়িয়া দিয়াছেন অথবা ভগবান প্রথমে সবই শুভ ও পুণ্যময় করিয়া গড়িয়াছিলেন কিন্তু মানুষ তাহার পাপের দ্বারা জগতে অমঙ্গলের সূচনা করিয়াছে। যেন মানুষই মৃত্যুর সৃষ্টি করিয়াছে, জীব-জগতে গ্রাসের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছে। প্রকৃতি সৃষ্টি করিতেছে এবং সেই সঙ্গে ধ্বংস করিতেছে—ইহাও যেন মানুষেরই বিধান। জগতের অতি অল্প ধর্মই ভারতের মত খোলাখুলিভাবে বলিতে সাহস করিয়াছে যে এই রহস্যময় জগতের একটিই কর্তা—সৃষ্টি, স্থিতি, লয় এই তিনই এক ভগবানের কার্য, বিশ্বশক্তি শুধু সর্বমঙ্গলা দুর্গা নহে, করালী কালীও বটে। কবিরাজকলেবরা ধ্বংস-নৃত্য-পরায়ণা কালীমূর্তিকে দেখাইয়া হিন্দুই বলিতে পারিয়াছে—"ইনিও মা, ইঁহাকে ভগবান বলিয়া জান—যদি সাধ্য থাকে ইঁহার পূজা কর।" যে ধর্মে এইরূপ অবিচলিত সততা এবং অসীম সাহস, সেই ধর্মই জগতের সর্বাপেক্ষা গভীর ও বিস্তৃত আধ্যাত্মিকতার সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইয়াছে। কারণ, সত্যই প্রকৃত আধ্যাত্মিকতার ভিত্তি এবং সাহস তাহার প্রাণ।

তবে আমরা একথা বলিতে চাই না যে যুদ্ধ এবং ধ্বংসই সৃষ্টির মূল কথা, সামঞ্জস্য যুদ্ধ অপেক্ষা বড় নহে, মৃত্যু অপেক্ষা প্রেমেই ভগবানের অধিক প্রকাশ নহে। পাশবিক বলের পরিবর্তে আত্মিক শক্তির প্রতিষ্ঠা করিতে, যুদ্ধ উঠাইয়া শান্তি স্থাপন করিতে, বিরোধের স্থানে মিলনের প্রতিষ্ঠা করিতে, গ্রাসের বদলে প্রেমের প্রতিষ্ঠা করিতে, স্বার্থপরতার স্থানে সার্বজনীনতা স্থাপন করিতে, মৃত্যুর বদলে অমরত্ব লাভ করিতে যে চেষ্টা করিতে হইবে না তাহাও আমরা বলি না। ভগবান শুধু ধ্বংসকর্তা নহেন, তিনি সর্বভূতের সুহৃদও বটেন। ভীষণা কালীই

সর্বমঙ্গলা মা। কুরুক্ষেত্রের কর্তাই আবার অর্জুনের সখা ও সারথি, জীবের প্রাণারাম, অবতার কৃষ্ণ। সমস্ত বিরোধ, যুদ্ধ, গোলমালের ভিতর দিয়া তিনি যে আমাদিগকে কোন শুভের দিকে, দেবত্বের দিকে লইয়া যাইতেছেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তবে এটা ঠিক যে আমরা যে যুদ্ধ ও বিরোধের কথা এত করিয়া বলিতেছি—এসবের উপরেই লইয়া যাইতেছেন। কিন্তু, কোথায় কেমন করিয়া, কিরূপে তাহা আমাদিগকে বুঝিতে হইবে। এবং বুঝিতে হইলে জগৎটা এখনও বাস্তবিক কিরূপ তাহা আমাদিগকে জানিতেই হইবে—ভগবানের কর্ম এখন কিরূপ তাহা বুঝিতেই হইবে—তাহার পর আমাদের লক্ষ্য, আমাদের পথ, আমাদের সম্মুখে ভাল করিয়া প্রতিভাত হইবে। আমাদিগকে কুরুক্ষেত্র স্বীকার করিয়া লইতেই হইবে। অমরত্ব লাভ করিবার পূর্বে—মৃত্যুর দ্বারাই জীবন, এই নীতি আমাদিগকে মাথা পাতিয়া লইতে হইবে। কাল ও মৃত্যুর কর্তার সম্মুখে চক্ষু খুলিয়া আমাদিগকে দাঁড়াইতে হইবে—অর্জুনের মত অত ভয় খাইলে চলিবে না। বিশ্বসংহারকর্তাকে অস্বীকার করিলে, ঘৃণা করিলে, প্রত্যাখ্যান করিলে চলিবে না।

ষষ্ঠ অধ্যায়

মনুষ্য ও জীবন-যুদ্ধ

অতএব গীতার সর্বব্যাপী শিক্ষা হৃদযঙ্গম কবিতে হইলে, গীতা জগতেব প্রকাশ্য স্বরূপ ও পদ্ধতি যেরূপ নির্ভযে অবলোকন কবিযাছে তাহা বুঝিতে হইবে। কুরুক্ষেত্রেব দেবসাবথি একদিকে সকল জগতেব ঈশ্বব, সর্বজীবেব বন্ধু ও সর্বজ্ঞ গুরুরূপে প্রতীযমান, অন্যদিকে তিনিই আবাব জনগণেব ক্ষযসাধনকাবী ভীষণ কাল—লোকান্ সমাহর্ত্তুমিহ প্রবৃত্তঃ।

গীতা এবিষযে সার্বভৌম হিন্দুধর্মেব অনুসবণ কবিযা ইহাকেও ভগবান বলিযাছে, জগৎবহস্যেব এই দিকটা চাপা দিবাব চেষ্টা করে নাই। কেহ বলে এই জগৎ জডশক্তির অন্ধক্রিয়া মাত্র। কেহ বলে এই দৃশ্যমান জগৎ সত্য নহে, ইহা মিথ্যা—সনাতন, অক্ষর অদ্বিতীয় আত্মাব মধ্যে স্বপ্নেব ন্যায ভাসমান মাযা মাত্র। কিন্তু গীতা সর্বব্যাপী, সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান ঈশ্বরেব অস্তিত্ব স্বীকাব করে এবং বলে যে তিনি স্বকৃত মহাশক্তি চালিত বিশ্বরূপে আত্মপ্রকাশ কবিযাছেন, তিনি মাযা, প্রকৃতি বা শক্তিব দাস নহেন—প্রভু, তাঁহাব ইচ্ছাব বিরুদ্ধে জগতে কিছুই সংঘটিত হইতে পাবে না—অতএব, জগৎপদ্ধতিব কোন বিশেষ অংশেব জন্য তিনি ভিন্ন আব কেহ দাযী নহেন। যাঁহাবা গীতাব এই মত স্বীকাব করেন তাঁহাদেব পক্ষে বিশ্বাস বক্ষা কবা বড কঠিন। জগতে দেখিতে পাওযা যায অসীম অজ্ঞান শক্তিসমূহ পবস্পবেব সহিত বিবোধ কবিযা দৃশ্যত অশেষ গোলমালেব সৃষ্টি কবিতেছে, এখানে কোন জীবন অনববত পবিবর্তন ও মৃত্যু ভিন্ন টিকিতে পাবে না, চতুর্দিকে ব্যথা, যন্ত্রণা, অমঙ্গল ও ধ্বংসেব ভয—এই সকলেব ভিতব সর্বব্যাপী ভগবানকে দেখিতে হইবে—মনে বাখিতে হইবে যে এই বহস্যেব নিশ্চযই কোন সমাধান আছে, এই অজ্ঞানেব উপব নিশ্চযই এমন জ্ঞান আছে যাহাব দ্বাবা সকলেব সামঞ্জস্য বুঝিতে পাবা যায, এই বিশ্বাসেব উপব ভব দিযা দাঁডাইতে হইবে—"তুমি যদি মৃত্যুরূপে এস, তথাপি তোমাবই উপব আমি নির্ভব কবিব।" জগতেব যত ধর্মমতেব দ্বাবা মানুষ চালিত হয তাহাদেব ভিতরে কম বা বেশী স্পষ্টভাবে এই বিশ্বাসই নিহিত বহিযাছে।

অতএব মানবজীবনে যে বিরোধ ও যুদ্ধ আছে এবং তাহা যে সময়ে সময়ে কুরুক্ষেত্রেব ন্যায় মহাসন্ধিক্ষণে পবিণত হয ইহা আমাদিগকে স্বীকাব কবিতেই হইবে। মানবজাতিব ইতিহাসে মাঝে মাঝে এরূপ যুগান্তব ও সন্ধিক্ষণ উপস্থিত হয যখন ধর্ম, শিক্ষা, সমাজ, বাজনীতি প্রভৃতি বিষযে বিবাট ধ্বংস ও পুনর্গঠনেব জন্য মহাশক্তিসমূহেব সংঘাত উপস্থিত হয। সাধাবণত এরূপ যুগান্তব ভীষণ যুদ্ধ ও রক্তপাতেব ভিতর দিয়া সংঘটিত হয। এইরূপ যুগসন্ধিকে গীতাশিক্ষাব

কাঠামো কবা হইযাছে। জগতে এরূপ ভীষণ যুগপবিবর্তনেব যে প্রযোজন আছে তাহা স্বীকাব কবিযা লইযাই গীতা অগ্রসর হইযাছে। গীতা নৈতিক জগতে পাপ ও পুণ্যেব বিবোধ, শুভ ও অশুভেব বিরোধ যেমন স্বীকার করিয়াছে, তেমনি সাধু ও দুষ্কৃতেব মধ্যে শাবীবিক যুদ্ধও স্বীকাব কবিযাছে। আমাদের ভুলিলে চলিবে না যে গীতা যখন বচিত হয, এখন অপেক্ষা তখন মানবজীবনে যুদ্ধ আরও অধিক প্রযোজনীয ছিল এবং জীবন হইতে যে যুদ্ধ কখনও উঠিতে পারে, তাহা কেহ স্বপ্নেও ভাবিতে পাবিত না। সকল মনুষ্যেব মধ্যে পবস্পবেব প্রতি সম্পূর্ণ সদ্ভাব না হইলে স্থায়ী ও প্রকৃত শান্তি কখনও সম্ভব নহে। এরূপ সদ্ভাব ও সর্বব্যাপী শান্তিব আদর্শ মনুষ্য তখন মুহূর্তের জন্যও গ্রহণ কবিতে পাবে নাই; কাবণ সমাজে, ধর্মে, আধ্যাত্মিকতায মানবজাতি তখন ইহাব জন্য প্রস্তুত হয় নাই—প্রকৃতিও এরূপ বিধান বরদাস্ত কবিবাব মত অবস্থায় উপনীত হয় নাই। এমনকি এখনও আমবা যতদূব অগ্রসব হইযাছি তাহাতে পরস্পরের স্বার্থেব মধ্যে কতকটা সামঞ্জস্য স্থাপন কবিযা নিকৃষ্ট বকমেব যুদ্ধ ও বিরোধেব হাত এডান ভিন্ন আব কিছুই কবা সম্ভবপব হয নাই। এইটুকুই কবিবাব নিমিত্ত স্বভাবেব বশে মানবজাতিকে যে নৃশংস যুদ্ধ ও বক্তপাতেব অবতাবণা কবিতে হইযাছে ইতিহাসে তাহাব তুলনা আব কোথাও নাই। এই যে শান্তি—ইহারও ভিত্তি মানবচবিত্রের কোন গভীব পবিবর্তনেব উপর স্থাপিত হয নাই। অর্থনৈতিক অসুবিধা, প্রাণহানি কবিতে বিতৃষ্ণা, যুদ্ধেব বিপদ ও ভীষণতা এই সকল বিবেচনা কবিযা রাজনৈতিক বন্দোবস্তেব দ্বাবা শান্তিবক্ষাব যে ব্যবস্থা হইয়াছে তাহাব ভিত্তি যে খুব দৃঢ় এবং তাহা অধিক দিন স্থাযী হইবে বলিয়া মনে হয় না। এমন এক দিন আসিবে, নিশ্চযই আসিবে, যখন মানবজাতিব আধ্যাত্মিক, নৈতিক, সামাজিক অবস্থা সর্বব্যাপী শান্তিব অনুকূল হইবে। কিন্তু যতদিন তাহা না হইতেছে ততদিন ধর্মকেই যুদ্ধ এবং যোদ্ধারূপে মানুষেব কর্তব্যের মীমাংসা করিযা দিতেই হইবে। ভবিষ্যতে মানবজীবন কিরূপ হইতে পাবে শুধু তাহাই না ধবিযা, উহা এখন বাস্তবিক যেরূপ, গীতা তাহাই ধবিয়াছে এবং প্রশ্ন তুলিযাছে যে যুদ্ধেব সহিত আধ্যাত্মিক জীবনেব সামঞ্জস্য কেমন কবিযা রক্ষা কবা যাইতে পাবে?

সেইজন্যই গীতাব শিক্ষা একজন ক্ষত্রিযেব নিকট কথিত হইযাছে। যুদ্ধ ও দেশবক্ষাই ক্ষত্রিযেব ধর্ম। সমাজে অন্য কার্য কবিতে হয বলিযা যাহাবা নিজেদের বক্ষাব ব্যবস্থা কবিতে পাবে না, তাহাদিগকে আক্রমণকাবীদেব হস্ত হইতে বক্ষা কবিবাব জন্য ক্ষত্রিয়কে যুদ্ধ করিতে হয। দ্বিতীযত, যাহারা দুর্বল ও নির্যাতিত তাহাদিগকে বক্ষা কবিবাব জন্য এবং জগতে ন্যায ও ধর্মকে সুপ্রতিষ্ঠিত বাখিবাব জন্য ক্ষত্রিযকে যুদ্ধ কবিতে হয।—ভাবতে ক্ষত্রিয শুধু সৈনিক নহেন—ধর্ম ও সমাজেব বক্ষা তাঁহাব ধর্ম, স্বভাবত তিনি আর্তেব বক্ষক এবং দেশের পালনকর্তা ও বাজা। যদিও গীতাব সার্বজনীন সাধারণ ভাব ও কথাগুলিই আমাদেব পক্ষে সর্বাপেক্ষা মূল্যবান তথাপি যে বিশিষ্ট ভাবতীয সমাজ ও সভ্যতার মাঝে ইহার

উৎপত্তি তাহারও হিসাব লওয়া আমাদের কর্তব্য। বর্তমান সমাজতন্ত্র হইতে তাহা বিভিন্ন। এখন আমরা মানুষকে একাধারে জ্ঞানী, ব্যবসায়ী এবং যোদ্ধা বলিয়াই দেখি। বর্তমান সমাজে এই সকল কর্মের তেমন বিভাগ নাই—আমরা চাই প্রত্যেক লোকই সমাজকে কিছু জ্ঞান দিক, কিছু অর্থসঞ্চয় করুক, দেশরক্ষার জন্য যুদ্ধও করুক—কোন্ ব্যক্তির প্রকৃতি কোন্ রকম কার্যের অনুকূল আমরা তাহার হিসাব লইতে চাই না। ভারতের প্রাচীন সভ্যতা ব্যক্তির প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের উপর বিশেষ ঝোঁক দিত এবং তদনুসারে সমাজে তাহার স্থান ও কর্তব্য নির্ধারণ করিয়া দিত। সামাজিক কর্তব্য পালনই তখন মনুষ্যজীবনের শ্রেষ্ঠ আদর্শ বলিয়া পরিগণিত হইত না—সমাজে কর্তব্য পালন করিয়া আধ্যাত্মিক জীবনে উন্নতি সাধন করাই তখন ছিল শ্রেষ্ঠ আদর্শ। ধ্যান ও জ্ঞান, যুদ্ধ ও দেশশাসন, ধনোৎপাদন ও আদানপ্রদান, শ্রম ও সেবা—সমাজের কর্তব্য এই চারিভাগে স্পষ্টভাবে বিভক্ত ছিল। যেরূপ কার্য যাহার স্বভাবের অনুযায়ী এবং যেরূপ কার্যের দ্বারা যাহার আধ্যাত্মিক জীবনের ক্রমোন্নতির সুবিধা সেইরূপ কার্যেই সেইরূপ লোককে নিযুক্ত করা হইত।

বর্তমান যুগের যে ব্যবস্থা অনুসারে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র নির্বিশেষে সর্ববিধ কর্মের জন্য সকল মানুষেরই সাধারণভাবে দায়িত্ব রহিয়াছে সে ব্যবস্থারও কতক সুবিধা আছে। এরূপ ব্যবস্থার গুণে সামাজিক জীবনে অধিকতর দৃঢ়তা, একতা, পূর্ণতার সুবিধা হয়। অন্যদিকে প্রাচীন প্রথামত কর্ম অনুসারে জাতি বিভাগ করিতে যাইয়া ঘটনাচক্রে ভারতবর্ষে ক্রমে অসংখ্য জাতির সৃষ্টি হইয়াছে, সামাজিক জীবনে সঙ্কীর্ণতা, অনৈক্য আসিয়াছে, জাতিগত ব্যবসায় অবলম্বন করিতে অনেককে স্বভাবের বিরুদ্ধেও কার্য করিতে হইতেছে। তবে আধুনিক প্রথারও অসুবিধা রহিয়াছে। অনেক সময় এই প্রথার ফল এতদূর গড়াইয়াছে যে সমাজের অত্যন্ত অনিষ্ট সাধন হইয়াছে। আধুনিক যুদ্ধের স্বরূপ বিবেচনা করিলেই ইহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। আধুনিক প্রথা অনুসারে স্বদেশের রক্ষা ও কল্যাণের জন্য যুদ্ধ করিতে সকল মনুষ্যই সাধারণভাবে বাধ্য। ইহার ফল হইয়াছে এই যে এখন কোথাও যুদ্ধ আরম্ভ হইলে পণ্ডিত, কবি, দার্শনিক, পুরোহিত, ব্যবসাদার, শিল্পী, সকলকেই আপন আপন স্বাভাবিক কর্ম হইতে ছিন্ন করিয়া মরিতে ও মারিতে পরিখার ভিতর পাঠাইয়া দেওয়া হয়, সমগ্র সমাজজীবনে বিশেষ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়, লোকের জ্ঞান ও বিবেক অমান্য করা হয়। এমনকি যে ধর্মযাজক শান্তি ও প্রেমের বাণী প্রচার করিতে গবর্নমেন্ট কর্তৃক নিযুক্ত হইয়াছেন, তাঁহাকেও বাধ্য হইয়া স্বধর্ম পরিত্যাগ করিতে হয় এবং কশাইয়ের মত মানুষ মারিতে হয়। এইরূপে সামরিক স্টেটের আদেশে শুধুই যে মানুষের বিবেক ও স্বধর্মকেই বলি দেওয়া হয় তাহা নহে, জাতি রক্ষার অত্যধিক আগ্রহে জাতীয় আত্মহত্যারই পথ সুন্দররূপে পরিষ্কার করিয়া দেওয়া হয়।

অন্যদিকে যুদ্ধের উৎপাত ও অনর্থ যতদূর সম্ভব কমানই ভারতীয় সভ্যতার

প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। এই উদ্দেশ্যেই যুদ্ধকার্যটার ভার একশ্রেণীর লোকের উপরই দেওয়া ছিল। এই শ্রেণীর লোক জন্ম, স্বভাব ও বংশগৌরবের দ্বারা এই কার্যের প্রকৃতভাবে উপযুক্ত বলিয়া পরিগণিত হইতেন। যুদ্ধকার্যের দ্বারাই স্বাভাবিকভাবে তাহাদের আধ্যাত্মিক উন্নতি হইত। একটা উচ্চ আদর্শের অনুবর্তী হইয়া যাঁহারা যোদ্ধার জীবন যাপন করেন তাঁহাদের সাহস, শক্তি, নিয়মানুবর্তিতা, সহযোগিতা, শৌর্য প্রভৃতি বিবিধ সদ্‌গুণের বিকাশ হইয়া তাঁহাদের আত্মার উন্নতি হইবার বিশেষ সুযোগ ও সুবিধা হয়। সমাজের অন্য শ্রেণীর লোক উক্ত শ্রেণীর দ্বারা সর্বদা বিপদ ও অত্যাচার হইতে রক্ষিত থাকিয়া নিশ্চিন্ত মনে আপন আপন কার্য করিতেন। নিজ নিজ কার্য ও ব্যবসায়ের ক্ষতি করিয়া তাহাদিগকে যুদ্ধ করিতে যাইতে হইত না। যুদ্ধ অল্প লোকের মধ্যে নিবদ্ধ থাকায় যুদ্ধের দ্বারা সমাজের সাধারণ জীবনে ক্ষতি খুব কমই হইত। উচ্চ নৈতিক আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হওয়ায় এবং যতদূর সম্ভব দয়া সৌজন্য প্রভৃতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়ায় যুদ্ধ মানুষকে নিষ্ঠুর না করিয়া উচ্চহৃদয় ও উন্নতই করিত। আমাদের ভুলিলে চলিবে না যে গীতা এইরূপ যুদ্ধের কথাই বলিয়াছে—জীবন হইতে যুদ্ধকে যখন বাদ দেওয়া চলে না তখন এরূপভাবে যুদ্ধকে সীমাবদ্ধ ও নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে যেন তাহা অন্যান্য কর্মেরই ন্যায় নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির সহায় হয়। নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতিই তখন জীবনের একমাত্র প্রকৃত উদ্দেশ্য বলিয়া পরিগণিত হইত। এইরূপ সুনিয়ন্ত্রিত সীমাবদ্ধ যুদ্ধের দ্বারা ব্যক্তিগতভাবে মানুষের শরীর ধ্বংস হইত বটে কিন্তু তাহাদের আভ্যন্তরীণ জীবন এবং জাতির নৈতিক জীবন সুগঠিত হইত। উচ্চ আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হওয়ায় প্রাচীনকালে যুদ্ধ যে শৌর্য ও সৌজন্য বিকাশে বিশেষ সহায়তা করিয়াছে, অতি বড় গোঁড়া অহিংসবাদী ভিন্ন সকলেই সে কথা স্বীকার করিবেন। ইউরোপের নাইট্, ভারতের ক্ষত্রিয় এবং জাপানের সামুরাই জাতি ইহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। যুদ্ধের দ্বারা মানবজাতির যে কল্যাণ হইতে পারে তাহা যদি সম্পূর্ণ হইয়া থাকে, তবে যুদ্ধ উঠিয়া যাউক; গঠনশক্তি ও আদর্শ হইতে বিচ্যুত যুদ্ধ নিষ্ঠুর হিংসাকাণ্ড মাত্র এবং এরূপ যুদ্ধ মানবসমাজের ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে পরিত্যক্ত হইবে বটে কিন্তু আমাদের বিবর্তনের যুক্তিসঙ্গত বিচার করিতে হইলে, যুদ্ধের দ্বারা অতীতে যে জাতির কল্যাণ হইয়াছে তাহা আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে।

তবে যাহাই হউক, শারীরিক যুদ্ধ জীবনের এক সাধারণ নীতির এক বিশেষ অভিব্যক্তি মাত্র। মানবজাতিকে পূর্ণতা লাভ করিতে হইলে যে সকল সাধারণ গুণের প্রয়োজন, ক্ষত্রিয়-ধর্ম তাহার একটির বাহ্য নিদর্শন মাত্র। এই জগতে আমাদের আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যজীবনে সর্বত্রই যুদ্ধ ও বিরোধের যে একটা দিক আছে, শারীরিক যুদ্ধ তাহার বাহ্য দৃষ্টান্ত। জগতের ধারাই এই যে শক্তিসমূহ পরস্পরের সহিত বিরোধ করিতেছে, যুদ্ধ করিতেছে, পরস্পরকে ধ্বংস করিয়াই নিত্য নূতন মিটমাটের দিকে অগ্রসর হইতেছে। আশা হয়, এমনই করিয়া একদিন

সকল বিরোধের অবসান হইবে, পূর্ণ সামঞ্জস্য ও সমন্বযেব প্রতিষ্ঠা হইবে, কিন্তু কোন্ একত্বেব উপর এই সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠিত হইবে এ পর্যন্ত তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইতেছে না। মানুষের মধ্যে যে ক্ষত্রিযত্ব বহিযাছে তাহা জীবনেব এই নীতি স্বীকার করে এবং ইহাকে জয় করিতে যোদ্ধারূপে ইহাব সম্মুখীন হয়, শবীব বা বাহ্য আকাবকে ধ্বংস কবিতে কুণ্ঠিত হয় না কিন্তু এই সকল দ্বন্দ্বেব ভিতব দিযা এমন এক নীতি, এক ধর্মেব প্রতিষ্ঠা কবিতে চাহে, যাহাকে অবলম্বন কবিযা সেই শেষ সামঞ্জস্য স্থাপিত হইবে, সকল দ্বন্দ্বেব অবসান হইবে। বিশ্বশক্তিব এই দিকটাকে এবং ইহার বাহ্য নিদর্শন শারীরিক যুদ্ধকে গীতা স্বীকাব কবিযাছে এবং ইহার শিক্ষা একজন কর্মী, যোদ্ধা, ক্ষত্রিয়কে বিবৃত কবিযাছে। ভিতবে শান্তি, বাহিরে অহিংসা—এই যে আত্মাব উচ্চাকাঙ্ক্ষা, যুদ্ধ তাহাব সম্পূর্ণ বিবোধী। যোদ্ধাব, ক্ষত্রিয়ের দ্বন্দ্বকোলাহলময় জীবন নীবব আত্মজয ও শান্তিপূর্ণ আদর্শ জীবনেব সম্পূর্ণ বিবোধী বলিয়াই মনে হয। এই বিবোধেব মধ্যে কোথায সামঞ্জস্যের সূত্র বহিযাছে গীতা তাহাই খুঁজিযা বাহির কবিতে চায, সেই সূত্র অবলম্বন করিয়াই সকল দ্বন্দ্ব বিরোধেব অতীত শেষ সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে।

যে মানুষেব প্রকৃতিতে যে গুণেব প্রভাব অধিক সেই গুণ অনুসাবেই সেই মনুষ্য জীবনযুদ্ধের সম্মুখীন হয। সাংখ্যমতে জগৎ ত্রিগুণাত্মক। জগতেব প্রত্যেক বস্তু ত্রিগুণের সমবায়ে গঠিত। গীতা এ মতেব অনুমোদন কবিয়াছে। গীতা বলে,

ন তদস্তি পৃথিব্যাং বা দিবি দেবেষু বা পুনঃ।
সত্ত্বং প্রকৃতিজৈর্মুক্তং যদেভিঃ স্যাৎ ত্রিভির্গুণৈঃ॥১৮।৪০

"পৃথিবীতে কিংবা স্বর্গে দেবগণেব মধ্যে এমন কোনই বস্তু নাই যাহা প্রকৃতিসম্ভূত এই গুণত্রয় হইতে মুক্ত।"

অতএব মানবপ্রকৃতিরও তিন প্রধান গুণ আছে। শান্তি, জ্ঞান, সুখ সত্ত্বগুণেব লক্ষণ। তৃষ্ণা, আসক্তি, কর্ম রজোগুণেব স্বরূপ। অজ্ঞান ও আলস্য তমোগুণেব লক্ষণ। যাহাদের প্রকৃতিতে তমোগুণেব প্রাধান্য তাহাবা জগতের শক্তিসমূহ কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া যুদ্ধ কবিতে পারে না, সহজেই অভিভূত, নিপীড়িত হয, তাহাদের অধীন হইয়া পড়ে। তামসিক মনুষ্যেরা অন্য গুণেব কিছু সহায়তা পাইলে কোনরূপে যতদিন সম্ভব টিকিযা থাকিতে চায়, বাধা বিধিনিষেধেব মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া জীবনযুদ্ধ হইতে নিজেকে নিরাপদ মনে কবে, কোন উচ্চ আদর্শেব ডাকে চেষ্টা কবিয়া জীবনযুদ্ধে জয়লাভ করিবাব কোন প্রযোজনই উপলব্ধি কবে না। যাহাদের প্রকৃতিতে রজোগুণের প্রাধান্য তাহাবা উৎসাহেব সহিত জীবনযুদ্ধে ঝাঁপাইয়া পড়ে এবং জগতেব শক্তিসমূহের দ্বন্দ্বকে নিজেদেব স্বার্থসিদ্ধিব কার্যে লাগাইতে চেষ্টা কবে—তাহাবা চায় জয় কবিতে, প্রভুত্ব কবিতে, ভোগ কবিতে। রাজসিক মনুষ্যেবা যদি কতকটা সত্ত্বগুণের সাহায্য পায তাহা হইলে তাহাবা এই

দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়া আন্তরিক বিপুগণকে জয় করিতে চায়, হর্ষ চায়, শক্তি চায়। জীবনযুদ্ধে তাহারা বেশ আনন্দ পায়, এটা তাহাদের একটা নেশাব মত, কারণ প্রথমত জীবনযুদ্ধে তাহারা কর্মের যে আনন্দ, সবলতার যে সুখ, তাহা উপভোগ কবিবাব সুযোগ পায়; দ্বিতীয়ত, ইহার দ্বারা তাহাদের উন্নতি, তাহাদেব স্বাভাবিক আত্মবিকাশের সুবিধা হয়। যাহাদের উপর সত্ত্বগুণের প্রভাব অধিক তাহারা এই দ্বন্দ্বের মধ্যেই ধর্ম, নীতি, সামঞ্জস্য, শান্তি, সুখের সন্ধান করে। যে সকল মনুষ্য খাঁটি সাত্ত্বিক তাহারা অন্তরেব ভিতরেই এই শান্তির সন্ধান করে। তাহারা হয় শুধু নিজেদের জন্যই এই শান্তি চায় অথবা এই আভ্যন্তরীণ শান্তির বার্তা অপবকেও জানাইযা দেয়; কিন্তু বাহ্যজগতের যুদ্ধ দ্বন্দ্ব হইতে সরিয়া বা তাহার প্রতি উদাসীন থাকিয়াই তাহাবা শান্তি লাভ করিতে চায়। কিন্তু যেসকল সাত্ত্বিক প্রকৃতিতে রজোগুণেবও কিছু প্রভাব আছে তাহাবা বাহিরে যুদ্ধ-দ্বন্দ্বেব উপবই শান্তি ও সামঞ্জস্য স্থাপন কবিতে চায়—যুদ্ধ বিরোধ দ্বন্দ্বকে পবাজিত করিয়া জগতে শান্তি প্রেম সামঞ্জস্যেব বাজত্ব স্থাপন করিতে চায়। এই তিনটি গুণের প্রভাব যাহাব প্রকৃতিতে যেরূপ সে সেইভাবেই জীবন-সমস্যাব সম্মুখীন হয়।

কিন্তু এরূপ অবস্থাও আসিতে পারে যখন মানুষ প্রকৃতির ত্রৈগুণ্যের খেলায় তৃপ্ত হইতে পাবে না—হয ইহাব বাহিরে যাইতে চায় অথবা ইহার উপরে উঠিতে চায। মানুষ এমন কোন অবস্থা চায় যাহা ত্রিগুণেব বাহিরে, গুণশূন্য বা নির্গুণ। অথবা এমন অবস্থায উঠিতে চায় যাহা সকল গুণের উপরে, যেখানে সকল গুণের প্রভু হওযা যায, কর্ম কবা যায অথচ কর্মের অধীন হইতে হয় না—মানুষ নির্গুণ অবস্থা চায অথবা ত্রিগুণাতীত অবস্থা চায। পূর্বোক্ত ভাব মানুষকে সন্ন্যাসের দিকে লইয়া যায়। শেষোক্ত ভাবের বশে মানুষ পাশবিক প্রবৃত্তিগুলিকে জয় করিতে চায, অপবা প্রকৃতির দ্বারা ইতস্তত চালিত হয় না—কামনা ও বাসনাকে বর্জন কবিযা আভ্যন্তবীণ সমতালাভই এইরূপ ভাবের মূল নীতি। প্রথমে সন্ন্যাসের দিকে অর্জুনেব ঝোঁক হইয়াছিল। তাঁহাব বীবজীবনের পরিণাম কুরুক্ষেত্রের বিরাট হত্যাকাণ্ড হইতে প্রথমে তিনি পিছাইয়া পড়িবার উপক্রম কবিয়াছিলেন। এতদিন তিনি যে নীতিব বশে কার্য কবিয়া আসিয়াছেন সেই নীতি হারাইয়া কর্মত্যাগ, সংসাবত্যাগ ভিন্ন অন্য কোন পথই তিনি খুঁজিয়া পান নাই! কিন্তু তাঁহাব উপর ভগবানের আদেশ হইল বাহ্যত সংসার ও কর্ম পরিত্যাগ করিতে হইবে না, ভিতবে প্রাধান্য লাভ কবিতে হইবে, আত্মজয় কবিতে হইবে।

অর্জুন ক্ষত্রিয, বাজসিক মনুষ্য—তিনি সাত্ত্বিক আদর্শ অনুসারে তাঁহার বাজসিক কর্ম নিযন্ত্রিত কবেন। যুদ্ধে যে আনন্দ আছে তাহা সম্পূর্ণভাবে স্বীকার কবিয়াই তিনি অসীম উল্লাসের সহিত কুরুক্ষেত্রেব বিরাট যুদ্ধে অগ্রসব হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি যে ধর্মের পক্ষে যুদ্ধ কবিতেছেন—এই গৌরবে তাঁহার হৃদয় পূর্ণ। তাঁহাব দ্রুতগামী রথে তিনি শঙ্খনিনাদে শত্রুগণের হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া অগ্রসব হইতেছিলেন। তিনি অবলোকন করিতে চান যে এই যুদ্ধে কাহারা দুর্বুদ্ধি

দুর্যোধনের পক্ষ সমর্থন করিয়া ধর্ম, ন্যায, সত্যের পরিবর্তে স্বার্থপরতা ও অহঙ্কারের প্রতিষ্ঠা করিতে আসিয়াছে, কাহাদের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে ধর্ম, ন্যায়, সত্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। তাঁহার ভিতরে এই আত্মবিশ্বাস যখন চূর্ণ হইয়া গেল, তাঁহার সু-অভ্যস্ত ক্ষত্রিয় ধর্ম তাঁহাকে মহাপাপের মধ্যে টানিয়া আনিয়াছে বলিয়া যখন তাঁহার ধারণা হইল, তখন তমোগুণ জাগিয়া উঠিয়া সেই রাজসিক মনুষ্যকে ঘিরিয়া ধরিল—বিস্ময়, শোক, ভয়, অবসাদ, মোহে তিনি অভিভূত হইয়া পড়িলেন, তাঁহার বুদ্ধিভ্রংশ হইল, তিনি অজ্ঞান ও অপ্রবৃত্তির বশীভূত হইলেন। ফলে সন্ন্যাসের দিকেই তাঁহার ঝোঁক হইল। এই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম অপেক্ষা ভিক্ষা করিয়াই জীবিকা নির্বাহ করা শ্রেয়। রক্তপাত করিয়া যে ভোগের বস্তু সংগ্রহ করা হয় তাহা রুধিরাক্ত। ধর্ম ও নীতির নামে যে যুদ্ধ, সেই যুদ্ধ ধর্ম, নীতি, সমাজ সকলের মূলে কুঠারাঘাত করিয়া চালাইতে হইবে।

কর্ম ও সংসার পরিত্যাগ, ত্রৈগুণ্য পরিত্যাগ—ইহাই সন্ন্যাস। কিন্তু সন্ন্যাস অবস্থায় উপস্থিত হইতে হইলে তিন গুণের কোনটির ভিতর দিয়াই যাইতে হয়। তামসিকতার বশে মানুষ সন্ন্যাসের দিকে যাইতে পারে—সংসার ও জীবনের প্রতি তাহাদের বিতৃষ্ণা, ঘৃণার উদয় হয়, অক্ষমতাবোধ ও ভয়ে অভিভূত হইয়া তাহারা সংসার ছাড়িয়া পলাইতে চায়, অথবা রজোগুণ তমোর দিকে যাইতে পারে, তখন সংসারের শোক দুঃখ দ্বন্দ্ব নিরাশায় পরিশ্রান্ত হইয়া মানুষ আর কর্মের কোলাহল, জীবনের যন্ত্রণা ভোগ করিতে চায় না। সত্ত্বমুখী রজোগুণের বশেও মানুষ সন্ন্যাসের দিকে যাইতে পারে—সংসার যাহা দিতে পারে তাহা অপেক্ষা তাহারা উচ্চ বস্তু লাভ করিতে চায়। শুধু সত্ত্বগুণের বশে মানুষ বুদ্ধির দ্বারা সংসারের অসত্যতা উপলব্ধি করিয়া সন্ন্যাসের দিকে আকৃষ্ট হইতে পারে—অথবা কালাতীত, অনন্ত, নীরব, নামরূপহীন শান্তির অনুভূতি লাভ করিয়াও মানুষ সংসার ছাড়িতে পারে। অর্জুনের যে সংসারের প্রতি বিরাগ উপস্থিত হইয়াছিল, সেটা হইতেছে সত্ত্বরাজসিক মনুষ্যের তামসিক বিরাগ। ভগবান গুরুরূপে অর্জুনকে এই অন্ধকারময় পথের ভিতর দিয়াই তপস্বী জীবনের পবিত্রতা ও শান্তির মধ্যে লইয়া যাইতে পারিতেন। অথবা এখনই তাঁহার তামসিক বিরাগকে পবিত্র করিয়া সাত্ত্বিক সন্ন্যাসের অসাধারণ উচ্চতার দিকে লইয়া যাইতে পারিতেন। কিন্তু, বাস্তবিক তিনি এই দুইটির কোনটিই করিলেন না। তিনি তামসিক বিরাগ ও সন্ন্যাসের প্রতি ঝোঁককে নিন্দা করিলেন এবং অর্জুনকে কর্ম করিতে, এমনকি সেই ভীষণ নৃশংস যুদ্ধ করিতেই উপদেশ দিলেন। কিন্তু, তিনি তাঁহার শিষ্যকে আর এক সন্ন্যাস, আভ্যন্তরীণ ত্যাগের পথ দেখাইয়া দিলেন। অর্জুনের যে সমস্যা তাহার ইহাই প্রকৃত মীমাংসা। এই রূপেই বিশ্বশক্তির উপর আত্মপ্রাধান্য লাভ করিবে অথচ সংসারে স্বাধীন ও শান্তভাবে কর্মও করিতে পারিবে। বাহ্য সন্ন্যাস নহে, আভ্যন্তরীণ ত্যাগ—কামনা, বাসনা, আসক্তির ত্যাগই গীতার শিক্ষা।

সপ্তম অধ্যায়

ক্ষত্রিয়ের ধর্ম*

শোকে, দুঃখে, সন্দেহে, অভিভূত অর্জুন যখন এই সংসারকে শূন্য ও অসার দেখিলেন, হত্যাকাণ্ড হইতে নিবৃত্ত হইলেন, পাপ কর্মের পাপ পরিণামের কথা বলিতে লাগিলেন তখন তাহার উত্তরস্বরূপ ভগবান তাঁহাকে তীব্র ভর্ৎসনা করিয়া উঠিলেন। ভগবান উত্তর করিলেন যে অর্জুনের এই ভাব বুদ্ধির গোলমাল ও ভ্রম হইতে উৎপন্ন—ইহা হৃদয়ের দৌর্বল্য, ক্লৈব্য—ক্ষত্রিয়োচিত, বীরোচিত ধর্ম হইতে পতন। পৃথার পুত্রের ইহা শোভা পায় না। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের পক্ষে তিনিই নায়ক, তিনিই ভরসা—এহেন সঙ্কটসময়ে সেই ধর্মপক্ষ পরিত্যাগ করা তাঁহার উচিত হয় না, মোহবশে দেবদত্ত গাণ্ডীব পরিত্যাগ করা, ভগবান কর্তৃক নির্দিষ্ট কর্ম পরিত্যাগ করা কখনই উচিত হয় না। আর্যগণের অনুমোদিত ও অনুসৃত পথ ইহা নহে। এ ভাব স্বর্গের নহে, এ পথে স্বর্গে যাওয়া যায় না। ইহজগতে মহৎ কর্ম ও বীরত্বের দ্বারা যে কীর্তি লাভ করা যায় এরূপ ব্যবহারে তাহা সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট হয়। অর্জুন এই ক্ষুদ্র হৃদয়দৌর্বল্য, কার্পণ্য পরিত্যাগ করুক, উঠিয়া শত্রুগণের বিনাশ সাধন করুক।

কিন্তু, ইহা কি একজন ধর্মোপদেষ্টা দেবগুরুর উপযুক্ত উত্তর হইল? একজন ক্ষত্রিয় বীর আর একজন বীরকে এইরূপ উত্তর দিতে পারে। কিন্তু, ধর্ম-গুরুর নিকট হইতে আমরা কি চাই না যে তিনি সর্বদা কোমলতা, সাধুতা এবং আত্মত্যাগের উপদেশ দিবেন, সংসারের কাম্য, সাংসারিক চালচলন বর্জন করিতে উৎসাহ দিবেন? গীতায় স্পষ্টই বলা হইয়াছে যে অর্জুন বীরের অনুচিত দুর্বলতায় পতিত হইয়াছিলেন, তিনি অশ্রুপূর্ণাকুললোচন এবং বিষাদাপন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। কারণ তিনি কৃপয়াবিষ্ট, কৃপা দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু, এই দুর্বলতা কি দেবোচিত নহে? কৃপা কি দেবোচিত ভাব নহে যে ইহাকে এরূপ তীব্র তিরস্কার করিয়া দমাইয়া দিতে হইবে? জার্মান দার্শনিক নীট্‌শে বীরত্ব এবং গর্বিত শক্তির নীতি প্রচার করিয়াছিলেন, হিব্রু ও টিউটনিকগণ দয়ামায়াকে বীরহৃদয়ের দুর্বলতা বলিয়া মনে করিতেন—আমরা কি তবে সেইরূপ যুদ্ধনীতি এবং কঠোর বীরোচিত কার্যেরই উপদেশ শুনিতেছি? কিন্তু, গীতার শিক্ষা ভারতীয় সভ্যতা হইতে উদ্ভূত হইয়াছে এবং ভারতবর্ষে দয়া চিরকালই দেবচরিত্রের একটি প্রধান গুণ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। গীতারই গুরু শেষের এক অধ্যায়ে মানুষের মধ্যে দেবোচিত গুণের বর্ণনা করিতে যেমন নির্ভীকতা ও

* গীতা- দ্বিতীয় অধ্যায় ১-৩৮।

তেজের উল্লেখ করিয়াছেন তেমনি সর্বজীবে দয়া, কোমলতা, অক্রোধ, অহিংসা, এবং অদ্রোহেরও উল্লেখ করিয়াছেন। ক্রূরতা, কঠোরতা, নিষ্ঠুরতা, শত্রু বধে আনন্দ, ধনসঞ্চয়ে আনন্দ, অন্যায় ভোগ্যবস্তু সংগ্রহে আনন্দ—এই সকল আসুরিক গুণ। যেসকল দুর্দান্তচরিত্র ব্যক্তি জগৎকে ঈশ্বরবিহীন বলে, মানুষের মধ্যে দেবত্ব অস্বীকার করে এবং কামনাকেই পরম পুরুষার্থ বলিয়া পূজা করে তাহাদের চরিত্রতেই উল্লিখিত লক্ষণসকল দৃষ্ট হয়—অতএব অর্জুন এইরূপ অসুরোচিত গুণসম্পন্ন নহে বলিয়া ভগবান তাঁহাকে তীব্র ভর্ৎসনা করিতে পারেন না।

কৃষ্ণ অর্জুনকে জিজ্ঞাসা করিলেন—কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতম্। —"হে অর্জুন, এ বিষম সঙ্কটসময়ে এই মোহ কেন তোমায় আক্রমণ করিল?" অর্জুন তাঁহার বীরোচিত গুণ হইতে কিরূপ স্খলিত হইয়াছেন এই প্রশ্ন হইতেই তাহার স্বরূপ বুঝা যায়। দয়া একটি দেবোচিত গুণ—ইহা স্বর্গ হইতে আমাদের নিকট নামিয়া আসে। যাহার চরিত্রে এই গুণ নাই, যে এইরূপ ধাতে তৈয়ারী নয়, সে যদি নিজেকে বড় বলে, আদর্শ মনুষ্য বলে, অতিমানব বলে—তাহা হইলে সেটা তাহার পক্ষে মূর্খতা, ধৃষ্টতা হইবে। কারণ, কেবলমাত্র তিনিই অতিমানব যাঁহার চরিত্রে ভগবদ্‌গুণের সর্বাপেক্ষা অধিক প্রকাশ হইয়াছে। মানুষের যুদ্ধ ও দ্বন্দ্ব, সবলতা ও দুর্বলতা, তাহার পাপ-পুণ্য, তাহার সুখ-দুঃখ, তাহার জ্ঞান-অজ্ঞান, তাহার বিজ্ঞতা-মূর্খতা, তাহার আশা-নিরাশা এই সকল ব্যাপারকেই দয়াবান প্রেম, জ্ঞান ও শান্ত শক্তির চক্ষুতে দেখেন এবং সকল অবস্থাতেই সাহায্য করিতে চান, সান্ত্বনা দিতে চান। সাধু ও পরোপকারীদের হৃদয়ে এই দেবোচিত দয়া যথেষ্ট প্রেম ও বদান্যের মূর্তি ধারণ করে। পণ্ডিত বীরের হৃদয়ে এই দয়া কল্যাণকর জ্ঞান ও শক্তিরূপে প্রকট হয়। এই দয়াই আর্য ক্ষত্রিয়ের শৌর্যের প্রাণ-স্বরূপ—এই দয়ার বশেই ক্ষত্রিয়বীর ছিন্ন লতাগুল্মকেও আঘাত করিতে চায় না, কিন্তু দুর্বলকে, দলিতকে, আহতকে, পতিতকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হয়। কিন্তু আবার এই দেবোচিত দয়াই দুর্দান্ত অত্যাচারীকে ধরাশায়ী করে, তবে তাহা ক্রোধ বা ঘৃণার বশে করে না কারণ ক্রোধ বা ঘৃণা দেবোচিত উচ্চ গুণ নহে। পাপীর প্রতি ভগবানের ক্রোধ, দুষ্টের প্রতি তাঁহার ঘৃণা, এ সকল মিথ্যা গল্প নরকের যন্ত্রণার গল্পের মতই অর্ধশিক্ষিত ধর্মসমূহ কর্তৃক রচিত হইয়াছে। ভারতের প্রাচীন ধর্ম স্পষ্টই দেখিয়াছিল যে দেবোচিত দয়ার বশে যে সকল ব্যথিত ও অত্যাচারিতকে অন্যায় ও উপদ্রব হইতে রক্ষা করা হয় তাহাদের প্রতি যেরূপ প্রেম ও করুণা থাকে—যে সকল ভ্রমান্ধ দুর্দান্ত অত্যাচারী অসুরকে তাহাদের পাপের জন্য নিধনসাধন করিতে হয় তাহাদের প্রতিও সেইরূপই প্রেম ও করুণা থাকে।

কিন্তু যে ভাবের বশে অর্জুন তাঁহার কর্তব্যকার্য পরিত্যাগ করিতে উদ্যত, তাহা সেই দেবোচিত করুণা নহে। অর্জুন নিজের দুর্বলতায়, নিজের কষ্টে পীড়িত, কর্তব্যকার্য সাধনে তাঁহার নিজের যে মানসিক যন্ত্রণা উপস্থিত হইবে তাহা সহ্য

করিতে নারাজ। তিনি স্পষ্ট বলিলেন—"আমি এমন কিছুই দেখিতেছি না, যাহা আমার ইন্দ্রিয়গণের শোষক এই শোক অপনোদন করিতে পারে।" এরূপ দীনতা ও আত্মদৌর্বল্যের ভাব আর্যগণের নিকট সর্বাপেক্ষা হীন ও অনার্যোচিত বলিয়া পরিগণিত হইত। অর্জুনের যে কৃপা উপস্থিত হইয়াছিল তাহাও এক রকমের স্বার্থপরতা। ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণ অর্জুনের "বান্ধব" "স্বজন"—তাই তাহাদিগকে বধ করিতে অর্জুনের প্রাণ চাহিতেছিল না। এইরূপ কৃপা মনের দুর্বলতা ভিন্ন আর কিছুই নহে। এইরূপ কৃপা নিম্ন অবস্থার লোকের পক্ষে কল্যাণকর হইতে পারে—তাহাদের হৃদয় কিছু দুর্বল হওয়াই উচিত নতুবা তাহারা কঠিন ও নিষ্ঠুর হইয়া পড়িবে। কারণ তাহাদিগকে কোমল স্বার্থপরতার দ্বারা নিষ্ঠুর স্বার্থপরতা দূর করিতে হইবে, তাহাদের দুর্দান্ত রাজসিক রিপুগণকে দমন করিবার নিমিত্ত তাহাদিগকে অবসাদক তমোগুণের দ্বারা সত্ত্বকে সাহায্য করিতে হইবে। কিন্তু, অর্জুনের পক্ষে এ পথ নহে, তিনি উন্নতচরিত্র আর্য। দুর্বলতার সাহায্যে তাঁহাকে অগ্রসর হইতে হইবে না—ক্রমশ তাঁহার শক্তি বাড়াইয়া তুলিতে হইবে। অর্জুন দেবধর্মী মানব—তিনি শ্রেষ্ঠ মনুষ্য তৈয়ারী হইতেছিলেন, দেবতারা তাঁহাকেই ইহার জন্য নির্বাচন করিয়াছিলেন। তাঁহাকে একটি কার্যের ভার দেওয়া হইয়াছে, ভগবান তাঁহার পার্শ্বে তাঁহার রথেই রহিয়াছেন, তাঁহার হস্তে দৈবাস্ত্র গাণ্ডীব, তাঁহার সম্মুখে ধর্মদ্রোহী, দেবদ্রোহী, প্রতিদ্বন্দ্বিগণ! এখন তিনি কি করিবেন না করিবেন—নিজের খেয়াল বা হৃদয়াবেগের বশে তাহা স্থির করিবার তাঁহার কোন অধিকার নাই। তাঁহার স্বার্থপর হৃদয় ও বুদ্ধির বলে একটা আবশ্যক ধ্বংসকাণ্ড হইতে বিরত হইবার তাঁহার কোন অধিকার নাই। সহস্র সহস্র ব্যক্তি বিনষ্ট হইয়া নিজের জীবন শূন্য ও দুঃখময় হইয়া যাইবে, এই ধ্বংসের দ্বারা তাঁহার নিজের পার্থিব কোন ফলই লাভ হইবে না—এইরূপ স্বার্থপর চিন্তার বশে কর্ম হইতে বিরত হইবার তাঁহার কোন অধিকার নাই। এইরূপ মনোভাব তাঁহার উচ্চ প্রকৃতি হইতে দুর্বল অধঃপতন ভিন্ন আর কিছুই নহে। কোন্‌টা কর্তব্যকর্ম শুধু ইহাই অর্জুনকে বুঝিতে হইবে, তাঁহার ক্ষত্রিয় স্বভাবের মধ্য দিয়া ভগবান কি আদেশ দিতেছেন, শুধু তাহাই শুনিতে হইবে, মানবজাতির ভবিষ্যৎ তাঁহার কর্মের উপর নির্ভর করিতেছে—সকল বাধা দূর করিয়া সকল শত্রু বিনাশ করিয়া মানবজাতির উন্নতির পথ পরিষ্কার করিবার নিমিত্ত ভগবান তাঁহাকে পাঠাইয়াছেন—ইহাই উপলব্ধি করিতে হইবে।

কৃষ্ণের ভর্ৎসনা অর্জুন স্বীকার করিলেন তথাপি তিনি কৃষ্ণের আদেশ পালন করিলেন না—বরং আরও তর্ক করিতে লাগিলেন। তিনি তাঁহার দুর্বলতা বুঝিলেন কিন্তু তাহা পরিত্যাগ করিতে চাহিলেন না। তিনি স্বীকার করিলেন যে তাঁহার চিত্তের দীনতা তাঁহার ক্ষত্রিয়োচিত বীর-স্বভাবকে অভিভূত করিয়াছে। ধর্ম সম্বন্ধে, কর্তব্যাকর্তব্য সম্বন্ধে বিমূঢ়চিত্ত হইয়াই তিনি কৃষ্ণের নিকট শ্রেয়ঃ কি জানিতে চাহিলেন, (কৃষ্ণকেই গুরু বলিয়া স্বীকার করিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইলেন) কিন্তু

যে সকল হৃদযভাব, যে সকল ধ্যান-ধাবণা অনুসারে এতদিন তিনি কর্তব্যাকর্তব্য নির্ধারণ কবিযা আসিতেছিলেন তাহা ওলটপালট হইযা যাওযায এবং নূতন কিছু ধরিবাব না পাওযায় অর্জুন তাঁহাব পুবানো জীবনেব উপযোগী একটা আদেশ মাথা পাতিযা লইতে পাবিলেন না। তিনি এখনও তর্ক কবিতে লাগিলেন যে যুদ্ধ হইতে বিবত হওযাই তাঁহাব পক্ষে ঠিক হইবে। এই হত্যাকাণ্ড কবিতে এবং ইহাব ফলস্বরূপ কধিবাক্ত ভোগ্যসমূহ উপভোগ কবিতে তাঁহাব প্রাণ চাহিতেছে না। এই কর্মেব ফলে স্বজনগণকে হাবাইযা তাঁহাব জীবন কিরূপ শূন্য ও দুঃখময হইযা উঠিবে তাহা ভাবিয়া তাঁহার হৃদয় শিহবিযা উঠিতেছে। ধর্মাধর্ম, কর্তব্যাকর্তব্য সম্বন্ধে এতদিন যে ধাবণা তাঁহাব অভ্যস্ত ছিল তাহাতে তিনি ভীষ্ম দ্রোণেব ন্যায গুরুজনকে কেমন কবিযা বধ কবিবেন? এই যে ভীষণ নৃশংসকর্মেব ভাব তাঁহাব উপব দেওয়া হইয়াছে—ইহাব যে কি সুফল হইতে পাবে তাহা তাঁহাব বুদ্ধিতে কুলাইতেছে না। তিনি যতদূব বুঝিতেছেন—এই ভীষণ কর্মেব ফল অতি অশুভই হইবে। এতদিন তিনি যে ধাবণাব বশে যে উদ্দেশ্য লইযা যুদ্ধ কবিযাছেন এখন আব সে ধারণায, সে উদ্দেশ্যে যুদ্ধ না কবিতে তিনি সঙ্কল্প কবিলেন এবং ভগবান তাঁহাব অকাট্য যুক্তিগুলি কেমন কবিযা খণ্ডন কবেন, নীববে তাহাবই অপেক্ষা কবিতে লাগিলেন। ভগবান প্রথমেই অর্জুনেব অহঙ্কৃত ও মমতাপন্ন স্বভাবেব এই দাবিগুলি নষ্ট করিতে অগ্রসব হইলেন। সকল অহঙ্কাব ও মমতাব উপবে যে ধর্ম ইহাব পব তাহা বিবৃত করিবেন।

ভগবান দুইটি বিভিন্ন পথ ধবিযা অর্জুনেব প্রশ্নেব জবাব দিলেন। অর্জুন যে আর্যশিক্ষায় শিক্ষিত তাহাবই সর্বোচ্চ ভাবগুলিকে ভিত্তি কবিযা ভগবান সংক্ষেপে প্রথম উত্তব দিলেন। দ্বিতীয যে উত্তব, আবও গভীবতব জ্ঞানেব উপব তাহাব ভিত্তি; এই উত্তব হইতে আমাদেব জীবনেব অনেক গুহ্য কথা বুঝিতে পাবা যায়—ইহাই গীতা শিক্ষাব প্রকৃত আবম্ভ। বেদান্ত দর্শনেব আধ্যাত্মিক ও নৈতিক তত্ত্ব এবং আর্য সমাজেব নৈতিক ভিত্তিস্বরূপ কর্তব্যাকর্তব্য, সম্মান-অসম্মান সম্বন্ধে সামাজিক ধারণাকে অবলম্বন কবিযাই ভগবানেব প্রথম উত্তব কথিত হইয়াছে। অর্জুন ধর্মাধর্ম, শুভাশুভ ফল সম্বন্ধে যুক্তি প্রদর্শন কবিযা তাঁহাব যুদ্ধে পরাঙ্মুখতাকে সমর্থন কবিবাব চেষ্টা কবিযাছেন। কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে অর্জুন তাঁহাব অজ্ঞান, অশুদ্ধ চিত্তেব বিদ্রোহকেই মিথ্যা পাণ্ডিত্যেব দ্বাবা ঢাকিবাব চেষ্টা কবিযাছেন। তিনি শবীব ও শবীবেব মৃত্যু সম্বন্ধে এরূপ কথা বলিযাছেন যেন এইগুলিই চবম সত্য। কিন্তু জ্ঞানী বা পণ্ডিতেবা কখনই এরূপ মনে করেন না। বন্ধু ও আত্মীয-স্বজনেব মৃত্যুতে শোক প্রকৃত জ্ঞানানুমোদিত নহে। পণ্ডিতেবা মৃত বা জীবিত কাহাবও জন্য শোক কবেন না, কাবণ তাঁহাবা জানেন যে যন্ত্রণা ও মৃত্যু আত্মাব জীবনেব বিভিন্ন অস্থায়ী অবস্থা মাত্র। শবীব নহে, আত্মাই সত্য বস্তু। এই যে রাজগণেব আসন্ন মৃত্যুব জন্য তিনি শোক কবিতেছেন—ইহাবা যে পূর্বে কখনও জীবন ধাবণ কবেন নাই তাহা নহে, ভবিষ্যতে যে আব কখনও জন্মগ্রহণ

কবিবেন না, তাহাও নহে। কারণ যেমন এই দেহে দেহোপাধিবিশিষ্ট জীবেব কৌমাব, যৌবন ও বার্ধক্য অবস্থাগুলিব প্রাপ্তি হয়, দেহান্তর প্রাপ্তি অর্থাৎ মৃত্যুও সেইরূপ। যাঁহাবা শান্ত ও জ্ঞানী, যাঁহাবা ধীব, যাঁহাবা স্থির চিত্তে সংসারের ব্যাপাব অবলোকন কবিতে পাবেন এবং ইন্দ্রিয় ও চিত্তের আবেগে বিচলিত ও মোহিত না হন, তাঁহাবা জড-জগতেব বাহ্য দৃশ্যে প্রতারিত হন না। তাঁহাবা শবীরেব, স্নাযুব বা চিত্তেব গোলমালে তাঁহাদেব বুদ্ধি ও জ্ঞানকে মোহগ্রস্ত হইতে দেন না। তাঁহাবা দেহ, প্রাণ, ইন্দ্রিযেব অতীত জীবনের প্রকৃত সত্য দেখিতে পান এবং চিত্তাবেগ ও অজ্ঞান স্বভাবেব শাবীরিক বাসনা অতিক্রম কবিযা মানবজীবনের প্রকৃত ও একমাত্র উদ্দেশ্য অবলম্বন কবিতে পাবেন।

সেই প্রকৃত সত্য কি? সেই উচ্চতম উদ্দেশ্য কি? তাহা এই—যুগে যুগে মানুষ জন্ম-মৃত্যুব ভিতব দিযা যাইযা অমরত্ব লাভেব যোগ্য হইযা উঠিতেছে। এই যোগ্যতা কিরূপে আসিবে? কোন্ মনুষ্য প্রকৃত যোগ্য? যিনি নিজেকে শুধু শরীব ও প্রাণ বলিযাই মনে কবেন না, ইন্দ্রিয়েব সাক্ষ্য গ্রহণ কবিযাই যিনি জাগতিক সত্যাসত্য নির্ণয কবেন না, যিনি নিজেকে এবং সকলকেই আত্মা বলিযা জানেন, যিনি আত্মাব মধ্যেই বাস কবিতে শিখিযাছেন, যিনি অপরের সহিত শাবীরিক জীবভাবে নহে, আত্মাভাবেই ব্যবহার কবেন—তিনি অমবত্ব লাভেব প্রকৃত যোগ্য, কাবণ মৃত্যুব পরও থাকাই অমবত্ব নহে—কারণ মন লইযা যাহারা জন্মগ্রহণ কবে তাহাবা সকলেই মৃত্যুব পবও থাকে। জন্ম-মৃত্যুব উপবে উঠাই প্রকৃত অমরত্ব। মনোময দেহ ছাডাইযা মানুষ যখন আত্মারূপে আত্মার মধ্যেই বাস কবে তখনই তাহাব প্রকৃত অমবত্ব লাভ হয। যাহাবা শোক-দুঃখেব অধীন, চিত্তাবেগ ও ইন্দ্রিযেব দাস, অনিত্য বিষযসমূহেব স্পর্শ লইয়াই যাহাবা ব্যস্ত তাহাবা অমবত্ব লাভেব যোগ্য হইতে পাবে না। যতদিন এই সকলকে জয কবিতে পাবা না যাইতেছে, ততদিন ইহাদিগকে সহ্য কবিতেই হইবে—শেষে এমন একদিন আসিবে যখন ইহাবা মুক্ত পুরুষকে আর ব্যথা দিতে পারিবে না। যে অনন্ত শান্ত আত্মা গুপ্তভাবে আমাদের অন্তবেব মধ্যে বহিযাছেন, তিনি যেমন জ্ঞান, সমতা ও শান্তিব সহিত সংসাবেব সমস্ত ঘটনা গ্রহণ করেন—মুক্ত পুরুষও তেমনই শান্তভাবে সংসাবেব সুখ দুঃখ গ্রহণ কবিতে পাবিবেন। অর্জুনের মত দুঃখ ও ভযে বিচলিত হওযা, তাহাদেব দ্বাবা কর্তব্য পথ হইতে ভ্রষ্ট হওয়া, আত্মকৃপা এবং অসহাবোধে দুঃখ দ্বাবা অভিভূত হওয়া, অবশ্যম্ভাবী তুচ্ছ শাবীবিক মৃত্যুব সম্মুখে শিহবিয়া উঠা—ইহা অনার্যোচিত অজ্ঞান। যে আর্য শান্ত শক্তির সহিত অমবত্বে উঠিতে চাহিবে—এপথ তাহার নহে।

মৃত্যু বলিযা কিছুই নাই। কারণ শবীবই মরে, কিন্তু শরীব মানব নহে। যাহা নিত্য বস্তু তাহা কখনও বিনষ্ট হইতে পারে না—তবে তাহা ভিন্ন আকাবে প্রকাশিত হইতে পাবে, শুধু আকাবের পবিবর্তন হইতে পারে। তেমনই যাহা অনিত্য তাহাব কোন সত্তা থাকিতে পারে না। এই সৎ ও অসতের তফাত

উপলব্ধি হইলে বুঝা যায় যে আত্মা নিখিল জগৎ ব্যাপিয়া বহিয়াছে—কেহই এই অব্যয় আত্মার বিনাশসাধন করিতে পারে না। দেহের বিনাশ আছে, কিন্তু যাহার এই দেহ, যিনি এই দেহকে ব্যবহার করেন, সেই আত্মা অনন্ত, অপ্রমেয়, নিত্য, অবিনাশী। যেমন মনুষ্য জীর্ণবস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া অপর নূতন বস্ত্র পরিধান করে, সেইরূপ আত্মা জীর্ণ দেহ ত্যাগ করিয়া অন্য নূতন দেহ ধারণ করে—ইহাতে শোক করিবার কি আছে? পশ্চাৎপদ হইবার বা শিহরিয়া উঠিবার কি আছে? ইহা জন্মায় না, মরেও না। ইহা এরূপ বস্তু নহে যে, উৎপন্ন হইয়া লোপ পাইয়া আর কখনও ফিরিয়া আসিবে না। ইহা অজ, শাশ্বত, পুরাণ—শরীরের বিনাশ হইলেও ইহা হত হয় না। অমর আত্মার বিনাশ সাধন করিতে কে পারে? শস্ত্র সকল ইহাকে ছেদন করিতে পারে না, অগ্নি ইহাকে দগ্ধ করিতে পারে না, জল ইহাকে সিক্ত করিতে পারে না, বায়ু ইহাকে শুষ্ক করিতে পারে না। ইহা স্থাণু, অচল, সর্বব্যাপী, সনাতন। ইহা শরীরাদির ন্যায় ব্যক্ত নহে, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের গোচর নহে—তবে ইহা সকল ব্যক্ত বস্তু অপেক্ষা বড়। চিন্তার দ্বারা ইহাকে ধরা যায় না—তবে ইহা সকল মন অপেক্ষা বড়। প্রাণ ও ইন্দ্রিয়ের ন্যায় ইহার বিকার হয় না, পরিবর্তন হয় না—ইহা দেহ, মন, প্রাণের পরিবর্তনের অতীত—তবে ইহা সেই সত্য বস্তু, এই সকল যাহাকে প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিতেছে।

যদিই ইহা সত্য হয় যে আমাদের সত্তা তত মহান্ নহে, তত বিরাট নহে, যদি মনে করা যায় যে আত্মা নিত্য দেহের সহিত জন্মগ্রহণ করে ও দেহের সহিত মরে—তথাপি জীবের মৃত্যুতে শোক করা উচিত নহে। কারণ আত্মার স্বপ্রকাশের *জন্য জন্ম মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। জন্মের পূর্বে যে আত্মা থাকে না, তাহা নহে। জন্মের* পূর্বে আত্মা এরূপ অবস্থায় থাকে যাহা আমাদের জড়েন্দ্রিয়ের অগোচর, অব্যক্ত—এই অব্যক্ত অবস্থা হইতে ব্যক্ত হওয়া, ইন্দ্রিয়ের গোচর হওয়াই আত্মার জন্ম। মৃত্যুকালে আত্মা আবার সেই অব্যক্তাবস্থায় ফিরিয়া যায়, এই অবস্থা হইতে আবার তাহা ব্যক্ত হয়, বাহ্যেন্দ্রিয়ের গোচর হয়। রোগেই মৃত্যু হউক আর যুদ্ধেই মৃত্যু হউক—মৃত্যু সম্বন্ধে আমাদের জড় ইন্দ্রিয়-মনের যে শোক তাহা নিতান্ত অজ্ঞান, স্নায়বিক আর্তনাদ ভিন্ন আর কিছুই নহে। আমরা যখন মৃত ব্যক্তির জন্য শোক করি তখন অজ্ঞানের বশে এমন লোকের জন্য শোক করি যাহাদের জন্য শোক করিবার কোন কারণই নাই—কারণ তাহাদের অস্তিত্ব লোপ পাইয়া যায় না, তাহাদিগকে কোন ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক অবস্থায় পরিবর্তন সহ্য করিতে হয় না, বরং মৃত্যুর পরেও তাহারা থাকে এবং জীবিতাবস্থার অপেক্ষা কম সুখে থাকে না।

কিন্তু বস্তুত আমাদের সত্তা খুবই মহান্। সকলেই সেই আত্মা, এক ব্রহ্ম—যাহাকে কেহ-কেহ আশ্চর্যের ন্যায় বোধ করেন, কেহ আশ্চর্যবৎ বলেন বা আশ্চর্যবৎ শ্রবণ করেন। কারণ তিনি আমাদের জ্ঞানের অতীত—আমাদের সকল জ্ঞানচর্চা এবং জ্ঞানীদের নিকট তত্ত্বকথা শ্রবণ সত্ত্বেও সেই পরব্রহ্মকে এ পর্যন্ত কোন মানব-মনই স্বরূপত জানিতে পারে নাই। ইনিই জগতের আবরণের

আড়ালে লুক্কায়িত রহিয়াছেন, ইনিই শরীরের প্রভু—সমস্ত জীবন ইঁহারই ছায়া মাত্র। আত্মার শারীরিক মূর্তি গ্রহণ এবং মৃত্যুর দ্বারা এই অবস্থা পরিত্যাগ—এ সকল তাঁহারই একটি সামান্য লীলা। যখন আমরা নিজদিগকে এ ভাবে জানিব তখন নিজদিগকে হন্তা বা হত বলার কোন অর্থই থাকিবে না। মানব-আত্মা জন্ম ও মৃত্যুরূপ অবস্থান্তরের ভিতর দিয়া অগ্রসর হইতেছে। মাঝে-মাঝে পরলোকে বিশ্রাম করিতেছে, আবার ইহলোকের সুখ-দুঃখ, যুদ্ধ-দ্বন্দ্ব, জয়-পরাজয়কে উন্নতিরই সহায় করিয়া ক্রমশ অমরত্বের দিকেই অগ্রসর হইতেছে—ইহা সেই পরব্রহ্মেরই লীলা, তাঁহারই অভিব্যক্তি। ইহাই একমাত্র প্রকৃত সত্য, জীবনে আমাদিগকে এই সত্য উপলব্ধি করিতে হইবে, এই পরম সত্যের আলোকেই আমাদের জীবন গড়িয়া তুলিতে হইবে।

তাই গুরু বলিলেন—হে ভারত, এই বৃথা শোক ও ক্লৈব্য পরিহার করিয়া যুদ্ধ কর। কিন্তু যুদ্ধ করিবার কথা কেমন করিয়া আসিল? আমরা যদি এই উচ্চ মহান্ জ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি, মন ও আত্মার কঠোর সংযমের দ্বারা চিত্তের আবেগ ও ইন্দ্রিয়ের প্রতারণার উপরে উঠিয়া প্রকৃত আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারি—তাহা হইলে অবশ্য আমরা শোক ও মোহ হইতে মুক্ত হইতে পারি। তাহা হইলে আমাদের মৃত্যুভয় এবং মৃত ব্যক্তির জন্য শোক দূর হইতে পারে। তাহা হইলে আমরা বুঝিতে পারি যে যাহাদিগকে আমরা মৃত বলি তাহারা বাস্তবিক মরে নাই এবং তাহাদের জন্য শোক করিবার কিছু নাই কারণ তাহারা কেবল ইহলোক ছাড়িয়া গিয়াছে। উক্ত জ্ঞানের অধিকারী হইলে আমরা জীবনের ভীষণ দ্বন্দ্বে *অবিচলিত থাকিতে পারি এবং দেহের সত্যকে তুচ্ছ বলিয়া বুঝিতে পারি।* জীবনের সমস্ত ঘটনাই সেই এক ব্রহ্মেরই অভিব্যক্তি এবং সেই এক ব্রহ্মের সহিত আমাদের একত্ব অনুভব করিবারই উপায়মাত্র বলিয়া উপলব্ধি করিতে পারি। কিন্তু তাই বলিয়া অর্জুনকে যুদ্ধ করিতে, কুরুক্ষেত্রের ভীষণ হত্যাকাণ্ড করিতে বলা হইল কেন? ইহার উত্তর এই যে, অর্জুনকে যে পথে চলিতে হইবে তাহাতে এই যুদ্ধকার্য সম্পাদন করাই আবশ্যক। তাঁহার স্বধর্ম, তাঁহার সামাজিক কর্তব্য পালন করিতে তাঁহাকে যুদ্ধ করিতেই হইবে। এই সংসার জড়জগতে ব্রহ্মেরই আত্মপ্রকাশ—ইহা শুধু আভ্যন্তরীণ ক্রমবিকাশেরই ব্যাপার নহে, এখানে জীবনের বাহ্য ঘটনাগুলিকেও উক্ত ক্রমবিকাশের সহায় বলিয়াই গ্রহণ করিতে হইবে। এই জন্য পরস্পরকে সাহায্যও করিতে হইবে; আবার পরস্পরের সহিত যুদ্ধও করিতে হইবে। এখানে নিশ্চিন্ত মনে শান্তির সহিত, সহজ সুখ ও সোয়াস্তির ভিতর দিয়া কেহই অগ্রসর হইতে পারে না—এখানে একটি পদ অগ্রসর হইতে হইলেও বীরের মত চেষ্টা করিতে হয়, বাধা-বিপত্তির সহিত যুদ্ধ করিতে হয়। যাহারা আভ্যন্তরীণ ও বাহ্য উভয়বিধ দ্বন্দ্বেই প্রবৃত্ত হয়—এমনকি বাহ্য দ্বন্দ্বের চরম *স্বরূপ যুদ্ধকার্যেও প্রবৃত্ত হয়*—তাহারাই ক্ষত্রিয়, তাহারাই বীরপুরুষ। যুদ্ধ, বল, উচ্চ-হৃদয়তা, সাহস তাহাদের স্বভাব; ন্যায়ের রক্ষা এবং যুদ্ধে অপরাঙ্মুখতা,

নিশ্চিত মবণ জানিয়াও পলায়ন না কবাই তাহাদেব ধর্ম, তাহাদেব কর্তব্য। কাবণ এই সংসাবে ধর্মেব সহিত অধর্মের, ন্যায়েব সহিত অন্যাযেব, আততায়ী ও অত্যাচাবীর সহিত রক্ষাকর্তাব দ্বন্দ্ব অনববত চলিতেছে এবং এই দ্বন্দ্ব পবিণামে যখন বাহ্য যুদ্ধে আসিযা দাঁডায় তখন যিনি ধর্মপক্ষেব নাযক হইযা ধর্মেব ধ্বজা ধবিযা দাঁডাইয়াছেন তাঁহাব ভীষণ ও কঠোব কর্তব্যের সম্মুখে কম্পিত হওযা চলিবেই না। যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁহাব অনুচব ও সঙ্গিগণকে পবিত্যাগ কবা, নিজপক্ষেব প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা কবা, যুদ্ধেব ভীষণতা ও নৃশংসতাব জন্য ক্ষুদ্র দৌর্বল্য, কার্পণ্যেব বশে ধর্ম ও ন্যাযেব ধ্বজা ধূল্যবলুণ্ঠিত হইতে দেওযা, আততাযীব রক্তমাখা পদে দলিত হইতে দেওয়া কিছুতেই চলিবে না। যুদ্ধ পবিত্যাগ নহে, যুদ্ধ কবাই তাঁহাব ধর্ম, তাঁহার কর্তব্য। হত্যা কবিলে নহে, হত্যা না করিলেই এখানে পাপ হইবে।

অর্জুন দুঃখ করিতেছিলেন যে মানুষ যাহাব জন্য, যেসকল উদ্দেশো জীবনধাবণ কবে, আত্মীয়-স্বজনের মৃত্যুতে সেসকল ব্যর্থ হইবে, তাঁহাব জীবন বাস্তবিক শূন্য হইয়া যাইবে। ভগবান ক্ষণিকের জন্য আব এক দিক দিযা এই দুঃখের উত্তব দিলেন। ক্ষত্রিয়জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য কি, প্রকৃত সুখ কি? নিজেব ও পরিবারবর্গের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য নহে, আত্মীযবন্ধু সহ আবাম ও শান্তিসুখময জীবনযাপন নহে—ক্ষত্রিযজীবনের প্রধান সুখ হইতেছে কোন মহৎ উদ্দেশ্য সাধনেব নিমিত্ত জীবন দেওয়া অথবা যুদ্ধ জয় কবিযা বীবেব মুকুট অর্জন কবা এবং বীরোচিত গৌরবের সহিত জীবনযাপন কবা। "ধর্মযুদ্ধ অপেক্ষা ক্ষত্রিয়ের আর কিছুতেই শ্রেয়ঃ নাই, স্বর্গেব মুক্ত দ্বাব স্বরূপ এইরূপ যুদ্ধ আপনা হইতেই যেসকল ক্ষত্রিযেব নিকট উপস্থিত হয় তাহাবাই সুখী। যদ্যপি তুমি এই ধর্মযুদ্ধ না কর তাহা হইলে তোমাব কর্তব্য, স্বধর্ম ও কীর্তি ত্যাগ কবা হইবে এবং তোমাব পাপ সঞ্চয় কবা হইবে। এইরূপ যুদ্ধ কবিতে অস্বীকৃত হইলে যাঁহারা তোমাব সম্মান কবিতেন, তোমাব বীবত্বেব ভূযসী প্রশংসা কবিতেন, তাঁহারা সকলে তোমাকে কাপুরুষ বলিযা ঘৃণা ও উপহাস কবিবেন।" ক্ষত্রিয-জীবনে ইহা অপেক্ষা বড দুঃখ আব কিছু নাই—ইহা অপেক্ষা মৃত্যুও অনেক শ্রেয়ঃ। যুদ্ধ, সাহস, শক্তি, প্রভুত্ব, বীবেব গৌরব, সম্মুখ যুদ্ধে মবিযা স্বর্গলাভ—ইহাই ক্ষত্রিয়ের আদর্শ। এই আদর্শকে ক্ষুণ্ণ করা, এই গৌববকে কলঙ্কিত কবা, বীরশ্রেষ্ঠের জীবনে এরূপ কাপুরুষতা ও দুর্বলতাব দৃষ্টান্ত দেখান এবং এইরূপে মানুষেব নৈতিক জীবনের আদর্শকে ছোট কবা—ইহাতে নিজেব অকল্যাণ কবা হয়, জগতেরও অকল্যাণ করা হয়। "যদি হত হও, স্বর্গে যাইবে, যদি জযী হও, পৃথিবী ভোগ করিবে—অতএব, হে কুন্তীপুত্র! যুদ্ধের নিমিত্ত কৃতনিশ্চয় হও, উঠ।"

পূর্বে যে সুখদুঃখে অবিচলিত থাকার কথা, ধীবতার কথা বলা হইযাছে এবং পবেও যে গভীরতব আধ্যাত্মিকতার কথা বলা হইবে, সেই দুইয়েব তুলনায

ভগবানেব এই বীবোচিত অভিভাষণ খুব নিম্নস্তরের বলিযাই মনে হয়। কারণ পবেব শ্লোকেই ভগবান অর্জুনকে আদেশ করিলেন—

সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ।
ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্স্যসি॥২।৩৮

—"সুখদুঃখ, লাভালাভ এবং জয়-পরাজয় তুল্য জ্ঞান করিয়া যুদ্ধার্থে উদ্‌যুক্ত হও, তাহা হইলে পাপ প্রাপ্ত হইবে না।" ইহাই গীতার প্রকৃত শিক্ষা। কিন্তু ভাবতেব ধর্মশাস্ত্র সকল সময়েই অধিকাবী ভেদ স্বীকার করিয়াছে—মানুষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন করিতে হইলে, ভিন্ন ভিন্ন স্তবেব জন্য, ভিন্ন ভিন্ন আদর্শ কার্যত আবশ্যক। ক্ষত্রিয়ের আদর্শ, চাবিবর্ণের আদর্শ—ভগবান ইহাব সামাজিক দিকটাই এইখানে বুঝাইয়াছেন—ইহাব ভিতবে যে গূঢ় আধ্যাত্মিক অর্থ আছে তাহা পবে দেখাইবেন। ভগবান বলিলেন, যদি তুমি সুখ-দুঃখেব হিসাব কবিযা, কর্মেব ফলাফল হিসাব কবিয়াই কর্ম করিতে চাও তাহা হইলে মোটের উপব তোমাব প্রতি ইহাই আমাব উত্তব—মরিলে স্বর্গে যাইবে, ইত্যাদি। আমি তোমাকে বুঝাইযাছি যে আত্মা ও জগৎ সম্বন্ধে উচ্চজ্ঞান কোন্ পথ দেখায়। এখন তোমাকে বুঝাইলাম যে তোমার সামাজিক কর্তব্য, তোমাব বর্ণের নৈতিক আদর্শ তোমাকে কি পথ দেখায—স্বধর্ম্মমপি চাবেক্ষ্য। তুমি যেদিক দিয়াই আলোচনা কব, ফল একই হইবে। কিন্তু, যদি তোমাব সামাজিক কর্তব্যে, তোমার বর্ণের ধর্মে তুমি তৃপ্ত না হও, যদি তোমাব মনে হয যে ইহা তোমাকে দুঃখে ফেলিবে, পাপে ফেলিবে তাহা হইলে তুমি আরও উচ্চ আদর্শ অবলম্বন কব, নিম্নে নামিও না। তোমাব ভিতব হইতে সমস্ত অহমিকা দূর করিয়া দাও, দুঃখ তুচ্ছ কর, লাভ অলাভ ও সমস্ত পার্থিব ফলাফল তুচ্ছ কব। তোমাকে কোন্ পক্ষ সমর্থন কবিতে হইবে, ভগবানেব আদেশে কোন্ কার্য সম্পাদন করিতে হইবে শুধু তাহাই দেখ—"নৈবং পাপমবাপ্স্যসি" তাহা হইলে পাপ প্রাপ্ত হইবে না। এইরূপে অর্জুনেব দুঃখেব যুক্তি, হত্যাবিমুখতাব যুক্তি, পাপবোধের যুক্তি, তাহার কর্মের অশুভ ফলেব যুক্তি—সকল যুক্তিবই তৎকালীন আর্যজাতিব শ্রেষ্ঠ জ্ঞান ও নৈতিক আদর্শ অনুসাবেই উত্তব দেওযা হইল।

ইহাই ক্ষত্রিযেব ধর্ম। এই ধর্ম বলে—"ভগবানকে জান, নিজেকে জান, মানুষকে সাহায্য কব। ধর্মকে, ন্যায়কে রক্ষা কর, ভয ও দুর্বলতা পরিহাব কবিযা অবিচলিতভাবে সংসাবে তোমাব যুদ্ধেব কার্য সম্পন্ন কর। তুমিই সেই অনন্ত অবিনাশী আত্মা, তোমার আত্মা অমবত্ব লাভেব পথেই সংসারে আসিয়াছে, জীবন মৃত্যু কিছু নয, দুঃখ বেদনা যন্ত্রণা কিছু নয়, কাবণ এই সকলকেই জয় করিতে হইবে, ইহাদেব উপবে উঠিতে হইবে। তোমাব নিজের সুখ, নিজেব লাভের দিকে তাকাইও না কিন্তু উপর দিকে এবং চাবিদিকে চাহিযা দেখ—উপরে ঐ যে উজ্জ্বল চূডাব দিকে তুমি উঠিতেছ ঐদিকে দৃষ্টি বাখ, তোমার চাবিদিকে এই যুদ্ধ ও

পরীক্ষার ক্ষেত্র, সংসারেব দিকে চাহিয়া দেখ কেমন সেখানে শুভ-অশুভ উন্নতি-অবনতি পরস্পরের সহিত নির্মমভাবে দ্বন্দ্ব করিতেছে। মানুষ তোমাকে সাহায্যেব জন্য ডাকিতেছে—বলিতেছে তুমি তাহাদের শক্তিমান পুরুষ, তুমি তাহাদেব সহায়, অতএব তাহাদিগকে সাহায্য কব, যুদ্ধ কব। যদি জগতেব উন্নতিব জন্যই ধ্বংসকার্য আবশ্যক হয তবে ধ্বংস কর—কিন্তু যাহাদিগকে ধ্বংস কবিবে তাহাদিগকে ঘৃণা করিও না, যাহাবা ধ্বংস হইবে তাহাদেব জন্য শোক কবিও না। সকলস্থানেই সেই এক সত্য বস্তুকে জানিও—জানিও সকল আত্মাই অমব এবং এই দেহ শুধু ধূলা। শান্তি, শক্তি, সমতাব সহিত তোমাব কার্য কব। যুদ্ধ কব, বীরের মত পতিত হও কিংবা বীবেব মত জয়লাভ কর। কাবণ, ভগবান এবং তোমার প্রকৃতি তোমাকে এই কার্যই করিতে দিযাছেন।

অষ্টম অধ্যায়

সাংখ্য ও যোগ

ভগবান অর্জুনেব সমস্যার এই প্রথম সংক্ষিপ্ত উত্তর সারিযা প্রথমেই সাংখ্য ও যোগেব প্রভেদ কবিলেন—

এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধির্যোগে ত্বিমাং শৃণু।
বুদ্ধযা যুক্তো যয়া পার্থ কর্ম্মবন্ধং প্রহাস্যসি॥২।৩৯

—"সাংখ্যে তোমাকে এই জ্ঞান কথিত হইয়াছে। এখন যোগে এই জ্ঞান কিরূপ তাহা শ্রবণ কব। হে পার্থ, এই জ্ঞানসহকারে যদি তুমি যোগে থাক তাহা হইলে তুমি কর্মবন্ধন ত্যাগ কবিতে পারিবে।"

যে পবমার্থদর্শন গীতাশাস্ত্রেব প্রকৃত প্রতিপাদ্য এই শ্লোকোক্ত প্রভেদে তাহার মূলসূত্র নিহিত বহিযাছে এবং গীতার্থ বুঝিতে হইলে এইরূপ প্রভেদ একান্ত প্রযোজন।

গীতা মূলত বৈদান্তিক গ্রন্থ। বেদান্তজ্ঞান সম্বন্ধে যে তিনটি গ্রন্থ প্রামাণ্য বলিয়া পবিচিত, গীতা তাহাব মধ্যে একটি। সত্যের উপব গীতা শিক্ষার ভিত্তি হইলেও—গীতা আপ্তবাক্য নহে, অর্থাৎ ঋষিগণেব যোগদৃষ্টিতে সত্য যেরূপ প্রতিভাত—গীতায় তাহা ঠিক সাক্ষাৎভাবে ব্যক্ত হয নাই, গীতার শিক্ষা বিচার, বুদ্ধি, তর্ক, যুক্তিব ভিতব দিযা ব্যাখ্যাত হইয়াছে। তথাপি, গীতার উপর লোকের এরূপ শ্রদ্ধা যে ইহা প্রায ত্রযোদশ উপনিষদ বলিযা গণ্য হয়। তবে গীতার বৈদান্তিক ভাবগুলি সর্বত্র বিশেষভাবে সাংখ্য ও যোগের ভাবে রঞ্জিত এবং এইরূপ সমন্বযই দর্শনশাস্ত্র হিসাবে গীতাব বিশেষত্ব। বাস্তবিক পক্ষে গীতায় প্রধানত যোগেবই ব্যবহাবিক প্রণালী শিক্ষা দেওয়া হইযাছে এবং কেবল এই ব্যবহাবিক প্রণালী বুঝাইবাব নিমিত্তই তত্ত্বকথার অবতাবণা করা হইয়াছে। গীতা শুধুই বৈদান্তিক জ্ঞান প্রচাব কবে নাই, কিন্তু, একদিকে যেমন জ্ঞানেই সমস্ত কর্মেব পবিসমাপ্তি কবিযাছে এবং ভক্তিকেই কর্মেব সাব ও প্রাণ বলিয়াছে তেমনি কর্মকেই আবাব জ্ঞান ও ভক্তির ভিত্তি করিযাছে। আবার গীতাব যোগ সাংখ্যের বিশ্লেষণমূলক জ্ঞানেব উপব প্রতিষ্ঠিত, সাংখ্য হইতেই ইহার আবম্ভ এবং বরাবব ইহাব অনেকটা মত ও পদ্ধতি সাংখ্যেবই অনুরূপ। তথাপি ইহা সাংখ্যকে অনেক দূব অতিক্রম কবিযা গিয়াছে, সাংখ্যের কোন কোন মূল কথা অস্বীকার কবিযাছে এবং এইরূপে সাংখ্যেব নিম্নস্তবেব বিশ্লেষণমূলক জ্ঞানেব সহিত উচ্চ ব্যাপক বৈদান্তিক সত্যেব সমন্বয কবিযাছে।

তাহা হইলে, গীতায যে সাংখ্য ও যোগেব কথা বলা হইযাছে, সেগুলি কি?

আমরা এখন সাংখ্য বলিতে ঈশ্বরকৃষ্ণের সাংখ্যকারিকা এবং যোগ বলিতে পতঞ্জলির যোগসূত্র বুঝি—কিন্তু গীতার সাংখ্য ও যোগ যে ইহাদের হইতে স্বতন্ত্র তাহাতে আমার কোন সন্দেহ নাই। কারিকার সাংখ্যমত যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে—অন্তত সাধারণত আমরা যেরূপ বুঝি, গীতার সাংখ্য সেরূপ নহে—কারণ গীতা কোথাও মুহূর্তের জন্যও সৃষ্টির মূল তত্ত্বস্বরূপ বহু পুরুষ স্বীকার করে না। প্রচলিত সাংখ্যের সম্পূর্ণভাবে বিপক্ষে গীতা জোরের সহিত বলিয়াছে যে আত্মা এবং পুরুষ এক, সেই একই ঈশ্বর ও পুরুষোত্তম, এবং ঈশ্বরই এই জগতের আদি কারণ। আধুনিক ভাষায় তফাত করিতে গেলে—প্রচলিত সাংখ্য নিরীশ্বরবাদী, কিন্তু, গীতার সাংখ্য ঈশ্বরবাদ (theism) সর্বেশ্বরবাদ (pantheism) এবং একত্ববাদের (monism) সূক্ষ্ম সমন্বয় সাধন করিয়াছে।

গীতায় যে যোগের কথা আছে তাহাও পতঞ্জলির যোগপ্রণালী নহে। কারণ, পতঞ্জলিতে খাঁটি রাজযোগেরই প্রণালী বিবৃত হইয়াছে—এই প্রণালীতে আভ্যন্তরীণ বৃত্তিসমূহকে সংযত করিবার বাঁধাধরা পদ্ধতি আছে, ইহাতে সুনির্দিষ্ট সীমাবদ্ধ উপায়সমূহের দ্বারা ক্রমশ চিত্তকে শান্ত করিয়া সমাধির অবস্থায় তুলিতে হয়; তাহাতে ঐহিক ও চিরন্তন উভয়বিধ ফললাভ হয়। ঐহিক ফল—জীবের জ্ঞান শক্তি বিশেষভাবে বর্ধিত হয়। চিরন্তন ফল—ভগবানের সহিত মিলন। কিন্তু গীতার যোগ উদার, নানামুখী, উহা বাঁধাধরা নিয়মপ্রণালীর ভিতর সীমাবদ্ধ নহে, উহার মধ্যে নানা বিষয়ের সমাবেশ আছে এবং তাহাদেরও পরস্পরের মধ্যে স্বাভাবিক সামঞ্জস্য রক্ষিত হইয়াছে, রাজযোগ ইহার একটি সামান্য অপ্রধান অংশ মাত্র। গীতার যোগে রাজযোগের মত কাটাছাঁটা বৈজ্ঞানিক স্তরবিভাগ নাই—উহা আত্মার সহজ স্বাভাবিক ক্রমবিকাশ প্রণালী। কি ভাবে আমরা কর্ম করিব এই সম্বন্ধে কয়েকটি নীতি অনুসরণ করিয়া—সমস্ত আধারের রূপান্তর সাধন করিতে হইবে—আধারের প্রত্যেক অঙ্গকে পুরাতন প্রাকৃত সত্তা ও সংস্কার (প্রকৃতির নীচের স্তরের খেলা বা প্রাকৃত জীবন) হইতে মুক্ত করিয়া অভিনব দিব্য ধর্মে গড়িয়া তুলিতে হইবে, অথবা প্রকৃতি ছাড়াইয়া উঠিয়া পরা প্রকৃতির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে—ইহাই গীতার যোগের লক্ষ্য। অতএব, পতঞ্জলিতে যে যৌগিক অবস্থার কথা বলা হইয়াছে—গীতার সমাধি তাহা অপেক্ষা স্বতন্ত্র। পতঞ্জলির মতে শুধু প্রথমাবস্থাতেই চিত্তশুদ্ধির জন্য এবং একাগ্রতা লাভের জন্যই কর্মের প্রয়োজনীয়তা। কিন্তু গীতা, কর্মকেই যোগের বিশেষ লক্ষণ পর্যন্ত বলিয়াছে। পতঞ্জলির মতে কর্ম শুধু যোগের উপক্রমণিকা—গীতার মতে কর্মই যোগের স্থায়ী ভিত্তি। রাজযোগানুসারে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলে কর্মকে বস্তুত পরিত্যাগই করিতে হয়, অন্তত শীঘ্রই যোগের উপায়স্বরূপ কর্মের কোন প্রয়োজনীয়তা থাকে না। গীতার মতে কর্মই সর্বোচ্চ অবস্থায় উঠিবার একটি উপায় এবং আত্মার সম্পূর্ণ মুক্তি হইবার পরও কর্ম থাকে।

এতটুকু বলা দরকার, কারণ সুপরিচিত কথাগুলি প্রচলিত পারিভাষিক অর্থে

ব্যবহার না করিয়া, ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করিলে ভাবার্থ বুঝিতে গোলমাল হওয়া সম্ভব। তবে, প্রচলিত সাংখ্য ও যোগদর্শনের মধ্যে যাহা কিছু উদার, সার্বজনীন, সার্বভৌমিক সত্য আছে গীতায় তাহা স্বীকৃত হইয়াছে—যদিও গীতা শুধু ইহাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে। উপনিষদের বৈদান্তিক সমন্বয়ে এবং পরবর্তী পুরাণে আমরা যে উদার বৈদান্তিক সাংখ্যমতের পরিচয় পাই, গীতার সাংখ্য তাহাই। প্রধানত অন্তর্মুখী সাধনার দ্বারা আভ্যন্তরীণ পরিবর্তন ঘটাইয়া আত্মার দর্শন ও ভগবানের সহিত মিলনের যে সাধনা তাহাই গীতার যোগ—রাজযোগ গীতার এই উদার সাধনার একটি বিশেষ পদ্ধতি মাত্র। গীতা স্পষ্টই বলিয়াছে যে সাংখ্য ও যোগ দুইটি বিভিন্ন, সামঞ্জস্যহীন, পরস্পরবিরোধী মতবাদ নহে—তাহাদের মূল নীতি ও লক্ষ্য এক। শুধু তাহাদের পদ্ধতি ও আরম্ভ বিভিন্ন। সাংখ্যও এক প্রকার যোগ—তবে ইহার আরম্ভ জ্ঞানে, অর্থাৎ সাংখ্য-মতে বুদ্ধির দ্বারা সৃষ্টিতত্ত্বসমূহ বিশ্লেষণ ও আলোচনা করিয়া আরম্ভ করিতে হয় এবং সত্যকে দর্শন করিয়া, লাভ করিয়া উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। অপরদিকে, যোগের আরম্ভ কর্মে, মূলত ইহা কর্মযোগ। তবে গীতার সমগ্র শিক্ষা হইতে এবং পরে কর্ম শব্দের যেরূপ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে তাহা হইতে বুঝা যায় যে কর্ম শব্দটি খুব বিস্তৃত অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে। আমার ভিতরে ও বাহিরে যেসকল ক্রিয়া হইতেছে সেসমস্ত সর্বকর্মের ঈশ্বরকে নিঃস্বার্থভাবে যজ্ঞরূপে উৎসর্গ করা, যজ্ঞ ও তপস্যা সকলের ভোক্তা ও প্রভু-স্বরূপ ভগবানের নিকট সমর্পণ করা—ইহাই যোগ। জ্ঞানের দ্বারা যে সত্য দেখা যায় তাহার সাধন করাই যোগ—এবং এই জ্ঞানের দ্বারা যাহাকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া জানা যায় তাহার প্রতি জ্ঞানসম্ভূত ভক্তি ও শান্ত বা আবেগপূর্ণ আত্মসমর্পণই ঐ সাধনের পরিচালকশক্তি।

কিন্তু, সাংখ্যের সত্য কি? তত্ত্বসমূহের বিশ্লেষণ ও সংখ্যা করিয়াছে বলিয়া এই দর্শনের নাম সাংখ্য দর্শন হইয়াছে। সাধারণত আমরা জগৎকে যেরূপ দেখি তাহা নানা তত্ত্বের সংযোগের ফল—সাংখ্য এই তত্ত্বগুলি বিশ্লেষণ করিয়া স্বতন্ত্রভাবে দেখাইয়াছে এবং তাহাদের গণনা করিয়াছে। সাংখ্য বিশ্লেষণ করিয়াছে বটে কিন্তু সমন্বয় করিতে মোটেই চেষ্টা করে না। মূলত সাংখ্য দ্বৈতবাদী। বৈদান্তিকদের মধ্যে যাঁহারা নিজদিগকে দ্বৈতবাদী বলেন, সেরূপ বিশিষ্ট দ্বৈতবাদ সাংখ্যের মত নহে। সাংখ্যের মত সম্পূর্ণভাবে দ্বৈত অর্থাৎ সাংখ্য সৃষ্টির মূলে একটি নহে, সম্পূর্ণ বিভিন্ন দুইটি তত্ত্ব স্বীকার করে—নিষ্ক্রিয় পুরুষ এবং ক্রিয়াশীলা প্রকৃতি। তাহাদের সংযোগেই জগতের উৎপত্তি। পুরুষই আত্মা, আত্মা বলিতে সাধারণত যাহা বুঝায় পুরুষ তাহা নহে—পুরুষ শুদ্ধ চৈতন্যময়, অচল, অবিকারী, স্বপ্রকাশ। শক্তি এবং তাহার ক্রিয়াই প্রকৃতি। পুরুষ কিছুই করে না—শুধু শক্তি এবং তাহার ক্রিয়া পুরুষে প্রতিফলিত হয়, প্রকৃতি বস্তুত জড় অচেতন হইলেও পুরুষে প্রতিফলিত হওয়ায় প্রকৃতিকে চেতন বলিয়া মনে হয়। এইরূপে সৃষ্টি, স্থিতি, লয়, জন্ম, জীবন ও মৃত্যু, চৈতন্য ও অচৈতন্য, ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান, বুদ্ধিলব্ধ জ্ঞান ও অজ্ঞান, কর্ম ও

অকর্ম, সুখ ও দুঃখ এই সকল ব্যাপারের উদ্ভব হয় এবং প্রকৃতির প্রভাবের অধীন পুরুষ এই সকলকে তাহার নিজের বলিয়া ধরে কিন্তু বাস্তবিক এই সকল মোটেই পুরুষের নহে, এই সব শুধু প্রকৃতিরই ক্রিয়া।

কারণ প্রকৃতি ত্রিগুণময়ী—প্রকৃতির শক্তি মূলত তিন প্রকার সত্ত্ব, জ্ঞানের বীজ—ইহা স্থিতি করে; রজঃ, তেজ ও কর্মের বীজ—ইহা সৃষ্টি করে, তমঃ, জড়তা ও অজ্ঞানের বীজ এবং সত্ত্ব ও রজের বিরোধী—সত্ত্ব ও রজঃ যাহা সৃষ্টি ও স্থিতি করে, তমঃ তাহা লয় সাধন করে। যখন প্রকৃতির এই তিনটি গুণ সমান বলে বলী হইয়া সাম্যাবস্থায় থাকে—তখন সব স্থির—তখন কোন গতি, ক্রিয়া বা সৃষ্টি থাকে না; অতএব তখন অবিকারী জ্যোতির্ময় চেতন আত্মায় প্রতিফলিত হইবার কিছু থাকে না। কিন্তু যখন এই সাম্যাবস্থা হইতে বিচ্যুতি ঘটে, তখন তিনটি গুণ অসমান হইয়া পরস্পরের সহিত বিরোধ করে এবং তখন অনবরত সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের ব্যাপার চলিতে থাকে—বিশ্বজগতের অভিব্যক্তি হয়। এই সকল ব্যাপারে পুরুষের সনাতন স্বরূপকে ঢাকিয়া রাখে। যতদিন পুরুষ ইহা চায় এবং নিজেকে প্রকৃতির গুণসম্পন্ন দেখে ততদিনই এইরূপ বিচ্যুতি থাকে, এই সকল ব্যাপার চলিতে থাকে। কিন্তু যখনই পুরুষ আর এসবে সম্মতি দেয় না—তখনই গুণত্রয় সাম্যাবস্থা লাভ করে, তখনই আত্মা তাহার সনাতন, অপরিণামী, অচল অবস্থায় ফিরিয়া আসে, আত্মার মুক্তি হয়। এইরূপে প্রকৃতির খেলা প্রতিবিম্বিত করা এবং সম্মতি দেওয়া বা না দেওয়া—শুধু এইটুকুই পুরুষের ক্ষমতা বলিয়া মনে হয়। সাংখ্যের পুরুষ শুধু প্রতিফলনের জন্য দেখিতে পারে এবং অনুমতি দিতে পারে—গীতার ভাষায় সাক্ষী ও অনুমন্তা—কিন্তু ঈশ্বররূপে কর্ম করে না। এমনকি পুরুষের যে অনুমতি দেওয়া বা অনুমতি প্রত্যাহার করা তাহাও ঠিক পুরুষের কার্য নহে—প্রকৃতিই করাইয়া লয়। বাহ্য বা আভ্যন্তরীণ কোন কর্মই পুরুষের নাই—তাহার কার্যকরী ইচ্ছা নাই, কার্যকরী বুদ্ধি নাই। অতএব শুধু পুরুষ একা এই জগতের কারণ হইতে পারে না—দ্বিতীয় কারণ দেখান আবশ্যক। জ্ঞান, ইচ্ছা ও আনন্দের আধার আত্মা একা এই জগতের কর্তা নহে—আত্মা ও প্রকৃতি, নিষ্ক্রিয় চৈতন্য এবং ক্রিয়াশীলা শক্তি এই যুগ্ম কারণ হইতেই জগতের উৎপত্তি। সাংখ্য এইভাবেই জগতের অস্তিত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছে।

কিন্তু তাহা হইলে আমরা যে চিন্তা করিতেছি, বিচার করিতেছি বলিয়া বুঝিতে পারি, সঙ্কল্প করিতেছি বলিয়া বুঝিতে পারি এসব কোথা হইতে হয়? এগুলি তো আমাদের জীবনের কম অংশ নহে। সাধারণত আমরা মনে করি এগুলি প্রকৃতির নহে, এগুলি পুরুষের। সাংখ্যমতানুসারে এই বিচার বুদ্ধি ও ইচ্ছা সম্পূর্ণভাবে জড়প্রকৃতিরই অংশ—এগুলি আত্মার গুণ নহে। সাংখ্য যে চতুর্বিংশতি তত্ত্বের দ্বারা জগতের ব্যাখ্যা করিয়াছে—এগুলি তাহার মধ্যে একটি তত্ত্ব—বুদ্ধি। ত্রিগুণময়ী প্রকৃতিই জগতের মূল উপাদান। সৃষ্টির পূর্বে জগৎ অব্যক্ত অবস্থায় থাকে। সৃষ্টিকালে অব্যক্ত প্রকৃতি হইতে ক্রমান্বয়ে জড়জগতের উপাদানস্বরূপ

পঞ্চ মহাভূতের আবির্ভাব হয়। এই পঞ্চ স্থূলভূত প্রাচীন শাস্ত্রে আকাশ, বায়ু, অগ্নি, অপ ও পৃথিবী এই সকল নামে অভিহিত। তবে আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে বর্তমানকালে জড়বিজ্ঞান উপাদান (elements) বলিতে যাহা বুঝে, এই পঞ্চভূত সেইরূপ উপাদান নহে—ইহারা জড়শক্তির পাঁচটি সূক্ষ্ম অবস্থা; এই স্থূল জড়জগতে ইহারা কোথাও খাঁটি অবস্থায় নাই। জগতের সমস্ত পদার্থই এই পাঁচটি সূক্ষ্ম অবস্থা বা উপাদানের সংমিশ্রণে গঠিত। আবার পাঁচটির প্রত্যেকটিই জড়শক্তির একটি সূক্ষ্ম গুণের আধার, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ। মন এই পাঁচ প্রকারেই বাহ্য জগতের বস্তু সকলকে গ্রহণ করে। অতএব, মূল প্রকৃতি হইতেই আবির্ভূত এই পঞ্চ মহাভূত এবং পাঁচটি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অবস্থা—এইগুলি হইতেই বাহ্যদৃশ্য জগৎ উদ্ভূত হইয়াছে।

অন্য ত্রয়োদশটি তত্ত্ব লইয়া অন্তর্জগৎ গঠিত—বুদ্ধি বা মহৎ, অহঙ্কার, মন এবং ইহার অধীনে দশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়। মন আদি ইন্দ্রিয়—মনই বাহ্যবস্তুসমূহ প্রত্যক্ষ করে, মনই তাহাদের উপর কার্য করে। কারণ, মনের অন্তর্মুখী ও বহির্মুখী দু'রকম ক্রিয়াই রহিয়াছে। মন প্রত্যক্ষের দ্বারা বাহ্য স্পর্শ গ্রহণ করিয়া জগৎ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করে এবং বাহ্য জগতের উপর ক্রিয়ার জন্য শরীর-যন্ত্রকে পরিচালিত করে। কিন্তু, মন বিশেষ বিশেষ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সাহায্যে প্রত্যক্ষলব্ধ জ্ঞানের, বিশেষ করে—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক যথাক্রমে রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস ও স্পর্শকে গ্রহণ করে। মন সেইরূপ বাক, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ এই পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয়ের সাহায্যে বিশেষ প্রয়োজনীয় শারীরিক ক্রিয়া করে। প্রকৃতির যে শক্তি বিচার করে, ভেদ সামঞ্জস্য নির্ণয় করে তাহারই নাম বুদ্ধি—ইহা একাধারে বোধশক্তি ও ইচ্ছাশক্তি। বুদ্ধির যে তত্ত্বের দ্বারা পুরুষ নিজেকে প্রকৃতির সহিত এক বলিয়া ধরিয়া লয়, প্রকৃতির কার্যাবলীকে নিজের কার্যাবলী বলিয়া মনে করে তাহারই নাম অহঙ্কার। কিন্তু, এই সকল (মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার) আভ্যন্তরিক তত্ত্ব (Subjective principles) নিজেরা জড়, অচেতন—বাহ্য জগতের কার্যাবলী যেরূপ অচেতন প্রাকৃতিক শক্তির অন্তর্গত, ইহারাও ঠিক সেইরূপ। বিচারবুদ্ধি ও ইচ্ছা (এই দুইকেই সাংখ্যে বুদ্ধি বলা হইয়াছে) কেমন করিয়া জড় অচেতনের ক্রিয়া হইতে পারে, নিজেরা জড় হইতে পারে ইহা বুঝিতে যদি আমাদের কষ্ট হয় তাহা হইলে আমাদের স্মরণ করা কর্তব্য যে বর্তমান বিজ্ঞানও (Science) এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছে। এমনকি পরমাণুর (Atom) জড়ক্রিয়াতে যে শক্তি রহিয়াছে তাহাকেও অচেতন ইচ্ছাশক্তি বলা যাইতে পারে এবং প্রাকৃতিক জগতের সমস্ত ঘটনায় ঐ সর্বব্যাপী ইচ্ছা অচেতনভাবেই বুদ্ধির কার্য করিতেছে। জড় জগতের সকল কার্যে যে ভেদাভেদ নির্ণয় অচেতনভাবে চলিতেছে—সেই ক্রিয়া এবং যাহাকে আমরা মানসিক বুদ্ধির ক্রিয়া বলি তাহা মূলত একই জিনিস। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছে যে সচেতন মন অচেতন জড়ের ক্রিয়ারই পরিণাম ফল।

কিন্তু জড় অচেতন কেমন করিয়া চেতনের মত হয় পাশ্চাত্য বিজ্ঞান তাহা ব্যাখ্যা করিতে পারে নাই, সাংখ্য তাহা ব্যাখ্যা করিয়াছে। পুরুষের ভিতর প্রকৃতি প্রতিবিম্বিত হওয়াতেই এরূপ হইয়া থাকে, আত্মার চৈতন্য জড়প্রকৃতির ক্রিয়ার উপর আরোপিত হয়। এইরূপে সাক্ষীস্বরূপ পুরুষ নিজেকে ভুলিয়া যায়—প্রকৃতির চিন্তা, অনুভূতি, ইচ্ছা, পুরুষের নিজের বলিয়া ভ্রম হয়। কিন্তু, বস্তুত এই সব চিন্তা, অনুভূতি, ইচ্ছা, ক্রিয়া, প্রকৃতি এবং তাহার তিন গুণের দ্বারাই সংঘটিত হয়—মোটেই পুরুষের দ্বারা নহে। এই ভ্রম হইতে পরিত্রাণ লাভই প্রকৃতি এবং তাহার কার্য হইতে পুরুষের মুক্তিলাভের প্রথম সোপান।

সংসারে অবশ্য অনেক জিনিস রহিয়াছে সাংখ্য যাহা আদৌ ব্যাখ্যা করে নাই অথবা সন্তোষজনকভাবে ব্যাখ্যা করে নাই। কিন্তু, আমরা যদি সৃষ্টিতত্ত্বের এমন যুক্তিযুক্ত কোন ব্যাখ্যা চাই যাহা অবলম্বন করিয়া বিশ্বপ্রকৃতির বন্ধন হইতে আত্মা মুক্তিলাভ করিতে পারে (এরূপ মুক্তিই প্রাচীন দর্শন শাস্ত্রসমূহের প্রধান উদ্দেশ্য) তাহা হইলে সাংখ্য যে ব্যাখ্যা দিয়াছে এবং মুক্তির যে পথ দেখাইয়া দিয়াছে তাহা অন্য কিছু হইতে কম সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। সাংখ্যের যেটা আমরা সহসা বুঝিয়া উঠিতে পারি না সেটা হইতেছে ইহার বহুপুরুষবাদ। মনে হয় এক পুরুষ এবং এক প্রকৃতি ধরিলেই সৃষ্টিতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতে পারা যায়। কিন্তু সাংখ্য বস্তুতত্ত্ব যেরূপভাবে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিয়াছে তাহাতে বহুপুরুষমত না আনিলে আর উপায় ছিল না। প্রথমত বাস্তবিক আমরা দেখি যে জগতে সচেতন জীব রহিয়াছে এবং প্রত্যেকেই জগৎকে আপন আপন ধারা অনুসারে অবলোকন করে—অন্তর্জগৎ ও বহির্জগৎ অন্যলোকের নিকট যেরূপ তাহার নিকট সেরূপ নহে—প্রত্যেকেই জগৎকে স্বতন্ত্রভাবে প্রত্যক্ষ করে, জগতের উপর স্বতন্ত্রভাবে কার্য করে। পুরুষ যদি একটি মাত্র হইত তাহা হইলে এই স্বাতন্ত্র্য ও প্রভেদ থাকিত না—সকলেই জগৎকে একভাবে দেখিত, সকলেরই নিকট অন্তর্জগৎ ও বহির্জগৎ একই রূপে প্রতিভাত হইত। সকলে এক জগৎই প্রত্যক্ষ করিতেছে—কারণ, প্রকৃতি এবং প্রকৃতির যে সকল তত্ত্ব লইয়া অন্তর্জগৎ ও বহির্জগৎ গঠিত সেগুলি সকলের পক্ষে সমান। কিন্তু জগৎকে লোকে যেরূপ দেখে, জগৎ সম্বন্ধে লোকের যেরূপ ধারণা, জগতের প্রতি লোকের যেরূপ ভাব—লোকের অনুভূতি ও কর্ম অসংখ্য রকমের। ("যদি পুরুষ বহু না হইয়া এক হইত, তবে একজন সুখী হইলে সকলে সুখী হইত, একজন দুঃখী হইলে সকলে দুঃখী হইত, একজনের মোহ হইলে সকলের মোহ হইত। যখন এরূপ হয় না তখন বহুপুরুষ সিদ্ধ হইতেছে"—তত্ত্বসমাসবৃত্তি) এই সকল ভেদ ও বিভিন্নতা অবলোকনকারীর, প্রাকৃতিক কার্যাবলীর নহে, কারণ প্রকৃতি এক। বহু পুরুষ বহু সাক্ষী বা দ্রষ্টা না মানিলে এই বৈচিত্র্য ও বিভিন্নতা ব্যাখ্যা করা অসম্ভব। বলিতে পারা যায় বটে জীবের অহংজ্ঞানই প্রত্যেককে প্রত্যেকের সহিত বিভিন্ন করিতেছে কিন্তু অহঙ্কার প্রকৃতির সাধারণ তত্ত্ব এবং ইহা বিভিন্ন হইবার কোন কারণ নাই।

কারণ শুধু অহঙ্কার পুরুষের এই ভ্রম করাইয়া দেয় যে সে প্রকৃতির সহিত এক ও অভিন্ন। যদি পুরুষ একমাত্র হয় তাহা হইলে সকল জীবই এক হইবে। তাহাদের বাহ্য আকার-প্রকার যতই বিভিন্ন হউক অহংজ্ঞানে সকলেই সমান হইবে, আত্মার দৃষ্টিতে, আত্মার বাহ্যজ্ঞানে কোন প্রভেদ থাকিবে না। প্রকৃতির মধ্যে যতই বৈচিত্র্য থাকুক পুরুষ যদি এক হয়, সাক্ষী যদি এক হয় তাহা হইলে জগৎ সম্বন্ধে ধারণাও একরূপ হইবে। যে প্রাচীন বৈদান্তিক জ্ঞান হইতে সাংখ্যের উৎপত্তি তাহা হইতে বিচ্যুত হওয়ায় খাঁটি সাংখ্য বহুপুরুষ স্বীকার করিতে ন্যায়ত (Logically) বাধ্য। এক পুরুষ এবং এক প্রকৃতির সঙ্গ হইতে জগতের সৃষ্টি স্থিতি লয় বুঝান যাইতে পারে কিন্তু জগতের জীবের মধ্যে এত প্রভেদ কিরূপে হয় তাহা বুঝান যায় না।

বহু পুরুষ স্বীকার না করায় আরও একটি বিষম বাধা আছে। অন্যান্য দর্শনের ন্যায় সাংখ্য-দর্শনেরও উদ্দেশ্য মুক্তি। আমরা, পূর্বেই বলিয়াছি যে প্রকৃতি পুরুষের আনন্দের জন্য যে সকল ক্রিয়া করিতেছে পুরুষ যখন তাহা হইতে তাহার অনুমতি প্রত্যাহার করিয়া লয় তখনই মোক্ষ লাভ হয় কিন্তু, বস্তুত ইহা কথা বলিবার একটা ধারা মাত্র। প্রকৃতপক্ষে পুরুষ নিষ্ক্রিয়—অনুমতি দেওয়া বা প্রত্যাহার করা কার্য কখনও পুরুষের হইতে পারে না—ইহা নিশ্চয় প্রকৃতিরই ক্রিয়া। বিবেচনা করিলেই বুঝা যায় যে এই অনুমতি দেওয়া বা প্রত্যাহার করা বুদ্ধিরই ক্রিয়া। বুদ্ধির সাহায্যেই মন প্রত্যক্ষ করে, বুদ্ধি প্রকৃতির ক্রিয়ার মধ্যে ভেদ ও সামঞ্জস্য বিচার করে, বুদ্ধি অহঙ্কারের সাহায্যে দ্রষ্টাকে প্রকৃতির প্রত্যক্ষ ও কার্যের সহিত এক করিয়া দেয়। ভেদ-বিচার করিতে করিতে বুদ্ধি এমন অবস্থায় উপনীত হয় যখন সে বুঝিতে পারে যে পুরুষ ও প্রকৃতির একত্ব ভ্রম। শেষে বুদ্ধি পুরুষ ও প্রকৃতিতে প্রভেদ করে এবং বুঝিতে পারে যে জগতের সমস্ত ব্যাপারই গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থার বিচ্যুতি মাত্র। তখন বুদ্ধি (at once intelligence and will) যে-মিথ্যার অবলম্বন হইয়াছিল তাহা পরিত্যাগ করে—তখন পুরুষ বন্ধনমুক্ত হয় এবং মন যে-জাগতিক লীলায় রস পায় তাহার সহিত পুরুষ আর নিজেকে যোগ করে না। পরিণামফল এই হইবে যে প্রকৃতি পুরুষের ভিতর নিজেকে প্রতিফলিত করিবার শক্তি হারাইয়া ফেলিবে, কারণ, অহঙ্কারের ক্রিয়া নষ্ট হইয়া যাইবে এবং বুদ্ধি উদাসীন হইয়া আর প্রকৃতির কার্যের অনুমতির সহায় হইবে না; কাজেই, তাহার গুণত্রয় সাম্যাবস্থায় পড়িতে বাধ্য হইবে, জাগতিক লীলা বন্ধ হইবে, পুরুষ তাহার অচল শান্তিতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইবে। কিন্তু, যদি শুধু একটি পুরুষই থাকিত এবং এইরূপে বুদ্ধি নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া উদাসীন হইয়া পড়িত তাহা হইলে সমস্ত জগৎ শেষ হইত। আমরা দেখিতেছি যে এরূপ কিছুই হয় না। কোটি কোটি লোকের মধ্যে কয়েকজন মাত্র মুক্তিলাভ করেন বা মুক্তি-পথের পথিক হন—তাহাতে অবশিষ্টদের কোনরূপ ব্যতিক্রম হয় না, এবং এইরূপ প্রত্যাখ্যানে বিশ্বলীলার যে শেষ হইবার কথা তাহা দূরে থাকুক তাহাদের সহিত লীলা করিতে বিশ্বপ্রকৃতির এতটুকুও অসুবিধা হয় না। বহু স্বতন্ত্র পুরুষ মানিয়া না লইলে ইহা

ব্যাখ্যা করা যায না। বৈদান্তিক অদ্বৈত মতানুসাবে ইহাব একমাত্র ন্যাযসঙ্গত ব্যাখ্যা হইতেছে মায়াবাদ, কিন্তু এই মতানুসাবে সমস্তই স্বপ্ন—বন্ধন ও মুক্তি দুই-ই মিথ্যা, মায়াব ভ্রম, বস্তুত, কেহই মুক্ত হয না, কেহই বদ্ধ হয না। সাংখ্য জগৎকে এইরূপে সম্পূর্ণ মিথ্যা বলিয়া উডাইযা দিতে চায না—তাই সাংখ্য বেদান্তেব এই ব্যাখ্যা স্বীকাব কবে না। এখানেও আমবা দেখিতেছি যে সাংখ্য যেরূপে সৃষ্টিতত্ত্ব বিশ্লেষণ করিযাছে তাহাতে বহুপুরুষ স্বীকাব না কবিযা আব তাহার উপায় নাই।

সাংখ্যেব এই বিশ্লেষণ লইযাই গীতাব আরম্ভ, এমনকি গীতা যেভাবে যোগেব বর্ণনা কবিযাছে তাহাতে মনে হয় গীতা প্রায় সম্পূর্ণভাবেই ইহা স্বীকাব কবিযাছে। প্রকৃতি, তাহার তিনগুণ এবং চতুর্বিংশতি তত্ত্ব গীতা স্বীকাব কবিযাছে। সমস্ত ক্রিযাই প্রকৃতিব—পুরুষ নিষ্ক্রিয, গীতা ইহাও মানিযা লইযাছে। গীতা স্বীকাব কবিয়াছে যে জগতে বহু চেতন জীব আছে, অহঙ্কাবেব নাশ, বুদ্ধিব ভেদক্রিযা এবং প্রকৃতির গুণত্রযেব অতীত হইয়াই যে মুক্তিব উপায তাহা গীতা স্বীকাব করিয়াছে। অর্জুনকে প্রথম হইতেই যে যোগ অভ্যাস কবিতে বলা হইযাছে তাহা হইতেছে বুদ্ধিযোগ। কিন্তু একটি বিষয়ে গুরুতব তফাত বহিযাছে—গীতাব মতে পুরুষ এক, পুরুষ বহু নহে। কারণ গীতা যে লিখিযাছে আত্মা মুক্ত, চেতন, অচল, সনাতন, অক্ষর—তাহা শুধু একটি কথা ছাড়া সাংখ্যেব সনাতন, নিষ্ক্রিয, অচল, অক্ষর পুরুষেব বৈদান্তিক বর্ণনা। কিন্তু, সর্বশ্রেষ্ঠ তফাত এই যে পুরুষ বহু নহে, পুরুষ এক। সাংখ্য বহু পুরুষ স্বীকাব কবিযা যে সকল সমস্যাব সমাধান করিযাছে—ইহাতে আবাব সেই সকল সমস্যা উঠে এবং তাহাদেব আব একটা সম্পূর্ণ বিভিন্ন সমাধান প্রযোজন হয। গীতা বৈদান্তিক সাংখ্যেব সহিত বৈদান্তিক যোগ মিলাইয়া সে সমাধান কবিযাছে।

পুরুষ সম্বন্ধে ধাবণাতেই প্রথম নূতনত্ব। পুরুষেব সুখেব জন্য প্রকৃতি কার্য করে; কিন্তু, এই সুখ নির্ধাবিত হয কেমন করিয়া? খাঁটি সাংখ্যেব মতে নিষ্ক্রিয সাক্ষীর উদাসীন অনুমতির দ্বাবাই ইহা নির্ধারিত হয়। সাক্ষী উদাসীনভাবেই অহঙ্কার ও বুদ্ধিব ক্রিযায সায দেয়, আবাব সেইরূপ উদাসীনভাবেই অহঙ্কাব হইতে বুদ্ধির প্রত্যাহারেও সায দেয়। সে দেখে, অনুমতি দেয এবং প্রতিফলনেব দ্বারা প্রকৃতিব কার্য ধবিযা থাকে—সাক্ষী, অনুমন্তা, ভর্তা কিন্তু আব অধিক কিছু নহে। কিন্তু, গীতাব পুরুষ প্রকৃতিব অধিপতিও বটে—সে ঈশ্বব। বুদ্ধি ও ইচ্ছাশক্তি প্রকৃতিব ক্রিয়া হইলেও ইচ্ছাব উৎপত্তি ও শক্তি চেতন আত্মা হইতেই—তিনিই প্রকৃতিব প্রভু। ইচ্ছাব বুদ্ধির কার্য প্রকৃতিব হইলেও—পুরুষই এই বুদ্ধির উৎপত্তিস্থান—পুরুষই সক্রিয়ভাবে এই বুদ্ধিব আলোক জোগাইযা দেন। তিনি—শুধু সাক্ষী নহেন, তিনি জ্ঞাতা ও ঈশ্বব—তিনি জ্ঞান ও ইচ্ছাশক্তিব অধিপতি। তিনিই প্রকৃতির ক্রিযাব চবম কারণ, প্রকৃতিব কার্য হইতে সংহবণেবও তিনি চবম কাবণ। সাংখ্যের বিশ্লেষণ অনুসারে পুরুষ এবং প্রকৃতি দুই বিভিন্ন—

উভযেব সংযোগে এই জগৎ উদ্ভূত হইয়াছে, গীতার সমন্বযকারী সাংখ্য অনুসারে পুরুষ তাঁহাব প্রকৃতির সহাযে এই জগৎ উৎপন্ন কবিয়াছেন। এখন আমরা স্পষ্ট বুঝিলাম যে গীতা প্রাচীন সাংখ্যেব সঙ্কীর্ণতা হইতে কতদূর অগ্রসব হইয়াছে।

কিন্তু, তাহা হইলে গীতা যে অক্ষর, অচল, চিরমুক্ত এক আত্মার কথা বলিযাছে সে সম্বন্ধে কি? সে আত্মা অবিকার্য, অজ, অব্যক্ত, ব্রহ্ম—অথচ তিনিই এই সকল ব্যাপিযা আছেন যেন সর্বমিদং ততম্। তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে ইহাব সত্তাব মধ্যেই ঈশ্ববত্ব রহিয়াছে; তিনি অচল হইলেও তিনিই সমস্ত কর্ম ও গতিব কাবণ ও অধীশ্বব। কিন্তু ইহা কেমন কবিয়া হয? জগতে যে বহু জীব বহিযাছে তাহারই বা কি? তাহাদিগকে তো ঈশ্বব বলিয়া মনে হয না—ববং বিশেষ ভাবে তাহাবা ঈশ্বব নয, অনীশ—কারণ তাহাবা গুণত্রযেব অধীন, অহঙ্কাবেব ভ্রমেব অধীন। গীতা যে বলিতেছে তাহাবা সকলেই এক আত্মা তাহা হইলে এই বন্ধন, এই অধীনতা ও ভ্রম কেমন করিয়া আসিল—পুরুষকে সম্পূর্ণভাবে নিষ্ক্রিয ও উদাসীন না বলিলে কেমন করিযা ইহার ব্যাখ্যা হইতে পারে? আব এই বহুত্বই বা কোথা হইতে? এক শরীব ও মনেব ভিতর এক আত্মা মুক্তিলাভ কবিতেছে অথচ সেই এক আত্মাই অন্য শরীর ও মনের ভিতর মুক্তিলাভ করিতেছে না, নিজেকে বদ্ধ বলিয়া ভ্রম করিতেছে ইহাই বা কেমন কবিযা হয? এই সকল প্রশ্নেব একটা উত্তব না দিলে চলে না।

গীতা পবে পুরুষ ও প্রকৃতিব সম্বন্ধ বিশ্লেষণ কবিয়া এই সকল প্রশ্নের সমাধান কবিযাছে, তবে সেখানে এমন সব নূতন তথ্যের অবতাবণা করা হইয়াছে যাহা বৈদান্তিক যোগেব অন্তর্ভুক্ত—প্রচলিত সাংখ্যের সহিত তাহাদের কোন সম্পর্ক নাই। গীতা তিনটি পুরুষের কথা অথবা তিনটি অবস্থার কথা বলিযাছে। উপনিষদ সাংখ্যতত্ত্ব বর্ণনা কবিবাব সময় কোথাও কোথাও কেবল দুইটি পুরুষের কথা বলিয়াছে বলিযা মনে হয। উপনিষদেব এক শ্লোকে আছে—এক ত্রিবর্ণের অজা আছে, ত্রিগুণময়ী স্ত্রীধর্মী প্রকৃতি, ইহা সকল সময়েই সৃষ্টি কবিতেছে; দুইটি অজ পুরুষ আছে, ইহাদের মধ্যে একজন প্রকৃতিকে ধরিয়া ভোগ কবিতেছে, আর একজন তাহাকে সম্পূর্ণরূপে ভোগ কবিযা লইযা ছাডিযা দিয়াছে। আর এক শ্লোকে তাহাদিগকে এক বৃক্ষোপবি দুইটি পক্ষী বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, উভয়ে একত্র বদ্ধ চিরসঙ্গী। তাহাদেব মধ্যে একজন বৃক্ষের ফল খাইতেছে—প্রকৃতিস্থ পুরুষ প্রকৃতিব লীলা উপভোগ করিতেছে; অপবটি খাইতেছে না, কিন্তু তাহার সঙ্গীকে দেখিতেছে—সে নীবব দ্রষ্টা, ভোগেব মধ্যে লিপ্ত নহে। প্রথমটি যখন দ্বিতীযকে দেখে এবং বুঝিতে পাবে যে সকল মহত্ত্ব তাহারই তখন সে দুঃখ হইতে মুক্ত হয। উক্ত দুইটি শ্লোকেব উদ্দেশ্য বিভিন্ন, কিন্তু ইহাদেব মধ্যে একটি সাধাবণ অর্থ নিহিত বহিযাছে। দুইটি পক্ষীব মধ্যে একটি চিরকাল নীবব, মুক্ত আত্মা অথবা পুরুষ যাহাব দ্বাবা এই সমগ্র জগৎ ব্যাপ্ত হইযা রহিয়াছে—তিনি তৎকর্তৃক ব্যাপ্ত এই জগৎকে দেখিতেছেন কিন্তু, তাহাতে লিপ্ত হইতেছেন না, অপবটি

প্রকৃতির মধ্যে বদ্ধ পুরুষ। প্রথম শ্লোকটি হইতে বুঝা যায় যে দুইটি পুরুষই এক—একই চেতন জীবের দুইটি ভিন্ন অবস্থা—বদ্ধ অবস্থা ও মুক্ত অবস্থা—কারণ, শ্লোকোক্ত অজ পুরুষ প্রকৃতির মধ্যে নামিয়া তাহাকে উপভোগ করিয়াছেন এবং তাহার পর তাহাকে ছাড়িয়া দিয়াছেন। দ্বিতীয় শ্লোকটি হইতে যাহা বুঝা যায়—প্রথম শ্লোকে তাহা পাওয়া যায় না, দ্বিতীয় শ্লোকটি বুঝায় যে একই আত্মার উচ্চ ও নীচ দুই অবস্থা—উচ্চ অবস্থায় ইহা চিরকাল মুক্ত, নিষ্ক্রিয়, নির্লিপ্ত, কিন্তু, নিম্ন অবস্থায় ইহা প্রকৃতির মধ্যে বহু জীবরূপে অবতীর্ণ হয় এবং বিশেষ বিশেষ জীবে প্রকৃতির লীলায় বিরক্ত হইয়া সেই উচ্চ অবস্থায় ফিরিয়া যায়। একই সচেতন আত্মার এইরূপ দ্বৈত অবস্থা কল্পনা করিলে সমাধানের একটা পথ হয় বটে, কিন্তু এক কি করিয়া বহু হয় তাহা বুঝা যায় না।

উপনিষদের[১] অন্যান্য শ্লোকের মর্ম গ্রহণ করিয়া গীতা এই দুইটির উপর আর একটি যোগ করিয়াছে—তাহা হইতেছে পুরুষোত্তম, সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ—নিখিল বিশ্ব তাঁহারই মহিমা। তাহা হইলে তিনটি হইল—ক্ষর, অক্ষর, উত্তম। ক্ষর হইতেছে সচল, পরিণামী—ক্ষর স্বভাব (স্ব-ব্রহ্ম, ভাব-উৎপত্তি, ব্রহ্মই অংশরূপে যে জীব হন তাহাকেই স্বভাব বলে)—আত্মার সেই বহুভূত, বহু জীবরূপে যে পরিণাম তাহাকেই ক্ষর বলা হইয়াছে। এই পুরুষ বহু, এখানে পুরুষ ভগবানের বহুরূপ। এই পুরুষ প্রকৃতি হইতে স্বতন্ত্র নহে—ইহা প্রকৃতিস্থ পুরুষ। অক্ষর হইতেছে অচল, অপরিণামী—নীরব নিষ্ক্রিয় পুরুষ—ইহা ভগবানের একরূপ, প্রকৃতির সাক্ষী, কিন্তু ইহা প্রকৃতির কার্যে বদ্ধ নহে, ইহা নিষ্ক্রিয় পুরুষ—প্রকৃতি এবং তাহার কার্য হইতে এই পুরুষ মুক্ত। পরমেশ্বর, পরব্রহ্ম, পরমপুরুষই উত্তম—উল্লিখিত পরিণামী বহুত্ব এবং অপরিণামী একত্ব এই দুইই উত্তমের। তাঁহার প্রকৃতির, তাঁহার শক্তির বিরাট ক্রিয়ার বলে তাঁহার ইচ্ছা ও প্রভাবের বশেই তিনি নিজেকে সংসারে ব্যক্ত করিয়াছেন, আবার আরও মহান্ নীরবতা ও অচলতার দ্বারা তিনি নিজেকে স্বতন্ত্র, নির্লিপ্ত রাখিয়াছেন, তথাপি তিনি পুরুষোত্তমরূপে প্রকৃতি হইতে স্বতন্ত্রতা এবং প্রকৃতিতে লিপ্ততা এই দুইয়েরই উপরে। পুরুষোত্তম সম্বন্ধে এইরূপ ধারণা উপনিষদে প্রায়ই সূচিত হইলেও—গীতাতেই ইহা প্রথমে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হইয়াছে এবং তাহার পর হইতে ভারতীয় ধর্মচিন্তার উপর এই ধারণা বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। যে সর্বোত্তম ভক্তিযোগ অদ্বৈতবাদের কঠিন নিগড় ছাড়াইয়া যাইতে চায় ইহাই (অর্থাৎ পুরুষোত্তম সম্বন্ধে এইরূপ ধারণাই) তাহার ভিত্তি। ভক্তিরসাত্মক পুরাণসমূহের মূলে এই পুরুষোত্তমবাদ নিহিত রহিয়াছে।

গীতা শুধু সাংখ্যকৃত প্রকৃতির বিশ্লেষণে সীমাবদ্ধ থাকিতে সন্তুষ্ট নহে—কারণ

[১] পুরুষ .অক্ষরাৎ ..পরাৎপরঃ—যদিও অক্ষর পরমপুরুষ তথাপি তাহা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ এক পরম পুরুষ আছে, উপনিষদ বলিতেছে।

এই বিশ্লেষণে অহঙ্কারের স্থান আছে বটে কিন্তু বহু (multiple) পুরুষের স্থান নাই। সাংখ্যে বহুপুরুষ প্রকৃতি হইতে স্বতন্ত্র, প্রকৃতির অন্তর্গত নহে। গীতা সাংখ্যমতের বিরুদ্ধে বলে যে ঈশ্বর স্বীয় প্রকৃতির দ্বারা জীব হইয়াছেন। কিন্তু ইহা কেমন করিয়া হইতে পারে? বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে তো মোট চতুর্বিংশতিটি তত্ত্ব রহিয়াছে? গীতায় ভগবান যাহা উত্তর দিয়াছেন তাহার সারমর্ম এই—"হ্যাঁ, সাংখ্য যেরূপ বর্ণনা করিয়াছে ত্রিগুণময়ী বিশ্বপ্রকৃতির দৃশ্য (apparent) কার্যাবলী ঠিকই সেইরূপ বটে, সাংখ্য পুরুষ ও প্রকৃতির যে সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়াছে তাহাও ঠিক এবং বন্ধনমুক্তি ও প্রত্যাহারের জন্য কার্যত এই সাংখ্যজ্ঞানের বিশেষ উপযোগিতা আছে। কিন্তু ইহা শুধু নিম্ন অপরা প্রকৃতি—ইহা ত্রিগুণময়ী, অচেতন, দৃশ্য। ইহা অপেক্ষা উচ্চ প্রকৃতি আছে—ইহা পরা, চেতন, দৈবী প্রকৃতি এবং এই পরা প্রকৃতিই জীব (individual soul) হইয়াছে। নিম্ন প্রকৃতিতে প্রত্যেকেই অহংভাবে প্রতিভাত, উচ্চ প্রকৃতিতে তিনি এক পুরুষ। অন্য কথায় বহুত্ব সেই একেরই আধ্যাত্মিক প্রকৃতির অন্তর্গত। আমিই এই জীবাত্মা, সৃষ্টিতে ইহা আমার আংশিক প্রকাশ, মমৈবাংশ—আমার সমস্ত শক্তি ইহাতে আছে। ইহা—উপদ্রষ্টা, অনুমন্তা, ভর্তা, জ্ঞাতা, ঈশ্বর। ইহা নিম্ন প্রকৃতিতে অবতীর্ণ হইয়া নিজেকে কর্মের দ্বারা বদ্ধ মনে করে এবং এইরূপে নিম্নস্তরের জীবন উপভোগ করে। ইহা প্রত্যাবৃত্ত হইতে পারে এবং নিজেকে সমস্ত কর্ম হইতে মুক্ত নিষ্ক্রিয় পুরুষ বলিয়া জানিতে পারে। ইহা গুণত্রয়ের উপর উঠিতে পারে এবং কর্মের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়াও ইহার কর্ম থাকিতে পারে—আমিও এইরূপই করিয়া থাকি। ইহা পুরুষোত্তমকে ভক্তি করিয়া এবং তাঁহার সহিত যুক্ত হইয়া তাঁহার দৈবী প্রকৃতি উপভোগ করিতে পারে।"

ইহাই গীতার বিশ্লেষণ। ইহা শুধু বাহ্য বিশ্বলীলায় সীমাবদ্ধ নহে, ইহা বিজ্ঞানময়ী প্রকৃতির (Superconscious Nature) উত্তম রহস্যের ভিতর প্রবেশ করিয়া বেদান্ত, সাংখ্য এবং যোগ—জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি এই তিনের সমন্বয়ের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছে। শুধু খাঁটি সাংখ্যের মতে কর্ম ও মোক্ষ পরস্পর-বিরোধী এবং ইহাদের যোগ অসম্ভব। খাঁটি অদ্বৈতবাদ অনুসারে পরার যোগের অঙ্গরূপে কর্ম থাকিতে পারে না এবং পূর্ণ জ্ঞান, মোক্ষ ও মিলনের পর ভক্তি থাকিতে পারে না। গীতার সাংখ্যজ্ঞান এবং গীতার যোগপ্রণালী এই সকল বাধা অতিক্রম করিয়াছে।

সাধারণের ধারণা এই যে, সাংখ্যদের ও যোগীদের প্রণালীদ্বয় বিভিন্ন, এমনকি পরস্পর-বিরোধী। ব্যাপক বৈদান্তিক সত্যের কাঠামোর মধ্যে এই দুই দৃশ্যত বিরোধী প্রণালী বা নিষ্ঠার সমন্বয় করাই গীতার প্রথম ছয় অধ্যায়ের উদ্দেশ্য। সাংখ্যকেই আরম্ভ ও ভিত্তি করা হইয়াছে, কিন্তু প্রথম হইতেই ইহা যোগের ভাবে অনুপ্রাণিত এবং ক্রমশ যোগের ভাব ও প্রণালীর উপরই অধিক ঝোঁক দেওয়া হইয়াছে। তৎকালে লোকের মনে এই দুই প্রণালীর মধ্যে কার্যত যে প্রভেদ ছিল

তাহা এই—সাংখ্যের পথ জ্ঞানের পথ, বুদ্ধিযোগের পথ, যোগের পথ কর্মের পথ, কর্মানুগামী বুদ্ধির রূপান্তরের পথ। এই প্রভেদ হইতেই আর একটি দ্বিতীয় প্রভেদ আপনা হইতে আসে—সাংখ্য লোককে সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়তা ও কর্মত্যাগের দিকে, সন্ন্যাসের দিকে লইয়া যায়, যোগের মতে ভিতরে বাসনা পরিত্যাগ করিতে হইবে, কর্মের আভ্যন্তরীণ তত্ত্বের সংশোধন করিতে হইবে—কর্মকে ঈশ্বরাভিমুখী করিতে হইবে—দেবজীবন লাভ ও মুক্তিলাভই কর্মের উদ্দেশ্য করিতে হইবে—তাহা হইলেই যোগের মতে যথেষ্ট হইবে। অথচ, দুই প্রণালীর উদ্দেশ্য, লক্ষ্য এক—পুনর্জন্ম ও সংসার অতিক্রম করা এবং জীবাত্মার সহিত পরমের মিলন। অন্ততপক্ষে গীতা এইরূপ প্রভেদই বুঝাইয়াছে।

এই দ্বিবিধ বিরোধী নিষ্ঠার সমন্বয় কি করিয়া সম্ভব তাহা বুঝিতে অর্জুনের কষ্ট হইবার কারণ এই যে তৎকালে সাধারণত এই দুইটির মধ্যে বিশেষ তফাত করা হইত। ভগবান কর্ম ও বুদ্ধিযোগের সমন্বয় লইয়াই আরম্ভ করিলেন। তিনি বলিলেন যে বুদ্ধিযোগ অপেক্ষা কেবল কর্ম অত্যন্ত অপকৃষ্ট—দূরেণ হ্যবরং কর্ম্ম। বুদ্ধিযোগ ও জ্ঞানের দ্বারা মানুষকে সাধারণ মনোভাব এবং বাসনা হইতে মুক্ত করিয়া সকল বাসনাশূন্য ব্রাহ্মীস্থিতির পবিত্রতা ও সমত্বের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে—তবেই কর্ম গ্রাহ্য হইবে। কর্ম মুক্তির উপায়, তবে সে কর্ম এরূপ জ্ঞানের দ্বারা শুদ্ধ হওয়া চাই। অর্জুন তৎকালপ্রচলিত শিক্ষার প্রভাবে প্রভাবিত। ভগবান বৈদান্তিক সাংখ্যের উপযোগী তত্ত্বসমূহের উপর বিশেষ ঝোঁক দিতে লাগিলেন—ইন্দ্রিয়জয়, মনোগত সর্ববিধ বিষয়াভিলাষ পরিত্যাগ করিয়া আত্মারাম হইয়া, নীচ প্রকৃতি হইতে মুক্তিলাভ করিয়া উচ্চ প্রকৃতিতে প্রতিষ্ঠিত হওয়া, এই সকল কথাই বিশেষভাবে বলিতে লাগিলেন—যোগের কথা অতি সামান্য ভাবেই বলিলেন। অর্জুনের বিষম সংশয় উপস্থিত হইল এবং তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—

জ্যায়সী চেৎ কর্ম্মণস্তে মতা বুদ্ধির্জনার্দ্দন।
তৎ কিং কর্ম্মণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সি কেশব॥
ব্যামিশ্রেণেব বাক্যেন বুদ্ধিং মোহয়সীব মে।
তদেকং বদ নিশ্চিত্য যেন শ্রেয়োঽহমাপ্নুয়াম্॥৩।১-২

—"হে জনার্দন, হে কেশব, যদি কর্ম অপেক্ষা বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ ইহাই তোমার অভিমত, তবে কেন হিংসাত্মক কর্মে আমায় নিযুক্ত করিতেছ? কখনও কর্ম-প্রশংসা কখনও জ্ঞান-প্রশংসা এইরূপ বিমিশ্র বাক্যে আমার বুদ্ধিকে কেন মোহিত করিতেছ, এই দুইটির যেটি ভাল তাহা নিশ্চয় করিয়া বল, যাহাতে আমি শ্রেয়োলাভ করিতে পারি।"

উত্তরে কৃষ্ণ বলিলেন যে জ্ঞান ও সন্ন্যাস সাংখ্যের পথ, কর্ম যোগের পথ।

লোকেঽস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ।
জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্ম্মযোগেন যোগিনাম্॥৩।৩

কিন্তু, কর্মযোগের সাধন ব্যতীত প্রকৃত সন্ন্যাস অসম্ভব—ভগবানের উদ্দেশ্যে যজ্ঞরূপে কর্ম করিতে হইবে, লাভালাভ জয়পরাজয় সমান জ্ঞান করিয়া ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য হইয়া কর্ম করিতে হইবে, প্রকৃতিই কর্ম করিতেছে আত্মা কিছুই করিতেছে না, ইহা উপলব্ধি করিতে হইবে—তাহা না হইলে প্রকৃত সন্ন্যাস সম্ভব হইবে না। কিন্তু, পরক্ষণেই ভগবান বলিলেন যে—জ্ঞান-যজ্ঞই শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানেই সমস্ত কর্মের পরিসমাপ্তি, জ্ঞানরূপ অগ্নি সমুদয় কর্মকে ভস্মীভূত করিয়া থাকে; অতএব, যে ব্যক্তি আত্মজ্ঞান লাভ করিয়াছেন যোগের দ্বারাই তাঁহার কর্ম সংন্যস্ত হয় এবং এতাদৃশ আত্মবান্ ব্যক্তিকে কর্ম সকল আবদ্ধ করিতে পারে না।

যোগসংন্যস্তকর্ম্মাণং জ্ঞানসংছিন্নসংশয়ম্।
আত্মবন্তং ন কর্ম্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয়॥৪।৪১

আবার অর্জুনের গোলমাল লাগিল। বাসনাহীন কর্ম হইতেছে যোগের মূল কথা, এবং কর্মসন্ন্যাস বা ত্যাগ হইতেছে সাংখ্যের মূল কথা। এই দুইটিকেই পাশাপাশি রাখা হইয়াছে যেন তাহারা একই সাধনার অঙ্গ, কিন্তু, উভয়ের মধ্যে কোন সামঞ্জস্য বুঝিতে পারা যাইতেছে না। ভগবান ইতিপূর্বে যে সামঞ্জস্য করিয়াছেন তাহা এই যে, বাহ্য কর্মশূন্যতার মধ্যেও বুঝিতে হইবে যে কর্ম চলিতেছে, আবার আত্মা যেখানে নিজেকে কর্মী ভাবার ভ্রম বুঝিতে পারে এবং সকল কর্ম যজ্ঞেশ্বরে অর্পণ করে সেখানে বাহ্য কর্মপরায়ণতাতেও প্রকৃত নৈষ্কর্ম্য দেখিতে হইবে। কিন্তু, অর্জুনের কর্মপ্রবণ ব্যবহারিক বুদ্ধি এই সূক্ষ্ম প্রভেদ বুঝিতে পারিল না, এই হেঁয়ালীর মত কথার মর্ম গ্রহণ করিতে পারিল না—তাই তিনি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন—

সংন্যাসং কর্ম্মণাং কৃষ্ণ পুনর্যোগঞ্চ শংসসি।
যচ্ছ্রেয় এতয়োরেকং তন্মে ব্রূহি সুনিশ্চিতম্॥৫।১

—"হে কৃষ্ণ, কর্মসকলের সন্ন্যাস উপদেশ দিয়া আবার কর্মযোগ উপদেশ দিতেছ, এতদুভয়ের মধ্যে যাহা আমার পক্ষে শ্রেয়ঃ নিশ্চয় করিয়া সেই একটি উপদেশ দাও।"

ভগবান ইহার যে উত্তর দিলেন তাহা বিশেষ প্রয়োজনীয়, কারণ তাহাতে প্রভেদটি খুব স্পষ্ট করিয়াই দেখান হইয়াছে এবং উভয়ের সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য সাধিত না হইলেও, কোন্ পথে সামঞ্জস্য হইবে তাহাও দেখান হইয়াছে। ভগবান বলিলেন—

সংন্যাসঃ কর্ম্মযোগশ্চ নিঃশ্রেযসকবাবুভৌ।
তযোস্তু কর্ম্মসংন্যাসাৎ কর্ম্মযোগো বিশিষ্যতে॥৫।২
জ্ঞেযঃ স নিত্যসংন্যাসী যো ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি।
নির্দ্বন্দ্বো হি মহাবাহো সুখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে॥৫।৩
সাংখ্যযোগৌ পৃথগ্ বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ।
একমপ্যাস্থিতঃ সম্যগুভযোর্বিন্দতে ফলম্॥৫।৪
যৎ সাংখৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্যোগৈবপি গম্যতে।
একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি॥৫।৫

—"সন্ন্যাস (কর্মত্যাগ) ও কর্মযোগ (কর্মানুষ্ঠান) উভযই মোক্ষপ্রদ, কিন্তু এতদুভযের মধ্যে কর্মসন্ন্যাস অপেক্ষা কর্মযোগ উৎকৃষ্টতব। যিনি দ্বেষ কবেন না বা আকাঙ্ক্ষা কবেন না তাঁহাকে নিত্য-সন্ন্যাসী (কর্মানুষ্ঠানকালেও সন্ন্যাসী) জানিও। যেহেতু রাগদ্বেষাদি-দ্বন্দ্বশূন্য ব্যক্তি অনাযাসে সংসাববন্ধন হইতে মুক্তিলাভ কবেন। অজ্ঞেরাই সাংখ্য ও যোগকে পৃথক বলে, জ্ঞানীবা বলেন না, সম্যকরূপে একটির অনুষ্ঠান করিলে উভযেব ফল পাওযা যায।" কাবণ, সম্যকভাবে পালন কবিলে প্রত্যেকটির ভিতবেই অপবটি অঙ্গভাবে বহিযাছে। "জ্ঞাননিষ্ঠ সন্ন্যাসিগণ যে স্থান লাভ কবেন, যোগিগণও তাহাই প্রাপ্ত হন, যিনি সাংখ্য ও যোগকে এক বলিয়া দেখেন তিনিই সম্যক দর্শন কবেন। কিন্তু, কর্মযোগ ব্যতীত সন্ন্যাসলাভ কষ্টকব, যোগযুক্ত মুনি অচিবাৎ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন, তাঁহাব আত্মা সর্বভূতেব (অর্থাৎ সংসাবে যাহা কিছু হইয়াছে তাহাব) আত্মা হয; এবং ঈদৃশ ব্যক্তি কর্ম করিয়াও কর্মবদ্ধ হন না।" তিনি জানেন যে কর্মসকল তাঁহাব নহে, প্রকৃতির এবং এই জ্ঞানেব দ্বাবাই তিনি মুক্ত হন, তিনি কর্ম সন্ন্যাস কবিযাছেন, কোন কর্ম কবেন না, যদিও তাঁহাব ভিতব দিযা কর্ম হয। তিনি ব্রহ্মভূত—ব্রহ্ম হন, তিনি দেখেন যে সেই এক স্বযম্ভূ বস্তুই সর্বভূত হইযাছেন এবং তিনিও তাঁহাদের মত একজন হইযাছেন। তিনি বুঝেন যেন তাঁহাদেব সকলের কার্য ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিব ভিতব দিযা বিশ্বপ্রকৃতিবই কার্য এবং তাঁহাবও কর্মসকল সেই বিশ্বক্রিয়ার অংশমাত্র।

ইহাই গীতাশিক্ষার সব নহে, কারণ এ পর্যন্ত শুধু অক্ষব পুরুষ,—অক্ষব ব্রহ্মেব কথা এবং প্রকৃতিব কথা হইযাছে; বলা হইযাছে যে এই দুই হইতেই জগৎ। কিন্তু এ পর্যন্ত ঈশ্বরেব কথা, পুরুষোত্তমেব কথা সুস্পষ্ট কবিযা বলা হয নাই। এ পর্যন্ত শুধু জ্ঞান ও কর্মেব সমন্বযই কবা হইযাছে—কিন্তু, সামান্য সঙ্কেত ভিন্ন ভক্তির কথা আরম্ভ করা হয় নাই। ভক্তিই পবম তত্ত্ব এবং পববর্তী ভাগে ভক্তিই গীতার মধ্যে বিশেষ স্থান অধিকাব করিযাছে। এ পর্যন্ত শুধু এক নিষ্ক্রিয পুরুষ এবং নিম্নতর প্রকৃতির কথাই বলা হইয়াছে, এখনও তিন পুরুষ এবং দুই প্রকৃতির প্রভেদ কবা হয নাই। সত্য বোধে ঈশ্বরেব কথা বলা হইযাছে—কিন্তু

আত্মা ও প্রকৃতিব সহিত তাঁহাব সম্পর্ক স্পষ্ট কবিয়া দেওয়া হয নাই। এই সকল অতি প্রযোজনীয তত্ত্বেব সম্যক অবতাবণা না কবিযা যতদূর সমন্বয করা যায গীতার প্রথম ছয অধ্যাযে শুধু ততদূরই করা হইয়াছে। যখন অতঃপর এই সকল তত্ত্বেব অবতারণা কবা হইবে তখন এই প্রাথমিক সমন্বযগুলিকে উঠাইযা না দিলেও অনেক সংশোধিত ও পরিবর্ধিত কবিতেই হইবে।

নবম অধ্যায়

সাংখ্য, যোগ ও বেদান্ত

কৃষ্ণ বলিলেন যে মোক্ষপরতা দ্বিবিধ—সাংখ্যদিগের জ্ঞানযোগ দ্বারা এবং যোগীদিগের কর্মযোগ দ্বারা নিষ্ঠা (মোক্ষপরতা) হয়। এই যে সাংখ্যের সহিত জ্ঞানযোগকে এবং যোগের সহিত কর্মমার্গকে এক করা হইল ইহা বড় মজার জিনিস। কারণ ইহা হইতে বেশ বুঝা যায় যে তৎকালে যে দার্শনিক ধারণা ও চিন্তাসকল প্রচলিত ছিল এখন তাহাদের অনেক পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে। বেদান্ত মতের ক্রমবিকাশই এই পরিবর্তনের কারণ। গীতা রচনার পর হইতেই এই বৈদান্তিক প্রভাব আরম্ভ হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় এবং গীতা রচনার পর মোক্ষলাভের অন্যান্য বৈদিক ব্যবহারিক প্রণালী একরকম উঠিয়া যায়। গীতার ভাষা হইতে বুঝা যায় যে তৎকালে যাঁহারা জ্ঞানমার্গ অবলম্বন করিতেন তাঁহারা সাধারণত সাংখ্য প্রণালীই গ্রহণ করিতেন।[১] পরবর্তীকালে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধভাবের দ্বারা সাংখ্যের জ্ঞান-প্রণালীর প্রভাব নিশ্চয় খর্ব হইয়া পড়ে। সাংখ্যের ন্যায়ই অনীশ্বরবাদী ও বহুবাদী বৌদ্ধমত বিশ্বশক্তির কার্যাবলীর অনিত্যতার উপর ঝোঁক দিয়াছিল, কিন্তু, বৌদ্ধমতে এই বিশ্বশক্তিকে প্রকৃতি না বলিয়া কর্ম বলা হইয়াছে। কারণ বৌদ্ধেরা বেদান্তের ব্রহ্ম বা সাংখ্যের নিষ্ক্রিয় পুরুষ স্বীকার করে না। তাহাদের মতে বুদ্ধি যখন বিশ্বক্রিয়ার এই অনিত্যতা বুঝিতে পারে তখনই মুক্তি হয়। যখন আবার বৌদ্ধমতের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইল তখন আর সেই পুরাতন সাংখ্যমতের পুনঃপ্রতিষ্ঠা না হইয়া শঙ্কর কর্তৃক প্রচারিত বেদান্তমতই প্রতিষ্ঠা লাভ করিল। শঙ্কর বৌদ্ধদের অনিত্যতার স্থানে বেদান্ত অনুমোদিত ভ্রম, মায়ার প্রতিষ্ঠা করিলেন, এবং বৌদ্ধদের শূন্যবাদ, নির্বাণবাদের স্থানে অনির্দেশ্য ব্রহ্মবাদের প্রতিষ্ঠা করিলেন। এই সকল দার্শনিক তত্ত্বের (ব্রহ্ম, মায়া, মোক্ষ) উপর ভিত্তি করিয়া শঙ্কর যে সাধন-প্রণালী নির্দেশ করিয়াছেন, সংসার মিথ্যা বলিয়া সংসার ত্যাগের যে উপদেশ দিয়াছেন, বর্তমানে আমরা জ্ঞানযোগ বলিতে সাধারণত সেইটাই বুঝিয়া থাকি। কিন্তু, যখন গীতা রচিত হয় তখনও মায়াবাদ বেদান্তদর্শনের মূল কথা বলিয়া গণ্য হয় নাই এবং পরবর্তীকালে শঙ্কর এই মায়াবাদকে যেরূপ স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট করিয়া তুলিয়াছিলেন গীতা রচনার সময় মায়া শব্দের অর্থ সেরূপ স্পষ্ট বা সুনির্দিষ্ট হয় নাই। কারণ গীতাতে মায়ার কথা খুব অল্পই আছে কিন্তু প্রকৃতির কথা অনেক আছে। মায়া

[১] পুরাণ ও তন্ত্রসমূহ সাংখ্যভাবে পরিপূর্ণ, যদিও সেগুলি বৈদান্তিকভাবেরই অধীনে এবং অন্যান্য ভাবের সহিত মিশ্রিত।

শব্দ প্রকৃতি শব্দের পরিবর্তেই ব্যবহৃত হইয়াছে, বরং প্রকৃতির যে নিম্নাবস্থা—অপরা ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিকেই মায়া বলা হইয়াছে—ত্রৈগুণ্যময়ী মায়া। গীতার মতে ভ্রমাত্মিকা মায়া নহে, প্রকৃতিই এই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছে।

তবে দার্শনিক তত্ত্ব সম্বন্ধে ঠিক প্রভেদ যাহাই থাকুক, গীতা সাংখ্য ও যোগের মধ্যে কার্যত যেরূপ প্রভেদ করিয়াছে বর্তমানের বৈদান্তিক জ্ঞানযোগ এবং বৈদান্তিক কর্মযোগ, এই দুয়ের মধ্যে প্রভেদও সেইরূপ এবং কার্যত এই প্রভেদের ফলও একই রকম। বৈদান্তিক জ্ঞানযোগের ন্যায় সাংখ্যও বুদ্ধির সাহায্যে মুক্তির পথে অগ্রসর হইত। বিচারবুদ্ধির সাহায্যে আত্মার স্বরূপ-জ্ঞান এবং জগৎমিথ্যা-জ্ঞান যেমন বেদান্তের প্রণালী তেমনই বিচারবুদ্ধির সাহায্যে পুরুষ-প্রকৃতি-বিবেক, পুরুষ-প্রকৃতিভেদের সম্যক জ্ঞান সাংখ্যের প্রণালী। সাংখ্য যেমন বিচারবুদ্ধির সাহায্যে বুঝিতে চাহিত যে আসক্তি ও অহঙ্কার বশে প্রকৃতির কার্যাবলী পুরুষের উপর আরোপিত হয়, বেদান্তও তেমনই বুদ্ধির সাহায্যে বুঝিতে চায় যে মানসিক ভ্রম হইতে উত্থিত অহঙ্কার ও আসক্তির বশে জাগতিক আভাস ব্রহ্মের উপর আরোপিত হয়। বৈদান্তিক প্রণালী অনুসারে আত্মা যখন নিজের সত্য সনাতন একব্রহ্ম স্বরূপে ফিরিয়া আসে তখন মায়ার শেষ হয়, বিশ্বলীলা লোপ পায়; সাংখ্য-প্রণালী অনুসারে আত্মা যখন তাহার নিষ্ক্রিয় পুরুষ-স্বরূপ সত্য সনাতন অবস্থায় ফিরিয়া আসে তখন গুণসকলের ক্রিয়া শান্ত হয়, বিশ্বক্রিয়া বন্ধ হয়। মায়াবাদীদের ব্রহ্ম নীরব, অক্ষর, নিষ্ক্রিয়—সাংখ্যদের পুরুষও তদ্রূপ। অতএব, উভয়ের মতেই সংসার ও কর্ম পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসীর জীবন যাপন ভিন্ন মোক্ষলাভের আর অন্য উপায় নাই। কিন্তু গীতার যোগ এবং বৈদান্তিক কর্মযোগ উভয় মতানুসারেই কর্ম শুধু মোক্ষের সহায় নহে—কর্মের দ্বারাই মোক্ষলাভ হইতে পারে; এবং এই কথারই যুক্তিযুক্ততা গীতা জোরের সহিত পুনঃ পুনঃ বলিয়াছে। দুর্ভাগ্যের বিষয় বৌদ্ধধর্মের[১] প্রবল বন্যায় গীতার এই শিক্ষা ভারতবর্ষে স্থান পায় নাই। পরে কঠোর মায়াবাদের তীব্রতায় এবং সংসারত্যাগী সাধু-সন্ন্যাসীদের ভাবাবেগে গীতার এই কর্মশিক্ষা লোপ পাইয়াছিল। কেবল এতদিন পরে সেই শিক্ষা এখন ভারতবাসীর মনের উপর প্রকৃত কল্যাণকর প্রভাব বিস্তার করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ত্যাগ চাইই; কিন্তু ভিতরে বাসনা ও অহঙ্কার ত্যাগই প্রকৃত ত্যাগ। এই ত্যাগ ব্যতীত বাহ্য কর্মত্যাগ মিথ্যাচার এবং ব্যর্থ। এই ত্যাগ যেখানে আছে সেখানে বাহ্য কর্মত্যাগের কোন প্রয়োজন নাই, তবে তাহা নিষিদ্ধও নহে। জ্ঞান চাইই, মুক্তির জন্য ইহা অপেক্ষা বড় শক্তি আর কিছুই নাই, তবে জ্ঞানের সহিত কর্মের প্রয়োজন আছে, কর্ম ও জ্ঞানের মিলনের দ্বারা আত্মা

[১] আবার গীতাও মহাযান বৌদ্ধমতের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। গীতার অনেক শ্লোক সম্পূর্ণভাবে বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থের মধ্যে স্থান পাইয়াছে। বৌদ্ধধর্ম প্রথমত জ্ঞানী কর্মহীন শান্ত সাধু-সন্ন্যাসীরই ধর্ম ছিল, ক্রমে উহা ধ্যানযুক্ত ভক্তি এবং জীবসেবা ও দয়ার ধর্ম হইয়া এশিয়ার উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে—বোধ হয় গীতার প্রভাবেই বৌদ্ধধর্মের পরিবর্তন হইয়াছিল।

শুধু কর্মশূন্য শান্তির অবস্থায় নহে, ভীষণ কর্ম কোলাহলের মধ্যেও সম্পূর্ণভাবে ব্রাহ্মীস্থিতির মধ্যে অবস্থান করিতে পারে। ভক্তি সর্বতোভাবে প্রয়োজনীয়, কিন্তু ভক্তির সহিত কর্মও প্রয়োজনীয়, জ্ঞান, ভক্তি ও কর্মের মিলনের দ্বারা আত্মা সর্বোচ্চ ঐশ্বরিক অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত হয়,—যিনি একই কালে অনন্ত আধ্যাত্মিক শান্তি এবং অনন্ত বিশ্বব্যাপী কর্ম উভয়েরই অধীশ্বর সেই পুরুষোত্তমের মধ্যে বাস করেন, ইহাই গীতার সমন্বয়।

কিন্তু, সাংখ্যানুমোদিত জ্ঞানের পথ এবং যোগানুমোদিত কর্মের পথ—এই দুয়ের মধ্যে প্রভেদের সামঞ্জস্য যেমন গীতাকে করিতে হইয়াছে তেমনই বেদান্তের মধ্যেই ঐরূপ আর একটি যে বিরোধ আছে আর্য-জ্ঞানের উদার ব্যাখ্যা করিতে গীতাকে সেই বিরোধেরও আলোচনা ও সমাধান করিতে হইয়াছে। এই বিরোধ হইতেছে কর্মকাণ্ড জ্ঞানকাণ্ড লইয়া, এক চিন্তাধারার পরিণতি পূর্বমীমাংসা দর্শনে, বেদবাদে; আর এক ধারার পরিণতি উত্তরমীমাংসা দর্শনে, ব্রহ্মবাদে, একদল লোক প্রাচীনকাল হইতে প্রচলিত বৈদিক মন্ত্র, বৈদিক যজ্ঞের উপর ঝোঁক দিতেন, অপর দল এই সকলকে নিম্নজ্ঞান বলিয়া উপেক্ষা করিয়া উপনিষদ হইতে যে উচ্চ আধ্যাত্মিক জ্ঞান পাওয়া যায় তাহারই উপর ঝোঁক দিতেন। ধন, পুত্র, জয় প্রভৃতি সর্ববিধ ঐহিক সুখ এবং পরলোকে অমরত্ব এই সকল লাভের উদ্দেশ্যে নিখুঁতভাবে দৈনিক যজ্ঞাদি সম্পন্ন করা এবং বৈদিক মন্ত্রাদি প্রয়োগ করা—*বেদবাদিগণ* ইহাকেই ঋষিগণের আর্যধর্ম বলিয়া বুঝিতেন। ব্রহ্মবাদিগণ বলেন যে ইহার দ্বারা মানুষ পরমার্থের জন্য তৈয়ারী হইতে পারে বটে, কিন্তু ইহাই পরমার্থ নহে। একমাত্র ব্রহ্মজ্ঞানই মানুষকে অনির্বচনীয় আধ্যাত্মিক আনন্দের আলয় প্রকৃত অমরত্ব দিতে পারে—এই আনন্দ সকল প্রকার ঐহিক ভোগসুখ এবং নিম্ন স্বর্গের বহু উপরে। মানুষ যখন এই ব্রহ্মজ্ঞানের দিকে ফিরে তখনই তাহার পুরুষার্থ সাধনের, জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধনের আরম্ভ হয়, পুরাকালে বেদের প্রকৃত অর্থ যাহাই থাকুক এই প্রভেদই বহুদিন হইতে চলিয়া আসিতেছিল এবং সেইজন্যই গীতাকে ইহার আলোচনা করিতে হইয়াছে।

কর্ম ও জ্ঞানের সমন্বয় করিতে গীতা প্রথমেই *বেদবাদকে* তীব্রভাবে নিন্দা করিয়াছে—

> *যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ।*
> *বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতি বাদিনঃ॥*
> *কামাত্মানঃ স্বর্গপরা জন্মকর্ম্মফলপ্রদাম্।*
> *ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্য্যগতিং প্রতি॥২।৪২-৪৩*

—"বেদের অর্থবাদে পরিতুষ্ট (তাৎপর্য বিমূঢ়), ইহা ভিন্ন ঈশ্বর তত্ত্ব প্রাপ্য আর কিছুই নাই এইরূপ মতের পোষক, কামাত্মা, স্বর্গাভিলাষী মূঢ়গণ এই পুষ্পিত বাক্য নির্দেশ করিয়া থাকে যাহা জন্মকর্মফলপ্রদ, ক্রিয়াবিশেষবাহুল্য বিশিষ্ট এবং

ভোগৈশ্বর্যপ্রাপ্তির সাধনভূত।" যদিও এখন কার্যত বেদ পরিত্যক্ত হইয়াছে তথাপি ভারতবাসীরা এখনও মনে করে যে বেদ অতি পবিত্র, অনতিক্রমণীয়—সকল ধর্মশাস্ত্র, দর্শনশাস্ত্রের বেদই মূল এবং প্রামাণ্য। গীতা এই বেদকেও আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

> *ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন।*
> *নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্॥২।৪৫*

—"হে অর্জুন, গুণত্রয়ের কার্যই বেদের বিষয়; কিন্তু, তুমি ত্রিগুণের অতীত হও।"

> *যাবানর্থ উদপানে সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে।*
> *তাবান্ সর্ব্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ॥২।৪৬*

—"সকল স্থান জলে প্লাবিত হইয়া গেলে, উদপানে (কূপ তড়াগাদি ক্ষুদ্র জলাশয়ে) যতটুকু প্রয়োজন, পরমার্থতত্ত্বজ্ঞ ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তির সমস্ত বেদেও ততটুকু প্রয়োজন।" "সর্ব্বেষু বেদেষু"—সমস্ত বেদ বলিতে উপনিষদ পর্যন্ত বুঝাইয়াছে বলিয়া মনে হয়—কারণ পরে ব্যাপক শ্রুতি শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে; যিনি পরমার্থ জ্ঞানলাভ করিয়াছেন তাঁহার নিকট সমস্ত বেদই নিষ্প্রয়োজন। বরং বেদগুলি বাধাস্বরূপ। কারণ, তাহাদের ভিতরে ভিন্ন ভিন্ন বাক্যের মধ্যে যে বিরোধ রহিয়াছে এবং যে নানাবিধ বিরোধী ভাষা ও ব্যাখ্যা হইয়াছে তাহাতে বুদ্ধি বিপর্যস্ত হইয়া উঠে, ভিতরে জ্ঞানের আলোক না থাকিলে বুদ্ধি নিশ্চয়াত্মিকা হয় না, যোগে নিবিষ্ট হইতে পারে না।

> *যদা তে মোহকলিলং বুদ্ধির্ব্যতিতরিষ্যতি।*
> *তদা গন্তাসি নির্ব্বেদং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ॥*
> *শ্রুতিবিপ্রতিপন্না তে যদা স্থাস্যতি নিশ্চলা।*
> *সমাধাবচলা বুদ্ধিস্তদা যোগমবাপ্স্যসি॥২।৫২-৫৩*

—"যখন তোমার বুদ্ধি মোহরূপ গহন দুর্গ পরিত্যাগ করিবে, তখন তুমি শ্রোতব্য এবং শ্রুত শাস্ত্র সম্বন্ধে বৈরাগ্য লাভ করিবে। শ্রুতি শ্রবণে তোমার বিক্ষিপ্ত বুদ্ধি যখন পরমেশ্বরে নিশ্চলা ও অভ্যাসপটুতা বশত স্থিরা থাকিবে তখন তুমি যোগপ্রাপ্ত হইবে।" বেদের প্রতি এই সকল আক্রমণ সাধারণ ধর্মভাবের এত বিরুদ্ধ যে উক্ত শ্লোকগুলির বিকৃত অর্থ করিবার অনেক চেষ্টা হইয়াছে। কিন্তু উক্ত শ্লোকগুলির অর্থ স্পষ্ট এবং প্রথম হইতে জ্ঞানকে বলা হইয়াছে যে উহা বেদ উপনিষদের উপরে—শব্দব্রহ্মাতিবর্ত্ততে।

যাহা হউক এই বিষয়টি আমাদিগকে ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে, কারণ গীতার ন্যায় সার্বভৌমিক, সমন্বয়কারী শাস্ত্র আর্য সভ্যতার এই সকল বিশিষ্ট অংশকে কখনও সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার বা অগ্রাহ্য করিতে পারে না। যোগ-দর্শনানুসারে

কর্মের দ্বারা মুক্তি এবং সাংখ্যদর্শনানুসারে জ্ঞানের দ্বারা মুক্তি এই উভয় মতের সমন্বয় গীতাকে করিতে হইবে। জ্ঞানের সহিত কর্মকে মিশাইতে হইবে। আবার পুরুষ ও প্রকৃতি সম্বন্ধে সাংখ্য ও যোগের মত এক, বেদান্ত কিন্তু উপনিষদের পুরুষ, দেব, ঈশ্বর, এই সকল তত্ত্বকে এক অক্ষর ব্রহ্মতত্ত্বে পরিণত করিয়াছে, ইহাদের সমন্বয় গীতাকে করিতে হইবে, যোগমতানুযায়ী ঈশ্বরতত্ত্বেরও স্থান করিতে হইবে। ইহার সহিত গীতার নিজস্ব তত্ত্ব—তিন পুরুষ ও পুরুষোত্তমের কথাও বলিতে হইবে। এই পুরুষোত্তম তত্ত্বের কোন প্রমাণ উপনিষদের মধ্যে সহজে পাওয়া যায় না, যদিও এই ভাবধারা সেখানে আছে। বরং মনে হয়, এই তত্ত্ব শ্রুতির বিরোধী কারণ কেবল দুইটি পুরুষ স্বীকার করিয়াছে। আবার জ্ঞান ও কর্মের সমন্বয় করিতে হইলে শুধু সাংখ্য এবং যোগের মধ্যে বিরোধ ধরিলেই চলিবে না, বেদান্তের মধ্যেই কর্ম ও জ্ঞানের যে বিরোধ রহিয়াছে তাহা সাংখ্য ও যোগের বিরোধ হইতে স্বতন্ত্র এবং সেই বিরোধেরও একটা হিসাব লওয়া প্রয়োজন। বেদ এবং উপনিষদকে প্রামাণ্য স্বীকার করিয়া এত বিরুদ্ধ দর্শন ও মতের সৃষ্টি হইয়াছে তাহাতে গীতা যে বলিয়াছে শ্রুতি মানুষের বুদ্ধিকে বিপর্যস্ত করিয়া দেয়—শ্রুতিবিপ্রতিপন্না—ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। ভাবতের পণ্ডিত ও দার্শনিকেরা এখনও শাস্ত্রবাক্যের অর্থ লইয়া কত ঝগড়া করিতেছে এবং কত বিভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছে। এটা মোটেই আশ্চর্যের কথা নয় যে বুদ্ধি বিরক্ত হইয়া ছাড়িয়া দিবে, গন্তাসি নির্বেদম্,—নূতন পুরাতন, শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ, কোন শাস্ত্র বাক্যই আর শুনিতে চাহিবে না এবং নিজের মধ্যে যাইয়া গভীর, আভ্যন্তরীণ প্রত্যক্ষের আলোকে সত্য আবিষ্কার করিতে চাহিবে।

প্রথম ছয় অধ্যায়ে গীতা কর্ম ও জ্ঞানের সমন্বয়ের, সাংখ্য, যোগ ও বেদান্তের সমন্বয়ের প্রশস্ত ভিত্তি স্থাপন করিয়াছে। কিন্তু, প্রথমেই গীতা দেখিয়াছে যে বৈদান্তিকদের ভাষায় কর্ম শব্দের এক বিশেষ অর্থ আছে, তাহারা কর্ম শব্দে বৈদিক যজ্ঞ ও অনুষ্ঠান সমূহ বুঝিয়া থাকেন। বড় জোর গৃহ্যসূত্র অনুযায়ী সংসারধর্মপালনও ঐসকল যজ্ঞ ও অনুষ্ঠান কর্মের অন্তর্ভূত বলিয়া ধরিয়াছেন। ক্রিয়াবিশেষবহুল বিধিসঙ্গত এই সকল ধর্মানুষ্ঠানকেই বৈদান্তিকেরা কর্ম বলিয়াছেন। কিন্তু যোগশাস্ত্রে কর্মশব্দের অর্থ ইহা অপেক্ষা অনেক অধিক ব্যাপক। গীতা এই ব্যাপক অর্থের উপরই বিশেষ ঝোঁক দিয়াছে, ধর্মকর্মের ভিতর আমাদিগকে সর্বকর্মাদি, সকল কর্মই ধরিতে হইবে। তথাপি গীতা বৌদ্ধধর্মের ন্যায় যজ্ঞকে একেবারে উড়াইয়া দেয় নাই, বরং যজ্ঞের ধারণাকে উন্নীত ও প্রশস্ত করিয়াছে। বাস্তবিক গীতার বক্তব্যের মর্ম এই—যজ্ঞ যে জীবনের সর্বপ্রধান অংশ শুধু তাহাই নহে, সমগ্র জীবনকেই যজ্ঞরূপে দেখিতে হইবে, তবে অজ্ঞানীরা উচ্চজ্ঞান ব্যতীতই ইহা সম্পাদন করে এবং যাহারা বিশেষ অজ্ঞানী তাহারা যেরূপ করা উচিত সেরূপে না করিয়া অবিধিপূর্বক ইহা করিয়া থাকে। যজ্ঞ না হইলে জীবন চলিতে পারে না, সৃষ্টিকর্তা প্রজা সৃষ্টি করিবার সময় যজ্ঞকে তাহাদের

চিরসঙ্গী করিয়া দিয়াছেন—সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্টাঃ। কিন্তু, বেদবাদীদের যে যজ্ঞ তাহা ফল-কামনা প্রসূত; ভোগৈশ্বর্যই সে যজ্ঞের লক্ষ্য ও স্বর্গের অধিকতর ভোগই সেখানে শ্রেষ্ঠ গতি এবং অমৃতত্ব বলিয়া বিবেচিত। এরূপ যজ্ঞপ্রণালী কখনও গীতা কর্তৃক অনুমোদিত হইতে পারে না; কারণ কামনা পরিত্যাগই গীতার প্রথম কথা—আত্মার শত্রুস্বরূপ এই কামনাকে বর্জন করিতে হইবে, বিনাশ করিতে হইবে, এই কথা লইয়াই গীতা-শিক্ষার আরম্ভ। গীতা বলে না যে বৈদিক যজ্ঞপ্রণালী নিরর্থক, গীতা স্বীকার করে যে এইরূপ যজ্ঞানুষ্ঠানের ফলে লোকে এখানে ও স্বর্গে সুখভোগ করিতে পারে। ভগবান বলিয়াছেন, অহংহি সর্ব যজ্ঞানাং ভোক্তাচ প্রভুরেবচ, লোকে ভিন্ন ভিন্ন দেবতার উদ্দেশ্যে যে যজ্ঞ করে আমিই সেই দেবতারূপে সমুদয় যজ্ঞার্পণ গ্রহণ করি এবং তদনুযায়ী ফল আমিই প্রদান করি। কিন্তু, প্রকৃত পথ ইহা নহে, স্বর্গসুখভোগও মানুষের পক্ষে শ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ নহে, মোক্ষ নহে। অজ্ঞানীরাই দেবতার পূজা করে, তাহারা জানে না যে এই সকল দেবমূর্তিতে অজ্ঞানে তাহারা কাহার পূজা করিতেছে, কারণ, তাহারা না জানিয়াও সেই এক ঈশ্বর, সেই এক দেবেরই আরাধনা করে এবং তিনিই সকল পূজা গ্রহণ করেন। সেই ঈশ্বরকেই যজ্ঞ অর্পণ করিতে হইবে, জীবনের সমস্ত কার্য যখন ভক্তির সহিত বাসনাশূন্য হইয়া তাঁহারই উদ্দেশে সর্বজনহিতের জন্য করা যায় তাহাই প্রকৃত যজ্ঞ। বেদবাদ এই সত্যকে ঢাকিয়া দেয় এবং ক্রিয়াবিশেষ-বাহুল্যের দ্বারা মানুষকে ত্রিগুণের ক্রিয়ার মধ্যে বদ্ধ রাখিতে চায়, সেই জন্যই বেদবাদের এত তীব্র নিন্দা করা হইয়াছে এবং কঠভাবেই বেদবাদকে পরিত্যাগ করা হইয়াছে; কিন্তু ইহার যে মূল কথা তাহা নষ্ট করা হয় নাই, ইহাকে পরিবর্তিত ও উন্নীত করিয়া আধ্যাত্মিক জীবনের, মোক্ষলাভ প্রণালীর একটি অতি প্রয়োজনীয় অংশ করিয়া তোলা হইয়াছে।

বৈদান্তিকদের ভাষায় জ্ঞান শব্দ যে অর্থে ব্যবহৃত তাহা লইয়া এত গোলমাল নাই। গীতা প্রথমেই সম্পূর্ণভাবে বেদান্তের জ্ঞানই গ্রহণ করিয়াছে এবং প্রথম ছয় অধ্যায়ে সাংখ্যদের শান্ত অক্ষর কিন্তু বহু পুরুষের পরিবর্তে বৈদান্তিকদের একমেবাদ্বিতীয় বিশ্বব্যাপী শান্ত অক্ষর ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। এই ছয় অধ্যায়ে গীতা বরাবরই স্বীকার করিয়াছে যে ব্রহ্মজ্ঞান মোক্ষলাভের জন্য সর্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয় এবং ব্রহ্মজ্ঞান ব্যতীত মোক্ষলাভ অসম্ভব, যদিও গীতা বরাবরই বলিয়াছে যে নিষ্কাম কর্ম জ্ঞানেরই একটি মূল উপাদান। সেই রকমই গীতা স্বীকার করিয়াছে যে অক্ষর নির্গুণ ব্রহ্মের অনন্ত সমতার মধ্যে অহং তত্ত্বের নির্বাণ মোক্ষের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয়, সাংখ্যমতে প্রকৃতির কার্যের সহিত সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া নিষ্ক্রিয় অক্ষর পুরুষের স্বরূপে প্রত্যাবর্তন এবং এই নির্বাণকে গীতা কার্যত একই করিয়া দিয়াছে। কোন কোন উপনিষদ (বিশেষ করিয়া শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ) সাংখ্যের সহিত বেদান্তের ভাষাকে মিশাইয়া যেমন এক করিয়াছে, গীতাতেও তাহা করা হইয়াছে। কিন্তু তথাপি বৈদান্তিক মতের একটা

দোষ আছে তাহা অতিক্রম করিতেই হইবে। আমরা আন্দাজ করিতে পারি যে তখনও বেদান্ত-পরবর্তী বৈষ্ণবযুগের ন্যায় ঈশ্বরবাদের (theism) বিকাশ হয় নাই, যদিও ইহার বীজ উপনিষদের মধ্যেই নিহিত ছিল। আমরা ধরিয়া লইতে পারি যে গোঁড়া বেদান্তের ভিত্তি ছিল সর্বেশ্বরবাদ এবং তাহার চূড়া ছিল অদ্বৈতবাদ।[১] ইহা একমেবাদ্বিতীয়ম্ ব্রহ্মকেই জানিত, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর প্রভৃতি দেবগণকে ব্রহ্ম বলিয়াই জানিত। কিন্তু সেই পরব্রহ্মই যে এক ঈশ্বর, পুরুষ, দেব, এই ধারণার ব্যতিক্রম হইয়া পড়িয়াছিল, খাঁটি ব্রহ্মবাদে এই সকল শব্দ ব্রহ্মের নিম্নতর অবস্থাতেই প্রযোজ্য হইতে পারিত। গীতা যে এইসকল শব্দ এবং অর্থকে পুনরায় স্বস্থানে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছে শুধু তাহাই নহে, গীতা আরও একপদ অগ্রসর হইতে চাহিয়াছে। সাংখ্যের সহিত বেদান্তের সম্পূর্ণ সমন্বয় করিতে হইলে বলিতে হইবে যে পরমাবস্থায় ব্রহ্মই পুরুষ এবং পুরুষের অপরা প্রকৃতিই ব্রহ্মের মায়া; এবং সাংখ্য ও বেদান্তের সহিত যোগের সম্পূর্ণ সমন্বয় করিতে হইলে বলিতে হইবে যে নিম্নাবস্থায় নহে, পরমাবস্থায় ব্রহ্মই ঈশ্বর। কিন্তু, গীতা ঈশ্বরকে, পুরুষোত্তমকে শান্ত অক্ষর ব্রহ্মেরও উপর স্থান দিতে অগ্রসর, নির্গুণ ব্রহ্মের অহং-তত্ত্বের লয় পুরুষোত্তমের সহিত চরম মিলনের একটি প্রধান প্রাথমিক প্রক্রিয়া মাত্র। কারণ পুরুষোত্তমই পরব্রহ্ম। অতএব গীতা বেদ ও উপনিষদের প্রচলিত শিক্ষাকে অতিক্রম করিয়া নিজে তাহাদের মধ্য হইতে যে শিক্ষা উদ্ধার করিয়াছে তাহাই বিবৃত করিয়াছে। বৈদান্তিকেরা সাধারণত বেদ ও উপনিষদের যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছে গীতার সহিত তাহার মিল না হইতে পারে।[২] বাস্তবিক শাস্ত্র-বাক্যের এরূপ স্বাধীন সমন্বয়কারী ব্যাখ্যা না করিলে তৎকালে প্রচলিত অসংখ্য মতবাদের ও বৈদিক প্রণালীর মধ্যে সামঞ্জস্য সাধন কিছুতেই সম্ভব হইত না।

পরবর্তী অধ্যায়সমূহে গীতা বেদ এবং উপনিষদকে খুব উচ্চস্থান দিয়াছে। বেদ ও উপনিষদ ভাগবত শাস্ত্র, ভগবানের বাণী। স্বয়ং ভগবানই বেদের জ্ঞাতা এবং বেদান্তের প্রণেতা—বেদবিৎ বেদান্তকৃৎ। সকল বেদে তিনিই একমাত্র জ্ঞাতব্য বিষয়—সর্বৈর্বেদৈরহমেব বেদ্যঃ। এই ভাষা হইতে বুঝা যায় যে বেদ শব্দের অর্থ জ্ঞানের গ্রন্থ—এই সকল শাস্ত্রের নাম উপযুক্তই হইয়াছে। পুরুষোত্তম ক্ষর ও অক্ষরের অতীত তাঁহার উচ্চ অবস্থা হইতে নিজেকে জগতে এবং বেদে ব্যাপ্ত করিয়াছেন। তথাপি বেদের শব্দার্থ লইয়া অনেক গোলমাল হয়—যাহারা কথার

[১] ঈশ্বর এবং জগতে যাহা কিছু আছে সে সবই এক—এই মতই সর্বেশ্বরবাদ (Pantheism), অদ্বৈতবাদ (Monism) বলে যে একমাত্র ভগবান বা ব্রহ্মই সত্য, আর এই জগৎ মিথ্যা, অথবা জগৎ ব্রহ্মেরই আংশিক বিকাশ।

[২] বাস্তবিক পুরুষোত্তমের ধারণা গীতার পূর্বে উপনিষদের মধ্যেই সূচিত হইয়াছিল, তবে, সেখানে ইহা বিক্ষিপ্তভাবে ছিল। গীতার ন্যায় উপনিষদেও বারবার বলা হইয়াছে যে সেই পরম ব্রহ্ম, পরম পুরুষের মধ্যেই নির্গুণ ও গুণী ব্রহ্মের বিরোধ রহিয়াছে। এই দুইটি আমাদের নিকট বিরোধী মনে হইলেও পরম ব্রহ্ম শুধু গুণীও নহেন, শুধু নির্গুণও নহেন, তাঁহার ভিতর দুইই রহিয়াছে।

উপর অত্যধিক ঝোঁক দেয় তাহারা প্রকৃত গূঢ় অর্থের সন্ধান পায় না। খ্রীষ্টধর্মের প্রচারক এই কথাই বলিয়াছিলেন যে শব্দে সর্বনাশ, অর্থেই রক্ষা—"the letter killeth and it is the spirit that saves" এবং ধর্মশাস্ত্রের উপযোগিতারও একটা সীমা আছে। হৃদয়ের মধ্যে যে ঈশ্বর রহিয়াছেন তিনিই সকল জ্ঞানের প্রকৃত উৎস—

সর্ব্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানম্...।১৫।১৫

—"আমি সর্ব প্রাণীর হৃদয়ে অধিষ্ঠিত আছি এবং আমা হইতেই স্মৃতি ও জ্ঞান।"

শাস্ত্র সেই অন্তরস্থিত বেদের সেই স্বপ্রকাশ সত্যের বাঙ্ময় রূপ মাত্র—ইহা শব্দব্রহ্ম। বেদে কথিত হইয়াছে যে হৃদয় হইতে, যেখানে সত্যের আবাস সেই গুহ্যস্থান হইতে মন্ত্রের উৎপত্তি, সদনাৎ ঋতস্য, গুহ্যম্! উৎপত্তিস্থান এইরূপ বলিয়াই ইহার সার্থকতা, তথাপি শব্দ অপেক্ষা সনাতন সত্য বড়। এবং কোন ধর্মশাস্ত্র সম্বন্ধেই এ কথা বলা যায় না যে তাহাই সম্পূর্ণ এবং যথেষ্ট, তাহা ছাড়া আর কোন সত্যই গ্রাহ্য হইতে পারে না (বেদ সম্বন্ধে বেদবাদীদের এইরূপই অভিমত—নান্যদস্তীতিবাদিনঃ)। জগতে যত ধর্মশাস্ত্র আছে তাহাদের দ্বারা প্রকৃত উপকার লাভ করিতে হইলে তাহাদিগকে এইভাবেই দেখিতে হইবে। জগতে যত ধর্মগ্রন্থ আছে বা ছিল—বাইবেল, কোরান, চীনদেশীয় গ্রন্থ, বেদ, উপনিষদ, পুরাণ, তন্ত্র, শাস্ত্র, গীতা, ঋষিদের পণ্ডিতদের অবতারদের বাণী ও উপদেশবাক্য—সব ধরিলেও বলিতে পার না যে আর কিছুই নাই, তোমার বুদ্ধি সেখানে যে-সত্যের সন্ধান পায় না তাহা সত্য নহে, কারণ তোমার বুদ্ধি সেখানে তাহা পাইতেছে না। যাহাদের চিন্তা সাম্প্রদায়িক, সঙ্কীর্ণ, তাহারাই এরূপ ভুল করিবে—যাহাদের ভগবৎ অনুভূতি হইয়াছে, যাহাদের মন মুক্ত এবং আলোকসম্পন্ন তাঁহারা সত্যের সন্ধান করিতে এরূপ সঙ্কীর্ণতার মধ্যে আবদ্ধ হন না। যে সত্য হৃদয়ের গভীর অনুভূতিতে প্রত্যক্ষ হইয়াছে অথবা যাহা হৃদয়স্থিত সর্বজ্ঞানের ঈশ্বর, সনাতন বেদবিদের নিকট হইতে শুনা গিয়াছে তাহা শ্রুতই হউক, আর অশ্রুতই হউক—তাহাই প্রকৃত সত্য।

দশম অধ্যায়

বুদ্ধিযোগ

শেষ দুইটি প্রবন্ধে আমি একটু অবান্তবভাবেই দার্শনিক মতবাদের আলোচনা করিয়াছি। সে আলোচনা মোটেই গভীর বা যথেষ্ট নহে। গীতার যে বিশেষ পদ্ধতি তাহা বুঝানই উক্ত আলোচনার উদ্দেশ্য। গীতা প্রথমে একটি আংশিক সত্যের ব্যাখ্যা করিয়াছে এবং তাহার গূঢ়তম অর্থ সম্বন্ধে সংযতভাবে দুই একটি ইঙ্গিত মাত্র করিয়াছে। তাহার পর গীতা ফিরিয়া আসিয়া এই ইঙ্গিতগুলির প্রকৃত অর্থ বাহির করিয়াছে এবং ক্রমে তাহার শেষ মহান বক্তব্যে উঠিয়াছে। এই শেষ কথাই শ্রেষ্ঠ রহস্য, গীতা মোটেই ইহা ব্যাখ্যা করে নাই, জীবনে অনুভব করিতে ছাড়িয়া দিয়াছে। পরবর্তী যুগের ভারতীয় সাধকগণ প্রেম, আত্মসমর্পণ ও উল্লাসের মহান্ তরঙ্গের মধ্যে ইহা জীবনে অনুভব করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। সমন্বয়ের দিকে সকল সময়েই গীতার দৃষ্টি এবং গীতার সকল কথাই সেই শেষ মহান্ সিদ্ধান্তের আয়োজন মাত্র।

ভগবান অর্জুনকে বলিলেন, জ্ঞানযোগ সম্বন্ধে তোমায় বলিলাম, এখন কর্মযোগ বিষয়ে যাহা বলিতেছি তাহা শ্রবণ কর। (২।৩৯) তুমি তোমার কর্মের ফল ভাবিয়া পশ্চাৎপদ হইতেছ, তুমি অন্যরূপ ফল কামনা করিতেছ এবং সেই ফলের সম্ভাবনা না দেখিয়া তুমি কর্মপদ পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছ। কর্ম এবং কর্মের ফল সম্বন্ধে এরূপ ধারণা—*ফলকামনাতেই কর্ম করিতে হয়, কর্ম শুধু বাসনা তৃপ্তিরই উপায়*—এরূপ ভাব অজ্ঞানীদের বন্ধনের কারণ। এরূপ অজ্ঞানীরা জানে না যে কর্ম কি, কর্মের প্রকৃত উৎস কোথায়, কর্মের প্রকৃত ধারা কি এবং মহৎ উপযোগিতা কি। আমি যে যোগের কথা বলিতেছি তাহার দ্বারা তুমি সমস্ত কর্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইবে—*কর্ম্মবন্ধং প্রহাস্যসি*। তুমি অনেক জিনিসকেই ভয় করিতেছ—তুমি পাপকে ভয় করিতেছ, দুঃখকে ভয় করিতেছ, নরক ও শাস্তিকে ভয় করিতেছ, ভগবানকে ভয় করিতেছ, ইহকালকে ভয় করিতেছ, পরকালকে ভয় করিতেছ, তুমি নিজে নিজেকেই ভয় করিতেছ। তুমি ক্ষত্রিয় হইয়া, জগতের শ্রেষ্ঠ বীর হইয়া ভয় পাইতেছ কিসে? কিন্তু, যে মহাভয় মানবসকলকে আক্রমণ করে তাহাই এই—পাপের ভয়, ইহকালে পরকালে দুঃখের ভয়, যে-সংসারের প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে তাহারা অজ্ঞ সেই সংসারের ভয়, যে-ভগবানের প্রকৃত স্বরূপ তাহারা দেখে নাই এবং যাঁহার বিশ্বলীলার গূঢ় রহস্য তাহারা বুঝে না সেই ভগবানের ভয়। আমি যে যোগের কথা বলিতেছি তাহা তোমাকে এই মহাভয় হইতে পরিত্রাণ করিবে এবং ইহার অতি স্বল্পমাত্রাও তোমাকে মুক্তি আনিয়া দিবে—*স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ*। একবার তুমি এই পথে যাত্রা

করিলেই বুঝিবে যে একটি পদক্ষেপও বৃথা যায় না, প্রত্যেক সামান্য ঘটনাতেই কিছু লাভ হইবে, তুমি দেখিবে যে এমন কোন বাধাই নাই যাহা তোমার অগ্রগতি প্রতিরোধ করিতে পারে। ভগবান এই যে এত বড় চরম প্রতিজ্ঞা করিলেন—যেসকল ভয়গ্রস্ত ইতস্ততকারী মানুষ জীবনে পদে পদে বাধা পাইতেছে, ঠকিতেছে, তাহারা সহসা ইহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারে না; ভগবানের এই প্রতিজ্ঞার পূর্ণ অর্থও আমরা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি না যদি না গীতার বাণীর এই প্রথম কথাগুলির সঙ্গে আমরা সেই শেষ কথাগুলিও স্মরণ করি—

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বা সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষযিষ্যামি মা শুচঃ॥১৮।৬৬

—"ধর্মাধর্ম, কর্তব্যাকর্তব্যে সকল বিধিনিষেধ পরিত্যাগ পূর্বক একমাত্র আমাকে আশ্রয় কর, আমিই তোমাকে সর্ববিধ পাপ ও অশুভ হইতে মুক্ত করিব, শোক করিও না।"

কিন্তু, মানুষের প্রতি ভগবানের এই গভীর মর্মস্পর্শী বাণী প্রথমেই বলা হয় নাই। পথের জন্য যতটুকু আলোর প্রয়োজন প্রথমে শুধু ততটুকুই দেওয়া হইয়াছে। এই আলো আত্মার উপর নহে, বুদ্ধির উপরেই ফেলা হইয়াছে। ভগবান প্রথমে মানুষের সুহৃদ ও প্রণয়ীরূপে কথা বলিলেন না—গুরু ও পথপ্রদর্শক-রূপেই এমন কথা বলিলেন যেন তাহার প্রকৃত আত্মা সম্বন্ধে, সংসারের প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে এবং তাহার কার্যের প্রকৃত উৎস ও মূল সম্বন্ধে তাহার অজ্ঞানতা দূর হইয়া যায়। কারণ, মানুষ অজ্ঞানের সহিত, ভ্রান্ত বুদ্ধির সহিত এবং সেই জন্যই ভ্রান্ত ইচ্ছারও সহিত কার্য করে বলিয়া মানুষ তাহার কার্যের দ্বারা বদ্ধ হয় অথবা বদ্ধ হইয়াছে বলিয়া মনে হয়; নতুবা মুক্ত আত্মার নিকট কর্ম বন্ধন হয় না। এই ভ্রান্ত বুদ্ধির জন্যই মানুষের আশা ও আশঙ্কা, ক্রোধ শোক এবং ক্ষণস্থায়ী হর্ষ হয়; নতুবা সম্পূর্ণ শান্তি ও মুক্তির সহিত কর্ম করা সম্ভব। অতএব অর্জুনকে প্রথমেই বুদ্ধিযোগের পরামর্শ দেওয়া হইল। অভ্রান্ত বুদ্ধির সহিত, এবং সেই জন্যই অভ্রান্ত ইচ্ছার সহিত, *তদেকচিত্ত* হইয়া, *সর্বভূতে* এক আত্মা জানিয়া আত্মার শান্ত সমতা হইতে কার্য করা, অজ্ঞান মনের অসংখ্য কামনার বশে ইতস্তত ছুটাছুটি না করা—ইহাই বুদ্ধিযোগ।

গীতা বলে মানুষের দুই প্রকার বুদ্ধি আছে। প্রথম প্রকার বুদ্ধি শান্ত, ব্যবস্থিত, এক, সম, কেবলমাত্র সত্যই ইহার লক্ষ্য। ঐক্য ইহার লক্ষণ, স্থির, একাগ্রতা ইহার স্বরূপ। দ্বিতীয় প্রকারের বুদ্ধিতে কোন একাগ্র ইচ্ছা নাই, কোন নিশ্চয়াত্মিকতা নাই—জীবনে যত প্রকার কামনা আছে তাহার দ্বারাই উহা ইতস্তত চালিত হয়।

ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন।
বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োঽব্যবসায়িনাম্॥২।৪১

বুদ্ধি শব্দটি যে ব্যবহাব কবা হইযাছে ইহাব সঠিক অর্থ হইতেছে মনেব বোধশক্তি—কিন্তু, গীতায ইহা ব্যাপক দার্শনিক অর্থে ব্যবহৃত হইযাছে। মনেব যে ক্রিয়াব দ্বাবা আমবা বিচাব কবি এবং নির্ধাবণ কবি যে আমাদেব চিন্তা কিরূপ হইবে এবং আমাদের কর্ম কিরূপ হইবে—সেই সমগ্র ক্রিযাকেই গীতাতে বুদ্ধি বলা হইযাছে; চিন্তা (thought), বুদ্ধি (intelligence), বিচাব (judgement), প্রত্যক্ষ নির্বাচন (perceptive choice) এবং লক্ষ্যস্থিব (aim) এই সমস্তকেই বুদ্ধিক্রিয়াব অন্তর্ভূত কবা হইযাছে, কাবণ, শুধু জ্ঞানলাভ ব্যাপাবে মনের নিশ্চয়াত্মিকতাই একনিষ্ঠ বুদ্ধিব লক্ষণ নহে, কিন্তু, কর্মেব লক্ষ্য নির্ধাবণ এবং সেই নির্ধাবণেই অবিচলিত থাকা, ব্যবসায, বিশেষ কবিযা ইহাই একনিষ্ঠ বুদ্ধিব লক্ষণ; অন্যদিকে চিন্তাব বিক্ষিপ্ততা বিক্ষিপ্ত বুদ্ধিব প্রধান লক্ষণ নহে—যাহাদের লক্ষ্যেব স্থিরতা নাই, "লক্ষ্যশূন্য লক্ষ বাসনাব" পশ্চাতে যাহাবা ঘুবিযা বেড়ায় বিশেষ করিয়া তাহাদেব বুদ্ধিই বিক্ষিপ্ত। অতএব, ইচ্ছা (will) এবং জ্ঞান (knowledge) এই দুইটিই বুদ্ধিব[১] ক্রিযা। ব্যবসাযাত্মিকা একনিষ্ঠ বুদ্ধি—আত্মাব আলোকে নিবদ্ধ, ইহা আভ্যন্তবীণ আত্মজ্ঞানে কেন্দ্রীভূত। অন্যদিকে অব্যবসাযীদের অনন্ত ও বহুশাখাযুক্ত বুদ্ধি—যেটি একমাত্র প্রয়োজনীয জিনিস সেটিকেই ভুলিয়া চঞ্চল বিক্ষিপ্ত মনেব বশ হয়, বাহ্য জীবনেব কর্ম এবং কর্মফলে শতখানে ধায়, শত স্বার্থেব মাঝখানে। ভগবান বলিযাছেন—

দূরেণ হ্যববং কর্ম্ম বুদ্ধিযোগাদ্ ধনঞ্জয।
বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ কৃপণাঃ ফলহেতবঃ॥২।৪৯

—"হে ধনঞ্জয, বুদ্ধিযোগ অপেক্ষা কর্ম অত্যন্ত অপকৃষ্ট, অতএব, তুমি বুদ্ধিযোগ আশ্রয় কর; যাহাবা কর্মফলের চিন্তা কবে, ফলেব উদ্দেশ্যে কার্য কবে তাহাবা অতি নিকৃষ্ট ও হতভাগ্য ব্যক্তি।"

আমাদিগকে মনে বাখিতে হইবে যে সাংখ্য মনস্তত্ত্বেব যে পাবম্পর্য নির্দেশ করিয়াছে, গীতা তাহা স্বীকাব কবিয়াছে। একদিকে পুরুষ শান্ত আত্মা, নিষ্ক্রিয, অক্ষব, এক, তাহার বিকাশ নাই, অন্য দিকে প্রকৃতি সচেতন পুরুষকে ছাড়া নিষ্ক্রিয় (inert), কিন্তু সচেতন পুরুষেব সন্নিধি মাত্রেই ক্রিযাশীলা, প্রকৃতি নিরবয়ব (indeterminate), ত্রিগুণময়ী, বিকাশশীলা, সৃষ্টি ও প্রলযে সমর্থা। আমাদেব ভিতবে ও বাহিরে যাহা আমবা প্রত্যক্ষ কবিতেছি সে সমুদয প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগে উৎপন্ন। আমাদের কাছে যেটা ভিতবেব (subjective) সেইটিই প্রথমে উৎপন্ন হয, কাবণ আত্মচেতনাই প্রথম কাবণ—অচেতন প্রাকৃতিক শক্তি দ্বিতীয় কারণ এবং ইহা প্রথমেব অধীন। কিন্তু, তাহা হইলেও আমাদের অন্তঃকবণেব বৃত্তিসমূহ প্রকৃতিই সববরাহ কবে, পুরুষ নহে। যথাক্রমে

[১] শ্রীঅববিন্দ বুদ্ধি শব্দেব ইংবাজী অনুবাদে বলিযাছেন—intelligent will—অনুবাদক।

প্রথমে আসে বুদ্ধি ও তাহাব অধীন অহঙ্কাব। ক্রমবিকাশেব দ্বিতীয স্তবে বুদ্ধি ও অহঙ্কাব হইতে উৎপন্ন হয মন (sense-mind), যে-শক্তিব দ্বাবা বিষয-বৈচিত্র্য গ্রহণ কবা হয তাহাই এই। বিকাশেব তৃতীয় স্তবে মন হইতে দশ ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হয—পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয এবং পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয। তাহার পব উৎপন্ন হয প্রত্যেক জ্ঞানেন্দ্রিযেব শক্তি—শব্দ, রূপ, গন্ধ ইত্যাদি এবং ইহাদের ভিত্তিস্বরূপ পঞ্চভূত। আকাশ, বাযু, অগ্নি প্রভৃতি পঞ্চভূতেব বিভিন্ন মিশ্রণেব ফলে এই বাহ্যজগতেব বস্তুসমূহ উৎপন্ন হইযাছে।

প্রাকৃতিক শক্তিব এই সকল ভিন্ন ক্রম ও শক্তিসমূহ পুরুষেব শুদ্ধ চেতনায় প্রতিফলিত হইযা আমাদেব অশুদ্ধ অন্তঃকবণেব উপাদান হয়—অশুদ্ধ, কাবণ ইহাব ক্রিযা বাহ্যজগতেব প্রত্যক্ষসমূহেব উপব এবং তাহাদের আন্তরিক প্রতিক্রিযাব উপব নির্ভব কবে। প্রাকৃতিক জড-বুদ্ধি ও জড-মনের ক্রিয়া আত্মাব চেতনায প্রতিফলিত হইযা চেতন-বুদ্ধি ও চেতন-মন রূপে প্রতিভাত হয। বাসনা কামনা উদ্বেগ এই মনেব খেলা। পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয ও পঞ্চকর্মেন্দ্রিয অন্তঃকবণেব সহিত বাহ্যজগতেব যোগ কবাইযা দেয। বাকী পঞ্চতন্মাত্র, পঞ্চভূত ইন্দ্রিয়ের বিষয—ইহাদিগকে লইযাই বাহ্যজগৎ।

সৃষ্টিব যে ক্রম, যে পাবম্পর্য দেখাইলাম বাহ্যজগতে ইহাব উল্টা দেখা যায বলিযা বোধ হয, কিন্তু যদি আমবা স্মবণ বাখি যে বুদ্ধি নিজেই অচেতন প্রকৃতিব জডক্রিযা মাত্র এবং জড অণুতেও এরূপ অচেতন বোধশক্তি এবং ইচ্ছাশক্তি আছে—যদি বৃক্ষলতায আমবা সুখদুঃখ বোধ, স্মৃতি, ইচ্ছা প্রভৃতিব সূচনা দেখিতে পাই, যদি দেখি যে প্রকৃতিব এই সকল শক্তিই অন্যান্য জীব ও মনুষ্যেব চৈতন্যেব ক্রমবিকাশে অন্তঃকবণ হইযাছে তাহা হইলেই আমবা বুঝিতে পাবিব যে বর্তমান বিজ্ঞান জডজগতেব পর্যবেক্ষণেব ফলে যে সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইযাছে সাংখ্য প্রণালীব সহিত তাহাব যথেষ্ট মিল বহিযাছে। আত্মা যখন প্রকৃতি হইতে পুরুষেব অবস্থায ফিবিযা যায তখন প্রকৃতির পূর্ব অভিব্যক্তিব উল্টা ক্রম অবলম্বন কবিতে হয। উপনিষদে আত্মশক্তিব ক্রমবিকাশেব এইরূপ ক্রমই দেখান হইযাছে এবং গীতা এ বিষযে উপনিষদকেই অনুসবণ কবিযাছে, প্রায উপনিষদেব বাক্যই অবলম্বন কবিযাছে।

ইন্দ্রিযাণি পবাণ্যাহুবিন্দ্রিযেভ্যঃ পবং মনঃ।
মনসস্তু পবা বুদ্ধির্যো বুদ্ধেঃ পবতস্তু সঃ॥৩।৪২

—"ইন্দ্রিযগণ তাহাদেব বিষয অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, মন ইন্দ্রিযগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধি মন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধি অপেক্ষা যাহা শ্রেষ্ঠ তাহাই তিনি"—সেই চৈতন্যময আত্মা, পুরুষ। তাই, গীতা বলিযাছে যে এই পুরুষকে, আমাদেব অন্তর্জীবনেব এই শ্রেষ্ঠ কাবণকে বুদ্ধিব দ্বাবা বুঝিতে হইবে, জানিতে হইবে, তাহাতেই আমাদেব ইচ্ছা ন্যস্ত কবিতে হইবে।

এবং বুদ্ধেঃ পবং বুদ্ধা সংস্তভ্যাত্মানমাত্মনা।
জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুবাসদম্। ।৩।৪৩

এইরূপে আমাদেব নীচেব প্রকৃতিস্থ আত্মাকে শ্রেষ্ঠ, প্রকৃত, চেতন আত্মাব দ্বাবা স্থিব ও শান্ত কবিযা আমবা আমাদেব শান্তি এবং আত্মসংযমেব দুর্ধর্ষ অশান্ত সদাব্যস্ত শত্রু কামকে বিনাশ করিতে পাবি।

বুদ্ধিব ক্রিযা দুই প্রকাব হইতে পারে। বুদ্ধি নিম্নে ত্রৈগুণ্যময়ী প্রকৃতিব খেলাব দিকে অথবা ঊর্ধ্ব চৈতন্যময শান্ত আত্মাব পবিত্র স্থাযী শান্তিব দিকে যাইতে পারে। *প্রথম গতি বহির্মুখী। প্রথম ক্ষেত্রে মানুষ ইন্দ্রিযবিষযেব অধীন হয* বাহ্যস্পর্শ লইযাই থাকে। এই জীবন কামনাব জীবন। কাবণ, ইন্দ্রিযগণ তাহাদেব বিষয়েব দ্বাবা উত্তেজিত হইযা অশান্তি সৃষ্টি কবে এমনকি অনেক সময অত্যাচ উপদ্রবেব সৃষ্টি কবে, ঐ সকল বিষযকে লাভ ও ভোগ কবিবাব জন্য বাহিবেব দিকে প্রবল ঝোঁক উৎপন্ন কবে এবং তাহাবা মনকে হবণ কবিযা লয, বাযুর্ণাবমিবাম্ভসি—"যেমন বাযু নৌকাকে সমুদ্রে বিশৃঙ্খলভাবে ভ্রমণ কবায", ইন্দ্রিযগণেব এইরূপ উপদ্রবে মন বাসনা, আবেগ উদ্বেগ, তীব্র লালসাব অধীন হইযা পড়ে এবং কামাধীন মন বুদ্ধিকেও টানিযা লয—তখন বুদ্ধি শান্ত বিচাবশক্তি ও বিবেক হাবাইযা ফেলে—সংযম হাবাইযা ফেলে। বুদ্ধিব এইরূপ নিম্নগতিব ফলে আত্মা প্রকৃতিব গুণত্রযেব চিবদ্বন্দ্বেব অধীন হইযা পড়ে, অজ্ঞান, মিথ্যা ইন্দ্রিযপরাযণ জীবন, শোক দুঃখেব অধীনতা, আসক্তি, কাম, ক্রোধ—এই সকল নিম্নগামিনী বুদ্ধিব পবিণাম, ইহাই সাধাবণ অজ্ঞানী অসংযমী মানুষেব দুঃখময জীবন। বেদবাদীদেব ন্যায যাহাবা ইন্দ্রিয-ভোগকেই কর্মেব লক্ষ্য করে এবং ইন্দ্রিযতৃপ্তিকেই আত্মাব শ্রেযঃ বলিযা মনে করে তাহাবা মানুষকে ভ্রান্ত পথ দেখায। বাহ্যবিষযেব অধীনতা ছাড়াইযা অন্তবেব ভিতব যে আত্মাবাম তাহাই আমাদেব প্রকৃত লক্ষ্য এবং শান্তি ও মুক্তিব উচ্চ উদাব অবস্থা।

অতএব, বুদ্ধিব যে ঊর্ধ্ব অন্তর্মুখী গতি তাহাই আমাদিগকে দৃঢসঙ্কল্পেব সহিত, স্থিরনিশ্চযতা অধ্যবসাযেব (ব্যবসায) সহিত অবলম্বন কবিতে হইবে বুদ্ধিকে দৃঢভাবে পুরুষেব শান্ত আত্মজ্ঞানে লাগাইযা বাখিতে হইবে। প্রথমে যে *আমাদিগকে কামনা ছাড়িতে চেষ্টা কবিতেই হইবে তাহা বেশ বুঝা যায, কাবণ* ইহাই সমস্ত অশুভ ও দুঃখেব সমগ্র মূল, এবং কামনা ছাড়িতে হইলে কামনাব কাবণেবও শেষ কবিতে হইবে—ইন্দ্রিযগণ যে বাহ্যবস্তু ধবিতে ও ভোগ কবিতে ছুটিযা যায তাহা বন্ধ কবিতে হইবে। ইন্দ্রিযগণ যখন বাহিবেব দিকে ছুটিতে চায তখন তাহাদিগকে ফিবাইতে হইবে, তাহাদেব ভোগ্য বিষয হইতে তাহাদিগকে সরাইযা আনিতে হইবে—কচ্ছপ যেমন স্বীয কবচবণাদি অঙ্গ বাহিব হইতে সঙ্কুচিত কবিয়া দেহমধ্যে বাখে তেমনই ইন্দ্রিযগণকে তাহাদেব মূলে বাখিতে হইবে, মনে বিলীন করিতে হইবে, মনকে বুদ্ধিতে এবং বুদ্ধিকে আত্মাতে এবং

আত্মজ্ঞানে বিলীন কবিতে হইবে, প্রকৃতিব কার্য দেখা হইবে কিন্তু তাহাব অধীন হওযা চলিবে না—বাহ্যজগৎ যাহা দিতে পাবে এমন কোন বস্তু কামনা কবা চলিবে না।

পাছে বুঝিতে ভুল হয তাই পবক্ষণেই কৃষ্ণ নির্দেশ কবিলেন যে তিনি বাহ্য কঠোবতা, ইন্দ্রিযগ্রাহ্য বস্তুব শাবীবিক প্রত্যাখ্যান শিক্ষা দেন নাই। সাংখ্যেবা যে সন্ন্যাস শিক্ষা দেয অথবা উপবাস, শবীরেব পীডন প্রভৃতিব দ্বাবা কঠোর তপস্বিগণ যে তপস্যা কবেন তাহা ভগবানেব উপদেশ নহে, ভগবান যে প্রত্যাহাব ও সংযমেব শিক্ষা দিযাছেন তাহা অন্যরূপ, তাহা আন্তবিক প্রত্যাহার—কামনা *পবিত্যাগ। দেহী আত্মাব যে দেহ তাহাব সাধাবণ ক্রিয়াব জন্য সাধাবণত আহাব* আবশ্যক। আহাব পবিত্যাগ কবিলে ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুব সহিত বাহ্য সংস্পর্শ দূব হয বটে—কিন্তু, যে আভ্যন্তবীণ সম্বন্ধেব জন্য এই সংস্পর্শ অনিষ্টজনক সেই সম্বন্ধ ঘুচিযা যায না। বিষযে ইন্দ্রিযেব যে সুখ, বস, তাহা থাকিযা যায—বাগ-ও দ্বেষ থাকিযা যায কাবণ এই দুইটিই বসেব দুইটা দিক মাত্র, কিন্তু বাগ দ্বেষ শূন্য হইযা বিষয গ্রহণ কবিবাব যে সামর্থ্য তাহাই লাভ কবিতে হইবে। নতুবা বিষযেব নিবৃত্তি হইবে বটে কিন্তু মনেব নিবৃত্তি হইবে না, কিন্তু, ইন্দ্রিয়সকল মনেবই ভিতবেব জিনিস এবং ভিতবে বসেব শেষই আত্মজয়েব প্রকৃত চিহ্ন। কিন্তু, ইহা কিরূপে সম্ভব যে বিষযেব সহিত ইন্দ্রিযেব সংযোগ হইবে অথচ কামনা থাকিবে না, বাগ দ্বেষ থাকিবে না? ইহা সম্ভব—পবং দৃষ্ট্বা, পব, আত্মা, পুরুষের দর্শনলাভ কবিযা এবং বুদ্ধিযোগেব দ্বাবা সমস্ত মনপ্রাণ লইযা তাঁহাব সহিত মিলিত হইযা অথবা এক হইযা তাহাব মধ্যে বাস কবিযা ইহা সম্ভব হয। কাবণ সেই এক আত্মা শান্তিময, আত্মানন্দেই সন্তুষ্ট; আমবা যদি একবাব সেই পবম বস্তুকে আমাদেব মধ্যে দেখিতে পাই এবং আমাদেব মন ও বুদ্ধি তাহাতে নিবিষ্ট কবিতে পাবি তাহা হইলে ইন্দ্রিযভোগ্য বিষয়ে যে রাগ দ্বেষ তাহাব পবিবর্তে আমবা দ্বন্দ্বশূন্য সেই আত্মানন্দ লাভ করিব। ইহাই মুক্তিব প্রকৃত পন্থা।

আত্মসংযম, আত্মজয যে সহজ নহে সে বিষযে কোন সন্দেহ নাই। সকল বুদ্ধিমান মনুষ্যই জানে যে তাহাদিগকে কোনরকম আত্মসংযম কবিতেই হইবে এবং ইন্দ্রিযসংযম কবিতে যত উপদেশ দেওযা হয় এত বোধহয আব কোন বিষযেই দেওযা হয না, কিন্তু সাধাবণত এরূপ উপদেশ নিতান্ত অসম্পূর্ণভাবে দেওযা হয এবং নিতান্ত অসম্পূর্ণ ও সঙ্কীর্ণভাবে পালিত হয। এমনকি যেসকল জ্ঞানী, বিবেকী পুরুষ সম্পূর্ণ আত্মজয়েব জন্য প্রকৃতভাবেই চেষ্টা যত্ন করেন ইন্দ্রিযগণ তাহাদেব মনকেও বলপূর্বক হবণ কবে—

যততোহ্যপি কৌন্তেয পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ।
ইন্দ্রিযাণি প্রমাথীনি হবন্তি প্রসভং মনঃ॥২।৬০

ইহাব কাবণ এই যে মন স্বভাবতই ইন্দ্রিযগণেব অনুগামী হয, মন ইন্দ্রিয়েব

বিষয়গুলিতে রস পায়, সেগুলিতে বিনষ্ট হয এবং সেগুলিকে বুদ্ধিব একান্ত চিন্তার বিষয় এবং ইচ্ছার তীব্র আকর্ষণেব বিষয কবিযা তুলে। এইরূপে আসক্তিব উদয় হয়, আসক্তি হইতে কামনা হয; এই কামনাব তৃপ্তি না হইলে দুঃখ হয, বাধা পাইলে ক্রোধ হয; ক্রোধ হইতে আত্মাব মোহ উপস্থিত হয়—বুদ্ধি তখন শান্ত, সাক্ষী আত্মাকে দেখিতে এবং তাহাতে নিবিষ্ট হইতে ভুলিযা যায—প্রকৃত আত্মাব স্মৃতি লোপ পায় এবং এইরূপ লোপেব দ্বারা বুদ্ধিও মোহগ্রস্ত হয, এমনকি বিনষ্ট হইয়া যায়। কারণ, কিছুকালেব জন্য ইহা আব আমাদেব আত্মস্মৃতিতে থাকে না—দুঃখ ক্রোধাদির আতিশয্যে ইহা অদৃশ্য হয, আমবা আত্মা ও বুদ্ধিব পবিবর্তে ক্রোধ, শোক, দুঃখাদিময় হইয়া উঠি।

ধ্যাযতো বিষযান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজাযতে।
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজাযতে॥
ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥২।৬২-৬৩

অতএব, ইহা কিছুতেই ঘটিতে দেওযা চলিবে না এবং সমস্ত ইন্দ্রিযগণকে সম্পূর্ণভাবে বশে আনিতে হইবে, কাবণ ইন্দ্রিয়গণকে বশে আনিযাই প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হয়।

তানি সর্ব্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপবঃ।
বশে হি যস্যেন্দ্রিয়াণি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥২।৬১

শুধু বুদ্ধির দ্বারা, মানসিক সংযমেব দ্বাবা ইন্দ্রিযগণকে সম্পূর্ণভাবে বশীভূত কবা সম্ভব নহে, ইহাব জন্য চাই কোন উচ্চতর সত্তাব সহিত যোগ; এমন কোন বস্তুব সহিত যোগের প্রযোজন যাহাতে শান্তি ও আত্মসংযম স্বভাবতই বহিযাছে। নিজেকে সম্পূর্ণভাবে ভগবানে সমর্পণ কবিলে, কৃষ্ণ বলিয়াছেন, "আমাতে" সমর্পণ কবিলে তবেই এই যোগ সাফল্য লাভ কবিতে পাবে, কাবণ মুক্তিদাতা আমাদেব ভিতরেই রহিযাছেন, তবে আমাদেব মন, বুদ্ধি বা ইচ্ছা তাহা নহে—এগুলি তাঁহাব যন্ত্র মাত্র। ইনি সেই ঈশ্বব, সর্বতোভাবে যাঁহাব শরণ লইবাব কথা গীতাব শেষে বলা হইয়াছে। এবং ইহাব জন্য প্রথমে তাঁহাকেই আমাদেব সমগ্র জীবনেব লক্ষ্য কবিতে হইবে এবং তাঁহাব সহিত আত্মাব স্পর্শ বাখিতে হইবে। "যুক্ত আসীত মৎপরঃ" এই বাক্যেব ইহাই প্রকৃত অর্থ, কিন্তু, গীতার যেমন ধবন, এখানে শুধু এই অর্থেব সঙ্কেতমাত্র কবা হইযাছে। যে সর্বোত্তম বহস্য পরে ব্যক্ত করা হইবে তাহাব সবটুকু বীজরূপে এই তিনটি কথাব ভিতব বহিয়াছে—যুক্ত আসীত মৎপবঃ।

যদি এইরূপ করা হয় তাহা হইলে ইন্দ্রিযগণকে সম্পূর্ণভাবে অন্তবাত্মাব বশীভূত করিয়া বিষয়সমূহেব মধ্যে বিচবণ করা যায়—তাহাদেব স্পর্শ গ্রহণ কবা

যায, তাহাদেব উপব কার্য কবা যায়—সেই সকল বিষয়ের ও তাহাদেব প্রতি বাগদ্বেষেব অধীন হইতে হয না—ঐ অন্তরাত্মা আবাব পরমাত্মাব, পুরুষের অধীন হয। তখন বিষযসমূহেব প্রতিক্রিয়া হইতে মুক্ত ইন্দ্রিয়গণ বাগদ্বেষের প্রভাব হইতে মুক্ত হইবে, কামনা বাসনাব দ্বন্দ্ব হইতে মুক্ত হইবে এবং মানুষ সুখময় শান্তি ও আত্মপ্রসাদ লাভ কবিবে।

প্রসাদে সর্ব্বদুঃখানাং হানিরস্যোপজায়তে।
প্রসন্নচেতসো হ্যাশু বুদ্ধিঃ পর্যবতিষ্ঠতে॥২।৬৫

এই আত্মপ্রসাদই আত্মাব প্রকৃত সুখের মূল; এইরূপ শান্ত প্রসন্ন আত্মাকে কোন দুঃখই স্পর্শ কবিতে পারে না, দুঃখের অবসান হয। এইরূপ আত্মজ্ঞানে, আত্মপ্রসাদে প্রতিষ্ঠিত বুদ্ধিব শান্ত, বাসনাশূন্য, শোকশূন্য স্থিবতাকেই গীতাতে সমাধি বলা হইযাছে।

সমাধিস্থ লোকের লক্ষণ ইহা নহে যে তাঁহার বাহ্য বিষয়ের জ্ঞান লোপ পাইবে, তাঁহাব শবীব ও মনেব জ্ঞানও লোপ পাইবে এমনকি তাঁহার শবীব দগ্ধ করিলেও তাঁহাব জ্ঞান হইবে না; সাধাবণত সমাধি বলিতে এই অবস্থাই বুঝায—কিন্তু ইহা সমাধিব প্রধান চিহ্ন নহে, ইহা শুধু এক বিশেষ গভীর অবস্থা, সমাধি হইলেই যে এইরূপ অবস্থা হইবে তাহা নহে। সমাধিস্থ ব্যক্তির প্রকৃত লক্ষণ এই যে তাঁহার ভিতব হইতে সমস্ত কামনা দূব হয, তাহারা মনে প্রবেশ কবিতে পারে না, যে আন্তবিক অবস্থা হইতে এইরূপ মুক্তির উৎপত্তি—শুভাশুভ, সুখ-দুঃখ, বিপদ-সম্পদে অবিচলিত মনসহ আত্মাতেই যে তৃপ্তি তাহাই প্রকৃত সমাধি। সমাধিস্থ ব্যক্তি বাহিবে কার্য কবিলেও তাঁহাব ভাব অন্তর্মুখী; বাহিবেব বস্তুব দিকে যখন তিনি তাকাইযা থাকেন তখনও আত্মাতেই তিনি নিবদ্ধ থাকেন, যখন সাধারণের চক্ষুতে তাঁহাকে দেখায যে তিনি সাংসারিক বাহ্য ব্যাপাবে ব্যস্ত, তখনও সম্পূর্ণ-ভাবে ভগবানেব দিকেই তাঁহাব লক্ষ্য থাকে। সাধাবণ মানুষের ন্যায়ই অর্জুন জানিতে চাহিলেন যে এই মহান্ সমাধির এমন বাহ্য লক্ষণ কি আছে যাহার দ্বারা এই অবস্থা চিনিতে পাবা যায়—

স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা সমাধিস্থস্য কেশব।
স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত কিমাসীত ব্রজেত কিম্॥২।৫৪

—"হে কেশব, সমাধিতে অবস্থিত স্থিতপ্রজ্ঞেব লক্ষণ কি? স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি কি বলেন? কিরূপ থাকেন? কিরূপ চলেন?"

কিন্তু এরূপ কোন লক্ষণ দেওযা যায না এবং গুরু তাহা দিবার চেষ্টাও কবিলেন না; কাবণ, এরূপ অবস্থাব একমাত্র নিদর্শন আভ্যন্তবীণ। যে আত্মা মুক্তিলাভ কবিযাছে তাহাব মহান্ ভাব সমতা এবং যেসব সহজ লক্ষণ দেখিযা এই সমতাব অবস্থা বুঝা যায সেসবও আন্তবিক (Subjective)।

দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে॥২।৫৬

দুঃখ উপস্থিত হইলে অক্ষুব্ধচিত্ত, সুখে নিস্পৃহ এবং আসক্তি ভয় ও ক্রোধ শূন্য যে মুনি তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ বলিয়া অভিহিত হন। তাঁহাতে প্রকৃতির ত্রিগুণের ক্রিয়া নাই, দ্বন্দ্ব নাই—তিনি তাঁহার প্রকৃত সত্তায় প্রতিষ্ঠিত, তাঁহার পাওয়া থাকা কিছু নাই, তিনি আত্মাকে পাইয়াছেন—

ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন।
নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থো নির্য্যোগক্ষেম আত্মবান্॥২।৪৫

একবার যদি আমরা আত্মাকে পাই তখন সকল বস্তুই আমাদের পাওয়া হয়।

অথচ তিনি কর্ম হইতে বিরত হন না। এইখানেই গীতার মৌলিকত্ব ও শক্তি যে, এইরূপ সমাধির কথা বলিয়া এবং মুক্ত আত্মার নিকট প্রকৃতির সাধারণ ক্রিয়ার শূন্যতার কথা বলিয়াও গীতা কর্ম সমর্থন করিয়াছে, কর্ম করিবার আদেশ দিয়াছে। যে সকল দর্শনশাস্ত্র শুধু কঠোর তপস্যা ও নীরবতার প্রশংসা করিয়া লোককে কর্মহীন করিয়া তুলে গীতা তাহাদের সেই দোষ এইরূপে সংশোধন করিয়াছে; আজ আমরা দেখিতে পাই যে এই সকল দর্শনমত এই দোষ এড়াইবার চেষ্টা করিতেছে।

কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি॥২।৪৭

—"তোমার কর্মে অধিকার, কিন্তু কর্মেই তোমার অধিকার আছে, ফলে নহে, কর্মের ফলের জন্যই যেন কর্ম করিও না, কর্ম না করিতেও যেন তোমার প্রবৃত্তি না হয়।" অতএব বেদবাদীরা কামনার সহিত যে কার্য করে সেরূপ কার্য এখানে অনুমোদিত হয় নাই; যে সকল রজোগুণসম্পন্ন অস্থির লোক কর্মে তৃপ্তি পায়, সর্বদা কর্ম করিবার জন্য যাহাদের মন ব্যাকুল তাহাদের মত কর্ম করিতেও গীতা এখানে উপদেশ দেয় না।

যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে॥২।৪৮

—"যোগস্থ হইয়া আসক্তি পরিত্যাগপূর্বক সিদ্ধি বা অসিদ্ধির দিকে মনোনিবেশ না করিয়া তুমি কর্মের অনুষ্ঠান কর। চিত্তের এই সমতারই নাম যোগ।" প্রশ্ন উঠিতে পারে যে কোন্‌টা অপেক্ষাকৃত ভাল বা মন্দ, তাহা বিচার করিয়া কার্য করিতে হইলে, পাপের ভয় থাকিলে, পুণ্যের দিকে কঠিন চেষ্টা করিতে হইলে কাজ করা দায় হইয়া উঠে। কিন্তু, যে মুক্ত পুরুষ তাঁহার বুদ্ধি ও ইচ্ছাকে ভগবানের সহিত

যুক্ত করিয়াছেন তিনি এই দ্বন্দ্বময় সংসারেই পাপ ও পুণ্য উভয়ই পরিত্যাগ করেন—

বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে সুকৃতদুষ্কৃতে।২।৫০

কারণ, তিনি পাপ পুণ্যের উপরে যে নীতি তাহাতে উঠেন—সেই নীতি আত্মজ্ঞানের স্বাধীনতার উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রশ্ন উঠিতে পারে যে এরূপ কামনাশূন্য কর্মের স্থিরনিশ্চয়তা বা সাফল্য হইতে পারে না, কোন বিশেষ উদ্দেশ্য লইয়া কার্য না করিলে সে কার্য ভাল হইবে না, উদ্ভাবনী শক্তিরও সম্যক বিকাশ হইতে পারিবে না। কিন্তু ইহা ঠিক নহে; যোগস্থ হইয়া যে কর্ম করা যায় তাহা শুধু সর্বোচ্চ নহে, তাহাই সর্বাপেক্ষা বিজ্ঞানসম্মত—সাংসারিক ব্যাপারেও এইরূপ কর্ম সর্বাপেক্ষা অধিক শক্তিসম্পন্ন ও কার্যকরী; কারণ সর্বকর্মের যিনি অধীশ্বর তাঁহার ইচ্ছা ও জ্ঞানের আলোকে এরূপ কর্ম আলোকিত। যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্। কিন্তু, দুঃখযন্ত্রণাময় মানবজন্মের বন্ধন হইতে মুক্তিলাভই যে যোগীর লক্ষ্য বলিয়া সকলে স্বীকার করেন—সাংসারিক কর্ম করিতে যাইলে কি সেই লক্ষ্য হইতে ভ্রষ্ট হইতে হইবে না? না, তাহাও হইবে না; যেসকল জ্ঞানী ব্যক্তি ফলকামনা পরিত্যাগপূর্বক ভগবানের সহিত যোগে কর্ম করেন তাঁহারা জন্মবন্ধন হইতে মুক্ত হন এবং সেই পরমপদ প্রাপ্ত হন—সেখানে শোকদুঃখময় মানবজীবনের যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না।

কর্ম্মজং বুদ্ধিযুক্তা হি ফলং ত্যক্ত্বা মনীষিণঃ।
জন্মবন্ধবিনির্ম্মুক্তাঃ পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ম্॥২।৫১

তিনি যে পদ প্রাপ্ত হন তাহা হইতেছে ব্রাহ্মীস্থিতি; তিনি ব্রহ্মে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হন। সংসারবদ্ধ জীবের যে অবস্থা, যে জ্ঞান, যে অভিজ্ঞতা, যে অনুভূতি—ইহা তাহার বিপরীত। এই যে দ্বন্দ্বময় জীবন তাহাদের নিকট দিবসের স্বরূপ—এই জীবন তাহাদের জাগ্রতাবস্থা, তাহাদের চেতনা—এই অবস্থাতেই তাহারা কার্য করিবার, জ্ঞানলাভ করিবার সুযোগ পায়—এই জীবন যোগীর নিকট রাত্রি স্বরূপ, আত্মার কষ্টকর নিদ্রা এবং অন্ধকার স্বরূপ; আবার তাহাদের যাহা রাত্রি, যে নিদ্রার অবস্থায় সমস্ত জ্ঞান ও ইচ্ছা বন্ধ হয় তাহাতে সংযমী জাগ্রত হন, সেই অবস্থাতেই তাঁহার প্রকৃত জীবন, তাঁহার জ্ঞান ও শক্তির উজ্জ্বল দিবস।

যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ॥ ২।৬৯

—"সাধারণ ব্যক্তিগণের পক্ষে যাহা রাত্রিস্বরূপ সেই রাত্রিতে জিতেন্দ্রিয় যোগী জাগ্রত থাকেন, যাহাতে সাধারণ ব্যক্তিগণ জাগিয়া থাকে, স্থিতপ্রজ্ঞের তাহা রাত্রিস্বরূপ।" —সংসারাবদ্ধ অজ্ঞানী ব্যক্তিরা কর্দমাক্ত সামান্য জলের মত—

কামনার সামান্য বেগেই বিচলিত হইয়া উঠে; যোগী চেতনার বিশাল সমুদ্রের ন্যায়—সকল সময়েই তাহা পূরিত হইতেছে তথাপি তাহা আত্মার বিরাট শান্তিতে নিথর, নিশ্চল; সমুদ্রে যেমন জল প্রবেশ করে, তেমনই সংসারের সমস্ত কামনা তাহাতে প্রবেশ করে—তথাপি তাঁহার কোন কামনাই নাই এবং তিনি বিন্দুমাত্র বিচলিতও হন না—

আপূর্য্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং
সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।
তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্ব্বে
স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী॥২।৭০

যেমন সমস্ত নদ-নদীর জলে পরিপূর্ণ অতল গম্ভীর সমুদ্রে বর্ষার বারিধারাও আসিয়া প্রবেশ করে, সেইরূপ শব্দাদি বিষয়সকল স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষে প্রবিষ্ট হয় বটে, কিন্তু তাহাতে সে মহাত্মা কখনও বিক্ষোভযুক্ত না হইয়া বরং শান্তিই লাভ করিয়া থাকেন। কারণ, সাধারণ ব্যক্তিরা আমি, আমার, তোমার এই সকল দুঃখদায়ক জ্ঞানে পূর্ণ কিন্তু যোগী ব্যক্তি সর্বত্র যে আত্মা রহিয়াছে তাহার সহিত এক এবং তাঁহাতে "আমি" বা "আমার" এরূপ ভাব নাই। —তিনি অপরের ন্যায়ই কার্য করেন কিন্তু সমস্ত কাম, সমস্ত লালসা বর্জন করিয়াছেন। তিনি পরম শান্তি লাভ করেন এবং বাহ্যদৃশ্যে বিচলিত হন না, তিনি সেই একের ভিতর নিজের ক্ষুদ্র আমিত্ব নির্বাপিত করিয়া দিয়াছেন, সেই একত্বের মধ্যে তিনি বাস করেন এবং মৃত্যুকালে সেই ব্রাহ্মীস্থিতিতে থাকিয়া ব্রহ্মে নির্বাণ লাভ করেন।

এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি।
স্থিত্বাস্যামন্তকালেঽপি ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃচ্ছতি॥২।৭২

গীতায় এই যে নির্বাণের কথা বলা হইয়াছে ইহা বৌদ্ধমতানুযায়ী আত্মলোপ সাধন নহে; ব্যক্তিগত স্বতন্ত্র সত্তাকে সেই এক অনন্ত সত্তার বিরাট সত্যের মধ্যে ডুবাইয়া দেওয়াকে গীতাতে নির্বাণ বলা হইয়াছে।

এইরূপে সাংখ্য, যোগ ও বেদান্তকে সূক্ষ্মভাবে মিশাইয়াই গীতাশিক্ষার প্রথম ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে। ইহা মোটেই সব নহে, কার্যত জ্ঞান ও কর্মের একত্বসাধন যে অবশ্যপ্রয়োজন তাহাই এখানে সাধিত হইয়াছে; আত্মার চরম পূর্ণতার যে তৃতীয় উপাদান—ভগবৎপ্রেম ও ভক্তি, এ পর্যন্ত কেবল তাহার সঙ্কেত মাত্র করা হইয়াছে।

একাদশ অধ্যায়

কর্ম ও যজ্ঞ

বুদ্ধিযোগ এবং বুদ্ধিযোগের পরিণাম ব্রাহ্মীস্থিতি—ইহা লইয়াই গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষভাগ লিখিত হইয়াছে। এইখানেই গীতার অনেক শিক্ষার বীজ নিহিত রহিয়াছে,—গীতার নিষ্কাম কর্ম, সমতা, বাহ্যসন্ন্যাস পরিত্যাগ, ভগবানে ভক্তি, এই সকল শিক্ষারই সূত্রপাত এখানে হইয়াছে, তবে তাহা খুব স্বল্প এবং অস্পষ্ট। এখন পর্যন্ত যে শিক্ষার উপর সর্বাপেক্ষা অধিক জোর দেওয়া হইয়াছে তাহা এই—মানুষ যে সাধারণত কামনা লইয়া কার্য করে তাহা হইতে বুদ্ধিকে ফিরাইতে হইবে, ইন্দ্রিয়সুখের সন্ধানে ফিরিয়া সাধারণত মানুষের চিত্ত ও মনের যে বেগ ও অজ্ঞতা হয় তাহা হইতে মুক্ত হইতে হইবে, লক্ষ বাসনার পশ্চাতে ধাবমান বুদ্ধি ও ইচ্ছাকে ফিরাইয়া ব্রাহ্মীস্থিতির নিষ্কাম স্থির ঐক্য, নিরুদ্বেগ শান্তির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। অর্জুন এ পর্যন্ত বুঝিতে পারিলেন। এসব তাঁহার কাছে একেবারে নূতন নহে, ইহা তৎকালে প্রচলিত সেই শিক্ষার সারমর্ম যাহা মানুষকে জ্ঞানের পথ দেখাইয়া দেয়, সিদ্ধিলাভের উপায়স্বরূপ সংসার ও কর্ম-ত্যাগের পথ, সন্ন্যাসের পথ দেখাইয়া দেয়। ইন্দ্রিয়সুখ, কামনা, মানবীয় কর্ম ছাড়িয়া বুদ্ধিকে ঈশ্বরমুখী করা, সেই এক নিষ্ক্রিয় পুরুষ, অচল অরূপ ব্রহ্মের অভিমুখী করা—ইহা যে জ্ঞানের সনাতন বীজ তাহাতে সন্দেহ নাই। এখানে কর্মের স্থান নাই, কারণ কর্ম অজ্ঞানের, কর্ম জ্ঞানের সম্পূর্ণ বিপরীত; কামনা ইহার বীজ এবং বন্ধন ইহার ফল। ইহাই তৎকাল প্রচলিত দার্শনিক মত এবং কৃষ্ণ যখন বলিলেন যে, বুদ্ধিযোগ অপেক্ষা কর্ম অত্যন্ত অপকৃষ্ট, তখন তিনিও এই মত স্বীকার করিয়া লইলেন বলিয়াই মনে হয়। অথচ, তিনি বিশেষ করিয়া কর্মকে যোগের অঙ্গ বলিতে লাগিলেন, অতএব, এই শিক্ষায় মূলত একটা অসামঞ্জস্য রহিয়াছে বলিয়াই মনে হয়। শুধু তাহাই নহে; কারণ, কিছুকাল অতি সামান্য, নিতান্ত নির্দোষ কোন কর্ম করা চলিতে পারে, কিন্তু এখানে অর্জুনের সম্মুখে যে কর্ম তাহা আত্মার নিষ্কম্প শান্তি ও জ্ঞানের সম্পূর্ণ বিরোধী—এ কর্ম ভীষণ, এমনকি পৈশাচিক, ইহা নিষ্ঠুর রক্তপাতের যুদ্ধ, একটা বিরাট হত্যাকাণ্ড। অথচ আভ্যন্তরীণ শান্তি, নিষ্কাম সমতা এবং ব্রাহ্মীস্থিতি সম্বন্ধে শিক্ষার দ্বারা এই ভীষণ কর্মকে সমর্থন করিবার চেষ্টা হইতেছে। এই যে বিরোধ, এখনও ইহার সামঞ্জস্য করা হয় নাই। অর্জুনের অভিযোগ এই যে, তাঁহাকে যে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে তাহা বিরোধপূর্ণ এবং গোলমেলে—মানুষ যাহার সাহায্যে সোজা নিশ্চিত শ্রেয়ের দিকে যাইতে পারে এ শিক্ষা সেরূপ নহে। এই আপত্তির উত্তরে গীতা কর্মের প্রকৃত নীতি আরও স্পষ্টভাবে বুঝাইতে আরম্ভ করিয়াছে।

গুরু প্রথমেই মুক্তিলাভের দুইটি স্বতন্ত্র পন্থার প্রভেদ করিলেন,—

লোকেঽস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ।
জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্ম্মযোগেন যোগিনাম্॥৩।৩

এ সংসারে মুক্তিলাভ করিতে হইলে মানুষ জ্ঞানযোগ বা কর্মযোগ যে কোন একটি অবলম্বন করিতে পারে। সাধারণ ধারণা এই যে, জ্ঞানমার্গ কর্মকে মুক্তির পরিপন্থী বলিয়া পরিত্যাগ করে, কর্মমার্গ কর্মকে মুক্তির সহায় বলিয়া গ্রহণ করে। ভগবান এখন এই দুইয়ের মিশ্রণের বা সামঞ্জস্যের বিশেষ চেষ্টা করিলেন না, কেবল এই দেখাইয়া আরম্ভ করিলেন যে, সাংখ্যদের যে ত্যাগ, শারীরিক ত্যাগ, "সন্ন্যাস", তাহা একমাত্র পথও নহে, অন্যটি অপেক্ষা ভাল পথও নহে। অবশ্য আত্মাকে, পুরুষকে "নৈষ্কর্ম্ম্য" বা শান্ত কর্মশূন্যতার ভাব লাভ করিতে হইবে, কারণ প্রকৃতিই কর্ম করে, আত্মাকে এই কর্মস্রোতের উপরে উঠিতে হইবে এবং মুক্তি ও শান্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া প্রকৃতির ক্রিয়া-পরম্পরা অবিচলিতভাবে অবলোকন করিতে হইবে। পুরুষের নৈষ্কর্ম্ম্য বলিতে বস্তুত ইহাই বুঝায়, প্রকৃতির ক্রিয়াপরম্পরার বিরতি বুঝায় না। অতএব, কোনরূপ কর্ম না করিলেই যে এই নৈষ্কর্ম্ম্য লাভ ও ভোগ করা যায় এরূপ ভাবা ভুল। শুধু কর্ম পরিত্যাগই যথেষ্ট নহে, এমনকি মুক্তিলাভের ইহা ঠিক পথও নহে।

ন কর্ম্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।
ন চ সংন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি॥৩।৪

কর্ম হইতে বিরত হইলেই কেহ নিষ্ক্রিয়ভাব ভোগ করে না, কেবল কর্মসন্ন্যাসেই সিদ্ধিলাভ হয় না।

কিন্তু ইহা মোক্ষলাভের একটি অবশ্যপ্রয়োজনীয় উপায় নহে কি? কারণ, প্রকৃতির কর্ম যদি চলিতে থাকে তাহা হইলে পুরুষ তাহাতে বদ্ধ না হইয়া কেমন করিয়া থাকিবে? আমি যুদ্ধ করির অথচ আমার আত্মা "যুদ্ধ করিতেছি" বলিয়া ভাবিবে না, জয়াকাঙ্ক্ষা করিবে না, পরাজয়ে বিচলিত হইবে না, ইহা কিরূপে হইতে পারে? ইহাই সাংখ্যদের শিক্ষা যে, যে ব্যক্তি প্রকৃতির ক্রিয়ায় নিযুক্ত হয় তাহার বুদ্ধি অহঙ্কার অজ্ঞান ও কামনায় বদ্ধ হয় এবং সেজন্য কর্মে আকৃষ্ট হয়, কিন্তু যদি বুদ্ধি সরিয়া আসে তাহা হইলে কামনা ও অজ্ঞানের শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কর্মও শেষ হইয়া যায়। অতএব মুক্তিলাভ করিতে হইলে শেষপর্যন্ত সংসার ও কর্ম পরিত্যাগ করিতেই হইবে। অর্জুন প্রকাশ না করিলেও তাঁহার মনে যে তৎকাল-প্রচলিত এই যুক্তি উঠিয়াছিল তাহা তাঁহার পরের কথা হইতেই বুঝা যায়; ভগবান তৎক্ষণাৎ ইহা বুঝিয়াই উত্তর দিলেন। তিনি বলিলেন, এরূপ ত্যাগ অবশ্যপ্রয়োজনীয় তো নহেই, এমনকি সম্ভবও নহে।

ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ॥৩।৫

"*কোনও ব্যক্তি কর্ম না করিয়া ক্ষণকালও থাকিতে পারে না। প্রকৃতি-জাত* গুণসকলের দ্বারা চালিত হইয়া অবশভাবে সকলকেই কর্ম করিতে হয়।" বিশ্ব জুড়িয়া চিরকাল বিশ্বশক্তির যে বিরাট ক্রিয়া চলিতেছে তাহার তীব্র অনুভূতিই গীতার একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। পরবর্তীকালে তান্ত্রিক শাক্তগণ এইদিকে বিশেষ জোর দিয়াছিলেন—এমনকি তাঁহারা শক্তিকে পুরুষেরও উপরে স্থান দিয়াছিলেন। গীতাতে যদিও ইহা তেমন পরিস্ফুট হয় নাই, তথাপি গীতার ঈশ্বরবাদ ও ভক্তিতত্ত্বের সহিত সংযুক্ত হইয়া ইহা প্রাচীন বেদান্তের কর্মত্যাগের দিকে ঝোঁক বিশেষভাবে সংশোধন করিয়াছে। প্রাকৃতিক জগতে দেহধারী মানব কর্ম বন্ধ করিতে পারে না—এক মুহূর্তের জন্য, এক সেকেণ্ডের জন্যও পারে না; তাহার এখানে *বাঁচিয়া থাকাই একটা কর্ম*, সমগ্র বিশ্বজগৎই ভগবানের একটি কর্ম, কেবলমাত্র বাঁচিয়া থাকাও তাঁহারই লীলা।

আমাদের শারীরিক জীবন, ইহাই পালন ও রক্ষা, "শরীরযাত্রা" এটি পথযাত্রার মত—কর্ম ভিন্ন ইহা সম্পন্ন করা যায় না। কিন্তু যদি কোন মানব শরীরপালন না করিয়া থাকিতে পারে, যদি সর্বদা গাছের ন্যায় নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে বা প্রস্তরের ন্যায় জড়বৎ বসিয়া থাকিতে পারে, "তিষ্ঠতি", তথাপি এরূপ নিশ্চল বা জড়ভাবে থাকিলেই সে প্রকৃতির হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবে না; প্রকৃতির ক্রিয়াপরম্পরা হইতে সে মুক্তি পাইবে না। কারণ, কর্ম শব্দে শুধু আমাদের শারীরিক ক্রিয়া এবং চলাফেরাই বুঝায় না; আমাদের মানসিক জীবনও একটা মস্ত বড় জটিল কর্ম—বিশ্রামহীন শক্তির এইটাই বরং বৃহত্তর এবং অধিকতর প্রয়োজনীয় কর্ম—এই মানসিক ক্রিয়াই শারীরিক ক্রিয়ার কারণ ও নির্দেশক। ইন্দ্রিয়ের বিষয়গুলি আমাদের বন্ধনের উপলক্ষ্য মাত্র, তাহাদিগকে গ্রহণ করিতে মনের ঝোঁকই প্রকৃত কার্যকরী কারণ। কোনও মানুষ তাহার কর্মেন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করিতে পারে এবং তাহাদের স্বাভাবিক ক্রিয়া বন্ধ করিয়া দিতে পারে—কিন্তু তাহার মন যদি ইন্দ্রিয়ের বিষয় চিন্তা করিতে থাকে তাহা হইলে তাহার কোন লাভই হইল না। এরূপ ব্যক্তি আত্মসংযমের ভুল ধারণার বশে নিজেকে বিভ্রান্ত করে, সে ইহার উদ্দেশ্য বা প্রকৃত তথ্য বুঝে না—নিজের আভ্যন্তরীণ জীবনের মূল তত্ত্বই বুঝে না; অতএব তাহার আত্মসংযমের সমগ্র প্রণালীই মিথ্যা এবং ব্যর্থ।[১]

[১] "মিথ্যাচার" শব্দের অর্থ কপটাচারী (hypocrite) বলিয়া আমার মনে হয় না। যে মনুষ্য এরূপ সম্পূর্ণ কাঠোরভাবে নিজেকে বঞ্চিত করে সে কেমন করিয়া কপটাচারী হইতে পারে? সে ভ্রমে পতিত, "বিমূঢ়াত্মা", এবং তাহার "আচার"—তাহার গতানুগতিক আত্মসংযমের প্রণালী মিথ্যা এবং ব্যর্থ—এই মাত্রই যে গীতার অর্থ তাহাতে সন্দেহ নাই।

কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মবন্।
ইন্দ্রিযার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচাবঃ স উচ্যতে॥৩।৬

শুধু শরীরেব কর্ম, এমনকি শুধু মনেব কর্মও কিছু নয—সেসব বন্ধনও নহে, বন্ধনেব প্রথম কারণও নহে। প্রকৃতিব মহাশক্তি মন প্রাণ ও শবীবরূপ তাহাব বিবাট ক্ষেত্রে নিজভাবে ক্রীডা কবিবেই, তাহাব মধ্যে বিপদেব জিনিস হইতেছে তাহাব তিন গুণের মুগ্ধ কবিবাব শক্তি—এই তিন গুণ বুদ্ধিকে গুলাইযা দিযা আত্মাকে ঢাকিযা ফেলে। আমবা পবে দেখিব যে, ইহা লইযাই গীতাব কর্ম ও মুক্তিব সমস্ত কথা। গুণত্রয়েব মুগ্ধকরী ক্রিযা হইতে মুক্ত হও—তাহাব পব কর্ম থাকিতে পাবে, থাকিবেই, এমনকি বৃহত্তম, সমৃদ্ধতম, বিষম উপদ্রবময় কর্মও চলিতে পারে; তাহাতে কোন হানি হইবে না, কারণ আত্মা নৈষ্কর্ম্য লাভ কবে, আব কিছুই পুরুষকে স্পর্শ করিতে পাবে না।

কিন্তু উপস্থিত গীতা এই বড কথাটা তুলিতেছে না। মনই যখন যান্ত্রিক কাবণ, কর্মহীনতা যখন অসম্ভব, তখন শবীব ও মনের ক্রিয়াকে সংযত ও নিযমিত কবাই কর্তব্য ও যুক্তিযুক্ত। বুদ্ধিব যন্ত্রস্বরূপ মন ইন্দ্রিযগণকে বশে আনিবে এবং কর্মেন্দ্রিয়গণকে তাহাদেব যাহা প্রকৃত কাজ, কর্ম, তাহাতেই নিযুক্ত কবিবে—কিন্তু যোগরূপে এই কর্ম করিতে হইবে।

যস্ত্বিন্দ্রিয়াণি মনসা নিযম্যারভতেঽর্জ্জুন।
কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্ম্মযোগমসক্তঃ স বিশিষ্যতে॥৩।৭

কিন্তু এই আত্মসংযমেব সারতত্ত্ব কি, যোগরূপে কর্ম কবাব, কর্মযোগেব অর্থ কি? ইহা অনাসক্তি, ইন্দ্রিযবিষয়ে এবং কর্মেব ফলে মনকে লিপ্ত হইতে না দিযাই কর্ম করিতে হইবে। সম্পূর্ণ কর্মশূন্যতা নহে—ইহা ভ্রম, মোহ, আত্মপ্রতাবণা, ইহা অসম্ভব। সম্যকভাবে, স্বাধীনতাব সহিত কর্ম কবিতে হইবে, ইন্দ্রিয ও বিপুব বশ্যতা ত্যাগ করিয়া কর্ম করিতে হইবে, কামশূন্য হইযা অনাসক্তভাবে কর্ম কবিতে হইবে—এই সবই সিদ্ধিলাভেব প্রথম গূঢ় বহস্য। কৃষ্ণ বলিলেন, এইরূপে আত্মসংযমেব সহিত কর্ম কর, নিযতং কুরু কর্ম ত্বম্, আমি বলিযাছি যে, জ্ঞান বুদ্ধি কর্ম অপেক্ষা বড়, জ্যাযসি কর্ম্মণঃ বুদ্ধি, কিন্তু আমি এমন কথা বলি নাই যে, কর্ম অপেক্ষা কর্মশূন্যতা বড, বরং বিপরীতটাই সত্য, কর্ম জ্যাযঃ হ্যকর্ম্মণঃ। কারণ, জ্ঞান বলিতে কর্মত্যাগ বুঝায না, সমতা এবং ইন্দ্রিযবিষযে ও কামনায অনাসক্তিই বুঝায়। বুদ্ধি যখন প্রকৃতির নিম্নতব ক্রিযা হইতে মুক্ত হইযা ঊর্ধ্বে আত্মায প্রতিষ্ঠিত হয় এবং আত্মজ্ঞানেব শক্তিতে এবং অধ্যাত্মসিদ্ধিব শুদ্ধ বিষয়শূন্য আত্মানন্দে মন ইন্দ্রিয এবং শবীবেব ক্রিয়াকে নিযমিত কবে, নিযতম্,[১]

[১] নিযতং কর্ম সাধাবণত যেরূপ ব্যাখ্যা করা হয আমি সে ব্যাখ্যা গ্রহণ কবিতে পাবি নাই। সাধাবণ টীকাকাবেবা নিযতং কর্ম বলিতে সন্ধ্যা উপাসনা প্রভৃতি বেদোক্ত নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম বুঝিযাছেন। পূর্বোক্ত

জ্ঞান বলিতে বুদ্ধিব সেই অবস্থাই বুঝায়। কর্মযোগেব দ্বারা বুদ্ধিযোগ সম্পূর্ণ হয, আত্মমুক্তিদাযক বুদ্ধিযোগ কামনাশূন্য কর্মযোগেব দ্বাবা সার্থক হয। এইরূপে গীতা নিষ্কাম কর্মেব প্রযোজনীযতা বুঝাইয়াছে এবং সাংখ্যদেব কেবল বাহ্যিক শারীরিক বিধি পরিত্যাগ করিযা তাহাদের আভ্যন্তবীণ জ্ঞানেব প্রণালীর সহিত যোগপ্রণালীর মিলন কবিযাছে।

কিন্তু এখনও একটা মূল সমস্যাব সমাধান হয় নাই। মানুষ সাধাবণত যে কর্ম কবে, শুধু কামনার বশেই তাহা কবিযা থাকে, অন্তঃকবণ যদি কামনা হইতে মুক্ত হয তাহা হইলে তো কর্মেব কোন প্রবৃত্তি বা প্রযোজনীযতাই থাকিবে না। শবীর বক্ষাব জন্য কতকগুলি কর্ম কবিতে আমবা বাধ্য হইতে পাবি বটে, কিন্তু ইহাও শবীবেব কামনাব পবাধীনতা এবং সিদ্ধিলাভ কবিতে হইলে ইহা হইতেও আমাদের মুক্ত হওযা উচিত। কিন্তু যদি স্বীকাব করা যায় যে ইহা সম্ভব নহে, তাহা হইলে (আমাদেব ভিতবের কিছুব দ্বাবা পবিচালিত না হইযা) কর্মের কোন বাহ্য বিধি মানিযা চলা ব্যতীত আর উপায নাই; বেদেব নিত্যকর্ম, যজ্ঞানুষ্ঠান, নির্দিষ্ট দৈনিক কার্য, সামাজিক কর্তব্য এইরূপে বাহ্যবিধিদ্বারা নিয়ন্ত্রিত, যাহাবা মুক্তি চায তাহাবা এই সব কর্ম কবিতে পাবে, এই সকল কর্ম যে তাহাদের কামনানুযাযী এবং মনোমত সেজন্য নহে, শাস্ত্রে মুক্তিকামীগণকে এই সকল কর্ম কবিবার বিধি বা আদেশ দেওয়া হইয়াছে বলিযাই তাহাদিগকে এই সকল নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম কবিতে হয়। কিন্তু কর্মেব নীতি এরূপ বাহ্য না হইয়া যদি আভ্যন্তরীণ হয, যদি মুক্ত এবং জ্ঞানী ব্যক্তিদেরও কর্ম তাঁহাদেব স্বভাবের দ্বাবা নিযন্ত্রিত (স্বভাব-নিযতম্) করিতে হয তাহা হইলে কামনা ব্যতীত কর্মেব আব কোন আভ্যন্তবীণ নীতিই নাই, এই কামনা উচ্চ বা নীচ হইতে পারে, শবীরের ভোগেব কামনা হইতে পাবে, কিন্তু এসবই প্রকৃতিব গুণেব অধীন। অতএব গীতার "নিয়ত কর্ম" বলিতে বেদেব "নিত্য-কর্ম", আর্যসমাজেব নীতি অনুযাযী "কর্তব্য কর্ম" বুঝিতে হইবে এবং গীতাব যজ্ঞার্থে কর্ম বলিতে ব্যক্তিগত স্বার্থ ও কামনাশূন্য হইযা বেদোক্ত যজ্ঞ এবং নির্দিষ্ট সামাজিক কর্তব্যসমূহেরই অনুষ্ঠান বুঝিতে হইবে। গীতাব নিষ্কাম কর্মেব অনেকেই এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। কিন্তু আমাব মনে হয় গীতাব অর্থ এরূপ স্থূল ও সহজ নহে, এরূপ সঙ্কীর্ণ এবং দেশকালে সীমাবদ্ধ নহে। গীতাব শিক্ষা উদাব, মুক্ত, সূক্ষ্ম এবং গভীব; ইহা সকল যুগেব সকল মনুষ্যেবই

শ্লোকেব "নিযম্য" শব্দকে লইযাই যে এই শ্লোকে "নিযতং" কবা হইযাছে তাহাতে আব সন্দেহ নাই। প্রথমে কৃষ্ণ একটা তথ্য বর্ণনা কবিলেন যে, যে ব্যক্তি মনেব দ্বাবা ইন্দ্রিযগণকে নিয়মিত করিযা কর্মেন্দ্রিযেব দ্বাবা কর্মযোগ অনুষ্ঠান কবে সেই শ্রেষ্ঠ—মনসা নিযম্য আবভতে কর্ম্মযোগম্, এবং ইহাব পবেই এই তথ্য বর্ণনা হইতে একটা উপদেশ বাহিব করিলেন, ইহাব সাবটুকু লইযা ইহাকে একটি বিধিতে পবিণত কবিলেন—নিযতং কুরু কর্ম্ম ত্বম্—তুমি নিযত কর্ম কব। এখানে "নিয়তং" শব্দে "নিযম্য"কে লওযা হইযাছে এবং আবভতে কর্ম্মযোগম্ হইতে বিধি কবা হইযাছে, কুরু কর্ম্ম। বাহ্যবিধিদ্বাবা নির্দিষ্ট নৈমিত্তিক কর্ম নহে, মুক্ত বুদ্ধিব দ্বাবা নিযত কামনাশূন্য কর্মই গীতাব শিক্ষা।

উপযোগী, কেবল কোন বিশেষ যুগ বা কোন বিশেষ দেশের জন্য নহে। বিশেষত, ইহা সকল সময়েই বাহ্য বিধিনিষেধের, খুঁটিনাটি অনুষ্ঠানের, গতানুগতিক ধারণাসমূহের বন্ধন ছাড়াইয়া মূল সত্যের দিকে গিয়াছে, আমাদের প্রকৃতির এবং আমাদের সত্তার প্রধান তত্ত্বগুলিরই হিসাব লইয়াছে। উদার দার্শনিক সত্য এবং প্রয়োগ-উপযোগী আধ্যাত্মিকতা লইয়াই গীতার শিক্ষা—ইহাতে ধর্মের গোঁড়ামি নাই, বাঁধাধরা বিধিনিষেধ বা বিশেষ দার্শনিক মতবাদে ইহা সীমাবদ্ধ নহে।

সমস্যা হইতেছে এই যে, আমাদের প্রকৃতি যখন এইরূপ এবং কামনাই যখন কর্মের সাধারণ নীতি তখন প্রকৃতভাবে নিষ্কাম কর্ম করা কিরূপে সম্ভব? কারণ সাধারণত যেসকল কর্মকে নিঃস্বার্থ কর্ম বলা যায় সেগুলি প্রকৃত নিষ্কাম নহে, ক্ষুদ্র স্বার্থের পরিবর্তে বৃহত্তর স্বার্থের জন্য—দেশের জন্য, মানবজাতির কল্যাণের জন্য সেসকল কর্ম করা হয়। এই সব কর্ম নৈর্ব্যক্তিক মনে হইলেও প্রকৃত পক্ষে নৈর্ব্যক্তিক (impersonal) নহে। আবার শ্রীকৃষ্ণ বারবার বলিয়াছেন যে, সকল কর্মই আমাদের প্রকৃতির দ্বারা, গুণের দ্বারাই সম্পাদিত হয়। আমরা যখন *শাস্ত্রানুসারে কর্ম করি তখনও আমরা নিজেদের প্রকৃতি অনুসারেই কর্ম করি।* সাধারণত যে সকল কর্মের বিধি শাস্ত্রে আছে সেগুলি পরোক্ষভাবে আমাদের স্বার্থেরই অনুকূল—আমাদের ব্যক্তিগত, জাতিগত বা সম্প্রদায়গত ভাব, স্বার্থ বা অহঙ্কারের অনুকূল; কিন্তু যদিই অন্যরূপ ধরা যায়, যদি সেই সকল শাস্ত্রোক্ত কর্মের কথা ধরা যায় যেগুলির সহিত আমাদের ছোট-বড় কোনরূপ স্বার্থের সম্পর্ক নাই—সেগুলিও আমরা আমাদের প্রকৃতির বশেই করিয়া থাকি, কারণ, আমাদের স্বভাব যদি ভিন্নরূপ হইত তাহা হইলে হয়তো আমরা ঐসকল শাস্ত্রোক্ত কর্ম করিতে যাইতাম না—হয় আমরা শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগ করিয়া নিজেদের সুখের অনুসন্ধানেই কর্ম করিতাম অথবা নিজেদের বুদ্ধির দ্বারা কর্তব্য বাছিয়া লইতাম—নতুবা সমাজের বন্ধন ছিন্ন করিয়া একক তপস্বী বা সন্ন্যাসীর জীবন যাপন করিতাম। আমাদের বাহিরের কোন আইনকানুন মানিয়া আমরা নৈর্ব্যক্তিক হইতে পারি না, কারণ এইভাবে আমরা নিজেদের বাহিরে যাইতে পারি না, শুধু আমাদের ভিতরেই যে শ্রেষ্ঠ সত্তা রহিয়াছে তাহাতে উঠিতে পারিলে, আমাদের যে মুক্ত আত্মা সর্বভূতেরই এক আত্মা অতএব সকল ব্যক্তিক স্বার্থ হইতে মুক্ত, তাহাতে উঠিতে পারিলে আমরা প্রকৃতভাবে নৈর্ব্যক্তিক হইতে পারি। বিশ্বের অতীত যে ঈশ্বর আমাদের মধ্যে রহিয়াছেন, যিনি তাঁহার বিশ্বকর্ম বা ব্যক্তিগত কর্ম কিছু দ্বারাই বদ্ধ নহেন, সেইখানে আমাদিগকে উঠিতে হইবে। গীতা ইহাই শিক্ষা দিয়াছে—কামনাশূন্যতা ইহার উপায় মাত্র, শুধু কামনা-শূন্যতাই জীবনের লক্ষ্য নহে। বুঝিলাম, কিন্তু কেমন করিয়া ইহা হইতে পারে? ভগবান বলিলেন, যজ্ঞকেই একমাত্র লক্ষ্য করিয়া সকল কর্ম করিলে ইহা হইতে পারে।

যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর॥৩।৯

—"যজ্ঞার্থে কর্ম ব্যতীত অন্য কর্ম করিলে লোকে কর্মে বদ্ধ হয়। অতএব, হে কৌন্তেয়, আসক্তিশূন্য হইয়া যজ্ঞার্থে কর্ম অনুষ্ঠান কর।" শুধু যজ্ঞ এবং সামাজিক কর্তব্য নহে, সকল কর্মই যজ্ঞার্থে করা যাইতে পারে, প্রত্যেক কর্মই ছোট বা বড় স্বার্থের জন্য করা যাইতে পারে অথবা ঈশ্বরার্থে করা যাইতে পারে। প্রকৃতির সকল বস্তু এবং সকল কর্মই ঈশ্বরের জন্য। ঈশ্বর হইতেই ইহার উৎপত্তি, তাঁহার দ্বারাই ইহা রক্ষিত হয়, এবং তাঁহার দিকেই ইহার লক্ষ্য। কিন্তু যতদিন আমরা অহংভাবের (ego-sense) অধীন, ততদিন আমরা এই সত্য উপলব্ধি করিতে পারি না, ততদিন আমরা অহংভাবের বশে স্বার্থের জন্য কর্ম করি, যজ্ঞার্থে নহে। অহঙ্কারই সকল বন্ধনের গ্রন্থি। অহং সম্বন্ধে কোন চিন্তা না করিয়া ভগবানের উদ্দেশ্যে কর্ম করিলে আমরা এই গ্রন্থি শিথিল করিতে এবং শেষকালে মুক্তিলাভ করিতে পারিব।

যাহাই হউক, গীতা প্রথমে যজ্ঞের বেদোক্ত বর্ণনাই ধরিয়াছে এবং তৎকালীন প্রচলিত ভাষাতেই যজ্ঞের স্বরূপ ব্যক্ত করিয়াছে। গীতা একটি বিশেষ উদ্দেশ্যেই ইহা করিয়াছে। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে, সন্ন্যাস ও কর্মের যে বিরোধ তাহা দুই প্রকারের—প্রথমত, সাংখ্য ও যোগের মধ্যে যে বিরোধ, মূল নীতিতে এই বিরোধের সমাধান ইতিপূর্বেই করা হইয়াছে, দ্বিতীয়ত, বেদবাদ ও বেদান্তবাদের মধ্যে যে বিরোধ তাহা সমাধান করিতে এখনও বাকী আছে। প্রথমটিতে এই বিরোধ সাধারণভাবেই ব্যক্ত হইয়াছে এবং কর্ম শব্দ সাধারণ ব্যাপক অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে। সাংখ্যের আবদ্ধ অক্ষর ও নিষ্ক্রিয় পুরুষের দিব্যভাব লইয়া—প্রত্যেক জীবই প্রকৃতপক্ষে এইরূপ পুরুষ, সাংখ্যে পুরুষের নিষ্ক্রিয়তা এবং প্রকৃতির ক্রিয়াশীলতার প্রভেদ করিয়াছে—অতএব কর্মত্যাগই সাংখ্যমতে ন্যায়সঙ্গত পরিণতি। যোগের আবদ্ধ ঈশ্বরতত্ত্ব লইয়া—ঈশ্বর প্রকৃতির কার্যাবলীর প্রভু অতএব তাহাদের উপরে, সুতরাং কর্মসন্ন্যাস কর্মের উপর জীবের প্রাধান্যলাভ এবং সকল কর্ম করিতে থাকিলেও মুক্ত থাকা ইহাই যোগের লক্ষ্য। বেদবাদ ও বেদান্তবাদের মধ্যে যে বিরোধ সেখানে কর্ম বলিতে বৈদিক কর্ম, এমনকি কখনও কেবল বৈদিক যজ্ঞ ও আনুষ্ঠানিক কর্মই বুঝায়—অন্য কর্ম মুক্তির সহায় নহে বলিয়া পরিত্যাজ্য। মীমাংসকগণের যে বেদবাদ তদনুসারে এই সকল কর্ম মুক্তির উপায়স্বরূপ সম্পাদন করিতেই হইবে; উপনিষদের উপর প্রতিষ্ঠিত বেদান্তবাদ অনুসারে অজ্ঞান অবস্থায় প্রাথমিক প্রক্রিয়াভাবেই কর্মের উপযোগিতা, শেষে কর্মকে অতিক্রম করিতে হইবে, পরিত্যাগ করিতে হইবে কারণ ইহা মুক্তির পরিপন্থী। বেদবাদ যজ্ঞের দ্বারা দেবতার পূজা করিত এবং বিশ্বাস করিত যে, তাঁহারা আমাদের মোক্ষলাভে সাহায্য করেন। বেদান্তবাদের

মতে দেবতাসকল মানসিক এবং জড়-জগতের শক্তি ও আমাদের মুক্তির পরিপন্থী (উপনিষদে কথিত হইয়াছে যে, মানুষ দেবতাদের গোধনস্বরূপ—তাঁহারা চান না যে মানুষ জ্ঞানলাভ করে বা মুক্ত হয়), এই মতে ভগবান অক্ষর ব্রহ্ম—তাঁহাকে যজ্ঞ ও পূজা আদি কর্মের দ্বারা লাভ করা যায় না, জ্ঞানের দ্বারাই তাঁহাকে লাভ করা যায়। কর্মের দ্বারা শুধু ঐহিক ফল এবং নিম্নতর স্বর্গলাভ করা যায়, অতএব কর্ম পরিত্যাগ করিতে হইবে।

গীতা এই বিরোধের মীমাংসা করিয়াছে—গীতা পুনঃপুনঃ বলিয়াছে যে, দেবতারা সকল যোগ, পূজা, যজ্ঞ ও তপস্যার প্রভু সেই এক দেবের, ঈশ্বরের, বিভিন্ন রূপ মাত্র, এবং যদি ইহা সত্য হয় যে, দেবতাদের উদ্দেশে যজ্ঞ করিলে ঐহিক সুখ এবং স্বর্গ লাভ করা যায় তাহা হইলে ইহাও সত্য যে ঈশ্বরের উদ্দেশে যজ্ঞ করিলে তাহাদের উপরে যাইয়া পরম মুক্তি লাভ করা যায়। কারণ ঈশ্বর এবং অক্ষর ব্রহ্ম বিভিন্ন নহেন, উভয়েই এক—উভয়ের মধ্যে যাহাকে হউক লক্ষ্য করিলে একই দিব্যজীবনের অভিমুখী হওয়া যায়। সকল কর্মেরই পরিণতি ও পূর্ণতা হইতেছে ভগবানের জ্ঞানে, সর্ব্বং কর্ম্মাখিলম্ পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে। কর্মসকল বাধা নহে, তাহারা চরম জ্ঞানলাভের পথ। এইরূপে যজ্ঞ শব্দের উদার ব্যাখ্যা করিয়া এই বিরোধেরও সামঞ্জস্য করা হইল। বাস্তবিক, এই বিরোধ সাংখ্য ও যোগের মধ্যে বৃহত্তর বিরোধেরই একটি বিশিষ্ট রূপ। বেদবাদ একরকম সঙ্কীর্ণ বিশেষ রকমের যোগ, বৈদান্তিকদের মূল নীতি সাংখ্যদের সহিত এক, কারণ উভয় মতানুসারেই বুদ্ধিকে প্রকৃতির ভেদাত্মক শক্তিসকল হইতে, অহঙ্কার, মন, ইন্দ্রিয় হইতে, অন্তঃকরণের বৃত্তি এবং বাহ্য বিষয়সকল হইতে ফিরাইয়া লইয়া সেই অভিন্ন অক্ষরে লইয়া আসাই মুক্তিলাভের সাধনা। এইরূপ সামঞ্জস্যসাধনের উদ্দেশ্য মনে রাখিয়াই গুরু প্রথমে যজ্ঞের বর্ণনা করিয়াছেন; কিন্তু প্রথম হইতে বরাবরই তাঁহার লক্ষ্য সঙ্কীর্ণ বেদোক্ত যজ্ঞ ও অনুষ্ঠানের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকিয়া তাহাদের উদার ব্যাপক অর্থের উপরই ছিল। এইরূপে সঙ্কীর্ণ আনুষ্ঠানিক ধারণাগুলিকে বিস্তৃত করিয়া তাহাদের মধ্যে বৃহৎ সাধারণ সত্যগুলিকে লওয়া সকল সময়েই গীতার বিশিষ্ট প্রণালী।

দ্বাদশ অধ্যায়

যজ্ঞের মর্ম

গীতা যজ্ঞ বলিতে যাহা বুঝে তাহা দুইটি বিভিন্ন স্থানে ব্যক্ত করা হইয়াছে। একটি ব্যাখ্যা তৃতীয় অধ্যায়ে, অপরটি চতুর্থ অধ্যায়ে, প্রথমটির ভাষা এরূপ যে শুধু তাহাই ধরিলে যজ্ঞ বলিতে আনুষ্ঠানিক (বৈদিক) যজ্ঞ বুঝায় বলিয়াই মনে হয়, দ্বিতীয় ব্যাখ্যায় যজ্ঞকে উদার দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক সত্যের রূপক বলিয়াই বুঝান হইয়াছে, এবং উহাকে উচ্চ মনস্তত্ত্বমূলক ও অধ্যাত্ম সত্যের স্তরে উন্নীত করা হইয়াছে।

সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ।
অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষ বোঽস্ত্বিষ্টকামধুক্॥
দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ।
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ॥
ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ।
তৈর্দ্দত্তানপ্রদায়ৈভ্যো যো ভুঙ্‌ক্তে স্তেন এব সঃ॥
যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ।
ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ॥
অন্নাদ্ভবন্তি ভূতানি পর্জ্জন্যাদন্নসম্ভবঃ।
যজ্ঞাদ্ভবতি পর্জ্জন্যো যজ্ঞঃ কর্ম্মসমুদ্ভবঃ॥
কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবম্।
তস্মাৎ সর্ব্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্॥
এবং প্রবর্ত্তিতং চক্রং নানুবর্ত্তয়তীহ যঃ।
অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি॥৩।১০-১৬

"সৃষ্টির প্রথমে প্রজাপতি ব্রহ্মা যজ্ঞ সহিত প্রজাসকল সৃষ্টি করিয়া বলিয়াছেন, এই যজ্ঞ দ্বারা তোমরা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিলাভ কর; এই যজ্ঞই তোমাদিগকে মনোবাঞ্ছিত ফল প্রদান করুক। এই যজ্ঞের দ্বারা তোমরা দেবগণকে সম্বর্ধন কর। সেই দেবগণও তোমাদিগকে সম্বর্ধিত করুন, এইরূপে পরস্পরের সম্বর্ধন করিতে করিতে তোমরা পরম মঙ্গল লাভ করিবে। যজ্ঞের দ্বারা সম্বর্ধিত হইয়া দেবগণ তোমাদিগকে অভীষ্ট ভোগ প্রদান করিবেন, এই দেবদত্ত ভোগ লাভ করিয়া যে ব্যক্তি দেবতাদিগকে প্রদান না করিয়া স্বয়ং ভোগ করে সে চোরই। যাঁহারা যজ্ঞাবশেষ অন্ন ভোজন করেন, তাঁহারা সকল পাপ হইতে মুক্ত হন; কিন্তু যাহারা কেবল আপনার জন্যই অন্ন পাক করে, সেই পাপিষ্ঠগণ পাপই ভোজন করে। অন্ন

হইতে জীবগণ উৎপন্ন হয; মেঘের বৃষ্টি হইতে অন্ন জন্মে, যজ্ঞ হইতে মেঘ এবং কর্ম হইতে যজ্ঞ উৎপন্ন হইয়া থাকে; কর্ম ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন জানিও, ব্রহ্ম অক্ষর হইতে সমুৎপন্ন, অতএব সর্বব্যাপী ব্রহ্ম যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত আছেন। ইহলোকে এইরূপে প্রবর্তিত চক্র যে অনুবর্তন না করে, হে পার্থ, পাপময় জীবন ইন্দ্রিযপরাযণ সে ব্যক্তি বৃথা জীবিত থাকে।" এইস্থানে যজ্ঞ বলিতে বেদানুমোদিত আনুষ্ঠানিক যজ্ঞই বুঝাইতেছে বলিযা যে মনে হয ইহার প্রকৃত মর্ম কি তাহা আমরা পরে দেখিতে পাইব। শ্রীকৃষ্ণ এখানে যজ্ঞের প্রযোজনীযতা বুঝাইযা কর্ম অপেক্ষা আধ্যাত্মিক মানবের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করিতে অগ্রসর হইলেন।

যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাৎ আত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ।
আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে॥
নৈব তস্য কৃতেনার্থো নাকৃতে নেহ কশ্চন।
ন চাস্য সর্ব্বভূতেষু কশ্চিদর্থব্যপাশ্রযঃ॥৩।১৭-১৮

"কিন্তু যিনি কেবল আত্মাতেই প্রীত, আত্মাতেই পরিতুষ্ট এবং আত্মাতেই সন্তুষ্ট, তাঁহার কর্মানুষ্ঠান অনাবশ্যক। ইহলোকে তাঁহার কর্ম করিযা কোন লাভ নাই, কর্ম না করিযাও কোন লাভ নাই, কোন ঈপ্সিত বস্তু লাভের জন্য তাঁহাকে সর্বভূতের মধ্যে কাহারও উপর নির্ভর করিতে হয না।"

তাহা হইলে এখানে দুইটি বিভিন্ন বিরোধী আদর্শ দেখা যাইতেছে। একটি বৈদিক, অপরটি বৈদান্তিক। একদিকে কর্মের আদর্শ, যজ্ঞের দ্বারা এবং মনুষ্য ও দেবগণের পরস্পরের উপর নির্ভরতা দ্বারা ইহকালে ভোগসুখ ও পরকালে পরমার্থ লাভ, অন্যদিকে মুক্ত পুরুষের কঠোরতর জীবনের আদর্শ—তিনি আত্মসত্তায স্বাধীন, কর্ম বা ভোগের সহিত তাঁহার সম্পর্ক নাই, নরলোক বা দেবলোক লইয়া তিনি ব্যস্ত নহেন—শুধু পরমাত্মার শান্তির মধ্যে তিনি বাস করেন, ব্রহ্মের স্থির আনন্দে তিনি আনন্দলাভ করেন। পরের কয়েকটি শ্লোকে এই দুইটি বিরোধী আদর্শের সমন্বযের পথ করা হইযাছে, উচ্চতর সত্যের অভিমুখ হইলেই কর্ম ত্যাগ করিতে হইবে না—সেই সত্য লাভ করিবার পূর্বে ও পরে নিষ্কাম কর্মসাধনই গূঢ় রহস্য। মুক্ত পুরুষের কর্মের দ্বারা লাভ করিবার কিছুই নাই, তবে কর্ম হইতে বিরত থাকিয়াও তাঁহার কোন লাভ নাই এবং কোন ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য তাঁহাকে কর্ম করিতে বা কর্ম ত্যাগ করিতে হয না।

তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর।
অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ॥৩।১৯
কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদযঃ।৩।২০

"অতএব যে কর্ম করিতে হইবে (জগতের জন্য, লোকসংগ্রহার্থে) সর্বদা অনাসক্ত হইয়া তাহা কর, কারণ অনাসক্ত হইযা কর্মানুষ্ঠান করিলে মানুষ

পরমগতি প্রাপ্ত হয। কারণ জনক প্রভৃতি মহাত্মারা কর্ম দ্বারাই সিদ্ধিলাভ করিযাছেন।" ইহা সত্য যে, কর্ম এবং যজ্ঞ শ্রেয়োলাভের উপায, শ্রেযং পরমবাপ্স্যর্থ। কিন্তু কর্ম তিন প্রকার—(১) যজ্ঞহীন যে কর্ম শুধু ব্যক্তিগত ভোগের জন্য করা যায—ইহা সম্পূর্ণ স্বার্থপ্রণোদিত, এবং জীবনের মূল নীতির সহিত ইহার সামঞ্জস্য না থাকায় ইহা ব্যর্থ, মোঘং পার্থ স জীবতি। (২) সকাম হইযাও যে কর্ম যজ্ঞসহিত করা যায—এই কর্মে যে ভোগসুখ লাভ করা যায তাহা হয যজ্ঞের ফল স্বরূপ, অতএব ততখানি শুদ্ধ ও পবিত্র। (৩) নিষ্কামভাবে কোনরূপ আসক্তি না রাখিযা যে কর্ম করা যায়। শেষোক্ত প্রকারের কর্মের দ্বারাই পরমগতি লাভ করা যায, পরমাপ্নোতি পুরুষঃ।

যজ্ঞ, কর্ম, ব্রহ্ম—এই শব্দগুলির আমরা যেরূপ অর্থ করিব তাহার উপরেই এই শিক্ষার সারমর্ম নির্ভর করিতেছে। যজ্ঞ বলিতে যদি আমরা বৈদিক আনুষ্ঠানিক যজ্ঞই বুঝি, যে কর্ম হইতে ইহার উদ্ভব তাহা যদি বেদোক্ত কর্মবিধি হয এবং যে-ব্রহ্ম হইতে সকল কর্মের উদ্ভব তাহা বলিতে যদি আমরা "শব্দব্রহ্ম" বা বেদ বুঝি—তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, এখানে গীতা বেদোক্ত নিত্য-নৈমিত্তিক কর্মেরই উপদেশ দিযাছে, ইহার অধিক আর কিছুই নাই। আনুষ্ঠানিক যজ্ঞই পুত্র, ধন, ভোগলাভের যথাযথ উপায, আনুষ্ঠানিক যজ্ঞের দ্বারাই বৃষ্টি হয এবং তাহা দ্বারা প্রজার সমৃদ্ধি ও বংশবৃদ্ধি হইয়া থাকে, সমস্ত জীবনই মানুষ ও দেবগণের মধ্যে অনবরত আদানপ্রদানের ব্যাপার—এখানে মানুষ দেবগণের প্রদত্ত ভোগ্য বস্তুর দ্বারা দেবগণের সম্বর্ধন করে এবং তাহার ফলে নিজেরা সম্পদশালী হয, রক্ষিত হয, সম্বর্ধিত হয। অতএব সকল কর্মকেই আনুষ্ঠানিক যজ্ঞের সহিত করিতে হইবে; যেসকল কর্ম এইরূপে দেবগণের উদ্দেশে করা না হয তাহা অভিশপ্ত, আনুষ্ঠানিক যজ্ঞ না করিযা যে ভোগ, তাহা পাপ। এমনকি পরম শ্রেযঃ মুক্তি পর্যন্ত আনুষ্ঠানিক যজ্ঞের দ্বারাই লাভ করিতে হইবে। ইহা কখনও পরিত্যাগ করা চলিবে না। এমনকি মুক্তিকামী ব্যক্তিকেও অনাসক্তভাবে আনুষ্ঠানিক যজ্ঞ সম্পাদন করিতে হইবে। এইরূপে আনুষ্ঠানিক যজ্ঞ নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম অনাসক্তভাবে সম্পাদন করিয়াই জনকাদি মহাত্মাগণ অধ্যাত্মমুক্তি ও সিদ্ধিলাভ করিযাছেন।

গীতার অর্থ যে এরূপ হইতেই পারে না তাহা সহজেই বুঝা যায, কারণ এরূপ অর্থ গীতার বাকী সমস্ত অংশের বিপরীত। এমনকি গীতার এই স্থানেই যাহা বলা হইযাছে, (অন্যস্থানের প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা না ধরিলেও) তাহা হইতে যজ্ঞের উদার অর্থই বুঝা যায কারণ, এখানে বলা হইযাছে "কর্ম হইতে যজ্ঞ উদ্ভূত হয, কর্ম ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন, ব্রহ্ম অক্ষর হইতে উৎপন্ন, অতএব সর্বগত (সর্বব্যাপী) ব্রহ্ম সর্বদা যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত আছেন।" এখানে এই "অতএব" শব্দের ব্যবহার এবং "ব্রহ্ম" শব্দের পুনরুক্তি প্রণিধানযোগ্য, কারণ ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, "কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং" (ব্রহ্ম হইতেই কর্মের উৎপত্তি)। এই স্থলে ব্রহ্মের অর্থ বেদ নহে, ইহা

হইতেছে সৃজনাত্মক শব্দ (the creative word), ইহা সর্বব্যাপী, সনাতন, সর্বভূতে এবং সর্বকর্মে অবস্থিত ব্রহ্মের সহিত এক। ভগবানের শাশ্বতের জ্ঞানই বেদ—পরবর্তী এক অধ্যায়ে ভগবান বলিয়াছেন—

"বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যো"

"বেদসকলের দ্বারা আমিই বেদ্য অর্থাৎ জ্ঞাতব্য বিষয়।" কিন্তু তিনি প্রকৃতির ক্রিয়ার মধ্যে, ত্রিগুণের ক্রিয়ার মধ্যে যেরূপ, বেদে শুধু তাঁহাকে সেইরূপেই জানা যায়, ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদাঃ। প্রকৃতির ক্রিয়ার মধ্যস্থিত যে ব্রহ্ম তাহা অক্ষর পুরুষ হইতে সমুদ্ভূত, এই অক্ষর পুরুষ প্রকৃতির সমস্ত গুণক্রিয়ার উপরে, নিস্ত্রৈগুণ্য। ব্রহ্ম এক কিন্তু ইহার আত্মপ্রকাশের স্বরূপ দুইপ্রকার—অক্ষর সত্তা এবং ক্ষর জগতে সকল কর্মের স্রষ্টা ও উদ্ভবকর্তা, আত্মা, সর্ব্বভূতানি, ইহা বস্তুসকলের অচল সর্বব্যাপী আত্মা এবং ইহা বস্তুসকলের সকল কর্মধারায় আধ্যাত্মিক তত্ত্ব—আত্মসংস্থ পুরুষ এবং প্রকৃতিতে ক্রিয়াশীল পুরুষ, ইহা অক্ষর ও ক্ষর। এই উভয় স্বরূপেই ভগবান "পুরুষোত্তম" বিশ্বমাঝে নিজেকে প্রকাশ করিয়াছেন, সর্বগুণের অতীত অক্ষরই তাঁহার শান্তি, আত্মস্থতা, সমতার অবস্থা, "সমম্ ব্রহ্ম", তথা হইতেই প্রকৃতির গুণে এবং তাহাদের বিশ্বকর্মধারায় তাঁহার প্রকটন চলিয়াছে, প্রকৃতিস্থ পুরুষ হইতে, এই সগুণ ব্রহ্ম হইতেই বিশ্বশক্তির সমস্ত কর্মের[১] উৎপত্তি, এই কর্ম হইতেই যজ্ঞের তত্ত্ব উদ্ভূত। এমনকি দেবতা ও মনুষ্যগণের মধ্যে যে দ্রব্যাদির আদানপ্রদান তাহাও এই তত্ত্বেরই অনুসরণে ঘটিয়া থাকে, যথা—যে বৃষ্টি হইতে অন্ন উৎপন্ন হয় সেই বৃষ্টি এই কর্মের উপর নির্ভর করে এবং অন্ন হইতে ভূতগণের শরীরের উদ্ভব হয়। কারণ প্রকৃতির সকল ক্রিয়াই প্রকৃতপক্ষে যজ্ঞ এবং ভগবানই সকল কর্ম ও যজ্ঞের ভোক্তা এবং সর্বভূতের মহেশ্বর—ভোক্তারং যজ্ঞতপসাম্ সর্ব্বভূতমহেশ্বরম্। এই "সর্ব্বগতম্ যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্" ভগবানকে জানাই সত্য জ্ঞান, বৈদিক জ্ঞান।

কিন্তু দেবগণের ভিতর দিয়া তাঁহার যে নিম্নস্তরের ক্রিয়া সেই ক্রিয়াতে তাঁহাকে জানা যাইতে পারে। দেবগণ প্রকৃতিতে ভগবানেরই শক্তি। দেব ও মনুষ্য

[১] এইরূপ ব্যাখ্যাই যে সমীচীন, অষ্টম অধ্যায়ের প্রথম ভাগ হইতেই তাহা বুঝা যায়, সেখানে নিম্নলিখিত বিশ্বতত্ত্বগুলি বর্ণিত হইয়াছে, অক্ষর (ব্রহ্ম), স্বভাব, কর্ম, ক্ষরভাব, পুরুষ, অধিযজ্ঞ। অক্ষর হইতেছে অক্ষর ব্রহ্ম বা আত্মা (spirit of self), স্বভাব অধ্যাত্ম, ইহা সত্তার মূল প্রকৃতিরূপে, বিবর্তনের নিজস্ব ধারারূপে কর্ম করে এবং ইহা আত্মা হইতে, অক্ষর হইতে উৎপন্ন, সেই স্বভাব হইতে কর্মের উৎপত্তি এবং এই কর্মই সৃষ্টির ধারা, বিসর্গ, ইহার দ্বারা সকল প্রাকৃত সত্তা এবং সত্তার সকল পরিবর্তনশীল আন্তর ও বাহ্য রূপ উদ্ভূত হয়, অতএব এই পরিবর্তনশীল জগৎ সবই কর্মের ফল, স্বভাব হইতে উৎপন্ন ক্ষরভাব, অন্তরাত্মাই পুরুষ—এই ক্ষর জগতে তাহাই ভগবানের অংশ, অধিদৈবতম, তাঁহার অবস্থান হেতু কর্মসকল অন্তরস্থ ভগবানের উদ্দেশে যজ্ঞস্বরূপ হইয়া থাকে, এই যে গুপ্ত ভগবান যজ্ঞ করেন, তিনিই অধিযজ্ঞ।

পরস্পরের সহিত আদানপ্রদানের দ্বারা যে সম্বর্ধিত হইতেছে ইহার অনুসরণ করিয়া মনুষ্য ক্রমশ পরম শ্রেয়োলাভের যোগ্য হইয়া উঠে। মানুষ বুঝিতে পারে যে, জগতে ভগবানের এই যে কর্মধারা চলিতেছে, তাহার নিজের জীবন তাহারই অংশ মাত্র—তাহা স্বতন্ত্র কিছু নহে, নিজের জন্য যাপন করিবার জিনিস নহে। সে সংসারে যেসকল ভোগ ও কাম্য লাভ করে তাহা তাহার নিজের চেষ্টায় লব্ধ বলিয়া ভাবে না। সেইসকল যজ্ঞের ফল এবং দেবতাদের দান বলিয়াই সে গ্রহণ করে, অহংভাবে ও স্বার্থপরতার বশে নিজের শক্তিতেই সংসার হইতে সেসব লইবার পাপ-চেষ্টা সে করে না। এই ভাব তাহার ভিতরে যতই বর্ধিত হয়, ততই সে নিজের কামনাসকলকে দমন করে, যজ্ঞকেই জীবনের ও কর্মের নীতিরূপে গ্রহণ করিয়া সন্তুষ্ট হয়, যজ্ঞের অবশেষ স্বরূপ যাহা থাকে তাহাতেই তৃপ্ত হয়; বাকী সমস্তই নিঃসঙ্কোচে তাহার জীবন এবং বিশ্বের জীবনের মধ্যে কল্যাণকর মহান আদানপ্রদানে অর্ঘ্যস্বরূপ প্রদান করে। যাহারা কর্মে এই নীতির বিরুদ্ধাচরণ করে এবং স্বতন্ত্র ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্যই ভোগ ও কর্মের অনুসরণ করে তাহাদের জীবন বৃথা। তাহারা জীবনের এবং আত্মোন্নতির প্রকৃত অর্থ ও উদ্দেশ্য ও উপযোগিতা ধরিতে পারে নাই। যে পথে পরম শ্রেয়োলাভ করা যাইতে পারে তাহারা সে পথের পথিক নহে। কিন্তু পরম শ্রেয়ঃ তখনই লাভ করা যায় যখন আর শুধু দেবগণের উদ্দেশে যজ্ঞ না করিয়া সেই সর্বব্যাপী, যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত পরমেশ্বরের উদ্দেশে করা হয়, দেবগণ যাঁহার নিম্নতন রূপ ও শক্তি। পরম শ্রেয়োলাভ তখনই হয়, যখন মানুষ নিম্ন প্রকৃতির কামনা, বাসনা পরিত্যাগ করে, নিজে সমস্ত করিতেছে এই অহঙ্কার পরিত্যাগ করিয়া প্রকৃতিকেই সকল কর্মের প্রকৃত কর্ত্রী বলিয়া বুঝিতে পারে এবং নিজেকে সকল কার্যের ভোক্তা বলিয়া মনে না করিয়া বিশ্বাত্মা পরম পুরুষকেই প্রকৃতির সকল কার্যের ভোক্তা বলিয়া উপলব্ধি করে। নিজের ব্যক্তিগত ভোগ নহে, কিন্তু সেই পরমাত্মাতেই তখন সে তাহার একমাত্র তৃপ্তি, পূর্ণ সন্তোষ ও বিমল আনন্দ ভোগ করে, তখন কর্ম বা কর্মশূন্যতায় তাহার কোন লাভালাভ থাকে না, তখন সে কোন বস্তুর জন্য দেব বা মনুষ্য কাহারও মুখ চাহিয়া থাকে না, কাহারও নিকট কোন লাভের প্রত্যাশা করে না কারণ আত্মানন্দেই তাহার সম্পূর্ণ তৃপ্তি, কিন্তু সে শুধু ভগবানের জন্যই যজ্ঞরূপে আসক্তিশূন্য ও কামনাশূন্য হইয়া কর্ম করে। এইরূপে সে সমতা লাভ করে এবং প্রকৃতির গুণ হইতে মুক্তিলাভ করে, নিস্ত্রৈগুণ্য হয়; তাহার আত্মা প্রকৃতির অনিশ্চয়তার মধ্যে নহে, কিন্তু অক্ষর ব্রহ্মের শান্তিতেই প্রতিষ্ঠিত হয়, যদিও তখনও প্রকৃতির কর্মধারার মধ্যে তাহার কর্ম চলিতে থাকে। এইরূপে যজ্ঞই হয় তাহার পরম শ্রেয়োলাভের পথ।

গীতায় পরে যাহা বলা হইয়াছে তাহা হইতেই স্পষ্ট বুঝা যায় যে, আমরা যেরূপ ব্যাখ্যা করিলাম ইহাই ঠিক। পরে বলা হইয়াছে, 'লোকসংগ্রহই' কর্মের উদ্দেশ্য, একমাত্র প্রকৃতিই সমস্ত কর্ম করিয়া থাকে, ভাগবত পুরুষ সকল

কার্যেরই সমান ভর্তা (upholder) এবং সকল কর্ম কার্যকালেই তাঁহাকে অর্পণ করিতে হইবে (এইরূপে ভিতরে কর্মের অর্পণ এবং বাহিরে কর্মের সম্পাদন, ইহাই যজ্ঞের পরিণতি)। এইরূপে সমতার সহিত বাসনাশূন্য হইয়া যজ্ঞরূপে কর্ম করিলে কর্মের বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করা যায়।

যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টো দ্বন্দ্বাতীতো বিমৎসরঃ।
সমঃ সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ কৃত্বাপি ন নিবধ্যতে॥
গতসঙ্গস্য মুক্তস্য জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ।
যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে॥৪।২২-২৩

"যাহা পাওয়া যায় তাহাতেই যিনি সন্তুষ্ট, কর্মের সফলতা বা বিফলতায় যাঁহার সমভাব তিনি কর্ম করিয়াও বদ্ধ হন না। যখন কোন আসক্তিহীন মুক্ত পুরুষ যজ্ঞের জন্য কর্ম করেন তখন তাঁহার সমুদায় কর্ম লয়প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ তাঁহার মুক্ত, শুদ্ধ, সিদ্ধ এবং সমতাপ্রাপ্ত আত্মার উপর সেসকল কর্মের পরিণামস্বরূপ বন্ধন রহিয়া যায় না বা কোন দাগ পড়ে না।" পরে আমরা এই সকল শ্লোকের আলোচনা করিব। ইহাদের পরেই যজ্ঞের যে বিশদ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, যে-ভাষা প্রয়োগ করা হইয়াছে তাহা হইতেই নিঃসন্দেহে বুঝা যায় যে, এই সকল কথা রূপকভাবেই ব্যবহৃত হইয়াছে এবং গীতায় যে-যজ্ঞের শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে তাহা বাহ্যিক নহে, আন্তরিক। প্রাচীন বৈদিক প্রথায় সর্বত্রই দুই প্রকার অর্থ ছিল—শারীরিক এবং মনস্তত্ত্বমূলক, বাহ্যিক এবং রূপক, যজ্ঞের বাহ্যিক অনুষ্ঠান এবং তাহার সকল বিধানের গূঢ় অর্থ। কিন্তু প্রাচীন বৈদিকদের সেই গূঢ় কবিত্বময় রূপকের মর্ম লোকে বহুদিনই ভুলিয়া গিয়াছে এবং তাহার পরিবর্তে গীতাতে বেদান্ত এবং পরবর্তী যোগের শিক্ষা অনুসারে যজ্ঞের উদার দার্শনিক ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। যজ্ঞের অগ্নি স্থূল (material) অগ্নি নহে, উহা ব্রহ্মাগ্নি। সংযমই অগ্নি, অথবা শুদ্ধ ইন্দ্রিয়ক্রিয়াই অগ্নি, অথবা প্রাণায়ামের দ্বারা নিয়মিত প্রাণশক্তিই অগ্নি অথবা আত্মজ্ঞানই শ্রেষ্ঠ যজ্ঞের অগ্নি। যজ্ঞের অবশিষ্ট যাহা ভক্ষণ করা হয় তাহাকে অমৃত বলা হইয়াছে—তাহা ভোজন করিলে অমৃতত্ব লাভ করা যায়, এখানে প্রাচীন বৈদিক রূপকের কিছু রহিয়াছে—যজ্ঞের দ্বারা যে অমৃত অর্থাৎ অমৃতত্বপ্রদায়ী দিব্য আনন্দ লাভ করা যায়, দেবগণকে অর্পণ করা হয়, মানুষও পান করে, সোমরস ছিল সেই দিব্য আনন্দেরই স্থূল প্রতীক। মানুষ শরীর বা মনের দ্বারা যে কোন কর্ম দেবতাদের বা ভগবানের উদ্দেশে করে, অথবা নিজের ঊর্ধ্বতম আত্মা অথবা মানবজাতি ও সর্বভূতের আত্মার উদ্দেশে করে তাহাই হইতেছে অর্পণ।

যজ্ঞের এই বিশদ ব্যাখ্যার আরম্ভস্বরূপ বলা হইয়াছে যে, যজ্ঞের ক্রিয়া, যজ্ঞের সামগ্রী, যজ্ঞের কর্তা, যজ্ঞের গ্রহীতা, যজ্ঞের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সবই সেই এক ব্রহ্ম।

ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিনা॥৪।২৪

"অর্পণ ব্রহ্ম, উৎসর্গের দ্রব্য ব্রহ্ম, ব্রহ্মের দ্বারাই ইহা ব্রহ্মাগ্নিতে অর্পিত, ব্রহ্মকর্মে সমাধির দ্বারা ব্রহ্মই লভ্য।" অতএব এই জ্ঞানেই মুক্ত পুরুষকে যজ্ঞকর্ম করিতে হইবে। 'সোঽহম্' 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' 'এই আত্মাই ব্রহ্ম', এই সকল মহান বেদান্ত বাক্যে এই জ্ঞানই সূচিত হইয়াছে। ইহাই পূর্ণ অদ্বৈত জ্ঞান; একমেবাদ্বিতীয়ম্ সত্তাই কর্মের কর্তা, কর্ম এবং কর্মের লক্ষ্যরূপে আবির্ভূত, জ্ঞাতা জ্ঞান এবং জ্ঞেয়রূপে অভিব্যক্ত। যে বিশ্বশক্তিতে কর্ম অর্পণ করা হয় তাহা ভগবান। অর্পণের ক্রিয়া ভগবান, যাহা অর্পণ করা হয় তাহা ভগবানেরই বিশেষ রূপ; যিনি অর্পণ করেন তিনিও মানুষের ভিতরে ভগবান ভিন্ন আর কেহ নহেন; ক্রিয়া, কর্ম, যজ্ঞ সবই গতিরূপে কর্মরূপে ভগবান, যজ্ঞের দ্বারা যে লক্ষ্যে পৌঁছিতে হইবে তাহাও ভগবান। যে মনুষ্য এই জ্ঞানের অধিকারী এবং এই জ্ঞানানুসারে জীবনযাপন করে, কর্ম করে—তাহার পক্ষে কর্ম কোন বন্ধনই নহে, তাহার ব্যক্তিগত, অহংভাবে কৃত কোন কর্ম থাকিতে পারে না, শুধু ভাগবত পুরুষ তাঁহার নিজেরই সত্তায় ভাগবত প্রকৃতির দ্বারা কর্ম করেন, তাঁহার আত্মজ্ঞানসম্পন্ন বিশ্বশক্তিরূপ অগ্নিতে সমস্ত অর্পণ করেন। ভগবদ্‌মুখী এইসব কর্মের লক্ষ্য হইতেছে ভগবানের সহিত যুক্ত জীবের ভাগবত জ্ঞান, ভাগবত জীবন, ভাগবত চেতনা লাভ। ইহা জানা এবং এই ঐক্যসাধক-চৈতন্যে জীবনযাপন করা, কর্ম করাই মুক্ত হওয়া।

কিন্তু যোগীগণের মধ্যেও সকলেই এই জ্ঞান লাভ করিতে পারেন নাই।

দৈবমেবাপরে যজ্ঞং যোগিনঃ পর্য্যুপাসতে।
ব্রহ্মাগ্নাবপরে যজ্ঞং যজ্ঞেনৈবোপজুহ্বতি॥৪।২৫

"অন্য যোগীগণ দেবতাদের উদ্দেশে যজ্ঞানুষ্ঠান করেন; অপর যোগীরা ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে যজ্ঞের দ্বারাই যজ্ঞার্পণ করেন।" প্রথমোক্ত ব্যক্তিরা ভগবানকে বিভিন্ন রূপে, বিভিন্ন শক্তিতে কল্পনা করেন এবং বিভিন্ন সাধন, অনুষ্ঠান, বিভিন্ন ধর্মের দ্বারা তাঁহাকে লাভ করিতে চান, শেষোক্ত জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিগণের পক্ষে তাঁহারা যে কর্মই করুন সেসব ভগবানে অর্পণ করা, ঐক্যমূলক ভাগবত চৈতন্য ও শক্তির মধ্যে তাঁহাদের সকল কর্ম নিক্ষেপ করা—কেবল এই যজ্ঞই হয় তাঁহাদের একমাত্র সাধন, তাঁহাদের একমাত্র ধর্ম। যজ্ঞের সাধন বিবিধ; অর্পণ নানা প্রকারের। আত্মসংযমরূপ যে মনস্তত্ত্বমূলক যজ্ঞ তাহার দ্বারা উচ্চ আত্মজ্ঞান আত্মজয় লাভ করা যায়।

শ্রোত্রাদীনীন্দ্রিয়াণ্যন্যে সংযমাগ্নিষু জুহ্বতি।
শব্দাদীন্ বিষয়ানন্য ইন্দ্রিয়াগ্নিষু জুহ্বতি॥৪।২৬

সর্ব্বাণীন্দ্রিয়কর্ম্মাণি প্রাণকর্ম্মাণি চাপরে।
আত্মসংযমযোগাগ্নৌ জুহ্বতি জ্ঞানদীপিতে॥৪।২৭

"কেহ কেহ ইন্দ্রিয়সংযমরূপ অগ্নিতে শ্রোত্র প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণকে হোম করেন, অন্য কেহ কেহ ইন্দ্রিয়রূপ অগ্নিতে শব্দাদি বিষয়সকলকে নিক্ষেপ করেন। অপরে ব্রহ্মজ্ঞান-প্রদীপ্ত আত্মসংযম-যোগরূপ অগ্নিতে সমস্ত ইন্দ্রিয়কর্ম এবং প্রাণকর্ম হোম করেন।" অর্থাৎ একরকমের সাধনা আছে যাহাতে ইন্দ্রিয়ের বিষয়সমূহ গ্রহণ করা হয় অথচ এই ইন্দ্রিয়ক্রিয়ায় মনকে বিচলিত হইতে দেওয়া হয় না, ইন্দ্রিয়গণই যজ্ঞের পবিত্র অগ্নিস্বরূপ হয়। আর একরকম সাধনা আছে যাহাতে ইন্দ্রিয়গণকে শান্ত করা হয়, যেন মনের ক্রিয়ায় অন্তরাল হইতে শান্ত স্থির আত্মা তাহার বিশুদ্ধতায় আবির্ভূত হয়; আর একরকম সাধনা আছে—যখন আত্মাকে পরিজ্ঞাত হওয়া যায়, এই সাধনার দ্বারা সমস্ত ইন্দ্রিয়কর্ম এবং সমস্ত প্রাণকর্ম সেই এক স্থির শান্ত আত্মার মধ্যে গৃহীত হয়। যাঁহারা সিদ্ধির জন্য যত্ন করিতেছেন, তাঁহাদের যজ্ঞ স্থূল দ্রব্য সম্পর্কে হইতে পারে; দ্রব্যযজ্ঞ—ভক্ত যখন নৈবেদ্যাদির দ্বারা দেবতার পূজা করে তখন এইরূপ দ্রব্যযজ্ঞই করিয়া থাকে অথবা আত্মসংযমের কঠোর সাধনা এবং কোন উচ্চ উদ্দেশ্য সাধনে আত্মশক্তি নিয়োগ করাও এক রকম যজ্ঞ হইতে পারে, তপোযজ্ঞ অথবা রাজযোগী এবং হঠযোগীদের প্রাণায়াম বা অন্য কোনরূপ যোগ যজ্ঞ হইতে পারে। এই সমস্তই আত্মশুদ্ধির সহায়ক, সকল যজ্ঞই শ্রেষ্ঠ পদলাভের পন্থাস্বরূপ।

এই সকল বিভিন্নতার মধ্যে প্রধান জিনিস যাহা মূল নীতিরূপে সকলগুলিরই ভিতরে রহিয়াছে তাহা এই—নিম্নস্তরের ক্রিয়াগুলিকে দমন করিতে হইবে, বাসনার আধিপত্য কমাইয়া উচ্চস্তরের শক্তির প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে, ত্যাগের দ্বারা, আত্মোৎসর্গের দ্বারা, আত্মজয়ের দ্বারা, নীচ প্রবৃত্তিগুলিকে পরিত্যাগপূর্বক উচ্চতর ও বৃহত্তর আদর্শ গ্রহণের দ্বারা যে দিব্যতর আনন্দ পাওয়া যায় তাহারই অনুসরণ করিতে হইবে।

যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজো যান্তি ব্রহ্ম সনাতনম্।

যাঁহারা যজ্ঞাবশিষ্ট অমৃত ভোজন করেন তাঁহারা সনাতন ব্রহ্ম লাভ করেন। যজ্ঞই সংসারের নীতি। ইহকালে প্রভুত্ব, পরকালে স্বর্গ বা সর্বশ্রেষ্ঠ পদ কিছুই যজ্ঞ ব্যতীত পাওয়া যায় না।

নায়ং লোকোঽস্ত্যযজ্ঞস্য কুতোঽন্যঃ কুরুসত্তম॥
এবং বহুবিধা যজ্ঞা বিততা ব্রহ্মণো মুখে।
কর্ম্মজান্ বিদ্ধি তান্ সর্ব্বানেবং জ্ঞাত্বা বিমোক্ষ্যসে॥৪।৩১-৩২

যিনি যজ্ঞ করেন না, তাঁহার পক্ষে ইহলোকই নাই, পরলোক তো দূরের কথা।

অতএব, এই সমস্ত যজ্ঞ এবং অন্যান্য অনেক প্রকার যজ্ঞ 'বিততা ব্রহ্মণো মুখে', ব্রহ্মাগ্নিতে অর্পিত হয় (Extended in the mouth of the Brahman, the mouth of that Fire which receives all offerings)। এসবই হইতেছে কর্মে প্রবৃত্ত অদ্বিতীয় এক মহান সত্তার বিভিন্ন সাধন, বিভিন্ন রূপ; এই সব সাধনের দ্বারা মানুষের কর্ম সেই পরম সত্তাকে অর্পণ করা যায়, মানুষের বাহ্য জীবন সেই সত্তার অংশ এবং তাহার অন্তরতম সত্তায় তাহার সহিত সে এক। এই সমস্ত যজ্ঞই কর্ম হইতে উৎপন্ন, ঈশ্বরের যে এক বিরাট শক্তি বিশ্বব্যাপী কর্মে আবির্ভূত—এবং সকল বিশ্বকর্মকে পরমেশ্বরের উদ্দেশে অর্পণ করিতেছে—সকল যজ্ঞই তাহা হইতে উদ্ভূত এবং মানুষের পক্ষে ইহার শেষ পরিণতি হইতেছে আত্মজ্ঞান ও ভাগবত বা ব্রাহ্মী চৈতন্যে প্রতিষ্ঠা। 'এই প্রকার জানিয়া তুমি মুক্তিলাভ করিবে।'

কিন্তু এই সকল বিভিন্ন প্রকার যজ্ঞের বিভিন্ন স্তর আছে—দ্রব্যযজ্ঞ সর্বনিম্ন স্তরের, জ্ঞানযজ্ঞ সর্বোচ্চ স্তরের। জ্ঞানেই এই সকল কর্মের পরিসমাপ্তি—নিম্নস্তরের জ্ঞানে নহে, উচ্চতম জ্ঞানে, আত্মজ্ঞানে, ব্রহ্মজ্ঞানে। এই জ্ঞান আমরা তাঁহাদের নিকট হইতেই শিক্ষা করিতে পারি যাঁহারা সৃষ্টির মূলতত্ত্বসমূহ অবগত আছেন, তত্ত্বদর্শিনঃ। এই জ্ঞান লাভ করিলে আর আমরা মনের অজ্ঞানের মোহে পতিত হইব না এবং শুধু ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান এবং কামনা ও আবেগের বন্ধনে বদ্ধ হইব না। যে জ্ঞানে সমস্ত পরিসমাপ্ত হয় সেই জ্ঞানের দ্বারা 'তুমি সমস্ত ভূতকেই আত্মার মধ্যে এবং পরে আমার মধ্যে দেখিতে পাইবে।' কারণ আত্মা হইতেছে সেই এক, অক্ষর, সর্বব্যাপী, সর্বাধার, স্বপ্রতিষ্ঠ সত্তা, আমাদের মানস সত্তার পশ্চাতে লুক্কায়িত ব্রহ্ম, আমাদের চেতনা যখন অহঙ্কার হইতে মুক্ত হয়, তখন বিস্তৃত হইয়া তাঁহাকেই প্রাপ্ত হয়; আমরা সকলকেই সেই এক সত্তার মধ্যে বিভিন্ন ভূতরূপে দেখিতে পাই।

শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্ যজ্ঞাজ্ জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপ।
সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে॥
তদ্‌বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥
যজ্‌জ্ঞাত্বা ন পুনর্মোহমেবং যাস্যসি পাণ্ডব।
যেন ভূতান্যশেষেণ দ্রক্ষ্যস্যাত্মন্যথো ময়ি॥৪।৩৩-৩৫

কিন্তু এই যে আত্মা বা অক্ষর ব্রহ্ম, ইহাও আমাদের মানসিক চেতনার সম্মুখে এক শ্রেষ্ঠ পুরুষেরই আত্ম-অভিব্যক্তি, তিনিই আমাদের অস্তিত্বের মূল এবং যাহা কিছু ক্ষর বা অক্ষর আছে সে সব তাঁহারই অভিব্যক্তি। তিনিই ঈশ্বর, ভগবান, পুরুষোত্তম। তাঁহাকেই আমরা যজ্ঞরূপে সমস্ত অর্পণ করি, তাঁহার হস্তেই আমাদের কর্ম সমর্পণ করি, তাঁহারই সত্তায় আমরা জীবনধারণ করি, চলাফেরা

করি। আমাদেব প্রকৃতিতে তাঁহাব সহিত যুক্ত হইয়া এবং তাঁহাতে অবস্থিত সর্বভূতের সহিত যুক্ত হইযা আমবা তাঁহার সহিত এবং সর্বভূতেব সহিত আত্মসত্তায় ও শক্তিতে এক হই, তাঁহাব পবমতম সত্তাব সহিত আমবা আমাদেব আত্মসত্তাকে এক কবি, যুক্ত করি। বাসনা বর্জন কবিযা, যজ্ঞার্থে কর্ম কবিযা, আমরা জ্ঞানলাভ কবি এবং আত্মা নিজেকে ফিরিযা পায, আত্মজ্ঞানেব সহিত, ভগবদ্ জ্ঞানেব সহিত কর্ম কবিযা আমরা ভগবৎসত্তাব ঐক্য, শান্তি ও আনন্দেব মধ্যে মুক্তিলাভ করি।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

যজ্ঞের অধীশ্বর

আব অগ্রসব হইবাব পূর্বে এতদূব পর্যন্ত যাহা বলা হইযাছে সংক্ষেপে তাহাব মূল তত্ত্বগুলি পুনবাবৃত্তি কবা আবশ্যক। গীতাব সমগ্র কর্মবাদ যজ্ঞ-তত্ত্বেবই উপব প্রতিষ্ঠিত, বাস্তবিক, ভগবান জগৎ এবং কর্মের মধ্যে শাশ্বত সম্বন্ধেব যে-সত্য, গীতাব কর্মবাদেব মধ্যে তাহাই গৃহীত হইযাছে। মানুষেব মন সাধাবণত জগৎ তত্ত্ব সম্বন্ধে বহুমুখী সনাতন সত্যেব আংশিক ভাবসকল গ্রহণ কবিযা জীবন, ধর্ম এবং নীতি সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ সৃষ্টি কবে—কখনও একটি লক্ষণ বা উপলব্ধিব উপবে, কখনও আব একটিব উপবেই বিশেষ ঝোঁক দেয; কিন্তু যখনই কোন উদাব জাগৃতিব যুগে ঈশ্বব, জগৎ এবং আত্মা সম্বন্ধে জ্ঞানেব সমন্বযেব দিকে দৃষ্টি পড়ে তখনই সত্যের কতকটা সমগ্র অখণ্ড স্বরূপেব দিকে মানুষেব ঝোঁক হয। সংসাবে যাহা কিছু আছে সবই সেই এক ব্রহ্ম, সমগ্র জগৎ ব্রহ্মেবই চক্র—ভগবান হইতে বাহিব হইযা ভগবানেই ফিবিযা যাওয়া-রূপ ভগবৎ-লীলা—এই মূল বৈদান্তিক সত্যের উপরই গীতাশিক্ষাব ভিত্তি। সমস্তই প্রকৃতিব প্রকটন লীলা এবং প্রকৃতি ভগবানেবই শক্তি—প্রকৃতি তাহাব কর্মের প্রভু এবং তাহাব রূপসকলেব অধিবাসী ভাগবত পুরুষেব ইচ্ছা সম্পাদন কবিতেছে। তাঁহাবই তৃপ্তিব নিমিত্ত প্রকৃতি নামরূপেব লীলায এবং প্রাণ ও মনেব কর্মে অবতীর্ণ হইতেছে, আবাব মন ও আত্মজ্ঞানের ভিতর দিযা তাহার মধ্যে যে পুরুষ বাস কবিতেছে তাহাকে সজ্ঞানে লাভ করিতে ফিবিয়া যাইতেছে। প্রথমে আত্মা বদ্ধ হইযা পড়িতেছে, প্রকৃতিব লীলাব বিকাশ হইতেছে, পবে আত্মা আবার স্বরূপে প্রকাশিত হইতেছে। এই যে প্রকৃতিব চক্র ইহা কখনও সম্ভব হইত না যদি পুরুষ তাঁহাব শাশ্বত তিনটি অবস্থায একই সময়ে থাকিতে না পাবিতেন; সমগ্র ক্রিয়াটিব জন্য তিনটিই অপবিহার্য। ক্ষব রূপে তাঁহাকে সসীম, বহু, 'সর্ব্বভূতানি' রূপে দেখিতে পাই। সংসাবে যে অসংখ্য-বৈচিত্র্য-বিশিষ্ট অসংখ্য জীব বহিযাছে, তাহাদেব সসীম ব্যক্তিত্বরূপে এবং তাহাদেব পশ্চাতে জাগতিক ক্রিয়াব অধিষ্ঠাতা যে সকল দেবতা বহিযাছেন তাঁহাদেবও ক্রিযাব আত্মা ও শক্তিরূপে তিনি প্রকট হন। আবাব সকল বস্তু ও রূপেব অন্তবে ও পশ্চাতে গুপ্তভাবে রহিযাছে এক অক্ষব, এক অনন্ত, কালাতীত, নৈর্ব্যক্তিক সত্তা, জগতেব এক অপবিবর্তনশীল অখণ্ড আত্মা—সেখানে সকল বহু নিজেদেব বস্তুত এক বলিযাই দেখিতে পায়। অতএব সেইখানে ফিবিযা জীবেব সসীম সক্রিয সত্তা দেখিতে পায় যে, সে নিজেকে এক বিশ্বব্যাপী নীববতাব মধ্যে, এই অখণ্ড অনন্ত হইতে যাহা কিছু উদ্ভূত হইযাছে, যাহা কিছু ইহা দ্বাবা বিধৃত বহিযাছে সেইসবেব সহিত এক অক্ষব ও

অনাসক্ত ঐক্যের শান্তি ও প্রতিষ্ঠার মধ্যে, নিজেকে মুক্ত করিয়া দিতে পারে। এমনকি ইহার মধ্যে ব্যক্তিগত সত্তার লয়ও করিয়া দিতে পারে। কিন্তু শ্রেষ্ঠ রহস্য, উত্তমম্ রহস্যম্ হইতেছেন পুরুষোত্তম। ইনিই শ্রেষ্ঠ দেব ভগবান—তাঁহার ভিতর সান্ত ও অনন্ত দুই-ই রহিয়াছে, তাঁহাতে ব্যক্তিক এবং নৈর্ব্যক্তিক, এক আত্মা এবং সর্বভূত, জাগতিক ক্রিয়া এবং বিশ্বাতীত শান্তি, প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তি সবই মিলিয়াছে, একত্র হইয়াছে, এক সঙ্গে এবং পরস্পরের মধ্যেই স্থান পাইয়াছে। ভগবানের মধ্যেই সকল বস্তুর নিগূঢ় সত্য নিহিত রহিয়াছে এবং তাঁহার মধ্যেই সকলের পূর্ণতম সামঞ্জস্য হইয়াছে।

কর্মের সত্য, সত্তার সত্যের উপরেই নির্ভর করে। সংসারে যাহা কিছু ঘটিতেছে তাহা বস্তুত প্রকৃতির দ্বারা পুরুষের উদ্দেশ্যে কর্মযজ্ঞ। জীবনের যজ্ঞবেদিমূলে প্রকৃতি তাহার সকল কর্ম ও কর্মের ফল লইয়া আসিতেছে, তাহার মধ্যে চৈতন্য ভগবানের যে ভাবটিতে উপনীত হইয়াছে তাহারই সম্মুখে সে সব ধরিয়া দিতেছে, জাগ্রত আত্মা নিজের উপস্থিত কল্যাণ বা পরম শ্রেয়ঃ বলিয়া যে ফল কামনা করে তাহারই জন্য ঐসব যজ্ঞরূপে অর্পিত হয়। প্রকৃতিতে আত্মা চৈতন্যের যে স্তরে উঠিয়াছে তদনুযায়ী দেবতারই সে পূজা করিবে, তদনুযায়ী আনন্দের সন্ধান করিবে এবং তদনুরূপ ফল কামনা করিয়া যজ্ঞ করিবে। আর প্রকৃতিতে ক্ষর পুরুষের যে লীলা তাহা সমস্তই আদানপ্রদান, কারণ জগৎ এক এবং ইহার বিভিন্ন বিভাগগুলি পরস্পর পরস্পরের উপরই নির্ভর করিতেছে, প্রত্যেকেই প্রত্যেকের সাহায্যে বাড়িয়া উঠিতেছে, বাঁচিয়া রহিয়াছে—এই আদানপ্রদানের নীতির উপর জগৎ প্রতিষ্ঠিত। যেখানে ইচ্ছাপূর্বক ত্যাগ নাই প্রকৃতি সেখানে জোর করিয়া তাহা আদায় করে এবং এইরূপে তাহার জাগতিক নীতি রক্ষা করে। পরস্পর দেওয়া এবং লওয়া ইহাই জীবনের নীতি, ইহা ভিন্ন জীবন এক মুহূর্তও টিকিতে পারে না; এই সত্যই জগতে ভগবৎ-ইচ্ছার নিদর্শন—যজ্ঞকে চিরসাথী করিয়া ভগবান যে প্রজাসকলের সৃষ্টি করিয়াছিলেন ইহাই সে বিষয়ে প্রমাণ। বিশ্বব্যাপী এই যে যজ্ঞের নীতি—ইহা হইতেই বুঝা যায় যে, জগৎ ভগবানেরই এবং সংসার তাঁহারই রাজ্য, তাঁহারই পূজার মন্দির, স্বতন্ত্র অহংয়ের ক্ষেত্র নহে। জীবনের উদ্দেশ্য অহংয়ের তৃপ্তিসাধন নহে, ইহা কেবল স্থূল অজ্ঞান আরম্ভ মাত্র, যজ্ঞকে সর্বদা প্রসারিত করিয়া তাহার ভিতর দিয়া ভগবানের সন্ধান, অনন্তের পূজা ও উপাসনা, পূর্ণতম আত্মজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত পূর্ণতম আত্মদান—এই চরম লক্ষ্যের দিকেই জীবনের সকল অভিজ্ঞতা মানুষকে লইয়া যাইতে চায়।

কিন্তু ব্যক্তিগত জীব অজ্ঞান লইয়াই আরম্ভ করে এবং বহুদিন অজ্ঞানেই থাকে। অহঙ্কারে একান্ত নিবিষ্ট মানুষ মনে করে যে, সংসার অহংয়েরই জন্য, ভগবানের জন্য নহে। সে নিজেকেই সকল কর্মের কর্তা বলিয়া দেখে, সে বুঝে না যে, সংসারে যাহা কিছু ঘটিতেছে, তাহার নিজেরও ভিতর ও বাহিরের সকল কর্মই এক বিশ্বপ্রকৃতির ক্রিয়া ভিন্ন আর কিছুই নহে। সে নিজেকে সকল কর্মের

ভোক্তা বলিয়া দেখে এবং ভাবে যে, তাহার জন্যই সব, প্রকৃতির কাজ তাহাকেই তৃপ্ত করা, তাহারই ব্যক্তিগত ইচ্ছা পালন করা। সে দেখিতে পায় না যে, প্রকৃতি তাহাকে তৃপ্ত করিতে, তাহার ইচ্ছা পালন করিতে মোটেই ব্যস্ত নহে, পরন্তু এক উচ্চতর বিশ্বগত ইচ্ছার অনুসরণ করে, যে ভগবান প্রকৃতির এবং প্রকৃতির কার্যের ও সৃষ্টির অতীত সেই ভগবানকেই তৃপ্ত করিতে চায়; ব্যক্তির সসীম সত্তা, তাহার ইচ্ছা এবং তাহার তৃপ্তি—এ সকল তাহার নিজের নহে, এ সকলই প্রকৃতির; প্রকৃতি এই সকলকে প্রতি মুহূর্তে ভগবানের নিকট যজ্ঞরূপে অর্পণ করে এবং অলক্ষ্যে এই সবকে ভগবদিচ্ছা পূরণের যন্ত্ররূপে ব্যবহার করে। জীব এই সম্বন্ধে অজ্ঞান এবং অহংভাবই এই অজ্ঞানতার চিহ্ন; এই অজ্ঞানের বশে জীব যজ্ঞের নীতি অগ্রাহ্য করে, যতটা পারে নিজেই গ্রহণ করিতে চায়, এবং শুধু ততটুকুই দেয় যতটুকু প্রকৃতি ভিতরে এবং বাহিরে জোর করিয়া আদায় করিয়া লয়। বাস্তবিক প্রকৃতি জীবের প্রাপ্য অংশ, দেবতাদত্ত ভোগ বলিয়া জীবকে যতটুকু লইতে দেয় তাহার অধিক জীব কিছুই লইতে পারে না। এই যজ্ঞের জগতে যে স্বার্থপর ব্যক্তি প্রকৃতিস্থ দেবশক্তিসমূহের শুধু দান গ্রহণ করে কিন্তু প্রতিদানে কিছু ফিরাইয়া দিতে চাহে না সে চোর ডাকাতেরই অনুরূপ। সে জীবনের প্রকৃত মর্মের সন্ধান পায় নাই, কারণ সে যজ্ঞার্থে জীবনযাপন ও কর্মের দ্বারা আত্মার প্রসার ও উন্নতি সাধন করে না, তাহার জীবন ব্যর্থ।

মানুষ যেমন নিজের শক্তির এবং নিজের অভাব অভিযোগের হিসাব করে তেমনই যখন অপরের সম্বন্ধেও করিতে আরম্ভ করে, মানুষ যখন তাহার স্বকর্মের পশ্চাতে বিশ্বপ্রকৃতিকে উপলব্ধি করিতে এবং বিশ্ব-দেবসমূহের ভিতর দিয়া সেই এক এবং অনন্তের সন্ধান পাইতে আরম্ভ করে—শুধু তখনই সে অহংভাবের বন্ধন অতিক্রম করিয়া মুক্তিলাভের এবং আত্মার সন্ধানলাভের পথের পথিক হয়। সে তখন তাহার বাসনা ও কামনারও উপরে যে নীতি আছে তাহার সন্ধান পাইতে আরম্ভ করে এবং উপলব্ধি করে যে, তাহার সমস্ত বাসনা ও কামনাকে ক্রমশ ঐ নীতির বশ ও অধীন করিতে হইবে। সে সঙ্কীর্ণ স্বার্থপর জীবন ছাড়াইয়া বুদ্ধিমূলক ও নৈতিক জীবনের বিকাশ করে। সে নিজের ব্যক্তিগত দাবী অপেক্ষা অপরের দাবীর প্রতি অধিকতর মনোযোগী হয়; সে স্বার্থপরতা ও পরার্থপরতার বিরোধ স্বীকার করে এবং তাহার পরার্থপর বৃত্তিগুলির অনুশীলন করিয়া তাহার নিজের চৈতন্যের ও সত্তার প্রসারণের পথ পরিষ্কার করে। সে প্রকৃতিকে এবং প্রকৃতির মধ্যে যে সকল দেবতা রহিয়াছেন তাঁহাদিগকে উপলব্ধি করিতে আরম্ভ করে, বুঝিতে পারে যে, ইঁহারা তাহার ভক্তি ও পূজার পাত্র—ইঁহাদিগকে মান্য করিতে হইবে, ইঁহাদের উদ্দেশে যজ্ঞ করিতে হইবে, কারণ তাঁহাদের দ্বারা এবং তাঁহাদের নিয়মের দ্বারা মানসিক জগৎ এবং জড়জগৎ উভয়ই নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে; সে শিখে যে, তাহার চিন্তায় এবং বুদ্ধিতে এবং জীবনে সেই শক্তিসমূহের আবির্ভাব যত অধিক হইবে কেবল ততখানিই শক্তি, জ্ঞান, যথাযথ ধর্মকর্ম এবং সেইসঙ্গে

তাহার সুখ ও তৃপ্তি বর্ধিত হইবে। এইরূপে সে জীবনকে শুধু জড়বুদ্ধিতে ও অহংবুদ্ধিতে না দেখিয়া ধর্মভাবে, আধ্যাত্মিকভাবে দেখে এবং এইরূপে সসীমের ভিতর দিয়া অসীমের মধ্যে উঠিতে নিজেকে প্রস্তুত করিয়া তোলে।

কিন্তু ইহা একটি দীর্ঘ মধ্যবর্তী অবস্থা ভিন্ন আর কিছুই নহে। এখানেও বাসনাই তাহার কর্মের নীতি, তাহার অহংয়ের প্রয়োজনই কেন্দ্রস্বরূপ এবং প্রকৃতিই তাহার জীবন ও কর্মকে নিয়ন্ত্রিত করে; যদিও এখানে বাসনা সংযত নিয়ন্ত্রিত, অহং শুদ্ধ, এখানে প্রকৃতি উচ্চ সত্ত্বভাবাপন্ন। এই সমস্তই এখনও ক্ষর, সসীম, ব্যক্তিক গণ্ডীর মধ্যে—তবে এই গণ্ডী খুবই প্রসারিত। প্রকৃত আত্মজ্ঞান, অতএব কর্মেরও প্রকৃত নীতি এই অবস্থারও ঊর্ধ্বে; কারণ জ্ঞানের সহিত যে যজ্ঞ করা যায় তাহাই শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ এবং তাহাতেই কর্ম সর্বাঙ্গসুন্দর হয়। এই অবস্থা কেবল তখনই আসে যখন মানুষ উপলব্ধি করে যে, তাহার নিজের মধ্যে যে আত্মা রহিয়াছে এবং অপরের মধ্যে যে আত্মা তাহা একই, এই আত্মা অহং অপেক্ষা বড় জিনিস, ইহা অনন্ত, নৈর্ব্যক্তিক, বিশ্বব্যাপী সত্তা, ইহার ভিতরেই সর্বভূত বিরাজ করিতেছে, যেসকল বিশ্বদেবতাদের উদ্দেশে সে যজ্ঞ করে সেসকল সেই এক অনন্ত ভগবানের বিভিন্নরূপ বলিয়া সে বুঝিতে পারে এবং সেই এক ভগবান সম্বন্ধে তাহার সমস্ত সঙ্কীর্ণ ধারণা পরিত্যাগ করিয়া উপলব্ধি করে যে, তিনিই শ্রেষ্ঠ অনির্বচনীয় পরমেশ্বর—তিনি একই সঙ্গে সসীম এবং অসীম, এক এবং বহু, প্রকৃতির অতীত হইয়াও প্রকৃতির মধ্যেই ব্যক্ত, গুণাতীত হইয়াও তিনি অনন্ত গুণের ভিতর দিয়া তাঁহার লীলা বিকাশ করেন। ইনিই পুরুষোত্তম, ইঁহাকেই যজ্ঞ অর্পণ করিতে হইবে—কোন অনিত্য ব্যক্তিগত কর্মফলের জন্য নহে, পরন্তু ভগবানকে লাভ করিবার জন্য, ভগবানের সহিত যোগে ও সামঞ্জস্যে জীবনযাপন করিবার জন্য।

অন্য কথায় বলিতে গেলে ক্রমবর্ধমান নৈর্ব্যক্তিক ভাবের ভিতর দিয়াই মানুষের মুক্তি ও সিদ্ধির পথ। ইহাই মানুষের প্রাচীন ও নিরন্তর অভিজ্ঞতা যে, নৈর্ব্যক্তিক ও অনন্ত সত্তার দিকে—যাহা সকল বস্তু, সকল জীবের মধ্যেই এক এবং সাধারণ, শুদ্ধ ও সমুচ্চ সত্তা, যাহা প্রকৃতির মধ্যে নৈর্ব্যক্তিক ও অনন্ত, জীবনের মধ্যে নৈর্ব্যক্তিক ও অনন্ত, তাহার নিজেরই অন্তর্লোকে নৈর্ব্যক্তিক ও অনন্ত, তাহার দিকে সে নিজেকে যতই উন্মুক্ত করিয়া ধরে, যতই তাহার অহং-এর বন্ধন, সীমার বন্ধন কমিয়া যায়, ততই সে বিশালতা, শান্তি ও বিশুদ্ধ সুখের অনুভূতি লাভ করে। শুধু সীমার মধ্যে, 'অহং'-এর মধ্যে যে আনন্দ যে তৃপ্তি তাহা ক্ষণিক, ক্ষুদ্র এবং অনিশ্চিত। যাহারা সম্পূর্ণভাবে অহংভাবের মধ্যে বাস করে এবং 'অহং'-এর সসীম ধারণা, শক্তি, তৃপ্তি লইয়াই থাকে তাহাদের পক্ষে এই জগৎ সর্বদা অনিত্যম্ অসুখম্—অস্থায়ী এবং দুঃখময়। সসীম জীবনের চিরদুঃখ এই যে, সকল সময়েই একটা নিরর্থকতার ভাব থাকিয়া যায় কারণ সসীম জীবনের সমগ্র বা শ্রেষ্ঠ সত্য নহে। জীবন যতক্ষণ না অসীমের দিকে উন্মুক্ত হইতেছে ততক্ষণ তাহা সম্পূর্ণভাবে সত্য বা বাস্তব নহে। এই জন্যই গীতা কর্মবাদ

ব্যাখ্যা করিবার প্রারম্ভেই ব্রহ্মচৈতন্যের উপর, নৈর্ব্যক্তিক জীবনের উপর এত ঝোঁক দিয়াছে এবং এইটিই ছিল প্রাচীনদের সাধনার মহান লক্ষ্য। কারণ যে নৈর্ব্যক্তিক অনন্ত একমেবাদ্বিতীয়ম্ সত্তায় জগতের সকল স্থায়ী, সচল, বহুমুখী কর্মধারা নিজের ঊর্ধ্বে স্থায়িত্ব, আশ্রয় ও শান্তির ভিত্তি পায়, সেইটিই হইতেছে অচল আত্মা, অক্ষর, ব্রহ্ম। যদি আমরা ইহা বুঝি তাহা হইলে বুঝিতে পারিব যে, আমাদের চৈতন্যকে, আমাদের সত্তায় প্রতিষ্ঠাকে, সীমাবদ্ধ ব্যক্তিকতা হইতে এই অনন্ত নৈর্ব্যক্তিক ব্রহ্মের মধ্যে তুলিতে হইবে—ইহাই আধ্যাত্মিক জীবনের সর্বপ্রথম প্রয়োজন। এই এক আত্মার মধ্যে সর্বভূতকে দেখা, এই জ্ঞানই মানুষকে অহংভাবের অজ্ঞান হইতে এবং ইহার কর্ম ও ফল হইতে তুলিয়া লয়; ইহাতে বাস করাই পরম শান্তি এবং আধ্যাত্মিক জীবনের দৃঢ় প্রতিষ্ঠালাভ।

কিরূপে এই মহান রূপান্তর সাধিত হয় তাহার দুইটা পথ আছে, জ্ঞানের পথ এবং কর্মের পথ; গীতা এই দুইয়ের সংহত সমন্বয় করিয়াছে। মন এবং ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়ায় বুদ্ধির (intelligent will) যে নিম্নমুখী আসক্তি তাহা হইতে বুদ্ধিকে ফিরাইয়া ঊর্ধ্বমুখী করিতে হইবে—পুরুষের দিকে, ব্রহ্মের দিকে ফিরাইতে হইবে; ইহাই জ্ঞানের পথ। মনের বহুমুখী ধারণাসমূহ এবং বাসনার বহুমুখী প্রেরণাসকল পরিত্যাগ করিয়া বুদ্ধিকে এক আত্মার এক ভাবে নিবিষ্ট করাইতে হইবে। শুধু এইটুকু দেখিলে মনে হয় বুঝি সম্পূর্ণ কর্মত্যাগ, নিশ্চল নিষ্ক্রিয়তা এবং পুরুষকে প্রকৃতি হইতে বিচ্ছিন্ন করাই এই পথের লক্ষ্য। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে এরূপ সম্পূর্ণ ত্যাগ, নিষ্ক্রিয়তা এবং বিচ্ছিন্নতা সম্ভব নহে। পুরুষ ও প্রকৃতি সত্তার যুগল তত্ত্ব—তাহাদিগকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না, যতক্ষণ আমরা প্রকৃতির মধ্যে আছি, প্রকৃতির মধ্যে আমাদের কর্ম চলিতেই থাকিবে—তবে অজ্ঞানীরা যেভাবে কর্ম করে, জ্ঞানীদের কর্মের রূপ বা অর্থ তাহা হইতে স্বতন্ত্র হইতে পারে। সন্ন্যাস করিতেই হইবে—তবে কর্ম হইতে পলায়ন করা প্রকৃত সন্ন্যাস নহে, অহং ও বাসনাকে বধ করাই প্রকৃত সন্ন্যাস। ইহা কি উপায়ে হইতে পারে? কর্ম করিবার সময়েও কর্মফলে আসক্তি পরিত্যাগ করিতে হইবে, প্রকৃতিকেই সর্বকর্মের প্রকৃত কর্ত্রী বলিয়া জানিতে হইবে, প্রকৃতিকেই তাহার কর্ম করিতে ছাড়িয়া দিতে হইবে, দ্রষ্টা এবং ভর্তারূপে আত্মাতে বাস করিয়া প্রকৃতিকে দেখিতে হইবে, ধরিয়া থাকিতে হইবে, কিন্তু প্রকৃতির কর্মে বা কর্মফলে আসক্ত হওয়া চলিবে না। তখন সীমাবদ্ধ ও বিক্ষুব্ধ ব্যক্তিকতা এবং অহং শান্ত হয়, নৈর্ব্যক্তিক আত্মার চৈতন্যে মগ্ন হয়—এখন আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে সর্বভূতের ভিতর দিয়া প্রকৃতির কর্ম চলিতে থাকে—আমরা এই সকলকে দেখি যে ইহারা সম্পূর্ণভাবে প্রকৃতি কর্তৃক চালিত হইয়া সেই এক অনন্ত সত্তার মধ্যেই বাস করিতেছে, চলাফেরা করিতেছে, আমাদের সসীম জীবনকেও ইহাদেরই মধ্যে একটি বলিয়া বুঝিতে পারি এবং উপলব্ধি করি যে, আমাদেরও সমস্ত কর্ম প্রকৃতিরই—আমাদের প্রকৃত আত্মার নহে, সে আত্মা হইতেছে নিশ্চল নৈর্ব্যক্তিক একম্। অহং এই সকলকে নিজের

বলিযা দাবী কবিত, আমবা তাই সেগুলিকে আমাদেবই মনে কবিতাম, কিন্তু অহং যখন মবিল, তখন আব সেগুলি আমাদেব নহে, প্রকৃতিব। অহংকে বধ কবিযা আমবা আমাদেব সত্তায ও চৈতন্যে নৈর্ব্যক্তিক হইযা উঠিযাছি, বাসনাকে ত্যাগ কবিয়া আমাদেব প্রকৃতিব কর্মেও আমবা নৈর্ব্যক্তিক হইযা উঠিযাছি। এখন শুধু কর্মশূন্যতাব মধ্যেই নহে, কর্মেব মধ্যেও আমবা মুক্ত, শাবীবিক ও প্রাকৃতিক নিশ্চলতা ও শূন্যতাব উপব আমাদেব মুক্তি নির্ভব কবে না, আব যেই আমবা কর্ম করি অমনিই মুক্তি হইতে বিচ্যুত হইযা পডি না। এমনকি প্রাকৃতিক কর্মেব পূর্ণস্রোতেব মধ্যেও নৈর্ব্যক্তিক আত্মা আমাদেব মধ্যে ধীব, স্থিব, মুক্ত থাকে।

এই পূর্ণ নৈর্ব্যক্তিকতা দ্বাবা যে মুক্তিলাভ কবা যায তাহা প্রকৃত, তাহা সম্পূর্ণ, তাহা অপবিহার্য, কিন্তু ইহাই কি সব, ইহাই কি এই বিষযে শেষ কথা? আমবা ইতিপূর্বে বলিযাছি, সমস্ত জীবন সমস্ত বিশ্ব প্রকৃতি কর্তৃক পুরুষেব নিকট যজ্ঞরূপে অর্পিত, এই পুরুষই প্রকৃতিব মধ্যে অদ্বিতীয এবং নিগূঢ আত্মা, ইহাবই মধ্যে প্রকৃতিব সমগ্র কর্ম চলিতেছে; কিন্তু ইহাব প্রকৃত মর্ম আমাদেব নিকট আচ্ছন্ন বহিয়াছে অহং-এব দ্বাবা, কামনাব দ্বাবা, আমাদেব সীমাবদ্ধ, সক্রিয, বহুমুখী ব্যক্তিত্বের দ্বাবা। আমবা অহংভাব ও কামনা ও সীমাবদ্ধ ব্যক্তিত্বেব মধ্য হইতে উঠিয়াছি, এবং ইহাব মহান প্রতিষেধক নৈর্ব্যক্তিকতাব দ্বাবা নৈর্ব্যক্তিক ভাগবত সত্তাব সন্ধান পাইযাছি, যে এক আত্মা ও ব্রহ্মেব মধ্যে সর্বভূত বহিযাছে তাহাব সহিত আমাদেব একত্ব আমবা উপলব্ধি কবিযাছি। কর্মেব যজ্ঞ চলিতেছে, কিন্তু আমবা চালাইতেছি না—আমাদেব সত্তাব সসীম অংশ মন ইন্দ্রিয ও শবীবেব ভিতব দিযা প্রকৃতিই এই ক্রিযা চালাইতেছে, কিন্তু এই সমস্ত চলিতেছে আমাদেবই অনন্ত সত্তাব মধ্যে। তবে কাহাকে কোন্ উদ্দেশ্যে এই যজ্ঞ অর্পণ কবা হইতেছে? নৈর্ব্যক্তিক সত্তাব তো কোন কর্ম নাই, কোন বাসনা নাই, লাভ কবিবাব কোন বস্তু নাই, কোন কিছুবই জন্য ইহা সংসাবেব কোন জীবেব উপব নির্ভব কবে না, নিজেব জন্যই ইহা আছে নিজেবই আত্মানন্দে, নিজেবই অক্ষব অনন্ত সত্তায এই নৈর্ব্যক্তিক আত্মপ্রতিষ্ঠায পৌঁছিবাব উপাযস্বরূপ আমাদিগকে বাসনাশূন্য হইযা কর্ম কবিতে হইতে পাবে কিন্তু এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলে কর্মেব প্রযোজনীযতা শেষ হইযা যায, যজ্ঞের আব প্রযোজন থাকে না। তখনও কর্ম চলিতে পাবে কারণ প্রকৃতি থাকে, তাহাব ক্রিযা চলিতে থাকে, কিন্তু তখন আব সেই সকল কর্মেব কোন উদ্দেশ্য থাকে না। তখন কর্ম না কবিলে নয, সেই জন্যই কর্ম কবিতে হয, মুক্তিব পব আমাদেব সসীম শবীব ও মনকে বাধা কবিযা প্রকৃতি কর্ম কবায। কিন্তু ইহাই যদি সব হয তাহা হইলে কর্মকে যতদূব সম্ভব কমাইলেই হইল, প্রকৃতি আমাদেব শবীবেব দ্বাবা যতটুকু নিশ্চয কবাইযা লইবে কেবলমাত্র ততটুকু কর্ম কবা হইলেই হইল, দ্বিতীযত যদি কর্মকে যতদূব সম্ভব কমান নাই হয়—কাবণ কর্ম কবিলে কিছু আসিযা যায না, কর্ম না কবাও উদ্দেশ্য নহে—তাহা হইলে কর্ম কি প্রকাবেব হইবে তাহাতেও কিছু আসিযা যায না। একবাব

জ্ঞানলাভ কবিবাব পর অর্জুন তাঁহাব পুবাতন ক্ষত্রিয়স্বভাবেব অনুসরণ কবিযা কুরুক্ষেত্রেব যুদ্ধ সম্পন্ন কবিতে পারেন অথবা তাঁহাব শান্তিব দিকে নূতন ঝোঁকে যুদ্ধ পবিত্যাগ কবিযা সন্ন্যাসীব জীবনযাপন করিতে পাবেন। ইহাদের মধ্যে কোন্‌টি তিনি কবিবেন তাহাতে কিছু আসিয়া যায না; বরং দ্বিতীয়টিই উত্তম, কাবণ অতীত সংস্কাবেব জন্য প্রকৃতিব যে সকল প্রবৃত্তি এখনও তাহাকে ধরিয়া আছে সেগুলিকে দমন কবিবাব ইহাই প্রকৃত উপায; যখন তাঁহার শরীব পতিত হইবে তখন তিনি নিশ্চিতভাবে সেই অনন্ত ও নৈর্ব্যক্তিক সত্তায প্রয়াণ করিতে পাবিবেন, অনিত্যম্ অসুখম্ ইমম্ লোকম্—এই অনিত্য দুঃখময় সংসারের দুঃখ ও উন্মত্ততাব মধ্যে আব তাঁহাকে ফিবিতে হইবে না।

যদি এইরূপই হয তাহা হইলে গীতাব সমস্ত শিক্ষাই অর্থশূন্য হয়; কারণ ইহার যাহা প্রথম ও মূল উদ্দেশ্য তাহাই ব্যর্থ হইযা যায়। কিন্তু গীতা বিশেষ কবিযা বলিযাছে যে কর্ম কি প্রকাবেব হইল তাহা প্রযোজনীয, এবং কর্ম চালাইবারও স্পষ্ট নির্দেশ গীতাতে আছে, শুধু প্রকৃতিব লক্ষ্যহীন তাডনাতেই যে যন্ত্রবৎ কর্ম কবিতে হইবে তাহা নহে। অহং জয হইবাব পবও যজ্ঞেব একজন ভোক্তা ঈশ্বর থাকেন—ভোক্তাবম্ যজ্ঞ-তপসাম্, এবং তখনও যজ্ঞেব একটা উদ্দেশ্য থাকে। নৈর্ব্যক্তিক ব্রহ্মই একেবাবে শেষ কথা নহে, আমাদেব সত্তার একেবারে শ্রেষ্ঠ বহস্যও নহে, কাবণ নৈর্ব্যক্তিক, সসীম ও অসীম, একই ভগবানেব দুইটি বিপরীত দিক মাত্র—দুইটি একই সময়ে ভগবানেব মধ্যে রহিয়াছে এবং ভগবান এই সকল পার্থক্যেব দ্বাবা সীমাবদ্ধ নহেন, তিনি একাধারে এই দুইই। ভগবান চির অব্যক্ত অনন্ত—সর্বদা স্বতঃপ্রণোদিত হইযা সান্তেব ভিতব নিজেকে ব্যক্ত করিতেছেন; তিনি সেই মহান নৈর্ব্যক্তিক ব্যক্তি—সকল ব্যক্তি, সকল রূপ যাঁহার আংশিক প্রকাশমাত্র; তিনি সেই ভগবান যিনি মানুষেব মধ্যে নিজেকে প্রকাশ কবেন, তিনি মানুষেব হৃদযস্থিত ঈশ্বব। এক নৈর্ব্যক্তিক (impersonal) আত্মার মধ্যে সর্বভূতকে দেখাই জ্ঞানেব শিক্ষা, কাবণ এইভাবেই আমবা ভেদাত্মক অহংভাব হইতে মুক্ত হইতে পাবি এবং তাহাব পব সেই মুক্তিসাধক নৈর্ব্যক্তিকতাব ভিতর দিযা সেসকলকে ভগবানেব মধ্যে দেখিতে পারি—আত্মনি অথো ময়ি, 'আত্মাব মধ্যে, পবে আমাব মধ্যে।' ভগবান সকলেব মধ্যে বহিযাছেন এবং সকলেই ভগবানেব মধ্যে বহিযাছেন, কিন্তু আমাদের অহং, আমাদের সীমাবদ্ধ ব্যক্তিত্ব আডাল কবিযা দাঁডায বলিযা আমবা ভগবানকে চিনিতে পাবি না, কারণ আমরা ব্যক্তিক ভাবেব বশীভূত বলিযা বস্তুসমূহেব সসীম দৃশ্যেব ভিতর দিযা যতটুকু সম্ভব ততটুকুই ভগবানেব আংশিক ভাবসকল দেখিয়া থাকি। ভগবানকে পাইতে হইলে আমাদেব নিম্নতব ব্যক্তিকতাব ভিতব দিযা তাহা সম্ভব নহে; আমাদের সত্তাব উচ্চ অসীম নৈর্ব্যক্তিক অংশেব ভিতব দিযাই তাহা সম্ভব এবং তাহার জন্য সকলেব ভিতব এই যে এক আত্মা (যাহার মধ্যে বিশ্বসংসাব রহিযাছে) সেই আত্মাব সহিত আমাদিগকে এক হইতে হইবে। এই যে অসীম সত্তা, যাহার

ভিতরেই সব সসীম দৃশ্যও বহিয়াছে, এই যে নামরূপের অতীত নৈর্ব্যক্তিক সত্তা যাহার ভিতর সকল ব্যক্তি, সকল নামরূপও বহিয়াছে, এই যে অচল সত্তা প্রকৃতির সকল সচল ক্রিয়াকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে, সেসব হইতে সরিয়া দাঁড়ায় নাই, এই নির্মল দর্পণেই ভগবানের সত্তা প্রতিভাত হইবে। অতএব আমাদিগকে প্রথমে নৈর্ব্যক্তিক সত্তাকেই লাভ করিতে হইবে, কেবল বিশ্বদেবগণের ভিতর দিয়া, কেবল সসীম দিক দিয়া ভগবানের পূর্ণজ্ঞান সমগ্রভাবে লাভ করা যায় না। কিন্তু অন্যপক্ষে নৈর্ব্যক্তিক আত্মার দ্বারা যাহা কিছু বিধৃত ও ব্যাপ্ত রহিয়াছে সেসব হইতে বিচ্ছিন্ন বলিয়া পরিকল্পিত এই নৈর্ব্যক্তিক আত্মার যে নীরব নিশ্চলতা সেইটিও ভগবানের সর্বপ্রকাশক, সর্বসংশয়-নিরসনকারী সমগ্র সত্য নহে। সেই সত্য দর্শন করিতে হইলে ইহার নীরবতার ভিতর দিয়া পুরুষোত্তমকে দেখিতে হইবে, তিনি তাঁহার দিব্য মহিমায় ক্ষর ও অক্ষর দুইকেই ধরিয়া রহিয়াছেন; তিনি অচলতায় প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু তিনি বিশ্বপ্রকৃতির সকল গতি, সকল ক্রিয়ার মধ্যেই নিজেকে প্রকাশ করিতেছেন, তাঁহারই উদ্দেশে মুক্তির পরেও প্রকৃতির কর্ম যজ্ঞরূপে অর্পিত হইতে থাকে।

ভগবান পুরুষোত্তমের সহিত জীবন্ত মিলন এবং তাহার দ্বারা আত্মার পূর্ণ বিকাশ—ইহাই যোগের প্রকৃত উদ্দেশ্য, শুধু নৈর্ব্যক্তিক সত্তার মধ্যে আত্মনির্বাণ নহে। আমাদের সমস্ত জীবনকে ভগবানের মধ্যে তুলিতে হইবে, তাঁহাতে বাস করিতে হইবে (ময্যের নিবসিষ্যসি); তাঁহার সহিত এক হইতে হইবে, তাঁহার চৈতন্যের সহিত আমাদের চৈতন্য মিলাইতে হইবে, আমাদের আংশিক প্রকৃতিকে তাঁহার পূর্ণ প্রকৃতির প্রতিবিম্বস্বরূপ করিতে হইবে, চিন্তা ও অনুভূতিতে, মনে আমাদিগকে সম্পূর্ণভাবে ভাগবত জ্ঞানের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইতে হইবে, সঙ্কল্পে ও কর্মে আমাদিগকে সম্পূর্ণভাবে, নির্দোষভাবে ভাগবত ইচ্ছা দ্বারা চালিত হইতে হইবে, তাঁহার প্রেমানন্দে বাসনা কামনা ভুলিতে হইবে—ইহাই মানব জীবনের পূর্ণসিদ্ধি। গীতা ইহাকেই উত্তম রহস্য বলিয়াছে। ইহাই মানবের প্রকৃত লক্ষ্য এবং চরম সার্থকতা—ইহাই আমাদের ক্রমবিকাশমান কর্মযজ্ঞের সর্বোচ্চ সোপান। কারণ শেষপর্যন্ত তিনিই থাকেন কর্মের অধীশ্বর এবং যজ্ঞের আত্মস্বরূপ।

চতুর্দশ অধ্যায়

দিব্য কর্মের নীতি

অতএব গীতাবর্ণিত যজ্ঞের ইহাই প্রকৃত মর্ম। ইহার সম্পূর্ণ অর্থ বুঝিতে হইলে পুরুষোত্তম-তত্ত্ব বুঝা দরকার; গীতায় এ পর্যন্ত এ তত্ত্ব বুঝান হয় নাই —গীতার বাকী অধ্যায়সকলের শেষের দিকেই এই তত্ত্ব পরিষ্কার করিয়া বুঝান হইয়াছে, এবং সেই জন্যই গীতার ক্রমশ-প্রকাশমান পদ্ধতির বিরুদ্ধাচার করিয়াও আমাদিগকে এখনই সেই মূল শিক্ষার অবতারণা করিতে হইয়াছে। উপস্থিত শুরু কেবল পুরুষোত্তম সম্বন্ধে সঙ্কেতমাত্র করিয়াছেন এবং নিশ্চল আত্মার সহিত তাঁহার সম্বন্ধ নির্দেশমাত্র করিয়াছেন; আমাদের প্রথম কাজ আমাদের জরুরী আধ্যাত্মিক প্রয়োজন হইতেছে ব্রাহ্মীস্থিতি প্রাপ্ত হইয়া এই নিশ্চল আত্মায় সম্পূর্ণ শান্তি ও সমতার অবস্থা লাভ করা। এখন পর্যন্ত তিনি স্পষ্ট ভাষায় পুরুষোত্তমের উল্লেখ করেন নাই, "আমি", কৃষ্ণ, নারায়ণ, অবতার, কুরুক্ষেত্রে দিব্য সারথিরূপে অবতীর্ণ বিশ্বের অধীশ্বর—এই ভাবেই নিজের পরিচয় দিয়াছেন। তিনি সূত্র দিয়াছেন, আত্মনি অথো ময়ি, "আত্মার মধ্যে, তাহার পর আমার মধ্যে", ইহার অর্থ এই যে ব্যষ্টিগত ব্যক্তিক সত্তাকে নৈর্ব্যক্তিক স্বপ্রতিষ্ঠ সত্তাতেই একটি "সম্ভূতি" (becoming) বলিয়া দেখিয়া ব্যক্তিক ভাব অতিক্রম করা হইতেছে সেই মহান নিগূঢ় নৈর্ব্যক্তিক ব্যক্তিতে (পুরুষোত্তমে) উপনীত হইবার পন্থামাত্র, তিনি নৈর্ব্যক্তিক সত্তায় নীরব, শান্ত, প্রকৃতির ঊর্ধ্বে অবস্থিত আবার প্রকৃতিতে এই লক্ষ লক্ষ ভূতের মধ্যে বর্তমান এবং কর্মশীল। আমাদের নিম্নতন ব্যষ্টিগত ব্যক্তিক সত্তাকে নৈর্ব্যক্তিক সত্তার মধ্যে লয় করিয়া শেষকালে আমরা সেই পরম পুরুষের সহিত যুক্ত হইব যিনি স্বতন্ত্র ও ব্যষ্টিগত নহেন, অথচ সকল ব্যষ্টিগত রূপ ধারণ করিয়াছেন। ত্রিগুণাত্মিকা অপরা প্রকৃতিকে অতিক্রম করিয়া এবং ত্রিগুণের অতীত নিশ্চল পুরুষে আত্মাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া আমরা অবশেষে অনন্ত ভগবানের পরা প্রকৃতিতে উঠিতে পারি, তিনি প্রকৃতির ভিতর দিয়া কার্য করিলেও গুণত্রয়ের দ্বারা বদ্ধ হন না। নীরব নিশ্চল পুরুষের ভিতরের নৈষ্কর্ম্য (inner actionlessness) প্রাপ্ত হইয়া এবং প্রকৃতিকে তাহার কর্ম করিতে ছাড়িয়া দিয়া আমরা সেই পরম উচ্চ দিব্য প্রভুত্বের পদ লাভ করিতে পারি যখন সকল কর্ম করিয়াও কোন কর্মের দ্বারা বদ্ধ হইতে হয় না। অতএব, অবতীর্ণ নারায়ণরূপে, কৃষ্ণরূপে, এখানে দৃষ্ট পুরুষোত্তমের তত্ত্বই হইতেছে মূল সূত্র। ইহা ব্যতীত অপরা প্রকৃতি হইতে সরিয়া ব্রাহ্মীস্থিতি লাভ করিলে মুক্তপুরুষের নিষ্ক্রিয়তা এবং সংসারের কর্মের প্রতি তাঁহার উদাসীনতা অবশ্যম্ভাবী; কিন্তু পুরুষোত্তমকে ধরিতে পারিলে ঐরূপ নিবৃত্তিই একটি ধাপ স্বরূপ হয়, তাহার দ্বারা

সংসাবেব কর্ম আত্মাব মধ্যে গৃহীত হয, দিব্য প্রকৃতিব ভিতব দিযা দিব্য মুক্তিতে সম্পাদিত হয়। নিশ্চল নীবব ব্রহ্মকেই যদি লক্ষ্য বলিযা দেখ, তাহা হইলে সংসাব এবং সমস্ত কর্ম পবিত্যাগ করিতে হইবে, ভগবানকে, পুরুষোত্তমকে যদি লক্ষ্য বলিয়া দেখ, যদি তাঁহাকে কর্মেব উপবে অথচ ইহাব আভ্যন্তবীণ আধ্যাত্মিক কাবণ এবং উদ্দেশ্য এবং মূল সঙ্কল্প বলিযা বুঝ, তাহা হইলে সংসাব এবং সংসাবের সকল কর্ম বিজিত হইবে, ভগবানেব ন্যাযই সংসাবেব ঊর্ধ্বে থাকিযা সেসব পবিচালন কবা যাইবে। সংসাব কাবাগাব না হইযা সমৃদ্ধিশালী বাজ্য, রাজ্যম্ সমৃদ্ধম্ হইতে পাবে; দুর্দান্ত "আমি"ব সীমাবদ্ধতাকে ধ্বংস কবিযা, আমাদেব বন্ধনের কারণ কামনাসকলকে জয কবিযা, আমাদেব ব্যক্তিগত ভোগ ঐশ্বর্যের কাবাগাব ভগ্ন কবিয়া আমবা আধ্যাত্মিক জীবনেব জন্য এই বাজ্যম্ সমৃদ্ধম্ জয় কবিব। মুক্ত বিশ্বভাবাপন্ন জীব তখন স্ববাট, সম্রাট হইবে।

এইরূপে মুক্তি এবং পূর্ণতম অধ্যাত্ম সংসিদ্ধি লাভেব উপাযস্বরূপ যজ্ঞার্থে কর্মের সার্থকতা দেখান হইল। এইরূপে সম্পূর্ণভাবে অহংভাব এবং আসক্তি পরিত্যাগ কবিযা কামনাশূন্য হইয়া জয-পবাজয লাভালাভকে সমান জ্ঞান কবিযা যজ্ঞরূপে কর্ম করিয়া জনক প্রভৃতি মহৎ কর্মযোগীগণ পুবাকালে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন—

কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদযঃ।

এইরূপে এবং এইরূপ কামনাশূন্যভাবেই, মুক্তি এবং সিদ্ধিলাভেব পবও কর্ম করা যায এবং কবিতে হইবে—তখন সে কর্ম কবা হইবে ভাগবতভাবে, আধ্যাত্মিক ঐশ্বরিকতার শান্ত উচ্চ প্রকৃতিতে।

লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্ কর্ত্তুমর্হসি॥
যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতবো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে॥
ন মে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত্ত এব চ কর্ম্মণি॥৩।২০-২২

"লোকসংগ্রহার্থেও কর্মেব অনুষ্ঠান কবা তোমাব কর্তব্য। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ যেরূপ আচরণ কবেন, নিম্নতব শ্রেণীব লোকও তাহাই কবিযা থাকে, শ্রেষ্ঠগণ কর্মেব যে আদর্শ সৃষ্টি কবেন, জনগণ তাহাবই অনুসবণ করে। হে পার্থ! ত্রিলোকে আমার কিঞ্চিন্মাত্রও কর্তব্য নাই, এমন কোন পদার্থ নাই যাহা আমি পাই নাই এবং যাহা আমাকে অতঃপব লাভ কবিতে হইবে, তথাপি আমি কর্ম কবিযাই থাকি।" বর্ত্ত এব চ কর্ম্মণি—এখানে "এব" শব্দেব দ্বাবা বুঝা যায যে, ভগবান কর্ম কবিয়াই থাকেন এবং সন্ন্যাসীবা যে মনে কবেন তাঁহাবা কর্ম পবিত্যাগ কবিতে বাধ্য, তিনি সেরূপ করেন না। কাবণ—

যদি হ্যহং ন বর্ত্তেয়ং জাতু কর্ম্মণ্যতন্দ্রতঃ।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ॥
উৎসীদেযুবিমে লোকা ন কুর্য্যাং কর্ম্ম চেদহম্।
সঙ্কবস্য চ কর্ত্তা স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ॥
সক্তাঃ কর্ম্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্ব্বন্তি ভারত।
কুর্য্যাদ্ বিদ্বাংস্তথাসক্তশ্চিকীর্ষুর্লোকসংগ্রহম্॥
ন বুদ্ধিভেদং জনযেদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্।
যোজযেৎ সর্ব্বকর্ম্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্॥৩।২৩-২৬

"যদি আমি আলস্য পবিশূন্য হইযা কর্মে প্রবৃত্ত না থাকি, মনুষ্যগণ সর্বতোভাবে আমাব পন্থা অনুসবণ করিবে, আমি যদি কর্ম না করি, তাহা হইলে এই সকল লোক বিনষ্ট হইবে এবং আমি উচ্ছৃঙ্খলতাব স্রষ্টা হইব, এইরূপে আমি প্রজাগণকে নষ্ট কবিব। অজ্ঞ ব্যক্তিবা কর্মে আসক্তির সহিত যেমন কর্ম কবে, জ্ঞানী ব্যক্তিদেব লোকসংগ্রহার্থে অনাসক্ত হইযা সেইরূপ কর্ম কবা কর্তব্য। যে অজ্ঞ ব্যক্তিবা কর্মে আসক্ত, জ্ঞানী তাহাদেব বুদ্ধিভেদ জন্মাইবেন না। তিনি জ্ঞানেব সহিত এবং যোগস্থ হইয়া স্বযং সকল কর্ম কবিয়া অজ্ঞদিগকে সেই সব কর্ম কবাইবেন।" এই সাতটি শ্লোক অপেক্ষা মূল্যবান শ্লোক গীতাতে আব খুব কমই আছে।

কিন্তু আমাদেব স্পষ্ট বুঝা দরকাব যে, এই শ্লোকগুলিকে আধুনিক কর্মপ্রবণ নীতি অনুসাবে ব্যাখ্যা করা চলিবে না, এই নীতি কোন উচ্চ ও দূর আধ্যাত্মিক সম্ভাবনা অপেক্ষা বর্তমান জাগতিক কার্যাবলী লইযাই অত্যধিক ব্যস্ত। সমাজসেবা, দেশসেবা, মানবজাতির কল্যাণসাধন এবং যে শত শত সামাজিক পবিকল্পনা ও স্বপ্ন আধুনিক মনকে আকৃষ্ট কবিতেছে, এই শ্লোকগুলিকে কেবলমাত্র সেই সকলের দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক ভিত্তি বলিযা বুঝিলে চলিবে না। এখানে উদাব পবোপকারেব কোন যুক্তিযুক্ত নিয়মনীতি কথিত হয নাই; ভগবানেব সহিত যে জাগতিক জীবসমূহ ভগবানের মধ্যে বাস করিতেছে এবং যাহাদেব মধ্যে ভগবান বাস কবিতেছেন তাহাদেব সহিত আধ্যাত্মিক ঐক্যের নীতিই এখানে কথিত হইযাছে। ব্যক্তিকে সমাজেব এবং মানবজাতিব অধীন কবিবাব, সমষ্টিগত মানবেব বেদিতে অহংভাবকে বলি দিবার উপদেশ এখানে দেওযা হয নাই, ভগবানেব মধ্যে ব্যক্তিত্বকে সার্থক কবিযা তুলিবার, সর্বব্যাপী ভাগবত সত্তাব সত্যবেদীতে অহংকে বলি দিবাব উপদেশ দেওযা হইয়াছে। যে সকল ভাব ও অভিজ্ঞতা লইযা আধুনিক মানব ব্যস্ত, গীতার শিক্ষা তাহা অপেক্ষা উচ্চস্তবেব; মানুষ এখন অহংভাবেব শৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইবার চেষ্টা করিতেছে বটে, তথাপি তাহাব দৃষ্টি ঐহিকতার দিকে, তাহার মতিগতি আধ্যাত্মিক নহে, পবন্তু যৌক্তিক ও নৈতিক। দেশপ্রেম, বিশ্বপ্রেম, সমাজসেবা, সমষ্টিবাদ, মানব-

ধর্ম—এই সকল আদর্শ যে আমাদেব ব্যক্তিগত, পবিবাবগত, সমাজগত, জাতিগত আদিম স্বার্থপবতা হইতে মুক্তি লাভ কবিযা অপবেব জীবনেব সহিত নিজেব জীবনের ঐক্য উপলব্ধি কবিবাব প্রকৃষ্ট উপায তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই ঐক্য উপলব্ধি হইতেছে বুদ্ধি ও চিত্তাবেগের স্তরে, নৈতিক স্তবে—এখানে এই উপলব্ধি সর্বাঙ্গসুন্দব সম্পূর্ণ হইতে পাবে না। আদিম স্বার্থপবতাব পব ইহা দ্বিতীয় অবস্থা। কিন্তু গীতা আমাদেব বিকাশমান আত্মচৈতন্যেব আবও এক উচ্চতর তৃতীয় অবস্থাব কথা বলিযাছে, দ্বিতীয অবস্থাটি কেবল সেই উচ্চতব অবস্থায় উঠিবার আংশিক ধাপমাত্র।

ভারতবর্ষে সমাজনীতি ব্যক্তিকে সমাজেব অধীন কবিতে চাহিযাছে, কিন্তু সকল সময়েই ভারতের ধর্মচিন্তা ও অধ্যাত্মসাধনাব লক্ষ্য ছিল ব্যক্তিকে বড কবা। গীতার ন্যায ভারতীয় দর্শনশাস্ত্র যে ব্যক্তিব বিকাশকে প্রথম স্থান দিবে ইহা অবশ্যম্ভাবী; ব্যক্তিব যাহা উচ্চতম প্রযোজন, তাহা উদাবতম অধ্যাত্মমুক্তি, মহত্ত্ব, দীপ্তি, বাজশ্রী আবিষ্কার ও ভোগ করিবার অধিকাব। ঋষিত্ব ও বাজশ্রীব যাহা আধ্যাত্মিক অর্থ সেই অর্থে ঋষি ও বাজা হইযা উঠাকেই জীবনেব লক্ষ্য কবা—আদর্শ মানবত্বেব এই প্রথম মহান সনন্দ প্রাচীন বৈদিক ঋষিগণ কর্তৃক প্রচাবিত হইয়াছিল। ব্যক্তিকে তাহার নিজেব ঊর্ধ্বে উঠিতে হইবে, ইহাই ছিল তাঁহাদেব আদর্শ, তবে সঙ্ঘবদ্ধ মানবসমাজেব মধ্যে ব্যক্তিত্বেব সকল লক্ষ্য হাবাইযা নহে, পরন্তু নিজেকে বড় কবিয়া, উচ্চ কবিযা, বিস্তৃত কবিযা ভাগবত চৈতন্যলাভই তাঁহাদেব আদর্শ ছিল। গীতা এখানে যে অতিমানব, শ্রেষ্ঠমানব, দিব্যভাবাপন্ন মানবেব কথা বলিয়াছে, তাহা নীট্‌শে কথিত অতিমানবেব ধাবণা হইতে বিভিন্ন। কোন এক বিশেষ গুণেব, শক্তিব আত্যন্তিক বিকাশ, মানুষেব কোন আংশিক ভাবের আতিশয্যলাভই গীতাব লক্ষ্য নহে, গীতাব অতিমানব অসুব বা দানব নহে। এক সর্বাতীত বিশ্বগত ভাগবত পুরুষেব সত্তা প্রকৃতি ও চৈতন্যেব মধ্যে মানবের সমগ্র ব্যক্তিত্বকে সমর্পণ কবিযা ক্ষুদ্র "আমিকে" হাবাইযা বৃহত্তব "আমিকে" পাইয়া যে ভাগবত অবস্থা লাভ করা যায গীতায তাহাবই নীতি বর্ণিত হইয়াছে।

নীচের অপূর্ণ প্রকৃতি হইতে, ত্রিগুণময়ী মাযা হইতে নিজেকে তুলিযা ভগবানেব সাযুজ্য, সালোক্য এবং সাদৃশ্য (বা সাধর্ম্য)[১] লাভ কবা, মদ্ভাবমাগতাঃ, ইহাই যোগেব উদ্দেশ্য। কিন্তু যখন এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয, মানব ব্রাহ্মীস্থিতি লাভ করিয়া নিজেকে ও জগৎকে আর মিথ্যা অহংভাবেব দৃষ্টি লইযা দেখে না পবন্তু সর্বভূতকে আত্মার মধ্যে, ভগবানের মধ্যে দেখে এবং সর্বভূতেব মধ্যে আত্মাকে, ভগবানকে দেখে, তখনও যে কর্ম থাকে, সে কর্মেব স্বরূপ কি এবং সে কর্ম কি বিশ্বগত বা ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য লইযা করা হয? অর্জুন এই প্রশ্নই কবিযাছিলেন—

[১] জীবনেব ও কর্মেব নীতিতে ভগবানেব সহিত এক হওযাই সাধর্ম্য।

কিং প্রভাষেত কিমাসীত ব্রজেত কিম্। "স্থিতপ্রজ্ঞব্যক্তি কিরূপ কহেন? কিরূপ থাকেন? কিরূপে চলেন?" —ভগবান এই প্রশ্নেব উত্তর দিলেন বটে, কিন্তু অর্জুন যেদিক হইতে এই প্রশ্ন কবিযাছিলেন উত্তরটা ঠিক সেই দিক দিয়া হইল না। মানসিক বুদ্ধি, হৃদযাবেগ ও নৈতিকতার স্তবে যে ব্যক্তিগত কামনা বা বাসনা তাহা কখনও এরূপ কর্মেব প্রবর্তক হইতে পারে না; কাবণ সে বাসনা পরিত্যক্ত হইযাছে—এমনকি নৈতিক প্রেবণাও পবিত্যক্ত হইবে কারণ যিনি মুক্ত ব্যক্তি তিনি পাপ পুণ্যেব নিম্নতব ভেদ অতিক্রম কবেন এবং শুভ ও অশুভেব উপরে দিব্য পবিত্রতাব মধ্যে বাস কবেন। পূর্ণ আত্মবিকাশেব জন্য নিঃস্বার্থভাবে কর্ম কবিবাব যে আধ্যাত্মিক আহ্বান তাহাব বশেও এ অবস্থায় কর্ম হইবে না, কাবণ সে আহ্বানে সাডা দেওয়া হইযা গিযাছে, আত্মবিকাশ সম্পূর্ণ ও সিদ্ধ হইয়া গিযাছে। শুধু লোকসংগ্রহেব জন্যই এ অবস্থায কর্ম হইতে পারে, চিকীর্ষুর্লোকসংগ্রহম্। মানবমণ্ডলীব দূব ভাগবত আদর্শেব দিকে যে মহান যাত্রা আবম্ভ কবিযাছে তাহা অক্ষুণ্ণ বাখিতে হইবে, বুদ্ধিব সংশয ও গোলমাল হইতে সকলকে বক্ষা করিতে হইবে। অজ্ঞান আঁধাবেব ভিতব দিযা মানুষকে চলিতে হইতেছে, শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণেব আচবণেব আদর্শ, তাহাদেব জ্ঞান ও শক্তিব সাহায্য না থাকিলে সহজেই তাহাবা ধ্বংসমুখে পতিত হইতে পারে। যাঁহাবা শ্রেষ্ঠ, যে সকল ব্যক্তি সাধারণ অপেক্ষা অগ্রগামী এবং সাধাবণেব স্তবেব উপরে তাঁহারা স্বভাবতই মানুষেব নেতা, কাবণ তাঁহাবাই মানুষকে দেখাইতে পারেন যে, কোন্ আদর্শ মানবজাতিকে অনুসবণ কবিতে হইবে, কোন্ পথে তাহাদিগকে চলিতে হইবে। কিন্তু ভগবদ্ভাবাপন্ন ব্যক্তি সাধাবণভাবে শ্রেষ্ঠ নহেন, তাঁহাব প্রভাবেব, তাঁহাব দৃষ্টান্তেব এমন শক্তি থাকিবেই যাহা সাধাবণ শ্রেষ্ঠ মনুষ্যেব থাকিতে পাবে না। তাহা হইলে তিনি কি দৃষ্টান্ত দেখাইবেন? তিনি কোন্ নীতি বা আদর্শ সকলেব সম্মুখে ধবিবেন?

তাঁহাব বক্তব্য আবও সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ কবিবার নিমিত্ত দিব্য গুরু, অবতাব, নিজেব দৃষ্টান্ত, নিজেব আদর্শ অর্জুনেব সম্মুখে ধরিলেন। তিনি যেন বলিলেন—'আমি কর্মপথে বহিযাছি, এই পথ সকল মনুষ্যই অনুসবণ কবে; তোমাকেও কর্ম কবিতে হইবে। আমি যেরূপ কর্ম কবি, তোমাকেও সেইরূপ কর্ম কবিতে হইবে। আমি কর্মেব আবশ্যকতাব ঊর্ধ্বে, কাবণ কর্মেব দ্বারা আমার লাভ কবিবাব কিছুই নাই, আমি ভগবান, সংসাবেব সকল বস্তু, সকল জীবই আমাব, আমি নিজে সংসাবের অতীতও বটি, সংসাবেব মধ্যেও বটি, কোন কিছুব জন্য ত্রিভুবনে আমি কাহাবও নিকট কোন ভরসা করি না, তথাপি আমি কর্ম করি। এই ভাবেই, এই আদর্শেই তোমাকেও কর্ম করিতে হইবে। আমি ভগবান, আমি বিধি, আমিই আদর্শ, মানুষ যে পথে চলে তাহা আমিই প্রস্তুত কবি; আমিই পথ, আমিই লক্ষ্যস্থল। কিন্তু আমি এই সকল বিশালভাবে, সার্বভৌমিকভাবে কবি—আংশিকভাবে দৃশ্যত কবি, কিন্তু বেশীর ভাগ অদৃশ্যভাবেই কবি; মানুষ আমাব কর্মধাবা বাস্তবিকই বুঝে না। তুমি যখন সব জানিবে, দেখিবে, তুমি যখন

দিব্য মানব হইবে—তখন তুমি ভগবানের ব্যষ্টিগত শক্তি হইবে। মানুষ হইযাও ভাগবত আদর্শ—যেমন অবতাবরূপে আমি। বেশীর ভাগ লোকই অজ্ঞানের মধ্যে বাস করে, ভগবদ্‌দ্রষ্টা জ্ঞানের মধ্যে বাস করেন, কিন্তু তিনি যেন বিপজ্জনক দৃষ্টান্ত দেখাইয়া লোকের মধ্যে সংশয় আনযন না করেন, উপরে উঠিযাছেন বলিয়া সংসারের কর্ম পরিত্যাগ না করেন, তিনি যেন অকালে কর্মসূত্র ছিন্ন করিযা না দেন, ক্রমোন্নতির আমি যে সকল স্তর ও ধাপ নির্ধারণ করিযাছি, তিনি যেন তাহা গোলমাল করিযা না দেন। মানুষ কেমন করিযা অপরা প্রকৃতি হইতে পরা প্রকৃতিতে উঠিতে পারিবে, ভাগবত চৈতন্য লাভ করিতে পারিবে, তাহার হিসাব করিয়াই আমি সমস্ত মানবীয় কর্মের ব্যবস্থা করিযাছি। ভাগবত-জ্ঞানীকে সমস্ত মানবীয় কর্মের মধ্যেই থাকিতে হইবে। সমস্ত ব্যক্তিগত কার্য, সামাজিক কার্য, বুদ্ধি, হৃদয, দেহের সমস্ত কার্যই তাঁহার থাকিবে—তবে, তাহা আর স্বতন্ত্রভাবে তাঁহার নিজের জন্য নহে, পরন্তু যে ভগবান জগতের মধ্যে রহিযাছেন, সর্বভূতের মধ্যে রহিযাছেন, তাঁহারই জন্য—তিনি যেমন কর্মের পথ অনুসরণ করিযা নিজের মধ্যে ভগবানকে পাইযাছেন, সেইমত সকলেই যাহাতে পায সেই উদ্দেশ্যেই তাঁহাকে সকল কর্ম করিতে হইবে। বাহ্যত তাঁহার কর্মের সহিত অপরের কর্মের হযতো বিশেষ কোন তফাতই থাকিবে না, যেমন শিক্ষাদান ও জ্ঞানচর্চা, তেমনই যুদ্ধ ও রাজ্যশাসন, মানুষের সহিত মানুষের যত বিচিত্র আদানপ্রদান সবই তাঁহাকে করিতে হইতে পারে, কিন্তু যে মনোভাবের সহিত তিনি এই সকল করিবেন তাহা হইবে সম্পূর্ণ বিভিন্ন, তাঁহার ভিতরের এই ভাবই মানবগণকে তাঁহার নিজের উচ্চতর স্তরে টানিয়া লইবার মহতী শক্তি হইবে, জনমণ্ডলীকে তাহাদের ঊর্ধ্বমুখী পথে তুলিয়া দিবার মহান উত্তোলন-দণ্ড স্বরূপ হইবে।

ভগবান এখানে মুক্ত পুরুষকে যে নিজের দৃষ্টান্ত দিলেন ইহার অর্থ অতি গভীর, কারণ ইহার দ্বারা গীতার দিব্য কর্মবাদের সমগ্র ভিত্তিটি প্রকাশিত হইয়াছে। যিনি নিজেকে দিব্য প্রকৃতির মধ্যে উন্নীত করিযাছেন তিনিই মুক্ত, এতাদৃশ মানবের কর্ম সেই দিব্য প্রকৃতি অনুসারেই হইবে। কিন্তু, দিব্য প্রকৃতি কি? ইহা কেবল অক্ষরের নিশ্চল, নিষ্ক্রিয, নৈর্ব্যক্তিক আত্মার প্রকৃতিই নহে, কারণ তাহা হইলে মুক্ত মানবকে নিশ্চল নিষ্ক্রিয, হইতে হইত। ইহা ক্ষর, বহু ব্যক্তিক যে পুরুষ নিজেকে প্রকৃতির অধীন করিযা দিযাছে স্বরূপত তাহার প্রকৃতিও নহে, কারণ শুধু এইরূপ প্রকৃতি মানুষকে নামরূপের অধীনে, অপরা প্রকৃতি এবং তাহার গুণত্রযের অধীনে ফিরাইযা লইযা যাইবে। ইহা পুরুষোত্তমের প্রকৃতি, তিনি দুইটিকেই এক সঙ্গে ধরিযা রহিয়াছেন এবং তাঁহার পরম ভাগবতসত্তায় তাহাদের দিব্য সমন্বয করিযাছেন, ইহাই হইতেছে তাঁহার সত্তার শ্রেষ্ঠ রহস্য, রহস্যম্ হ্যেতদ্ উত্তমম্। প্রকৃতিতে বদ্ধ আমরা যেরূপ ব্যক্তিগতভাবে কর্ম করি তিনি সেরূপভাবে কর্ম করেন না, কারণ ভগবান তাঁহার শক্তি, মায়া, প্রকৃতির ভিতর দিযা কার্য করেন, কিন্তু তথাপি তিনি ইহার ঊর্ধ্বেই

থাকেন, ইহার দ্বারা বদ্ধ নহেন, ইহার অধীন নহেন; এই প্রকৃতি কর্মের যে নিয়ম, ধারা এবং সংস্কারের সৃষ্টি করে তিনি নিজেকে তাহাদের উপরে তুলিতে অক্ষম নহেন, তাহাদের দ্বারা বিচলিত বা বদ্ধ নহেন, আমরা যেরূপ প্রাণ মন দেহের কর্ম হইতে নিজদিগকে পৃথক করিতে অক্ষম, তিনি সেরূপ অক্ষম নহেন। তিনি কর্তা হইযাও কর্ম করেন না, কর্ত্তারম্ অকর্ত্তারম্।

তস্য কর্ত্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্ত্তারমব্যযম্॥৪।১৩
ন মাং কর্ম্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্ম্মফলে স্পৃহা।৪।১৪

"আমাকে ইহার (চাতুর্ব্বর্ণ্যের) কর্তা বলিযা অথচ অব্যয় অকর্তা বলিয়াই জানিও। কর্মসকল আমাতে লিপ্ত হয় না; কর্মফলেও আমার স্পৃহা নাই।" কিন্তু আবার তিনি নিষ্ক্রিয, নিশ্চল, অক্ষম সাক্ষীমাত্রও নহেন; কারণ তাঁহার শক্তির ক্রিযায তিনিই কর্ম করেন। ইহার প্রত্যেক গতি, এই শক্তি কর্তৃক সৃষ্ট জীবজগতের প্রত্যেক অণু-পরমাণু তাঁহারই সত্তায অনুপ্রাণিত, তাঁহারই চৈতন্যে পূর্ণ, তাঁহারই ইচ্ছায পরিচালিত, তাঁহারই জ্ঞানে গঠিত।

তাছাড়া তিনি সেই পরমপুরুষ যিনি গুণশূন্য হইয়াও সকল গুণের অধিকারী, নির্গুণো গুণী।` প্রকৃতির কোন গুণ বা কর্মের দ্বারা তিনি বদ্ধ নহেন, আমাদের ব্যক্তিত্বের মত তিনি প্রকৃতির গুণসমূহের সমষ্টিমাত্র নহেন, দেহ, প্রাণ, মন, হৃদযের স্বভাবসিদ্ধ ক্রিযাসমূহের সমষ্টিমাত্র নহেন, কিন্তু তিনিই সকল গুণ ও কর্মের মূল, যেটিকে যেমনভাবে হউক তাঁহার ইচ্ছামত বিকাশ করিতে তিনি সক্ষম, তিনি অনন্ত সত্তা, উহারা তাঁহার সম্ভূতির বিভিন্ন ধারা, তিনি অপরিমেয, অনন্ত, অনির্বচনীয বস্তু,—উহারা তাঁহার সান্ত রূপ, বিশ্বের ছন্দে ও সংখ্যায় তাঁহাকেই প্রকাশ করিতেছে। অথচ তিনি শুধুই একটি নৈর্ব্যক্তিক অনির্দেশ্য সত্তা নহেন, চৈতন্যময জীবনের এমন উপাদান মাত্র নহেন যাহা হইতে সকল নাম ও রূপ নিজদিগকে গড়িযা তোলে, পরন্তু তিনি পরমপুরুষ, একমাত্র আদি স্বপ্রতিষ্ঠ চৈতন্যময সত্তা, তিনি পূর্ণতম ব্যক্তি—সকল সম্বন্ধ, মনুষ্যোচিত স্থূল অন্তরঙ্গ সম্বন্ধও তাঁহাতে সম্ভব, তিনি বন্ধু, সখা, প্রণয়ী, খেলার সাথী, পথ-প্রদর্শক, গুরু, প্রভু, জ্ঞানদাতা, আনন্দদাতা, অথচ সকল সম্বন্ধের মধ্যেও মুক্ত, কৈবল্যাত্মক সত্তা। মানুষ ভাগবত প্রকৃতিলাভে যতখানি সক্ষম হয়, ততখানি সেও এইরূপ হয—ব্যক্তি হইযাও ব্যক্তিত্বের উপর উঠিতে পারে, মানুষের সহিত নিবিড়তম ব্যক্তিগত সম্বন্ধ রাখিযাও গুণ বা কর্মের দ্বারা বদ্ধ হয না, এ ধর্ম বা ও ধর্ম অনুসরণ করিতেছে বলিয়া প্রতীযমান হইলেও বাস্তবিক কোন ধর্মের দ্বারাই বদ্ধ থাকে না। কর্মপ্রবণ মনুষ্যের কর্মচাঞ্চল্য অথবা শান্ত সন্ন্যাসীর নিষ্ক্রিয জ্ঞান, কর্মহীনতা, কর্মীর উদ্যম, ব্যক্তিত্ব অথবা দার্শনিক পণ্ডিতের উদাসীন

নৈর্ব্যক্তিকতা—কোনটাই সম্পূর্ণ ভাগবত আদর্শ নহে। সংসাবী মানব এবং সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী বা শান্ত দার্শনিক, এই দুইটি বিবোধী আদর্শ, একজন ক্ষবেব কর্মে মগ্ন আব একজন অক্ষবেব শান্তিব মধ্যে সম্পূর্ণভাবে বাস কবিবাব জন্য যত্নবান; কিন্তু পূর্ণভাগবত আদর্শ আসে পুরুষোত্তমেব প্রকৃতি হইতে, তাহা এই বিবোধের ঊর্ধ্বে এবং তাহাব মধ্যে সকল দিব্য সম্ভাবনাবই সমন্বয় হইযাছে।

বিশ্বপ্রকৃতির পূর্ণ বিকাশ সেই প্রকৃতিব তিনগুণেব এই খেলা, মন হৃদয ও দেহেব এই মানবীয় ক্রিযা, এই সকলেব উপব যে আদর্শ প্রতিষ্ঠিত নহে, সাধাবণ কর্মশীল মানব সেরূপ আদর্শে তৃপ্তি পায় না। সে বলে যে ঐ ক্রিযাব চবম পরিণতিতেই আমাব মানবত্বেব পূর্ণ বিকাশ, মানুষেব দিব্য সম্ভাবনা বলিতে আমি ইহাই বুঝি। মানুষ শুধু সেই আদর্শেই সন্তুষ্ট, যে আদর্শ আমাদেব হৃদযকে আমাদেব নৈতিক বোধকে তৃপ্ত কবিতে পাবে, আমাদেব মানবীয প্রকৃতিকে কর্মে ব্রতী কবিতে পাবে, দেহ মন প্রাণেব কর্মেব মধ্যে যাহা পাওয়া যাইতে পাবে মানুষ তাহাই চায। কাবণ তাহাই তাহাব প্রকৃতি, তাহাব ধর্ম। তাহাব প্রকৃতিব বাহিবেব কিছুতে কেমন কবিযা সে সার্থকতা লাভ কবিবে? কাবণ প্রত্যেক জীব তাহাব প্রকৃতিতে বদ্ধ এবং তাহাবই মধ্যে তাহাকে পূর্ণতা খুঁজিতে হইবে। আমাদেব মানবীয প্রকৃতি যেমন, আমাদেব মানবীয় পূর্ণতাও তদনুরূপই হইবে, প্রত্যেক মনুষ্য নিজেব ব্যক্তিত্ব অনুসাবে, স্বধর্মানুসাবেই ইহাব জন্য চেষ্টা কবিবে—কিন্তু জীবন ও কর্মেব মধ্যে, তাহাদেব বাহিবে নহে। গীতা বলে,—হাঁ এই কথাব মধ্যেও সত্য রহিয়াছে, মানুষেব মধ্যে ভগবানের স্ফুবণ, জীবনেব মধ্যে ভাগবত লীলা, ইহা আদর্শ পূর্ণতাবই অংশ। কিন্তু যদি শুধুই বাহিবে, জীবনেব মধ্যে, কর্মেব নীতিব মধ্যে ইহার সন্ধান কব তাহা হইলে ইহাকে কখনই পাইবে না, কাবণ তখন তুমি যে নিজের প্রকৃতি অনুসারে কর্ম কবিবে (এটা পূর্ণতাবই নীতি) তাহাই নহে কিন্তু তুমি চিবকাল প্রকৃতির গুণের অধীন, বাগদ্বেষেব দ্বন্দ্বেব অধীন, বিশেষত কামনাময ক্রোধশোকসঙ্কুল রজোগুণেব অধীন হইবে (ইহা অপূর্ণতাব নীতি)। এই সর্বগ্রাসী চির-অতৃপ্ত কামনা তোমার সাংসাবিক কর্মকে ঘিবিযা ধবিবে।

কাম এষ ক্রোধ এষ বজোগুণসমুদ্ভবঃ।
মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈবিণম্॥
ধূমেনাব্রিযতে বহ্নির্যথাদর্শো মলেন চ।
যথোল্বেনাবৃতো গর্ভস্তথা তেনেদমাবৃতম্॥
আবৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনো নিত্যবৈবিণা।
কামরূপেণ কৌন্তেয় দুষ্পূবেণানলেন চ॥৩।৩৭-৩৯

এই কাম জ্ঞানেব চিবশত্রু, ইহাব দ্বারা জ্ঞান আচ্ছন্ন হয। ধূম যেমন অগ্নিকে এবং মল যেমন দর্পণকে আচ্ছাদিত কবে, আব জবাযু যেমন গর্ভকে আবৃত কবিযা বাখে তেমনি কাম জ্ঞানকে আচ্ছন্ন কবে। যদি তুমি আত্মাব শান্ত নিমল

জ্যোতির্ময সত্যেব মধ্যে বাস কবিতে চাও তাহা হইলে এই কামকে বধ করিতেই হইবে। ইন্দ্রিযগণ, মন ও বুদ্ধি হইতেছে সিদ্ধিব চিরশত্রু কামের অধিষ্ঠানভূমি, আশ্রয, অথচ শুধু এই ইন্দ্রিয মন ও বুদ্ধির মধ্যে, অপবা প্রকৃতির খেলার মধ্যেই সিদ্ধিব সন্ধান কবিবে? এ চেষ্টা বৃথা। তোমার কর্মপ্রবণ প্রকৃতিকে প্রথমে শান্তিব সন্ধান ফবিতে হইবে; এই নীচের প্রকৃতি হইতে উঠিযা ত্রিগুণেব উপবে যে পবা অধ্যাত্মপ্রকৃতি তাহাতে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। যখন তুমি আত্মাব শান্তি লাভ কবিবে কেবল তখনই তুমি মুক্ত দিব্য কর্মেব অধিকারী হইবে।

অন্যদিকে শান্তিপ্রবণ সন্ন্যাসীগণ সিদ্ধাবস্থায় সংসার ও কর্মের কোন স্থান দেখিতে পান না। এইগুলিই কি বন্ধন এবং অসিদ্ধিব মূল নহে? ধূমাবৃত অগ্নিব ন্যায সকল কর্মই কি দোষযুক্ত নহে? কর্মেব নীতিই কি রাজসিক নহে? এই বজোগুণ হইতেই কামের উদ্ভব, কাম জ্ঞানকে সমাচ্ছন্ন করিয়া বাখে, জয়-পবাজয, সুখ-দুঃখ, পাপ-পুণ্যেব দ্বন্দ্বে মানুষকে অস্থিব করিয়া তোলে। সংসাবেব মধ্যে ভগবান থাকিতে পাবেন, কিন্তু তিনি সংসারের নহেন, তিনি ত্যাগেব ভগবান, আমাদেব কর্মেব অধীশ্বব বা কাবণ নহেন; বাসনা বা কামই আমাদের কর্মেব অধীশ্বব এবং অজ্ঞানই আমাদেব কর্মের কারণ। ক্ষরকে, জগতকে যদিও একভাবে ভগবানেব প্রকাশ বা লীলা বলা যায়, ইহা প্রকৃতির অজ্ঞানের সহিত অপূর্ণ লীলা; ইহা ভগবানকে প্রকাশ করা অপেক্ষা তাঁহাকে ঢাকিয়াই বাখে। জগতেব স্বরূপেব দিকে একবার মাত্র দৃষ্টিপাত করিলেই ইহা নিঃসন্দেহে বুঝা যায় এবং জগতেব সহিত সম্পূর্ণভাবে পবিচিত হইলেও আমরা কি এই শিক্ষাই পাই না? যতদিন কামনা ও কর্মেব প্রবৃত্তি ভোগের দ্বাবা ক্ষীণ বা পবিত্যক্ত না হয ততদিন এই অজ্ঞানচক্র সংসাব কি জীবকে পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ কবায় না? শুধু কাম নহে, কর্ম পর্যন্ত বর্জন কবিতেই হইবে; তখন জীব নীরব আত্মায় প্রতিষ্ঠিত হইযা গতিহীন, কর্মহীন, অবিচল, কৈবল্যাত্মক ব্রহ্মের মধ্যে চলিযা যাইবে। অব্যক্তে আসক্তচিত্ত শান্তিপ্রবণ সন্ন্যাসীর এই আপত্তিব উত্তব গীতা যেরূপ যত্নেব সহিত দিযাছে, সংসাবী কর্মপ্রবণ মানুষের আপত্তির উত্তর দিতে গীতা তত যত্ন কবে নাই। কাবণ শান্ত সন্ন্যাসীব যে আপত্তি তাহাতে আরও উচ্চ এবং শক্তিশালী সত্য নিহিত বহিযাছে অথচ ইহা সম্পূর্ণ বা শ্রেষ্ঠ সত্য নহে—ইহাব প্রচারের দ্বারা মানবজাতিব লক্ষ্যের দিকে প্রগতিতে যে গোলমাল ও অনিষ্ট হইতে পাবে একদেশদর্শী কর্মবাদেব ভ্রান্তিব দ্বাবা তত ক্ষতিব সম্ভাবনা নাই। কোন তীব্র আংশিক সত্যকে যখন সম্পূর্ণ সত্য বলিযা প্রচাব করা যায়—তখন যেমন তীব্র আলোকেব সৃষ্টি হয তেমনই গভীব গোলমালেবও সৃষ্টি হয; কারণ ইহার ভিতর যে সত্যটুকু রহিযাছে—তাহার শক্তি ইহার মিথ্যা বা ভুলেব অংশটুকুকে খুব তীব্র কবিযা তুলে। কর্মবাদের আদর্শে যে ভুল তাহাতে শুধু অজ্ঞানকে স্থায়ী করিয়া বাখে, এবং যেখানে সিদ্ধি পাওযা যায় না সেখানে সিদ্ধিব সন্ধান করায মানবেব

উন্নতিতে বাধা পড়িতে পারে; কিন্তু সন্ন্যাসীর নিষ্কর্মতাব আদর্শে যে ভুল তাহাতে সংসার ধ্বংসেব বীজ নিহিত বহিযাছে। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, আমি যদি এই আদর্শ অনুসারে কর্মত্যাগ করি তাহা হইলে আমি লোকসকলকে নষ্ট কবিব এবং বিষম বিশৃঙ্খলা আনয়ন করিব, এবং যদি কোন বিশিষ্ট মানব (যদিও তিনি প্রায ভাগবত জীবন লাভ করিয়া থাকেন) তাঁহাব ভুলের দ্বাবা সমগ্র জাতিকে ধ্বংস কবিতে না পারেন তথাপি তাঁহাব ভুলের ফলে বিস্তৃতভাবে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইতে পাবে এবং তাহা মানবজীবনের মূলনীতিব সংহাবক হইতে পাবে এবং ইহাব ক্রমবিকাশের নির্দিষ্ট পন্থাকে বিপর্যস্ত করিতে পাবে।

অতএব মানুষেব মধ্যে কর্মশূন্য শান্তিব দিকে যে ঝোঁক বহিযাছে তাহাব অসম্পূর্ণতা বুঝিতে হইবে এবং ইহার মধ্যে যেমন সত্য রহিয়াছে অন্যদিকে কর্মপ্রবণতাব মধ্যেও যে তেমনই সত্য সমানভাবে বহিযাছে তাহা স্বীকার কবিতে হইবে—স্বীকার করিতে হইবে যে, মানুষেব মধ্যে ভগবান প্রকটিত হইতেছেন, এবং মানবজাতির সকল কর্মেব মধ্যেই ভগবান বহিয়াছেন। ভগবান শুধু নীরবতার মধ্যেই নাই, তিনি কর্মেব মধ্যেও রহিযাছেন, প্রকৃতিব প্রভাব হইতে মুক্ত নিষ্ক্রিয় আত্মার যে শান্তভাব এবং প্রকৃতির দ্বাবা পবিচালিত আত্মাব যে কর্মপ্রবণতায় জগৎ-যজ্ঞ, পুরুষ-যজ্ঞ সম্পন্ন হইতেছে, সেই দুইটি পবস্পববিবোধী সত্য নহে; একটি সত্য অপরটি মিথ্যা এরূপভাবেও তাহাদেব মধ্যে চিববিবোধ নাই; একটি উচ্চ অপরটি নীচ তাহাও নহে, একটি দ্বাবা অপবটিব নাশ হইতে পারে সেরূপ সম্ভাবনাও নাই। এই দুইটি হইতেছে ভাগবত লীলাব দুইটি দিক (double term)। শুধু অক্ষরই তাহাদেব সংসিদ্ধিব সমগ্র তত্ত্ব নহে, উচ্চতম রহস্য নহে। এখানে কৃষ্ণ যাঁহাব প্রতিনিধি সেই পুরুষোত্তমেব মধ্যেই উভযেব সিদ্ধি ও সমন্বযেব সন্ধান করিতে হইবে, তিনি একই সঙ্গে পবমতম সত্তা, জগৎসমূহের অধীশ্বর এবং অবতার। যে ভাগবত-ভাবাপন্ন মানব তাঁহাব ভাগবত প্রকৃতিতে প্রবেশ লাভ কবিয়াছেন, তাঁহাব মতই তিনিও কর্ম কবিবেন; তিনি নিজেকে নৈষ্কর্ম্যের মধ্যে ছাড়িযা দিবেন না। অজ্ঞানী মানুষের মধ্যে ভগবান কর্ম করিতেছেন, জ্ঞানী মানুষের মধ্যেও তিনি কর্ম করিতেছেন। তাঁহাকে জানাই আমাদের আত্মার শ্রেষ্ঠ কল্যাণ এবং সিদ্ধিলাভেব উপায, কিন্তু তাঁহাকে শুধু বিশ্বের অতীত নীবব শান্তিময় বলিয়া জানিলে ও বুঝিলেই সব হইল না। অজাত অনন্ত ভগবানের রহস্য যেমন জানিতে হইবে, তেমনই তাঁহার দিব্য জন্ম ও কর্মেব রহস্যও জানিতে হইবে, জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যম্। এই জ্ঞান হইতে যে কর্ম উৎসারিত হয় তাহা সকল বন্ধন হইতে মুক্ত। ভগবান বলিয়াছেন, "এইরূপে যে আমাকে জানে সে কর্মের দ্বাবা বদ্ধ হয় না।" যদি কর্ম ও বাসনাব বাধ্যতা এবং জন্মান্তব চক্র হইতে মুক্তিলাভ আমাদের লক্ষ্য ও আদর্শ হয তাহা হইলে এই জ্ঞানকেই মুক্তির প্রকৃত প্রশস্ত উপায ধবিতে হইবে, কাবণ গীতায বলা হইয়াছে—

জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জ্জুন॥৪।৯

"হে অর্জুন, যিনি আমার এইরূপ দিব্যজন্ম ও দিব্যকর্ম যথার্থরূপে জানেন, তিনি দেহত্যাগান্তে পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হন না; কিন্তু আমাকেই প্রাপ্ত হন।" দিব্যজন্মেব জ্ঞান ও দিব্যজন্মেব ভিতব দিযা তিনি সর্বভূতের আত্মা অজ অব্যয় ভগবানকে লাভ কবেন। দিব্যকর্মেব জ্ঞান ও সাধনেব ভিতব দিয়া তিনি সর্বকর্মের সর্বভূতেব অধীশ্বরকে লাভ কবেন। তিনি অজাত সত্তাব মধ্যে বাস করেন; তাঁহাব কর্ম হয় সেই বিশ্বেব অধীশ্বরের কর্ম।

পঞ্চদশ অধ্যায়

অবতারের সম্ভাবনা ও প্রয়োজন

যে যোগে কর্ম ও জ্ঞান এক হয, জ্ঞানেব সহিত কর্মকে যজ্ঞরূপে অর্পণ কবা হয়, যে যোগে সকল কর্মেব পবিসমাপ্তি হয জ্ঞানে, জ্ঞান কর্মকে সমর্থন কবে, পবিবর্তিত কবে, আলোকিত কবে এবং জ্ঞান ও কর্ম উভযই সেই পবম ভগবান পুরুষোত্তম-এর উদ্দেশে অর্পিত হয, যিনি আমাদেব মধ্যে নাবাযণরূপে আবির্ভূত হন, আমাদেব সকল সত্তা ও কর্মেব অধীশ্ববরূপে আমাদেব হৃদযে চিব-বিরাজিত, যিনি মানবশবীরেও অবতাররূপে আবির্ভূত হন, দিব্যজন্ম আমাদেব মানবীয়তাকে অধিকার করে—সেই যোগের কথা বলিতে বলিতে শ্রীকৃষ্ণ কথাচ্ছলে বলিলেন—

ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যযম্।
বিবস্বান্ মনবে প্রাহ মনুরিক্ষ্বাকবেঽব্রবীৎ॥৪।১

"আমি সূর্যকে এই আদি প্রাচীন যোগ বলিযাছিলাম, সূর্য মানবপিতা মনুকে এবং মনু সূর্যবংশেব আদিরাজ ইক্ষ্বাকুকে এই যোগ কহিযাছিলেন।"

এবং পরম্পবাপ্রাপ্তমিমং বাজর্ষযো বিদুঃ।
স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পবন্তপ॥
স এবাযং মযা তেঽদ্য যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ।
ভক্তোঽসি মে সখা চেতি বহস্যং হ্যেতদুত্তমম্॥৪।২-৩

"রাজর্ষিগণ এইরূপে পবম্পরাপ্রাপ্ত এই যোগ জানিযাছিলেন। হে পবন্তপ, ইহলোকে তাহা কালবশে নষ্ট হইযাছে। তুমি ভক্ত ও সখা, এজন্য আমি সেই পুবাতন যোগ অদ্য তোমাকে কহিলাম; কাবণ ইহাই উত্তম বহস্য।" ইহাকে উত্তম রহস্য বলা হইল, অতএব বলা হইল যে, ইহা অন্যান্য প্রকাবেব যোগ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, কারণ অন্যান্য প্রকারের যোগ নৈর্ব্যক্তিক ব্রহ্মে বা কোন সাকাব দেবতাব নিকট লইয়া যায, হয় কর্মশূন্য জ্ঞানে যে মুক্তি নতুবা ভক্তিতে মগ্ন থাকায যে মুক্তি তাহা লাভ হয। কিন্তু, এখানে যে যোগেব কথা বলা হইল তাহাতে শ্রেষ্ঠ বহস্য এবং সমগ্র রহস্য লাভ হয়। ইহার দ্বারা আমবা ভাগবত শান্তি এবং ভাগবত কর্ম লাভ করি, পূর্ণতম মুক্তিতে সম্মিলিত ভাগবত জ্ঞান, ভাগবত কর্ম, ভাগবত আনন্দের অধিকারী হই; যেমন ভগবানের শ্রেষ্ঠ সত্তাব মধ্যে তাঁহাব বিভিন্ন, এমনকি বিবোধী শক্তি ও তত্ত্বসকলেব সমন্বয হইয়াছে, তেমনি ইহাব মধ্যে অন্যান্য সমস্ত যোগের পথই সম্মিলিত হইয়াছে। অতএব গীতাব এই যোগ কেবল

কর্মযোগ—তিনটি পথেব একটি পথ এবং নিম্নতম পথ এ কথা কেহ কেহ বলিলেও বাস্তবিকপক্ষে ইহা শ্রেষ্ঠ যোগ, ইহা সমগ্র ও পূর্ণ, ইহাতে সকল পন্থার সমন্বয হইযাছে, ইহাব দ্বাবা আমাদেব সমস্ত শক্তিকে ভগবদ্‌মুখী কবা যায়।

ভগবান যে পবেব পব যোগ শিক্ষাদানেব কথা বলিলেন, অর্জুন ইহার সাধাবণ বাহ্যিক অর্থটিই ধবিলেন (ইহার অন্যরকম অর্থও কবা যাইতে পারে) এবং জিজ্ঞাসা কবিলেন—

অপবং ভবতো জন্ম পবং জন্ম বিবস্বতঃ।
কথমেতদ্‌বিজানীয়াং ত্বমাদৌ প্রোক্তবানিতি॥৪।৪

"তোমাব জন্ম পববর্তী এবং সূর্যেব জন্ম পূর্ববর্তী; অতএব তুমি যে প্রথমে সূর্যকে এই যোগ বলিযাছ, ইহা আমি কিরূপে বুঝিব?" শ্রীকৃষ্ণ এই বলিয়া জবাব দিতে পাবিতেন যে, তিনি ভগবান, সমস্ত জ্ঞানেব তিনিই উৎস—তাঁহারই জ্ঞানময রূপ ও সকল আভ্যন্তবীণ ও বাহ্য জ্যোতিব প্রদাতা সূর্যদেবকে তিনি তাঁহার বাণী দিযাছিলেন—ভর্গো সবিতুর্ দেবস্য যো নঃ ধীয়ঃ প্রচোদয়াৎ। কিন্তু তাহা না কবিযা তিনি এই সুযোগে অর্জুনকে তাঁহাব গুপ্ত ঈশ্বরত্বেব কথা বলিলেন; ইহাব জন্য তিনি ইতিপূর্বে অর্জুনকে প্রস্তুত কবিযা বাখিয়াছিলেন যখন তিনি নিজেকে সকল বন্ধনমুক্ত কর্মীব ভাগবত আদর্শ বলিযা উল্লেখ কবেন—কিন্তু তখন কথাটা বেশ পবিষ্কাব কবিযা বলা হয নাই। এখন তিনি স্পষ্ট বলিলেন যে, তিনি স্বয়ং অবতীর্ণ ভগবান, অবতাব।

গীতাব গুরুব কথা বলিবার সময আমবা সংক্ষেপে অবতারবাদের কথা বলিযাছি, বেদান্তশিক্ষাব আলোকে অবতাববাদ যেরূপ বুঝা যায় গীতা সেইভাবে উহা আমাদেব নিকট উপস্থিত কবিযাছে। এখন এই অবতাববাদ আমাদিগকে আর একটু গভীবভাবে দেখিতে হইবে এবং যে দিব্যজন্মেব ইহা বাহ্যিক নিদর্শন তাহার প্রকৃত অর্থ হৃদযঙ্গম কবিতে হইবে; কাবণ, গীতাব পূর্ণ শিক্ষায ইহা সমধিক প্রযোজনীয। প্রথমে, গীতাব গুরু নিজে যে ভাষায অবতারেব স্বরূপ ও প্রয়োজনের কথা বলিযাছেন আমবা তাহাব উল্লেখ কবিব এবং এই বিষযে অন্যান্য স্থানেও যাহা বলা হইযাছে বা সঙ্কেত কবা হইযাছে তাহাও স্মবণ করিব। ভগবান বলিলেন—

বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জ্জুন।
তান্যহং বেদ সর্ব্বাণি ন ত্বং বেত্থ পবন্তপ॥
অজোঽপি সন্নব্যযাত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায সম্ভবাম্যাত্মমাযযা॥
যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥৪।৫-৭

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥
জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জ্জুন॥
বীতরাগভয়ক্রোধা মন্ময়া মামুপাশ্রিতাঃ
বহবো জ্ঞানতপসা পূতা মদ্ভাবমাগতাঃ॥
যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ॥৪।৮-১১

"হে অর্জুন, আমার ও তোমার বহু জন্ম অতীত হইয়াছে, আমি সে সমুদয় জানি, কিন্তু, তুমি তাহা জান না, পরন্তপ। আমি জন্মরহিত, নিজ স্বপ্রতিষ্ঠ সত্তায় অবিনশ্বর এবং প্রাণীগণের ঈশ্বর হইলেও আমি স্বীয় প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান করিয়া স্বীয় মায়াবশত জন্মগ্রহণ করিয়া থাকি। হে ভারত, যখনই ধর্মের গ্লানি হয় অধর্মের প্রাদুর্ভাব হয়, তখনই আমি আপনাকে সৃষ্টি করি। সাধুদিগের রক্ষার জন্য, দুষ্কর্মকারীদিগের বিনাশের জন্য এবং ধর্মস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই। হে অর্জুন, যিনি আমার এইরূপ জন্ম এবং কর্ম যথার্থ জানেন তিনি দেহত্যাগান্তে পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হন না, কিন্তু আমাকেই প্রাপ্ত হন। আসক্তি, ভয় ও ক্রোধশূন্য, মদেকচিত্ত হইয়া আমাকে আশ্রয় করিয়া, জ্ঞান তপস্যায় পবিত্র অনেক মহাত্মাই আমার ভাব (পুরুষোত্তমের ভাব) পাইয়াছেন। যাহারা আমাকে যেভাবে ভজনা করে, তাহাদিগকে আমি আমার প্রেমে সেইভাবেই গ্রহণ করি, হে পার্থ, মনুষ্যগণ সর্বতোভাবে আমার পথের অনুবর্তন করিয়া থাকে।"

কিন্তু বেশীর ভাগ লোকই কর্মের সিদ্ধি কামনা করিয়া দেবগণের উদ্দেশ্যে, একই ভগবানের বিভিন্ন রূপ ও ব্যক্তিত্বের উদ্দেশে যজ্ঞ করিয়া থাকে, কারণ মনুষ্যলোকে কর্মজ সিদ্ধি, জ্ঞান-বিরহিত কর্মের ফল, খুব শীঘ্রই এবং সহজেই লব্ধ হয়; বাস্তবিক ইহা শুধু এই জগতেরই। কিন্তু পরমেশ্বরের উদ্দেশে জ্ঞানের সহিত যজ্ঞ করিয়া মানুষের মধ্যে যে ভাগবত জীবনের বিকাশ তাহা ইহা অপেক্ষা অনেক কঠিন; ইহার ফল উচ্চস্তরের এবং তাহা সহজে হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। অতএব, মানুষকে গুণ-কর্মের বিভাগ অনুযায়ী চাতুর্বর্ণ্য নীতির অনুসরণ করিতে হয় এবং এই সাংসারিক কর্মের স্তরে তাহারা ভগবানের বিভিন্ন গুণের ভিতর দিয়াই তাঁহার উপাসনা করে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন যে, যদিও আমি চাতুর্বর্ণ্যের কর্ম করি এবং আমি এই চাতুর্বর্ণ্য নীতির সৃষ্টিকর্তা তথাপি আমাকে অকর্তা বলিয়াও, অবিনশ্বর অক্ষর আত্মা বলিয়াও জানিও। কর্মসকল আমাকে আসক্ত করে না, কর্মফলে আমার স্পৃহা নাই।

ন মাং কর্ম্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্ম্মফলে স্পৃহা।

কারণ, ভগবান নৈর্ব্যক্তিক সত্তারূপে এই অহংমূলক ব্যক্তিকতার এবং প্রকৃতিজাত গুণের এই দ্বন্দ্বের অতীত, আবার পুরুষোত্তমরূপে, নৈর্ব্যক্তিক পুরুষরূপে, তিনি কর্মের মধ্যেও সম্পূর্ণভাবে মুক্ত। অতএব দিব্যকর্মের কর্মিগণকে চাতুর্বর্ণ্য নীতি অনুসারে কর্ম করিবার সময়েও ঊর্ধ্বে যাহা রহিয়াছে তাহা জানিতে হইবে, নৈর্ব্যক্তিক আত্মার মধ্যে এবং পরম ভগবানের মধ্যে বাস করিতে হইবে,

ইতি মাং যোঽভিজানাতি কর্ম্মভির্ন স বধ্যতে॥৪।১৪
এবং জ্ঞাত্বা কৃতং কর্ম্ম পূর্ব্বৈরপি মুমুক্ষুভিঃ।
কুরু কর্ম্মৈব তস্মাৎ ত্বং পূর্ব্বৈঃ পূর্ব্বতরং কৃতম্॥৪।১৫

"এইরূপে যিনি আমাকে জানেন, তিনি তাঁহার কর্মের দ্বারা বদ্ধ হন না। এইরূপ জানিয়া পূর্বতন (জনকাদি) মুমুক্ষুরাও কর্ম করিয়াছেন, অতএব তুমিও পূর্বতন সাধুগণের কৃত প্রাচীনতর কর্মই কর।"

গীতার এই যে কথাগুলি এখানে উত্থিত হইল, এগুলি দিব্যকর্মের, ভাগবত কর্মের স্বরূপের পরিচায়ক—পূর্ব প্রবন্ধে ইহার নীতি সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করিয়াছি। এই কথাগুলির পূর্বেই গীতা হইতে যে শ্লোকগুলি তুলিয়া আমরা অনুবাদ করিয়াছি—তাহাতে দিব্যজন্মের, অবতারের স্বরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে। কিন্তু আমরা ভাল করিয়া বলিতে চাই যে, শুধু জগতের ধর্মরক্ষা ধর্মসংস্থাপনই অবতারের, মানবীয়তার মধ্যে ভগবদ্ আবির্ভাবরূপ মহান রহস্যের একমাত্র উদ্দেশ্য নহে, কারণ শুধু ধর্মসংস্থাপনই যথেষ্ট নহে, একজন খ্রীষ্ট, কৃষ্ণ বা বুদ্ধের অবতারের উচ্চতম সম্ভব লক্ষ্য নহে, উহা এক উচ্চতর দিব্য প্রয়োজন ও মহত্তর লক্ষ্য সিদ্ধির জন্য সাধারণ প্রয়োজনীয় একটি বিধান মাত্র। কারণ দিব্যজন্মের দুইটি দিক আছে একটি হইতেছে, অবতরণ, মানবীয়তার মধ্যে ভগবানের জন্ম, মানব শরীর ও প্রকৃতির মধ্যে ভগবানের আত্মপ্রকাশ, চিরন্তন অবতার, অপরটি হইতেছে আরোহণ, ভাগবত ভাবে মানবের জন্ম, ভাগবত প্রকৃতি ও চৈতন্যের মধ্যে মানবের উত্থান, মদ্ভাবমাগতাঃ, ইহা আত্মার নূতন জন্মে পুনর্জন্মলাভ। এই নবজন্ম সাধনের জন্যই অবতার এবং ধর্মসংস্থাপন। গীতার অবতারবাদের এই যে দুইটি দিক রহিয়াছে তাহা অসতর্ক পাঠকের চক্ষুতে পড়ে না, কারণ সাধারণ পাঠকেরা গীতার অর্থ তলাইয়া দেখিবার চেষ্টা করে না, দেখিবামাত্র সহজে যে অর্থ মনে আসে তাহাতেই সন্তুষ্ট হয়, গীতার গোঁড়া টীকাকারেরাও ইহা ধরিতে পারে না, কারণ কোন বিশেষ সাম্প্রদায়িক মতবাদের সঙ্কীর্ণতাতে তাহারা প্রকৃত অর্থকে বিকৃত করিয়া দেখে। অথচ অবতারবাদের সম্যক অর্থ বুঝিবার জন্য দুইটি দিকই প্রয়োজন। নতুবা এই অবতারবাদ শুধু একটা গোঁড়া মত, একটা লৌকিক কুসংস্কার বা কোন ঐতিহাসিক বা পৌরাণিক মহাপুরুষকে কল্পনার বলে ভগবান বলিয়া বর্ণনা করা ভিন্ন আর কিছুই হয় না; কিন্তু গীতার শিক্ষা এইরূপ নহে, গীতার সমস্ত শিক্ষার ন্যায় এই অবতারবাদও গভীর আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক তত্ত্বের

উপরে প্রতিষ্ঠিত এবং উত্তমম্ রহস্যম্, শ্রেষ্ঠ রহস্যের অন্তর্গত।

এইরূপে মানুষকে তুলিয়া ভাগবত জীবনের মধ্যে লইয়া যাইতে সাহায্য করিবার জন্যই মানবশরীরে ভগবানের অবতরণ। যদি তাহা না হয়, তাহা হইলে শুধু ধর্মসংস্থাপনের জন্য ভগবানের অবতারের কোন প্রয়োজন নাই, কারণ ধর্ম, ন্যায়, পাপ-পুণ্যের বিধান—এ সকলের প্রতিষ্ঠা সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর সকল সময়েই সাধারণ উপায়ের দ্বারা সংশোধন করিতে পারেন—মহাপুরুষ বা মহৎ আন্দোলনের ভিতর দিয়া, সাধু, রাজা এবং ধর্মোপদেষ্টাদের জীবন ও কর্মের ভিতর দিয়া এই সকল সংসাধিত হইতে পারে, বস্তুত স্বয়ং ভগবানকে অবতীর্ণ হইতে হয় না। মানবীয় প্রকৃতির মধ্যে ভাগবত প্রকৃতির প্রকাশই অবতার, এইরূপেই হইয়াছে খ্রীষ্ট, কৃষ্ণ, বুদ্ধের আবির্ভাব—ইহার উদ্দেশ্য এই যে, মানবীয় প্রকৃতি খ্রীষ্টত্ব, কৃষ্ণত্ব, বুদ্ধত্বের অনুসরণ করিয়া নিজের নীতি, চিন্তা, ভাব, কর্ম গড়িয়া তুলিবে এবং এইরূপেই তাহা ভাগবত প্রকৃতিতে রূপান্তরিত হইবে। অবতার যে নীতি, যে ধর্ম সংস্থাপন করেন ইহাই তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য, খ্রীষ্ট বা কৃষ্ণ বা বুদ্ধ কেন্দ্রস্থানে দ্বারের মত দাঁড়াইয়া থাকেন—তাঁহার নিজের ভিতর দিয়াই মানুষের অগ্রসর হইবার পথ করিয়া দেন। এই জন্যই প্রত্যেক অবতার মনুষ্যের সম্মুখে নিজের দৃষ্টান্ত ধরিয়া থাকেন এবং প্রচার করেন যে, তিনিই পথ, তিনিই প্রবেশের দ্বার, আরও তিনি প্রচার করেন তাঁহার মানবীয়তার সহিত ভাগবত সত্তার একত্ব। যীশু বলিয়াছেন, মানবপুত্র তিনি এবং যে স্বর্গীয় পিতা হইতে তিনি অবতীর্ণ, উভয়েই এক, শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, মানুষশরীরে তিনি, মানুষীম্ তনুমাশ্রিতম্, এবং সর্বভূতের সুহৃদ্, পরম ঈশ্বর, উভয়েই এক ভগবান পুরুষোত্তমেরই প্রকাশ, সেখানে নিজ স্বরূপে প্রকাশ, এখানে মানব মূর্তিতে প্রকাশ।

অবতারের এই দ্বিতীয় এবং প্রকৃত উদ্দেশ্যই যে গীতাশিক্ষার সার তাহা গীতার কেবল এই অংশের যথার্থ আলোচনা করিলেই বুঝা যায়, কিন্তু, শুধু এই *অংশটি না ধরিয়া অন্যান্য* অংশও যদি বিবেচনা করা যায় তাহা হইলে ইহা আরও স্পষ্ট হয়। বাস্তবিক গীতার প্রকৃত অর্থ বুঝিতে হইলে—কোন বিশেষ শ্লোক বা অংশকে স্বতন্ত্রভাবে ধরা ঠিক নহে—অন্যান্য শ্লোক বা অংশের সহিত মিলাইয়া, *এবং সমগ্র শিক্ষার সহিত মিলাইয়া* তাহার অর্থ করা সমীচীন। গীতা যে বলিয়াছে, একই আত্মা সর্বভূতে বিরাজমান, ঈশ্বর সর্বভূতের হৃদ্দেশে অবস্থিত—আমাদিগকে গীতার সেই শিক্ষা এখানে স্মরণ করিতে হইবে, ঈশ্বর ও তাঁহার সৃষ্টির পরস্পরের সম্বন্ধের কথা মনে করিতে হইবে, বিভূতির কথা গীতায় যেরূপ জোরের সহিত বলা হইয়াছে তাহাও মনে করিতে হইবে। গীতার গুরু যে ভাষায় নিজের নিঃস্বার্থ কর্মের দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন তাহাও লক্ষ্য করিতে হইবে—এই বর্ণনা মানবরূপী শ্রীকৃষ্ণ এবং জগতের ঈশ্বর উভয়েরই পক্ষে সমানভাবে খাটে, নবম অধ্যায়ের নিম্ন শ্লোকটির মত শ্লোকগুলির মর্মও গ্রহণ করিতে হইলে—

অবজানন্তি মাং মূঢা মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্॥৯।১১

"ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ **মানুষীদেহধারী** আমাকে অবজ্ঞা করে কারণ তাহারা সর্বভূতের মহান্ ঈশ্বররূপ আমার পরমতত্ত্ব জানে না।" এই সকল তথ্যের আলোকে আমাদিগকে গীতার নিম্নলিখিত ঘোষণাটি বুঝিতে হইবে—

জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জ্জুন॥৪।৯
বীতরাগভয়ক্রোধা মন্ময়া মামুপাশ্রিতাঃ
বহবো জ্ঞানতপসা পূতা মদ্ভাবমাগতাঃ॥৪।১০

"হে অর্জুন, যিনি আমার এইরূপ জন্ম ও কর্ম যথার্থরূপে জানেন, তিনি দেহত্যাগান্তে পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হন না, কিন্তু আমাকেই প্রাপ্ত হন। আসক্তি, ভয় ও ক্রোধশূন্য হইয়া, মদেকচিত্ত হইয়া, আমাকে আশ্রয় করিয়া জ্ঞান তপস্যার দ্বারা পবিত্র অনেক মহাত্মাই আমার ভাব পাইয়াছেন।" এইরূপ আলোচনা করিলে আমরা দিব্যজন্মের প্রকৃত স্বরূপ ও উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিব; বুঝিব যে, এই অবতার বা দিব্যজন্ম একটা বিচ্ছিন্ন অলৌকিক ঘটনা নহে—জগৎ-বিকাশরূপ সমগ্র ব্যাপারের মধ্যে ইহারও নির্দিষ্ট স্থান আছে; নতুবা আমরা ইহার দিব্য রহস্য বুঝিতে পারিব না, হয়তো আমরা একেবারেই এই অবতার তত্ত্বকে উড়াইয়া দিব অথবা অন্ধভাবে কিছু না বুঝিয়াই হয়তো বা কুসংস্কারপূর্ণভাবেই ইহাকে মানিয়া লইব, অথবা অবতার সম্বন্ধে আধুনিক মনের সেই সব ক্ষুদ্র ও অগভীর ধারণার বশবর্তী হইয়া পড়িব যাহাদের দ্বারা ইহার সকল নিগূঢ় ও সাহায্যপ্রদ অর্থ নষ্ট হইয়া যায়।

প্রাচ্য হইতে যেসকল ভাব মানুষের যৌক্তিক বুদ্ধির সম্মুখে আসিতেছে তাহাদের মধ্যে এই অবতারতত্ত্ব আধুনিক মনের পক্ষে বুঝা বড়ই কঠিন। আধুনিক মন অবতারবাদকে অন্ধ কুসংস্কার বলিয়া উড়াইয়া দেয় নতুবা ইহাকে রূপকমাত্র বলিয়া গ্রহণ করে—তাহাদের মতে যেসকল মনুষ্য বিশেষ শক্তি, প্রতিভা বা কর্ম দেখান তেমন লোককেই সাধারণে অবতার বলিয়া থাকে। জড়বাদীগণ তো অবতারতত্ত্বকে আমলই দিতে পারে না, কারণ তাহারা ভগবানের অস্তিত্বই স্বীকার করে না, যাঁহারা ঈশ্বরকে জগৎ হইতে সম্পূর্ণ পৃথকভাবে দেখেন (Deists) তাঁহারা ভগবান যে মানুষ হন একথা হাসিয়া উড়াইয়া দেন। পূর্ণ দ্বৈতবাদী (Dualists), যাঁহারা মানবীয় প্রকৃতি এবং ভাগবত প্রকৃতির মধ্যে অলঙ্ঘ্য ব্যবধান দেখিতে পান, তাঁহাদের নিকট অবতারবাদ হইতেছে পাষণ্ডীয়। যুক্তিবাদী বলেন—ভগবান যদি থাকেন তাহা হইলে তিনি বিশ্বের উপরে অথবা বাহিরে আছেন এবং তিনি সংসারের ব্যাপারে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করেন না, বাঁধা নিয়মকানুনের বশে জগতের কার্যাবলী যন্ত্রবৎ পরিচালিত হয়—বস্তুত তিনি

একজন দূরবর্তী নিয়মতান্ত্রিক রাজার মত, বড জোর তিনি প্রকৃতির ক্রিয়াশীলতার পশ্চাতে উদাসীন, নিষ্ক্রিয়, আত্মামাত্র, সাংখ্যের সাক্ষীর মত, তিনি পবিত্র আত্মা, তাঁহার পক্ষে শরীর ধারণ সম্ভব নহে, তিনি অনন্ত, মানুষ যেমন সান্ত তিনি তেমন সান্ত হইতে পারেন না, তিনি চির-অজাত সৃষ্টিকর্তা, তিনি কখনও সৃষ্টজীবরূপে জগতে জন্মগ্রহণ করিতে পারেন না; তিনি সর্বশক্তিমান হইলেও এসব তাঁহার পক্ষে সম্ভব নহে। পূর্ণ দ্বৈতবাদীরা আরও আপত্তি তোলেন যে, ভগবান তাঁহার স্বরূপ, ব্যবহার ও প্রকৃতিতে মনুষ্য হইতে সম্পূর্ণভাবে ভিন্ন, স্বতন্ত্র; যিনি পূর্ণ, মনুষ্যের অপূর্ণতা গ্রহণ করা তাঁহাতে সম্ভব নহে; অজাত ভাগবতপুরুষ কখনও মানবীয় ব্যক্তিরূপে জন্মগ্রহণ করিতে পারেন না, যিনি জগৎসমূহের নিয়ন্তা তিনি কখনও প্রকৃতির অধীন মানবীয় কর্মের মধ্যে, ধ্বংসশীল মানব শরীরের মধ্যে সীমাবদ্ধ হইতে পারেন না। এই সকল আপত্তি যে শুনিবামাত্রই বুদ্ধির কাছে খুব বড বলিয়া মনে হয়, গীতার গুরুর মনেও যে এই আপত্তিগুলি উঠিয়াছিল তাঁহার নিম্নলিখিত কথাগুলি হইতেই তাহা বেশ বুঝা যায়—

অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া॥৪।৬
অবজানন্তি মাং মূঢা মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্॥৯।১১
চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।
তস্য কর্ত্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্ত্তারমব্যয়ম্॥৪।১৩

"আমি জন্মরহিত, অবিনশ্বর এবং প্রাণীগণের ঈশ্বর, তাহা হইলেও আমি স্বীয় প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান করিয়া স্বীয় মায়ায় আবির্ভূত হইয়া থাকি। মূঢগণ সর্বভূতের মহান ঈশ্বররূপ আমার পরমতত্ত্ব না জানায় মানুষদেহধারী আমাকে অবজ্ঞা করে। আমি গুণ ও কর্মের বিভাগে চাতুর্বর্ণ্য সৃষ্টি করিয়াছি, আমাকে তাহার কর্তা বলিয়া জানিও, অব্যয় অকর্তা বলিয়াও জানিও।" —ভাগবত চৈতন্যের ক্রিয়ায় তিনি চাতুর্বর্ণ্যের সৃষ্টিকর্তা এবং সংসারের সকল কর্মের কর্তা, আবার ভাগবত চৈতন্যের নীরবতার মধ্যে তিনি তাঁহার নিজেরই প্রকৃতির কর্মের নিরপেক্ষ দ্রষ্টা—কারণ তিনি সকল সময়ে নীরবতা ও কর্ম উভয়ের ঊর্ধ্বে, তিনি পরম পুরুষোত্তম। গীতা এই সমস্ত আপত্তিরই খণ্ডন করিতে এবং এই সকল বিরোধের মীমাংসা করিতে পারিয়াছে, কারণ গীতা জগৎ ও ঈশ্বর সম্বন্ধে বেদান্তের মত গ্রহণ করিয়া অগ্রসর হইয়াছে।

কারণ বেদান্তের মতে এই সকল দারুণ আপত্তি ও বিরোধের কোন ভিত্তিই নাই। বেদান্তের মতে অবতারবাদ অপরিহার্য নহে বটে তথাপি ইহা সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত ও ন্যায়সঙ্গত ধারণারূপে বেদান্ত মতের মধ্যে সহজ ও স্বাভাবিকভাবেই আসিয়া পড়ে। কারণ এখানে সমস্তই ভগবান, আত্মা, স্বপ্রতিষ্ঠ সত্তা, ব্রহ্ম,

একমেবাদ্বিতীয়ম্—ইহা ছাড়া ইহা হইতে ভিন্ন বা স্বতন্ত্র আর কিছুই নাই, থাকিতে পারে না, প্রকৃতি ভাগবত চৈতন্যেরই শক্তি এবং ইহা ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না, সকল জীবই ভগবানের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ শারীররূপ ও আত্মরূপ—ভাগবত চৈতন্যের শক্তি হইতেই তাহারা উৎপন্ন অথবা তাহার মধ্যে অবস্থিত। অনন্তের পক্ষে সান্তভাব গ্রহণ করা অসম্ভব তো নহেই, সমস্ত বিশ্ব ইহা ভিন্ন আর কিছুই নহে, আমরা যেভাবেই দেখি না কেন, যে জগতে আমরা বাস করি তাহার কোথাও ইহা ভিন্ন আর কিছুই নাই। আত্মার পক্ষে আকার গ্রহণ করা, অথবা দেহ ও মনের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হওয়া, সীমাবদ্ধ প্রকৃতি বা দেহ গ্রহণ করা অসম্ভব তো নহেই, পরন্তু এইরূপ সম্বন্ধের দ্বারাই জগৎ টিকিয়া আছে। এই জগৎ শুধু চৈতন্যহীন অন্ধ নিয়মের খেলা নহে, জগতের বাহিরে কোন চৈতন্য বা আত্মা শুধু উদাসীন সাক্ষীভাবে বসিয়া নাই, সমগ্র জগৎ এবং জগতের প্রতি অণু পরমাণু ভাগবত শক্তির ক্রিয়া ভিন্ন আর কিছুই নহে, এবং সেই শক্তি জগতের প্রত্যেক গতি ও ক্রিয়া পরিচালন করে, জগতের প্রত্যেক রূপের মধ্যে বাস করে, প্রত্যেক আত্মা ও মনকে অধিকার করে; সকলেই ভগবানের মধ্যে আছে, সকলেই তাঁহার মধ্যে চলাফেরা করে, তাঁহারই মধ্যে জীবনযাপন করে; তিনি সকলের মধ্যে আছেন, সকলের ভিতর দিয়া কর্ম করেন এবং নিজের সত্তা প্রকট করেন; প্রত্যেক জীবই ছদ্মবেশী নারায়ণ।

অজাত ভগবানের পক্ষে জন্মগ্রহণ অসম্ভব হওয়া দূরের কথা, সমস্ত জীব ব্যক্তিগতভাবেই অজ আত্মা, সকলেই আদিঅন্তহীন সনাতন, তাহাদের গূঢ় সত্তায় সকলেই সেই এক আত্মা যাহার পক্ষে জন্ম ও মৃত্যু বাহ্যিক আকার পরিগ্রহ এবং পরিবর্তনের লক্ষণমাত্র। যিনি পূর্ণ (Perfect) তিনি কেমন করিয়া অপূর্ণতা (imperfection) পরিগ্রহ করিতে পারেন ইহাই বিশ্বপ্রপঞ্চের পরম রহস্যময় ব্যাপার, কিন্তু যে মন ও শরীর পরিগৃহীত হয় তাহার রূপ ও কর্মেই অপূর্ণতা-দোষ দৃষ্ট হয়—যিনি এইসব পরিগ্রহ করেন তাঁহাতে কোন অপূর্ণতা নাই, যেমন সূর্য যে আলো দেয় তাহাতে কোন দোষ নাই, যাহার যেমন চক্ষু সে তেমনই আলো দেখিয়া থাকে, বিভিন্ন ব্যক্তির চক্ষুতে অপূর্ণতা বা দোষ থাকে। ভগবান কোনও দূর স্বর্গ হইতে যে এই বিশ্বজগৎ পরিচালন করেন তাহাও নহে, সর্বত্র নিবিড়ভাবে বিরাজিত থাকিয়াই তিনি জগৎ পরিচালনা করেন; শক্তির যেসব সসীম ক্রিয়া সেসব এক অনন্ত শক্তিরই ক্রিয়া, সেসব কোন সীমাবদ্ধ স্বতন্ত্র স্বপ্রতিষ্ঠ ক্রিয়া নহে, সবই সেই এক অনন্ত শক্তি হইতে উদ্ভূত; ইচ্ছা ও জ্ঞানের প্রত্যেক সসীম ক্রিয়াতেই দেখিতে পাওয়া যায় সেইটিকে ধরিয়া রহিয়াছে এক অনন্ত সর্ব-ইচ্ছা এবং সর্ব-জ্ঞানের ক্রিয়া। ভগবান কোন দূর দেশে জগতের বাহিরে থাকিয়া জগৎ পরিচালনা করেন না; তিনি সকলের অতীত বলিয়াই সকলকে পরিচালনা করেন, কিন্তু আবার তিনি সকল ক্রিয়ার মধ্যে তাহাদের পরমাত্মারূপে আছেন বলিয়াও সকলকে পরিচালনা করেন। অতএব আমাদের বুদ্ধি অবতারের সম্ভাবনার বিরুদ্ধে

যেসকল আপত্তি তুলিযা থাকে সেসকল ভিত্তিহীন। কাবণ আমাদেব বুদ্ধি যে (অনন্ত ও সান্তেব, পূর্ণ ও অপূর্ণেব) মিথ্যা বিভাগ কবিযা থাকে তাহা জগতেব সমগ্র ঘটনাব, সমগ্র সত্যেব বিবোধী।

কিন্তু সম্ভাবনাব কথা ছাডিযা দিলেও এই প্রশ্ন উঠে যে, বাস্তবিকই কি এইরূপ ঘটিয়া থাকে? বাস্তবিকই কি ভাগবত চৈতন্য আববণেব অন্তবাল হইতে বাহিব হইয়া সাক্ষাৎভাবে বাহ্যজগতে, মানসিক ও জডজগতে, সসীমেব মধ্যে অসম্পূর্ণেব মধ্যে কার্য কবিযা থাকে? প্রকৃতপক্ষে সসীম আব কিছুই নহে, নিজেব চৈতন্যের বিচিত্রতাব সম্মুখে অনন্তেব আত্মপ্রকাশেব এক একটি রূপই হইতেছে সসীম, কার্যত সসীম যেভাবেই প্রতীযমান হউক, বস্তুত প্রত্যেক সসীমই নিজ স্বপ্রতিষ্ঠ সত্তায অসীম অনন্ত। মানুষকে আমবা ঘনিষ্ঠভাবে দেখিলেই বুঝিতে পাবি যে, মানুষ একেবারে স্বতন্ত্র, সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন স্বপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তি নহে, কিন্তু বিশেষ শরীব ও মনের ভিতব মানবজাতিবই প্রকাশ, তেমনই মানবজাতিও কোন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জাতি নহে, ইহা বিশ্বসত্তাব, বিশ্বেশ্ববেবই মানবজাতিরূপে আত্মপ্রকাশ। সেখানে তিনি কতকগুলি বিশিষ্ট সম্ভাবনাব বিকাশ কবিতেছেন। তাঁহার অভিব্যক্তিব কতকগুলি বিশিষ্ট শক্তি বিবর্তিত কবিতেছেন। আব তিনি বিবর্তিত করিতেছেন, প্রকট করিতেছেন নিজেকেই, আত্মাকেই।

কারণ আত্মা (Spirit) বলিতে আমবা বুঝি স্বপ্রতিষ্ঠ সত্তা, তাহাব আছে চৈতন্যের অনন্ত শক্তি এবং নিজ সত্তাব অনাপেক্ষিক আনন্দ। হয ইহা এরূপ নতুবা ইহা কিছুই নয়, অন্তত মানুষ ও জগতেব সহিত ইহাব কোন সম্পর্কই নাই। জড়, শরীব হইতেছে কেবল চৈতন্যময় সত্তাব একটা পুঞ্জীভূত গতি, চৈতন্য নিজের ইন্দ্রিয়শক্তির ভিতব দিযা বিচিত্র সম্বন্ধ বিকাশেব জন্য জডকে, দেহকে প্রাথমিক উপলক্ষ্যরূপে ব্যবহাব কবে, জডও প্রকৃতপক্ষে কোথাও চৈতন্যশূন্য নহে, কাবণ বর্তমান বিজ্ঞানই স্পষ্টভাবে স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছে যে, প্রত্যেক অণুতে (atom) প্রত্যেক কোষে (cell) একটা ইচ্ছাশক্তি, একটা বুদ্ধি ক্রিযা কবিতেছে; কিন্তু সেই শক্তি অন্তর্নিহিত আত্মাবই, ভাগবতেবই সঙ্কল্প ও বুদ্ধিব শক্তি; কোষে ও অণুতে যে চেতনাশক্তি, ইচ্ছাশক্তি, তাহা জড অণু বা কোষেব নিজস্ব, স্বতন্ত্র সঙ্কল্প বা বুদ্ধি নহে। এই যে বিশ্বব্যাপী ইচ্ছাশক্তি, বোধশক্তি, সর্বত্র নিহিত রহিযাছে ইহা বিভিন্ন রূপেব ভিতব দিয়া বিকাশ লাভ কবিয়াছে এবং অন্তত পৃথিবীতে ইহা মানুষের মধ্যেই পূর্ণ ভাগবতেব সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী হইযাছে এবং প্রথমে সেখানেই বাহ্যচৈতন্যেব মধ্যেও অস্পষ্টভাবে নিজেব ভাগবত সত্তা উপলব্ধি করিয়াছে। কিন্তু এখানেও একটা সীমা আছে, এখানেও অভিব্যক্তিব সেই অসম্পূর্ণতা আছে যাহার জন্য নিম্নস্তবেব আধারে ভগবানেব সহিত একাত্মতা উপলব্ধি হয় না। কারণ প্রত্যেক সসীম সত্তাতেই তাহার বাহিবেব কর্মে যেমন অসম্পূর্ণতা আছে তেমনই তাহাব বাহিরের চৈতন্যেও অসম্পূর্ণতা আছে এবং ইহা হইতেই জীবেব স্বরূপ নিরূপিত হয ও এইরূপেই জীবের সহিত বিভিন্নতা

হয। অবশ্য ভগবান পশ্চাৎ হইতে কর্ম কবেন এবং এই বাহ্যিক ও অসম্পূর্ণ চেতনা ও সঙ্কল্পেব ভিতব দিয়া নিজের অভিব্যক্তি নিযন্ত্রিত করেন, কিন্তু তিনি নিজে গূহায়াম্ (বেদ), গুহাব ভিতব লুক্কাযিত; অথবা গীতায় যেমন বলা হইযাছে—

ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥১৮।৬১

"ঈশ্বব সর্বভূতেব হৃদযে অবস্থিত থাকিয়া মায়া দ্বারা সর্বভূতকে যন্ত্রারূঢেব ন্যায পবিভ্রমণ কবাইতেছেন।" ভগবান এই যে জীবের হৃদয়ে গুপ্ত থাকিয়া অলক্ষ্যে তাহাব অহংমূলক প্রাকৃত চৈতন্যেব ভিতর দিয়া কর্ম করেন, জীবেব সহিত ভগবানেব সর্বত্রই এইরূপ ব্যবহার। তবে কেন আমরা ধরিতে যাইব যে, কোন বিশেষ আধারে তিনি অন্তবাল হইতে সম্মুখে আসেন, বাহ্য চৈতন্যের মধ্যে আসেন এবং অধিকতব সাক্ষাৎভাবে ও সজ্ঞানে দিব্যকর্ম সম্পাদিত হয়? ভগবান ও মানুষের মধ্যে অন্তরাল রহিয়াছে—এবং নিজেব প্রকৃতিতে সীমাবদ্ধ মানুষ যাহা নিজে কখনই সরাইতে পাবিত না, তাহা লুপ্ত করাই যে ইহার প্রকৃত উদ্দেশ্য তাহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে।

গীতা বলে, জীব সাধারণত যে অপূর্ণভাবে কর্ম কবে, তাহাব কারণ জীব প্রকৃতিব প্রক্রিয়ার বশ এবং মায়া তাহাব আত্মজ্ঞানকে আবৃত কবিয়া বাখে। প্রকৃতি ও মায়া, ভাগবত চৈতন্যেব একই কার্যকবী শক্তিব দুইটি অনুপূবক ভাব ভিন্ন আব কিছুই নহে। মূলত মায়া ভ্রম (illusion) নহে (ত্রিগুণময়ী অপরা প্রকৃতিব অজ্ঞান হইতেই মায়ার ভ্রম উৎপন্ন হয), ভাগবত চৈতন্য যে শক্তিতে বিভিন্নভাবে নিজেকে নিজেব সম্মুখে ধরিতেছে, আত্মপ্রকাশ করিতেছে—ইহাই মায়া, এই সকল বিভিন্ন আত্মপ্রকাশকে প্রত্যেকের স্বভাব ও স্বধর্ম অনুসারে প্রকট কবা যাহাব কাজ, ভাগবত চৈতন্যেব সেই কার্যকরী শক্তিই প্রকৃতি।

প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ।
ভূতগ্রামমিমং কৃৎস্নমবশং প্রকৃতের্বশাৎ॥৯।৮

"আমি আমাব নিজেব প্রকৃতিব উপর চাপিয়া প্রকৃতিব শাসনে অবশ এই সকল ভূতগণকে বারংবাব সৃষ্টি করি।" মানবশবীরে অবস্থিত ভগবানকে যাহারা জানে না তাহাদেব এই অজ্ঞানের কাবণ এই যে তাহারা প্রকৃতিব এই যন্ত্রবৎ ক্রিযাব সম্পূর্ণ অধীন, অবশভাবে ইহার মানসিক অজ্ঞান ও অপূর্ণতাসকলে সায় দেয এবং আসুবিক প্রকৃতিব মধ্যে বাস করে; এই আসুরিক প্রকৃতি বাসনা ও অহংভাবেব দ্বাবা তাহাদেব বুদ্ধিকে বিভ্রান্ত করিযা তুলে, মোহিনীং প্রকৃতিং আশ্রিতাঃ। কাবণ হৃদিস্থিত পুরুষোত্তমকে সকলেই সহজে দেখিতে পায় না; তিনি নিজেকে গভীব অন্ধকার মেঘেব অন্তবালে অথবা উজ্জ্বল আলোক মেঘের

অন্তরালে লুকাইয়া রাখেন, যোগমায়ার দ্বারা নিজেকে সম্পূর্ণভাবে আবৃত করিয়া রাখেন।[১]

গীতায় বলা হইয়াছে—

ত্রিভির্গুণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্ব্বমিদং জগৎ।
মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্॥৭।১৩
দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥৭।১৪
ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ।
মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ॥৭।১৫

"এই ত্রিবিধ গুণময় ভাব দ্বারা মোহিত হওয়ায় এই সমস্ত জগৎ আমাকে জানিতে পারে না। কারণ, আমার এই গুণাত্মিকা মায়া অতিক্রম করা বড়ই দুঃসাধ্য; যাঁহারা আমার স্মরণাপন্ন হন, তাঁহারা এই মায়া অতিক্রম করেন। কিন্তু কুকর্মান্বিত মোহগ্রস্ত নরাধমগণ আমার ভজনা করে না, আসুরিক ভাবের মধ্যে বাস করে, তাহাদের জ্ঞান মায়া কর্তৃক অপহৃত হয়।" অর্থাৎ ভাগবতের জ্ঞান সকলের মধ্যেই ওতঃপ্রোতভাবে রহিয়াছে, কারণ সকলের মধ্যেই ভগবান বাস করিতেছেন; কিন্তু তিনি সেখানে নিজ মায়ার দ্বারা আবৃত হইয়া রহিয়াছেন এবং মায়ার ক্রিয়ার দ্বারা, প্রকৃতির যন্ত্রবৎ ক্রিয়ার দ্বারা এই মূল আত্মজ্ঞান অপহৃত হয়, অহংয়ের ভ্রমে পরিণত হয়। তথাপি মানুষ প্রকৃতির যন্ত্রবৎ ক্রিয়া হইতে নিজেকে প্রত্যাহার করিয়া প্রকৃতির অন্তর্নিহিত গুপ্ত অধীশ্বরের দিকে ফিরিলে অন্তর্যামী ভগবানকে জানিতে পারে।

এখানে ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, গীতা সাধারণ জীবের জন্ম যে ভাষায় বর্ণনা করিয়াছে তাহারই *বিশেষ প্রয়োজনীয় স্বল্প একটু পরিবর্তন করিয়া* ভগবানের অবতারের কথাও বর্ণনা করিয়াছে। ভগবান কেমন করিয়া সাধারণ জীবের জন্ম দেন সে সম্বন্ধে পরে বলা হইবে—

প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ।
ভূতগ্রামমিমং কৃৎস্নমবশং প্রকৃতের্বশাৎ॥৯।৮

এখানে বলা হইয়াছে—

প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া।

"স্বীয় প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান করিয়া স্বীয় মায়ার দ্বারা আমি আবির্ভূত হইয়া থাকি।" আত্মানম্ সৃজামি (I loose forth myself) আমি আপনাকে সৃষ্টি

[১] নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ।

করি। পূর্ব শ্লোকে ব্যবহৃত "অবষ্টভ্য" কথার দ্বারা বোঝায়, উপর হইতে নীচের দিকে এমন সজোরে চাপ দেওয়া যাহাতে অধিকৃত বস্তুটি নির্জিত, নিপীড়িত, তাহার সমস্ত গতিক্রিয়ায় সম্পূর্ণভাবে সীমাবদ্ধ হয়, সম্পূর্ণভাবে উপরের বস্তুর বশ হইয়া পড়ে, অবশম্ বশাৎ, প্রকৃতি এই প্রক্রিয়ায় কলের (mechanism) মত কাজ করে এবং তাহার জীবসকলের নিজেদের কোন প্রভুত্ব থাকে না; তাহারা এই কলে অবশভাবে বদ্ধ থাকে। অন্যদিকে, "অধিষ্ঠায়" শব্দের অর্থ সম্পূর্ণ বিভিন্ন, ইহার অর্থ প্রকৃতিতে বাস করা, অথচ, প্রকৃতির উপর দাঁড়াইয়া থাকিয়া সজ্ঞানে অধিষ্ঠাতা দেবতারূপে প্রকৃতির কার্য পরিচালনা করা—ইহাতে পুরুষ অজ্ঞানের বশে অবশভাবে প্রকৃতি কর্তৃক চালিত হয় না, বরং প্রকৃতিই পুরুষের জ্ঞান ও ইচ্ছায় পূর্ণ হয়। অতএব, সাধারণ জন্মে যাহা সৃষ্ট হয় তাহা ভূতগ্রামম্; ভূত সকল, দিব্যজন্মে যাহা আবির্ভূত হয় তাহা স্বয়ম্ভূ, আত্মচেতন, স্বপ্রতিষ্ঠ সত্তা, আত্মানম্, কারণ, বেদান্ত আত্মা ও ভূতানি এই দুইয়ের যে প্রভেদ করিয়াছে, পাশ্চাত্য দর্শনও সেই প্রভেদ করিয়াছে, Being এবং তাহার becomings। উভয়ক্ষেত্রে মায়াই সৃষ্টি বা অভিব্যক্তির উপায়স্বরূপ(means), কিন্তু, দিব্যজন্মে ইহা হইতেছে আত্মমায়া, স্বীয় মায়ার দ্বারা; নিম্নতম অবিদ্যা মায়ার মধ্যে বদ্ধ হইয়া পড়া নহে, পরন্তু ইহা হইতেছে স্বপ্রতিষ্ঠ ভগবানের সজ্ঞানে জাগতিক ব্যাপারের মধ্যে আত্মপ্রকাশ, এই মায়ার ক্রিয়া ও উদ্দেশ্য সম্পূর্ণভাবে তাঁহার বিদিত। গীতা অন্যত্র ইহাকেই যোগমায়া বলিয়াছে। সাধারণ জন্মে ভগবান এই যোগমায়া দ্বারা নিজেকে নিম্নতম চৈতন্য (lower consciousness) হইতে লুকাইয়া রাখেন এবং এইরূপে ইহা আমাদের পক্ষে অজ্ঞানের যন্ত্রস্বরূপ হয়, অবিদ্যামায়া, কিন্তু এই একই যোগমায়া আবার আমাদিগকে আত্মজ্ঞান লাভ করায়, আমরা ভাগবতজ্ঞানে ফিরিয়া আসি, ইহা জ্ঞানের যন্ত্রস্বরূপ হয়, বিদ্যামায়া; দিব্যজন্মে ইহা এইরূপেই কার্য করে—সাধারণত যেসব কার্য অজ্ঞানের বশে করা হয় ইহা সেই সকল কার্যকে জ্ঞানের দ্বারা আলোকিত ও পরিচালিত করে।

গীতার ভাষা হইতে বুঝা যায় যে, দিব্যজন্ম হইতেছে ভগবানের সজ্ঞানে মানবরূপে জন্মগ্রহণ করা এবং ইহা মূলত সাধারণ জন্মের বিপরীত (যদিও একই উপায়ের দ্বারা দুইটিই সংঘটিত হইয়া থাকে), কারণ ইহা অজ্ঞানের মধ্যে জন্মগ্রহণ নহে, পরন্তু জ্ঞানেরই জন্মগ্রহণ; ইহা শারীরিক ব্যাপার নহে পরন্তু অধ্যাত্ম জন্ম (a soul birth)। আত্মা স্ব-প্রতিষ্ঠ পুরুষরূপে নিজের বিবর্তন সজ্ঞানে নিয়মিত করিয়া, অজ্ঞান মেঘে আত্মজ্ঞান না হারাইয়া জন্মগ্রহণ করেন। এখানে আত্মা প্রকৃতির অধীশ্বররূপেই শরীরে জন্মগ্রহণ করেন, প্রকৃতির উপর দাঁড়াইয়া তাহার ভিতর স্বাধীনভাবে নিজের ইচ্ছার দ্বারা কর্ম করেন, প্রকৃতির দ্বারা বদ্ধ হইয়া অবশভাবে চক্রে ঘূর্ণায়মান হন না; কারণ এখানে তিনি জ্ঞানের সহিত কর্ম করেন, অধিকাংশের ন্যায় অজ্ঞানের বশে কর্ম করেন না। সকলের মধ্যে যে অধ্যাত্ম পুরুষ গুপ্তভাবে রহিয়াছেন এবং গোপন স্থান হইতে সমস্ত পরিচালনা করিতেছেন,

দিব্যজন্মে তিনি সম্মুখে আসিয়া মানবরূপকে ভগবদ্ভাবেই সম্পূর্ণরূপে অধিকার করেন। সাধারণ জন্মে ইনি অন্তরালেই ঈশ্বররূপে থাকেন, অন্তরালের সম্মুখে যে বাহ্য চৈতন্য তাহা পরাধীন, স্বাধীন নহে, কারণ সেখানে উহা আংশিক চেতন সত্তা, আত্মবিস্মৃত জীব, প্রকৃতির বাহ্য অধীনতায় আপন কর্মে বদ্ধ। অতএব, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক মানবত্বের ভিতর ভাগবত ভাবের সাক্ষাৎ প্রকাশই অবতার[১]; মানবত্বের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বিভূতি অর্জুনকে গুরু এই ভাগবত জীবনের মধ্যে উঠিবার জন্যই আহ্বান করিলেন; তাঁহার সাধারণ মানবোচিত ক্ষুদ্রত্ব ও অজ্ঞান অতিক্রম করিতে না পারিলে এ অবস্থায় উঠা সম্ভব নহে। আমাদিগকে নীচে হইতে যাহার বিকাশ করিতে হইবে উপর হইতে তাহার অভিব্যক্তিই অবতার, মানবের যে দিব্যজন্মে আমাদের মত মরজগতের জীবগণকে উঠিতে হইবে, তাহার মধ্যে ভগবানের অবতরণই অবতার; সর্বাঙ্গসুন্দর মানবত্বের ভিতর প্রকটিত এই মনোহর দিব্য আদর্শ ভগবান মানুষের সম্মুখে ধরিয়াছেন।

[১] অবতার শব্দের অর্থ নামিয়া আসা, যে রেখা ভাগবতকে মানবীয় স্তর হইতে পৃথক করিতেছে সেই রেখার নীচে ভগবানের নামিয়া আসাই অবতার।

ষোড়শ অধ্যায়

অবতরণের প্রণালী

মানুষের জন্ম গূঢ় রহস্যময়। আমরা দেখিলাম গীতার মতে ভগবানের মানবরূপে অবতরণ এই রহস্যেরই আর একটা দিক,—অবতারে ভগবান মানবরূপ গ্রহণ করেন, মনুষ্যজন্মও মূলত ভগবানের মানুষরূপ গ্রহণ ভিন্ন আর কিছুই নহে। প্রত্যেক মানুষেরই সনাতন সর্বগত আত্মা ভগবান; এমনকি মানুষের ব্যক্তিগত আত্মাও ভগবানের অংশ, মমৈবাংশ—অবশ্য এই অংশ ভগবানের খণ্ড বা ভগ্নাংশ নহে, কারণ আমরা ভগবানকে খণ্ড খণ্ড ভাবে বিভক্ত বলিয়া ভাবিতে পারি না; ইহা সেই এক চৈতন্যের আংশিক চৈতন্য, সেই এক শক্তির আংশিক শক্তি, এক বিরাট আনন্দের বিশ্বলীলায় আংশিক আনন্দ, অতএব বিশ্বলীলার মধ্যে সেই অনন্ত অসীম সত্তারই সসীম ও সান্ত সত্তা। এই সসীমতার চিহ্ন হইতেছে অজ্ঞান, এই অজ্ঞানের বশে মানুষ ভুলিয়া যায় যে, সে ভগবান হইতে আসিয়াছে, এমনকি তাহারই হৃদয়ের মধ্যে গুপ্তভাবে যে ভগবান রহিয়াছেন, তাহারই মানবচৈতন্যের মন্দিরে আচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় জ্বলিতেছেন তাঁহাকেও সে ভুলিয়া যায়।

মানুষ অজ্ঞান, কারণ যে প্রকৃতি বা মায়ার দ্বারা ভগবানের অনন্ত সত্তা হইতে সে সৃষ্ট হইয়াছে সেই মায়ার ছাপ তাহার অন্তরাত্মার দৃষ্টিতে এবং তাহার ইন্দ্রিয়সকলের উপরে রহিয়াছে; মায়া তাহাকে ভাগবত সত্তার মূল্যবান ধাতু হইতে মুদ্রার ন্যায় খোদিত করিয়াছে, কিন্তু প্রাকৃত গুণসমূহের খাদের দ্বারা তাহার উপর এক কঠিন আবরণ লাগাইয়া দিয়াছে, নিজের ছাপ, পাশবিক মনুষ্যত্বের চিহ্ন বসাইয়া দিয়াছে; যদিও সেখানে ভগবানের গুপ্ত চিহ্ন রহিয়াছে, তথাপি তাহা প্রথমে বুঝা যায় না—অনেক কষ্ট করিয়া বুঝিতে হয়, আমাদের নিজেদের জীবনের গূঢ় রহস্যে সেই দীক্ষা লাভ না করিলে উহা বস্তুত দেখিতে পাওয়া যায় না যাহা দ্বারা ভগবদ্‌মুখী মানবের সহিত মর্ত্যমুখী মানবের পার্থক্য হয়। অবতারে, ভাগবতভাবে জাত মানবে, প্রকৃত ধাতুটি আবরণের ভিতর দিয়া দীপ্তিমান হয়। সেখানে প্রকৃতির ছাপ কেবল বাহ্য রূপে, কিন্তু দৃষ্টি অন্তরস্থিত ভগবানের, শক্তি অন্তরস্থিত ভগবানের এবং তাহা গৃহীত মানবীয় প্রকৃতির আবরণকে ভেদ করিয়া বাহির হয়। সেখানে ভগবানের চিহ্ন (শারীরিক বাহ্যিক চিহ্ন নহে, আধ্যাত্মিক চিহ্ন) স্পষ্ট—যে দেখিতে চায় বা দেখিতে পারে সেই দেখিতে পায়। আসুরিক প্রকৃতির লোকেরা এই সকল ব্যাপারে সর্বদা অন্ধ, তাহারা শরীরকে দেখে, আত্মাকে দেখে না, বাহিরের সত্তাকে দেখে, ভিতরের সত্তাকে দেখে না, তাহারা শুধু মুখোশটিকে দেখে, ভিতরের পুরুষটিকে দেখিতে পায় না। সাধারণ

মনুষ্যজন্মে বিশ্বগত ভগবানের প্রকৃতি ভাবটাই প্রবল, অবতারের মনুষ্যজন্মে ভাগবত ভাবই প্রবল। একটিতে ভগবানের আংশিক সত্তাকে মানবীয় প্রকৃতি অধিকার করে, পরিচালিত করে (অবশ্য ভগবান এইরূপ করিতে দেন বলিয়াই করে)। অপরটিতে ভগবানই নিজের অংশ সত্তা ও ইহার প্রকৃতিকে অধিকার করেন, ভাগবতভাবে পরিচালিত করেন। গীতার মতে সাধারণ মানুষ ক্রমবিবর্তনের ফলে ঊর্ধ্বে উঠিয়া যে ভাগবতভাব লাভ করে তাহা অবতার নহে, ভগবান যখন মানবীয়তার মধ্যে সাক্ষাৎভাবে নামিয়া আসেন, মানবীয় আকার গ্রহণ করেন, তাহাই অবতার।

তবে, মানুষের এই ঊর্ধ্ব গতিকে, ক্রমবিবর্তনকে, সাহায্য করিবার নিমিত্তই ভগবান অবতাররূপে নামিয়া আসেন; এইটি গীতা খুব স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছে। মানুষের মধ্যে ভাগবত সত্তার প্রকাশ সম্ভব ইহা দেখাইবার জন্যই অবতার, যেন মানুষ দেখিতে পায় যে, উহা কিরূপ এবং নিজদিগকে ঐ সত্তায় পরিণত করিবার ভরসা করিতে পারে। অবতারের আরও উদ্দেশ্য হইতেছে, ভগবানের এইরূপ আবির্ভাবের প্রভাব পৃথিবীতে স্পন্দিত রাখিয়া যাওয়া এবং পার্থিব প্রকৃতির ঊর্ধ্বমুখী প্রয়াসকে পরিচালনা করিবে এমন অধ্যাত্মশক্তি রাখিয়া যাওয়া। দিব্য মানব কিরূপ তাহার একটা আধ্যাত্মিক ছাঁচ দেখান অবতারের উদ্দেশ্য, যেন দিব্যজীবনকামী মানব সেই ছাঁচে নিজেকে গড়িয়া তুলিতে পারে। অবতারের উদ্দেশ্য *একটি ধর্ম দেওয়া*, শুধু কোন এক মতবাদ নহে, কিন্তু অন্তর্জীবন ও বহির্জীবন যাপনের একটা প্রণালী দেওয়া, এমন এক সাধনা দেওয়া যাহার দ্বারা মানুষ দেবত্ব লাভের দিকে অগ্রসর হইতে পারে। আবার মানুষের এই ঊর্ধ্বগতি, এই দেবজন্ম লাভ একটা বিচ্ছিন্ন ব্যষ্টিগত ব্যাপার নহে, কিন্তু জগতে ভগবানের অন্যান্য কার্যের ন্যায় ইহা সমষ্টিগত ব্যাপার, সমগ্র মানবজাতির উন্নতি ও কল্যাণ ইহার লক্ষ্য, অতএব অবতারের উদ্দেশ্য মানবজাতির অগ্রগমনে সাহায্য করা, সকল মহাসন্ধিক্ষণে ইহাকে রক্ষা করা, যখন নিম্নমুখী শক্তিগুলি খুব প্রবল হইয়া উঠে তখন তাহাদের ধ্বংসসাধন করা, মানুষের প্রকৃতিতে ভগবানের দিকে উঠিবার যে প্রবৃত্তি রহিয়াছে সেই মহান ধর্মকে রক্ষা করা বা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা, জগতে যত দূরভবিষ্যতেই হউক স্বর্গরাজ্য (The Kingdom of God) স্থাপনের পথ পরিষ্কার করা, যাঁহারা আলোক ও সিদ্ধি চান (সাধূনাম্) তাঁহাদিগকে জয়যুক্ত করা, যাঁহারা অন্ধকার ও পাপের রাজ্যকেই অটুট রাখিতে যুদ্ধ করিতেছে তাহাদিগকে পরাজিত করা। অবতারের আগমনের এই সকল উদ্দেশ্য *লোকবিদিত*। অবতারের *কার্য দেখিয়াই সাধারণ লোকে* তাঁহাকে চিনিতে চায়, তাহার জন্যই তাঁহাকে পূজা করিয়া থাকে। কেবল যাঁহারা আধ্যাত্মিক তাঁহারাই দেখিতে পান, চির-অন্তর্যামী ভগবান যে তাঁহাদেরই মানবীয় দেহ ও মনে নিজেকে প্রকট করিতেছেন, মানবরূপে এই বাহ্য অবতার তাহারই নিদর্শন, যেন তাঁহারা সেই ভগবানের সহিত ঐক্য লাভ করিতে পারেন এবং ভাগবত ভাবের দ্বারা

অধিকৃত হইতে পারেন। বাহ্য মানবরূপে খ্রীস্ট, কৃষ্ণ ও বুদ্ধের আবির্ভাব এবং আমাদের নিজেদের মধ্যে ভগবানের চিরন্তন অবতারের আবির্ভাব-মূলে একই গূঢ় সত্য। পৃথিবীতে বাহ্য মানবজীবনে যাহা সংঘটিত হইয়াছে, সকল মনুষ্যের ভিতরের জীবনে তাহা পুনরায় সংঘটিত হইতে পারে।

অবতারের উদ্দেশ্য ইহাই, কিন্তু অবতরণের প্রণালী কি? কেবল সাধারণ বুদ্ধির উপর নির্ভর করিয়া অবতার সম্বন্ধে যে ক্ষুদ্র ধারণা করা হয়, প্রথমে আমরা তাহারই আলোচনা করিব। এই মতানুসারে, কোন মনুষ্যে দেবোচিত চরিত্র, বুদ্ধি ও কর্মশক্তির অসাধারণ প্রকাশ হইলে তাহাকেই অবতার বলা হয়। এইরূপ ধারণায় কতকটা সত্য আছে। যিনি অবতার তিনি বিভূতিও বটেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার অন্তরতম ভাগবত সত্তায় মানবরূপী ভগবান, আর তাঁহার বাহ্য মানবীয় সত্তায় তিনি সেই যুগের নেতা, বৃষ্ণিবংশের মহাপুরুষ। ইহা প্রকৃতির দিক হইতে, কিন্তু আত্মার দিক হইতে নহে। ভগবান তাঁহার প্রকৃতির অনন্ত গুণের (qualities) ভিতর দিয়া নিজেকে প্রকাশ করেন, এবং এই সকল গুণের শক্তি ও কার্য দেখিয়া ভগবানের প্রকাশের তারতম্য বুঝা যায়। অতএব নৈর্ব্যক্তিকভাবে ভগবানের বিভূতি হইতেছে তাঁহার গুণের প্রকট শক্তি; উহা জ্ঞান, তেজ, প্রেম, বল ইত্যাদি যেকোন রূপে ভগবানের বহিঃপ্রকাশ, আর ব্যক্তিকভাবে, যে প্রাণ-মনোময় আধারের ভিতর দিয়া ভগবানের এই শক্তি প্রকাশিত হয় এবং মহৎ কার্য সম্পাদন করে তাহাই বিভূতি। ভিতরে এইরূপ অসাধারণ ভাগবত গুণের শক্তি এবং বাহিরে তাহার মহান কার্য—ইহাই বিভূতির চিহ্ন। ভাগবত সিদ্ধিলাভের দিকে মানবজাতির প্রচেষ্টায় যিনি নেতাস্বরূপ তিনিই মানব-বিভূতি, পাশ্চাত্য পণ্ডিত কার্লাইলের ভাষায় তিনি বীর (hero), তিনি মানুষের মধ্যে ভগবানের একটা শক্তি। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,

> বৃষ্ণীনাং বাসুদেবোঽস্মি পাণ্ডবানাং ধনঞ্জয়ঃ।
> মুনীনামপ্যহং ব্যাসঃ কবীনামুশনা কবিঃ॥১০।৩৭

"আমি বৃষ্ণিবংশীয়দিগের মধ্যে বাসুদেব, পাণ্ডবগণের মধ্যে ধনঞ্জয় (অর্জুন), আমি মুনিগণের মধ্যে ব্যাস এবং ঋষি-কবিগণের মধ্যে উশনা কবি"—প্রত্যেক শ্রেণীতে প্রথম, প্রত্যেক দলের সর্বশ্রেষ্ঠ, প্রত্যেক শ্রেণীর বিশিষ্ট গুণ ও কর্মের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি। এইরূপে শক্তির উৎকর্ষ সাধন ভাগবত প্রকাশের প্রগতির জন্য একান্ত প্রয়োজনীয়। যেকোন মহাপুরুষ সাধারণ মানবের উপরে উঠেন, তিনি তাহার দ্বারাই মানবসাধারণকে উন্নত করেন; আমাদের ভিতরে যে ভাগবতের সম্ভাবনা রহিয়াছে, আমাদের যে ভাগবতভাব লাভের আশা রহিয়াছে সে বিষয়ে তিনি জীবন্ত দৃষ্টান্ত, তিনি ভাগবত জ্যোতিরই একটি কিরণ, ভাগবত শক্তিরই একটি উচ্ছ্বাস।

এইজন্যই মহামনীষী ও বীরপুরুষগণকে দেবতা বলিয়া ভাবিবার একটি

স্বাভাবিক ঝোঁক মানুষের মধ্যে আছে, ভাবতবাসীব মনে এরূপ ধাবণা সংস্কাবগত; তাহাবা মহৎ সাধু, গুরু ও ধর্মপ্রচাবককে সহজেই ভগবানেব অংশ-অবতার বলিয়া মনে করে; দক্ষিণদেশীয বৈষ্ণবগণের মধ্যে এই ভাবটি আবও পরিস্ফুট, তাঁহারা বিশ্বাস কবেন যে, তাঁহাদের কোন কোন সাধু মহাপুরুষ বিষ্ণুব প্রতীকাত্মক জীবন্ত অস্ত্রশস্ত্রের অবতাব—ইহাব গভীর মর্মার্থ বহিযাছে, কাবণ সকল মহাপুরুষই মানবজাতিকে ঊর্ধ্বদিকে লইযা যাইবাব সংগ্রামে জীবন্ত যন্ত্র ও শক্তি। যে সকল আধ্যাত্মিক মতানুসাবে ভাগবত সত্তা ও প্রকৃতি এবং মানবীয সত্তা ও প্রকৃতি এই দুইযেব মধ্যে কোন অলঙ্ঘ্য ব্যবধান নাই, সেই সকল মতে উল্লিখিত ভাব স্বাভাবিক এবং অপবিহার্য। ইহা মানবতাব মধ্যে ভাগবতেব উপলব্ধি। তথাপি কিন্তু বিভূতি ও অবতাব এক নহে; নতুবা অর্জুন, ব্যাস, উশনা সকলেই শ্রীকৃষ্ণেব মত অবতাব হইতেন, কেবল তাঁহাদের অবতাবেব ক্ষমতাই কিছু কম হইত। কেবল ভাগবত গুণ থাকিলেই হয না; ভগবান স্বযং বর্তমান থাকিয়া মানবীয় প্রকৃতিকে পরিচালনা কবিতেছেন, ভিতরে এই জ্ঞান থাকা চাই। গুণসকলের উৎকর্ষ সাধন ভূতগ্রামেবই অংশ, সাধাবণ অভিব্যক্তিতেই এইরূপ ঊর্ধ্বগতি হইয়া থাকে। কিন্তু অবতারে বিশেষ অভিব্যক্তি হয, উপব হইতে দিব্যজন্ম হয, সনাতন সর্বগত ভগবান কোন বিশেষ মানবীয রূপেব মধ্যে নামিযা আসেন, আত্মানম্ সৃজামি, এবং তখন কেবল যবনিকাব অন্তবালেই যে ভাগবত চৈতন্য থাকে তাহা নহে, বহিঃপ্রকৃতিও সেই চৈতন্যে পূর্ণ থাকে।

অবতার সম্বন্ধে মাঝামাঝি একটা মতবাদ আছে, ইহা অধিকতর আধ্যাত্মিক, এই মতানুসারে কোন মানবীয় আত্মা নিজের মধ্যে ভগবানকে অবতীর্ণ কবান এবং হয় ভগবৎ চৈতন্য কর্তৃক অধিকৃত হন অথবা ভাগবত চৈতন্যেব সুযোগ্য আধাব বা প্রতিচ্ছাযা হন। কতকগুলি আধ্যাত্মিক অনুভূতিলব্ধ সত্যেব উপব এই মত প্রতিষ্ঠিত। মানবচৈতন্য বিকশিত ও রূপান্তবিত হইতে হইতে যখন ভাগবত চৈতন্যে পরিণত হয়, তখনই হয় মানুষেব দিব্যজন্ম, ইহাই মানুষেব ঊর্ধ্বপতি—ইহার চবমাবস্থায় ভাগবত চৈতন্যেব মধ্যে স্বতন্ত্র সত্তাব লয় হয। জীব নিজেব ব্যষ্টিগত সত্তাকে এক অনন্ত বিশ্বব্যাপী সত্তায ডুবাইয়া দেয়, অথবা এক বিশ্বাতীত সত্তার উচ্চতার মধ্যে নিজেকে হাবাইযা ফেলে, পবমাত্মাব সহিত, ব্রহ্মের সহিত, ভগবানেব সহিত সে এক হয়, অথবা যেমন কেহ কেহ আরও চূড়ান্ত করিয়া বলেন যে, জীব অদ্বিতীয ব্রহ্মই হইযা যায, ভগবান হইযা যায। গীতা বলিয়াছে বটে যে, জীব ব্রহ্ম হয়, ব্রহ্মভূতঃ, এবং এইরূপে পবমেশ্বরেব মধ্যে, শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে বাস করে। কিন্তু লক্ষ্য করিতে হইবে যে, গীতা কোথাও বলে নাই, জীব ভগবান বা পুরুষোত্তম হয, যদিও গীতা বলিযাছে যে, জীব স্বযং নিত্যই ঈশ্বব, ভগবানের অংশ-সত্তা, মমৈবাংশ। কারণ, এই শ্রেষ্ঠ মিলন, এই পরম পরিণতি ঊর্ধ্বগতিবই একটি অংশ মাত্র, সত্য বটে যে, প্রত্যেক জীব দিব্য-জন্ম লাভ করিতে পারে, কিন্তু ইহা ভগবানের অবতরণ নহে, অবতাব নহে—ইহা

বড জোব বৌদ্ধমতানুযাযী বুদ্ধত্ব লাভ, জীবেব পক্ষে বর্তমান জাগতিক ব্যক্তিত্ব হইতে উঠিযা এক অনন্ত পবাচৈতন্যে জাগ্রত হওয়া। ইহাতে অবতারের ন্যায় আভ্যন্তবীণ চৈতন্য অথবা অবতারোচিত কর্ম যে থাকিবেই এমন কোন কথা নাই।

তবে এইরূপ ভাগবত চৈতন্যেব মধ্যে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিক্রিয়ারূপে ভগবানও আমাদের সত্তাব মানবীয অংশে প্রবিষ্ট বা আবির্ভূত হইতে পারেন, নিজেকে মানুষের প্রকৃতি, কর্ম, মন, এমনকি দেহের মধ্যেও ঢালিয়া দিতে পাবেন; এবং ইহাকে অন্তত আংশিক অবতাব বেশই বলা যাইতে পারে। গীতা বলিয়াছে যে, ঈশ্বব হৃদ্দেশে[১] বাস করেন, কিন্তু তথায় তিনি থাকেন যবনিকাব অন্তরালে, যোগমাযাসমাবৃত। কিন্তু ইহার উপবে আরও এক স্থান আছে, তাহা আমাদের মধ্যেই অবস্থিত কিন্তু তাহা আমাদের সাধারণ চেতনার অতীত—প্রাচীনেরা ইহাকে স্বর্গ বলিতেন, সেখানে ঈশ্বর ও জীব উভয় মূলত একই সত্তারূপে প্রকাশিত, কোথাও কোথাও রূপকচ্ছলে তাহাদিগকে পিতা ও পুত্র বলা হইয়াছে, ভগবান এবং তাঁহা হইতে আবির্ভূত দিব্য মানব—ঊর্ধ্বের ভাগবত প্রকৃতি (The Virgin Mother),[২] পবা প্রকৃতি, পরা মায়া হইতে নিম্নতন বা মানবীয প্রকৃতিতে জাত। ইহাই খ্রীস্টান অবতাববাদের ভিতবেব তত্ত্ব বলিয়া মনে হয়; খ্রীস্টানদেব ত্রিসত্তাবাদে (Trinity) পিতা এই আভ্যন্তরীণ স্বর্গগামী; পুত্র অথবা পবাপ্রকৃতি গীতাব মতানুযাযী জীব হইয়া ভূতলে নবদেহে দিব্য মানবরূপে অবতীর্ণ, The Holy Spirit হইতেছে শুদ্ধ আত্মা, ব্রহ্মচৈতন্য, এই আত্মা বা চৈতন্যেব দ্বাবা পিতা ও পুত্র, ঈশ্বব ও জীব এক হন, এবং এই চৈতন্যের ভিতর দিযা উভয়েব মধ্যে যোগ হয; কাবণ আমবা শুনি যে, শুদ্ধ আত্মা যীশুর মধ্যে নামিযা আসিলেন, এবং এইরূপ অবতবণেব ফলেই যীশুব শিষ্যগণের সাধারণ মানবত্বেব মধ্যেও ঊর্ধ্বেব চৈতন্যেব ক্ষমতাসকল নামিয়া আসিল।

কিন্তু পুরুষোত্তমেব যে ঊর্ধ্বতব দিব্যচৈতন্য সেইটিও মানবেব মধ্যে নামিয়া আসিতে পাবে এবং জীবেব চৈতন্য তাহাতে লয় হইতে পারে। শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক ব্যক্তিবা বলিযাছেন যে, মাঝে মাঝে তাঁহার এইরূপ রূপান্তব হইত। তাঁহাব সাধাবণ জীবনে তিনি কেবল ঈশ্বরের প্রেমিক ও ভক্ত ছিলেন এবং তাঁহাকে দেবতা বলিয়া মান্য কবিতে দিতেন না; কিন্তু মাঝে মাঝে তাঁহাব দিব্য ভাবান্তব হইত, তিনি স্বয়ং ভগবান হইতেন এবং ভগবানের মত কথা কহিতেন, কর্ম কবিতেন, তখন তাঁহাব মধ্যে ভাগবত জ্যোতি, ভাগবত প্রেম, ভাগবত শক্তি উছলিযা পডিত। এইরূপ অবস্থা যদি কাহাবও সাধাবণ অবস্থা হয, মানবীয় আধাবটি যদি কেবল সর্বদা ভগবানেব আবির্ভাব ও ভাগবত চৈতন্যের আধার মাত্র হয, তাহা হইলে এই মাঝামাঝি মতানুসারে এই অবস্থাকেই অবতার বলা

[১] এই হৃদ্দেশ বলিতে অবশ্য সূক্ষ্মদেহেব হৃদয়ই বুঝায, তাহা সমস্ত চিত্তাবেগ, ইন্দ্রিযানুভূতি ও মানসিক চৈতন্যেব গ্রন্থিস্থান (nodus), সেইখানে জীবপুরুষও অবস্থিত।

[২] বৌদ্ধ আখ্যাযিকায় বুদ্ধেব মাতাব যে নাম তাহাতে এই রূপকটি বেশ পবিস্ফুট হইযাছে।

যাইতে পারে; এরূপ অবতার সম্ভব বলিয়া সহজেই মানুষের ধারণা হইতে পারে, কারণ মানুষ যদি তাহার প্রকৃতিকে এমনভাবে উন্নত করিতে পারে যে, ভগবৎসত্তার সহিত নিজের সত্তার ঐক্য অনুভব করে, নিজেকে ভগবানের চৈতন্য, জ্যোতি, শক্তি, প্রেমের আধার বলিয়া অনুভব করে, নিজের ইচ্ছা ও ব্যক্তিত্বকে ভগবানের ইচ্ছা ও সত্তার মধ্যে হারাইয়া ফেলিতে পারে (এরূপ আধ্যাত্মিক অবস্থা সম্ভব বলিয়াই স্বীকৃত হইয়া থাকে)—তাহা হইলে ইহার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ সেই ভাগবত ইচ্ছা, সত্তা, শক্তি, প্রেম, জ্যোতি, চৈতন্য যে মানব-জীবের সমগ্র ব্যক্তিত্বকে অধিকার করিবে ইহা একান্ত অসম্ভব কিছু নহে। আর ইহা শুধু মানুষের দিব্যজন্মে ও দিব্যপ্রকৃতিতে উঠা হইবে না, ইহা মানুষের মধ্যে ভাগবত পুরুষের নামিয়া আসা হইবে, অবতার হইবে।

যাহা হউক, গীতা কিন্তু আরও অনেক দূরে গিয়াছে। গীতা স্পষ্ট বলিয়াছে যে, ভগবান স্বয়ং জন্মগ্রহণ করেন, শ্রীকৃষ্ণ নিজের বহু অতীত জন্মের কথা বলিয়াছেন এবং তাঁহার ভাষা হইতে বুঝা যায় যে, ভগবানকে ধারণ করিবার উপযুক্ত আধারসম্পন্ন মানবের কথাই তিনি বলেন নাই, কিন্তু ভগবানেরই বহু জন্মের কথা বলিয়াছেন, কারণ তিনি এখানে ঠিক সৃষ্টিকর্তার ভাষাই প্রয়োগ করিয়াছেন, পরে যখন জগৎ সৃষ্টির কথা বলিবেন তখন তিনি এই ভাষারই প্রয়োগ করিবেন।

অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া॥৪।৬

"আমি অজাত, অবিনশ্বর এবং সর্বভূতের ঈশ্বর হইয়াও স্বীয় প্রকৃতির কার্য অধ্যক্ষরূপে পরিচালনা করিয়া স্বীয় মায়ার দ্বারা নিজেকে সৃষ্টি করি।" এখানে ঈশ্বর ও মানব-জীবের কোন কথা নাই, স্বর্গীয় পিতা ও তাঁহার পুত্রের—দিব্য মানবের কোন কথা নাই, কিন্তু কেবল ঈশ্বর এবং তাঁহার প্রকৃতির কথা আছে। ভগবান তাঁহার প্রকৃতির দ্বারা মানবরূপে জন্মগ্রহণ করেন, মানব দেহ প্রাণ মনের মধ্যে নামিয়া আসেন, এবং এই মানবরূপের মধ্যে ভাগবত চৈতন্য ও ভাগবত শক্তি লইয়া আসেন, তবে তিনি মানবরূপ, মানব দেহ প্রাণ মনের ভিতর দিয়াই কার্য করিতে স্বীকৃত হন, তিনি অন্তরাত্মারূপে অধিষ্ঠিত থাকিয়া এই দেহের মধ্যে সমস্ত কার্য পরিচালনা করেন। অবশ্য সকল সময়েই তিনি উপর হইতে পরিচালনা করিয়া থাকেন, এইরূপে উপর হইতে সমগ্র প্রকৃতিকে এবং তাহার মধ্যে মানুষকেও পরিচালনা করিয়া থাকেন; ভিতর হইতেও তিনি সর্বদা গুপ্ত থাকিয়া সমগ্র প্রকৃতিকে ও মানুষকে পরিচালনা করিয়া থাকেন, এখানে (অর্থাৎ, অবতারে) প্রভেদ হইতেছে এই যে, তিনি গুপ্ত নহেন, প্রকৃতি এখানে সচেতন যে, তাহার প্রভু স্বয়ং অধিবাসীরূপে উপস্থিত, এবং এখানে ভগবান ঊর্ধ্ব হইতে তাঁহার গোপন ইচ্ছাশক্তির দ্বারা, "স্বর্গস্থ পিতার ইচ্ছার দ্বারা", প্রকৃতিকে

পরিচালনা করেন না, কিন্তু সাক্ষাৎ ও সুস্পষ্ট ইচ্ছার দ্বারা প্রকৃতিকে পরিচালনা করেন। আর এখানে মধ্যস্থরূপে একজন মানুষ থাকিবার কোন স্থান আছে বলিয়া মনে হয় না, কারণ এখানে জীবের প্রকৃতিবিশেষকে অবলম্বন করিয়া নহে পরন্তু নিজের প্রকৃতিকে, স্বাম্ প্রকৃতিম্, অবলম্বন করিয়াই সর্বভূতেশ পরমেশ্বর মানবজন্ম গ্রহণ করিয়া থাকেন।

মানুষের সাধারণ বুদ্ধির পক্ষে এরূপ মতে বিশ্বাস করা কঠিন ব্যাপার; এবং ইহার কারণও স্পষ্ট, কারণ অবতারের মানবীয়তা, অবতার যে মানুষ তাহা স্পষ্টভাবেই লোকের চক্ষুতে প্রতীয়মান হইয়া থাকে। অবতার সকল সময়েই ভাগবতভাব ও মানুষভাব, এই দুইভাব সমন্বিত; ভগবান যখন মানবরূপে অবতীর্ণ হন তখন তিনি মানবীয় প্রকৃতিকে তাহার সমস্ত বাহ্যিক অপূর্ণতা এবং অক্ষমতাসহ গ্রহণ করেন এবং ইহাদিগকেই ভাগবত চৈতন্য এবং ভাগবত শক্তির উপলক্ষ্য, যন্ত্র, সহায় করিয়া তোলেন, দিব্যজন্ম ও দিব্যকর্মের আধার করিয়া তোলেন। কিন্তু এইরূপ হওয়াই অবশ্যম্ভাবী, নতুবা অবতারের আগমনের যে উদ্দেশ্য তাহা সম্পন্ন হয় না; কারণ ঐ উদ্দেশ্য ঠিক ইহাই দেখান যে, মানব-জন্ম ইহার সকল অপূর্ণতা সত্ত্বেও দিব্যজন্ম ও দিব্যকর্মের সহায় ও যন্ত্র হইতে পারে, মানবচৈতন্য ভাগবতচৈতন্য প্রকাশের মূলত বিরোধী নহে, মানবচৈতন্যকে ভাগবতচৈতন্যের প্রকাশের আধার করা যাইতে পারে, মানবচৈতন্যের ছাঁচের রূপান্তর সাধন করিয়া এবং ইহার জ্ঞান, প্রেম, শক্তি ও বিশুদ্ধতার উন্নতি করিয়া ইহাকে ভাগবতচৈতন্যের অনুবর্তী করিয়া তোলা যাইতে পারে; কেমন করিয়া ইহা সম্পাদন করা যাইতে পারে তাহাও দেখান অবতারের উদ্দেশ্য। অবতার যদি কেবল অলৌকিকভাবেই কার্য করেন, তাহা হইলে অবতারের উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হয় না। কেবল অলৌকিক বা অতি-প্রাকৃত অবতার একটা অর্থহীন অসঙ্গত ব্যাপার। একেবারেই যে কোনরূপ অলৌকিক ক্রিয়া থাকিতে পারিবে না এমন কোন কথা নাই (যীশুখ্রীস্টের রোগ আরোগ্য করিবার এইরূপ অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল বলিয়া শুনা যায়), কারণ এইরূপ অসাধারণ ক্ষমতা মানুষের পক্ষে অসম্ভব কিছুই নহে। ইহা অবতারের অপরিহার্য ব্যাপার নহে। আবার, অবতারের জীবন কেবল অলৌকিক আতসবাজি প্রদর্শন হইলেও চলিবে না। অবতার একজন আশ্চর্যকর্মা বাজীকরের মত আসেন না, তিনি আসেন মানবজাতির দিব্য নেতা স্বরূপ, তিনি আসেন দিব্য মানবতার আদর্শ স্বরূপ। এমনকি তাঁহাকে মানবোচিত দুঃখ এবং শারীরিক যন্ত্রণাও গ্রহণ করিতে হইবে এবং দেখাইতে হইবে, প্রথমত, কেমন করিয়া এই দুঃখ-যন্ত্রণাকেই মুক্তির সহায় করা যাইতে পারে (যীশুখ্রীস্ট এইরূপ করিয়াছিলেন), দ্বিতীয়ত দেখাইতে হইবে যে, কেমন করিয়া ভাগবত সত্তা মানবীয় প্রকৃতিতে এই দুঃখ-যন্ত্রণা স্বীকার করিয়াও মানবীয় প্রকৃতিতেই তাহা জয় করিতে পারে, বুদ্ধ এইরূপ করিয়াছিলেন। যেসকল তার্কিক খ্রীস্টকে বলিতে পারে—"যদি তুমি ঈশ্বরের পুত্র হও, তাহা হইলে ক্রুশ হইতে নামিয়া আইস,"

অথবা, যাহারা বিজ্ঞভাবে মাথা নাড়িয়া দেখাইয়া দেয় যে অবতারেরা কখনও ভগবান হইতে পারে না কারণ তাহারা মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে এবং সে মরণ আবার রোগের দ্বারা হইয়াছে, যেমন কুকুর বিড়াল মরে—তাহারা অবতারের মূল উদ্দেশ্য কিছুই বুঝে নাই। দিব্য আনন্দের অবতার হইবার পূর্বে দুঃখ ও যন্ত্রণারও অবতার হইতে হইবে। মানুষের অপূর্ণতা গ্রহণ করিয়াই দেখাইতে হইবে কেমন করিয়া তাহা অতিক্রম করা যায়; এই অতিক্রম কতখানি হইবে এবং কি উপায়ে হইবে, কেবল আন্তরিক হইবে না বাহ্যিকও হইবে তাহা মানবজাতির ক্রমোন্নতির অবস্থার উপরে নির্ভর করে; ইহা কোন অমানুষিক অদ্ভুত ঘটনার দ্বারা সম্পাদন করা চলিতে পারে না।

এখন প্রশ্ন উঠিতেছে, ভগবান কিরূপে মানবদেহ ও মন গ্রহণ করেন? এই প্রশ্নটিই বাস্তবিক কঠিন, মানুষের সীমাবদ্ধ বুদ্ধি ইহার কোন কিনারা করিতে পারে না। কারণ, এই দেহ ও মন সহসা পূর্ণভাবে সৃষ্ট হয় নাই, এগুলি কোনপ্রকার শারীরিক বা আধ্যাত্মিক বা উভয়বিধ বিবর্তনের দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছে। অবশ্য এটা সত্য যে, অবতারের আবির্ভাব (অন্যদিক হইতে দিব্যজন্মের ন্যায়ই) মূলত একটা আধ্যাত্মিক ব্যাপার—গীতার ভাষা হইতেই বুঝা যায়, ইহা আত্মার জন্ম, আত্মানম্ সৃজামি; তথাপি ইহার সঙ্গে এখানে শারীরিক জন্মও রহিয়াছে। তাহা হইলে অবতারের এই মানবীয় দেহ ও মন কেমন করিয়া সৃষ্ট হইল? যদি আমরা ধরিয়া লই যে, অচেতন প্রকৃতি এবং তাহাতে অনুস্যূত প্রাণশক্তির বংশানুক্রম বিবর্তনের ফলেই শরীর সকল সময়ে সৃষ্ট হয়, জীবাত্মা ইহাতে কিছু করে না, তাহা হইলে ব্যাপারটা খুব সহজ হইয়া পড়ে। ভগবানের অবতারের যোগ্য শারীরিক ও মানসিক দেহ কোন উচ্চ বা পবিত্র বংশে উদ্ভূত হয়, অবতরণকালে ভগবান সেই দেহ অধিকার করেন। কিন্তু গীতা যেখানে অবতারের কথা বলিয়াছে (৪র্থ অধ্যায়, ৫-৮ শ্লোক) সেখানে অকুণ্ঠিতভাবে অবতারেরও জন্মান্তরের কথা বলিয়াছে (৪-৫), আর সাধারণ জন্মান্তরবাদ অনুসারে জীব জন্মান্তর গ্রহণকালে তাহার অতীত আধ্যাত্মিক ও মানসিক বিবর্তনের দ্বারা নিজেই নিজের শরীর ও মন ঠিক করিয়া লয়, একরকম প্রস্তুত করিয়াই লয়। জীবই নিজের দেহ তৈয়ারী করিয়া লয়, জীবের সহিত কোন সম্পর্ক না রাখিয়া তাহার দেহ তৈয়ারী করিয়া দেওয়া হয় না। তাহা হইলে কি আমাদিগকে বুঝিতে হইবে যে, নিত্য ও নিরন্তর এক অবতার নিজেই ক্রমবিবর্তনের দ্বারা পুনঃপুনঃ নিজের উপযুক্ত মানসিক ও শারীরিক দেহের বিকাশ করিয়া লন, এই দেহ কোন্ যুগে কিরূপ হইবে তাহা সেই যুগের মানবজাতির প্রয়োজন ও ক্রমোন্নতির অবস্থা অনুসারে নির্ণয় করেন এবং এইরূপেই তিনি যুগে যুগে অবতীর্ণ হন? এইরূপ কোন একভাবেই কেহ কেহ বিষ্ণুর দশাবতারের ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন—প্রথমে নানা পশুমূর্তি, তাহার পর নরসিংহ মূর্তি, তাহার পর বামন মূর্তি, তাহার পর দুর্ধর্ষ আসুরিক মানব পরশুরাম, তাহার পর দেব-প্রকৃতি মানব মহত্তর রাম, তাহার পর প্রবুদ্ধ আধ্যাত্মিক মানব

বুদ্ধ, কাল হিসাবে বুদ্ধের পূর্বে কিন্তু স্থান হিসাবে সর্বোচ্চ হইতেছেন পূর্ণ দেবভাবাপন্ন মানব শ্রীকৃষ্ণ। কল্কি শ্রীকৃষ্ণের পরে হইলেও, তিনি শুধু শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক আরব্ধ কর্মই সম্পন্ন করেন,—পূর্ব পূর্ব অবতারেরা মহৎ প্রয়াসের সম্ভাবনাসকল প্রস্তুত করিয়া গিয়াছেন, কল্কি তাহাই শক্তিতে সিদ্ধ করেন। বর্তমান যুগের যেরূপ মনোভাব তাহাতে এই সকল বিশ্বাস করা বড়ই কঠিন, কিন্তু গীতার ভাষা এইরূপই বুঝায় বলিয়া মনে হয়। তবে গীতা যখন স্পষ্টভাবে এই সমস্যার সমাধান করে নাই, তখন আমরা আমাদের মনের মতন যেমন হয় সমাধান করিতে পারি, যথা, আমরা বলিতে পারি যে, জীবই (জীবাত্মাই) শরীর প্রস্তুত করে কিন্তু জন্ম হইতেই ভগবান ঐ শরীর গ্রহণ করেন, অথবা গীতায় যে চারি মনুর (চত্বারঃ মনবঃ) কথা বলা হইয়াছে (ইহারা প্রত্যেক মানব মন ও শরীরের আধ্যাত্মিক পিতা) তাহাদের একজনই অবতারের যোগ্য শরীর প্রস্তুত করিয়া দেন, কিন্তু এসকল অধ্যাত্ম-রহস্যের (mystic) কথা বর্তমান বুদ্ধিপন্থী লোক এখন শুনিতে চায় না; কিন্তু যখনই আমরা অবতারবাদ স্বীকার করিয়াছি তখনই আমরা অধ্যাত্মজগতের কথাই তুলিয়াছি এবং একবার যখন এই কথা তোলা হইয়াছে তখন দৃঢ়তার সহিত ইহার আলোচনা করা বাঞ্ছনীয়।

অবতার সম্বন্ধে গীতার মত কি তাহা বলা হইল। আমরা অবতারের সম্ভাবনা যেরূপ বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছি, অবতরণের প্রণালীও সেইরূপভাবে আলোচনা করিলাম, কারণ মানুষের তর্কবুদ্ধি এ সম্বন্ধে যেসকল আপত্তি তুলিতে পারে তাহার হিসাব লওয়া এবং তাহার জবাব দেওয়া প্রয়োজন। সত্য বটে যে, গীতাতে বাহ্যিক অবতারের (physical avatarhood) স্থান খুব বেশী নহে, তথাপি গীতাশিক্ষার ক্রমপরম্পরায় বাহ্যিক অবতারবাদের এক বিশিষ্ট স্থান আছে। গীতাশিক্ষার কাঠামোই এই যে অবতার বিভূতিকে, মানবতার উচ্চতম স্তরে উঠিয়াছে এমন একজন মানবকে, দিব্যজন্ম ও দিব্যকর্মের অভিমুখে লইয়া যাইতেছেন। আর ইহাও সত্য যে, মানবাত্মাকে নিজের মধ্যে তুলিয়া লইবার নিমিত্ত ভগবানের আভ্যন্তরীণ অবতরণই প্রধান ব্যাপার—অন্তরের খ্রীস্ট, কৃষ্ণ বা বুদ্ধ লইয়াই কথা। কিন্তু যেমন আভ্যন্তরীণ বিকাশের নিমিত্ত বাহ্যিক জীবনের সহায়তা সমধিক প্রয়োজনীয় তেমনই ভিতরে এই মহান আধ্যাত্মিক অভিব্যক্তির নিমিত্ত বাহ্যিক অবতারও কম প্রয়োজনীয় নহে। মানসিক ও শারীরিক প্রতীকের পূর্ণ বিকাশের দ্বারা আভ্যন্তরীণ সত্যবস্তুর বিকাশে সহায়তা হয়, পরে এই আভ্যন্তরীণ বস্তু আরও শক্তির সহিত, নিজের আরও উৎকৃষ্ট রূপে বাহ্যজীবনের ভিতর দিয়া আত্মপ্রকাশ করে। এইরূপে মানসিক ও শারীরিক রূপ আধ্যাত্মিক সত্তার উপর ক্রিয়া করে, আবার আধ্যাত্মিক সত্তা মানসিক ও শারীরিক রূপের উপর ক্রিয়া করে—এই দুইয়ের পরস্পরের উপর সতত ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার ভিতর দিয়া ভগবান কখনও নিজেকে গোপন করিয়া কখনও প্রকট হইয়া মানবতার মধ্যে ভাগবতের বিকাশ সিদ্ধ করিয়া তুলিতেছেন।

সপ্তদশ অধ্যায়

দিব্যজন্ম ও দিব্যকর্ম

অবতারেব জন্মেব ন্যায অবতাবেব কর্মেবও দুই অর্থ এবং দুই রূপ আছে। ক্রমান্বযে ক্রিযা-প্রতিক্রিয়ার, উত্থান-পতনেব ভিতব দিযা অগ্রসব হওযাই প্রকৃতির নিয়ম, এই নিয়ম সত্ত্বেও যে দিব্যধর্ম মানবজাতির ভগবদ্‌মুখী প্রযাসেব নিশ্চিত অবনতি প্রতিবোধ করিযা তৎপবিবর্তে নিশ্চিতভাবে তাহাকে অগ্রসব করাইয়া দেয়, ভাগবত শক্তি বাহ্যজগতেব উপব ক্রিযা কবিযা সেই ধর্মকে বক্ষা কবে, নূতন করিয়া গঠন করিয়া দেয,—ইহাই অবতাবেব কর্মেব বাহিবেব দিক। অবতারেব কর্মেব একটা ভিতবের দিক আছে, ভাগবতমুখী চৈতন্যেব দিব্যশক্তি ব্যক্তিব আত্মাব উপর ও জাতিব আত্মার উপব ক্রিযা কবে, যেন তাহা মানুষেব মধ্যে ভাগবতের নব নব প্রকাশ গ্রহণ কবিতে পাবে এবং নিজেব বিকাশেব শক্তিতে বিধৃত, পুনরুজ্জীবিত ও সমৃদ্ধ হইযা উঠে। সাধাবণ কর্মপ্রবণ মানুষ স্বভাবতই মনে কবে যে কেবল বাহ্যজগতে একটা মহৎ কর্ম সম্পাদনেব নিমিত্তই অবতারের আবির্ভাব হয়, কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে এরূপ ধাবণা ঠিক নহে। বাহ্যিক কর্ম এবং ঘটনাব নিজস্ব কোন মূল্য নাই, তাহাদেব পশ্চাতে যে শক্তি ও ভাব থাকে তাহা হইতেই তাহাদের মূল্য।

যে সন্ধিক্ষণে অবতাবের আবির্ভাব হয, তাহা বাহ্যঘটনাব এবং জড়জগতে মহাপরিবর্তনেব সন্ধিক্ষণ বলিযাই বাহ্যদৃষ্টিতে মনে হয বটে, কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে যখন মানবজাতির চৈতন্যেব কোন মহাপরিবর্তন সংসাধন কবিতে হয এবং কোন নূতন বিকাশ সম্পন্ন করিতে হয়, মূলত সেই সন্ধিক্ষণেই অবতাবেব আবির্ভাব হয। এই পবিবর্তনসাধনের নিমিত্ত একটা দিব্য শক্তিব প্রযোজন, কিন্তু সকল সময়েই এই শক্তি হয ইহাব অন্তর্নিহিত চৈতন্যেব অনুযাযী; এই জন্যই মানবীয মন ও আত্মাব মধ্যে ভাগবত-চৈতন্যেব আবির্ভাব আবশ্যক। তবে, যখন প্রধানত কেবল মানসিক ও ব্যবহাবিক জগতেব পবিবর্তন সংসাধন কবিতে হয তখন অবতাবেব হস্তক্ষেপের কোন প্রযোজন হয না, তখন চৈতন্যেব মহান অভ্যুত্থান হয, সমুচ্চ শক্তির প্রকাশ হয, মানুষ তৎকালেব নিমিত্ত তাহাদেব সাধারণ স্তব হইতে ঊর্ধ্বে উঠে, এবং চৈতন্য ও শক্তিব এই অভ্যুদয কযেকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিতে উচ্চসীমায উঠে; ইঁহাবাই বিভূতি, এবং ইঁহাদেব নেতৃত্বেব দ্বাবা পরিচালিত সাধারণ কর্মধাবাই অভিপ্রেত পবিবর্তনটি সাধনেব পক্ষে যথেষ্ট। ইউবোপে রিফর্মেশন (Reformation) এবং ফবাসী বিপ্লব (French Revolution) ছিল এইরূপই পবিবর্তন, এগুলি মহান আধ্যাত্মিক ঘটনা নহে, এগুলি কেবল বুদ্ধি ও কর্মজগতের পবিবর্তন—একটি ধর্ম সম্বন্ধীয, অপবটি

সামাজিক ও বাজনৈতিক ভাব, রূপ ও আদর্শের পবিবর্তন; ইহাদেব ফলে সাধারণ চৈতন্যে যে পবিবর্তন হইযাছিল তাহা মানসিক ও ব্যবহাবিক পরিবর্তন কিন্তু আধ্যাত্মিক পবিবর্তন নহে। কিন্তু যখন আধ্যাত্মিক পবিবর্তন সাধন কবিযা যুগান্তর আনযন কবা উদ্দেশ্য হয তখন ইহার উদ্ভাবক বা নেতারূপে মানবীয় মন ও আত্মাব মধ্যে ঐশ্বরিক চৈতন্যেব পূর্ণ বা আংশিক আবির্ভাব হয। ইহাই অবতার।

গীতায অবতাবেব বাহ্যিক কর্ম বলা হইয়াছে, ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায; যুগে যুগে যখন ধর্ম মলিন হয, অবসন্ন হয, হীনবল হয়, অধর্ম সবল ও অত্যাচারী হইয়া মাথা তুলিয়া উঠে তখন অবতাব আবির্ভূত হন এবং ধর্মকে পুনরায় প্রবল ও সুপ্রতিষ্ঠিত কবেন, এবং যেহেতু তখন কর্মের ভিতব দিয়া, মানুষের ভিতর দিয়াই ধর্মাধর্ম প্রকট হয, তজ্জন্য অবতাবেব লৌকিক ও বাহ্যিক উদ্দেশ্য হয অধর্মেব পীডনে অভিভূত সাধুগণকে পরিত্রাণ করা এবং অধর্মের অভ্যুত্থানের সহায়ক দুষ্কর্মকাবীদিগকে বিনাশ কবা।

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥৪।৭
পবিত্রাণায সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥৪।৮

কিন্তু এখানে গীতা যে ভাষাব ব্যবহার করিয়াছে সহজেই তাহার এমন সঙ্কীর্ণ ব্যাখ্যা কবা যাইতে পাবে যাহাতে অবতাবত্বের গভীব আধ্যাত্মিক অর্থ সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হইযা যাইবে। ধর্ম শব্দটিব একটি নৈতিক অর্থ আছে, একটি দার্শনিক অর্থ আছে এবং একটি আধ্যাত্মিক অর্থ আছে—এই সকল অর্থেব যেকোন একটি লইযা এবং অপবগুলি অগ্রাহ্য করিযা ধর্ম শব্দটি ব্যবহৃত হইতে পারে, ধর্ম কেবল নৈতিক (ethical) অর্থে অথবা কেবল দার্শনিক (philosophical) অর্থে অথবা কেবল আধ্যাত্মিক (religious) অর্থে ব্যবহৃত হইতে পাবে। ধর্ম শব্দের নৈতিক অর্থ হইতেছে সৎকর্মেব নীতি, ন্যায্য আচরণের বিধান, অথবা আরও বাহ্যিক ও ব্যবহাবিক অর্থে ধর্মেব নৈতিক অর্থ হইতেছে সামাজিক এবং বাজনৈতিক ন্যাযের বিধান; অথবা আরও সংক্ষেপে এই অর্থে ধর্ম হইতেছে কেবল সমাজেব অনুশাসন পালন। ধর্মের এই অর্থ গ্রহণ করিলে আমাদিগকে বুঝিতে হইবে যে, যখন অন্যায, অবিচাব, অত্যাচাবের প্রাদুর্ভাব হয তখন সজ্জনগণকে বক্ষা করিতে এবং অসজ্জনকে বিনাশ কবিতে, অন্যায় অত্যাচার ধ্বংস কবিযা মানবসমাজে ন্যায ও সুবিচাবেব প্রতিষ্ঠা করিতে অবতার আবির্ভূত হন।

এইরূপে পুবাণে কৃষ্ণাবতাবের প্রয়োজন বর্ণনা কবা হইযাছে—কুরুদের অসৎকর্মেব ভাব পৃথিবীব পক্ষে এত দুর্বিষহ হইয়া পড়িযাছিল যে পৃথিবী তাহার ভাবেব লাঘব কবিতে ভগবানের অবতাব প্রার্থনা করিযাছিল, তাই বিষ্ণু কৃষ্ণরূপে

অবতীর্ণ হন, অত্যাচারিত পাণ্ডবগণকে উদ্ধার করেন এবং দুষ্কর্মী কৌরবগণকে বিনাশ করেন। বিষ্ণুর পূর্ব পূর্ব অবতারের প্রয়োজনও এইভাবেই বর্ণিত হইয়াছে—রাবণের অন্যায় অত্যাচার নিবারণ করিতে রাম অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, ক্ষত্রিয়গণের অন্যায় উচ্ছৃঙ্খলতা নিবারণ করিতে পরশুরাম অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, দৈত্য বলির শাসন ধ্বংস করিতে বামন অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। কিন্তু এইরূপে কেবল নৈতিক, সামাজিক বা রাজনৈতিক প্রয়োজন সিদ্ধিই অবতারের উদ্দেশ্য বলিয়া পুরাণাদিতে যে বর্ণনা করা হইয়াছে তাহাতে অবতার ব্যাপারের প্রকৃত পরিচয় দেওয়া হয় নাই, ইহা সহজেই বুঝা যায়। এরূপ বর্ণনায় অবতারের *আধ্যাত্মিক প্রয়োজনের* কথা ধরা হয় নাই, এবং এইরূপ বাহ্য প্রয়োজনই যদি সব হইত তাহা হইলে খ্রীস্ট ও বুদ্ধকে অবতারের পর্যায় হইতে বাদ দিতে হইত, কারণ সাধুগণের পরিত্রাণ ও অসাধুগণের বিনাশ মোটেই তাঁহাদের লক্ষ্য ছিল না, তাঁহারা আনিয়াছিলেন সকল মানবের জন্য এক নূতন আধ্যাত্মিক বাণী, দিব্য বিকাশ ও অধ্যাত্ম-সিদ্ধির এক অভিনব নীতি। আবার অন্যপক্ষে যদি আমরা ধর্ম শব্দের শুধু আধ্যাত্মিক অর্থ গ্রহণ করি, ধর্ম বলিতে কেবল আধ্যাত্মিক ও ধর্মজীবনের নীতি মাত্র বুঝি, তাহা হইলে আমরা অবতার ব্যাপারের মূল সত্যটি ধরি বটে, কিন্তু অবতারের কর্মের একটা বিশেষ আবশ্যকীয় দিক বাদ পড়িয়া যাইতে পারে। ভগবানের অবতারের ইতিহাসে সকল সময়েই আমরা দুই প্রকারের কর্ম দেখিতে পাই এবং এইরূপই হইবার কথা কারণ অবতার জগতের মধ্যে ভগবানের কার্যেরই ভার গ্রহণ করেন, জগতে ভগবানের ইচ্ছা ও জ্ঞানেরই অনুসরণ করেন, এবং এই কার্যের সর্বদাই দুইটি দিক, একটি হইতেছে অন্তর্জগতে আত্মার উন্নতি সাধন, অপরটি হইতেছে মানবসমাজের, মানবজীবনের বাহ্য পরিবর্তনসাধন।

কোন মহান্ আধ্যাত্মিক গুরু ও ত্রাণকর্তারূপে, খ্রীস্ট বা বুদ্ধরূপে অবতার আবির্ভূত হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহার পার্থিব প্রকাশকাল শেষ হইবার পরে তাঁহার কর্মের ফলে মানবজাতির কেবল নৈতিক জীবন নহে, সামাজিক এবং বাহ্যিক জীবন ও আদর্শেরও গভীর শক্তিশালী পরিবর্তন সংসাধিত হয়। আবার অন্যপক্ষে তিনি দিব্যজীবন, দিব্যব্যক্তিত্ব, দিব্যশক্তি লইয়া রাম বা শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় বাহ্যত সামাজিক বা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে গভীর পরিবর্তন সংসাধন করিতে অবতীর্ণ হইতে পারেন; কিন্তু এরূপ অবতারের ফল সকল সময়েই মানবজাতির আভ্যন্তরীণ জীবনগঠন ও দিব্যজন্মলাভে চিরস্থায়ীভাবে সহায়তা করিয়া থাকে। বড়ই রহস্যের কথা যে, বৌদ্ধ ও খ্রীস্টধর্মের স্থায়ী, জীবন্ত, ব্যাপক ফল হইয়াছে নৈতিক, সামাজিক ও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে, এমনকি যেসকল যুগ ও জাতি এই দুই ধর্মের তত্ত্বকথা, সাধনা ও অনুষ্ঠান বর্জন করিয়াছে তাহারাও ইহাদের সামাজিক, নৈতিক ও ব্যবহারিক আদর্শে প্রভাবিত হইয়াছে। বুদ্ধ, বুদ্ধের সঙ্ঘ এবং ধর্ম পরবর্তী হিন্দুধর্ম কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে বটে কিন্তু হিন্দুর জীবনে, হিন্দুর ধ্যান-ধারণায় বৌদ্ধধর্মের সামাজিক ও নৈতিক আদর্শের প্রভাব যে ছাপ মারিয়া

দিয়াছে তাহা কখনও মুছিবার নহে; আর বর্তমান ইউরোপ নামে খ্রীস্টান হইলেও বাস্তবিকপক্ষে খ্রীস্টধর্মকে বর্জন করিয়াছে, কিন্তু বর্তমান ইউরোপের মানবধর্ম (humanitarianism) হইতেছে নৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে খ্রীস্টধর্মের *আধ্যাত্মিক তত্ত্বসকলের প্রয়োগ*, আর তাহাদের সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার আদর্শ হইতেছে সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ঐ সকল অধ্যাত্মসত্যের প্রয়োগ; বিশেষত যাহারা তীব্রভাবে খ্রীস্টধর্মকে আক্রমণ করিয়াছিল এবং যে মুক্তিপন্থী যুগ মুক্তিলাভের প্রয়াসে খ্রীস্টধর্মমতকে প্রত্যাখ্যান করিতে চেষ্টা করিয়াছিল তাহাদের দ্বারাই ঐ সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার আদর্শ গৃহীত হইয়াছে। অন্যদিকে রাম ও কৃষ্ণের যুগের কোন ইতিহাস নাই, কেবল কাব্য ও পুরাণের ভিতর দিয়া আমরা তাঁহাদের কার্যাবলীর পরিচয় পাই এবং এই সকলকে আমরা কাল্পনিক বলিয়াও ধরিতে পারি, কিন্তু তাঁহাদের জীবনকে আমরা কাল্পনিক বলিয়াই ধরি অথবা ঐতিহাসিক সত্য বলিয়াই গ্রহণ করি তাহাতে কিছুই আসিয়া যায় না, কারণ ব্যক্তির ও জাতির আভ্যন্তরীণ আধ্যাত্মিক জীবনে তাঁহাদের দিব্য আদর্শের প্রভাব চিরস্থায়ী হইয়াই রহিয়াছে। অবতার দিব্যজীবন ও চৈতন্যের ব্যাপার, কোন বাহ্য কর্ম সম্পাদনেই ইহা প্রকট হইতে পারে, কিন্তু এই কর্ম শেষ হইবার পরও ইহার আধ্যাত্মিক প্রভাব বরাবর থাকিবেই, অথবা ইহা প্রকট হইতে পারে কোন ধর্ম শিক্ষা দিয়া, আধ্যাত্মিক প্রভাব বিস্তার করিয়া; কিন্তু এই নূতন ধর্ম বা সাধনার উপযোগিতা যখন শেষ হইয়া যাইবে তখনও মানবজাতির চিন্তা, প্রকৃতি ও বাহ্য জীবনে ইহার চিরস্থায়ী প্রভাব থাকিবেই।

অতএব অবতারের কর্ম সম্বন্ধে গীতার মত বুঝিতে হইলে ধর্ম শব্দের সর্বাপেক্ষা পূর্ণ, গভীর এবং ব্যাপক অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে; যে বাহ্য এবং আভ্যন্তরীণ নিয়মের দ্বারা ভাগবত ইচ্ছা ও প্রজ্ঞা মানুষের আধ্যাত্মিক বিকাশ সাধন করে, *জাতির জীবনে ইহার পরিবেষ্টন ও পরিণাম সম্পাদন করিয়া দেয়*, তাহাকেই ধর্ম বলিয়া বুঝিতে হইবে। ভারতে ধর্ম বলিতে কেবল সদসৎ কর্মের নীতি, ন্যায়-অন্যায়ের বিধান, নৈতিক অনুশাসন বুঝায় না; বাহ্য ও অন্তর্জগতে নানা রূপ, নানা কর্ম, নানা সম্বন্ধের ভিতর দিয়া এক ভাগবত তত্ত্ব নিজেকে সিদ্ধ করিয়া তুলিতেছে, সেই দিক দিয়া মানুষের সহিত ভগবানের, প্রকৃতির ও অন্যান্য জীবের সকলপ্রকার সম্বন্ধ যে নিয়মের দ্বারা পরিচালিত হয় সেই সমগ্র অনুশাসনই ধর্ম। আমরা যাহাকে ধরিয়া থাকি এবং যাহা আমাদের বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ কার্যাবলীকে ধরিয়া রাখে—এই দুই-ই ধর্ম।[১] ধর্ম শব্দের প্রাথমিক অর্থ আমাদের প্রকৃতির মূল নীতিকে বুঝায়, ইহা অলক্ষ্যে আমাদের সমস্ত কর্ম নিয়ন্ত্রিত করে এবং এই অর্থে প্রত্যেক জীব, শ্রেণী, জাতি, ব্যক্তি বা সঙ্ঘের স্ব-স্ব ধর্ম আছে। দ্বিতীয়ত আমাদের মধ্যে ভাগবত-প্রকৃতির বিকাশ করিতে হইবে; যে-

১ ধৃ ধাতু হইতে 'ধর্ম্ম' শব্দের উৎপত্তি এবং ইহার অর্থ 'ধরা'।

সকল আভ্যন্তরীণ ক্রিযাব দ্বাবা সেই ভাগবত-প্রকৃতি আমাদেব সত্তায বিকশিত হইযা উঠে তাহাদেব নীতিকে ধর্ম বলা যায এবং ইহাই ধর্ম শব্দেব দ্বিতীয অর্থ। আবাব, বহির্মুখী চিন্তা ও কর্ম এবং আমাদেব পবস্পবেব সহিত সম্বন্ধে যে বিধানের দ্বাবা নিযন্ত্রিত কবিযা ভাগবত আদর্শেব দিকে আমাদেব নিজেদেব এবং সমগ্র মানবজাতির বিকাশকে সর্বোত্তমভাবে সাহায্য কবা হয, তাহাকেও ধর্ম বলা যায়, ইহাই ধর্ম শব্দেব তৃতীয অর্থ।

ধর্মকে সাধাবণত সনাতন ও অপবিবর্তনশীল বলা হয; ধর্মেব মূল নীতি, আদর্শ এইরূপই বটে, কিন্তু ইহাব রূপেব পবিবর্তন ও বিকাশ সকল সময়েই চলিতেছে, কারণ মানুষ এখনও সেই আদর্শে পৌঁছিতে পাবে নাই বা এখনও তাহার মধ্যে বাস করে নাই, কিন্তু সেই আদর্শকে কোনবকমে লক্ষ্য কবিযা চলিয়াছে, তাহাকে জানিবার জন্য এবং জীবনে তাহা সিদ্ধ কবিবাব জন্য ক্রমশ তৈযারী হইয়া উঠিতেছে। এই বিকাশে যাহা কিছু আমাদিগকে দিব্য শুচিতা, উদারতা, জ্যোতি, স্বাধীনতা, তেজ, শক্তি, আনন্দ, প্রেম, শুভ, ঐক্য ও সৌন্দর্যে বাড়িযা উঠিতে সাহায্য করে সেই সবই ধর্ম, এবং যাহা কিছু ইহাব বিরুদ্ধ, ইহাব প্রতিবন্ধক তাহাই অধর্ম, তাহা লইযা আসে বিকৃতি ও বিরোধ, অশুচিতা, সঙ্কীর্ণতা, বন্ধন, অন্ধকার, দুর্বলতা, নীচতা, দ্বন্দ্ব, দুঃখ ও অনৈক্য, উন্নতিব পথে মানুষকে এই সবই ছাড়িযা যাইতে হইবে। এই অধর্ম ধর্মেব প্রতিদ্বন্দ্বী হয, ধর্মকে পরাভূত কবিতে চায, আমাদিগকে পিছনের দিকে, নীচেব দিকে টানে,—অশুভ, অজ্ঞান ও অন্ধকাবেব দিকে লইয়া যাইতে চায। এই দুইযেব মধ্যে অনববত দ্বন্দ্ব ও সংগ্রাম চলিতেছে, কখনও ধর্মের শক্তিব জয় হইতেছে, কখনও অধর্মেব শক্তিব জয় হইতেছে। বেদে ইহা দেবাসুর সংগ্রামেব রূপকেব ভিতব দিযা বর্ণিত হইতেছে, ইহাই *জোবোযাস্ট্রিযান (Zoroastrianism)* ধর্মে অহুবমজ্‌দা ও অহ্‌রিমানের সংগ্রামরূপে বর্ণিত হইয়াছে, ইহাই পরবর্তী ধর্মসমূহে মানবজীবন ও মানবাত্মাকে অধিকাব কবিবাব নিমিত্ত ঈশ্বব ও শযতান বা ইব্‌লিসেব সংগ্রামরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

এই সবের দ্বারাই অবতারেব কর্ম নির্ণীত হয। বৌদ্ধধর্মেব বিধানমত সাধক তাহার মুক্তিপথের বিবোধী ব্যাপাবসমূহ হইতে বক্ষা পাইবাব নিমিত্ত ধর্ম, সঙ্ঘ ও বুদ্ধ এই তিন শক্তির আশ্রয গ্রহণ কবে। সেইরূপ খ্রীস্টধর্মেও আমবা খ্রীস্টানুযাযী জীবনযাপনেব ধর্ম, চার্চ এবং খ্রীস্ট এই তিনটি দেখিতে পাই। এই তিনটি সকল অবতারেরই কর্মেব প্রযোজনীয অঙ্গ। তিনি একটি ধর্ম দেন, সাধনাব এক ধাবা দেন—তাহার সাহায্যে নীচেব জীবন হইতে উচ্চ জীবন লাভ কবা যায। কর্ম সম্বন্ধে বিধি এবং অন্যান্য মানুষ ও জীবের সহিত আমাদেব সম্বন্ধ নিযন্ত্রণ এই ধর্মেরই অঙ্গ—অষ্টাঙ্গমার্গ, অথবা শুদ্ধ প্রেম ও শুচিতাব ধর্ম অথবা এইরূপ অন্য কোনভাবে জীবনে ভাগবত ভাবের প্রকাশ। তাহাব পব তিনি সঙ্ঘেব স্থাপনা কবেন, তাঁহাকে কেন্দ্ররূপে আশ্রয় কবিযা ও তাঁহাব শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ হইযা যাহাবা

একত্রিত হয তাহাদের মধ্যে সখ্য ও একতা স্থাপন করেন, কারণ মানুষেব সকল চেষ্টাবই যেমন একটা ব্যষ্টিব দিক আছে তেমনই একটা সমষ্টিব দিকও আছে এবং যাহাবা একই পথেব অনুসবণ কবে তাহারা স্বভাবতই পরস্পরের সহিত আধ্যাত্মিক সাহচর্য ও একতায বদ্ধ হইযা পড়ে। বৈষ্ণব ধর্মেও এই তিন আছে, ভাগবত, ভক্ত, ভগবান,—বৈষ্ণব মতানুযাযী ভক্তি ও প্রেমেব ধর্মই ভাগবত, যাহাদেব মধ্যে এই ধর্ম প্রকাশিত হইযাছে তাহাদের সঙ্ঘই ভক্ত, যাঁহাব সত্তা ও প্রকৃতিতে এই ভাগবত প্রেমেব প্রতিষ্ঠা ও পূর্ণ পবিণতি সেই পরম প্রেমাস্পদই ভগবান। অবতাব এই তৃতীয়টিব প্রতিনিধি, অবতাবই সেই দিব্যপুরুষ ও সত্তা যিনি সঙ্ঘ ও ধর্মেব প্রাণ, তিনি নিজের ব্যক্তিত্বের দ্বারা সঙ্ঘ ও ধর্মকে অনুপ্রাণিত কবেন, জীবিত বাখেন এবং মনুষ্যগণকে আনন্দ ও মুক্তির দিকে আকৃষ্ট কবেন।

গীতায় এই তিনটিই আবও উদার[১] অর্থ গ্রহণ করিয়াছে। কারণ গীতায় যে ঐক্যেব কথা বলা হইযাছে তাহা বেদান্তমতানুযায়ী সর্বগত ঐক্য—তাহাব দ্বারা আত্মা নিজেকে সর্বভূতে এবং নিজের মধ্যেই সর্বভূতকে দেখে এবং সকলের সহিত নিজেকে এক কবিযা লয। অতএব, মানুষেব সকল প্রকার সম্বন্ধকে লইয়া উচ্চ ভাগবতভাবেব মধ্যে উত্তোলন কবাই এখানে ধর্ম; ঐ ধর্ম সমষ্টিজীবনেব ভিত্তিস্বরূপ প্রচলিত নৈতিক, সামাজিক ও ধর্মসম্বন্ধীয বিধান লইযা আবম্ভ করে এবং উহাকে ব্রাহ্মী চৈতন্যেব দ্বাবা অনুপ্রাণিত ও উন্নীত করে; গীতাব নীতি হইতেছে ঐক্য, সাম্য, ঈশ্বব-প্রণোদিত মুক্ত নিষ্কাম কর্ম, ভগবৎ জ্ঞান ও আত্মজ্ঞানেব দ্বাবা সকল প্রকৃতি, সকল কর্মকে অনুপ্রাণিত কবা, উহাকে দিব্য জীবন, দিব্য চৈতন্যেব দিকে লইযা যাওযা, এবং ঐ জ্ঞান ও কর্মেব পরম শক্তি ও পবিণতিস্বরূপ ভগবৎপ্রেম। প্রেম ও ভক্তির দ্বারা ভগবানলাভেব সাধনাব কথা গীতা যেখানে বলিযাছে, সেইখানেই ভাগবত ভক্তদেব সখ্য ও পবস্পরকে ভগবানলাভে সহাযতা কবাব ভাবও আসিযাছে এবং ইহাই সঙ্ঘের ভিত্তি; কিন্তু গীতাব শিক্ষা অনুসারে প্রকৃত সঙ্ঘ হইতেছে সমগ্র মানবজাতি। সমগ্র জগৎ এই ধর্মেব দিকে অগ্রসব হইতেছে, যাহার যেমন ক্ষমতা সে সেই ভাবেই চলিতেছে—

"মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ।"

সাধক সকলেব সহিত নিজের একত্ব উপলব্ধি কবিতে, তাহাদেব সুখ দুঃখ, তাহাদেব সমগ্র জীবন নিজেব কবিযা লইতে সাধনা করেন, আর যে মুক্ত সিদ্ধ পুরুষ সর্বভূতেব সহিত নিজেব একত্ব উপলব্ধি করিযাছেন, তিনি সকল মানবজাতিব জীবনেব মধ্যে বাস কবেন, মানবজাতির এক অদ্বিতীয আত্মাব জন্য, সর্বভূতে যে ঈশ্বব রহিযাছেন তাঁহাব জন্য জীবনধাবণ কবেন, লোক-সংগ্রহের

[১] বাস্তবিকপক্ষে গীতাব শিক্ষা অন্যান্য বিশিষ্ট সাধনা ও শিক্ষা অপেক্ষা উদাব ও বহুমুখী।

নিমিত্ত, সকলকে সকল পথ এবং সকল অবস্থাব ভিতব দিয়া ভগবানেব অভিমুখে লইয়া যাইবাব নিমিত্ত কর্ম কবেন; গীতায অবতাব শ্রীকৃষ্ণেব নাম ও রূপ গ্রহণ করিয়াছেন বটে কিন্তু তিনি এই অবতাবেব উপবই সব ঝোঁক দেন নাই, কিন্তু এই অবতাব যাঁহার প্রতিনিধি সেই পুরুষোত্তমেব উপবেই ঝোঁক দিযাছেন, সকল অবতাব এই পুরুষোত্তমেবই নরজন্ম, মানুষ যেসকল নাম ও রূপে ভগবানেব পূজা করিয়া থাকে সেসব এই পুরুষোত্তমেবই প্রতিমা। গীতায শ্রীকৃষ্ণ যে পন্থাব কথা বর্ণনা করিযাছেন তাহাব দ্বাবাই মানুষ প্রকৃত জ্ঞান ও প্রকৃত মুক্তি লাভ কবিতে পারে, এই কথা বলা হইয়াছে বটে, কিন্তু এই পন্থা অন্যান্য পন্থা হইতে স্বতন্ত্র নহে, অন্যান্য সকল পন্থাই ইহার অন্তর্গত। কাবণ ভগবানেব সর্বব্যাপী সত্তাব মধ্যেই সকল অবতার, সকল শিক্ষা, সকল ধর্ম বহিযাছে।

এই জগৎ এক বিবাট যুদ্ধক্ষেত্র। এই যুদ্ধ দুই প্রকাবেব, ভিতবেব যুদ্ধ ও বাহিরেব যুদ্ধ। গীতা এই দুই প্রকাব যুদ্ধেব উপবেই ঝোঁক দিযাছে। ভিতবেব যুদ্ধে মানুষকে, ব্যক্তিকে, তাহার ভিতবের শত্রুব সহিত যুদ্ধ কবিতে হয এবং বাসনা, অজ্ঞান, অহঙ্কারকে বধ করিতে পাবিলেই এই যুদ্ধ জয হয। কিন্তু মানবসমাজে একটা বাহিবের যুদ্ধও আছে, এখানে ধর্ম-পক্ষ ও অধর্ম-পক্ষ এই দুইযেব মধ্যে সংগ্রাম চলে। মানুষেব মধ্যে যে ভাগবত ভাব, ভাগবত প্রকৃতি আছে এবং যেসকল মনুষ্য এই ভাব ও প্রকৃতিব প্রতিনিধি বা সাধক, তাহাবা ধর্ম-পক্ষের সহায হয় এবং দুর্ধর্ষ অহঙ্কারপূর্ণ আসুবিক ও বাক্ষসিক প্রকৃতি ও ঐরূপ প্রকৃতিব মনুষ্যসকল অধর্ম-পক্ষেব সহায় হয়। এই সংগ্রামেব রূপক স্বরূপ দেবাসুবেব যুদ্ধের কথায ভাবতের প্রাচীন সাহিত্য পবিপূর্ণ; মহাভাবতেব যে যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণ কেন্দ্রস্বরূপ, তাহাও এই ধর্ম ও অধর্মেব যুদ্ধেবই ছবি বলিযা প্রাযই বর্ণিত হইযা থাকে; পাণ্ডবেবা দেবতার সন্তান, নবরূপে দেবশক্তি, তাহাবা ধর্মবাজ্য স্থাপনেব জন্য যুদ্ধ করিতেছে এবং তাহাদের প্রতিদ্বন্দ্বীবা দানবীয শক্তিব অবতাব, অসুব। এই বাহিরের যুদ্ধেও সাক্ষাৎ বা পবোক্ষভাবে সাহায্য কবিতে অসুবগণেব, পাপীগণের প্রভুত্ব ধ্বংস কবিযা এবং তাহাদেব শক্তিকে খর্ব কবিযা উৎপীড়িত ধর্মকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে অবতার আবির্ভূত হন। যেমন ব্যক্তিগত মানবাত্মাব মধ্যে স্বর্গবাজ্য প্রতিষ্ঠা কবিতে, তেমনই পৃথিবীতে সমষ্টিব মধ্যে স্বর্গবাজ্যকে নিকটতর করিয়া দিতে অবতাব আগমন কবেন।

অবতারের আগমনেব নিগূঢ় ফল তাহাবা লাভ কবে যাহাবা ইহা হইতে দিব্যজন্ম ও দিব্যকর্মেব প্রকৃত মর্ম বুঝিতে পাবে, যাহাদেব চিত্ত তাঁহাব চিন্তাতেই পূর্ণ হয়, যাহারা সর্বতোভাবে তাঁহাব আশ্রয গ্রহণ করে, মন্ময়া মামুপাশ্রিতাঃ, তাহাদের জ্ঞানের সিদ্ধিপ্রদ শক্তিব দ্বাবা শুদ্ধ হইয়া এবং নিম্ন প্রকৃতি হইতে মুক্ত হইযা তাহারা দিব্য সত্তা ও দিব্য প্রকৃতি লাভ কবে, মদ্ভাবমাগতাঃ; অবতাব আসিয়া দেখাইয়া দেন যে, মানুষেব এই নীচেব প্রকৃতিব ঊর্ধ্বে দিব্য প্রকৃতি মানুষের মধ্যেই বহিয়াছে, অবতার আসিয়া দেখাইযা দেন যে, দিব্য কর্মেব স্বরূপ

কি—এরূপ কর্ম মুক্ত, নিবহঙ্কাব, নিঃস্বার্থ, নৈর্ব্যক্তিক, সর্বজনীন—ভাগবত জ্ঞান, শক্তি ও প্রেমে পবিপূর্ণ। তিনি দিব্য পুরুষরূপে অবতীর্ণ হন যেন তাঁহার দিব্য চবিত্রে মানুষেব চিত্ত মন ভরিযা উঠে এবং তাহার সঙ্কীর্ণ অহমিকা দূর হইয়া যায়, যেন এইরূপে সে ক্ষুদ্র অহং হইতে মুক্ত হইযা অনন্ত ও বিশ্বব্যাপী সত্তা হইযা উঠিতে পাবে, সংসাব হইতে মুক্ত হইযা অমৃতত্বে পৌঁছিতে পারে। তিনি ভাগবত শক্তি ও প্রেমরূপে অবতীর্ণ হইযা মানুষকে নিজের দিকে আকর্ষণ করেন যেন তাহাবা তাঁহাবই আশ্রয গ্রহণ করে, যেন মানুষেব ক্ষুদ্র শক্তি লইয়া, তাহাদের মানবীয ভয় কাম ক্রোধাদিব দ্বন্দ্ব লইযাই পড়িয়া না থাকে, যেন এই সব দুঃখ ও অশান্তি হইতে মুক্ত হইযা মানুষ ভগবানের শান্তি ও আনন্দেব মধ্যে বাস করিতে পারে।[১] ভগবান কি নাম বা রূপ লইয়া, ভাগবতেব কোন ভাব সম্মুখে রাখিয়া অবতীর্ণ হন তাহাতেও মূলত কিছুই আসিয়া যায় না; কাবণ মানুষ আপন আপন স্বভাবানুসাবে ভগবান কর্তৃক নির্দিষ্ট পথই অনুসরণ করিতেছে, সেই পথই শেষকালে তাহাদিগকে ভগবানের সমীপে লইয়া যাইবে, তিনি যখন তাহাদিগকে পথ দেখাইতে অবতীর্ণ হন তখন তাঁহার যে ভাব তাহাদের স্বভাবেব অনুযায়ী সেই ভাবেব অনুসরণই তাহাদেব পক্ষে প্রকৃষ্ট, মানুষ যে ভাবে ভগবানকে গ্রহণ করে, ভালবাসে, ভগবানে আনন্দ পায, ভগবানও সেই ভাবে মানুষকে গ্রহণ কবেন, ভালবাসেন, তাহাতে আনন্দ পান—যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।

[১] জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জুন॥
বীতবাগভযক্রোধা মন্ময়া মামুপাশ্রিতাঃ।
বহবো জ্ঞানতপসা পূতা মদ্ভাবমাগতাঃ॥৪।৯-১০

অষ্টাদশ অধ্যায়

দিব্য কর্মী

তাহা হইলে দিব্যজন্ম (এক ঊর্ধ্বতর চেতনায় আত্মার দিব্যভাবাত্মক জন্ম) লাভ করা এবং দিব্যজন্ম লাভের পূর্বে ইহার উপায়স্বরূপ ও পরে ইহার অভিব্যক্তিস্বরূপ দিব্য কর্ম করা—ইহাই গীতাকথিত কর্মযোগের সমগ্র তত্ত্ব। গীতা কর্মের এমন কোন বাহ্য লক্ষণ নির্দেশ করে নাই যাহা বাহ্য দৃষ্টিতেই চিনিতে পারা যায়, সংসারে প্রচলিত সমালোচনায় যাহার বিচার করিতে পারা যায়, এমনকি মানুষ সাধারণ জ্ঞান-বুদ্ধির আলোকে যে পাপপুণ্যের প্রভেদ করিয়া কর্তব্য নির্ধারণ করিতে চায় গীতা ইচ্ছা করিয়াই সেসব প্রভেদ পরিত্যাগ করিয়াছে। গীতা দিব্য কর্মের যেসব বিশিষ্ট লক্ষণ দিয়াছে সেসব হইতেছে অতিশয় গূঢ় ও আভ্যন্তরীণ, যে চিহ্নের দ্বারা দিব্য কর্ম চেনা যায় তাহা অদৃশ্য, আধ্যাত্মিক, সাধারণ ভালমন্দ, পাপপুণ্য বিচারের অতীত।

আত্মা হইতেই দিব্য কর্মসকল উদ্ভূত হয় এবং কেবল সেই আত্মার আলোকেই তাহাদিগকে চেনা যাইতে পারে। গীতায় বলা হইয়াছে, "কিং কর্ম্ম কিমকর্ম্মেতি কবয়োঽপ্যত্র মোহিতাঃ", "*কোন্‌টি কর্ম, কোন্‌টিই বা অকর্ম*, এ বিষয়ে জ্ঞানীগণও মোহিত ও ভ্রান্ত হন" কারণ তাঁহারা ব্যবহারিক, সামাজিক, নৈতিক, যৌক্তিক মানদণ্ড লইয়া বিচার করেন বলিয়া বাহ্য দিকটা লইয়াই পার্থক্য করেন, কিন্তু এ বিষয়ের যাহা মূল তত্ত্ব তাহার কোনও সন্ধান পান না।

> তৎ তে কর্ম্ম প্রবক্ষ্যামি যজ্‌জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ॥
> কর্ম্মণো হ্যপি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যঞ্চ বিকর্ম্মণঃ।
> অকর্ম্মণশ্চ বোদ্ধব্যং গহনা কর্ম্মণো গতিঃ॥৪।১৬-১৭

"আমি তোমাকে সেই কর্মের কথা বলিব, যাহা জানিলে তুমি সমস্ত অশুভ হইতে মুক্ত হইবে। কর্ম কি তাহা বুঝিতে হইবে, অন্যায় কর্ম কি তাহা বুঝিতে হইবে, অকর্ম বা নিষ্ক্রিয়তা কি তাহাও বুঝিতে হইবে। এ সংসারে কর্ম গভীর অরণ্যের মত, গহন।" প্রচলিত ভাব নীতি ও আদর্শের আলোকে মানুষ হোঁচট খাইতে খাইতে কোনরকমে এই গহন অরণ্যের ভিতর দিয়া চলিতে থাকে, এই *সকল নীতি ও আদর্শ বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন সমাজের ভাব ও আদর্শের মিশ্রণের* ফল, এই সবকে লোকে অক্ষর ও সনাতন বলে বটে, কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে ইহারা দেশকালানুগতিক এবং অনিত্য, এই সকল নীতি ও আদর্শের ভিত্তি জ্ঞান-বিজ্ঞান-সম্মত বলিয়া দেখিবার নানারূপ চেষ্টা করা হয়, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ইহারা ব্যবহারিক ও অযৌক্তিক। জ্ঞানী ব্যক্তি এই সবের মধ্যে কোন স্থায়ী নীতি ও মূল

সত্যের উচ্চতম ভিত্তি সন্ধান করিতে করিতে অবশেষে চরম প্রশ্ন তুলিতে বাধ্য হন—সমস্ত কর্ম ও সংসারই কি মিথ্যা, মায়ার ফাঁদ নহে? সমস্ত কর্ম হইতে নিবৃত্ত হওয়া, অকর্ম, ইহাই কি ক্লান্ত মোহমুক্ত মানবাত্মার শেষ আশ্রয়স্থল নহে? কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন যে, এ বিষয়ে জ্ঞানীদেরও বুদ্ধিবিভ্রাট ঘটিয়া থাকে। কারণ, নিষ্ক্রিয়তার দ্বারা নহে, কিন্তু কর্মের দ্বারাই জ্ঞান লাভ করা যায়, মুক্তি লাভ করা যায়।

তাহা হইলে এ সমস্যার মীমাংসা কি? কোন্ প্রকারের কর্ম করিলে আমরা এই জীবনের অশুভ সমূহ হইতে মুক্তি পাইব, এই সংশয়, এই ভ্রম, এই শোক হইতে মুক্তি পাইব, আমাদের শুদ্ধতম মহদুদ্দেশ্য-প্রণোদিত কার্যেরও মিশ্রিত, অশুদ্ধ, ব্যর্থতাময় পরিণাম হইতে মুক্তি পাইব, এই অসংখ্য প্রকারের অশুভ ও দুঃখ হইতে মুক্তি পাইব? ইহার উত্তর এই যে, কোনরূপ বাহ্যিক ভেদ করিবার আবশ্যকতা নাই, সংসারের প্রয়োজনীয় কোন কর্মও বর্জন করিবার আবশ্যকতা নাই, আমাদের মানবীয় কর্মের চতুর্দিকে কোন সীমা বা গণ্ডী রচনা করিতে হইবে না; পরন্তু সকল কর্মই করা কর্তব্য, তবে ভগবানের সহিত আত্মাকে যুক্ত রাখিয়াই সকল কর্ম করিতে হইবে, যুক্তঃ কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ; অকর্ম্ম, অর্থাৎ কর্ম পরিত্যাগ প্রকৃত পন্থা নহে, যে ব্যক্তি উচ্চতম বুদ্ধির অন্তর্দৃষ্টি লাভ করিয়াছেন তিনি বুঝেন যে এরূপ অকর্মের অবস্থায় বাস্তবিকপক্ষে অনবরত কর্ম চলিতে থাকে, এই অবস্থা প্রকৃতি এবং প্রকৃতির গুণাবলীর ক্রিয়ার অধীন। যে ব্যক্তি শারীরিক কর্ম হইতে বিরত থাকিতে চায়, তাহার এখনও ভ্রম আছে যে, সেই বুঝি কর্ম করে, প্রকৃতি নহে, সে জড়তাকে মুক্তি বলিয়া ভুল করে; সে জানে না যে, যে অবস্থা সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় বলিয়া মনে হয়, যেখানে ইঁট পাথর অপেক্ষাও অধিক জড়তা, সেখানেও প্রকৃতির ক্রিয়া চলিতেছে। আবার অন্যদিকে পূর্ণ কর্মস্রোতের মধ্যেও আত্মা তাহার কর্মসকল হইতে মুক্ত, সে কর্তা নহে, কোন কৃত কর্মের দ্বারা বদ্ধ নহে, আর যে ব্যক্তি আত্মার মুক্তিতে বাস করে, প্রকৃতির গুণের অধীনতায় বাস করে না, কেবল সেই ব্যক্তিই কর্ম হইতে মুক্তি পাইয়াছে। ইহাই গীতার নিম্নলিখিত বাক্যে সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত হইয়াছে—"কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেদকর্ম্মণি চ কর্ম্ম যঃ স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু"—যিনি কর্মের মধ্যে দেখেন কর্ম নাই এবং নিষ্ক্রিয়তার মধ্যে দেখেন কর্ম চলিতেছে তিনিই মনুষ্যের মধ্যে প্রকৃত বুদ্ধিমান। গীতার এই বাক্য সাংখ্যকৃত পুরুষ-প্রকৃতির প্রভেদের উপর প্রতিষ্ঠিত—পুরুষ মুক্ত, নিষ্ক্রিয়, কর্মের মধ্যেও চিরশান্ত, শুদ্ধ, অবিচলিত আর প্রকৃতি চিরক্রিয়াশীলা, প্রকৃতি তাহার দৃশ্য কর্মস্রোতের মধ্যে যেমন কর্ম করিতেছে, জড়তা ও নিষ্ক্রিয়তা বলিয়া যাহা দেখায় তাহার মধ্যেও তেমনই কর্ম করিতেছে। বিচারবুদ্ধির চরম চেষ্টার ফলে আমরা এই জ্ঞানই লাভ করি, অতএব যে ব্যক্তি এই জ্ঞান লাভ করিয়াছেন তিনিই প্রকৃত বুদ্ধিমান, স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু—যে ভ্রান্ত-চিত্তাশীল ব্যক্তি নিম্নতর বুদ্ধির বাহ্যিক, অনিশ্চিত, অস্থায়ী প্রভেদসমূহের

দ্বারা জীবন ও কর্মের বিচার করিতে চাহে, সে প্রকৃত বুদ্ধিমান নহে। অতএব মুক্ত ব্যক্তি কর্মকে ভয় পান না, তিনি সর্বকর্মকারী বৃহৎকর্মী, কৃৎস্নকর্মকৃৎ, অপরের ন্যায় তিনি প্রকৃতির অধীনে কর্ম করেন না, পরন্তু আত্মার নিথর শান্তিতে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া ভগবানের সহিত যোগে ধীরভাবে কর্ম করেন। ভগবানই তাঁহার সকল কর্মের অধীশ্বর, কেবল তাঁহার ভিতর দিয়া ঐসকল কর্ম হইয়া থাকে, তাঁহার প্রকৃতি নিজ অধীশ্বর সম্বন্ধে সচেতন হইয়া তাঁহারই পরিচালনায় যন্ত্রস্বরূপ ঐ-সকল কর্ম সম্পাদন করে। এই জ্ঞানের জ্বলন্ত ও পূত অগ্নিশিখায় তাঁহার সমস্ত কর্ম যেন পুড়িয়া ভস্ম হইয়া যায়, তাঁহার মনে ঐসকল কর্মের দ্বারা কোন দাগ বা বিকৃতি হয় না, সকল কর্মের মধ্যে তাঁহার মন শান্ত, নীরব, অবিচলিত, শুভ্র, নির্মল ও পবিত্র থাকে। কর্তৃত্বের অভিমানশূন্য হইয়া, এই মোক্ষদায়ক জ্ঞানের আলোকে সমস্ত কর্ম করা দিব্যকর্মীর প্রথম লক্ষণ।

বাসনা হইতে মুক্তি দ্বিতীয় লক্ষণ; কারণ যেখানে ব্যক্তিগত কর্তৃত্বের অভিমান বা অহঙ্কার নাই সেখানে বাসনা অসম্ভব, সেখানে বাসনা কোন আহার্য পায় না, অবলম্বন না পাইয়া অবসন্ন হইয়া পড়ে, ক্ষীণ হইয়া লোপ পায়। মুক্ত ব্যক্তি বাহ্যত অন্যান্য লোকের মতই সকল প্রকার কর্ম করিতেছেন মনে হয়, বরং তিনি অন্যান্য লোক অপেক্ষা বৃহত্তর কর্ম প্রবলতর সঙ্কল্প ও তেজের সহিতই সম্পাদন করিয়া থাকেন, কারণ ভগবদিচ্ছার মহতী শক্তি তাঁহার সক্রিয় প্রকৃতির ভিতর দিয়া ক্রিয়া করে, কিন্তু তাঁহার সমুদয় কর্ম ও আরব্ধ নীচের প্রকৃতির বাসনা ও সঙ্কল্প হইতে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত, সর্ব্বে সমারম্ভাঃ কামসঙ্কল্পবর্জ্জিতাঃ। তিনি তাঁহার *কর্মের ফলে সকল আসক্তি পরিত্যাগ করিয়াছেন*; আর যখন কেহ ফলের জন্য কর্ম করে না, কিন্তু সকল কর্মের অধীশ্বর ভগবানের হস্তে কেবল নৈর্ব্যক্তিক যন্ত্ররূপে কর্ম করে, সেখানে বাসনা কোন স্থান পাইতে পারে না—এমনকি ভগবানের কার্য সফল করিবার বাসনা বা কৃতিত্বের সহিত কার্য করিয়া ভগবানকে সন্তুষ্ট করিবার বাসনাও থাকিতে পারে না, কারণ ফল ভগবানের, ভগবান কর্তৃক নির্দিষ্ট এবং ভগবান নিজেই কর্মের কর্তা—ভগবান নিজের যে শক্তিকে কর্মের ভার দিয়াছেন সেই শক্তিরই সকল গৌরব, ক্ষুদ্র মনুষ্যের ব্যক্তিত্বের তাহাতে কোন গৌরবই নাই। মুক্ত পুরুষের মানবীয় মন ও আত্মা কিছুই করে না, ন কিঞ্চিৎ করোতি; যদিও তিনি তাঁহার প্রকৃতির ভিতর দিয়া কর্মে নিযুক্ত হন, কিন্তু প্রকৃতি, কার্যনির্বাহিকা শক্তি, চৈতন্যময়ী ভগবতীই হৃদ্দেশে অবস্থিত ভগবান কর্তৃক পরিচালিত হইয়া ঐ কর্ম করেন।

তাই বলিয়া যে সুচারুভাবে, সফলতার সহিত কর্ম করিতে হইবে না, কি উপায়ে কোন কার্য সিদ্ধ হইবে তাহা বিচার করিতে হইবে না, তাহা নহে; বরং যোগস্থ হইয়া শান্তভাবে কর্ম করিলে তাহা যেরূপ সুচারুভাবে সম্পন্ন হইতে পারে, আশা নিরাশায় কম্পিত হৃদয়ে, ক্ষুদ্র অক্ষম বুদ্ধির নানা বাধায়, অতিব্যগ্র মানবীয় ইচ্ছার অস্থির চাঞ্চল্যে কর্ম করিলে তাহা সেরূপ সুচারুভাবে সম্পন্ন হয় না, গীতা

আর এক স্থানে বলিয়াছে যে, যোগই কর্ম করিবার প্রকৃত কৌশল, যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্। কিন্তু এই সকল কর্ম ব্যষ্টিগত প্রকৃতির ভিতর দিয়া এক বিরাট বিশ্বগত জ্যোতি ও শক্তি দ্বারা নৈর্ব্যক্তিকভাবে সম্পাদিত হয়। কর্মযোগী জানেন যে, তাঁহাকে যে শক্তি দেওয়া হইয়াছে উহা ভগবৎ নির্দিষ্ট ফললাভের উপযোগী হইবে, তাঁহাকে যে কর্ম করিতে হইবে তৎসম্বন্ধে প্রয়োজনীয় দিব্যজ্ঞান তিনি লাভ করিবেন এবং তাঁহার ইচ্ছাশক্তি কর্মে ও লক্ষ্যে ভাগবত প্রজ্ঞার দ্বারাই সূক্ষ্মভাবে নিয়মিত হইবে—এই ইচ্ছা কর্মীর ব্যক্তিগত বাসনা বা ইচ্ছা নহে, কোনরূপ ব্যক্তিগত জয় বা লাভ ইহার লক্ষ্য নহে, ইহা ভগবানের উদ্দেশ্য-সাধনের নিমিত্ত এক দিব্য বিজ্ঞানময়ী শক্তির নৈর্ব্যক্তিক প্রেরণা। এরূপ কর্ম সাধারণের চক্ষে সাফল্যমণ্ডিতও হইতে পারে, বিফলও হইতে পারে; কিন্তু কর্মযোগী জানেন যে, বাহ্যত যাহাই মনে হউক সমস্ত জয়-পরাজয়, লাভ-লোকসানের ভিতর দিয়া তাঁহার নিজের অভিপ্রায় নহে পরন্তু সকল কর্ম ও কর্মফলের নিয়ন্তা সর্বজ্ঞ ভগবানের অভিপ্রায়ই সিদ্ধ হয়, ভগবান কখনও বাহ্য জয়ের ভিতর দিয়া নিজের ইচ্ছা সম্পাদন করেন, আবার অনেক সময়ে বাহ্য পরাজয়ের ভিতর দিয়াই তাঁহার ইচ্ছা অধিকতর জোরের সহিত সম্পন্ন করেন। অর্জুনকে যে যুদ্ধ করিতে আদেশ দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে জয় সুনিশ্চিত, কিন্তু যদি নিশ্চিত পরাজয়ই তাঁহার সম্মুখে থাকে তথাপি তাঁহাকে যুদ্ধ করিতেই হইবে কারণ, যে বিরাট আয়োজনের দ্বারা ভগবানের ইচ্ছা নিশ্চিতভাবে সম্পন্ন হইতেছে তাহাতে এই যুদ্ধটিই তাঁহার উপস্থিত কর্তব্য বলিয়া অর্জুনকে করিতে দেওয়া হইয়াছে।

মুক্ত মানবের ব্যক্তিগত কোন আশা, আকাঙ্ক্ষা নাই; তিনি কোন দ্রব্যই নিজস্ব বলিয়া গ্রহণ করেন না, ভগবানের ইচ্ছা যাহা আনিয়া দেয় তিনি তাহাই গ্রহণ করেন, কোনও দ্রব্যে লোভ করেন না, কাহাকেও ঈর্ষা করেন না, তিনি যাহা পান রাগদ্বেষশূন্য হইয়াই তাহা গ্রহণ করেন, কোন কিছু হারাইলে তিনি দুঃখ বা শোক করেন না। তাঁহার হৃদয় ও আত্মা সম্পূর্ণভাবে তাঁহার অধীন; সকল প্রকার প্রতিক্রিয়া ও বিক্ষোভ হইতে তাহারা মুক্ত, বাহ্য বিষয়ের সংস্পর্শে তাহারা বিচলিত হইয়া ভিতরে গোলযোগের সৃষ্টি করে না। তাঁহার কর্ম বাস্তবিকই কেবল শারীরিক, শারীরং কেবলং কর্ম্ম, কারণ বাকি আর যাহা কিছু তাহা ঊর্ধ্ব হইতেই আসে, মানবীয় স্তরে উৎপন্ন হয় না, তাহা ভগবান পুরুষোত্তমের ইচ্ছা, জ্ঞান ও আনন্দের প্রতিচ্ছায়া মাত্র। অতএব তিনি কর্মে ও কর্মের ফলে ঝোঁক দিয়া তাঁহার হৃদয় ও মনে সেই সকল প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেন না, যেগুলিকে আমরা রিপু বা পাপ বলিয়া থাকি। কারণ বাহিরের কর্ম আদৌ পাপ নহে, কিন্তু কর্মীর ব্যক্তিগত ইচ্ছা, মন ও হৃদয়ের যে অশুদ্ধ প্রতিক্রিয়া এই কর্মের আনুষঙ্গিক বা কারণ, বাস্তবিকপক্ষে তাহাই পাপ, যাহা নৈর্ব্যক্তিক, আধ্যাত্মিক, তাহা সকল সময়েই শুদ্ধ, অপাপবিদ্ধম্ এবং তাহার দ্বারা অনুষ্ঠিত সকল কর্মকেই তাহা নিজস্ব

অবিচ্ছেদ্য শুচিতা প্রদান করে। এই আধ্যাত্মিক নৈর্ব্যক্তিকতা (Spiritual impersonality) দিব্যকর্মীর তৃতীয় লক্ষণ। অবশ্য যেসকল মানব কতকটা মহত্ত্ব এবং উদারতা লাভ করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই অনুভব করেন যে এক নৈর্ব্যক্তিক শক্তি বা প্রেম বা ইচ্ছা এবং জ্ঞান তাঁহাদের মধ্য দিয়া ক্রিয়া করিতেছে, কিন্তু তাঁহারা মানবীয় ব্যক্তিগত অহংভাব হইতে মুক্ত নহেন, এবং মাঝে মাঝে এই অহংভাব খুবই প্রচণ্ড হইয়া উঠে। কিন্তু মুক্ত পুরুষের এই স্বাধীনতা লাভ হইয়াছে; কারণ তিনি তাঁহার ব্যক্তিগত সত্তাকে নৈর্ব্যক্তিক সত্তায় মিশাইয়া দিয়াছেন—সেখানে ইহা আর তাঁহার নিজের নহে, ভগবান পুরুষোত্তম ইহাকে গ্রহণ করিয়াছেন—তিনি সকল সাত্ত গুণকে অনন্তভাবে, অবাধে ব্যবহার করিতেছেন এবং কিছুর দ্বারাই বদ্ধ হইতেছেন না। যাঁহার এরূপ মুক্তিলাভ হইয়াছে, তিনি আত্মা হইয়াছেন, তিনি আর শুধু প্রকৃতির গুণসমূহের সমষ্টিমাত্র নহেন, আর প্রকৃতির কার্যের জন্য ব্যক্তিত্বের যে আভাসটুকু অবশিষ্ট থাকে তাহা কিছুর দ্বারা বদ্ধ নহে, তাহা একটা উদার, নমনীয়, বিশ্বব্যাপী সত্তা, তাহা অনন্তের মুক্ত আধার, পুরুষোত্তমের জীবন্ত প্রতিরূপ।

এই জ্ঞান, এই বাসনাশূন্যতা এবং এই নৈর্ব্যক্তিকতার ফল হইতেছে আত্মা ও প্রকৃতিতে পূর্ণ সমতা। সমতা দিব্যকর্মীর চতুর্থ লক্ষণ। গীতা বলে, দিব্যকর্মী সর্ববিধ দ্বন্দ্ব অতিক্রম করিয়াছেন, তিনি দ্বন্দ্বাতীত। আমরা দেখিয়াছি যে, তিনি জয়-পরাজয়, কৃতকার্যতা-অকৃতকার্যতা সবই সমান চক্ষে দেখেন এবং তাঁহার চিত্ত কিছুতেই বিচলিত হয় না; কিন্তু শুধু ইহাই নহে, তিনি সকল দ্বন্দ্বের উপরে উঠিয়া তাহাদের সামঞ্জস্য সাধন করেন। সংসারের ঘটনানিচয়ের সম্বন্ধে সাধারণ মনুষ্যের মনোভাব যেসকল বাহ্য ভেদাভেদের দ্বারা নির্ণীত হইয়া থাকে, দিব্যকর্মী সেসকল ভেদাভেদকে তত বড় করিয়া দেখেন না। তিনি এই সকল ভেদাভেদ অস্বীকার করেন না বটে কিন্তু তিনি এই সকলের উপরে। শুভ ও অশুভ ঘটনার প্রভেদ সকাম মনুষ্যের পক্ষে গুরুতর ব্যাপার, কিন্তু নিষ্কাম দিব্য পুরুষের নিকট শুভ ও অশুভ উভয়ই সমান আদরের, কারণ ইহাদের সংমিশ্রণের দ্বারাই সনাতন শুভের ক্রমবিকাশশীল রূপ গড়িয়া উঠিতেছে। তাঁহার পরাজয় নাই কারণ তাঁহার পক্ষে সমস্ত ঘটনাই প্রকৃতির কুরুক্ষেত্রে দিব্যজয়ের দিকেই চলিয়াছে—এই যে কর্মক্ষেত্রের ভিতর দিয়া ধর্মের বিকাশ হইতেছে, ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে, এখানকার প্রত্যেক ঘটনাই এই যুদ্ধের অধিনায়ক, কর্মসকলের ঈশ্বর, ধর্মের দিশারী ভগবানের সর্বদর্শী দৃষ্টি দ্বারা পূর্ব হইতেই ঠিক করা আছে। মানুষের সম্মান বা অপমান, প্রশংসা বা নিন্দা দিব্যকর্মীকে বিচলিত করিতে পারে না, কারণ তাঁহার কার্যের একজন মহত্তর স্বচ্ছদৃষ্টি সম্পন্ন বিচারকর্তা আছেন, এক স্বতন্ত্র মানদণ্ডও আছে; এবং তাঁহার কর্মের প্রেরণা সাংসারিক পুরস্কারের উপর এতটুকুও নির্ভর করে না। ক্ষত্রিয় অর্জুন স্বভাবতই যশ ও মানের আদর করিবেন, অপমান ও কাপুরুষ অপবাদকে মৃত্যু অপেক্ষাও অধিক বলিয়া পরিত্যাগ করাই তাঁহার পক্ষে

ঠিক, কারণ মর্যাদা রক্ষা করা, জগতে সাহসিকতার আদর্শ অটুট রাখা তাঁহার ধর্মের অঙ্গ, কিন্তু মুক্তপুরুষ অর্জুনের পক্ষে এসব বিষয় গ্রাহ্য করিবার কোনও প্রয়োজন নাই, তাঁহাকে শুধু জানিতে হইবে যে, কর্ত্তব্যম্ কর্ম্ম কি, ভগবান তাঁহার নিকট কোন্ কর্ম দাবি করিতেছেন, ভগবানে ফলাফল সমর্পণ করিয়া তাঁহাকে সেই কর্মই করিতে হইবে। এমনকি তিনি পাপ-পুণ্যের প্রভেদেরও উপরে উঠিয়াছেন, যাহারা অহঙ্কারের প্রভাব খর্ব করিবার চেষ্টা করিতেছে, রিপুগণের প্রচণ্ড বশ্যতা হইতে মুক্তি পাইবার চেষ্টা করিতেছে, তাহাদের পক্ষে পাপ-পুণ্যের প্রভেদ একান্ত আবশ্যক—কিন্তু যিনি মুক্ত তিনি এই সকল চেষ্টার উপরে উঠিয়াছেন এবং সাক্ষী প্রবুদ্ধ আত্মার পবিত্রতায় সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। পাপ তাঁহা হইতে খসিয়া পড়িয়াছে এবং তিনি যে চূড়ায় উঠিয়াছেন, যে আসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, অসৎকর্মে তাহার ক্ষয় নাই বা সৎকর্মে তাহার বৃদ্ধি নাই, তাহা অহংভাবশূন্য দিব্য প্রকৃতির অবিচ্ছেদ্য অপরিবর্তনীয় পবিত্রতা। সেখানে পাপ-পুণ্য বোধের কোন স্থান নাই, কোন উপযোগিতা, প্রয়োজনীয়তা নাই।

অজ্ঞানের অধীন অর্জুন হৃদয়ের মাঝে ন্যায় ও ধর্মের প্রেরণা উপলব্ধি করিতে পারেন এবং মনে মনে বিচার করিতে পারেন যে, যুদ্ধ হইতে বিরত হওয়া তাঁহার পক্ষে পাপ হইবে কারণ অত্যাচারী শক্তিকে বাড়িতে দিলে দেশের উপর, জাতির উপর যে অন্যায়, অত্যাচার, অবিচার হইবে সেসবের দায়িত্ব তাঁহারই উপর পড়িবে, অথবা তিনি হৃদয়ে হিংসা ও নরহত্যার প্রতি বিতৃষ্ণা অনুভব করিতে পারেন এবং মনে মনে বিচার করিতে পারেন যে, সকল অবস্থাতেই রক্তপাত পাপ এবং কিছুতেই ইহার সমর্থন করা যায় না। এই দুই প্রকার মনোভাবই সমানভাবে ন্যায্য ও যুক্তিসঙ্গত, ইহাদের মধ্যে তাঁহার মনে কোন্‌টির জয় হইবে বা জগৎ কোন্‌টিকে গ্রাহ্য করিবে তাহা অবস্থা কাল ও পাত্রের উপর নির্ভর করে। অথবা, শত্রুর বিরুদ্ধে বন্ধুদিগকে সাহায্য করিতে, অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে ন্যায় ও শুভকে সমর্থন করিতে অর্জুন কেবল মর্যাদাবোধ ও হৃদয়বৃত্তির প্রেরণাতেই নিজেকে বাধ্য মনে করিতে পারেন। কিন্তু মুক্ত পুরুষের দৃষ্টি এই সব বিরোধী আদর্শ ও নীতিকে অতিক্রম করে, তিনি শুধু দেখেন যে, ধর্মের রক্ষা অথবা বিকাশের নিমিত্ত প্রয়োজন বলিয়া ভগবান তাঁহার নিকট কি চাহেন। তাঁহার নিজের ব্যক্তিগত কোন উদ্দেশ্য সাধন করিবার নাই, নিজের ব্যক্তিগত কোন রাগ দ্বেষ তৃপ্ত করিবার নাই, তাঁহার কর্মের এমন কোন চিরনির্দিষ্ট নীতি বা আদর্শ নাই যাহা বিকাশশীল মানবজাতির ক্রমোন্নতির পথে বাধাস্বরূপ হয় অথবা অসীমের ডাককে তুচ্ছ করিয়া বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়। তাঁহার নিজের কোন শত্রু জয় করিবার বা বধ করিবার নাই, তিনি কেবল দেখেন যে, যাহারা তাঁহার বিরোধী তাহারা বাধাপ্রদানের দ্বারাই নিয়তির গতিকে সাহায্য করিবার নিমিত্ত ভবিতব্য ও ঘটনাচক্রের দ্বারা তাঁহার বিরুদ্ধে আনীত হইয়াছে। তাহাদের বিরুদ্ধে তাঁহার কোন ক্রোধ বা বিদ্বেষ থাকিতে পারে না, কারণ দিব্য প্রকৃতিতে ক্রোধ বা বিদ্বেষের

কোন স্থান নাই। বাধামাত্রকেই ভাঙিযা ফেলিবাব, ধ্বংস কবিবাব যে আকাঙ্ক্ষা অসুবেব মধ্যে আছে, যে ভীষণ বক্ত-পিপাসা বাক্ষসেব আছে, তাঁহাব ধীবতা, শান্তি এবং সর্বতোমুখী সহানুভূতি ও জ্ঞানেব মধ্যে সেসব অসম্ভব। তিনি কাহাবও অনিষ্ট করিতে চান না, ববং সকলেব প্রতি তাঁহাব বন্ধুভাব ও করুণা, অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ। কিন্তু হৃদয় স্নায়ু ও বক্তমাংসেব শিহবণজনিত যে অনুকম্পা সাধাবণত মনুষ্যেব মধ্যে দেখিতে পাওযা যায, এই দেবোচিত করুণা তাহা হইতে বিভিন্ন, ইহা হইতেছে মানুষেব উপব দিব্য পুরুষেব করুণাদৃষ্টি, সকল জীবকেই তিনি নিজের মধ্যে দেখেন। আবাব মুক্ত পুরুষ যে শাবীবিক জীবনটাকেই সবচেয়ে বড কবিয়া দেখেন তাহাও নহে, ইহাব উপব যে আত্মার জীবন আছে সেই দিকেই তিনি লক্ষ্য বাখেন এবং এই শবীবেব জীবনকে কেবল যন্ত্রমাত্র বলিযাই জানেন। তিনি সহসা হত্যাকাণ্ড বা যুদ্ধ কবিতে অগ্রসব হন না, কিন্তু যদি ধর্মের স্রোতে যুদ্ধ আসিযা পডে তাহা হইলে তিনি পশ্চাৎপদ হন না, উদার সমতা ও পূর্ণ জ্ঞানেব সহিত সেই ধর্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত হন, এবং তাঁহাকে যাহাদের প্রভুত্বেব শক্তি ও জয়েব উল্লাস নষ্ট কবিতে হয তাহাদেব প্রতি তাঁহাব সহানুভূতির কোন অভাব হয় না।

কাবণ তিনি সর্বত্র দুইটি জিনিস দেখেন, তিনি দেখেন যে, ভগবান সর্বভূতে সমানভাবে বিবাজ করিতেছেন, কেবল সাময়িক ঘটনাক্রমে সর্বত্র ভগবানেব প্রকাশ সমান নহে। পশু ও মানবে, কুক্কুবে, অস্পৃশ্য চণ্ডালে, বিদ্যাবিনযসম্পন্ন ব্রাহ্মণে, সাধুতে ও পাপীতে, উদাসীনে, শত্রুতে এবং বন্ধুতে, শুভকাবীতে এবং অনিষ্টকাবীতে—সর্বত্র তিনি নিজেকে দেখেন, ভগবানকে দেখেন এবং সকলেব প্রতিই তাঁহাব অন্তবে সমান দযা, দিব্য ভালবাসা। ঘটনাচক্রে তিনি হযতো কাহাকেও বাহ্যত আলিঙ্গনে বদ্ধ কবেন, আবাব কাহাকেও বাহ্যত যুদ্ধে আক্রমণ করেন—কিন্তু তাঁহাব সমদৃষ্টি, উন্মুক্ত হৃদয় এবং সকলেব প্রতি তাঁহাব আন্তবিক ভালবাসাব কখনও প্রত্যবায় হয় না। তাঁহাব সকল কর্মেব মূলে একই অধ্যাত্মনীতি থাকে, পূর্ণতম সমতা এবং একই কর্মনীতি থাকে—মানবজাতিকে ক্রমশ ভগবানের দিকে লইযা যাইবার উদ্দেশ্যে তাঁহাব মধ্যে ভগবৎ-ইচ্ছাব প্রেবণা।

দিব্যকর্মীব আব এক লক্ষণ হইতেছে, পূর্ণ আন্তবিক আনন্দ ও শান্তি (ইহা দিব্য চৈতন্যেবও মূলতত্ত্ব); ইহার উৎপত্তি ও স্থায়িত্ব জগতেব কিছুব উপবই নির্ভব কবে না; এই পূর্ণ আনন্দ ও শান্তি আত্মাব চৈতন্যেব মূল উপাদান, দিব্য সত্তাব ইহাই প্রকৃত স্বরূপ। সাধাবণ মানব তাহাব সুখেব জন্য বাহ্য বস্তুব উপব নির্ভব করে; অতএব তাহাব বাসনা আছে, সেই জন্যই তাহাব আছে ক্রোধ ও বিক্ষোভ, সুখ ও দুঃখ, হর্ষ ও শোক; সেই জন্যই সমস্ত জিনিসকে সে সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যেব মানদণ্ডে ওজন করে। ইহাদেব কোনটিই দিব্য পুরুষকে বিচলিত কবিতে পাবে না, তিনি কোন কিছুব উপব নির্ভর না কবিযা সদাই পবিতৃপ্ত, নিত্যতৃপ্তো নিবাশ্রযঃ, কাবণ তাঁহার আনন্দ, তাঁহার দিব্য স্বস্তি, তাঁহাব সুখ, তাঁহাব প্রসন্ন জ্যোতি—সবই

নিত্য, তাঁহাব অন্তবস্থিত, তাঁহাব অঙ্গীভূত, আত্মবতিঃ, অন্তঃসুখোঽন্তবা-বামস্তথান্তর্জ্যোতিবেব যঃ। দিব্য পুরুষ বাহ্য বস্তু হইতে যে আনন্দ পান তাহা ঐ বস্তুব জন্য নহে, ঐ বস্তু যে তাঁহাব কোন অভাব বা আকাঙ্ক্ষা পূবণ করে সেজন্য নহে পবন্তু ঐ সকল বস্তুতে যে আত্মা বহিযাছে, ভগবানেব প্রকাশ রহিয়াছে, ঐ সকল জিনিসেব মধ্যে যাহা নিত্য এবং কখনও তাঁহাব অগোচর হইতে পারে না তাহাব জন্যই তিনি ঐ সকল বস্তুতে আনন্দ পান। বাহ্য বস্তুব স্পর্শে তাঁহাব কোনরূপ আসক্তি নাই, কিন্তু তিনি নিজের আত্মাতে যে আনন্দ পান সকল বস্তুতেই সেই আনন্দ পাইযা থাকেন কাবণ এই সব বস্তুর আত্মা এবং তাঁহার নিজেব আত্মা এক, তিনি সর্বভূতেব আত্মাব সহিত একাত্মা হইয়াছেন, তাহাদের সকল ভেদেব মধ্যেও যে এক সম-ব্রহ্ম বহিযাছে সেই ব্রহ্মেব সহিত তিনি যুক্ত হইযাছেন, ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা (৫।২১), সর্বভূতাত্ম-ভূতাত্মা (৫।৭)। তিনি সুখময় জিনিসেব স্পর্শে উল্লসিত হন না বা দুঃখময় জিনিসেব স্পর্শে যন্ত্রণা বোধ কবেন না, কোন জিনিসেব ব্যথা, কোন বন্ধুর দেওযা বেদনা, শত্রুর আঘাত—কিছুই তাহাব হৃদয বা মনেব স্থৈর্য নষ্ট করিতে পাবে না, তাঁহার আত্মা স্বভাবত (উপনিষদেব ভাষায়) অব্রণম্, ক্ষতশূন্য বা ব্যথাশূন্য। সকল জিনিসেই তাঁহার একই অক্ষয আনন্দ—

বাহ্যস্পর্শেষ্বসক্তাত্মা বিন্দত্যাত্মনি যৎ সুখম্।
স ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা সুখমক্ষযমশ্নুতে॥৫।২১

এই সমতা, নৈর্ব্যক্তিকতা, শান্তি, আনন্দ, মুক্তি, কর্ম কবা-বা-না-করাব ন্যায বাহ্য ব্যাপারেব উপব নির্ভব কবে না। বাহ্য ও আভ্যন্তবীণ ত্যাগের প্রভেদের উপব, "সন্ন্যাস" ও "ত্যাগেব" প্রভেদেব উপব গীতায পুনঃপুনঃ জোর দেওয়া হইযাছে। গীতাব মতে আভ্যন্তবীণ ত্যাগ ভিন্ন বাহ্য ত্যাগেব কোন মূল্যই নাই, প্রথমটি ভিন্ন দ্বিতীযটি প্রায অসম্ভব; আবাব যেখানে আভ্যন্তবীণ মুক্তি আছে সেখানে বাহ্য সন্ন্যাসেব কোন প্রযোজনই নাই। বাস্তবিকপক্ষে "ত্যাগ"ই (আভ্যন্তবীণ ত্যাগ) প্রকৃত এবং যথোচিত সন্ন্যাস,

জ্ঞেযঃ স নিত্যসন্ন্যাসী যো ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি।
নির্দ্বন্দ্বো হি মহাবাহো সুখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে॥৫।৩

"যিনি দ্বেষ কবেন না, আকাঙ্ক্ষাও করেন না তাঁহাকে নিত্যসন্ন্যাসী বলিযা জানিতে হইবে, দ্বন্দ্ব হইতে মুক্ত এইরূপ ব্যক্তি অনাযাসে সকল প্রকাব বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ কবেন।" দুঃখদাযক (দুঃখমাপ্তুম্) বাহ্য সন্ন্যাসেব কোন প্রযোজন নাই। সমস্ত কর্ম এবং কর্মফল যে সন্ন্যাস কবিতে হইবে, ত্যাগ করিতে হইবে, তাহাতেও কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু এই সন্ন্যাস বাহ্য নহে, আভ্যন্তবীণ, প্রকৃতিব তামসিকতায সমস্ত সমর্পণ কবিতে হইবে না, কিন্তু সমস্ত কর্মফল যজ্ঞরূপে

পবমেশ্বরকে অর্পণ কবিতে হইবে, নৈর্ব্যক্তিক সত্তাব বিবাট শান্তি ও আনন্দেব মধ্যে সমর্পণ কবিতে হইবে—এই সত্তা হইতে সমস্ত কর্ম উৎপন্ন হইলেও উহাব শান্তি কিছুমাত্র বিচলিত হয না। সমস্ত কর্ম ব্রহ্মে সমর্পণ কবাই প্রকৃত কর্ম-সন্ন্যাস,

ব্রহ্মণ্যাধায কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা কবোতি যঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা॥৫।১০

"যিনি আসক্তি পবিত্যাগ কবিয়া, সমস্ত কর্ম ব্রহ্মে সমর্পণ কবিযা (অথবা ব্রহ্মকে কর্মেব আধার বা ভিত্তি কবিযা) কর্ম কবেন, জলে কমল পত্রেব ন্যায তিনি পাপে লিপ্ত হন না।

কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা কেবলৈবিন্দ্রিযৈবপি।
যোগিনঃ কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বাত্মশুদ্ধযে॥৫।১১
যুক্তঃ কর্ম্মফলং ত্যক্ত্বা শান্তিমাপ্নোতি নৈষ্ঠিকীম্।
অযুক্তঃ কামকাবেণ ফলে সক্তো নিবধ্যতে॥৫।১২

—অতএব "যোগিগণ প্রথমে শবীব, মন ও বুদ্ধিব দ্বাবা, এমনকি কেবল কর্মেন্দ্রিযেব দ্বারাই অনাসক্ত হইয়া আত্মশুদ্ধিব জন্য কর্ম কবিযা থাকেন। ব্রহ্মেব সহিত যুক্ত ব্যক্তি কর্মেব ফলে আসক্তি পবিত্যাগ কবিযা ব্রহ্মনিষ্ঠাব ঐকান্তিক শান্তি লাভ করেন, কিন্তু যে ব্যক্তি এরূপ ব্রহ্মে যুক্ত নহেন তিনি কর্মফলে আসক্ত হন এবং বাসনার বশে কর্ম কবিযা বদ্ধ হন।" এই প্রতিষ্ঠা, শুদ্ধি ও শান্তি একবাব লাভ কবিতে পাবিলে দেহী আত্মা তাহাব প্রকৃতিকে সম্পূর্ণভাবে বশীভূত কবিযা এবং সমস্ত কর্ম মনেব দ্বারা (বাহ্যভাবে নহে, আভ্যন্তবীণভাবে) সন্ন্যাস কবিযা "নবদ্বারবিশিষ্ট পুরবৎ দেহে কর্ম না কবিযা এবং না কবাইযা অবস্থান কবেন",

সর্ব্বকর্ম্মাণি মনসা সংন্যস্যাস্তে সুখং বশী।
নবদ্বাবে পুবে দেহী নৈব কুর্ব্বন্ ন কাবযন্॥৫।১৩

কাবণ এই আত্মাই সকলেব অন্তবস্থিত এক নৈর্ব্যক্তিক আত্মা, সর্বব্যাপী পবমেশ্বর, "প্রভু", "বিভু", ইনি নৈর্ব্যক্তিক সত্তায সংসাবেব কোন কর্ম সৃষ্টি কবেন না, মনের কর্তৃত্বভাবও ইনি সৃষ্টি কবেন না, কর্মেব সহিত কর্মফলেব সংযোগ অর্থাৎ কার্যকাবণ শৃঙ্খলও তিনি সৃষ্টি কবেন না। মানুষেব মধ্যে যে প্রকৃতি বহিয়াছে, "স্বভাব", তাহাব আত্মবিকাশেব মূল শক্তি, সেই স্বভাবই এই সকল সৃষ্টি করিয়া থাকে—

ন কর্ত্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ।
ন কর্ম্মফলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে॥৫।১৪

এই সর্বব্যাপী নৈর্ব্যক্তিক সত্তা কাহাবও পাপ বা পুণ্য গ্রহণ কবেন না, জীবেব

অজ্ঞান হইতে, কর্তৃত্বেব অহঙ্কাব হইতে, নিজেব পরম সত্তা সম্বন্ধে অজ্ঞান হইতে, প্রকৃতিব ক্রিয়াব সহিত জডিতভাব হইতে সকল পাপপুণ্যের উৎপত্তি; তাহার মধ্যে আত্মজ্ঞান যখন এই অন্ধকাবময় আববণ হইতে মুক্ত হয, সেই জ্ঞান সূর্যের ন্যায় ভিতরেব সত্য আত্মাকে প্রকাশিত করে; তখন সে নিজেকে প্রকৃতির যন্ত্রসমূহেব উপরিস্থিত পবম আত্মা বলিযা জানিতে পারে। শুদ্ধ, অনন্ত, অবিকার্য, অক্ষব, সে আর বিচলিত হয় না; প্রকৃতিব ক্রিয়ার দ্বারা যে তাহার কোনরূপ পবিবর্তন হইতে পাবে, তখন আর এ ধাবণা থাকে না। নিজেকে সেই নৈর্ব্যক্তিক সত্তাব সহিত সম্পূর্ণভাবে এক করিয়া, সেও প্রকৃতির বন্ধনে পুনরাবৃত্তি হইতে নিজেকে মুক্ত কবিতে পারে,

নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং ন চৈব সুকৃতং বিভুঃ।
অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ॥৫।১৫
জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেষাং নাশিতমাত্মনঃ।
তেষামাদিত্যবজ্জ্ঞানং প্রকাশযতি তৎ পরম্॥৫।১৬
তদ্বুদ্ধয়স্তদাত্মানস্তন্নিষ্ঠাস্তৎপরাযণাঃ।
গচ্ছন্ত্যপুনবাবৃত্তিং জ্ঞাননির্ধূতকল্মষাঃ॥৫।১৭

অথচ এইরূপ মুক্তিতে তাহাব কর্ম কবিবাব কোন বাধাই হয় না। কেবল তাহাব এই জ্ঞান থাকে যে, সে নিজে ক্রিযাপর নহে, বাস্তবিকপক্ষে প্রকৃতির গুণত্রযই সমুদয কর্ম কবে,

নৈব কিঞ্চিৎ কবোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ।
পশ্যন্ শৃন্বন্ স্পৃশন্ জিঘ্রন্নশ্নন্ গচ্ছন্ স্বপন্ শ্বসন্॥৫।৮
প্রলপন্ বিসৃজন্ গৃহ্নন্ উন্মিষন্ নিমিষন্নপি।
ইন্দ্রিযাণীন্দ্রিয়ার্থেষু বর্ত্তন্ত ইতি ধারযন্॥৫।৯

"তত্ত্ববিৎ ব্যক্তি (নিষ্ক্রিয় নৈর্ব্যক্তিক সত্তাব সহিত) যুক্ত থাকিয়া মনে কবেন—'আমি কিছুই কবিতেছি না', তিনি যখন দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শ, ঘ্রাণ, আহার, গমন, নিদ্রা, শ্বাস, কথন, ত্যাগ, গ্রহণ, চক্ষু উন্মোচন ও চক্ষু নিমীলন করেন তখন তিনি এই ধাবণা কবেন যে, শুধু ইন্দ্রিযগণই বিষয়েব উপর ক্রিয়া কবিতেছে।" তিনি অক্ষব, অবিকার্য পুরুষেব সত্তায সুপ্রতিষ্ঠিত থাকায় গুণত্রয়েব কবল হইতে ঊর্ধ্বে বিবাজ কবেন, ত্রিগুণাতীত; তিনি সাত্ত্বিকও নহেন, বাজসিকও নহেন, তামসিকও নহেন, তাঁহাব কর্মে প্রাকৃতিক গুণসমূহের যে ক্রমান্বয় পরিবর্তন চলে, জ্যোতি ও সুখেব, কর্ম ও শক্তিব, বিশ্রাম ও জডিমার যে ছন্দোবদ্ধ লীলা চলে, সেসব তিনি নির্মল শান্তভাবে নিবীক্ষণ করেন। শান্ত আত্মাব এই ঊর্ধ্বস্থিতি, দ্রষ্টাভাবে নিজেব কর্মকে নিবীক্ষণ করা অথচ তাহাতে জড়িত বা বদ্ধ না হওযা, এই ত্রৈগুণাতীত্য দিব্যকর্মীব আব একটি মহৎ চিহ্ন। শুধু এই ভাব

হইতে প্রকৃতিব অন্ধনিয়মবাদেব উৎপত্তি হইতে পাবে, পুরুষ সম্পূর্ণভাবে উদাসীন ও দাযিত্বহীন, এইরূপ মতবাদেব উদ্ভব হইতে পাবে, কিন্তু, এরূপ মত অসম্পূর্ণ চিন্তাব ফল, এই মত গীতা জ্ঞানদীপ্ত পুরুষোত্তম-তত্ত্বেব দ্বাবা পূর্ণভাবে নিবসন করিয়াছে। গীতার এই মত হইতে স্পষ্ট বুঝা যায যে, শেষ পর্যন্ত প্রকৃতি নিজেব কার্য নিজেই অন্ধভাবে নির্ণয করে না, পবম পুরুষেব ইচ্ছাই প্রকৃতিকে প্রেবণা দেয়; যিনি পূর্বেই ধার্তরাষ্ট্রগণকে নিধন কবিয়া বাখিযাছেন, অর্জুন যাঁহাব কর্মেব মানবীয় যন্ত্র মাত্র, সেই বিশ্বপুরুষ, সেই প্রপঞ্চাতীত ভগবানই প্রকৃতিব কর্মেব অধীশ্বর। আমাদের ব্যক্তিগত কর্তৃত্বেব অহঙ্কাব হইতে মুক্তিলাভ কবিবাব উপাযস্বরূপই আমাদিগকে নৈর্ব্যক্তিক সত্তায় সকল কর্ম অর্পণ কবিতে হয, কিন্তু, শেষপর্যন্ত আমাদের লক্ষ্য হইতেছে সকল কর্ম সর্বভূতমহেশ্বরে, সকলেবই যিনি পবমেশ্বর তাঁহাকে সমর্পণ কবা।

ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা।
নিরাশীর্নির্ম্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ॥৩।৩০

আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইযা, আমাতে তোমাব সমস্ত কর্ম সন্ন্যাস কবিযা, ব্যক্তিগত আশা আকাঙ্ক্ষা হইতে মুক্ত হইয়া, "আমি" এবং "আমাব" ভাব বর্জন করিয়া, 'বিগতজ্বরঃ' হইয়া যুদ্ধ কর, কর্ম কর, জগতে আমাব ইচ্ছা সম্পাদন কব। ভগবানই সমগ্র কর্মটি উদ্ভাবন কবেন, নির্দেশ কবেন, নিযন্ত্রণ কবেন; যে মানব ব্রহ্মেব মধ্যে নৈর্ব্যক্তিক ভাব লাভ কবিযাছেন, তিনি হন ভগবানেব শক্তিব শুদ্ধ, নীবব আধার (channel); প্রকৃতিতে আবির্ভূত ঐ শক্তি দিব্য কর্মধাবাটি সম্পাদন করে। কেবল এই প্রকারেব কর্মই মুক্ত পুরুষেব কর্ম, মুক্তস্য কর্ম, কাবণ কোথাও তিনি ব্যক্তিগত প্রবৃত্তিব বশে কর্ম কবেন না, এই প্রকাবেব কর্ম হয সিদ্ধ কর্মযোগীব। সেসব কর্ম মুক্ত আত্মা হইতে উত্থিত হয এবং আত্মাকে কোনরূপ বিকৃত না কবিযাই চলিয়া যায, ঠিক যেমন গভীব সমুদ্রে ঢেউ উঠিযা আবাব মিশিযা যায,

গতসঙ্গস্য মুক্তস্য জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ।
যজ্ঞায়াচবতঃ কর্ম্ম সমগ্রং প্রবিলীযতে॥৪।২৩

ঊনবিংশ অধ্যায

সমতা

যেহেতু জ্ঞান, নিষ্কামতা, নৈর্ব্যক্তিকতা, সমতা, আভ্যন্তরীণ স্বপ্রতিষ্ঠ শান্তি ও আনন্দ এবং ত্রৈগুণাতীত্য মুক্ত পুরুষের লক্ষণ, সেই হেতু তাহার সকল কর্মে ঐ সকল গুণ থাকিবেই। সংসাবের সকল আঘাত, সকল দ্বন্দ্ব, সকল ঘটনার মধ্যে সে যে অবিচলিত শান্তভাব বক্ষা করে, তাহাব জন্য ঐগুলি একান্ত প্রয়োজন। সমস্ত পবিবর্তনেব মধ্যে ব্রহ্মের যে সমতাপূর্ণ অক্ষরভাব, এই শান্তভাব তাহাবই প্রতিচ্ছায়া; বিশ্বেব বহুর মধ্যে যে অখণ্ড পক্ষপাতশূন্য একত্ব চিরকাল অনুস্যূত বহিযাছে, এই শান্তভাব তাহারই। কারণ জগতের অসংখ্য ভেদ ও বৈষম্যেব মধ্যে এই এক ব্রহ্মই সমতা রক্ষা কবিতেছে; এবং ব্রহ্মের সমতাই একমাত্র প্রকৃত সমতা। কারণ জগতের অন্যান্য বিষয়ে কেবলমাত্র সাদৃশ্য বা সামঞ্জস্য থাকিতে পাবে; কিন্তু জগতেব সর্বাপেক্ষা অধিক সদৃশ বস্তুসমূহের মধ্যেও আমবা অসমতা ও ভেদ দেখিতে পাই এবং অসমান বস্তুসমূহকে পবস্পবের সহিত সুসংবদ্ধ করিযাই জগতে সামঞ্জস্য ও শৃঙ্খলা স্থাপন করা যাইতে পাবে।

এই জন্যই গীতা কর্মযোগেব লক্ষণের মধ্যে সমতার উপর এত অধিক জোর দিযাছে, মুক্ত আত্মা যে মুক্তভাবে জগতের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হয়, এই সমতাই তাহাব সন্ধিস্থল। মুক্তপুরুষ যতক্ষণ আত্মজ্ঞান, নিষ্কামতা, নৈর্ব্যক্তিকতা, আনন্দ, ত্রৈগুণাতীত্য লইযা সংসাব হইতে সবিয়া নিজেব মধ্যে নিজেকে লইযাই থাকে, নিষ্ক্রিয অবস্থায থাকে, ততক্ষণ সমতাব কোন প্রয়োজন হয না; কারণ যেসকল বস্তুতে সমতা ও অসমতাব দ্বন্দ্ব আছে সেসকল বস্তু হইতে সে দূরে থাকে। কিন্তু যে মুহূর্তে আত্মা প্রকৃতিব ক্রিযাব বহুত্ব, নামরূপ, ভেদ, বৈষম্যের মধ্যে আসে তখনই তাহার মুক্ত অবস্থাব অপব লক্ষণগুলিকে এই সমতাব ভিতর দিয়াই কার্যে পবিণত কবিতে হয়। একমেবাদ্বিতীয়ম্ ব্রহ্মেব সহিত একত্বের উপলব্ধিই জ্ঞান; জগতেব বহু জীব ও বিভিন্ন বস্তুব সম্পর্কে থাকিয়া এই জ্ঞানকে সত্য করিয়া তুলিতে হইলে, সকলেব সহিত সমান একত্ব অনুভব করিতে হইবে। এই নৈর্ব্যক্তিকতাতেই এক অক্ষব আত্মা জগতে তাহার বহু নাম-রূপের বৈচিত্র্যের অতীত, জগতেব বিভিন্ন নামরূপেব সহিত ব্যবহারে আত্মাব নৈর্ব্যক্তিকতা প্রকাশিত হয সকলেব প্রতি সম ও নিরপেক্ষ ব্যবহাব করিয়া; অবশ্য সকলের সহিত যে একই প্রকাব ব্যবহার করিতে হইবে তাহা নহে—যাহার সহিত যেরূপ সম্বন্ধ তাহাব সহিত সেইরূপ ব্যবহার করিতে হইবে, অবস্থা ও সম্বন্ধ ভেদে ব্যবহাবেবও প্রকারভেদ হইবে বটে কিন্তু সকলের প্রতি সকল ব্যবহারেই ভিতরের

ভাব সম ও নিরপেক্ষ রাখিতে হইবে। যেমন কৃষ্ণ গীতায় বলিয়াছেন,

সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্॥৯।২৯

তাঁহার প্রিয় কেহ নাই, তাঁহার ঘৃণাভাজনও কেহ নহে, তাঁহার ভিতরে সকলের প্রতিই সমভাব; তথাপি যে ব্যক্তি তাঁহার ভক্ত তাহার প্রতি তাঁহার বিশেষ দয়া, কারণ এরূপ ব্যক্তি ভগবানের সহিত যে সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছে তাহা আলাদা, এবং সকলেরই প্রভু সেই এক পক্ষপাতশূন্য ভগবান তাঁহার সমীপে যে যেভাবে আসে তাহাকে সেই ভাবেই গ্রহণ করেন। সংসারের বিভিন্ন কামাবস্তু আত্মাকে সীমার মধ্যে, বন্ধনের মধ্যে টানিতে চাহিতেছে— অসীম আত্মা তাহার নিষ্কামতায় এই টানের অতীত, আত্মাকে যখন এই সকল বস্তুর সম্পর্কে আসিতে হয়, তখন তাহার নিষ্কামতা প্রকাশ করিতে হইবে, তাহাদিগকে সমান উদাসীনভাবে এবং নিরপেক্ষভাবে গ্রহণ করিয়া অথবা সকল বস্তুতে সমান নিরপেক্ষ অনাসক্ত আনন্দবোধ ও প্রেমের দ্বারা; আত্মার সেই আনন্দ স্বপ্রতিষ্ঠ, তাহা কোন বাহ্য বস্তুর লাভালাভের উপর নির্ভর করে না, তাহা স্বরূপত অটল অক্ষয়। কারণ, আপনাতেই আত্মার আনন্দ, আর যদি জীবজগতের সম্পর্কের মধ্যেও সে এই আনন্দ পাইতে চায় তাহা হইলে কেবল এই ভাবেই আত্মা তাহার মুক্ত আধ্যাত্মিকতা প্রকট করিতে পারে। আত্মা প্রকৃতির গুণসমূহের স্বভাবত নিত্য চঞ্চল ও অসম ক্রিয়ার ঊর্ধ্বে এবং ইহাই আত্মার ত্রৈগুণাতীত্য, এই আত্মাকে যদি প্রকৃতির অসম দ্বন্দ্বপূর্ণ ক্রিয়ার সম্পর্কে আসিতে হয়, মুক্ত পুরুষ যদি নিজের প্রকৃতিকে কোনরূপ কর্ম করিতে দেয় তাহা হইলে সকল কর্ম, সকল ফল, সকল ঘটনার প্রতি নিরপেক্ষ সমভাবের দ্বারাই তাহার ত্রৈগুণাতীত্য প্রকাশ করিতে হইবে।

সমতা দিব্যকর্মীর লক্ষণও বটে আবার যাহারা এই পথে অগ্রসর হইতে চায় তাহাদের পরীক্ষাও বটে। আত্মার মধ্যে যদি অসমতার ভাব থাকে তাহা হইলে বাসনার খেলা, ব্যক্তিগত ইচ্ছা, অনুভূতি ও কর্মের খেলা, সাধারণ সুখ দুঃখ অথবা চাঞ্চল্য ও অতৃপ্তি সংযুক্ত যে আনন্দ বস্তুত আধ্যাত্মিক নহে পরন্তু মানসিক তৃপ্তি মাত্র, এই সব প্রকৃতির অসম খেলা কিছু-না-কিছু দেখিতে পাওয়া যায়। যেখানে আত্মার অসমতা আছে সেখানে জ্ঞান হইতে বিচ্যুতি আছে, সর্বব্যাপী সর্বসমন্বয়কারী ব্রহ্মের একত্বে এবং সকল বস্তুর সহিত ঐক্যের দৃঢ় প্রতিষ্ঠার অভাব আছে। এই সমতার দ্বারাই কর্মযোগী তাহার কর্মের মধ্যেও উপলব্ধি করে যে সে মুক্ত।

গীতা যে সমতার বিধান দিয়াছে তাহার স্বরূপ খুব উচ্চ ও ব্যাপক, সমতার এই আধ্যাত্মিক স্বরূপই এ বিষয়ে গীতাশিক্ষার বিশেষত্ব। কারণ, হৃদয় মন ও চিত্তের সমতা যে খুবই বাঞ্ছনীয় তাহা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন, এই শিক্ষা

কেবল যে গীতাতেই আছে তাহা নহে, এই সমতার অবস্থায় আমরা মানুষের স্বাভাবিক দুর্বলতার উপরে উঠি। সমতা সকল সময়েই দার্শনিক আদর্শ এবং জ্ঞানিজনোচিত স্বভাব বলিয়া প্রশংসিত হইয়াছে। গীতা এই দার্শনিক আদর্শকে গ্রহণ করিয়াছে বটে, কিন্তু ইহাকে আরও ঊর্ধ্বদেশে তুলিয়াছে যেখানে আমরা অধিকতর উদার ও নির্মল বায়ু সেবন করি। ইন্দ্রিয়াকর্ষণের ঘূর্ণী হইতে, বাসনার বিক্ষুব্ধতা হইতে উঠিয়া পরমতম ভগবানেরই দিব্য শান্তি ও আনন্দলাভ করিতে হইলে আত্মাকে যে অবস্থার মধ্যে দিয়া যাইতে হয় তাহার কেবল প্রথম ও দ্বিতীয় ধাপ হইতেছে কৃচ্ছ্র বা স্তোয়িক[১] সমতা (Stoic poise) ও দার্শনিক বা বিচারলব্ধ সমতা (*Philosophic poise*)। কৃচ্ছ্রসাধন ও কঠোর সহিষ্ণুতার দ্বারা যে আত্মজয় লাভ করা যায় তাহারই উপর স্তোয়িক সমতার প্রতিষ্ঠা। ইহা অপেক্ষা শান্তিময় সুখময় জ্ঞানলব্ধ আত্মজয়ের উপরেই দার্শনিক সমতার প্রতিষ্ঠা, বুদ্ধি ও বিচারের দ্বারা আমাদের প্রকৃতির বিপর্যয় সমূহের প্রতি উদাসীন ভাব অবলম্বন করিয়া (উদাসীনবদাসীন) এই সমতা লাভ করা যায়। সর্বদা ভগবানের ইচ্ছার সম্মুখে মাথা নত করিয়া থাকার ভাব, তাঁহার বিধান সর্বদা মাথা পাতিয়া লওয়ার ভাব আর এক প্রকারের সমতা, ইহাকে ধর্মভাবের সমতা বা খ্রীস্টান সমতা বলা যায়। এই তিনটি হইতেছে দিব্য শান্তিলাভের তিনটি ধাপ ও উপায়—বীরোচিত ভাবে সকল কষ্ট সহ্য করা, জ্ঞানের দ্বারা উদাসীন ভাব অবলম্বন করা, ধর্মভাবের বশে ভগবানের ইচ্ছার সম্মুখে মাথা পাতিয়া দেওয়া—"তিতিক্ষা", "উদাসীনতা", "নমঃ" বা "নতি"। গীতা তাহার উদার সমন্বয়ের রীতি অনুসারে এই তিন অবস্থাকেই গ্রহণ করিয়াছে এবং আত্মার উন্নতির উপায়স্বরূপ ইহাদের মিশ্রণ ও সমন্বয় সাধন করিয়াছে, কিন্তু প্রত্যেকটিকেই গীতা গভীরতর ভিত্তি, বৃহত্তর লক্ষ্য, উচ্চতর ও ব্যাপকতর সার্থকতা দান করিয়াছে। কারণ গীতা এই তিন অবস্থারই ভিত্তি আত্মার শক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে এবং এই আধ্যাত্মিক সত্তার শক্তি চরিত্রবল

[১] গ্রীক Stoic সম্প্রদায়কে নির্দেশ করিতে আমরা "স্তোয়িক" শব্দই ব্যবহার করিলাম। এই সম্প্রদায়ের মত হইতেছে, সুখদুঃখ বোধ হৃদয়ের দুর্বলতা ভিন্ন আর কিছুই নহে, এই দুর্বলতাকে পদদলিত করিতে হইবে, মনের জোরে সুখদুঃখকে জয় করিতে হইবে। এই ভাব বলদৃপ্ত অসুরের তপস্যা, ইহার মহত্ত্ব আছে, মানবের উন্নতিসাধনে প্রয়োজনও আছে, কিন্তু ইহা দুঃখজয়ের প্রকৃত উপায় নহে। এরূপ দৃঢ়নিগ্রহে মানবের হৃদয় শুষ্ক কঠোর প্রেমশূন্য হইয়া যায়। এইরূপ কৃচ্ছ্রসাধনে স্থায়ী উন্নতি নাই। তপস্যায় শক্তি হয় বটে কিন্তু এই জন্মে যাহা চাপিয়া রাখি, পরজন্মে তাহা সর্বরোধ ভাঙিয়া দ্বিগুণ বেগে উছলিয়া আসে। গীতা বলিয়াছে, প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি। গীতা যে সমতার শিক্ষা দিয়াছে, তাহা স্তোয়িক সমতার অনেক উপরের জিনিস। গীতার সমতায় হৃদয় শুষ্ক হয় না, গীতার সমতায় ভোগের স্থান আছে, গীতোক্ত সাধনায় সমতাবাদ ও শান্ত বা শুদ্ধভোগ একই পথ। তবে গীতোক্ত সমতালাভের সাধনায় প্রথমাবস্থায় স্তোয়িক সমতার দ্বারা হয়তো কিছু সাহায্য হইতে পারে, গ্রন্থের মধ্যেও এই বিষয় বিশদ করিয়া বলা হইয়াছে। —অনুবাদক।

অপেক্ষা মহত্তর, মানসিক বুদ্ধি বিচার অপেক্ষা মহত্তব, হৃদযেব আবেগ অপেক্ষা মহত্তব।

সাধারণ মানবাত্মা তাহার প্রাকৃত জীবনেব অভ্যস্ত বিক্ষোভসকলে একটা সুখ পায; এবং এই সুখ পায বলিযা সে নীচের প্রকৃতিব এই অশান্ত খেলাতে সায দেয়, সেই জন্যই এই খেলা চিবকাল চলিতে থাকে, কাবণ প্রকৃতি তাহাব প্রণযী ও ভোক্তা পুরুষেব সুখেব জন্য না হইলে এবং তাহাব অনুমতি না পাইলে কোন কর্মই করে না। আমবা এই সত্য ধবিতে পাবি না কাবণ বাস্তবিক যখন বিপদ আমাদেব স্কন্ধে আসিয়া পড়ে, তখন শোক, যন্ত্রণা, অসোযাস্তি, দুর্ভাগ্য, অকৃতকার্যতা, পবাজয, নিন্দা, অপমান প্রভৃতিব দ্বাবা আক্রান্ত হইযা মন সেই আঘাত হইতে পিছাইয়া পড়ে, আবাব ইহাদেব বিপবীত ও সুখময বিক্ষোভ উপস্থিত হইলে সকল প্রকাব তৃপ্তি, সৌভাগ্য, আনন্দ, কৃতকার্যতা, জয, গৌবব, প্রশংসাকে আলিঙ্গন কবিযা লইতে মন আগ্রহেব সহিত লাফাইযা উঠে, কিন্তু আত্মাব সংসাবলীলায যে আনন্দ ইহাতে তাহাব কোন ব্যতিক্রম হয না। মনেব সকল দ্বন্দ্বেব পশ্চাতে আত্মাব সে আনন্দ অক্ষুণ্ণ থাকে। যোদ্ধা তাহাব ক্ষতেব বেদনায় কোন শাবীবিক সুখ অনুভব কবে না, পবাজয়েও মানসিক তৃপ্তি লাভ করে না; কিন্তু যুদ্ধে তাহাব পূর্ণ আনন্দ, যুদ্ধে যে জযেব আনন্দ আছে তাহাব জন্য সে ক্ষত ও পবাজযেব সম্ভাবনাকেও ববণ কবিযা লয, এবং এই আশা আশঙ্কাব মিশ্রণ যুদ্ধের জন্য তাহাব প্রাণ আনন্দে নাচিযা উঠে। এমনকি তাহাব ক্ষতেব বেদনা স্মরণ করিয়াও সে সুখ ও গৌবব অনুভব কবে—ক্ষত যখন সাবিযা যায তখন এই সুখেব অনুভূতি পূর্ণ, ক্ষতেব যন্ত্রণাভোগেব কালেও অনেকসময সুখেব অনুভূতি থাকে এবং যন্ত্রণাবোধেব দ্বারাই সেই সুখ পুষ্ট হয। পবাজযেব মধ্যেও তাহার এই সুখ ও গৌরববোধ থাকে যে একজন অধিকতব বলশালী প্রতিদ্বন্দ্বীব বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে সে পশ্চাৎপদ হয নাই, অথবা যদি সে নীচ প্রকৃতিব লোক হয তবে এই পবাজযেব ফলে তাহাব ভিতবে যে ঘৃণা ও প্রতিহিংসা জাগিযা উঠে তাহার মধ্যেও সে একপ্রকাব নিষ্ঠুব আনন্দ উপভোগ কবে। এইরূপেই আত্মা সংসারের সাধারণ খেলায আনন্দ গ্রহণ কবে।

ব্যথা ও যন্ত্রণার ভয়ে মানুষ বিপদ ও উৎপাত হইতে সবিযা থাকিতে চায, আত্মরক্ষার নীতিকে (জুগুপ্সা) কার্যে পবিণত কবিবাব নিমিত্ত ইহাই প্রকৃতিব কৌশল—ব্যথা ও যন্ত্রণাব প্রতি মনেব এই বিবাগেব জন্য মানুষ এই বক্ত-মাংসেব ভঙ্গপ্রবণ দেহটাকে অযথা ধ্বংসেব মধ্যে লইয়া যায না এবং এইরূপেই আত্মহত্যা হইতে রক্ষা পায; জীবনেব পক্ষে উপকারী স্পর্শ সমূহে মানুষ সুখ পায এবং এই বাজসিক সুখের লোভ দেখাইয়াই প্রকৃতি মানুষকে জডতা হইতে তামসিকতা হইতে টানিযা কর্মে প্রবৃত্ত কবে এবং মানুষেব জয়, দ্বন্দ্ব, বাসনা, কামনাব ভিতব দিয়া নিজেব উদ্দেশ্য সিদ্ধ কবিযা লয। আমাদেব অন্তবাত্মা এই দ্বন্দ্ব ও চেষ্টাব মধ্যেই একটা সুখ পায়, এমনকি বিপদ, যন্ত্রণাতেও একপ্রকাব সুখ পায—

অতীতেব স্মৃতিতে সে সুখ খুবই পূর্ণ হইতে পাবে, কিন্তু বর্তমান বিপদ ও যন্ত্রণার মধ্যেও সে সুখবোধ পিছনে থাকে এবং অনেক সময সম্মুখে আসিযা বিপদগ্রস্ত মনুষ্যেব দুঃখ-যন্ত্রণাব মধ্যে ধৈর্য আনিযা দেয়; কিন্তু সংসাবের যে সুখ-দুঃখ-মিশ্রিত খেলাকে আমবা জীবন বলি তাহাব সমগ্রটিব দ্বাবাই বাস্তবিকপক্ষে আত্মা আকৃষ্ট হয, জীবনেব সমস্ত চেষ্টা ও বাসনা, বাগ, দ্বেষ, আশা, আকাঙ্ক্ষা, জীবনেব সকল প্রকাব বৈচিত্র্যই প্রকৃতপক্ষে আত্মাকে আকর্ষণ করে। আমাদের বাজসিক বাসনাময় আত্মাব কাছে একঘেযে সুখ ভাল লাগে না; বিনাযুদ্ধে যে জযলাভ, যে সুখে বিচ্ছেদ নাই, দুঃখেব ছাযা নাই, এই সবে বাজসিক আত্মা বেশীদিন তৃপ্তি অনুভব কবে না, শীঘ্রই এসব অরুচি, ক্লান্তি ও অবসাদ আনযন কবে, পশ্চাতে অন্ধকাবেব ছাযা না থাকিলে কোন আলোককে পূর্ণভাবে উপভোগ কবা একপ আত্মাব পক্ষে সম্ভব হয না, কারণ একপ আত্মা যে সুখ চায় ও উপভোগ কবে তাহাব স্বরূপই এই, তাহা আপেক্ষিক—তাহার বিপবীত দুঃখ দর্শনেব উপবেই সেই সুখ নির্ভব কবে—বিপবীত দুঃখেব আস্বাদ গ্রহণ না কবিলে সে সুখেব আস্বাদ পাওয়া যায না। আমাদের মন যে জীবনলীলায সুখ পায তাহাব গূঢ বহস্য এই যে, আমাদেব অন্তবাত্মা এই দ্বন্দ্বেব খেলায একপ্রকাব আনন্দ অনুভব কবে।

মনকে যদি বলা যায যে, এই সব দ্বন্দ্ব ছাডিয়া শুদ্ধ আনন্দময় আত্মাব অমিশ্র সুখেব মধ্যে উঠিতে হইবে, তাহাব সকল দ্বন্দ্বে এই শুদ্ধ আত্মাই তাহাকে শক্তি দিযাছে, ধবিযা বাখিয়াছে, তাহাব অস্তিত্ব সম্ভব করিযাছে—তাহা হইলে মন তৎক্ষণাৎ সে আহ্বান হইতে পিছাইয়া পড়িবে। সে এরূপ শুদ্ধ আত্মাব অস্তিত্বে বিশ্বাস কবে না, আব যদিই বা বিশ্বাস করে, তথাপি মনে করে যে, সেইরূপ উচ্চ অবস্থায জীবন নাই, সংসাবে সে যে বৈচিত্র্যময় খেলার রস পাইয়াছে ঐ উচ্চের অবস্থায সেই বস নাই; সে অবস্থা আস্বাদহীন, অরুচিকব। অথবা সে অনুভব কবে যে, ঐ উচ্চ অবস্থায উঠিতে যে কঠিন চেষ্টার প্রযোজন, তাহা তাহাব সামর্থ্যে কুলাইবে না, উপবে উঠিবার চেষ্টা হইতে সে পশ্চাৎপদ হয়, যদিও বাস্তবিকপক্ষে বাসনাময আত্মা যেসকল আশার স্বপ্ন দেখে সেসব সফল করা অপেক্ষা এই আধ্যাত্মিক পবিবর্তন সাধন মোটেই কঠিন নহে, অথবা এরূপ আত্মা তাহাব বাসনাব তৃপ্তিব জন্য অস্থাযী জিনিসেব পশ্চাতে উন্মত্তভাবে ধাবমান হইয়া যে বিপুল উদ্যম ও চেষ্টা কবে, বাস্তবিকপক্ষে আধ্যাত্মিক উন্নতিসাধনে তাহা অপেক্ষা বেশী চেষ্টা বা কষ্ট স্বীকাব করিতে হয না। তাহাব অনিচ্ছার প্রকৃত কারণ এই যে, সে যে অবস্থায বহিয়াছে সে অবস্থা ছাডাইয়া তাহাকে এমন এক উচ্চতর, শুদ্ধতব অবস্থায উঠিতে বলা হইতেছে যেখানকাব আনন্দেব স্বরূপ সে বুঝে না, কিন্তু তাহাব নীচেব অশুদ্ধ প্রকৃতিব যে আনন্দ সেইটিব সহিতই সে পবিচিত, কেবল সেইটিকেই সে বেশ বুঝিতে পাবে, ধরিতে পারে। এই নীচের অবস্থাতে যে আনন্দ তাহাও যে একেবাবে দোষেব বা অলাভেব তাহা নহে; আমাদেব জড়

সত্তা (material being) তামসিক অজ্ঞান ও জড়তার একান্ত অধীন, এই অবস্থার উপরে আমাদের মানবীয় প্রকৃতির বিকাশ করিতে হইলে রাজসিক দ্বন্দ্বময় জীবনের ভিতর দিয়া, বাসনাময় জীবনের ভিতর দিয়াই যাইতে হয়, মানুষকে যে স্তরে স্তরে ক্রমান্বয়ে উঠিয়া পরম জ্ঞান, শক্তি ও আনন্দ লাভ করিতে হয়, সেই ঊর্ধ্বগমনেরই পথে ইহা রাজসিক স্তর। গীতাতে এই স্তরকেই "মধ্যমা গতিঃ" বলা হইয়াছে, কিন্তু আমরা যদি চিরকাল এই স্তরেই পড়িয়া থাকি তাহা হইলে আমাদের ঊর্ধ্বগমন, আত্মার পূর্ণ বিকাশ অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। সাত্ত্বিক সত্তা ও স্বভাবের ভিতর দিয়া ত্রিগুণের অতীত অবস্থায় যাওয়াই আত্মার পূর্ণসিদ্ধি লাভের পন্থা।

নীচের প্রকৃতির বিক্ষোভসকল হইতে উপরে উঠিতে হইলে আমাদিগকে সমতার দিকেই যাইতে হইবে—মনের সমতা, ভাবের সমতা, আত্মার সমতা—ইহা ভিন্ন অন্য পথ নাই। তবে মনে রাখা উচিত যে, যদিও শেষপর্যন্ত আমাদিগকে নীচের প্রকৃতির তিন গুণের উপরে উঠিতে হইবে তথাপি প্রথম প্রথম আমাদিগকে এই তিন গুণের একটি না একটিকে আশ্রয় করিয়াই অগ্রসর হইতে হয়। সমতার আরম্ভ সাত্ত্বিক হইতে পারে, রাজসিক হইতে পারে অথবা তামসিক হইতে পারে, কারণ মানবচরিত্রে তামসিক সমতারও সম্ভাবনা আছে। এই সমতা খাঁটি তামসিক হইতে পারে, প্রকৃতিগত জড়তার বশে জীবনের আনন্দ উপভোগে অনিচ্ছা, সংসারের সুখদুঃখের আঘাতে অসাড়তা, ইহা খাঁটি তামসিক সমতার লক্ষণ। আবার, কামনা উপভোগের সঞ্চিত ক্লান্তি হইতে সমতা আসিতে পারে, অথবা সংসারযুদ্ধে নিরাশ ও পরাভূত হইয়া সংসারের জ্বালা যন্ত্রণার প্রতি বিরাগ আসিতে পারে, সাংসারিক ব্যাপারে অবসাদ, ভয় বা আতঙ্ক আসিতে পারে, এরূপ ভাব মিশ্রিতভাব, রজস্তামসিক, তবে ইহার মধ্যে নিম্নতর গুণ তামসিকতাই প্রবল। আবার তামসিক প্রকৃতির মধ্যে কিছু সাত্ত্বিক ভাবের দিকে ঝোঁক থাকিতে পারে, বুদ্ধিবিচারের দ্বারা উপলব্ধি হইতে পারে যে জীবনের বাসনাসমূহের তৃপ্তি কখনই হইতে পারে না, আত্মার এমন শক্তি নাই যে সংসারকে জয় করিতে পারে, সমস্ত জীবনটাই দুঃখময় ও অনিত্য, এখানে কোন সত্য নাই, স্বস্তি নাই, আলোক নাই, সুখ নাই, এইরূপ ভাবকে সত্ত্বতামসিক সমতা বলা যাইতে পারে, ইহা প্রকৃতপক্ষে সমতা নয়, ইহা একপ্রকার উদাসীনতা, সবই সমানভাবে পরিত্যাগ করা—তবে এরূপ ভাব হইতে প্রকৃত সমতা আসিতে পারে। বস্তুত তামসিক সমতা প্রকৃতির আত্মরক্ষণ নীতি, জুগুপ্সা নীতিরই প্রসারণ, এই নীতির বশে বিশেষ বিশেষ যন্ত্রণাদায়ক ব্যাপার হইতে লোক স্বভাবত সরিয়া থাকিতে চায়, কিন্তু এই প্রবৃত্তির বশে যখন লোকে সমস্ত প্রাকৃতিক জীবনকেই দুঃখময় ভাবিয়া তাহা হইতে সরিয়া থাকিতে চায়, বা আত্মা যে আনন্দ চায় সংসারে সে আনন্দ নাই, তাহার পরিবর্তে শুধু যন্ত্রণা ও লাঞ্ছনা আছে, এইরূপ মনোভাবে যে সমতা তাহাই তামসিক সমতা।

কেবলমাত্র তামসিক সমতাতেই প্রকৃত মুক্তি নাই, কিন্তু প্রকৃতির উপরে অবস্থিত অক্ষর আত্মার মহত্তর সত্তা, সত্যতর শক্তি, উচ্চতর আনন্দের উপলব্ধি করিয়া এই তামসিক সমতাকে যদি সাত্ত্বিক সমতাতে পরিণত করিতে পারা যায়, তাহা হইলে আরম্ভ হিসাবে এইরূপ সমতার শক্তি খুব; ভারতের বৈরাগ্য ধর্ম (Indian asceticism) এই মার্গই অবলম্বন করে। তবে এই ভাবের স্বাভাবিক ঝোঁক হইতেছে সন্ন্যাসের দিকে, সংসার ও কর্ম পরিত্যাগ করিবার দিকে, কিন্তু গীতা যে ভিতরে বাসনা পরিত্যাগ করিয়া সংসারে থাকিয়াই নিষ্কাম কর্ম করিবার উপদেশ দিয়াছে সেদিকে ইহার ঝোঁক নহে। গীতা এরূপ তামসিক সমতাকেও স্থান দিয়াছে, সংসারের দোষ, জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি, দুঃখ উপলব্ধি করিয়া বৈরাগ্য অবলম্বনের অনুমতি গীতায় আছে জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিদুঃখদোষানুদর্শনম্ (১৩।৮), এই পথে বুদ্ধের সাধনা ইতিহাসপ্রসিদ্ধ; জরা ও মরণ হইতে মোক্ষপ্রাপ্তির উদ্দেশেই যাহারা আত্মসংযম অভ্যাস করিতে চায় গীতায় তাহাদের পন্থা পরিত্যক্ত হয় নাই, জরামরণমোক্ষায় মামাশ্রিত্য যতন্তি যে (৭।২৯)। তবে ইহা হইতে প্রকৃত কোন ফল লাভ করিতে হইলে এই সঙ্গে এক উচ্চতর অবস্থায় সাত্ত্বিক উপলব্ধি চাই, এবং ভগবানে আনন্দ ও আশ্রয় গ্রহণ করা চাই, মাম্ আশ্রিতা। তখন এই বৈরাগ্যের দ্বারা আত্মা এক উচ্চতর অবস্থায় উপনীত হয়,

গুণানেতানতীত্য ত্রীন্ দেহী দেহসমুদ্ভবান্।
জন্মমৃত্যুজরাদুঃখৈর্বিমুক্তোঽমৃতমশ্নুতে॥১৪।২০

আত্মা গুণত্রয়কে অতিক্রম করিয়া এবং জন্ম, মৃত্যু, জরা, ও দুঃখ হইতে মুক্ত হইয়া নিজের স্বপ্রতিষ্ঠ সত্তার অমৃতত্ব উপভোগ করে। বস্তুত সংসারের দুঃখ যন্ত্রণাকে বরণ করিতে যে শুধু তামসিক অনিচ্ছা তাহা মানুষকে অধোগামী ও দুর্বলই করিয়া দেয়, এবং নির্বিশেষে সকলকে সন্ন্যাস ও সংসার-বৈরাগ্য শিক্ষা দেওয়া এইজন্যই বিপজ্জনক যে, এরূপ শিক্ষার ফলে অযোগ্য আত্মায় তামসিক দুর্বলতা ও তামসিক বৈরাগ্যের উদয় হয়, বুদ্ধিভেদ উপস্থিত হয়, "বুদ্ধিভেদম্ জনয়েৎ", উচ্চতর লক্ষ্য ও সাধনা উপলব্ধি করিবার সামর্থ্য যখন আত্মার হয় নাই তখন পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে জয় করিবার নিমিত্ত, আত্মার কল্যাণেরই নিমিত্ত যে রাজসিক চেষ্টা ও দ্বন্দ্ব প্রয়োজন তাহা দমাইয়া দেওয়া হয়, জীবনের প্রতি ভালবাসা, ধৃতি ও উৎসাহ কমাইয়া দিয়া আত্মার অনিষ্টই করা হয়। কিন্তু যেসকল আত্মা যোগ্য হইয়াছে, তাহাদের পক্ষে এরূপ তামসিক বৈরাগ্য উপকারী হইতে পারে, তাহাদের যে রাজসিক বাসনা ও নিম্নস্তরের জীবনের প্রতি তীব্র আগ্রহ তাহাদের সাত্ত্বিক উচ্চজীবন লাভের অন্তরায় এই তামসিক বৈরাগ্য দ্বারা তাহা বিনষ্ট হয়। এইরূপ বৈরাগ্যের দ্বারা তাহারা জীবনে যে শূন্যতার সৃষ্টি করে সেই অবস্থায় একটা আশ্রয় খুঁজিতে গিয়া তাহারা ভগবানের আহ্বান শুনিতে পায়—"অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্"—"এই অনিত্য ও দুঃখময়

সংসারে কে রহিয়াছ, এস, আমাতে আনন্দ গ্রহণ কর।"

তথাপি এই সমতা সংসারের সকল জিনিসেরই প্রতি সমান বৈরাগ্য ভিন্ন আর কিছুই নহে; ইহার ফল হয় উপেক্ষা ও উদাসীনতা, কিন্তু ইহার মধ্যে সে শক্তি নাই যাহার দ্বারা সংসারের সকল প্রকার সুখ ও দুঃখের স্পর্শ সমানভাবে অনাসক্তি ও নির্বিকারতার সহিত গ্রহণ করা যাইতে পারে, এবং এইটি হইতেছে গীতোক্ত সাধনার আবশ্যকীয় অঙ্গ। অতএব তামসিক বৈরাগ্যের কোন প্রয়োজন নাই, আর যদিও আমরা ইহা লইয়া আরম্ভ করি, সেটা শুধু উচ্চতর সাধনায় আমাদিগকে প্রথমে প্রবৃত্ত করিবার জন্য কিন্তু চিরকাল বিষাদে নিমগ্ন হইয়া থাকিবার জন্য নহে। আমরা প্রথমে যেসকল জিনিস হইতে পলাইয়া যাইতে চাই, যখন সেসকল জিনিসকে জয় করিয়া তাহাদের উপর প্রভুত্ব করিতে চেষ্টা করিব তখনই প্রকৃত সাধনার আরম্ভ হইবে। এইখানেই একপ্রকার রাজসিক সমতার সম্ভাবনা আছে; চিত্তবিক্ষোভ ও দুর্বলতার উপরে উঠিতে, আত্মসংযম আত্মজয় করিতে শক্তিশালী লোক যে গর্ব অনুভব করে তাহা এই রাজসিক সমতার নিম্নতম অবস্থা; এই মনোভাব হইতে আরম্ভ করিয়া এবং ইহাকে মূল সূত্ররূপে ধরিয়া নীচের প্রকৃতির সকল দুর্বলতার বশ্যতা হইতে আত্মাকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত করিবার যে সাধনা তাহাই স্তোয়িক আদর্শ (stoic ideal)। তামসিক অন্তর্মুখী বৈরাগ্য যেমন প্রকৃতির আত্মরক্ষণ নীতির, জুগুপ্সানীতির প্রসারণ, রাজসিক ঊর্ধ্বমুখী সাধনাও তেমনি প্রকৃতির যুদ্ধ ও দ্বন্দ্বের নীতির, প্রভুত্ব ও জয়ের দিকে জীবনের অন্তর্নিহিত প্রবৃত্তির প্রসারণ; তবে কেবলমাত্র যে ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ জয় সম্ভব সেই ক্ষেত্রেই এই যুদ্ধ লইয়া যাওয়া হয়। সাধক নানা বিক্ষিপ্ত বাহ্যিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে এবং সাময়িক সাফল্য ও জয়লাভ করিতে চেষ্টা না করিয়া আধ্যাত্মিক সাধনা ও অন্তর জয়ের দ্বারা একেবারে প্রকৃতিকে এবং জগৎকে জয় করিতে চায়। তামসিক বৈরাগ্য সংসারের সুখ ও দুঃখ উভয় হইতেই সরিয়া পলাইতে চায়; রাজসিক সাধনা তাহাদের সম্মুখীন হইয়া তাহাদিগকে সহ্য করিতে, জয় করিতে, তাহাদের উপরে উঠিতে চায়। মহাভারতে বৃদ্ধ ধৃতরাষ্ট্র যেমন লৌহ ভীমকে আলিঙ্গনের মধ্যে টানিয়া লইয়া চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দিয়াছিলেন, ঠিক তেমনই স্তোয়িক সাধনা কুস্তিগীরের ন্যায় বাসনা ও বিপুগণকে আলিঙ্গনের ভিতরে লইয়া তাহাদিগকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া ফেলে। যে সকল সুখের বা দুঃখের জিনিস শরীর ও মনের চাঞ্চল্যের কারণ, স্তোয়িক সাধক তাহাদের আঘাত সহ্য করিয়া তাহাদের ফল ধ্বংস করিয়া দেয়। এই সাধনা তখনই সম্পূর্ণ হয় যখন আত্মা কিছুতেই ক্লিষ্ট বা আকৃষ্ট না হইয়া, কোনরূপ উত্তেজিত বা ব্যথিত না হইয়া সকল প্রকার বাহ্যস্পর্শ সহ্য করিতে পারে। এই সাধনা চায় যে, মানুষ তাহার প্রকৃতিকে জয় করুক, তাহার প্রকৃতির রাজা হউক।

গীতা অর্জুনের ক্ষাত্র স্বভাবকে লক্ষ্য করিয়া এই বীরোচিত সাধনার কথাই প্রথমে বলিয়াছে। তাহাকে আহ্বান করা হইয়াছে—পরম শত্রু কামনাকে আক্রমণ

করিয়া বধ করিতে। গীতা সমতার যে বর্ণনা দিয়াছে তাহা স্তোয়িক দার্শনিকেরই সমতা,

দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে॥২।৫৬
যঃ সর্ব্বত্রানভিস্নেহস্তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভম্।
নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥২।৫৭

"যাঁহার মন দুঃখের মাঝে অবিচলিত এবং সুখের মাঝে স্পৃহাশূন্য, যাঁহা হইতে আসক্তি ও ক্রোধ ও ভয় দূর হইয়াছে, সেইরূপ মুনিকেই স্থিতধী বলা হয়। যিনি সর্ববিষয়ে স্নেহশূন্য, কোন শুভ বা কোন অশুভ আসিলে যিনি আনন্দিত হন না বা দ্বেষ করেন না, তাঁহার বুদ্ধি জ্ঞানে সুপ্রতিষ্ঠিত।" গীতা একটি স্থূল দৃষ্টান্ত দিয়া বলিয়াছে, যদি কেহ আহার করিতে নিবৃত্ত হয়, তাহা হইলে বস্তুর সহিত ইন্দ্রিয়ের সংস্পর্শ হয় না বটে, কিন্তু ইন্দ্রিয়ের যে লালসা, "রস", তাহা থাকিয়াই যায়; কেবল যখন বস্তুর সংস্পর্শে আসিয়াও ইন্দ্রিয় বাহ্য-ভোগের জন্য লালায়িত হয় না, আস্বাদ-সুখের আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করে, শুধু তখনই হয় আত্মার উচ্চতম অবস্থা। রাগ দ্বেষ হইতে মুক্ত, আত্মবশীভূত মানসিক ইন্দ্রিয়সকলের দ্বারা বিষয়ের উপর বিচরণ করিয়াই আত্মার ও প্রকৃতির উদার ও মধুর স্বচ্ছতা লাভ হয়, সেখানে শোক বা দুঃখের কোন স্থান নাই,

রাগদ্বেষবিযুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্।
আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি॥২।৬৪
প্রসাদে সর্ব্বদুঃখানাং হানিরস্যোপজায়তে।২।৬৫

যেমন নদীর জল সমুদ্রের মধ্যে প্রবেশ করিলেও সমুদ্র বিক্ষুব্ধ হয় না, সেইরূপ বাসনাসমূহ আত্মায় প্রবেশ করিবে অথচ আত্মা তাহাতে বিক্ষুব্ধ হইবে না, এইরূপে অবশেষে সমস্ত বাসনা বর্জন করা যায়। ক্রোধ ও বিক্ষোভ হইতে মুক্ত হওয়া, ভয় আকর্ষণ হইতে মুক্ত হওয়া, যে মুক্ত অবস্থার জন্য একান্ত প্রয়োজনীয়, তাহা পুনঃপুনঃ বিশেষ জোর দিয়া বলা হইয়াছে, এবং ইহার জন্য আমাদিগকে এই সকলের বেগ সহ্য করিতে শিখিতেই হইবে, কিন্তু ইহাদের কারণের সম্মুখীন না হইলে তাহা সম্ভব হয় না,

শক্নোতীহৈব যঃ সোঢুং প্রাক্ শরীরবিমোক্ষণাৎ।
কামক্রোধোদ্ভবং বেগং স যুক্তঃ স সুখী নরঃ॥৫।২৩

"এই সংসারে, এই দেহেই যিনি কাম ক্রোধের বেগ সহ্য করিতে পারেন তিনিই প্রকৃত যোগী, তিনিই সুখী।" ইহার উপায় হইতেছে 'তিতিক্ষা'—সহ্য করিবার সঙ্কল্প ও শক্তি,

মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ।
আগমাপায়িনোঽনিত্যাস্তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত॥২।১৪
যং হি ন ব্যথয়ন্ত্যেতে পুরুষং পুরুষর্ষভ।
সমদুঃখসুখং ধীরং সোঽমৃতত্বায় কল্পতে॥২।১৫

"বাহ্য বস্তুর সহিত ইন্দ্রিয়ের সংস্পর্শই শীতোষ্ণ, সুখ-দুঃখের কারণ, এই সকল স্পর্শ আসে যায়, অনিত্য, ইহাদিগকে সহ্য করিতে শিক্ষা কর। কারণ যে ব্যক্তি এই সকল বাহ্য বস্তুর সংস্পর্শে ব্যথিত বা বিচলিত হন না, যে ধীর ও জ্ঞানী ব্যক্তি সুখে দুঃখে সমান, তিনি অমৃতত্ব লাভের অধিকারী হন।" যাঁহার আত্মা সমভাবাপন্ন (equal-souled) তিনি দুঃখভোগ করেন কিন্তু ঘৃণা করেন না, তিনি সুখ গ্রহণ করেন কিন্তু উল্লসিত হন না। এমনকি সহিষ্ণুতা দ্বারা শারীরিক যন্ত্রণাকেও জয় করিতে হইবে এবং ইহাও স্তোয়িক সাধনার অঙ্গ। জন্ম, মৃত্যু, দুঃখ, যন্ত্রণা হইতে পলায়ন করা হইবে না, তাহাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে এবং তাহাদিগকে নিতান্ত উপেক্ষার দ্বারা জয় করিতে হইবে।[১] নীচের খেলায় প্রকৃতির ছদ্মবেশসকল দেখিয়া ভয়ে পলায়ন করা নহে, কিন্তু সেসবের সম্মুখীন হইয়া তাহাদিগকে জয় করাই তেজস্বী পুরুষসিংহের (পুরুষর্ষভ) সত্য সহজাত প্রেরণা। এইরূপে বাধ্য হইয়া প্রকৃতি তাহার ছদ্মবেশ দূর করিয়া দেয়, পুরুষ যে মুক্ত আত্মা, তাহার সেই প্রকৃত স্বরূপ পুরুষকে দেখাইয়া দেয়—পুরুষ তখন বুঝিতে পারে যে, সে প্রকৃতির দাস নহে, সে প্রকৃতির অধীশ্বর, স্বরাট, সম্রাট।

কিন্তু গীতা এই স্তোয়িক (stoic) সাধনা, এই বীরোচিত আদর্শ শুধু সেই শর্তে স্বীকার করিয়াছে যে শর্তে গীতা তামসিক বৈরাগ্যও স্বীকার করিয়াছে—ইহার উপরে থাকা চাই জ্ঞানের সাত্ত্বিক দৃষ্টি, ইহার মূলে থাকা চাই আত্মস্বরূপ লাভের লক্ষ্য এবং ইহার গতি হওয়া চাই ঊর্ধ্বে দিব্যজীবন লাভের দিকে। যে স্তোয়িক সাধনা কেবল মানবহৃদয়ের স্বাভাবিক কোমলবৃত্তিগুলিকে ধ্বংস করিয়া দেয় তাহা তামসিক ক্লান্তি, নিষ্ফল বিষাদ এবং বন্ধ্যা জড়তা হইতে কম বিপজ্জনক বটে কিন্তু তাহা একেবারে অমিশ্র নহে কারণ, তাহা হইতে প্রকৃত আধ্যাত্মিক মুক্তি না আসিয়া কেবল হৃদয়হীনতা এবং নিষ্ঠুর উদাসীনতা আসিতে পারে। গীতার সাধনায় স্তোয়িক সমতা সমর্থিত হইয়াছে শুধু এইজন্য যে, এইরূপ সমতার সহিত আত্মার অক্ষরাবস্থার একটা সম্বন্ধ পাওয়া যাইতে পারে এবং এইরূপ সমতার সাহায্যে সেই মুক্ত অক্ষর আত্মার স্বরূপ বুঝিবার (পরং দৃষ্ট্বা) এবং সেই নূতন আত্মজ্ঞানে স্থিতি লাভ করিবার (এষা ব্রাহ্মীস্থিতিঃ) সহায়তা হইতে পারে,

[১] গীতা বলিয়াছে, ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি, তেজস্বী ও জ্ঞানী পুরুষ তাহা দ্বারা ব্যথিত হন না, বিচলিত হন না, কিংকর্তব্যবিমূঢ় হন না। তথাপি তাহাদিগকে স্বীকার করা হয়, কেবল জয় করিবার জন্যই, জয়ানন্তরমোক্ষায় যতন্তি।

এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধ্বা সংস্তভ্যাত্মানমাত্মনা।
জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদম্॥৩।৪৩

"বুদ্ধির সাহায্যে বুদ্ধিরও উপরে অবস্থিত পরমাত্মা সম্বন্ধে সচেতন হইয়া, আত্মাকে আত্মশক্তির প্রয়োগেই ধীর ও নিশ্চল কর এবং এই দুর্নিবার শত্রু কামকে বিনাশ কর।" সাত্ত্বিকতার ভিতর দিয়া আত্মজ্ঞান লাভই যখন লক্ষ্য শুধু তখনই তাহার সহায়স্বরূপ তামসিক বৈরাগ্য বা রাজসিক দ্বন্দ্ব ও জয়ের সার্থকতা আছে, নতুবা তাহাদিগকে সমর্থন করা যায় না।

দার্শনিক, মনীষী, জ্ঞানী ব্যক্তি কেবল নিজের আদর্শ সমর্থনের জন্যই সত্ত্বগুণের উপর নির্ভর করেন না, কিন্তু প্রথম হইতেই তাঁহার প্রকৃতির সাত্ত্বিকতার সাহায্যে আত্মজয়ের সাধনা করেন। সাত্ত্বিক সমতা হইতেই তাঁহার সাধনা আরম্ভ। তিনিও লক্ষ্য করেন যে, বাহ্য ও জড় জগৎ অনিত্য, তাহা হইতে বাসনার তৃপ্তি হয় না, বা প্রকৃত আনন্দ লাভ করা যায় না, কিন্তু ইহা লক্ষ্য করিয়া তাঁহার মনে শোক ভয় বা নিরাশার উদয় হয় না। তিনি শান্ত বিচার-বুদ্ধির দৃষ্টিতে সব দেখেন এবং দ্বেষ বা মোহের বশীভূত না হইয়া নিজের অভীষ্ট নির্ণয় করেন।

যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখযোনয় এব তে।
আদ্যন্তবন্তঃ কৌন্তেয় ন তেষু রমতে বুধঃ॥৫।২২

"বস্তুর সংস্পর্শ হইতে যেসকল ভোগসুখ উৎপন্ন হয় সে সকল পরিণামে দুঃখের কারণ, তাহাদের আদি আছে, অন্ত আছে; অতএব যিনি জ্ঞানী, যাঁহার বুদ্ধি জাগ্রত হইয়াছে (বুধঃ) তিনি সে সকল ভোগে আনন্দলাভ করেন না। তাঁহার আত্মা বাহ্য বস্তুর স্পর্শে আসক্ত হয় না, তিনি আপনাতেই আপনার আনন্দের সন্ধান পান।"

বাহ্যস্পর্শেষ্বসক্তাত্মা বিন্দত্যাত্মনি যৎ সুখম্।৫।২১

তিনি বুঝিতে পারেন যে, তিনি নিজেই নিজের শত্রু এবং নিজেই নিজের বন্ধু, আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ, অতএব তিনি নিজের প্রভুত্ব বর্জন করিয়া নিজেকে কাম-ক্রোধাদির হস্তে ছাড়িয়া দেন না, নাত্মানমবসাদয়েৎ, কিন্তু নিজের আভ্যন্তরীণ শক্তির সাহায্যে কাম-ক্রোধাদির বশ্যতা হইতে নিজেকে উদ্ধার করেন, উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং, কারণ যিনি নিজের নিম্নতন আত্মাকে জয় করিয়াছেন তিনিই দেখিতে পান যে, তাঁহার ঊর্ধ্বতন আত্মার মত তাঁহার পরম বন্ধু ও সহায় আর কেহ নাই, বন্ধুরাত্মাত্মনস্তস্য যেনাত্মৈবাত্মনা জিতঃ (৬।৬)। তিনি হন জ্ঞানে পরিতৃপ্ত, জিতেন্দ্রিয়, সাত্ত্বিক সমতার দ্বারা যোগী[১], তিনি মৃত্তিকা,

[১] কারণ সমতাই যোগ, সমত্বং যোগ উচ্যতে (২।৪৮)।

প্রস্তব ও সুবর্ণে সমদৃষ্টিসম্পন্ন, তিনি শীত-উষ্ণে, সুখ-দুঃখে, মান-অপমানে সমভাবাপন্ন ও প্রশান্ত।

জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কূটস্থো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ॥৬।৮

শত্রু, মিত্র, উদাসীন, মধ্যস্থ সকলেব প্রতিই তাঁহাব সমভাব, কাবণ তিনি দেখেন যে, এই সকল সম্বন্ধ অনিত্য, জীবনেব চিবপবিবর্তনশীল অবস্থা হইতে এই সকল সম্বন্ধেব উৎপত্তি। এমনকি মানুষ বিদ্যাব, শুচিতাব, পুণ্যেব দাবি কবিযা যে ছোট-বড়, উচ্চ-নীচ বিচাব কবে, জ্ঞানী ব্যক্তি তাহাতেও বিভ্রান্ত হন না। সাধু ও অসাধুব প্রতি, পুণ্যবান, বিদ্বান, উৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণ এবং পতিত চণ্ডালেব প্রতি—সকলের প্রতিই তিনি সমবুদ্ধিসম্পন্ন। গীতা এইরূপে সাত্ত্বিক সমতাব বর্ণনা করিয়াছে; বিজ্ঞ ব্যক্তির যে শান্ত জ্ঞানসম্মত সমতাব সহিত জগৎ পবিচিত, গীতার এই সাত্ত্বিক সমতাব বর্ণনায তাহাব সাবটুকু সুন্দবভাবে বিবৃত হইযাছে।

তাহা হইলে এই সমতা এবং গীতা যে উদাবতব সমতাব শিক্ষা দিযাছে, এই দুইযেব মধ্যে প্রভেদ কোথায? বিচাব বিতর্কেব দ্বাবা যে বুদ্ধিগ্রাহ্য জ্ঞান পাওযা যায় তাহাব সহিত আধ্যাত্মিক বৈদান্তিক ঐক্যজ্ঞানেব যে প্রভেদ, এই দুই সমতাব মধ্যেও সেই প্রভেদ; এই উচ্চতব আধ্যাত্মিক জ্ঞানেব উপবে, বৈদান্তিক ঐক্যজ্ঞানের উপরেই গীতা শিক্ষাব ভিত্তি। দার্শনিক পণ্ডিতগণ সাধাবণ মন বুদ্ধি দ্বারা বিচার বিতর্ক করিয়া ভিতবে সমভাব বক্ষা কবেন, কিন্তু শুধু সমতাব এইরূপ ভিত্তি মোটেই দৃঢ নহে। কাবণ যদিও দার্শনিক বিজ্ঞ ব্যক্তি সতত সজাগ দৃষ্টি রাখিয়া অথবা মনেব অভ্যাসেব দ্বাবা নিজেকে বশে বাখেন, তথাপি বাস্তবিক-পক্ষে তিনি তাঁহার নীচেব প্রকৃতি হইতে মুক্ত নহেন, নানাদিক দিযা নানাভাবে এই নীচের প্রকৃতি তাঁহার উপব প্রভাব বিস্তাব কবে এবং তাহাকে প্রত্যাখ্যান ও দমন কবা হইযাছে বলিয়া সেই প্রকৃতি যেকোন মুহূর্তে সুযোগ পাইযা ভীষণ প্রতিশোধ লইতে পারে। কারণ নীচেব প্রকৃতির খেলা সকল সমযেই ত্রিধা খেলা, সত্ত্ব, বজঃ, তমের খেলা এবং সাত্ত্বিক মনুষ্যকে কবলিত কবিবাব জন্য বজঃ ও তমঃ সতত ওৎ পাতিয়া থাকে।

যততো হ্যপি কৌন্তেয পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ।
ইন্দ্রিযাণি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ॥২।৬০

"সিদ্ধিলাভে যত্নশীল জ্ঞানী ব্যক্তিব মনকেও প্রবল বিক্ষোভকাবী ইন্দ্রিযগণ বলপূর্বক হবণ কবে।" সম্পূর্ণভাবে নিবাপদ হইতে হইলে সত্ত্বগুণেব উপবে, বুদ্ধিব উপরে (বুদ্ধেঃ পবং) যে আত্মপুরুষ বহিযাছে তাহাব আশ্রযগ্রহণ ভিন্ন আব অন্য উপায কিছুই নাই—ঐ আত্মপুরুষ দার্শনিকেব মনোময পুরুষ নহে কিন্তু দিব্য ঋষির বিজ্ঞানময় পুরুষ, উহা গুণত্রযেব অতীত। সকল সাধনাব উদ্‌যাপন

কবিতে হইবে ঊর্ধ্বেব আধ্যাত্মিক প্রকৃতিতে দিব্যজন্ম লাভ কবিয়া।

দার্শনিক জ্ঞানীব যে সমতা তাহা স্তোযিক সাধকের সমতাব ন্যায়, বা সংসাবত্যাগী সন্ন্যাসীব সমতাব ন্যাযই মানুষ হইতে স্বতন্ত্র ও দূরে নিজের মধ্যেই নিজে থাকাব নির্জন সমতা; কিন্তু যে ব্যক্তি দিব্যজন্ম লাভ করিযাছেন তিনি শুধু নিজেব মধ্যেই নহে, পবন্তু সকলের মধ্যেই ভগবানকে দেখিতে পাইয়াছেন। তিনি সকলেব সহিত নিজেব একত্ব উপলব্ধি কবিয়াছেন, অতএব তাঁহার সমতা সহানুভূতি ও ঐক্যে পবিপূর্ণ। তিনি সকলকে নিজেব সহিত অভিন্ন দেখেন এবং নিজেব একক মুক্তিব জন্য মোটেই ব্যগ্র নহেন, ববং তিনি অপরেব সুখ-দুঃখের বোঝা নিজেব স্কন্ধে তুলিযা লন, যদিও তিনি নিজে সে সুখ-দুঃখেব দ্বাবা বিচলিত বা বশীভূত হন না। গীতা একাধিকবাব বলিয়াছে যে, সিদ্ধ জ্ঞানী সর্বদা উদাব সমতাব সহিত সকলেব হিতসাধনে নিযুক্ত থাকেন, এইরূপ হিতসাধনেই তিনি কাজ পান, আনন্দ পান, সর্ব্বভূতহিতে বতাঃ। পরম সিদ্ধ যোগী কেবল উচ্চ আধ্যাত্মিক ভূমিতে বাস কবিয়া নির্জনে আত্মধ্যানে নিমগ্ন থাকেন না, পবন্তু তিনি যুক্তঃ কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ, জগতেব মঙ্গলেব জন্য, জগতেব মধ্যেই যে ভগবান বাঁহযাছেন তাঁহাব জন্য, তিনি সর্বকর্মকাবী, সর্ব্বতোমুখী কর্ম্মী। কারণ তিনি যেমন একজন ঋষি, একজন যোগী, তেমনই আবার তিনি একজন ভক্ত, একজন ভাগবত প্রেমিক—প্রেমিক তিনি, যিনি ভগবানকে যেখানে দেখেন সেইখানেই ভালবাসেন এবং তিনি সর্বত্রই ভগবানকে দেখিতে পান; আবাব, তিনি যাহাকে ভালবাসেন তাহাকে সেবা করিতে তিনি বিমুখ হন না, তাঁহার কর্ম তাঁহাকে মিলনসুখ হইতেও বঞ্চিত কবে না, কাবণ তাঁহার সকল কর্ম তাঁহার হৃদিস্থিত ভগবান হইতেই উত্থিত হয এবং সর্বভূতে যে এক ভগবান বিরাজিত রহিয়াছেন তাঁহাবই উদ্দেশে সম্পাদিত হয। গীতাব সমতা উচ্চ, উদার সমতা, এই সমতায সবই ভাগবত সত্তা ও ভাগবত প্রকৃতির একত্বেব মধ্যে উত্তোলিত হয়।

বিংশ অধ্যায়

সমতা ও জ্ঞান

গীতাব শিক্ষার এই গোড়াব দিকে যোগ ও জ্ঞান আত্মাব ঊর্ধ্বগমনেব দুই পক্ষ-স্বরূপ। বাসনাশূন্য হইয়া, সকল বস্তু ও সকল লোকেব প্রতি সমবুদ্ধিসম্পন্ন হইয়া পবমেশ্বেব উদ্দেশে যজ্ঞস্বরূপ যে দিব্যকর্ম কবা যায সেই কর্মের ভিতর দিয়া মিলনই যোগ, আব যাহা এই বাসনাশূন্যতা, এই সমতা, এই যজ্ঞশক্তিব ভিত্তি তাহাই জ্ঞান। বস্তুত এই দুই পক্ষই পবস্পবকে উড়িতে সাহায্য করে, মানুষের দুইটি চক্ষু যেমন একেব পব একটি দেখে বলিযাই একই সঙ্গে দেখিতে পাবে, তেমনি যোগ ও জ্ঞান সূক্ষ্মভাবে ক্রমান্বযে পবস্পবকে সাহায্যপূর্বক একই সঙ্গে কার্য কবিয়া পবস্পবকে বর্ধিত ও পুষ্ট কবে। কর্ম যেমন ক্রমশ বেশী বেশী নিষ্কাম হয়, সমদৃষ্টিসম্পন্ন হয, যজ্ঞভাবাপন্ন হয, তেমনই জ্ঞানও বর্ধিত হইতে থাকে, আবাব জ্ঞান যেমন বর্ধিত হয সেই সঙ্গে আত্মাও বাসনাশূন্যতায, যজ্ঞার্থে কর্মের সমতায দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হয। এই জন্যই গীতা বলিয়াছে যে, সকল প্রকাব দ্রব্যযজ্ঞ অপেক্ষা জ্ঞানযজ্ঞ বড (৪।৩৩)।

অপি চেদসি পাপেভ্যঃ সর্ব্বেভ্যঃ পাপকৃত্তমঃ।
সর্ব্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব বৃজিনং সন্তবিষ্যসি॥৪।৩৬
ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।৪।৩৮

"যদি তুমি সমুদয় পাপী অপেক্ষাও অধিকতব পাপকাবী হও, তথাপি জ্ঞানরূপ নৌকাব দ্বারা সমুদয় পাপসমুদ্র উত্তীর্ণ হইবে। ইহলোকে জ্ঞানেব তুল্য পবিত্র আব কিছুই নাই।" জ্ঞানের দ্বারা কামনা এবং কামনাব জ্যেষ্ঠ সন্তান পাপ ধ্বংস হয। মুক্ত মানব যজ্ঞরূপে কর্ম কবিতে পাবেন কাবণ তাঁহাব মন, হৃদয ও আত্মা আত্মজ্ঞানে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ায় তিনি আসক্তি হইতে মুক্ত হইযাছেন, গতসঙ্গস্য মুক্তস্য জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ (৪।২৩)। তাঁহাব সমস্ত কর্ম সম্পন্ন হইবামাত্র অদৃশ্য হয়, ব্রহ্মে লয়প্রাপ্ত হয, প্রবিলীযতে; সে কর্ম তাঁহাব আত্মাব উপব কোন প্রতি-ক্রিয়ার ফল বাখিযা যায় না, কোন দাগ বা সংস্কাব বাখিযা যায না। তাঁহাব প্রকৃতির ভিতব দিয়া ভগবানই সেই কর্ম সম্পাদন কবেন, সেই কর্ম মানুষেব নিজের নহে, মানুষ কেবল যন্ত্রমাত্র। কর্মটিও তখন হয ব্রহ্মসত্তাবই শক্তি (৪।২৪)।

এই অর্থেই গীতা বলিযাছে যে, সমস্ত কর্ম সমাপ্ত হয়, সম্পূর্ণ হয জ্ঞানে, সর্ব্বং কর্মাখিলম্ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে।

যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন।
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা॥৪।৩৭

"প্রজ্বলিত অগ্নি যেমন কাষ্ঠরাশিকে ভস্মীভূত কবে, সেইরূপ জ্ঞানাগ্নি সমুদয় কর্মবাশিকে ভস্মসাৎ কবিযা থাকে।" ইহার দ্বারা মোটেই বোঝায় না যে, যখন জ্ঞান সম্পূর্ণ হয, তখন কর্ম বন্ধ হইয়া যায়। ইহার প্রকৃত অর্থ গীতা খুব স্পষ্ট কবিয়াই বলিযাছে—

যোগসংন্যস্তকর্ম্মাণং জ্ঞানসংছিন্নসংশয়ম্।
আত্মবন্তং ন কর্ম্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয়॥৪।৪১

"যিনি জ্ঞানেব দ্বাবা সমস্ত সংশয নষ্ট কবিয়াছেন এবং যোগের দ্বারা সমস্ত কর্ম সমর্পণ কবিযাছেন এবং আত্মাকে পাইযাছেন সেরূপ ব্যক্তি নিজের কর্মরাশির দ্বাবা বদ্ধ হন না।" আর একস্থানে গীতা বলিযাছে, সর্বভূতাত্মভূতাত্মা, কুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যতে (৫।৭)—যাঁহাব আত্মা সর্বভূতের আত্মা হইয়াছে, তিনি কর্ম করেন কিন্তু সে কর্ম তাঁহাকে স্পর্শ কবে না, তিনি সেই কর্মেব জালে বদ্ধ হন না, তাঁহার আত্মাকে মুগ্ধ কবিতে পাবে এমন কোন প্রতিক্রিয়া ঐ কর্ম হইতে সৃষ্টি হয না, কুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যতে। অতএব, গীতার মতে বাহ্য কর্মত্যাগ অপেক্ষা কর্মযোগ ভাল, কর্মসংন্যাসাৎ কর্ম্মযোগো বিশিষ্যতে (৫।২), কারণ দেহবান লোককে শরীবযাত্রা নির্বাহেব জন্য কর্ম কবিতেই হয, এবং সেইজন্য তাহাদের পক্ষে বাহ্য কর্মসন্ন্যাস কঠিন ব্যাপাব, দুঃখমাপ্তুম, কিন্তু অন্যদিকে কর্মযোগই যথেষ্ট, কর্মযোগ সহজে এবং দ্রুতগতিতে জীবকে ব্রহ্মে লইয়া আসিতে পারে। আমরা ইতিপূর্বে দেখিযাছি যে, এই কর্মযোগ হইতেছে সমস্ত কর্ম ঈশ্বরে সমর্পণ করা; ইহাতে বাহিরে কর্মত্যাগ কবিতে হয় না, কেবল ভিতরে ত্যাগ কবিতে হয়, শারীবিক কর্মত্যাগ নহে, আধ্যাত্মিকভাবে সমস্ত কর্ম ব্রহ্মে, পবমেশ্বরে সমর্পণ করিতে হয়, ব্রহ্মণ্যাধায কর্ম্মাণি (৫।১০), ময়ি সংন্যস্য (৩।৩০)। এইরূপ কর্মরাশি যখন ব্রহ্মে সংন্যস্ত হয, তখন যন্ত্রের স্বতন্ত্র কর্তৃত্ব কিছু থাকে না; সে কর্ম করিযাও কিছু করে না, কাবণ সে শুধু কর্মফল ত্যাগ করে নাই কিন্তু সমস্ত কর্ম এবং তাহাদের সম্পাদনও ঈশ্বরে সমর্পণ কবিযাছে। তখন ভগবান স্বযং তাহার নিকট হইতে কর্মেব বোঝা তুলিযা লন, পবমেশ্বরই তখন কর্তা, কর্ম এবং ফল—সবই হন।

গীতা এই যে জ্ঞানেব কথা বলিযাছে ইহা মানসিক বুদ্ধি বিচারের ক্রিয়া নহে; সত্যের[১] দিব্য সূর্যালোকে বর্ধিত হইযা সত্তার উচ্চতম অবস্থা প্রাপ্তিকেই গীতাতে

[১] এই সত্য সম্বন্ধেই ঋগ্বেদ বলিযাছে —"তৎ সত্যম্ সূর্যম্ তমসি ক্ষীযন্তম্", আমাদের অজ্ঞানরূপ অন্ধকারেব আববণে লুক্কায়িত সূর্যই সেই সত্য।

জ্ঞান নাম দেওযা হইযাছে। দুঃখদ্বন্দ্বময় অশান্ত নীচেব প্রকৃতি হইতে বহু ঊর্ধ্বে, নির্মল অধ্যাত্ম আকাশে অক্ষব ব্রহ্ম বিরাজিত; এখানকাব পাপও তাঁহাকে স্পর্শ করে না, পুণ্যও তাঁহাকে স্পর্শ কবে না, আমাদেব পাপেব বোধও তিনি গ্রহণ কবেন না, পুণ্যেব বোধও তিনি গ্রহণ কবেন না, নীচেব প্রকৃতিব সুখ দুঃখ তাঁহাকে স্পর্শ করে না, আমাদেব জয়েতে যে সুখ তাহাতেও তিনি উদাসীন, আমাদেব পবাজয়ে যে দুঃখ তাহাতেও তিনি উদাসীন, তিনি সকলেব ঈশ্বব পবমতম সর্বব্যাপী, প্রভু, বিভু, শান্ত, তেজস্বী, শুদ্ধ, সর্ববস্তুতে সমান, প্রকৃতিব মূল, তিনি সাক্ষাৎভাবে আমাদেব কর্মেব কর্তা নহেন, কিন্তু প্রকৃতি ও প্রকৃতিব কর্মেব সাক্ষী, কর্তা বলিয়া আমাদের যে ভ্রম, এই ভ্রমও তাঁহাব দেওযা নহে, নীচেব প্রকৃতিব অজ্ঞান হইতেই এই ভ্রমের উৎপত্তি। কিন্তু এই মুক্তি, এই ঈশ্বরত্ব, এই শুদ্ধতা আমরা দেখিতে পাই না; প্রকৃতিগত অজ্ঞানেব দ্বাবা আমবা মোহগ্রস্ত, তাই আমাদেব অন্তরেব মধ্যে ব্রহ্মেব যে সনাতন আত্মজ্ঞান লুক্কাযিত বহিযাছে তাহা আমরা দেখিতে পাই না, অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ। কিন্তু যাঁহাবা অক্লান্ত অধ্যবসাযেব সহিত জ্ঞানের অনুসন্ধান কবেন, তাঁহাদেব নিকট জ্ঞান আসিয়া তাঁহাদেব প্রকৃতিগত অজ্ঞান দূব কবিযা দেয; বহুকাল লুক্কাযিত সূর্যেব ন্যায এই জ্ঞান প্রকাশিত হয এবং এই নীচেব প্রকৃতিব দ্বন্দ্বসকলেব ঊর্ধ্বে অবস্থিত পবম স্বপ্রতিষ্ঠ সত্তাকে আমাদেব দৃষ্টিব সম্মুখে প্রকাশিত কবিযা দেয।

জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেষাং নাশিতমাত্মনঃ।
তেষামাদিত্যবজ্জ্ঞানং প্রকাশযতি তৎ পবম্॥৫।১৬

বহুকাল একাগ্রভাবে সাধনা কবিযা, আমাদেব সমুদয চেতনসত্তাকে তদভিমুখী কবিয়া, তাহাকেই আমাদেব সমগ্র লক্ষ্য কবিয়া, আমাদেব বুদ্ধিব একমাত্র বিষয করিয়া এবং এইরূপে শুধু আমাদেব মধ্যেই নহে কিন্তু সর্বত্রই তাহাকে দেখিযা আমরা তদ্‌বুদ্ধয়স্তদাত্মনঃ হই, জ্ঞানরূপ সলিলেব[১] দ্বারা আমাদেব নীচেব প্রকৃতিব সমস্ত দুঃখ, পাপ ও অজ্ঞান ধৌত হইয়া যায,

তদ্‌বুদ্ধয়স্তদাত্মানস্তন্নিষ্ঠাস্তৎপবাযণাঃ।
গচ্ছন্ত্যপুনবাবৃত্তিং জ্ঞাননির্ধূতকল্মষাঃ॥৫।১৭

ইহার ফল হয় এই যে, সকল বস্তু ও সকল ব্যক্তিব প্রতি পূর্ণ সমভাব হয; গীতা বলিয়াছে, কেবল তখনই আমরা আমাদেব কর্ম সম্পূর্ণভাবে ব্রহ্মে সমর্পণ কবিতে পারি। কারণ, ব্রহ্ম সমস্বরূপ, সমং ব্রহ্ম; যখন আমাদেব এইরূপ পূর্ণ

[১] ঋগ্বেদ এইরূপে সত্যেব স্রোতধাবাব কথা বলিযাছে, এই জলে পূর্ণ জ্ঞান বিদ্যমান, এই জল দিব্য সূর্যালোকে পবিপূর্ণ, ঋতস্য ধাবাঃ, আপো বিচেতসঃ, সর্বতীব আপঃ। এখানে যাহা উপমামাত্র, বেদে তাহা স্থূল রূপক।

সমভাব হয, সাম্যে স্থিতং মনঃ, যখন আমরা বিদ্যাবিনযসম্পন্ন ব্রাহ্মণে, চণ্ডালে, গাভীতে, হস্তীতে, কুকুবে সমদর্শী হই, এবং সকলকে এক ব্রহ্ম বলিযা জানি, কেবল তখনই সেই একত্বেব মধ্যে বাস কবিযা আমবা ব্রহ্মেব মতই দেখিতে পাবি যে, আমাদেব কর্মসমূহ প্রকৃতি হইতে উদ্ভূত হইতেছে, তখন আর আসক্তি, পাপ বা বন্ধনেব ভয় থাকে না। তখন আর দোষ বা পাপ হইতে পাবে না; কারণ তখন আমবা কামনা ও কামনাজাত কর্ম ও প্রতিক্রিযায পূর্ণ অজ্ঞানেব খেলাকে, সংসাবকে জয কবিযাছি, তৈর্জিতঃ সর্গঃ, এবং পবম দিব্য প্রকৃতিব মধ্যে বাস কবায তখন আব আমাদেব কর্মে কোন দোষ বা ত্রুটি থাকে না; কাবণ এই সমস্ত দোষ ত্রুটি অজ্ঞানেব অসমতা হইতেই উদ্ভূত। সমান ব্রহ্ম দোষশূন্য, নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম, পাপপুণ্যেব গণ্ডগোলেব উপবে, ব্রহ্মেব মধ্যে বাস কবিয়া আমরাও পাপপুণ্যেব উপবে উঠি, আমবা সেই শুচিতায় নির্মলভাবে সমতাব সহিত সর্বভূতেব হিতকামনাকেই একমাত্র লক্ষ্য কবিযা কর্ম কবি, ক্ষীণকল্মষাঃ, সর্ববভূতহিতে বতাঃ। আমাদেব অজ্ঞানেব অবস্থাতেও আমাদের হৃদিস্থিত ঈশ্বরই আমাদেব কর্মেব কাবণ, তবে তিনি তাঁহাব মাযাব ভিতব দিয়া, আমাদেব নীচের প্রকৃতিব অহঙ্কাবেব ভিতব দিযা আমাদিগকে পবিচালিত কবেন; এই প্রকৃতিই আমাদেব কর্মসমূহেব জটিল জাল সৃষ্টি করে এবং তাহাদেব জটিল প্রতিক্রিয়া-সকলেব প্রতিঘাত আমাদেব অহং-এব উপব আনিয়া দেয, সেই সব প্রতিক্রিয়াই আভ্যন্তবীণভাবে পাপ ও পুণ্যরূপে এবং বাহ্যিকভাবে দুঃখ ও সুখরূপে, দুর্ভাগ্য ও সৌভাগ্যরূপে আমাদিগকে বিচলিত কবে, ইহাই কর্মের বিবাট শৃঙ্খল। যখন আমবা জ্ঞানেব দ্বাবা মুক্ত হই, তখন ঈশ্বব আব আমাদেব হৃদয়ে গুপ্তভাবে থাকেন না, আমাদেব পবম আত্মারূপে সাক্ষাৎভাবে আমাদেব সমুদয় কর্ম গ্রহণ করেন, জগতেব সাহায্যেব নিমিত্ত আমাদিগকে নির্দোষ যন্ত্রভাবে, নিমিত্তমাত্রম্ ব্যবহাব করেন। জ্ঞান ও সমতাব নিগূঢ় মিলন এইরূপই; বুদ্ধিতে যাহা জ্ঞান তাহাই প্রকৃতিতে সমভাব রূপে প্রতিফলিত, ঊর্ধ্বে, চেতনাব উচ্চতব ভূমিতে জ্ঞান হয সত্তাব জ্যোতি এবং সমতা হয প্রকৃতির উপাদান।

এই "জ্ঞান" শব্দটি ভাবতীয় দর্শন ও যোগশাস্ত্রে সর্বত্র এই পরম আত্মজ্ঞানের অর্থেই ব্যবহৃত হইযাছে, যে জ্যোতির দ্বারা বর্ধিত হইযা আমরা আমাদেব স্বরূপ প্রাপ্ত হই তাহাই জ্ঞান, যে জ্ঞানেব দ্বাবা আমবা নানা বিষয় জানিতে পাবি নানাদিক হইতে নানা তথ্য সংগ্রহ কবিযা আমাদেব মনের ভাণ্ডার পূর্ণ করি, ভাবতীয় শাস্ত্রে তাহাকে জ্ঞান বলা হয নাই, পাশ্চাত্যদেশে জড়বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, দর্শন, নীতিশাস্ত্র, সৌন্দর্যনীতি, বাজনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতিই জ্ঞান বলিযা পবিচিত, ভাবতে জ্ঞান বলিতে এসব বুঝায না। এইসব জ্ঞানেব দ্বাবাও যে আমাদেব বিকাশে সাহায্য হয তাহাতে সন্দেহ নাই, তবে এসব জীবনেব বিবর্তনে সাহায্য কবিতে পাবে, কিন্তু আত্মস্বরূপলাভে কোন সাহায্য করিতে পাবে না। যৌগিক জ্ঞানেব সংজ্ঞাব মধ্যে এইসব জ্ঞান তখনই স্থান পায় যখন

পরমতমকে, আত্মাকে, ভগবানকে জানিবাব জন্য আমবা ইহাদেব সাহায্য গ্রহণ করি; যখন জড়বিজ্ঞানের সাহায্যে আমবা জগতেব বাহ্য দৃশ্য ও ঘটনাবলীব রহস্য ভেদ করি এবং তাহাদের পশ্চাতে তাহাদেব কাবণ স্বরূপ যে এক সত্য বস্তু রহিযাছে তাহাব সন্ধান পাই, যখন মনোবিজ্ঞানেব সাহায্যে আমবা নিজদিগকে জানিতে পারি, আমাদেব ভিতর নীচেব খেলা ও উপবেব খেলাব প্রভেদ, অপবা প্রকৃতি ও পরা প্রকৃতিব প্রভেদ বুঝিতে পাবি এবং একটিকে বর্জন কবিযা অপরটিতে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারি, যখন দর্শনশাস্ত্রেব আলোকে আমবা জগতেব মূলতত্ত্বগুলি জানিতে পারি এবং যাহা সৎ, যাহা নিত্য তাহাব মধ্যে বাস কবিতে পাবি, যখন নীতিশাস্ত্রের সাহায্যে আমবা পাপপুণ্যেব প্রভেদ বুঝিতে পাবি এবং পাপকে বর্জন কবিযা, পুণ্যেবও উপবে উঠিযা দিব্য প্রকৃতিব শুদ্ধ পবিত্রতাব মধ্যে বাস করিতে পাবি, যখন কলাবিজ্ঞানেব সাহায্যে আমবা দিব্য সৌন্দর্যেব সন্ধান পাই, যখন সাংসাবিক ব্যবহারিক জ্ঞানেব সাহায্যে আমবা দেখিতে পাই ভগবান তাঁহার জীবগণের প্রতি কিরূপ ব্যবহার কবিতেছেন এবং মানুষেব সেবাব ভিতব দিয়া ভগবানেবই সেবা কবিতে এই জ্ঞানকে লাগাইতে পাবি, কেবল তখনই এই সকল জ্ঞানকে যৌগিক জ্ঞানের অন্তর্গত বলিযা ধবা যাইতে পাবে, তখনও এই সব জ্ঞান কেবলমাত্র সহায়তাই কবিতে পাবে, প্রকৃত যে জ্ঞান তাহা মনেব অগোচর, মন কেবল তাহাব ছাযামাত্র পাইতে পারে, সে জ্ঞানেব স্থান হইতেছে আত্মায়।

কিরূপে এই জ্ঞান আমবা লাভ কবিতে পারি সে সম্বন্ধে গীতা বলিযাছে যে, এই জ্ঞানেব প্রথম দীক্ষা লাভ করিতে হয় তত্ত্বদর্শী জ্ঞানীগণেব নিকট—যাঁহাবা শুধু বিচার বিতর্ক করিয়া নহে, কিন্তু প্রত্যক্ষ কবিয়া তত্ত্বজ্ঞান লাভ কবিযাছেন, জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ (৪।৩৪), কিন্তু এই জ্ঞান প্রকৃতভাবে লাভ কবা যায নিজেদেব ভিতব হইতে—"তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি" (৪।৩৮), যে ব্যক্তি যোগের দ্বাবা সিদ্ধ হইয়াছেন তিনি সেই জ্ঞান যথাসময়ে স্বীয অন্তঃকবণে স্বয়ং লাভ করেন, অর্থাৎ এই জ্ঞান ভিতব হইতে বিকশিত হইযা উঠে, এবং তিনি বাসনাশূন্যতায়, সমতায়, ভগবদ্ভক্তিতে যত বর্ধিত হন, এই জ্ঞানেও তেমনি বর্ধিত হন। কেবল পরম জ্ঞান সম্বন্ধেই এই কথা বলা যাইতে পাবে, মানুষেব বুদ্ধি যে জ্ঞান সঞ্চয় করে তাহা ইন্দ্রিয়েব ও বিচাবশক্তিব সাহায্যে কষ্টেসৃষ্টে বাহিব হইতে সংগ্রহ করিতে হয়। পরম জ্ঞান স্বতঃসিদ্ধ, প্রত্যক্ষানুভূত, স্বপ্রকাশ—ইহা লাভ কবিতে হইলে মন ও ইন্দ্রিযকে বশীভূত ও সংযত কবিতে হইবে, সংযতেন্দ্রিযঃ, যেন আব আমবা তাহাদের ছলনায় ভ্রান্ত না হই, কিন্তু মন ও ইন্দ্রিযগণ যেন সেই পরম জ্ঞানের নির্মল দর্পণ স্বরূপ হয়; যে পরম সত্তাব মধ্যে সর্বভূত বহিযাছে, আমাদের সমগ্র চেতনাকে তাহার সহিত যুক্ত কবিতে হইবে, তৎপবঃ—এইরূপে তাহার জ্যোতির্ময় স্বপ্রতিষ্ঠ সত্তা আমাদেব মধ্যে উদ্ভাসিত হইযা উঠিবে।

আর চাই আমাদের এমন শ্রদ্ধা, এমন বিশ্বাস, কোনরূপ সংশযেই যাহাকে

বিচলিত হইতে দেওযা চলিবে না; শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং,

অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশযাত্মা বিনশ্যতি।
নাযং লোকোঽস্তি ন পবো ন সুখং সংশযাত্মনঃ॥৪।৪০

"যে অজ্ঞান ব্যক্তিব বিশ্বাস নাই, যাহাব আত্মা সংশয়যুক্ত, সে বিনষ্ট হয; সন্দেহাকুলচিত্ত মানবের ইহলোকও নাই, পবলোকও নাই, কোন সুখও নাই।" বস্তুত ইহা সত্য যে, বিশ্বাস ভিন্ন ইহজগতে স্থাযী কিছু সম্পাদন করা যায় না, কিংবা উর্ধ্বলোক লাভেব নিমিত্তও কিছু করা যায না, কোন নিশ্চিত ভিত্তি ও দৃঢ় অবলম্বনকে ধবিতে না পাবিলে ইহকালের বা পরকালের কাজ কিছুই সফল করা যায না, কোন তৃপ্তি বা সুখ লাভ করা যায না, যে মন কেবল সংশয়পূর্ণ তাহা শূন্যতাব মধ্যে নিজেকে হাবাইযা ফেলে। তবু কিন্তু নিম্নস্তবেব জ্ঞানে সংশয় ও অবিশ্বাসেব সাময়িক প্রযোজনীয়তা আছে; উপবেব জ্ঞানে এসব বিষম বাধা, কাবণ সেখানকাব গূঢ়তত্ত্ব এই যে, সেখানে বুদ্ধির দ্বারা সত্য-অসত্যের বিচাব কবিতে কবিতে অগ্রসব হইতে হয না, পবন্তু স্বতঃ প্রকাশমান সত্যকে ক্রমশ বেশী প্রত্যক্ষ ও উপলব্ধি করিতে করিতেই অগ্রসর হইতে হয। বুদ্ধিব স্তরে যে জ্ঞান তাহাব সহিত সকল সমযেই অসম্পূর্ণতা, বা মিথ্যা মিশিযা রহিয়াছে, অতএব সংশয দৃষ্টিতে এই জ্ঞানকে পবীক্ষা করিযা মিথ্যাব ভাগ বর্জন করিতে হয়; কিন্তু উচ্চস্তবেব জ্ঞানে মিথ্যা স্থান পাইতে পাবে না এবং নানা মতের সংস্পর্শে আসিয়া বুদ্ধি যে সংশয উৎপাদন কবে তাহা কেবল বিচারের দ্বাবা দূব কবা যায না, ক্রমশ অনুভূতি ও উপলব্ধি দ্বাবা সে সংশয আপনা হইতেই দূব হইয়া যায়। এইরূপে লব্ধজ্ঞানে যেকোন অসম্পূর্ণতা থাকুক না কেন, তাহা দূর কবিতে হইলে যতটুকু উপলব্ধি হইযাছে তাহাতে সংশয় করিলে চলিবে না, কিন্তু আত্মাব মধ্যে গভীরতব, উচ্চতব ভাবে বাস কবিযা পূর্ণতর অনুভূতি ও উপলব্ধি দ্বারা সে অসম্পূর্ণতা দূব কবিতে হইবে। যেটুকু এখনও অনুভূত হয নাই, বিশ্বাসের দ্বারাই তাহাব জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে, সন্দেহপূর্ণ বিচাবের দ্বাবা নহে; কারণ এই জ্ঞান দান কবা বিচাব-বিতর্কেব সাধ্যাতীত, বাস্তবিক বিচার-বিতর্কেব দ্বাবা মন যেসকল ধাবণাব মধ্যে জড়াইযা পড়ে, অনেক সমযেই সেসব উচ্চস্তবেব জ্ঞানের সম্পূর্ণ বিপবীত—এই সত্য বিচাবেব দ্বাবা প্রমাণের বিষয় নহে, জীবনের মধ্যে ইহাকে ফুটাইযা তুলিতে হয, ক্রমবিকাশের দ্বাবা আমাদিগকে যে উচ্চতব আত্মস্বরূপ লাভ কবিতে হইবে ইহা সেই সত্য। শেষতঃ, এই সত্য হইতেছে স্বয়ংসিদ্ধ, আমবা যে অজ্ঞানেব ছলনাব মধ্যে বাস কবি তাহা না থাকিলে ইহা আপনিই প্রকাশ হইত, যে সংশয মোহ আমাদিগকে এই সত্য দেখিতে ও অনুসবণ করিতে দেয় না তাহা সেই অজ্ঞান হইতেই আসে, অজ্ঞানসম্ভূতং হৃৎস্থম্ সংশয়ম্—আমাদেব ইন্দ্রিযবিক্ষুব্ধ, নানা মতে ভ্রান্ত হৃদয ও মন নীচের ব্যবহাবিক সত্যে ডুবিযা আছে বলিযাই তাহাবা উপবেব সত্য বস্তু সম্বন্ধে সন্দিহান হয। গীতা বলিয়াছে, জ্ঞানরূপ

অসিব দ্বারা এই সংশয় ছেদন কবিতে হইবে, অনুভূতি উপলব্ধি দ্বাবা এই সন্দেহ দূব করিতে হইবে, সতত যোগেব অনুসবণ কবিযা অর্থাৎ যস্মিন্ বিজ্ঞাতে সর্ব্বং বিজ্ঞাতং, যাঁহাকে জানিলে সব জানা যায, সেই পবম পুরুষেব সহিত যোগে জীবনযাপন কবিয়া সকল সন্দেহ ভ্রান্তি নিবসন কবিতে হইবে।

তস্মাদজ্ঞানসম্ভূতং হৃৎস্থং জ্ঞানাসিনাত্মনঃ।
ছিত্ত্বৈনং সংশয়ং যোগমাতিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভাবত॥৪।৪২

সর্বদা ব্রহ্মে অবস্থিত ব্রহ্মবিৎ ব্যক্তি সকল সময়েই সেই উচ্চতব জ্ঞানেব আলোকে সমস্ত জিনিস অবলোকন কবেন। তাহা অন্য জিনিসকে ছাড়িযা কেবলমাত্র ব্রহ্মকে দেখা নহে, পরন্তু সমস্ত জিনিসকেই ব্রহ্মে দেখা এবং আত্মা বলিযা দেখা। কারণ গীতা বলিযাছে, যে জ্ঞান লাভ কবিলে আব আমাদিগকে আমাদের মানসিক প্রকৃতির মোহজালেব মধ্যে পুনরায পড়িতে হয না, "সেই জ্ঞানের দ্বাবা তোমবা সর্বভূতকেই (কাহাকেও বাদ না দিযা) আত্মাতে দেখিবে, পরে আমাতে দেখিবে।"

যজ্জ্ঞাত্বা ন পুনর্মোহমেবং যাস্যসি পাণ্ডব।
যেন ভূতান্যশেষেণ দ্রক্ষ্যস্যাত্মন্যথো ময়ি॥৪।৩৫

এই কথাই গীতা অন্যত্র আবও বিস্তাবিতভাবে বলিযাছে—

সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ॥৬।২৯
যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি॥৬।৩০
সর্ব্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ।
সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ত্ততে॥৬।৩১
আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জ্জুন।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পবমো মতঃ॥৬।৩২

"সর্বত্র সমদর্শী যোগী সর্বভূতে আত্মা এবং আত্মাতে সর্বভূত দর্শন করেন। যিনি আমাকে সর্বত্র দেখেন এবং সকলকে ও প্রত্যেককেই আমাব মধ্যে দেখেন আমি তাহাকে কখনও হাবাই না, তিনিও আমাকে কখনও হাবান না। যিনি একত্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন এবং সর্বভূতে অবস্থিত আমাকে ভজনা কবেন, তিনি যেখানে থাকুন আব যাহাই করুন না কেন, তিনি আমাব মধ্যেই বাস কবেন, কর্ম কবেন। হে অর্জুন, যিনি সুখে দুঃখে সর্বত্র সকলকে সমানভাবে নিজেব মত দেখেন আমাব মতে তিনিই শ্রেষ্ঠ যোগী।" ইহাই উপনিষদের প্রাচীন বৈদান্তিক জ্ঞান, এই জ্ঞানকে গীতা সর্বদা আমাদেব সম্মুখে ধরিয়াছে, তবে এই জ্ঞানেব অন্যান্য পববর্তী

বিবৃতিব তুলনায গীতার শ্রেষ্ঠত্ব এই যে, এই জ্ঞানেব সাহায্যে কেমন করিয়া কার্যত দিব্যজীবন গড়িযা তুলিতে হয তাহাবই উপর গীতা একান্তভাবে ঝোঁক দিযাছে। এই ঐক্যজ্ঞানেব সহিত কর্মযোগের সম্বন্ধ গীতায বার বাব বিশেষভাবে দেখান হইযাছে—দেখান হইয়াছে যে, সংসাবে মুক্তভাবে কর্ম করিবার ভিত্তিই হইতেছে এই ঐক্যেব জ্ঞান। গীতা যখনই জ্ঞানের কথা বলিযাছে, তখনই ইহাব ফলস্বরূপ সমতাব কথাও বলিযাছে, গীতা যখনই সমতার কথা বলিয়াছে তখনই এই সমতাব ভিত্তিস্বরূপ জ্ঞানেব কথাও বলিতে অগ্রসর হইয়াছে। গীতা যে সমতাব উপদেশ দিযাছে তাহাব আবম্ভ এবং শেষ কেবল আত্মমুক্তিব উপযোগী নিশ্চল অধ্যাত্ম অবস্থায় নহে, তাহা সকল সময়েই কর্মেব ভিত্তি। মুক্ত পুরুষেব আত্মায প্রতিষ্ঠারূপে থাকে ব্রহ্মেব শান্তি; মুক্ত প্রকৃতিতে ঈশ্বরেব বিরাট, মুক্ত, সম, বিশ্বব্যাপী কর্ম সেই শান্তি হইতে উত্থিত শক্তি বিকীরণ কবে। এই দুইকে এক কবিযাই দিব্যকর্ম ও ভাগবত জ্ঞানেব সমন্বয হয।

অন্যান্য দর্শন, নীতি বা ধর্মশাস্ত্রে জীবনেব যে সকল আদর্শ বহিযাছে, গীতা সেসব লইযা তাহাদেব কিরূপ গভীর বিস্তাব সাধন করিযাছে তাহা এখন সহজেই বুঝা যায। সহিষ্ণুতা, দার্শনিক উদাসীনতা এবং নতি যে তিন প্রকার সমতার ভিত্তি তাহা আমবা বলিযাছি, গীতা যে কেবল এই তিনটিরই সমন্বয় সাধন কবিযাছে শুধু তাহাই নহে, গীতা তাহাদিগকে অসীম গভীরতা এবং অপূর্ব উদাব সার্থকতা প্রদান করিয়াছে। সহিষ্ণুতাব দ্বারা আত্মজয় করিবার যে শক্তি আত্মার আছে তাহার জ্ঞানই স্তোযিক জ্ঞান (stoic knowledge), নিজেব প্রকৃতির সহিত যুদ্ধ কবিযাই সমতা লাভ করিতে হয়, সতত সজাগ দৃষ্টি, খাড়া পাহারার দ্বাবা প্রকৃতিব স্বাভাবিক বিদ্রোহসমূহকে দমন কবিযা এই সমতা বজায বাখিতে হয, ইহা হইতে একটা মহৎ শান্তি, একটা কঠোর সুখ পাওযা যায়, কিন্তু মুক্ত পুরুষেব জীবনে যে পবম আনন্দ তাহা লাভ কবা যায না; এই মুক্ত পুরুষের জীবন বিধিনিষেধ অনুসাবে যাপিত হয় না, তাঁহাব দিব্যসত্তাব শুদ্ধ সহজ স্বতঃস্ফূর্ত সিদ্ধাবস্থাতে তিনি জীবন যাপন করেন—সর্বথা বর্ত্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ত্ততে—"তিনি যেখানেই থাকুন আব যাহাই করুন, তিনি ভগবানের মধ্যেই বাস কবেন, কর্ম করেন," কারণ এখানে সিদ্ধি শুধু লব্ধই হয় না, জন্মগত অধিকাব হইযা উঠে, উহাকে চেষ্টা করিযা রক্ষা কবিতে হয় না কারণ উহা আত্মাব প্রকৃতিগত হইযা পড়ে। আমাদেব নীচেব প্রকৃতিকে জয় করিতে সাধনার প্রথমাবস্থায ধৈর্য ও তিতিক্ষার সার্থকতা গীতা স্বীকার করিয়াছে কিন্তু নিজেদেব ব্যক্তিগত চেষ্টায কতকটা জযলাভ কবিতে পারিলেও পূর্ণজয়েব মুক্তি লাভ কবিতে হইলে ভগবানেব সহিত যোগসাধন ভিন্ন আর অন্য কোন উপায নাই—সেই এক দিব্য পুরুষেব সত্তায় নিজেদের ব্যক্তিত্বকে ডুবাইয়া দিতে হইবে, তাঁহার মধ্যে বাস কবিতে হইবে, ভগবদিচ্ছাব মধ্যে ব্যক্তিগত ইচ্ছাকে লয় করিতে হইবে। প্রকৃতিব এবং তাহাব কর্মের একজন দিব্য অধীশ্বর আছেন, তিনি প্রকৃতির

মধ্যে বাস করিয়াও প্রকৃতির ঊর্ধ্বে, তিনিই আমাদের উচ্চতম সত্তা, আমাদের বিশ্বব্যাপী আত্মা; তাঁহার সহিত এক হওয়াই আমাদের দিব্যাবস্থালাভ। ভগবানের সহিত যুক্ত হইয়া আমরা পূর্ণ মুক্তি ও পরম জয় লাভ করি। স্তোয়িকদের যে আদর্শ, যে জ্ঞানীব্যক্তি আত্মজয়ের দ্বারা বাহ্য পারিপার্শ্বিক অবস্থাকেও জয় করিয়া রাজা হইয়াছেন, তাঁহার সহিত বেদান্তের স্বরাট, সম্রাট আদর্শের বাহ্যিক সাদৃশ্য আছে; কিন্তু তাহা হইতেছে নীচের স্তরে। স্তোয়িকের প্রভুত্ব আত্মার উপর ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর বল প্রয়োগ করিয়া বজায় রাখিতে হয়, যোগীর যে পূর্ণ মুক্ত প্রভুত্ব তাহা দিব্যপ্রকৃতির চিরন্তন ঈশ্বরত্ব হইতে স্বাভাবিকভাবে উদ্ভূত—নীচের প্রকৃতি যাহার যন্ত্রমাত্র, ঊর্ধ্বে সেই দিব্যপ্রকৃতির মুক্ত বিশালতায় বাস করিয়াই এই পূর্ণ জয়ে, পূর্ণ স্বাধীনতায় সহজ স্বতঃসিদ্ধভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায়। তিনি সকল জিনিসের উপর প্রভুত্ব লাভ করেন তাহার কারণ এই যে, তিনি সকল জিনিসের সহিত একাত্মা হন, সর্ব্বভূতাত্মভূতাত্মা। প্রাচীন রোমক সমাজের একটি দৃষ্টান্ত লইয়া স্তোয়িক মুক্তি বুঝান যাইতে পারে—যে ক্রীতদাসকে তাহার যোগ্যতার জন্য মুক্তি দেওয়া হইত (libertus) সে যেমন মুক্ত হইয়াও বস্তুত পূর্ব প্রভুরই অধীন থাকিত, স্তোয়িক সাধনায় মুক্ত ব্যক্তিকেও প্রকৃতি তেমনই তাহার যোগ্যতার জন্য মুক্তি দেয়। কিন্তু গীতা যে মুক্তির কথা বলিয়াছে তাহা স্বাধীন মনুষ্যের (freeman) জন্মগত স্বাধীনতা, দিব্যপ্রকৃতিতে জন্মলাভ করিয়া সেই সত্য স্বাধীনতা লাভ করা যায়, তাহা দিব্য সত্তায় স্বপ্রতিষ্ঠ। মুক্ত পুরুষ যাহাই করুন, যেখানেই থাকুন, তিনি ভগবানের মধ্যে বাস করেন, তিনি বাড়ীর দুলাল, বালবৎ, তাঁহার ভুল হইতে পারে না, পতন হইতে পারে না কারণ তিনি নিজে যাহা এবং তিনি যাহা করেন সেসবই সিদ্ধ, পরম আনন্দময়, পরম প্রেমময়, পরম সুন্দর। তিনি যে রাজ্য ভোগ করেন, রাজ্যম্ সমৃদ্ধম্, তাহা সুখ ও মধুরতার রাজ্য, তাহার সম্বন্ধে গ্রীক পণ্ডিতের গভীর ভাষায় বলা যায়, "শিশুর রাজ্য—The Kingdom is of the child "

বিশ্বজগতের প্রকৃত ধারা, বাহ্যবস্তুর অনিত্যতা, সাংসারিক ভেদ-বৈষম্যের নিরর্থকতা এবং আভ্যন্তরীণ ধীরতা, শান্তি, জ্যোতি ও আত্মনির্ভরতার সার্থকতা, এই সবের জ্ঞানই দার্শনিক[১] জ্ঞান। ইহা দার্শনিক জ্ঞানলব্ধ উদাসীনতার সমতা, ইহা হইতে একটা উচ্চ শান্তভাব আসে কিন্তু উচ্চতর আধ্যাত্মিক আনন্দ লাভ করা যায় না, এই মুক্তি সংসার হইতে বিচ্ছিন্ন অবস্থা—উত্তাল তরঙ্গসঙ্কুল সমুদ্রের মধ্যে পড়িয়া কত লোক হাবুডুবু খাইতেছে, এই দুরবস্থা হইতে দূরে উচ্চ

[১] ইংরাজী 'Philosophy' শব্দের প্রতিশব্দস্বরূপ বাংলায় 'দর্শন' শব্দ ব্যবহারই প্রচলিত রীতি এবং আমরাও সেই রীতি অনুসরণ করিয়াছি। তবে মনে রাখা উচিত যে, Philosophy তত্ত্বদর্শী ঋষির অপরোক্ষানুভূত তত্ত্বজ্ঞান নহে, মানসিক বুদ্ধির দ্বারা বিচার বিতর্ক করিয়া যে জ্ঞান লাভ করা যায় তাহা লইয়াই 'Philosophy'।

শৈলশিখর হইতে কেহ যেরূপ অন্যান্য সকলের দুরবস্থা দর্শন করে ইহাও সেইরূপ—শেষ পর্যন্ত ইহা সংসার হইতে বিচ্ছিন্ন অবস্থা ভিন্ন আর কিছুই নহে এবং ইহা সংসারের কোন কাজেই লাগে না। সাধনার প্রথমাবস্থায় এরূপ দার্শনিক উদাসীনতার যে উপযোগিতা আছে গীতা তাহা স্বীকার করিয়াছে। কিন্তু যে উদাসীনতা গীতার চরম লক্ষ্য তাহাতে সংসারকে উপেক্ষার কোন ভাব নাই; সে অবস্থাকে ঠিক উদাসীনতা বলা চলে কি না সন্দেহ। যেন উচ্চে বসিয়া আছে একরূপ একটা ভাব সে অবস্থায় আছে বটে, উদাসীনবৎ, কিন্তু যেমন ভগবান উচ্চে বসিয়া রহিয়াছেন—সংসারে তাঁহার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই, তথাপি তিনি সর্বদা কর্ম করিতেছেন এবং সর্বত্র বর্তমান থাকিয়া জীবকে ধরিয়া রাখিয়াছেন, সাহায্য করিতেছেন, পথ দেখাইয়া দিতেছেন। সর্বভূতের সহিত একত্বের উপলব্ধির উপর এই সমতা প্রতিষ্ঠিত। দার্শনিক সমতাতে যে অভাব আছে, এখানে তাহা পূর্ণ হইয়াছে; কারণ ইহার মূলে শান্তি আছে, উপরন্তু প্রেম আছে। এই সমতার অবস্থায় সর্বভূতকে নির্বিশেষে ভগবানের মধ্যে দেখা যায়, সর্বভূতের সহিত একাত্মবোধ হয়, অতএব সকলের প্রতিই পরম সহানুভূতিসম্পন্ন হওয়া যায়। কেহই বাদ থাকে না, "অশেষেণ", কেবল যেসব বস্তু শুভ, সুন্দর ও আনন্দদায়ক শুধু সেইসবই নহে, যত নীচ, পতিত, পাপী কুরূপ হউক না কেন এই সার্বজনীন ঐকান্তিক সহানুভূতি ও আধ্যাত্মিক একত্ব হইতে কোন বস্তু, কোন ব্যক্তিকেই বাদ দেওয়া যাইতে পারে না। এখানে যে কেবল ঘৃণা, ক্রোধ বা হৃদয়হীনতার স্থান নাই শুধু তাহাই নহে, এখানে উপেক্ষা, তাচ্ছিল্য বা মহত্ত্বের গর্বেরও স্থান নাই। অবশ্য মানবমনের দ্বন্দ্ব ও অজ্ঞানের প্রতি দিব্য করুণা থাকিবে, তাহাকে জ্ঞান দিবার, শক্তি দিবার, আনন্দ দিবার দিব্য প্রবৃত্তি থাকিবে; কিন্তু মানুষের মধ্যে যে দিব্য আত্মা রহিয়াছে তাহার প্রতি আরও অধিক কিছু থাকিবে, ভক্তি ও প্রেম থাকিবে। কারণ সকলের ভিতর হইতে—যেমন সাধু ও জ্ঞানীর ভিতর হইতে, তেমনই চোর, চণ্ডাল, পতিতার ভিতর হইতেও প্রেমময় চাহিয়া আছেন এবং আমাদিগকে ডাকিয়া বলিতেছেন—"এখানেও আমি"। সর্ব্বভূতস্থিতং যো মাং ভজতি, "সর্বভূতের মধ্যে অবস্থিত আমাকে যে ভালবাসে"—দিব্য সর্বজনীন প্রেমের চরম পূর্ণতা ও গভীরতার এতবড় শক্তিমান কথা জগতের আর কোন্ শাস্ত্রে কোন্ ধর্মে বলা হইয়াছে?

নতি এক প্রকার ভক্তসুলভ সমতার ভিত্তি—এই সমতা ভগবানের ইচ্ছার সম্মুখে মাথা পাতিয়া দেওয়া, সংসারের সমস্ত দুঃখ কষ্ট ধীরভাবে সহ্য করা। গীতার এই ভাব হইয়াছে আরও পূর্ণতর, সমগ্র সত্তাকে সম্পূর্ণভাবে ভগবানের নিকট সমর্পণ করা। ইহা কেবলমাত্র নিষ্ক্রিয় নতি (passive submission) নহে, পরন্তু ইহা সক্রিয় আত্মদান (active self-giving)। গীতায় সমর্পণের অর্থ কেবল সমস্ত জিনিসেই ভগবানের ইচ্ছা দেখা এবং স্বীকার করিয়া লওয়া নহে, কিন্তু নিজের ইচ্ছাশক্তিকে সর্বকর্মের প্রভু ভগবানের যন্ত্র করিয়া দেওয়া; এই

যন্ত্রভাব কেবল নিম্নতর দাসভাব নহে,—প্রথমাবস্থায় যাহাই হউক, শেষ পর্যন্ত আমাদের চৈতন্য ও কর্ম এমন পূর্ণভাবে ভগবানে সমর্পণ করিতে হইবে যেন আমাদের সত্তা ভগবানের সত্তার সহিত এক হইয়া যায় এবং আমাদের নৈর্ব্যক্তিক-ভাবাপন্ন প্রকৃতি হয় কেবল একটি যন্ত্র, আর কিছুই নহে। শুভ-অশুভ, সুখ-দুঃখ, সৌভাগ্য-দুর্ভাগ্য—সকল প্রকার ফলই সর্বকর্মের প্রভু ভগবানের বলিয়াই গ্রহণ করা হয়, অতএব শেষ পর্যন্ত শোক-দুঃখ যে কেবল সহ্য করা হয় তাহা নহে, শোক-দুঃখ একেবারে লোপ পায়, হৃদয়ে পূর্ণ সমতা প্রতিষ্ঠিত হয়। যন্ত্রের ব্যক্তিগত ইচ্ছার কোন বোধ থাকে না, সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান বিশ্বপুরুষ পূর্ব হইতেই সব ঠিক করিয়া রাখিয়াছেন, মানুষের অহঙ্কার ভগবানের সেই ইচ্ছার কোন ব্যতিক্রমই করিতে পারে না, এই জ্ঞান হয়। অতএব শেষ ভাব হইবে যেমন একাদশ অধ্যায়ে অর্জুনকে নির্দেশ করা হইয়াছে—"আমার দিব্য ইচ্ছা ও ভবিষ্যৎ-দৃষ্টিতে আমি ইতিপূর্বেই সব করিয়া রাখিয়াছি, হে অর্জুন, তুমি এখন কেবল নিমিত্তমাত্র হও"—নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্ (১১।৩৩)। এইরূপ ভাব হইতে শেষে ব্যক্তিগত ইচ্ছার সম্পূর্ণ যোগ হয় এবং ক্রমশ জ্ঞানবৃদ্ধির সহিত এমন অবস্থা লাভ করা যায় যে তখন যন্ত্র সম্পূর্ণ নিখুঁতভাবেই ভগবানের শক্তি ও জ্ঞানে সাড়া দেয়। বিশ্বাতীত ও বিশ্বময় পুরুষের সহিত ব্যক্তির এই চরম মিলনের অবস্থায় আত্মসমর্পণের পূর্ণতম চরমতম সমতা প্রতিষ্ঠিত হয়, মন দিব্য আলোক ও শক্তির নমনীয় আধার হয়, সক্রিয় সত্তা জগতে এই দিব্য আলোক ও শক্তির মহান কার্যক্ষম যন্ত্র হয়।

অপরে আমাদের প্রতি যে ব্যবহার করে সে সম্বন্ধেও সমভাব হইবে। সর্বত্র এক আত্মাকে দর্শন করিয়া, সর্বভূতে ভগবানকে দর্শন করিয়া, অন্তরে যে একত্ব বোধ, প্রেম, সহানুভূতির উদয় হয় তাহা কিছুতেই বিচলিত হয় না, অপরে আমাদের প্রতি যেরূপ ব্যবহারই করুক না কেন। কিন্তু তাই বলিয়া তাহারা যাহা করিবে নির্বিরোধে তাহা মানিয়া লইতে হইবে এমন কোন কথাই নাই, এরূপ হইতেই পারে না, কারণ সংসারে লোকে আপন আপন অহঙ্কারের তৃপ্তির জন্য দ্বন্দ্ব বিরোধের সৃষ্টি করিতেছে, ভগবদিচ্ছার সহিত ইহাদের বিরোধ অবশ্যম্ভাবী, অতএব যাহারা সর্বদা ভগবদিচ্ছার যন্ত্রভাবে কার্য করিবে তাহাদিগকে সংসারে বাসনাচালিত অহঙ্কৃত নানা ব্যক্তির, নানা কর্মের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতেই হইবে। সেইজন্যই অর্জুন বাধা দিতে, যুদ্ধ করিতে, জয় করিতে আদিষ্ট হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহাকে ঘৃণা বা ব্যক্তিগত বাসনা বা ব্যক্তিগত শত্রুভাব পরিহার করিয়াই যুদ্ধ করিতে বলা হইয়াছে, কারণ মুক্ত পুরুষে এই সকল ভাব সম্ভবে না। নৈর্ব্যক্তিক-ভাবে লোকসংগ্রহের জন্য, ভাগবত আদর্শের দিকে লোক সকলকে পরিচালনার জন্য কর্ম করা, এই নীতি ভগবানের সহিত, বিশ্বপুরুষের সহিত জীবের একাত্মবোধ হইতেই উত্থিত হয়, কারণ বিশ্বকর্মের উহাই সমগ্র লক্ষ্য ও অর্থ। আবার সর্বভূতের সহিত আমাদের যে একত্ব তাহারও সহিত এই নীতির কোন

বিরোধ নাই, হউক না কেন এখানে অনেকেই আমাদের সম্মুখে শত্রু বা প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে উপস্থিত। কারণ ভাগবত আদর্শ তাহাদেরও আদর্শ, যাহাদের বাহ্য মন অজ্ঞান ও অহঙ্কারের দ্বারা বিপথে চালিত হয় এবং ভাগবত উদ্দেশ্যের বিরুদ্ধে দাঁড়ায় তাহাদেরও নিগূঢ় লক্ষ্য হইতেছে ভাগবত আদর্শে পৌঁছান। তাহাদিগকে বাধা দিলে বা পরাস্ত করিলেই তাহাদের সর্বোৎকৃষ্ট বাহ্যিক সেবা বা উপকার করা হয়। ইহা উপলব্ধি করিয়া গীতা বাহ্যিক ব্যবহার-বৈষম্যের অবশ্যম্ভাবিতা অস্বীকার করে নাই, কিংবা অজ্ঞানজনিত দুর্বল অনুকম্পার উপদেশ দেয় নাই, কিন্তু আন্তরিক জ্ঞানসম্মত সমতা ও প্রেমের আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। আত্মায় সকলের সহিত একত্ব থাকিবে, হৃদয়ে সকলের প্রতি শান্ত সর্বজনীন প্রেম, সহানুভূতি, করুণা থাকিবে, কিন্তু হস্ত মুক্ত থাকিবে নৈর্ব্যক্তিকভাবে কল্যাণ সাধন করিতে, মানবজাতিকে শুভ ও মোক্ষের পথে আগাইয়া দিতে, সর্বভূতের সমগ্র হিতসাধন করিতে; এই ব্যক্তির বা ঐ ব্যক্তির বাহ্যিক মঙ্গল করিতে যাইয়া কখনই তাহা ভাগবত কার্যের বিরুদ্ধাচরণ করিবে না।

ভগবানের সহিত একত্ব, সর্বভূতের সহিত একত্ব, সর্বত্র সনাতন দিব্য ঐক্যের উপলব্ধি এবং সকল মনুষ্যকে এই একত্বের দিকে টানিয়া লওয়া—ইহাই জীবনের ধর্মরূপে গীতায় উপদিষ্ট হইয়াছে। ইহা অপেক্ষা গভীর, উদার, মহৎ ধর্ম আর কিছুই হইতে পারে না। নিজে মুক্ত হইয়া এই একত্বের মধ্যে বাস করা, যে পথে ইহা লাভ করা যায় সমস্ত মানবজাতিকে সেই পথে অগ্রসর হইতে সাহায্য করা, এবং ইতিমধ্যে সমস্ত কর্ম ভগবদর্থে সম্পাদন করা এবং অপরকেও এইরূপে সম্মতি ও আনন্দের সহিত আপন আপন কর্তব্য সম্পাদনে প্রবৃত্ত করা, কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ, সর্ব্বকর্ম্মাণি জোষয়ন্—দিব্যকর্মের ইহা অপেক্ষা উদার বা মহৎ নীতি আর কিছু দিতে পারা যায় না। এই মুক্তি এবং এই একত্বই আমাদের মানবীয় প্রকৃতির নিগূঢ় লক্ষ্য এবং মানবজাতির জীবনে ইহাই চরম ইচ্ছা। সমগ্র মানবজাতি আজ যে সুখের জন্য বৃথা খুঁজিয়া মরিতেছে তাহার জন্য এইদিকে ফিরিতেই হইবে, যখন মানুষ একবার নিজেদের মধ্যে ও চারিদিকে, সর্বেষু, সর্বত্র ভগবানকে দেখিবার জন্য চক্ষু ও হৃদয়কে উন্মুক্ত করিবে এবং শিখিবে যে, তাহারা ভগবানের মধ্যেই বাস করিতেছে, এই নীচের প্রকৃতি কেবল কারাপ্রাচীর মাত্র, ইহাকে ভাঙিয়া ফেলিতেই হইবে, বড় জোর ইহা শৈশবের পাঠশালা মাত্র, ইহাকে ছাড়াইয়া উঠিতেই হইবে তবেই আমরা প্রকৃতিতে সাবালক হইতে পারিব, আত্মায় মুক্ত স্বাধীন হইতে পারিব। ভগবান ঊর্ধ্বে রহিয়াছেন, মনুষ্যের মধ্যে রহিয়াছেন, জগতের মধ্যে রহিয়াছেন—সেই সর্বত্র বিরাজমান ভগবানের সহিত একাত্ম হইতে হইবে, ইহাই মুক্তির অর্থ, ইহাই সিদ্ধির পরম রহস্য।

একবিংশ অধ্যায়

প্রকৃতির নিয়ন্তৃত্ব

আত্মজ্ঞান ও কর্মের ঐক্যের দ্বারা যখন আমরা ঊর্ধ্বতন আত্মার মধ্যে বাস করিতে পারি, তখন আমরা প্রকৃতির নিম্নতম কর্মপদ্ধতির ঊর্ধ্বে উঠি। তখন আর আমরা প্রকৃতি ও তাহার গুণসকলের অধীন থাকি না, কিন্তু আমাদের প্রকৃতির প্রভু ঈশ্বরের সহিত এক হইয়া প্রকৃতিকে আমাদের মধ্যে ভগবদ্ ইচ্ছার উদ্দেশ্যসাধনে নিযোজিত করিতে পারি, তখন আর আমাদিগকে কর্মবন্ধনের অধীন হইতে হয় না; কারণ আমাদের মধ্যে যে মহত্তর আত্মা তাহা তিনিই, তিনি প্রকৃতির কর্মের অধীশ্বর, তাহার প্রতিক্রিয়াসকলের বিক্ষুব্ধ আঘাত তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। অন্যপক্ষে যে আত্মা অজ্ঞান অবস্থায় প্রকৃতির মধ্যে রহিয়াছে সে সেই অজ্ঞানের দ্বারাই প্রকৃতির গুণে বদ্ধ হয়, কারণ সেখানে সে তাহার প্রকৃত সত্তার সহিত, প্রকৃতির ঊর্ধ্বে যে ভগবান রহিয়াছেন তাঁহার সহিত নিজেকে স্বচ্ছন্দে এক করিয়া দেখে না পরন্তু নির্বোধভাবে এবং অস্বচ্ছন্দে মনের "আমি"কেই নিজের স্বরূপ বলিয়া দেখে, এই "আমি" নিজেকে যত বড়ই দেখাক না কেন ইহা বস্তুত প্রকৃতির ক্রিয়ার একটি নীচের অংশমাত্র, ইহা কেবল একটি মানসিক গ্রন্থি, একটি কেন্দ্র, ইহাকে ধরিয়া প্রকৃতির কর্মধারাসকলের খেলা চলে। এই গ্রন্থিকে ছিন্ন করা, "আমি"-কেই আর আমাদের কর্মের কেন্দ্র ও ভোক্তা না করা পরন্তু দিব্য পরমপুরুষ হইতেই সব প্রেরণা লাভ করা এবং তাঁহাকেই সব-কিছু উৎসর্গ করা—ইহাই হইতেছে প্রকৃতির গুণসকলের সকল অশান্ত বিক্ষোভের অতীত হইবার পন্থা। কারণ তখন আমরা পরম চৈতন্যের মধ্যে বাস করি, মনের "আমি" হইতেছে তাহার একটা নীচের রূপ মাত্র, তখন আমরা ভাগবত ইচ্ছা ও শক্তির সাম্যে ও ঐক্যে কর্ম করি, গুণসকলের খেলার অসাম্যে নহে, এই খেলা হইতেছে একটা ঐক্যহীন প্রয়াস, একটা বিক্ষোভ, একটা নীচের মায়া।

গীতা যেসকল স্থানে অহংকে প্রকৃতির অধীন বলিয়াছে, কেহ কেহ সেই সকলের অর্থ এইরূপ বুঝিয়া থাকেন যে, গীতার মতে বিশ্বজগতের কাহারও কোনরূপ স্বাধীনতা নাই, সবই অলঙ্ঘ্য যন্ত্রবৎ নিয়মের দ্বারা সম্পাদিত হইয়া থাকে। অবশ্য গীতা যেরূপ ভাষা প্রয়োগ করিয়াছে তাহা খুবই জোরের, এবং তাহা একেবারেই চরম বলিয়া মনে হয়। কিন্তু যেমন অন্যত্র তেমনি এখানেও আমাদিগকে গীতার কথাটিকে সমগ্রভাবে ধরিতে হইবে, অন্যান্য অংশ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া স্বতন্ত্রভাবে ইহার অর্থ করিলে চলিবে না, কারণ প্রত্যেক সত্য, তা নিজে যতই সত্য হউক না কেন—অন্য যে সব সত্য তাহার সীমা নির্দিষ্ট করিয়া

দেয় এবং সেই সঙ্গেই তাহাকে পূর্ণ করিয়া তোলে সেসব হইতে তাহাকে বিচ্ছিন্ন করিলে তাহা হয় বুদ্ধির পক্ষে একটি ফাঁদের মত, তাহা ভ্রান্তিপ্রদ হঠোক্তিতে পরিণত হয়, কারণ প্রত্যেকটিই হইতেছে একটি সমগ্রের অংশ, সেই সমগ্র হইতে কোনটিকে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইলে চলিবে না। সমগ্রের জ্ঞান যাহাদের নাই, অকৃৎস্নবিৎ, যাহারা আংশিক সত্যের দ্বারা বিভ্রান্ত হয়, আর যে যোগী সমগ্রের সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, কৃৎস্নবিৎ—গীতা নিজেই এই দুইয়ের প্রভেদ করিয়াছে। সমস্ত জীবনকে ধীরভাবে দেখা এবং সমগ্রভাবে দেখা, জীবনের আপাতবিরোধী সত্যসকলের দ্বারা বিভ্রান্ত না হওয়া ইহাই হইতেছে যোগিজন-বাঞ্ছিত শান্ত ও পরিপূর্ণ জ্ঞানের পক্ষে সর্বপ্রথম প্রয়োজন। আমাদের এই বিচিত্র সত্তার এক প্রান্তে এক প্রকার পূর্ণ স্বাধীনতাই হইতেছে আত্মার সহিত প্রকৃতির সম্বন্ধের একটা দিক, আবার বিপরীত প্রান্তে প্রকৃতির একপ্রকার পূর্ণ নিয়ন্তৃত্বই (absolute determinism) হইতেছে উহার বিপরীত দিক, আবার এই দুই বিপরীত সত্যের বিকৃত ছায়া ক্রমবিকাশশীল মনের উপর পড়িলে আত্মার এক প্রকার স্বাধীনতার আভাস হয়—ইহা আংশিক ও আভাসমাত্র, অতএব ইহা প্রকৃত স্বাধীনতা নহে। এই শেষেরটিকে সাধারণত আমরা কতকটা ভ্রান্তভাবেই স্বাধীন ইচ্ছা (free will) নাম দিয়া থাকি; কিন্তু গীতা পূর্ণ মুক্তি ও প্রভুত্ব ভিন্ন আর কিছুকেই স্বাধীনতা বলিয়া স্বীকার করে নাই।

সকল সময়েই আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, গীতার সমস্ত শিক্ষার পশ্চাতে আত্মা ও প্রকৃতি সম্বন্ধে দুইটি মহান তত্ত্ব রহিয়াছে, (১) সাংখ্যের পুরুষ-প্রকৃতি-তত্ত্ব বেদান্তের পুরুষত্রয়ের তত্ত্বের দ্বারা সংশোধিত ও পূর্ণতা-প্রাপ্ত এবং (২) যুগ্ম প্রকৃতি, ইহার নীচের রূপ হইতেছে ত্রিগুণাত্মিকা মায়া এবং ঊর্ধ্বের রূপ হইতেছে দিব্য প্রকৃতি, প্রকৃত অধ্যাত্মপ্রকৃতি। গীতার শিক্ষার নানাস্থানে যে অসামঞ্জস্য ও বিরোধ আপাতদৃষ্টিতে প্রতীয়মান হয়, সে সমুদয়ের প্রকৃত সামঞ্জস্য করিবার ইহাই হইতেছে মূল সূত্র। বস্তুত আমাদের চৈতন্যময় জীবনের বিভিন্ন স্তর আছে, যাহা এক স্তরে কার্যত সত্য উপরের আর এক স্তরে উঠিলে তাহাই আর সত্য থাকে না, কারণ তখন তাহা ভিন্ন রূপ গ্রহণ করে, উপর হইতে জিনিসসকলকে আমরা আরও সমগ্রভাবে দেখিতে পারি। আধুনিক গবেষণা নির্ধারণ করিয়াছে যে, মনুষ্য, পশু, উদ্ভিদ এমনকি ধাতুদ্রব্য পর্যন্ত সকলের মধ্যে মূলত একই জীবনের সাড়া পাওয়া যায়, অতএব প্রত্যেকের মধ্যেই কোন এক প্রকারের স্নায়বিক চৈতন্য (nervous consciousness) রহিয়াছে, তাহাদের স্থূল মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি একই। অথচ প্রত্যেকেই যদি তাহার অনুভূতি উপলব্ধিসকলের বর্ণনা দিতে পারিত তাহা হইলে আমরা একই প্রাকৃত তত্ত্বের চারিপ্রকার সম্পূর্ণ বিভিন্ন এবং অনেকাংশেই বিরোধী বর্ণনা পাইতাম, কারণ আমরা যেমন জীবনের পর্যায়ে ঊর্ধ্বতর স্তরে উঠি তেমনই তাহাদের অর্থ ও উপযোগিতার বিভিন্নতা হয় এবং তাহাদিগকে বিভিন্ন দৃষ্টি লইয়া বিচার করিতে

হয়। মানবাত্মার স্তর সম্বন্ধেও সেইরূপ। আমাদের সাধারণ ধারণায় আমরা যেটিকে আমাদের স্বাধীন ইচ্ছা বলি, এবং এরূপ বলিবার কতকটা ন্যায্যতাও আছে, তথাপি, যে যোগী ঊর্ধ্বে উঠিয়াছেন এবং আমাদের রাত্রি যাঁহার নিকট দিনস্বরূপ এবং আমাদের দিন রাত্রিস্বরূপ, তাঁহার নিকট সেটি আদৌ স্বাধীন ইচ্ছা নহে, পরন্তু প্রকৃতির গুণসমূহের বশ্যতা, তিনি একই জিনিস দেখেন, কিন্তু সমগ্র জ্ঞানীর, কৃৎস্নবিৎ ব্যক্তির উচ্চতর দৃষ্টি লইয়া দেখেন, আর আমরা দেখি আমাদের আংশিক জ্ঞানের ক্ষুদ্র পরিধি হইতে, অকৃৎস্নবিৎ, ইহা অজ্ঞান ভিন্ন আর কিছুই নহে। যেটাকে আমরা আমাদের স্বাধীনতা বলিয়া গর্ব করি, তিনি দেখেন যে সেটা দাসত্ব।

নীচের প্রকৃতির জালে সর্বদা বদ্ধ থাকিয়াও আমরা যে নিজদিগকে স্বাধীন বলিয়া মনে করি, গীতা ইহাকে অজ্ঞান বলিয়াই দেখিয়াছে এবং এই অজ্ঞান ধারণার বিরুদ্ধেই গীতা বলিয়াছে যে, এই স্তরে অহংরূপী আত্মা সম্পূর্ণভাবেই প্রকৃতির গুণসমূহের অধীন। গীতা বলিয়াছে,[১] "কর্মসকল সর্বাতোভাবে প্রকৃতির গুণসমূহের দ্বারা সম্পন্ন হইলেও যে ব্যক্তি-আত্মা অহংভাবের দ্বারা বিমূঢ় সে মনে করে যে তাহার "অহং"ই সেসব করিতেছে। কিন্তু যে ব্যক্তি গুণ ও কর্মবিভাগের প্রকৃত তত্ত্ব অবগত আছেন, তিনি উপলব্ধি করেন যে, গুণসকলই পরস্পরের উপর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া করিতেছে, তিনি আসক্তির দ্বারা তাহাদের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া পড়েন না। যাহারা গুণসকলের দ্বারা বিমূঢ় হইয়া পড়ে, সমগ্রের জ্ঞান যাহাদের নাই, সমগ্র-জ্ঞানীরা যেন তাহাদের মানসিক ধারণাকে বিচলিত না করেন। তোমার সকল কর্ম আমাকে সমর্পণ করিয়া, কামনা ও অহংভাব হইতে মুক্ত হইয়া, শোকত্যাগ-পূর্বক যুদ্ধ কর।" এখানে চেতনার দুইটি স্তরের, কর্মের দুইটি প্রতিষ্ঠার স্পষ্ট প্রভেদ করা হইয়াছে, এক স্তরে আত্মা তাহার অহংভাবাপন্ন প্রকৃতিতে বদ্ধ, প্রকৃতির দ্বারা চালিত হইয়া কর্ম করিতেছে, তাহার স্বাধীন ইচ্ছা রহিয়াছে মনে হইলেও প্রকৃতপক্ষে এরূপ কোন স্বাধীনতাই নাই, আর এক স্তরে আত্মা মুক্ত, সে আর নিজেকে অহং-এর সহিত এক করিয়া দেখিতেছে না, প্রকৃতির ঊর্ধ্বে থাকিয়া প্রকৃতির কর্মসকল সাক্ষীভাবে অবলোকন করিতেছে, সমর্থন করিতেছে, নিয়ন্ত্রিত করিতেছে।

[১] প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢাত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥
তত্ত্ববিত্তু মহাবাহো গুণকর্ম্মবিভাগয়োঃ।
গুণা গুণেষু বর্ত্তন্ত ইতি মত্বা ন সজ্জতে॥
প্রকৃতের্গুণসংমূঢাঃ সজ্জন্তে গুণকর্ম্মসু।
তানকৃৎস্নবিদো মন্দান্ কৃৎস্নবিন্ন বিচালয়েৎ॥
ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা।
নিরাশীর্নির্ম্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ॥৩।২৭-৩০

আমরা বলি আত্মা প্রকৃতির অধীন; কিন্তু অন্যদিকে আবার গীতা আত্মা ও প্রকৃতির লক্ষণ প্রভেদ করিতে গিয়া বলিয়াছে যে, আত্মা সকল সময়েই প্রভু, ঈশ্বর, আর প্রকৃতি কার্যনির্বাহক শক্তি। এখানে গীতা বলিতেছে, আত্মা অহঙ্কারের দ্বারা বিমূঢ় হয়, অহঙ্কারবিমূঢাত্মা, কিন্তু বেদান্তের মতে প্রকৃত যে আত্মা তাহা ভাগবত. চিরমুক্ত, আত্মবিৎ। তাহা হইলে এই যে আত্মা প্রকৃতির দ্বারা বিমূঢ় হয়, এই যে আত্মা প্রকৃতির অধীন, ইহা কি? ইহার উত্তর হইতেছে এই যে, এখানে আমরা নিম্নতম মানসিক জ্ঞানের ভাষাই প্রয়োগ করিতেছি, আমরা বলিতেছি, আভাস-আত্মার কথা, প্রকৃত পুরুষের কথা নহে। প্রকৃতপক্ষে অহংই হইতেছে প্রকৃতির অধীন, আর ইহা অবশ্যম্ভাবী, কারণ এই অহং নিজেই হইতেছে প্রকৃতির অংশ, তাহার যন্ত্রের একটি প্রক্রিয়া, মানসিক চেতনায় যে আত্মসংবিৎ তাহা যখন নিজেকে এই অহং-এর সহিত এক করিয়া দেখে, তখন একটা নিম্নতন আত্মা, অহং-আত্মার আভাস সৃষ্ট হয়। সেইরকমই আমরা যাহাকে সাধারণত অন্তঃপুরুষ বলিয়া মনে করি বস্তুত তাহা হইতেছে প্রাকৃতিক ব্যক্তি-সত্তা, সত্য পুরুষ নহে, পরন্তু আমাদের মধ্যে বাসনাত্মক আত্মা, (desire-soul), তাহা হইতেছে প্রকৃতির ক্রিয়ার মধ্যে পুরুষের চৈতন্যের প্রতিচ্ছায়া বাস্তবিকপক্ষে ইহা প্রকৃতির গুণত্রয়েরই একটি ক্রিয়া, অতএব প্রকৃতিরই অঙ্গ। তাহা হইলে বলিতে পারা যায় যে, আমাদের মধ্যে দুইটি আত্মা রহিয়াছে, একটি হইতেছে আভাস আত্মা বা বাসনাত্মক আত্মা, গুণত্রয়ের পরিবর্তনের সহিত ইহা পরিবর্তিত হয়, ইহা সম্পূর্ণভাবে গুণত্রয়ের দ্বারা গঠিত ও নিয়ন্ত্রিত, অপরটি হইতেছে মুক্ত ও শাশ্বত-পুরুষ, প্রকৃতি এবং তাহার গুণসকলের অতীত। আমাদের দুইটি আত্মা রহিয়াছে, একটি হইতেছে আভাস আত্মা, তাহা কেবল অহং, আমাদের মধ্যে সেই মানসিক কেন্দ্র যাহা প্রকৃতির এই পরিবর্তনশীল ক্রিয়াকে, এই পরিবর্তনশীল ব্যক্তি-সত্তাকে গ্রহণ করিয়া বলে, "আমিই এই পুরুষ, আমিই এই প্রাকৃতিক সত্তা, আমিই এই সকল কর্ম করিতেছি",—কিন্তু ঐ প্রাকৃতিক সত্তা প্রকৃতি ভিন্ন আর কিছুই নহে, উহা গুণসকলেরই একটা সমবায়—অপরটি হইতেছে প্রকৃত আত্মা, তাহা বাস্তবিকপক্ষেই প্রকৃতির ভর্তা, ভোক্তা, ঈশ্বর, তাহা প্রকৃতির মধ্যে আবির্ভূত হইয়াছে কিন্তু নিজে ঐ পরিবর্তনশীল প্রাকৃতিক সত্তা নহে। তাহা হইলে মুক্তির পন্থা হইতেছে, এই বাসনাত্মক আত্মার বাসনা-কামনা সকল বর্জন করা এবং এই অহং-এর মিথ্যা আত্ম-অভিমান বর্জন করা। গুরু বলিলেন, নিরাশী নির্ম্মমো ভূত্বা, বাসনা ও অহংভাব হইতে মুক্ত হইয়া, তোমার আত্মাকে কাতরতা হইতে মুক্ত করিয়া যুদ্ধ কর।

আমাদের সত্তা সম্বন্ধে এই যে মত, সাংখ্যকৃত পুরুষ প্রকৃতি যুগ্মতত্ত্বের বিশ্লেষণ হইতেই ইহার আরম্ভ। পুরুষ নিষ্ক্রিয়, অকর্তা; প্রকৃতি ক্রিয়াশীলা, কর্ত্রী। পুরুষ চৈতন্যের জ্যোতিতে পূর্ণ সত্তা, প্রকৃতি জড় নিশ্চেতন, তাহার সমুদয় ক্রিয়া চৈতন্যময় সাক্ষিপুরুষে প্রতিফলিত করিতেছে। প্রকৃতি তাহার গুণত্রয়ের

অসাম্যের দ্বারা কর্ম করে, তাহারা অনবরত পরস্পরের সহিত দ্বন্দ্ব করিতেছে, মিশ্রিত হইতেছে, পরিবর্তিত হইতেছে, প্রকৃতি তাহার অহংবুদ্ধির ক্রিয়ার দ্বারা পুরুষকে এই সকল ক্রিয়ার সহিত নিজেকে এক করিয়া দেখিতে বাধ্য করে, এবং এইভাবেই আত্মার চিরনিশ্চলতা ও নীরবতার মধ্যে সক্রিয়, পরিবর্তনশীল অনিত্য ব্যক্তিত্ব ভাবের অনুভূতি সৃষ্টি করে। অশুদ্ধ প্রাকৃতিক চৈতন্য শুদ্ধ আত্মচৈতন্যকে মেঘাচ্ছন্ন করিয়া দেয়, মন অহং ভাব ও ব্যক্তিক সত্তার মধ্যে পুরুষকে ভুলিয়া যায়, আমরা ইন্দ্রিয়গত মন (sense mind) এবং ইহার বহির্মুখী ক্রিয়াসকলের দ্বারা এবং প্রাণ ও শরীরের বাসনার দ্বারা আমাদের বিচারবুদ্ধিকে বিপর্যস্ত হইতে দিই। যতদিন পুরুষ এই কার্যে অনুমতি দিবে, অহং, বাসনা ও অজ্ঞান প্রাকৃত সত্তাকে নিয়ন্ত্রিত করিবেই।

কিন্তু ইহাই যদি সব হইত, তাহা হইলে একমাত্র প্রতিকার হইত ঐ অনুমতি সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাহার করা, এই প্রত্যাহারের দ্বারা আমাদের সমগ্র প্রকৃতিকে গুণত্রয়ের নিশ্চল সাম্যাবস্থার মধ্যে পড়িতে দেওয়া বা পড়িতে বাধ্য করা এবং এইভাবে সকল কর্ম হইতে বিরত হওয়া। ইহা যে একপ্রকার প্রতিকার তাহাতে সন্দেহ নাই, বলিতে পারা যায় যে, এই প্রতিকারের দ্বারা রোগের সহিত রোগীকেও শেষ করিয়া দেওয়া হয়, কিন্তু গীতা ঠিক এই প্রতিকারটিকেই পুনঃ-পুনঃ নিন্দা করিয়াছে। বিশেষত অজ্ঞানীদের উপর এই শিক্ষা চাপাইয়া দিলে তাহারা ঠিক তামসিক নিষ্ক্রিয়তাই অবলম্বন করিবে, তাহাদের বিচারবুদ্ধি মিথ্যা ভেদে মিথ্যা বিরোধে পতিত হইবে, বুদ্ধিভেদঃ; তাহাদের কর্মপ্রবণ প্রকৃতি এবং তাহাদের বুদ্ধি পরস্পরের বিরোধী হইয়া উঠিবে, কোন সত্য ফল উৎপন্ন না করিয়া বিক্ষোভ ও বিশৃঙ্খলাই সৃষ্টি করিবে, মিথ্যা ও আত্মপ্রতারণামূলক কর্মধারা, মিথ্যাচার সৃষ্টি করিবে অথবা আসিবে একটা কেবল তামসিক নিষ্ক্রিয়তা, কর্ম হইতে বিরতি, জীবন ও কর্মের প্রবৃত্তির হ্রাস, অতএব তাহা প্রকৃত মুক্তি হইবে না, পরন্তু প্রকৃতির অধমতম গুণের, তমঃ গুণেরই বশ্যতা হইবে, সে গুণের লক্ষণ অজ্ঞান ও অপ্রবৃত্তি। অথবা তাহারা ইহার কোন মর্মই গ্রহণ করিতে পারিবে না, তাহারা এই উচ্চতর শিক্ষায় দোষ ধরিবে, ইহার বিরুদ্ধে তাহাদের বর্তমান মানসিক অনুভূতিকে, স্বাধীন ইচ্ছা সম্বন্ধে তাহাদের অজ্ঞান ধারণাকেই সত্য বলিয়া প্রচার করিবে, এবং তাহাদের নিজেদের যুক্তিকেই সারবান মনে করিয়া তাহাদের অহং ও বাসনার ভ্রান্তি ও ছলনাতে আরও অধিক দৃঢ় হইবে, তাহাদের অজ্ঞান গভীরতর এবং প্রখরতর সমর্থন লাভ করিয়া তাহাদের মুক্তির সম্ভাবনা নষ্ট করিবে।

বাস্তবিক পক্ষে এই সকল উচ্চতর সত্য কেবল চৈতন্য ও সত্তার উচ্চতর ও উদারতর ক্ষেত্রেই সাহায্যপ্রদ হইতে পারে, কারণ কেবল সেইখানেই তাহারা অনুভূতিতে সত্য হইয়া উঠে এবং জীবনে অনুসরণের উপযোগী হয়। নীচে হইতে এই সকল সত্য দেখিলে ভুল দেখা হইবে, ভুল বুঝা হইবে। সম্ভবত তাহাদের

অপপ্রয়োগই করা হইবে। পাপ ও পুণ্যের প্রভেদ অহংভাবপূর্ণ মানবজীবনের পক্ষেই উপযোগী ব্যবহারিক সত্য, এই জীবন হইতেছে পশুভাব হইতে দেবভাবে উঠিবার সন্ধিস্থল, কিন্তু উচ্চতর স্তরে উঠিলে আমরা পাপ ও পুণ্যের ঊর্ধ্বে উঠি, ভগবান যেমন তাহাদের দ্বন্দ্বের অতীত আমরাও সেইরূপ হই—এই যে সত্য, ইহা এইরূপই উচ্চতর সত্য। কিন্তু নিম্নতর চৈতন্যে ইহা কার্যত সত্য নহে, সেখান হইতে না উঠিয়াই যে অপরিপক্ক মন এই সত্যকে ধরিতে যাইবে, সে এইটিকে তাহার আসুরিক প্রবৃত্তিসকলকে প্রশ্রয় দিবার একটি সুবিধাজনক অছিলা করিয়া তুলিবে, পাপ পুণ্যের ভেদ একেবারেই অস্বীকার করিবে এবং নীচ ভোগের স্রোতে গা ভাসাইয়া দিয়া অধঃপাতে যাইবে, সর্বজ্ঞানবিমূঢ়ান্ নষ্টান্ অচেতসঃ। প্রকৃতির নিয়ন্তৃত্ব সম্বন্ধেও এইরূপ, এইটিকে লোকে ভুল বুঝিবে, ইহার অপব্যবহার করিবে, এই সত্যের অপব্যবহার তাহারাই করে যাহারা বলে যে, মানুষকে তাহার প্রকৃতি যেমন গড়িয়াছে সে সেইরূপই হইয়াছে, এবং তাহার প্রকৃতি যাহা করাইবে মানুষ তাহাই করিতে বাধ্য। ইহা এক হিসাবে সত্য বটে কিন্তু লোকে ইহাকে যে অর্থে বুঝে তাহা সত্য নহে, ইহার এই অর্থ নহে যে, অহং যেসব কাজ করিতেছে সেসব সম্বন্ধে তাহার কোন দায়িত্বই নাই এবং সেসবের জন্য তাহাকে কোন ফলভোগ করিতে হইবে না; কারণ অহং-এর ইচ্ছা আছে, বাসনা আছে, আর যতক্ষণ সে তাহার ইচ্ছা অনুসারে, বাসনা অনুসারে কর্ম করিবে, সেটা তাহার প্রকৃতি হইলেও তাহাকে তাহার কর্মের ফল ভোগ করিতেই হইবে। বলিতে পার যে, সে একটা জালে পড়িয়াছে একটা ফাঁদে পড়িয়াছে, তাহার বর্তমান অনুভূতিতে, তাহার সীমাবদ্ধ আত্মজ্ঞানে সেটা দুর্বোধ্য, যুক্তিবিগর্হিত, অন্যায়, ভয়ঙ্কর বলিয়াই বেশ মনে হইতে পারে, তথাপি সে ফাঁদে সে নিজেই সাধ করিয়া পড়িয়াছে, সে জাল তাহার নিজেরই তৈয়ারী।

গীতা বলিয়াছে বটে, প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি, "সর্বভূতই আপন আপন প্রকৃতির অনুসরণ করিয়া থাকে, ইহাকে নিগ্রহ করিলে কি হইবে?" যদি শুধু এই কথাটিই ধরা হয় তাহা হইলে মনে হয় যে, আত্মার প্রকৃতির আধিপত্য অসীম, অনতিক্রম্য, সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতের্জ্ঞানবানপি, "জ্ঞানবান ব্যক্তিও নিজ প্রকৃতি অনুসারে কর্ম করিয়া থাকেন।" ইহার উপর ভিত্তি করিয়াই গীতা বিধান দিয়াছে

শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ॥৩।৩৫

"স্বধর্ম দোষযুক্ত হইলেও উহা উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; স্বধর্মে থাকিয়া মৃত্যুও ভাল কিন্তু পরধর্মের অনুসরণ বিপজ্জনক।" এই স্বধর্ম বলিতে ঠিক কি বুঝায় তাহা আমরা দেখিতে পাইব যখন গীতার শেষের দিকে যেখানে পুরুষ, প্রকৃতি এবং গুণত্রয় সম্বন্ধে বিস্তৃত ব্যাখ্যান আছে সেখানে যাইব,

কিন্তু নিশ্চযই ইহার অর্থ এই নয যে, আমবা যাহাকে আমাদেব প্রকৃতি বলি তাহা আমাদিগকে যেকোন প্রেবণা দিবে সেটি অশুভ হইলেও আমাদিগকে সেটি অনুসবণ করিতে হইবে। কাবণ এই দুইটি শ্লোকেব মধ্যস্থলে গীতা আব একটি এই বিধান দিয়াছে—

ইন্দ্রিযস্যেন্দ্রিয়স্যার্থে বাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ।
তয়োর্ন বশমাগচ্ছেত্তৌ হ্যস্য পবিপন্থিনৌ॥৩।৩৪

"প্রতি ইন্দ্রিয়ের বিষয়েই বাগ ও দ্বেষ অবস্থিত বহিযাছে; তাহাদেব কবলে পতিত হইও না, তাহাবা আত্মার শ্রেযমার্গে বিঘ্নকাবী।" ইহাব অব্যবহিত পবেই অর্জুন যখন প্রশ্ন তুলিলেন, আমাদেব প্রকৃতির অনুসবণ কবিতে যদি কোন দোষই নাই তাহা হইলে আমাদের মধ্যে যে আমাদিগকে আমাদের ইচ্ছাব বিরুদ্ধে যেন বলপূর্বক পাপে প্রবৃত্ত কবায় সে সম্বন্ধে কি? তখন গুরু উত্তব দিলেন, কাম এব ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ, ইহা কাম এবং কামেব সহচব ক্রোধ, ইহাবা প্রকৃতিব দ্বিতীয় গুণ বিক্ষোভাত্মক বজোগুণের সন্তান, এই কাম বা বাসনা আত্মাব পবম শত্রু, ইহাকে বধ করিতে হইবে। গীতা বলিযাছে, মুক্তিব জন্য প্রথমেই প্রযোজন পাপকর্ম পরিত্যাগ কবা এবং গীতা সর্বদা আত্মজয, আত্মসংযম, মন ও ইন্দ্রিয, সমগ্র নিম্নতম প্রকৃতির সংযম উপদেশ দিযাছে।

অতএব এখানে একটা প্রভেদ কবা আবশ্যক, প্রকৃতিতে যাহা মূলগত, যাহা ইহাব নিজস্ব ও অবশ্যম্ভাবী ক্রিযা তাহাকে দমন কবিবাব, চাপিযা দিবাব, নিগ্রহ কবিবাব চেষ্টা বৃথা, আব প্রকৃতিতে যাহা মূলগত নহে পবন্তু আগন্তুক, প্রকৃতিব পথচ্যুতি, বিশৃঙ্খলা, বিকৃতি—এসবকে সংযত কবিতেই হইবে। "নিগ্রহ" ও "সংযম" এই দুইয়েব মধ্যেও প্রভেদ বহিযাছে, জোব কবিয়া দমন কবা, চাপিযা দেওয়া "নিগ্রহ", আব যথাযথ ব্যবহার, যথাযথ পবিচালনা দ্বাবা নিযন্ত্রিত কবাই "সংযম"। প্রথমটি হইতেছে ইচ্ছাশক্তির দ্বাবা প্রকৃতিব উপব অত্যাচাব, তাহা শেষ পর্যন্ত সত্তার স্বাভাবিক শক্তিগুলিকে অবসন্ন কবিযা দেয, আত্মানম্ অবসাদয়েৎ, দ্বিতীয়টি হইতেছে উর্ধ্বতন আত্মাব দ্বারা নিম্নতন আত্মাকে নিযন্ত্রিত কবা, তাহা সকল স্বাভাবিক শক্তিকে তাহাদেব যথাযথ ক্রিযা এবং উচ্চতম দক্ষতা প্রদান করে, যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্। সংযমেব এই স্বরূপ গীতা ষষ্ঠ অধ্যাযেব প্রাবম্ভে বেশ স্পষ্ট করিযাছে।[১] "আত্মাব দ্বারা আত্মাকে উদ্ধাব কবিতে হইবে, আত্মাকে

[১] উদ্ধবেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদযেৎ।
আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুবাত্মৈব বিপুবাত্মনঃ॥
বন্ধুরাত্মাত্মনস্তস্য যেনাত্মৈবাত্মনা জিতঃ।
অনাত্মনস্তু শত্রুত্বে বর্ত্তেতাত্মৈব শত্রুবৎ॥
জিতাত্মনঃ প্রশান্তস্য পবমাত্মা সমাহিতঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু তথা মানাপমানযোঃ॥৬।৫-৭

কখনও (অতিবিক্ত) ভোগ বা দমনেব দ্বাবা নির্জিত ও অবসন্ন করিবে না, কারণ আত্মাই আত্মাব বন্ধু এবং আত্মাই আত্মাব শত্রু। সেই ব্যক্তির আত্মাই বন্ধু যাহাব মধ্যে (নিম্নতন) আত্মা (উর্ধ্বতন) আত্মার দ্বাবা বিজিত হইয়াছে, কিন্তু যে ব্যক্তি তাহাব (উর্ধ্বতন) আত্মাকে লাভ করিতে পারে নাই, তাহার পক্ষে তাহাব (নিম্নতন) আত্মা শত্রুবৎ এবং শত্রুর ন্যাযই কার্য কবে।" যখন কেহ নিজ আত্মাকে জয কবিযাছেন এবং পূর্ণ আত্মজয় ও আত্মলাভেব শান্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইযাছেন তখন তাঁহাব মধ্যে পবমাত্মা বাহ্য মানবীয চৈতন্যেই প্রতিষ্ঠিত হয। অন্য কথায বলিতে গেলে, নিম্নতন আত্মাকে উর্ধ্বতন আত্মার দ্বাবা জয করা, প্রকৃত সত্তাকে অধ্যাত্ম সত্তাব দ্বাবা জয কবা, ইহাই মানুষেব সিদ্ধি ও মুক্তি লাভের পন্থা।

তাহা হইলে এইখানেই দেখা যাইতেছে, প্রকৃতিব নিযন্তৃত্ব কত বেশী পরিমিত এবং ইহাব অর্থ ও পরিধিব সঠিক সীমা কি। প্রকৃতিব বশ্যতা হইতে মুক্ত হইয়া কেমন করিযা তাহাব উপব প্রভুত্ব লাভ কবা যায তাহা আমরা উত্তমরূপে দেখিতে পাই যদি আমবা অনুধাবন করি প্রকৃতিব গুণগুলির ক্রিযা পর্যায়ক্রমে অধঃ হইতে উর্ধ্ব পর্যন্ত কিরূপ। সর্বনিম্নস্তরে যেসব বস্তু রহিয়াছে তাহাদের উপব তমোগুণেবই পূর্ণ আধিপত্য, তাহাবা এখনও আত্মচেতনাব আলোক লাভ করে নাই, তাহাবা প্রকৃতিব প্রবাহের দ্বারাই সম্পূর্ণভাবে চালিত হয। পরমাণুব (atom) মধ্যেও একটা ইচ্ছাশক্তি বহিযাছে, কিন্তু আমবা স্পষ্টই দেখিতে পাই যে, তাহা স্বাধীন ইচ্ছা নহে, কাবণ ইহা যন্ত্রবৎ (mechanical), আব ঐ ইচ্ছা পবমাণুটিব অধিকৃত নহে, পরমাণুটিই ঐ ইচ্ছাশক্তিব দ্বারা অধিকৃত। এখানে যে বুদ্ধি বহিযাছে, প্রকৃতির মধ্যে বোধ ও সঙ্কল্পের তত্ত্ব, ইহা বস্তুত এবং স্পষ্টত সাংখ্য যাহা বলিযাছে তাহাই, জড, একটা যন্ত্রবৎ এমনকি নিশ্চেতন তত্ত্ব, সেখানে চেতন আত্মাব জ্যোতি আদৌ সম্মুখে আসিতে পাবে নাই। পরমাণু তাহার বোধশক্তি ও ইচ্ছাশক্তি সম্বন্ধে সজ্ঞান নহে, অপ্রবৃত্তি ও অজ্ঞানেব তত্ত্ব তমোগুণই তাহাকে অধিকাব করিযা বহিয়াছে, নিজের মধ্যে বজোগুণকে ধবিযা বাখিযাছে, সত্ত্বগুণকে ঢাকিযা বাখিযাছে এবং অবাধ প্রভুত্বেব লীলা কবিতেছে। সত্য বটে প্রকৃতি এই সকল বস্তুকে বিবাট শক্তিব সহিত কর্ম করাইতেছে, কিন্তু জড যন্ত্ররূপে, যন্ত্রাকৃতম্ মাযয়া। ইহারই উপবেব স্তবে উদ্ভিদ, সেখানে রজোগুণ সম্মুখে আসিতে পাবিযাছে, তাহাব সহিত আনিয়াছে জীবনীশক্তি এবং আমাদেব মধ্যে যাহা সুখদুঃখ বলিযা অনুভূত হয সেই সব স্নাযবিক প্রতিক্রিযাব সামর্থ্য, কিন্তু সত্ত্ব সম্পূর্ণভাবে আবদ্ধ বহিয়াছে, তাহা এখনও চেতন বুদ্ধির আলোক জাগ্রত কবিতে অগ্রসব হয নাই, এখনও সবই যন্ত্রবৎ অবচেতন বা অর্ধচেতন, তমঃ বজঃ অপেক্ষাও প্রবল, উভযে মিলিযা সত্ত্বকে বন্দী করিয়া রাখিযাছে।

ইহাব উপবেব স্তবে হইতেছে পশু, যদিও তমঃ এখন খুবই প্রবল, যদিও আমবা পশুকে তামসিক সর্গেরই অন্তর্গত বলিতে পারি, তথাপি এখানে তমোগুণেব বিরুদ্ধে বজোগুণেব শক্তি পূর্বাপেক্ষা অনেক অধিক, রজঃ তাহার

সহিত লইয়া আসিয়াছে তাহার জীবন, কাম, ক্রোধ, সুখ, দুঃখের বিকশিত শক্তি আর সত্ত্ব এখনও নীচের ক্রিয়াব অধীন হইলেও সম্মুখে আসিতেছে, এই সমুদযকে সচেতন মনের প্রথম আলোক, স্থূল অহংভাব, সচেতন স্মৃতি, এক প্রকাবেব চিন্তাশক্তি, বিশেষত সহজাত প্রেবণা এবং পশুসুলভ সহজবোধেব আশ্চর্য শক্তি আনিয়া দিয়াছে। কিন্তু এখনও বুদ্ধি চৈতন্যেব পূর্ণ আলোক লাভ কবে নাই, অতএব পশুকে তাহার কার্যেব জন্য দায়ী কবা যায না যেমন পবমাণুকে তাহাব অন্ধগতিব জন্য, অগ্নিকে দগ্ধ কবাব জন্য, ঝডকে ধ্বংস কবাব জন্য দোষ দেওযা যায় না তেমনই ব্যাঘ্রকে হত্যা ও গ্রাস কবার জন্য দোষ দেওযা যায না। ব্যাঘ্র যদি জবাব দিতে পারিত তাহা হইলে নিশ্চযই সে মানুষেব মত বলিত যে তাহাব স্বাধীন ইচ্ছা বহিয়াছে; কর্তাব অহংবোধ তাহাব মধ্যে থাকিত এবং সে বলিত, "আমি হত্যা কবি, আমি গ্রাস কবি", কিন্তু আমবা স্পষ্টই দেখিতে পাই যে বাস্তবিকপক্ষে ব্যাঘ্র নহে পবন্তু ব্যাঘ্রের ভিতব প্রকৃতিই গ্রাস কবে আব যদি সে বধ করিতে বা গ্রাস কবিতে বিবত হয় তবে সেটা ক্ষুধাব অভাব, ভয বা আলস্য হইতে এবং ইহা তাহার মধ্যে প্রকৃতিবই আব একটি গুণেব ক্রিযা, তমোগুণেব ক্রিয়া। ব্যাঘ্রের ভিতর প্রকৃতি যেমন বধ করে তেমনি ব্যাঘ্রেব ভিতব প্রকৃতিই বধকার্য হইতে বিরত হয়। ব্যাঘ্রের মধ্যে যে আত্মাই থাকুক তাহা নির্বিবোধে প্রকৃতির কার্যে সায দেয়, ব্যাঘ্রেব আলস্য ও নিষ্ক্রিযতায সে যেমন নিশ্চেষ্ট, পশুটির ক্রোধ ও কর্মেব মধ্যেও তেমনই নিশ্চেষ্ট। পবমাণুব ন্যায পশুও তাহাব প্রকৃতির যান্ত্রিক ক্রিযাব বশেই কর্ম কবে, *সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতেঃ, যেন* যন্ত্রে আরূঢ়, যন্ত্রারূঢ়ানি মাযয়া।

তাহা হউক, কিন্তু অন্তত মানুষেব মধ্যে তো অন্য এক বকমেব ক্রিযা আছে, একটা স্বাধীন আত্মা আছে, দায়িত্বজ্ঞান আছে, প্রকৃতি ব্যতীত, মাযাব যান্ত্রিক কৌশল ব্যতীত একজন সত্যকাব কর্তা আছে? এইরূপই মনে হয, কাবণ মানুষেব মধ্যে রহিয়াছে সচেতন বুদ্ধি, সাক্ষী পুরুষেব জ্যোতিতে এই বুদ্ধি পূর্ণ, মনে হয পুরুষ এই বুদ্ধিব ভিতব দিয়া দেখে, বুঝে, সম্মত হয অথবা অসম্মত হয, অনুমতি দেয় অথবা নিষেধ করে, মনে হয এইবাব বুঝি পুরুষ তাহাব প্রকৃতিব প্রভু হইতে আরম্ভ কবিয়াছে। মানুষ ব্যাঘ্র বা জড পবমাণুর মত নহে; সে খুন কবিযা এমন সাফাই দিতে পাবে না যে, "আমি আমাব প্রকৃতি অনুসাবে কর্ম কবিতেছি", পাবে না কাবণ ব্যাঘ্র, জড় বা অগ্নিব প্রকৃতি তাহাব প্রকৃতি নহে এবং তাহাদেব স্বধর্ম, তাহাদেব কর্মের নীতি, তাহাব স্বধর্ম নহে। তাহাব আছে একটা সচেতন বুদ্ধি এবং সেই বুদ্ধিকে অনুসরণ কবিয়া তাহাকে কর্ম করিতে হইবে। যদি সে তাহা না কবে, যদি সে তাহার ইন্দ্রিয়ের বশে, বিপুব তাডনায় অন্ধভাবে কর্ম কবে, তাহা হইলে তাহার স্বধর্ম যথাযথ অনুষ্ঠান করা হয না, স্বধর্ম্ম সু-অনুষ্ঠিতঃ, তাহাব পূর্ণ মনুষ্যত্বের যোগ্য কর্ম কবা হয না, কেবল পশুব মতনই কর্ম কবা হয। সত্য বটে যে, সে যেকোন কর্মই করুক বা যেকোন কর্তব্যই অবহেলা করুক, তাহাব মধ্যে

বজোগুণ অথবা তমোগুণ তাহাব বুদ্ধিকে ধবিয়া তাহা সমর্থন করাইয়া লয়, তবুও যেমন করিয়া হউক বুদ্ধিব সমর্থন লইতেই হয়, অন্তত বুদ্ধিকে জানাইতে হয়, তা সে কর্মেব আগেই হউক বা পবেই হউক। তাহা ছাডা মানুষেব মধ্যে সত্ত্ব জাগ্রত, তাহা কেবল বুদ্ধি এবং বুদ্ধিমূলক সঙ্কল্পরূপেই ক্রিয়া করে না—পরন্তু আলোকেব সন্ধান কবে, যথাযথ জ্ঞান চায় এবং সে জ্ঞান অনুযায়ী যথাযথ কর্ম কবিতে চায়, অপবেব জীবন ও দাবি সম্বন্ধে সহানুভূতিব সহিত বিবেচনা করে, তাহার মধ্যে সাত্ত্বিকতা তাহাব নিজেব প্রকৃতিব যে উচ্চতর ধর্ম সৃষ্টি করে তাহা জানিতে এবং তাহা অনুসবণ কবিতে চেষ্টা করে, এবং পুণ্য জ্ঞান ও সহানুভূতি যে মহত্তব শান্তি ও সুখ সঙ্গে করিযা লইযা আসে সে সম্বন্ধে ধারণা কবে। মানুষ অল্পাধিক অসম্পূর্ণভাবে জানে যে, তাহাব সাত্ত্বিক প্রকৃতির দ্বাবা তাহার বাজসিক ও তামসিক প্রকৃতিকে নিযন্ত্রিত করিতে হইবে, তাহার সাধারণ মনুষ্যত্বে পূর্ণতা ও সিদ্ধি লাভেব ইহাই পন্থা।

কিন্তু প্রকৃতিতে সাত্ত্বিকতার প্রাধান্যই কি মুক্তিব অবস্থা, আর মানুষের মধ্যে এই ইচ্ছা কি স্বাধীন ইচ্ছা? গীতা এক উচ্চতর চৈতন্যেব দিক হইতে দেখিয়া ইহা অস্বীকাব কবিযাছে। সাত্ত্বিক অবস্থাতে চেতন বুদ্ধি হইতেছে প্রকৃতিরই একটি যন্ত্র এবং যখন তাহা কাজ কবে, যত সাত্ত্বিকভাবেই সে কাজ করা হউক না কেন, প্রকৃতপক্ষে প্রকৃতিই সে কাজ কবে এবং আত্মা যন্ত্রারূঢের ন্যায় মাযাব দ্বারাই চালিত হয। অন্ততপক্ষে ইহা ঠিকই যে আমবা যাহাকে আমাদেব স্বাধীন ইচ্ছা বলি তাহাব দশ অংশের নয অংশই স্পষ্টত ভ্রম; কোন বিশেষ মুহূর্তে ঐ ইচ্ছা কি হইবে, কোন দিকে চালিত হইবে তাহা স্বতঃনির্ধারিত হয় না পবন্তু আমাদের অতীত, আমাদেব বংশ, আমাদেব শিক্ষা, আমাদেব পরিবেষ্টনীর দ্বারা, যে বিবাট জটিল জিনিসকে আমবা "কর্ম" বলি সমগ্রভাবে তাহাব দ্বাবাই নির্ধারিত হয়; এই "কর্ম" আমাদের পশ্চাতে রহিযাছে, আমাদেব উপরে এবং জগতের উপরে প্রকৃতিব যে সমগ্র অতীত ক্রিয়া তাহা এক এক ব্যক্তির উপবে কেন্দ্রীভূত হইতেছে, সে কি হইবে তাহা নির্ধাবিত করিয়া দিতেছে, কোন বিশেষ মুহূর্তে তাহাব ইচ্ছা কি হইবে এবং যতদূব বিশ্লেষণ কবিযা দেখা যায, সেই মুহূর্তে সে কি কাজ কবিবে তাহাও নির্ধাবিত করিয়া দিতেছে, অহং সকল সময়েই নিজেব "কর্মেব" সহিত নিজেকে এক কবিয়া দেখে এবং বলে, "আমি কবিয়াছি", "আমি ইচ্ছা কবি", "আমি দুঃখ ভোগ কবি", কিন্তু সে যদি নিজেব দিকে চাহিযা দেখে এবং বুঝে যে, সে কিরূপে গঠিত হইযাছে তাহা হইলে সে যেমন পশুর সম্বন্ধে তেমনই মানুষেব সম্বন্ধেও বলিতে বাধ্য হইবে যে, "প্রকৃতি আমাব মধ্যে ইহা কবিযাছে, প্রকৃতি আমাব মধ্যে ইচ্ছা কবে, আর যদি সে সংশোধন কবিয়া বলে "আমাব প্রকৃতি", তাহার অর্থ কেবল ইহাই হয—"প্রকৃতি এই বিশেষ জীবটির মধ্যে নিজে যে রূপ গ্রহণ কবিয়াছে।" জগতেব এই দিকটা তীব্রভাবে উপলব্ধি কবিযাই বৌদ্ধগণ বলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন যে, সমস্তই হইতেছে "কর্ম", আত্মা

বলিয়া কোন বস্তুর অস্তিত্বই নাই, আত্মা হইতেছে মানসিক অহং-এর একটা ভ্রম মাত্র। অহং যখন মনে করে, "আমি এই পুণ্য কর্ম করিতে সঙ্কল্প করিতেছি, ঐ পাপ কর্মটা বর্জন করিতেছি", তখন সে প্রকৃতির সত্ত্বগুণের একটি ক্রিয়াকে নিজ ক্রিয়া বলিয়া ভ্রম করে, বস্তুত এই সত্ত্বগুণের দ্বারা প্রকৃতি বুদ্ধির ভিতর দিয়া এক প্রকার কর্ম বাছিয়া লয়, অন্য প্রকার কর্ম পরিত্যাগ করে, প্রকৃতির এই ক্রিয়ার সহিত অহং নিজেকে এক করিয়া দেখে ঠিক যেমন ঘূর্ণায়মান চক্রের উপরিস্থিত মক্ষিকা অথবা ঐ চক্রেরই দন্ত বা অন্য কোন অংশ (যদি তাহা সচেতন হইত) মনে করিতে পারে যে, সে নিজেই ইচ্ছা করিয়া ঘুরিতেছে। সাংখ্য বলে, নিষ্ক্রিয় সাক্ষী পুরুষের আনন্দের নিমিত্ত প্রকৃতি আমাদের মধ্যে রূপ গ্রহণ করিতেছে, সঙ্কল্প করিতেছে, কর্ম করিতেছে।

কিন্তু যদিও সাংখ্যের এই একান্ত উক্তি সংশোধন করিয়া লওয়া আবশ্যক (কিভাবে সংশোধন প্রয়োজন তাহা আমরা পরে দেখিব) তথাপি আমাদের ব্যক্তিগত ইচ্ছার স্বাধীনতা (যদি আমরা উহাকে এই নাম দিতেই চাই) খুবই আপেক্ষিক (relative), প্রায় ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র, ইহার সহিত মিশ্রিত হইয়া রহিয়াছে অন্য এমন বহু জিনিস যাহাদের উপর আমাদের কোন হাতই নাই। ইহার যে প্রবলতম শক্তি তাহাও প্রকৃত প্রভুত্ব নহে। উহা যে ঘটনাস্রোতের তীব্র বেগের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে পারিবে সে ভরসা করিতে পারা যায় না, রাজসিক ও তামসিক প্রকৃতি সাত্ত্বিক প্রকৃতিকে দাবাইয়া রাখে, অথবা ক্ষুণ্ণ করিয়া দেয় অথবা উহার সহিত মিশ্রিত হইয়া থাকে, আর যদি তা না পারে তো সূক্ষ্মভাবে উহাকে প্রতারিত করে, ফাঁকি দেয়। আমাদের ইচ্ছা যত সাত্ত্বিকই হউক না কেন, রজঃ ও তমঃ গুণের দ্বারা উহা এরূপ অভিভূত বা মিশ্রিত বা প্রতারিত হয় যে তাহা কেবল আংশিকভাবেই সাত্ত্বিক হইতে পারে; মনোবিজ্ঞানীর নির্মম সূক্ষ্মদৃষ্টি মানুষের সর্বোৎকৃষ্ট কর্মের মধ্যেও যে বহুল পরিমাণ আত্মপ্রতারণার অংশ ধরিয়া ফেলে তাহা এইভাবেই উত্থিত হয়, অজ্ঞাতসারে এমনকি নির্দোষভাবেই মানুষ মনকে চোখ ঠারে, নিজেদের সঙ্গেই লুকোচুরি খেলিয়া থাকে। যখন আমরা মনে করি যে, সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবেই কাজ করিতেছি, তখনও আমাদের কর্মের পশ্চাতে কত কত শক্তি লুকাইয়া থাকে, অতিশয় সতর্ক আত্ম-অনুসন্ধানের দ্বারাও তাহাদিগকে ধরিতে পারা যায় না; যখন আমরা মনে করি অহং হইতে মুক্ত হইয়াছি, তখনও অহং থাকে, প্রচ্ছন্নভাবে—যেমন পাপীর মনের মধ্যে থাকে তেমনি সাধুর মনের মধ্যেও থাকে। আমাদের কর্ম এবং কর্মের উৎস সম্বন্ধে যখন আমাদের চক্ষু প্রকৃতভাবে খুলিয়া যায়, তখন আমরা গীতার সঙ্গেই বলিতে বাধ্য হই, গুণাঃ গুণেষু বর্তন্তে, "প্রকৃতির গুণসকলই গুণসকলের উপর ক্রিয়া করিতেছে।"

এইজন্য সত্ত্বগুণের সমুচ্চ প্রাধান্য হইলেও তাহাতে প্রকৃত স্বাধীনতার অবস্থা হয় না। কারণ, গীতা দেখাইয়াছে যে, অন্যান্য গুণের ন্যায় সত্ত্বও বন্ধন করে এবং

অন্যান্য গুণের ন্যায়ই বাসনার দ্বারা, অহং-এর দ্বারা বন্ধন করে; সে বাসনা মহত্তর, সে অহং শুদ্ধতর—কিন্তু যতদিন এই দুইটি যে কোন রূপে সত্তাকে অধিকার করিয়া থাকিবে ততদিন স্বাধীনতা নাই। যে মনুষ্য সাধু, জ্ঞানী, তাঁহার মধ্যে সাধুর অহং রহিয়াছে, জ্ঞানীর অহং রহিয়াছে এবং তিনি সেই সাত্ত্বিক অহংকে তৃপ্ত করিতে চান। তিনি নিজের জন্য সাধুতা চান, জ্ঞান চান। আমাদের মধ্যে যে অহং রহিয়াছে, আমাদের ক্ষুদ্র "আমি", যখন আমরা তাহাকে আর তৃপ্ত করিতে চাহি না, তাহাকে কেন্দ্র করিয়া চিন্তা করি না, ইচ্ছা করি না, কেবল তখনই হয় প্রকৃত স্বাধীনতার অবস্থা। অন্য কথায়, স্বাধীনতা, উচ্চতম আত্মজয় আরম্ভ হয় যখন প্রাকৃত আত্মার ঊর্ধ্বে আমরা পরম আত্মাকে দেখিতে পাই, ধরিতে পারি, অহং তাহাকে আড়াল করিয়া রাখিয়াছে, অন্ধকার ছায়ায় আবৃত করিয়া রাখিয়াছে। আর ইহা কেবল তখনই সম্ভব হইতে পারে যখন আমরা প্রকৃতির ঊর্ধ্বে অবস্থিত এক আত্মাকে আমাদের মধ্যে দেখিতে পাই এবং আমাদের ব্যক্তিগত সত্তাকে সত্তায় ও চেতনায় তাহার সহিত এক করি এবং তাহাকে তাহার ব্যষ্টিগত কর্মশীল প্রকৃতিতে এক পরম ইচ্ছাশক্তির, যে একমাত্র ইচ্ছাশক্তি প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন, তাহারই যন্ত্র করিয়া দিই। ইহার জন্য আমাদিগকে গুণত্রয়ের বহু ঊর্ধ্বে উঠিতেই হইবে, ত্রিগুণাতীত হইতে হইবে; কারণ ঐ আত্মা সত্ত্বগুণেরও ঊর্ধ্বে। আমাদিগকে তাহাতে উঠিতে হইবে সত্ত্বের ভিতর দিয়াই, কিন্তু আমরা যখন সত্ত্বকে অতিক্রম করিব কেবল তখনই তাহাকে লাভ করিব; অহংকে ধরিয়াই আমরা তাহার দিকে অগ্রসর হই, কিন্তু অহংকে না ছাড়িলে তাহাতে উপনীত হইতে পারি না; আমরা তাহার দিকে আকৃষ্ট হই যে বাসনার দ্বারা তাহা উচ্চতম, অন্য সকল বাসনা অপেক্ষা তাহা প্রবল ও উল্লাসময়; কিন্তু যতক্ষণ না সকল বাসনা আমাদের সত্তা হইতে খসিয়া পড়িতেছে ততক্ষণ আমরা তাহার মধ্যে নিশ্চিতভাবে বাস করিতে পারি না। একটা অবস্থায় আমাদিগকে আমাদের মুক্তির বাসনা হইতেও মুক্ত হইতে হইবে।

দ্বাবিংশ অধ্যায়

ত্রিগুণাতীত

প্রকৃতির নিয়ন্তৃত্বের সীমা কতদূর তাহা আমরা দেখিলাম, এই নিয়ন্তৃত্বের অর্থ কেবল এই যে, আমরা যে অহং হইতে কর্ম করি তাহা নিজেই প্রকৃতির ক্রিয়ার একটি যন্ত্রবিশেষ এবং সেই জন্যই তাহা প্রকৃতির বশ্যতা হইতে মুক্ত হইতে পারে না; অহংয়ের যে ইচ্ছা তাহা প্রকৃতির দ্বারাই নির্ণীত ইচ্ছা, আমাদের মধ্যে প্রকৃতি তাহার নিজেরই অতীত কর্ম ও আত্ম-পরিবর্তনসমূহের দ্বারা যেভাবে গঠিত হইয়াছে ঐ ইচ্ছা সেই প্রকৃতিরই অংশ, আর আমাদের মধ্যে এইভাবে গঠিত প্রকৃতির দ্বারা এবং ইহার মধ্যে এইভাবে গঠিত ইচ্ছার দ্বারাই আমাদের বর্তমান কর্ম নির্ধারিত হয়। কেহ কেহ বলিয়া থাকে যে, আমরা সর্বপ্রথমে যে কর্ম করি সেটি আমরা সর্বদা স্বাধীনভাবেই বাছিয়া লই, তাহার পরে যাহা কিছু আসে তাহা সেই প্রাথমিক কর্মের দ্বারা যতই নির্ধারিত হউক না কেন, আর এই প্রথমে আরম্ভ করিবার ক্ষমতা এবং আমাদের ভবিষ্যতের উপর ইহার পরিণাম, এইখানেই রহিয়াছে আমাদের দায়িত্ব। কিন্তু প্রকৃতিতে এমন প্রথম কর্ম কোথায় যাহার পিছনে কোন অতীত নাই বা তাহাকে নির্ধারণ করিয়া দেয় নাই? আমাদের প্রকৃতির সেই বর্তমান অবস্থা কোথায় যাহা সাফল্যে এবং খুঁটিনাটিতে আমাদের অতীত প্রকৃতির কর্মের পরিণাম নহে? স্বাধীন প্রাথমিক কর্মের ধারণা এইজন্যই আমাদের মনে উঠে যে, আমরা প্রতি মুহূর্তে আমাদের বর্তমান হইতে ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়াই জীবন যাপন করি, আমরা সর্বদা আমাদের বর্তমান হইতে আমাদের অতীতের দিকে ফিরিয়া চাহি না, সেইজন্যই বর্তমান এবং বর্তমানের পরিণামফলই আমাদের মনে জীবন্তভাবে স্পষ্ট হইয়া থাকে, আর আমাদের বর্তমান যে সম্পূর্ণভাবেই আমাদের অতীতের পরিণাম সে সম্বন্ধে আমাদের ধারণা খুবই অস্পষ্ট থাকে; এই অতীতকে আমরা দেখি যেন একেবারে মরিয়া ভূত হইয়া গিয়াছে। আমরা কথা কই, কর্ম করি যেন শুদ্ধ ও নবীন মুহূর্তে আমরা আমাদিগকে লইয়া যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত, আমরা ভিতর হইতে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবেই সঙ্কল্প গ্রহণ করিতে পারি। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে এমন কোন সম্পূর্ণ মুক্তি নাই, আমাদের সঙ্কল্পে এমন কোন স্বাধীনতা নাই।

অবশ্য আমাদের মধ্যে যে ইচ্ছা রহিয়াছে তাহাকে সকল সময়েই কয়েকটি সম্ভাবনার মধ্যে কোন একটি বাছিয়া লইতে হয়, কারণ প্রকৃতি সর্বদা এইভাবেই কর্ম করে; এমনকি আমাদের নিশ্চেষ্টতা, কোনরূপ ইচ্ছা করিতে অস্বীকার, ইহাও একটা নির্বাচন। ইহাও হইতেছে আমাদের মধ্যে প্রকৃতির ইচ্ছার একটি ক্রিয়া, এমনকি পরমাণুর মধ্যেও একটা ইচ্ছাশক্তি সকল সময়েই কর্ম করিতেছে।

প্রকৃতির মধ্যে যে ইচ্ছা কর্ম করিতেছে তাহার সহিত আমরা আমাদের অহংভাবকে কতটা সংযুক্ত করি তাহা লইয়াই সমস্ত প্রভেদ; যখন আমরা এইভাবে নিজদিগকে উহার সহিত সংযুক্ত করি, তখন আমরা মনে করি যে ঐটি আমাদেরই ইচ্ছা এবং বলি যে উহা হইতেছে স্বাধীন ইচ্ছা এবং আমরা নিজেরাই কর্ম করিতেছি। আর ভুল হউক আর না হউক, ভ্রান্তি হউক আর না হউক, ইহা যে নিষ্ফল, ইহার যে কোন উপযোগিতা নাই তাহা নহে, প্রকৃতিতে প্রত্যেক জিনিসেরই ফল আছে, উপযোগিতা আছে। বস্তুত ইহা হইতেছে আমাদের চেতন সত্তার সেই প্রক্রিয়া যাহার দ্বারা আমাদের মধ্যে প্রকৃতি তাহার অন্তরস্থিত গুপ্ত পুরুষের অধিষ্ঠান সম্বন্ধে ক্রমশ বেশী বেশী সজ্ঞান ও সজাগ হইয়া উঠে এবং সেই জ্ঞানবৃদ্ধির দ্বারা কর্ম সম্বন্ধে বৃহত্তর সম্ভাবনায় উন্মুক্ত হয়; এই অহংভাব ও ব্যক্তিগত ইচ্ছার সাহায্যেই সে নিজেকে তাহার উচ্চতর সম্ভাবনাসমূহে উন্নীত করে, তামসিক প্রকৃতির পূর্ণ বা সাময়িক নিশ্চেষ্টতা হইতে রাজসিক প্রকৃতির আবেগ ও সংগ্রামের মধ্যে উঠে এবং রাজসিক প্রকৃতির আবেগ ও সংগ্রাম হইতে সাত্ত্বিক প্রকৃতির মহত্তর জ্যোতি, সুখ ও পবিত্রতার মধ্যে উঠে। প্রাকৃত মানব নিজের উপর যে আপেক্ষিক আত্মজয় লাভ করে তাহা হইতেছে তাহার প্রকৃতির নিম্নতম সম্ভাবনাসকলের উপরে তাহার উচ্চতর সম্ভাবনাসকলের প্রাধান্য; আর ইহা সম্পন্ন হয় যখন উচ্চতর গুণ নিম্নতর গুণকে জয় করিবার, বশীভূত করিবার জন্য যে চেষ্টা করিতেছে তাহার সহিত সে তাহার অহংভাবকে সংযুক্ত করে। স্বাধীন ইচ্ছার অনুভূতি ভ্রান্ত হউক আর নাই হউক, ইহা প্রকৃতির কর্মের একটি আবশ্যকীয় কৌশল, মানুষের অগ্রগতির জন্য প্রয়োজনীয়, আর সে যতক্ষণ না উচ্চতর সত্যের যোগ্য হইয়া উঠিতেছে ততক্ষণ এই অনুভূতি নষ্ট হইলে তাহার পক্ষে বিভ্রান্ট হইবে। যদি বলা যায় (এমন বলা হইয়া থাকে) যে, প্রকৃতি মানুষকে প্রতারণা করিয়া নিজের আদেশ পালন করাইয়া লয়, আর ব্যক্তিগত স্বাধীন ইচ্ছার ধারণা হইতেছে এইসব প্রতারণার মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রবলতম, তাহা হইলে ইহাও বলিতে হইবে যে, এই প্রতারণা তাহারই কল্যাণের জন্য এবং ইহা ছাড়া তাহার পূর্ণ সম্ভাবনাসমূহের বিকাশ হইতে পারে না।

কিন্তু ইহা সম্পূর্ণভাবেই প্রতারণা নহে, ইহা কেবল একটা দেখিবার ভুল, ইহাকে ঠিক যেভাবে যেখানে দেখিতে হইবে সেরূপ দেখা হয় না; অহং মনে করে যে, সেই হইতেছে প্রকৃত আত্মা, সে এমনভাবে ব্যবহার করে যে, সেই হইতেছে কর্মের কেন্দ্র, যেন সবকিছু রহিয়াছে তাহারই জন্য এবং এখানেই সে দেখিবার ভুল করে, বুঝিবার ভুল করে। সে যে মনে করে, আমাদের প্রকৃতির এই কর্মের মধ্যে এমন কেহ বা কোন বস্তু রহিয়াছে যে তাহার কর্মের প্রকৃত কেন্দ্র, তাহার জন্যই সবকিছু রহিয়াছে—ইহাতে কোন ভুল নাই, কিন্তু এইটি অহং নহে, ইহা হইতেছে আমাদের হৃদ্দেশে অবস্থিত ঈশ্বর, ভাগবত পুরুষ এবং তাঁহার অংশস্বরূপ জীব— এই জীব আর অহং এক বস্তু নহে। আমাদের মধ্যে প্রকৃত

এক আত্মা রহিযাছে, যে সকলেব প্রভু, তাহাবই জন্য, তাহাবই আদেশে প্রকৃতি সমুদয় কর্ম কবিতেছে—আমাদেব মনে এই সত্যেবই বিকৃত চূর্ণিত ছাযা হইতেছে অহং-এর অহমিকা। সেইরূপই অহং-এব যে স্বাধীন ইচ্ছাব অনুভূতি তাহাও হইতেছে—আমাদের এক মুক্ত আত্মা রহিয়াছে এই সত্যেবই বিকৃত ও অযথান্যস্ত অনুভূতি; প্রকৃতিতে যে ইচ্ছা তাহা হইতেছে এই আত্মারই ইচ্ছাব মন্দীভূত ও বিকৃত ছায়া—মন্দীভূত ও বিকৃত কাবণ উহা কালেব মুহূর্তসকলেব ধারাবাহিকতার মধ্যে রহিয়াছে এবং অনবরত পবিবর্তনেব দ্বাবা কর্ম কবিতেছে, তাহাতে অতীতের পূর্ণ স্মৃতি নাই, ভবিষ্যতেব ফলাফল ও লক্ষ্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ জ্ঞান নাই। কিন্তু অন্তরে যে দিব্য ইচ্ছা তাহা কালের মুহূর্তসকলেব উর্ধ্বে এবং তাহা এই সমস্তই জানে; আমরা বলিতে পাবি যে, ঐ আভ্যন্তবীণ ইচ্ছা ও জ্ঞান পূর্ণ অতিমানস জ্যোতিতে যাহা ভবিষ্যদ্দৃষ্টি কবে, আমাদেব মধ্যে প্রকৃতিব কর্ম হইতেছে সেইটিকে প্রাকৃত ও অহংভাবময অজ্ঞানেব দুরূহ পবিস্থিতিতে কার্যে পরিণত করিবার চেষ্টা করা।

কিন্তু আমাদের ক্রম-প্রগতিতে এমন একদিন নিশ্চয়ই আসিবে যখন আমবা আমাদেব সত্তাব প্রকৃত সত্যেব দিকে চক্ষু উন্মীলন কবিতে প্রস্তুত হইব, আর তখন আমাদের অহং-এর স্বাধীন ইচ্ছার ভ্রান্তি নিশ্চয়ই দূব হইযা যাইবে। অহংভাবাত্মক স্বাধীন ইচ্ছার ধাবণা বর্জনেব অর্থ কর্মেব অবসান নহে, কাবণ প্রকৃতিই হইতেছে কর্ত্রী, তাহাব ক্রমবিকাশে অহংভাবেব উদ্ভব হইবাব পূর্বে যেমন সে কর্ম কবিত, এই যন্ত্রটি পরিত্যক্ত হইবার পবও সে তেমনই কর্ম কবিবে, এমনকি যে মানুষের মধ্যে ইহা পবিত্যক্ত হইবে তাহাব মধ্যে বৃহত্তব কর্মেব বিকাশ কবা প্রকৃতির পক্ষে সম্ভব হইতে পাবে; কাবণ তাহাব মন আবও ভালরূপে বুঝিতে পারিবে অতীতের আত্মবিকাশেব দ্বাবা তাহাব প্রকৃতি বর্তমানে কিরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে, আরও ভালরূপে জানিতে পাবিবে কি কি পাবিপার্শ্বিক শক্তি তাহাব প্রকৃতিব উপর ক্রিযা কবিযা প্রকৃতিব বিকাশেব বাধা বা সহায হইতেছে, আব তাহাব মধ্যে যেসব জিনিস প্রকট হইতে পাবে কিন্তু এখনও প্রকট হয নাই সেসবের জন্য যে সকল মহত্তব সম্ভাবনা তাহাব মধ্যে নিহিত বহিযাছে সে সকল সম্বন্ধেও সে অধিকতব সজ্ঞান হইযা উঠিবে, আব এই যে মহত্তব সম্ভাবনা-সকলের সন্ধান সে পায এইসব সম্বন্ধে আত্মপুরুষেব অনুমতি এই অহংভাবশূন্য মনেব ভিতব দিয়া আবও অবাধে আসিতে পাবে এবং তাহাতে প্রকৃতিব সাডা দিবাব পক্ষে এবং তাহাব ফলস্বরূপ ঐ সকল সম্ভাবনাব বিকাশ ও সিদ্ধিব পক্ষে এইরূপ মন আবও অবাধ যন্ত্র হইতে পারে। কিন্তু স্বাধীন ইচ্ছাব বর্জন যেন আমাদের মধ্যে যে প্রকৃত আত্মা বহিযাছে তাহাব সম্বন্ধে দৃষ্টিবিবহিত বুদ্ধিতে কেবল অদৃষ্টবাদ (fatalism) বা প্রকৃতিব নিযন্তৃত্ববাদ না হয়, কাবণ তাহা হইলে কেবলমাত্র অহংকেই আত্মা বলিযা আমাদেব মনে ধাবণা থাকিযা যাইবে, আব যেহেতু ঐ অহং সকল সমযেই প্রকৃতিব যন্ত্রমাত্র, আমবা অহংকে ধবিযা এবং

আমাদেব ইচ্ছাকে প্রকৃতিব যন্ত্রস্বরূপ কবিয়া কর্ম করিব এবং এইরূপ ধাবণা কোন প্রকৃত পবিবর্তন আনিবে না, কেবল আমাদেব বুদ্ধিব দৃষ্টিভঙ্গীর কিছু সংশোধন হইবে। আমাদেব অহং ও অহং-এব ক্রিযা যে প্রকৃতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয এই বাহ্যিক সত্যটিই আমবা মানিয়া লইব, কিন্তু আমাদেব মধ্যে গুণসকলেব ক্রিয়াব অতীত যে অজাত আত্মা বহিযাছে তাহাব দর্শন আমবা পাইব না; আমাদেব মুক্তিব দ্বাব কোথায বহিযাছে তাহাব দর্শন আমবা পাইব না। প্রকৃতি ও অহং লইযাই আমাদেব সব নহে, আমাদেব মধ্যে রহিয়াছে মুক্ত আত্মা, পুরুষ।

কিন্তু পুরুষেব স্বাধীনতাব স্বরূপ কি? প্রচলিত সাংখ্য দর্শনের পুরুষ আপন মূল সত্তায স্বাধীন, কিন্তু সে নিষ্ক্রিয়, "অকর্তা" বলিযাই স্বাধীন; সে প্রকৃতিকে তাহাব কর্মেব ছাযা নিষ্ক্রিয আত্মাব উপব ফেলিতে যখন অনুমতি দেয তখন সে বাহ্যত গুণসকলেব কর্মাবলীব দ্বাবা বদ্ধ হইযা পড়ে এবং যতক্ষণ না সে প্রকৃতি হইতে নিজেকে বিযুক্ত কবে এবং প্রকৃতিব খেলা বন্ধ না হইয়া যায ততক্ষণ সে তাহাব স্বাধীনতা ফিবিযা পায না। তাহা হইলে যদি কোন মনুষ্য "আমি কর্তা" বা "আমাব কর্ম" এইরূপ অহংভাব বর্জন করে, যদি গীতার উপদেশ মত সে নিজেকে অকর্তা বলিযা দেখে, আত্মানম্ অকর্ত্তাবম্, কর্মসকল তাহাব নিজের নহে পবন্তু প্রকৃতিব, প্রকৃতিব গুণত্রযেব খেলা—এই উপলব্ধিতে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে কি অনুরূপ ফল হইবে না? সাংখ্যেব পুরুষ হইতেছে অনুমন্তা, কিন্তু সে কেবল নিষ্ক্রিযভাবেই অনুমতি দেয, কর্মটি সম্পূর্ণভাবেই হইতেছে প্রকৃতির; বলত সেই পুরুষ হইতেছে দ্রষ্টা ও ভর্তা, বিশ্ব-ঈশ্বরেব নিয়ন্তা ও সক্রিয় চৈতন্য নহে। সে পুরুষ, দেখে, গ্রহণ করে, কোন নাটক অভিনযের দ্রষ্টা যেভাবে ঐ অভিনযকে গ্রহণ কবে সেইভাবে সে গ্রহণ করে, কিন্তু যে পুরুষ নিজেব দ্বারা উদ্ভাবিত এবং নিজেব সত্তাব মধ্যে অভিনীত নাটককে দেখে এবং নিযন্ত্রণও করে সাংখ্যেব পুরুষ তাহা নহে। তাহা হইলে যদি সে অনুমতিটি প্রত্যাহাব কবিয়া লয়, যে কর্তৃত্বভাবেব ভ্রান্তি হইতে অভিনযটি চলিতেছে সেই ভ্রান্তি স্বীকাব করিতে অসম্মত হয, তাহা হইলে সে আব ভর্তা থাকে না, প্রকৃতির ঐ খেলাকে ধবিয়া থাকে না এবং সেইজন্য কর্মটি থামিযা যায, কাবণ কেবল দ্রষ্টা চৈতন্যময পুরুষেব ভোগেব জন্যই প্রকৃতি ঐ কর্ম সম্পাদন করে এবং কেবল পুরুষেব দ্বাবা বিধৃত হইলেই সে উহা চালাইতে পাবে। অতএব ইহা সুস্পষ্ট যে, পুরুষ ও প্রকৃতিব সম্বন্ধ বিষযে গীতাব শিক্ষা সাংখ্য হইতে ভিন্ন, কারণ একই প্রক্রিযাব ফল হইতেছে সম্পূর্ণ পৃথক, এক ক্ষেত্রে ফল হইতেছে কর্মের বিরতি, আব এক ক্ষেত্রে ফল হইতেছে মহান কর্ম, নিঃস্বার্থ ও নিষ্কাম কর্ম, দিব্য কর্ম। সাংখ্যমতে পুরুষ ও প্রকৃতি হইতেছে দুইটি বিভিন্ন বস্তু, গীতাব মতে তাহাবা হইতেছে একই স্বপ্রতিষ্ঠ সত্তাব দুইটি দিক, দুইটি শক্তি, পুরুষ কেবল অনুমতিদাতা নহেন, পবন্তু তিনি প্রকৃতিব ঈশ্বর, প্রকৃতিব ভিতব দিযা তিনি জগৎলীলা উপভোগ কবিতেছেন, প্রকৃতিব ভিতব দিযা জগতে ভাগবত ইচ্ছা ও জ্ঞানকে কার্যে পরিণত

করিতেছেন—এই জগতের ব্যবস্থা তাঁহারই অনুমতির দ্বারা বিধৃত, তিনি সর্বত্র অনুস্যূত রহিয়াছেন বলিয়া ইহার অস্তিত্ব সম্ভব হইয়াছে, ইহা রহিয়াছে তাঁহারই সত্তায়; তাঁহার সত্তার ধর্মের দ্বারা এবং তাঁহার অন্তর্নিহিত সচেতন ইচ্ছার দ্বারা ইহা নিয়ন্ত্রিত। এই পুরুষকে জানা, ইহার আহ্বানে সাড়া দেওয়া, ইহার দিব্য সত্তা ও প্রকৃতির মধ্যে বাস করা—এই উদ্দেশ্যেই অহং এবং তাহার ক্রিয়াকে বর্জন করিতে হয়। তখন মানুষ ত্রিগুণাত্মিকা নিম্নতন প্রকৃতিকে ছাড়াইয়া ঊর্ধ্বতন ভাগবত প্রকৃতির মধ্যে উঠে।

নীচের প্রকৃতি হইতে ভাগবত প্রকৃতিতে এই উন্নয়ন যে প্রক্রিয়ার দ্বারা সংসাধিত হয় তাহা পুরুষের সহিত প্রকৃতির জটিল সম্বন্ধ হইতেই উদ্ভূত, ইহা গীতার পুরুষত্রয় তত্ত্বের উপরে নির্ভর করে। যে পুরুষ সাক্ষাৎভাবে প্রকৃতির কার্য, তাহার পরিবর্তন লীলা, তাহার ক্রমান্বয় বিকাশকে অনুপ্রাণিত করিতেছে তাহাই ক্ষর পুরুষ; মনে হয় ইহা প্রকৃতির পরিবর্তনের সহিত পরিবর্তিত হইতেছে, তাহার চলার সহিত চলিতেছে, প্রকৃতির "কর্মের" অবিশ্রান্ত ক্রিয়ার দ্বারা এই পুরুষের *নানারূপের যেসব পরিবর্তন হইতেছে সেসবকে* সে তাহার সত্তার পরিবর্তন বলিয়াই অনুসরণ করিতেছে। প্রকৃতি এখানে ক্ষর, কালের মধ্যে অবিরাম গতি ও পরিবর্তন, অবিরাম বিবর্তন। কিন্তু এই প্রকৃতি পুরুষেরই কার্যকরী শক্তি ভিন্ন আর কিছুই নহে; কারণ প্রকৃতি কি হইবে তাহা পুরুষের স্বরূপেরই উপর নির্ভর করে, পুরুষের বিবর্তনের যেসব সম্ভাবনা রহিয়াছে তদনুসারেই প্রকৃতি কার্য করিতে পারে; *প্রকৃতি পুরুষের সত্তার বিবর্তনকে প্রকট করিতেছে। প্রকৃতির "কর্ম"* পুরুষের "স্বভাবের" (the own-nature) দ্বারা তাহার আত্ম-বিবর্তনের (self-becoming) ধারার দ্বারাই নির্ধারিত হয়, যদিও অনেক সময় মনে হয় যে কর্মের দ্বারাই প্রকৃতি নির্ধারিত হইতেছে, কারণ ইহার দ্বারাই বিবর্তন ক্রিয়া সম্পাদিত হয়। আমরা স্বরূপে যাহা তদনুসারে আমরা কর্ম করি, আবার আমাদের কর্মের দ্বারাই আমাদের স্বরূপকে বিকশিত করি, প্রকট করি। প্রকৃতিই হইতেছে কর্ম, পরিবর্তন, বিবর্তন এবং প্রকৃতিই হইতেছে সেই শক্তি যাহার দ্বারা এই সব সম্পাদিত হয়; কিন্তু পুরুষ হইতেছে চৈতন্যময় সত্তা, তাহা হইতেই ঐ শক্তি উদ্ভূত, তাহারই চৈতন্যের জ্যোতির্ময় উপাদান হইতে প্রকৃতি পরিবর্তনশীল ইচ্ছা আহরণ করিয়াছে, সেই ইচ্ছা নিজ পরিবর্তনসমূহ প্রকৃতির কর্মের মধ্যেই প্রকট করিতেছে। আর এই পুরুষ একও বটে, বহুও বটে, ইহা হইতেছে সেই এক প্রাণ-সত্তা যাহা হইতে সমস্ত প্রাণ সৃষ্ট হইয়াছে আবার ইহাই সমস্ত প্রাণী, ইহা হইতেছে এক বিশ্ব-সত্তা আবার ইহাই হইতেছে বিশ্বের সমস্ত সত্তা, সর্বভূতানি, কারণ এই সবই হইতেছে অদ্বিতীয় এক; সবই হইতেছে বহু পুরুষ। তাহাদের মূল সত্তায় একমেবাদ্বিতীয়ম্ একমাত্র পুরুষ। কিন্তু প্রকৃতির মধ্যে যান্ত্রিক কৌশলস্বরূপ যে অহংভাব রহিয়াছে, যাহা প্রকৃতিরই ক্রিয়ার একটা অংশ, তাহার বশে মন বর্তমান মুহূর্তের সীমাবদ্ধ বিবর্তনের সহিত, কোন বিশেষ দেশ ও কালে প্রকৃতির সক্রিয়

চৈতন্যের সমষ্টির সহিত, প্রকৃতির অতীত কর্মসমষ্টির যে ফল মুহূর্তে মুহূর্তে হইতেছে তাহার সহিত পুরুষের চৈতন্যকে একই বলিয়া ধারণা করে। প্রকৃতির মধ্যেই এই সব জীবের একত্ব এক প্রকারে উপলব্ধি করা যাইতে পারে, বিশ্বপ্রকৃতির সমগ্র কর্মে এক বিশ্বপুরুষ অভিব্যক্ত, প্রকৃতি পুরুষকে অভিব্যক্ত করিতেছে, পুরুষই প্রকৃতি হইতেছে—এইরূপ জ্ঞান হইতে পারে। কিন্তু ইহা হইতেছে কেবল বিরাট বিশ্ববিবর্তনকে জানা; এই বিবর্তন মিথ্যা নহে, মায়া নহে কিন্তু ইহার জ্ঞান হইতেই আমরা আমাদের আত্মা সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞানলাভ করিতে পারি না, কারণ আমাদের প্রকৃত আত্মা সকল সময়েই ইহা অপেক্ষা আরও কিছু, ইহার ঊর্ধ্বে আরও কিছু।

কারণ যে পুরুষ প্রকৃতিতে অভিব্যক্ত এবং তাহার কর্মে বদ্ধ তাহার ঊর্ধ্বে রহিয়াছে পুরুষের আর এক স্থিতি (status); তাহা শুধুই একটা স্থিতি, একেবারেই ক্রিয়া নহে, সেইটি হইতেছে নীরব, অক্ষর, সর্বব্যাপী, স্বপ্রতিষ্ঠ, নিশ্চল আত্মা, সর্বগতম্ অচলম্, তাহা বিবর্তন নহে পরন্তু অপরিবর্তনীয় সত্তা, তাহাই অক্ষর পুরুষ। ক্ষর পুরুষ প্রকৃতির কর্মের মধ্যে জড়িত হইয়াছে, অতএব সে কালের স্রোতে, বিবর্তনের তরঙ্গে কেন্দ্রীভূত, যেন নিজেকে তাহার মধ্যে হারাইয়া ফেলিয়াছে, বাস্তবিকপক্ষে নহে, কেবল এইরূপ দেখায় মাত্র। অক্ষরে প্রকৃতি পুরুষের মধ্যে নীরবতায় পতিত হয় এবং বিশ্রাম করে, অতএব পুরুষ নিজ অক্ষর সত্তা অবগত হয়। ক্ষর হইতেছে সাংখ্যের পুরুষ যখন সে প্রকৃতির গুণসকলের *বৈচিত্র্যময় খেলা নিজের মধ্যে প্রতিফলিত করে, এবং নিজেকে সগুণ (the* personal) বলিয়া জানে, অক্ষর হইতেছে সাংখ্যের পুরুষ যখন এই গুণসকল সাম্যাবস্থায় পতিত হয় এবং পুরুষ নিজেকে নির্গুণ (the impersonal) বলিয়া জানে। অতএব ক্ষর পুরুষ নিজেকে প্রকৃতির কর্মের সহিত এক করায় কর্তা বলিয়া মনে হয়, আর গুণসমূহের ক্রিয়া হইতে বিযুক্ত অক্ষর হইতেছে নিষ্ক্রিয় অকর্তা এবং সাক্ষী। *মানুষের আত্মা যখন ক্ষরের প্রতিষ্ঠা গ্রহণ করে,* তখন নামরূপের খেলার সহিত নিজেকে এক বলিয়া দেখে এবং প্রকৃতিতে যে অহংভাব রহিয়াছে তাহার দ্বারা নিজ আত্ম-জ্ঞানকে সমাচ্ছন্ন করিতে তৎপর হয়, অতএব সে তাহার অহংকেই কর্তা বলিয়া মনে করে, আর যখন সে অক্ষরে প্রতিষ্ঠিত হয় তখন সে নির্গুণ নৈর্ব্যক্তিক পুরুষের সহিত নিজেকে এক করিয়া দেখে, এবং প্রকৃতিকে কর্ত্রী বলিয়া ও নিজেকে নিষ্ক্রিয় সাক্ষী বলিয়া অবগত হয়, অকর্তারম্। মানুষের মনকে এই দুইটি প্রতিষ্ঠার কোন একটির দিকে ঝুঁকিতে হয়, একটিকে গ্রহণ করিতে গেলে সে অপরটি ছাড়িয়া দেয়, হয় সে প্রকৃতির দ্বারা গুণের ও নামরূপের পরিবর্তনের ধারায় কর্মে বদ্ধ হয় অথবা সে অক্ষর নৈর্ব্যক্তিক সত্তায় প্রকৃতির কর্মপরম্পরা হইতে মুক্ত হয়।

কিন্তু এই দুইটি পুরুষের স্থিতি ও অক্ষরতা এবং প্রকৃতিতে পুরুষের কর্ম, তাহার ক্ষরতা—ইহারা বস্তুত একই সঙ্গে যুগপৎ রহিয়াছে। এই সমস্যার সমাধান

করিতে মাযাবাদ বা দ্বৈতবাদের ন্যায কোন মতেব আশ্রয গ্রহণ করিতে হইত যদি না পুরুষেব এমন এক পবম সত্তা থাকিত, এই দুইটি, ক্ষব ও অক্ষব, যাহাব দুইটি বিপবীত দিক, কিন্তু যাহা দুইটিব কোনটির দ্বাবাই সীমাবদ্ধ নহে। আমবা দেখিয়াছি, গীতা এই সত্তা পাইয়াছে পুরুষোত্তম তত্ত্বেব মধ্যে। পবম পুরুষ হইতেছেন ঈশ্বব, ভগবান, সর্ব জীবের প্রভু, সর্বভূতমহেশ্বব। তিনি তাঁহাব নিজ সক্রিযা প্রকৃতিকে (গীতার ভাষায স্বাম প্রকৃতিম্) জীবেব মধ্যে প্রকট কবেন, তাহা প্রত্যেক জীবের স্বভাবের দ্বাবা, তাহাব অন্তর্নিহিত ভাগবত সত্তাব ধর্ম অনুসাবে (প্রত্যেক জীবকেই এই ধর্মেব মূল ধাবাগুলি অনুসবণ কবিতে হয) প্রকটিত হয, যদিও তাহা অহংভাবাত্মক প্রকৃতিতে গুণত্রযেব উপব জটিল ক্রিয়াব দ্বারাই (গুণাঃ গুণেষু বর্ত্তন্তে) প্রকটিত হয়। ইহাই ত্রৈগুণ্যময়ী মাযা, মানুষেব পক্ষে এই মাযা অতিক্রম কবা বডই কঠিন, দুবত্যয়া,—তথাপি গুণত্রযেব অতীত হইযা মানুষ ইহাকে অতিক্রম কবিতে পাবে। কাবণ যদিও ঈশ্বব ক্ষবভাবে তাঁহাব প্রকৃতিশক্তির দ্বাবা এইসব সম্পন্ন কবেন, তথাপি অক্ষবভাবে তিনি অস্পৃষ্ট, উদাসীন, সব সমভাবে দেখেন, সকলেব মধ্যে ব্যাপ্ত, অথচ সকলেব উর্ধ্বে। তিন অবস্থাতেই তিনি ঈশ্বব, সর্বোচ্চ অবস্থায় তিনি পবমেশ্বব, অক্ষব অবস্থায তিনি প্রভু ও বিভু, সর্বব্যাপী নৈর্ব্যক্তিক সত্তা, এবং ক্ষব অবস্থায় তিনি সর্বগত ইচ্ছাশক্তি এবং সর্বত্র বিদ্যমান সক্রিয ঈশ্বব। যখন তিনি তাঁহাব নামরূপেব খেলা প্রকট করিতেছেন তখনও তিনি নামরূপের অতীত নৈর্ব্যক্তিক সত্তায মুক্ত, তিনি কেবল নির্গুণও নহেন, কেবল সগুণও নহেন, তিনি এই দুইভাবে একই অদ্বিতীয সত্তা, উপনিষদের ভাষায তিনি নির্গুণো গুণী। কখন কি সংঘটিত হইবে সেসব তিনি পূর্ব হইতেই সঙ্কল্প কবিযা বাখিযাছেন (তখনও জীবিত ধার্তবাষ্ট্রগণ সম্বন্ধে তিনি অর্জুনকে বলিযাছিলেন, মযৈবৈতে নিহতাঃ পূর্ব্বমেব, "আমি ইহাদিগকে ইতিপূর্বেই মারিয়া বাখিয়াছি"), আব প্রকৃতি যাহা সংঘটিত কবে তাহা কেবল তাঁহারই দিব্য সঙ্কল্পেব ফল; তথাপি পিছনে তাঁহাব নৈর্ব্যক্তিকতাব জন্য তিনি তাঁহাব কর্মের দ্বাবা বদ্ধ হন না, কর্ত্তাবম্ অকর্ত্তাবম্।

কিন্তু ব্যষ্টিগত সত্তারূপে মানুষ অজ্ঞানেব বশে নিজেকে কর্মেব সহিত এবং বিবর্তনের সহিত এক কবিযা দেখে, যেন ঐটিই তাহাব আত্মাব সবখানি, যেন উহা আত্মার কেবল একটা শক্তি নহে, উহা হইতেই উদ্ভূত নহে—এই জন্যই সে অহংভাবেব দ্বাবা বিভ্রান্ত হইযা পডে। সে মনে কবে যে, সে এবং অন্যান্য লোকই সব করিতেছে; সে দেখিতে পায় না যে, প্রকৃতিই সব কবিতেছে এবং সে অজ্ঞান ও আসক্তিব বশে প্রকৃতিব কর্মাবলীকে ভুল করিযা দেখিতেছে। সে গুণসকলেব দাস, কখনও তমোগুণের জডতাব দ্বাবা প্রতিহত হইতেছে, কখনও বজোগুণেব প্রবল ঝটিকার বেগে উড়িয়া যাইতেছে, কখনও সত্ত্বগুণেব আংশিক আলোকেব দ্বাবা সীমাবদ্ধ হইতেছে, কিন্তু কেবলমাত্র প্রাকৃত মনই এইভাবে গুণসকলেব দ্বাবা পরিবর্তিত হইতেছে, সেই মন হইতে সে নিজেকে আদৌ পৃথক কবিযা দেখিতেছে

না। সেইজন্যই সে দুঃখ ও সুখ, হর্ষ ও শোক, বাসনা ও বিপু, আসক্তি ও ঘৃণা এই সকলেব দ্বাবা অভিভূত হইযা পডে; তাহাব কোনরূপ স্বাধীনতা নাই।

মুক্ত হইতে হইলে তাহাকে প্রকৃতিব কর্ম হইতে ফিবিয়া অক্ষবে প্রতিষ্ঠিত হইতেই হইবে; তখন সে গুণত্রযের উর্ধ্বে উঠিবে, ত্রিগুণাতীত হইবে। নিজেকে অক্ষব ব্রহ্ম, অপরিবর্তনীয পুরুষ জানিয়া সে নিজেকে অক্ষব নৈর্ব্যক্তিক সত্তা বলিযা, আত্মা বলিয়া জানিবে, প্রকৃতিব কর্মধাবাকে শান্তভাবে দর্শন করিবে, নিবপেক্ষভাবে সমর্থন কবিবে, কিন্তু নিজে থাকিবে উদাসীন, অস্পৃষ্ট, অচল শুদ্ধ, সর্বভূতেব সহিত তাহাদেব আত্মায এক, প্রকৃতি এবং তাহাব কার্যাবলীর সহিত এক নহে। যদিও এই আত্মা হইতেছে "প্রভু", "বিভু", তাহার উপস্থিতিব দ্বাবা প্রকৃতিকে কর্ম কবিবাব অধিকার দিতেছে, তাহার সর্বব্যাপী সত্তাব দ্বাবা প্রকৃতির সেই সকল ধর্ম ধবিযা বহিযাছে, অনুমোদন কবিতেছে, তথাপি সে নিজে কর্ম সৃষ্টি কবে না, কর্তৃত্বেব ভাবও সৃষ্টি কবে না, অথবা কর্মেব সহিত ফলেব সংযোগও সৃষ্টি কবে না` পবন্তু ক্ষবভাবে প্রকৃতি কেমন কবিয়া এইসব সংঘটিত কবিতেছে, স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে, কেবল তাহাই দর্শন কবে এবং সংসারে জাত কোন জীবেব পাপ বা পুণ্য সে নিজেব বলিযা গ্রহণ করে না,[১] সে তাহার আধ্যাত্মিক নির্মলতা রক্ষা কবে। অজ্ঞানে বিমূঢ় অহংই এই সব জিনিসকে নিজেব উপর আরোপ কবে, কাবণ সে কর্তাব দাযিত্ব গ্রহণ কবে, বাস্তবিকপক্ষে সে যে এক মহত্তব শক্তির যন্ত্র তাহা ভুলিযা নিজেই কর্তা সাজে, অজ্ঞানেনাবৃতম্ জ্ঞানম্ তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ। নিগুণ নৈর্ব্যক্তিক সত্তায ফিবিযা গিয়া জীবাত্মা মহত্তর আত্মজ্ঞান লাভ কবে এবং কর্মবন্ধন হইতে মুক্ত হয়, তাহাব গুণসকলেব দ্বারা সংস্পৃষ্ট হয় না, তাহার শুভ অশুভেব, পাপ পুণ্যেব ভ্রান্তি হইতে মুক্ত হয। প্রাকৃত সত্তা, মন, দেহ, প্রাণ তখনও থাকে, প্রকৃতি তখনও কার্য কবে, কিন্তু আভ্যন্তবীণ সত্তা আর এই সকলেব সহিত নিজেকে এক করিয়া দেখে না, আব প্রাকৃত সত্তাব গুণসকলের খেলা চলিলেও সে হর্ষ বা শোক কবে না। সে হয় সকল ব্যাপারের দ্রষ্টা, স্থির ও মুক্ত অক্ষব আত্মা।

এইটি কি শেষ অবস্থা, চূডান্ত সম্ভাবনা, শ্রেষ্ঠ বহস্য, তাহা হইতেই পারে না, কাবণ ইহা একটা মিশ্রিত বা দ্বিখণ্ডিত অবস্থা, সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যেব অবস্থা নহে, এখানে সত্তা দ্বিধা, তাহাতে ঐক্য সিদ্ধ হয় নাই, আত্মায় রহিয়াছে মুক্তি, কিন্তু প্রকৃতিতে বহিযাছে অপূর্ণতা। ইহা কেবল একটি ধাপমাত্র হইতে পারে, তাহা হইলে ইহার উর্ধ্বে আব কি আছে? এক সমাধান হইতেছে সন্ন্যাসীব, তিনি প্রাকৃতিক কর্মকে সম্পূর্ণভাবেই বর্জন করেন, অন্তত কর্ম যতদূব বর্জন করা সম্ভব

১ ন কর্ত্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ।
ন কর্ম্মফলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে॥ ৫।১৪
নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং ন চৈব সুকৃতং বিভুঃ।
অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ॥ ৫।১৫

তাহা করেন, যেন অমিশ্র অখণ্ড মুক্তিলাভ করা যায়, কিন্তু ইহা গীতা কর্তৃক স্বীকৃত হইলেও গীতার অনুমোদিত সমাধান নহে। গীতাও কর্ম ত্যাগের উপর জোর দিয়াছে, সর্ব্বকর্ম্মাণি সংন্যস্য, কিন্তু সে ত্যাগ ভিতরের, ব্রহ্মে কর্ম সমর্পণ। ক্ষরে ব্রহ্ম সম্পূর্ণভাবে প্রকৃতির কর্ম সমর্থন করিতেছেন, অক্ষরভাবে সে কর্ম সমর্থন করিলেও নিজেকে সে কর্ম হইতে স্বতন্ত্র রাখিতেছেন, নিজের মুক্তি অক্ষুণ্ণ রাখিতেছেন; ব্রহ্মের অক্ষরভাবের সহিত যুক্ত হইয়া ব্যষ্টিগত জীব মুক্ত ও স্বতন্ত্র হয়, অথচ ব্রহ্মের ক্ষরভাবের সহিত যুক্ত হইয়া প্রকৃতির কর্মকে সমর্থন করে কিন্তু তাহার দ্বারা স্পৃষ্ট বা বদ্ধ হয় না। ইহা সে সর্বোত্তমভাবে করিতে পারে যখন সে দেখে যে, এই দুইটি হইতেছে এক পুরুষোত্তমেরই দুইটি ভাব। পুরুষোত্তম সর্বভূতের মধ্যে গুপ্ত ঈশ্বররূপে বিরাজিত থাকিয়া প্রকৃতিকে পরিচালিত করেন এবং তাঁহার ইচ্ছার বশে প্রকৃতি স্বভাবের দ্বারা কর্মসকল সম্পাদন করে, সে ইচ্ছা আর তখন জীবের অহংভাবের দ্বারা বিকৃত ও স্বরূপভ্রষ্ট হয় না। ব্যষ্টিগত জীব দিব্যভাবাপন্ন প্রকৃতিকে ভাগবত ইচ্ছার যন্ত্র করিয়া দেয়, নিমিত্তমাত্রম্। সে কর্মের মধ্যেও থাকে ত্রিগুণাতীত, গুণত্রয়ের ঊর্ধ্বে, গুণসকল হইতে মুক্ত, নিস্ত্রৈগুণ্য, গীতা পূর্বেই যে আদেশ দিয়াছে, নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জুন, শেষ পর্যন্ত সে তাহা সমগ্রভাবে পূর্ণ করে। অবশ্য তখনও সে ব্রহ্মের ন্যায়ই গুণসকলের ভোক্তা থাকে, কিন্তু সে আর তাহাদের দ্বারা সীমাবদ্ধ থাকে না, নির্গুণং গুণভোক্তৃ চ, সে ব্রহ্মের ন্যায় সবকিছু ধরিয়া থাকিয়াও অনাসক্ত থাকে, অসক্তম্ সর্ব্বভৃৎ, কিন্তু তাহার মধ্যে গুণসকলের ক্রিয়া সম্পূর্ণভাবে রূপান্তরিত হইয়া যায়, তাহাদের অহংমূলক স্বরূপ ও প্রতিক্রিয়ার ঊর্ধ্বে উন্নীত হয়। কারণ সে তাহার সমগ্র সত্তাকে পুরুষোত্তমের মধ্যে একীভূত করিয়াছে, সে ভাগবত সত্তাকে এবং উচ্চতর ভাগবত প্রকৃতিকে প্রাপ্ত হইয়াছে, মদ্ভাব, এমনকি তাহার মন এবং প্রাকৃত চৈতন্যকেও ভগবানের সহিত যুক্ত করিয়াছে, মন্মনা মচ্চিত্ত। এই রূপান্তরই প্রকৃতির চরম বিকাশ এবং দিব্যজন্মের পূর্ণ সিদ্ধি, রহস্যম্ উত্তমম্। যখন ইহা সংসাধিত হয়, জীব নিজেকে প্রকৃতির প্রভু বলিয়া জানিতে পারে এবং ভাগবত জ্যোতির জ্যোতি হইয়া এবং ভাগবত ইচ্ছার ইচ্ছা হইয়া তাহার প্রাকৃত কার্যাবলীকে দিব্য কর্মে পরিণত করিতে পারে।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

নির্বাণ ও সংসারের কাজ

পূর্ণযোগের দ্বারা পুরুষোত্তমের সহিত জীবাত্মার মিলনই গীতার সম্পূর্ণ শিক্ষা, শুধু জ্ঞানের পথে কেবল অক্ষর পুরুষের সহিত মিলনের যে সঙ্কীর্ণতর মত তাহা নহে। এইজন্যই গীতা প্রথমে জ্ঞান ও কর্মের সামঞ্জস্য করিয়া দেখাইতে পারিয়াছে যে, জ্ঞান ও কর্ম উভয়ের সহিত সমন্বিত প্রেম ও ভক্তিই হইতেছে উত্তম রহস্যে পৌঁছিবার শ্রেষ্ঠতম পন্থা। কারণ যদি অক্ষর পুরুষের সহিত মিলনই একমাত্র রহস্য বা উচ্চতম রহস্য হইত তাহা হইলে উহা সম্ভব হইত না; কারণ তাহা হইলে একটা বিশেষ অবস্থায় যেমন আভ্যন্তরীণ ভিত্তি ধ্বংস ও লুপ্ত হইত ঠিক তেমনই প্রেম ও ভক্তিরও আভ্যন্তরীণ ভিত্তি ধ্বংস ও লুপ্ত হইয়া যাইত। কেবল অক্ষর পুরুষের সহিত সম্পূর্ণ ও অনন্য মিলনের অর্থ হইতেছে ক্ষরভাবের সম্পূর্ণ বিলোপ সাধন, শুধু ইহার সাধারণ ও নিম্নতন ক্রিয়া নহে পরন্তু ইহার যাহা একেবারে মূল, যাহা ইহার অস্তিত্বকে সম্ভব করিয়াছে, শুধু অজ্ঞানের মধ্যে কার্যাবলী নহে, পরন্তু জ্ঞানের মধ্যেও কার্যাবলী, সবেরই সম্পূর্ণ বিলোপ সাধন। ইহার অর্থ হইবে মানুষ ও ভগবানের মধ্যে সচেতন প্রতিষ্ঠা ও কর্মে যে পার্থক্য রহিয়াছে, যাহার ফলে ক্ষরপুরুষের খেলা সম্ভব হইয়াছে তাহার সম্পূর্ণ বিলোপ সাধন, কারণ তখন ক্ষরের কর্ম হইবে সম্পূর্ণভাবে অজ্ঞানেরই খেলা, তাহাতে ভাগবত সত্যের কোন মূল বা ভিত্তি থাকিবে না। অন্য পক্ষে যোগের দ্বারা পুরুষোত্তমের সহিত মিলনের অর্থ হইতেছে আমাদের স্বপ্রতিষ্ঠ সত্তায় তাঁহার সহিত আমার একত্বের উপলব্ধি ও আস্বাদন এবং আমাদের ক্রিয়াশীল সত্তায় তাঁহার সহিত একটা প্রভেদ বিশেষ। এই প্রভেদ দিব্যকর্মের খেলায় বর্তমান থাকে, সে কর্ম হয় দিব্যপ্রেমের দ্বারা প্রবোচিত এবং সিদ্ধ ভাগবত প্রকৃতির দ্বারা অনুষ্ঠিত, দিব্যকর্মে এই প্রভেদের স্থায়িত্ব এবং আত্মায় ভগবানের যে উপলব্ধি তাহার সহিত জগতে ভগবানের উপলব্ধির সামঞ্জস্য, ইহার জন্যই মুক্ত কর্মীর পক্ষে কর্ম ও ভক্তি সম্ভব হয়, আর শুধু সম্ভব নহে, তাহার পূর্ণসিদ্ধ অবস্থায় উহা অবশ্যম্ভাবী হয়।

কিন্তু অক্ষর আত্মার সুপ্রতিষ্ঠিত উপলব্ধির ভিতর দিয়াই হইতেছে পুরুষোত্তমের সহিত মিলনের সোজা পথ, আর যেহেতু এইটি না হইলে কর্ম ও ভক্তি তাহাদের পূর্ণ দিব্য সার্থকতা লাভ করিতে পারে না বলিয়া গীতা প্রথম প্রয়োজনরূপে এইটির উপর এত জোর দিয়াছে সেইজন্যই গীতার অর্থ বুঝিতে ভুল করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়। কারণ গীতা যেসকল শ্লোকে এই প্রয়োজনের উপর খুব বেশী জোর দিয়াছে কেবল সেইগুলিই যদি গ্রহণ করি,

কিন্তু পূর্বাপর চিন্তাধারায় তাহাদের স্থান কি সেইটি সমগ্রভাবে লক্ষ্য করিতে অবহেলা করি তাহা হইলে আমরা সহজেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে, গীতা বাস্তবিকপক্ষে কর্মহীন লয়ের অবস্থাকেই জীবের চরম গতি বলিয়া শিক্ষা দিতেছে, অচল অক্ষর সত্তায় নিথর শান্তিলাভের সাধনায় কর্ম কেবল প্রথমাবস্থায় উপযোগী উপায়মাত্র, পঞ্চম অধ্যায়ের শেষে এবং সমগ্র ষষ্ঠ অধ্যায়ে গীতা এই প্রয়োজনের উপর যে জোর দিয়াছে তাহাই সর্বাপেক্ষা প্রবল ও ব্যাপক। সেখানে আমরা যে যোগের বর্ণনা পাই তাহার সহিত কর্মের সামঞ্জস্য হয় না বলিয়াই প্রথম দৃষ্টিতে আমাদের মনে হইতে পারে এবং যোগী যে পরম পদ লাভ করেন তাহার বর্ণনা করিতে সেখানে "নির্বাণ" শব্দটি পুনঃপুনঃ ব্যবহৃত হইয়াছে।

এই পদের লক্ষণ হইতেছে শান্ত আত্ম-নির্বাণের পরম শান্তি, শান্তিং নির্ব্বাণপরমাং, আর ইহা যে বৌদ্ধ মতানুযায়ী শূন্যে আনন্দময় আত্মবিলয়, যেন তাহাই স্পষ্টভাবে বুঝাইবার জন্য গীতা সর্বদা "ব্রহ্ম-নির্ব্বাণ", ব্রহ্মের মধ্যে নির্বাণ, এই কথাটি ব্যবহার করিয়াছে, স্পষ্টতই মনে হয় যে, এখানে ব্রহ্ম বলিতে অক্ষরকেই বুঝাইতেছে, যাহা প্রকৃতির বাহ্য ব্যাপারে অনুস্যূত থাকিলেও সক্রিয়ভাবে কোনই অংশ গ্রহণ করে না। অতএব আমাদিগকে দেখিতে হইবে, এখানে গীতার কথার প্রকৃত মর্ম কি, বিশেষত এই যে শান্তির কথা বলা হইতেছে ইহা কি সম্পূর্ণ কর্মশূন্য বিরতির শান্তি, অক্ষরে আত্ম-নির্বাণের অর্থ কি ক্ষরের সমস্ত জ্ঞান ও চৈতন্যের এবং ক্ষরের সমস্ত কর্মের সম্পূর্ণ বর্জন? বস্তুত নির্বাণের সহিত সংসারে কোনরূপ অস্তিত্ব ও কর্মের সামঞ্জস্য হয় না এইরূপ ধারণাতেই আমরা অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি, আর আমরা যুক্তি দেখাইতে পারি যে, "নির্বাণ" শব্দটির ব্যবহারই যথেষ্ট এবং ইহার দ্বারাই প্রশ্নটির চূড়ান্ত মীমাংসা হইয়া যায়। কিন্তু আমরা যদি বৌদ্ধমতই অনুধাবন করিয়া দেখি তাহা হইলে নির্বাণের সহিত সংসার ও সাংসারিক কর্মের অসামঞ্জস্য বস্তুতপক্ষে বৌদ্ধদেরই মত ছিল কি না সে বিষয়ে সন্দেহ হইবে, আর যদি আমরা গীতার শিক্ষা অনুধাবন করি, তাহা হইলে দেখিতে পাইব যে, এরূপ মত এই মহত্তম বৈদান্তিক শিক্ষার অন্তর্গত নহে।

যিনি ব্রহ্মকে জানিয়াছেন, ব্রহ্মচৈতন্যের মধ্যে উঠিয়াছেন, ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মণিস্থিতঃ, তাঁহার পূর্ণ সমতার কথা বলিয়া গীতা ব্রহ্মযোগ ও ব্রহ্মে নির্বাণ বলিতে কি বুঝে পরবর্তী নয়টি শ্লোকে তাহা পরিস্ফুট করিয়াছে। প্রথমেই রহিয়াছে, "আত্মা যখন আর বাহ্য বস্তুর স্পর্শে আসক্ত নহে তখনই মানুষ আত্মায় যে সুখ রহিয়াছে তাহা লাভ করে, এরূপ ব্যক্তি অক্ষয় সুখ ভোগ করেন, কারণ তাঁহার আত্মা ব্রহ্মের সহিত যোগে যুক্ত।"[১] বাসনা ও ক্রোধ ও চিত্তবিক্ষোভের আক্রমণ হইতে মুক্ত হইতে হইলে অনাসক্তি হইতেছে মূল প্রয়োজন এবং

[১] বাহ্যস্পর্শেষ্বসক্তাত্মা বিন্দত্যাত্মনি যৎ সুখম্।
স ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা সুখমক্ষয়মশ্নুতে॥৫।২১

এইরূপ মুক্তি না হইলে প্রকৃত সুখও সম্ভব নহে, ইহাই গীতার বক্তব্য। ঐ সুখ এবং ঐ সমতা মানুষকে এই শরীরেই সম্পূর্ণভাবে লাভ করিতে হইবে, বিক্ষোভময় নীচের প্রকৃতির বশ্যতার লেশমাত্র রহিবে না, শরীর ত্যাগ করিয়াই পূর্ণ মুক্তি লাভ করা যায় এই ধারণা বর্জন করিতে হইবে, পূর্ণতম অধ্যাত্ম-মুক্তি এই পৃথিবীতেই লাভ করিতে হইবে, এই মানব জীবনেই উপভোগ করিতে হইবে, প্রাক্ শরীরবিমোক্ষণাৎ।[১] তাহার পর গীতা বলিতেছে, "যিনি আভ্যন্তরীণ সুখ, আভ্যন্তরীণ আরাম এবং আভ্যন্তরীণ জ্যোতি লাভ করিয়াছেন সেই যোগী ব্রহ্ম হইয়া ব্রহ্মে আত্মনির্বাণ লাভ করেন।"[২] এখানে নির্বাণ শব্দের অতি স্পষ্ট অর্থ হইতেছে উচ্চতর আধ্যাত্মিক, আভ্যন্তরীণ সত্তায় অহং-এর নির্বাণ, সে সত্তা চিরদিন দেশ ও কালের অতীত, কার্যকারণ শৃঙ্খল এবং ক্ষর জগতের পরিবর্তন সকলের দ্বারা বদ্ধ নহে, তাহা আত্মানন্দ, আত্মজ্যোতি এবং শাশ্বত শান্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত। যোগী আর "অহং" থাকেন না, মন ও শরীরের দ্বারা সীমাবদ্ধ ক্ষুদ্র ব্যক্তি থাকেন না, তিনি হন ব্রহ্ম, যে শাশ্বত আত্মা তাঁহার প্রাকৃত সত্তায় অনুস্যূত রহিয়াছে তাহার অক্ষর ভাগবত স্বরূপের সহিত তিনি চেতনায় ঐক্যবদ্ধ হন।

কিন্তু ইহা কি সকল বিশ্বচৈতন্য হইতে দূরে সমাধির কোন গভীর নিদ্রায় প্রবেশ করা, অথবা ইহা কি প্রকৃতি এবং তাহার কার্যাবলীর সম্পূর্ণভাবে এবং চিরকালের জন্য অতীত কোন কৈবল্যাত্মক সত্তায় প্রাকৃত সত্তা ও ব্যষ্টিগত আত্মার লয় বা মোক্ষ লাভের উদ্‌যোগ? নির্বাণে প্রবেশ করিতে হইলে কি বিশ্বচৈতন্য হইতে এইরূপে সরিয়া যাওয়া আবশ্যক, না, পূর্বাপর বাক্য হইতে যাহা বুঝা যায়, নির্বাণ বিশ্বচৈতন্যের সহিত একই সঙ্গে থাকিতে পারে, এমনকি একভাবে ইহা নির্বাণেরই অন্তর্গত? শেষেরটিই যথার্থ বলিয়া মনে হয় কারণ গীতা পরের শ্লোকেই বলিতেছে, "সেই ঋষিগণই ব্রহ্মে নির্বাণ লাভ করেন যাঁহাদের মধ্যে পাপের দাগ মুছিয়া গিয়াছে, সংশয়ের গ্রন্থি ছিন্ন হইয়াছে, যাঁহারা আত্মজয়ী এবং সর্বভূতের হিতসাধনে ব্রতী।"[৩] এই অবস্থা লাভ করাই নির্বাণ লাভ—এইরূপ অর্থ এখানে করা যাইতে পারে। কিন্তু পরের শ্লোকটি খুবই স্পষ্ট এবং সেখানে সন্দেহের স্থান নাই, যে যতিগণ[৪] কাম ও ক্রোধ হইতে মুক্ত হইয়াছেন, আত্মজয় লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে ব্রহ্মনির্বাণ তাঁহাদের চতুর্দিকে অবস্থিত, তাঁহাদিগকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে, তাঁহারা ইতিমধ্যেই ইহার মধ্যে বাস

শক্নোতীহৈব যঃ সোঢুং প্রাক্ শরীরবিমোক্ষণাৎ।
কামক্রোধোদ্ভবং বেগং স যুক্তঃ স সুখী নরঃ॥৫।২৩
যোঽন্তঃসুখোঽন্তরারামস্তথান্তর্জ্যোতিরেব যঃ।
স যোগী ব্রহ্মনির্ব্বাণং ব্রহ্মভূতোঽধিগচ্ছতি॥৫।২৪
লভন্তে ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃষয়ঃ ক্ষীণকল্মষাঃ।
ছিন্নদ্বৈধা যতাত্মানঃ সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ॥৫।২৫

[৪] যাঁহারা যোগ ও তপস্যার দ্বারা আত্মজয়ের সাধনা করেন তাঁহাদিগকেই "যতী" বলা যায়।

করিতেছেন, কারণ তাঁহারা আত্মার জ্ঞান লাভ করিয়াছেন,"[১] অর্থাৎ আত্মাকে জানা এবং আত্মাতে প্রতিষ্ঠিত হওয়াই নির্বাণে অবস্থান। ইহা যে নির্বাণ-তত্ত্বের উদার প্রসারণ তাহা সুস্পষ্ট। রিপুগণের সর্ববিধ কলুষ হইতে মুক্তি, এই মুক্তির ভিত্তিস্বরূপ সমতা ও আত্মজয়, সর্ব্বভূতেষু, সর্বভূতের প্রতিই সমভাব এবং সকলের জন্য কল্যাণকর প্রেম, যে সংশয় ও মোহ আমাদিগকে সর্বঐক্যসাধক ভগবান হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখে তাহার চরম নিরসন এবং আমাদের মধ্যে এবং সকলের মধ্যে যে এক অদ্বিতীয় আত্মা রহিয়াছে তৎসম্বন্ধে জ্ঞান—এইসব হইতেছে নির্বাণের পক্ষে প্রয়োজনীয়, এইসবকে লইয়াই নির্বাণ এবং ইহারাই নির্বাণের অধ্যাত্ম সত্তা, গীতার এই শ্লোকগুলি হইতে ইহাই স্পষ্টভাবে বুঝা যায়।

অতএব নির্বাণ স্পষ্টতই বিশ্বচৈতন্য এবং সংসারের কর্মের সহিত সুসঙ্গত। কারণ যেসকল ঋষি ইহা লাভ করিয়াছেন তাঁহারা ক্ষরজগতে প্রকট ভগবান সম্বন্ধে সচেতন এবং কর্মের ভিতর দিয়া তাঁহার সহিত নিবিড়ভাবে যোগযুক্ত, তাঁহারা সর্বভূতের হিতসাধনে নিযুক্ত। তাঁহারা ক্ষরপুরুষের অনুভূতিসকলকে ত্যাগ করেন নাই, তাঁহারা সেসবকে দিব্যভাবাপন্ন করিয়াছেন, কারণ গীতা বলিয়াছে, ক্ষরঃ সর্ব্বভূতানি, ক্ষরই সর্বভূত, এবং ব্যাপকভাবে সকলের হিতসাধন হইতেছে প্রকৃতির ক্ষরলীলার মধ্যে দিব্য কর্ম। ব্রহ্মে বাস করার সহিত জগতে এইরূপ কর্ম করার কোনই অসামঞ্জস্য নাই, বরং এইরূপ কর্ম ব্রহ্মে বাসের জন্য অবশ্যপ্রয়োজনীয় এবং উহার বাহ্যিক পরিণতি কারণ যে ব্রহ্মে আমরা নির্বাণ লাভ করি, যে অধ্যাত্ম চৈতন্যে আমরা ভেদাত্মক অহং-চৈতন্যের লয় সাধন করি, তাহা যে শুধু আমাদের মধ্যে রহিয়াছে তাহা নহে পরন্তু তাহা এই সর্বভূতের মধ্যেই রহিয়াছে, তাহা শুধু এই সব বিশ্বব্যাপারের ঊর্ধ্বে ও দূরে নাই পরন্তু এই সবের মধ্যে অনুস্যূত রহিয়াছে, ইহাদের ভিতর দিয়া প্রকটিত হইতেছে। অতএব ব্রহ্মে নির্বাণ বলিলে বুঝিতে হইবে, যে সীমাবদ্ধ ভেদাত্মক চৈতন্য ত্রিগুণাত্মিকা নিম্নতর মায়ার দ্বারা সৃষ্টির বাহিরের দিকে প্রকটিত হইয়াছে, যাহা মিথ্যা ও ভেদের সৃষ্টি করিতেছে, তাহারই বিনাশ ও নির্বাণ এবং নির্বাণে প্রবেশ হইতেছে এই অপর সত্য ঐক্যসাধক চৈতন্যের মধ্যে প্রবেশ, যাহা হইতেছে সৃষ্টির অন্তঃস্থল এবং ইহার আধার—ইহারই মধ্যে সৃষ্টি সমগ্রভাবে বিধৃত, ইহাই হইতেছে সৃষ্টির সমগ্র মূল ও শাশ্বত ও চরম সত্য। যখন আমরা নির্বাণ লাভ করি, নির্বাণের মধ্যে প্রবেশ করি, তখন ইহা কেবল আমাদের ভিতরেই থাকে না পরন্তু চতুর্দিকে বিদ্যমান থাকে, অভিতো বর্ত্ততে, কারণ এই ব্রহ্মচৈতন্য যে কেবল আমাদের অন্তরেই গুপ্তভাবে রহিয়াছে তাহা নহে, পরন্তু এই ব্রহ্মচৈতন্যের মধ্যেই আমরা বাস করিতেছি। আমরা ভিতরে যে আত্মা ইহা তাহাই, আমাদের ব্যষ্টিগত সত্তার

[১] কামক্রোধবিযুক্তানাং যতীনাং যতচেতসাম্।
অভিতো ব্রহ্মনির্বাণং বর্ত্ততে বিদিতাত্মনাম্॥৫।২৬

পরমাত্মা, আবার আমরা বাহিরে যে আত্মা ইহা তাহাও, বিশ্বের পরম আত্মা, সর্বভূতের আত্মা। সেই আত্মার মধ্যে বাস করিয়া আমরা সকলের মধ্যেই বাস করি, তখন আর কেবল আমাদের অহংমূলক সত্তায় বাস করি না; সেই আত্মার সহিত একত্ব লাভ করায় বিশ্বের সকল বস্তুর সহিত অবিচল ঐক্যবোধ আমাদের সত্তার প্রকৃতিগত হইয়া পড়ে, আমাদের সক্রিয় চৈতন্যের মূল প্রতিষ্ঠা এবং আমাদের সকল কর্মের মূল প্রেরণা হয়।

কিন্তু আবার ঠিক ইহার পরেই আমরা দুইটি শ্লোক পাই, তাহা এই সিদ্ধান্তের বিপরীত বলিয়াই মনে হইতে পারে। "সমস্ত বাহ্য স্পর্শ বহিষ্কৃত করিয়া এবং দৃষ্টিকে ভ্রূদ্বয়ের মধ্যস্থলে ন্যস্ত রাখিয়া এবং নাসিকার অভ্যন্তরে সঞ্চরণকারী প্রাণ ও অপান বায়ুকে সমান করিয়া ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিকে সংযত করিয়া মোক্ষপরায়ণ মুনি ইচ্ছা, ক্রোধ ও ভয়শূন্য হইয়া নিত্যমুক্ত হন।"[১] এখানে এই যোগের প্রণালীতে এমন একটা জিনিস আনা হইয়াছে যাহা কর্মযোগ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন বলিয়াই মনে হয়, এমনকি বিচার ও ধ্যানের দ্বারা জ্ঞান লাভের যে খাঁটি জ্ঞানযোগ, তাহা হইতেও ইহা বিভিন্ন বলিয়াই মনে হয়; ইহার সব বিশেষ লক্ষণগুলিই হইতেছে রাজযোগের, ইহাতে রাজযোগেরই দেহমন সম্বন্ধীয় তপস্যা গৃহীত হইয়াছে। এখানে মনের সমস্ত বৃত্তিকে জয় করিবার কথা রহিয়াছে, চিত্তবৃত্তিনিরোধ শ্বাস-প্রশ্বাসের সংযমও রহিয়াছে, প্রাণায়াম; ইন্দ্রিয় ও দৃষ্টিকে ভিতর দিকে টানিয়া লইবার কথাও রহিয়াছে, প্রত্যাহার। এই সবই হইতেছে আভ্যন্তরীণ সমাধিতে মগ্ন হইবার প্রণালী; ইহাদের সকলেরই লক্ষ্য হইতেছে মোক্ষ, আর মোক্ষ বলিতে সাধারণ ভাষায় কেবল ভেদাত্মক অহং চৈতন্যেরই বর্জন বুঝায় না, পরন্তু সমগ্র সক্রিয় চৈতন্যেরই বর্জন বুঝায়, উচ্চতম ব্রহ্মে আমাদের সত্তার লয় বুঝায়। তাহা হইলে কি আমাদিগকে বুঝিতে হইবে যে, গীতা ঐ অর্থে লয়ের দ্বারা মোক্ষলাভের শেষ প্রক্রিয়ারূপেই এই প্রণালীটি দিয়াছে, না, বহির্মুখী মনকে জয় করিবার একটি বিশেষ উপায়রূপে, একটি শক্তিশালী সহায়রূপেই এই প্রণালীটি দিয়াছে? এইটিই কি চরম, চূড়ান্ত, শেষ কথা? ইহা একটা বিশেষ উপায়, একটা সহায় বটে আবার চরম গতিরও অন্তত একটা দ্বার বটে, সে গতি লয় নহে, পরন্তু বিশ্বাতীত সত্তার মধ্যে উন্নয়ন, পরে আমরা দেখিব যে এইরূপ ব্যাখ্যাই সঙ্গত। কারণ এখানে এই অংশেও এইটিই শেষ কথা নহে; শেষ কথাটি, চরম চূড়ান্ত কথাটি আসিয়াছে পরের শ্লোকে, সেইটিই এই অধ্যায়ের শেষ শ্লোক। "মানুষ যখন আমাকে সকল যজ্ঞ ও তপস্যার ভোক্তা বলিয়া

স্পর্শান্ কৃত্বা বহির্বাহ্যাংশ্চক্ষুশ্চৈবান্তরে ভ্রুবোঃ।
প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত্বা নাসাভ্যন্তরচারিণৌ॥
যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধির্মুনির্মোক্ষপরায়ণঃ।
বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধো যঃ সদা মুক্ত এব সঃ॥৫।২৭-২৮

জানিতে পারে, ভুবনসকলের মহান ঈশ্বর বলিয়া, জীবসকলের সুহৃদ বলিয়া জানিতে পারে, তখন সে শান্তি লাভ করে।"[১] এখানে আবার কর্মযোগেরই শক্তি আসিয়াছে। এখানে জোর দিয়াই বলা হইয়াছে যে, নির্বাণের শান্তিলাভ করিতে হইলে সক্রিয় ব্রহ্মের জ্ঞান, বিশ্বপুরুষের জ্ঞান আবশ্যক।

এখানে আবার আমরা গীতার সেই মহান তত্ত্ব, পুরুষোত্তম তত্ত্ব পাইতেছি—যদিও এই "পুরুষোত্তম" নামটি একেবারে শেষের দিকেই ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহার পূর্বে ইহার উল্লেখ নাই, তথাপি কৃষ্ণ "অহং" (আমি), "মাং" (আমাকে) বলিতে সর্বদা পুরুষোত্তমকেই বুঝিয়াছেন, যে ভগবান আমাদের কালাতীত অক্ষর সত্তায় এক আত্মারূপে রহিয়াছেন, আবার যিনি জগতের মধ্যে, সর্বভূতের মধ্যে, সর্বকর্মের মধ্যেও রহিয়াছেন, নিশ্চল নীরবতা ও শান্তির অধীশ্বর, আবার শক্তি ও কর্মেরও অধীশ্বর, যিনি এখানে এই মহাযুদ্ধে সারথিরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, যিনি বিশ্বপ্রপঞ্চের অতীত, পরমাত্মা, সর্বমিদং, সকল ব্যষ্টিগত জীবেরই প্রভু—শ্রীকৃষ্ণ "অহং" বা "মাং" বলিতে সর্বদা সেই পুরুষোত্তম ভগবানকেই বুঝিয়াছেন। তিনি সকল যজ্ঞের, সকল তপস্যার ভোক্তা, অতএব মুক্তিকামী মানবকে যজ্ঞরূপে তপস্যারূপে কর্ম করিতে হইবে, তিনি ভুবনসকলের অধীশ্বর, সর্বলোকমহেশ্বর, প্রকৃতিতে এবং এই সর্বভূতে অভিব্যক্ত, অতএব মুক্তিলাভের পরও মুক্ত মানব কর্ম করিবেন জনগণকে যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করিবার জন্য, 'লোকসংগ্রহ'; তিনি সর্বজীবের সুহৃদ, অতএব যে ঋষি নিজের মধ্যে এবং চতুর্দিকে (অভিতঃ) নির্বাণ লাভ করিয়াছেন তিনি তখনও এবং সর্বদা সকল জীবের হিতসাধনে নিযুক্ত থাকিবেন—যেমন মহাযান বৌদ্ধমতে নির্বাণের শ্রেষ্ঠ লক্ষণ বিশ্বজনের প্রতি করুণার বশে কর্ম। যখন তিনি তাঁহার কালাতীত ও অক্ষর সত্তায় ভগবানের সহিত একত্বলাভ করিয়াছেন তখনও তিনি প্রকৃতির লীলায় সম্বন্ধসকলকে গ্রহণ করেন বলিয়া তাঁহার পক্ষে মানুষের প্রতি দিব্যপ্রেম এবং ভগবানের প্রতি প্রেম ও ভক্তি সম্ভব হয়।

ইহাই যে গীতার শিক্ষার মর্ম তাহা আরও স্পষ্ট হয় যখন আমরা গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ের অর্থ তলাইয়া দেখি, এই অধ্যায়টি হইতেছে পঞ্চম অধ্যায়ের এই শেষ কয়েকটি শ্লোকেরই বিস্তৃত ব্যাখ্যা ও পূর্ণ পরিণতি—ইহা হইতেই বুঝা যায়, গীতা এই শ্লোকগুলিকে কত প্রয়োজনীয় বিবেচনা করিয়াছে। অতএব আমরা এখানে যত সংক্ষেপে সম্ভব সমগ্র ষষ্ঠ অধ্যায়ের সারমর্মটি অনুধাবন করিব। ইহা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, প্রকৃত সন্ন্যাস বাহিরের ত্যাগ নহে, ভিতরের ত্যাগ—পুনঃপুনঃ উপদিষ্ট এই কথাটি প্রথমেই বলিয়া গুরু ষষ্ঠ অধ্যায় আরম্ভ করিলেন। "যিনি ফলকে অবলম্বন না করিয়া কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করেন তিনিই

[১] ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্বলোকমহেশ্বরম্।
সুহৃদং সর্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি॥৫।২৯

সন্ন্যাসী এবং তিনিই যোগী, যে ব্যক্তি যজ্ঞের অগ্নি প্রজ্বলিত করেন না এবং কর্ম করেন না তিনি নহেন। যাহাকে লোকে সন্ন্যাস বলে তাহাকেই যোগ বলিয়া জানিও, কারণ মনের বাসনামূলক সঙ্কল্প সন্ন্যাস (বা ত্যাগ) না করিলে কেহ যোগী হয় না।"[১] কর্ম করিতে হইবে, কিন্তু কোন্ উদ্দেশ্যে, কোন্ ক্রম অনুসারে? প্রথমে যোগশিক্ষার আরোহণের সময় কর্ম করিতে হইবে, কারণ তখন কর্মই কারণ। কিসের কারণ? আত্মসিদ্ধির, মুক্তির, ব্রহ্মে নির্বাণের কারণ, কারণ ভিতরে ত্যাগের একনিষ্ঠ সাধনা করিতে করিতে কর্ম করিলে এই সিদ্ধি, এই মুক্তি—বাসনাত্মক মন, অহং এবং নীচের প্রকৃতির উপর এই বিজয় সহজেই সম্পাদিত হয়।

কিন্তু যখন কেহ শিখরে উঠিয়াছেন? তখন আর কর্ম কারণ নহে; কর্মের দ্বারা আত্মজয় এবং আত্মোপলব্ধির যে শান্তি লাভ করা যায় তখন তাহাই হয় কারণ। আবার কিসের কারণ? আত্মাতে, ব্রহ্মচৈতন্যে অবিচল প্রতিষ্ঠার কারণ, যে পূর্ণ সমতায় মুক্ত মানবের দিব্য কর্মসকল সম্পাদিত হয় তাহার কারণ। "যখন কেহ ইন্দ্রিয় বিষয়ে অথবা কর্মে আসক্ত হয় না এবং মন হইতে সকল বাসনাত্মক সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়াছে, তখনই বলা যায় যে, সে যোগশিখরে আরোহণ করিয়াছে।"[২] এই ভাব লইয়াই মুক্ত মানব কর্ম করেন তাহা আমরা ইতিপূর্বেই দেখিয়াছি; তিনি কর্ম করেন বাসনা ও আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া, অহংমূলক ব্যক্তিগত ইচ্ছা ও যে মানসিক লিপ্সা বাসনার জনক তাহা পরিত্যাগ করিয়া। তিনি তাঁহার নিম্নতন আত্মাকে জয় করিয়াছেন, তিনি যে পূর্ণতম শান্তি লাভ করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার উচ্চতম আত্মা তাঁহার নিকট প্রকাশিত হইয়াছে; সেই উচ্চতম আত্মা সর্বদা নিজের সত্তায় সমাহিত, সমাধিমগ্ন, যখন বাহ্য জগৎ হইতে চেতনাকে ভিতরের দিকে টানিয়া লওয়া হয় তখনই নহে, পরন্তু সর্বদা, মনের জাগ্রত অবস্থাতেও, যখন বাসনা ও অশান্তির কারণ বিদ্যমান থাকে, সুখ-দুঃখ, মান-অপমান, সর্ববিধ দ্বন্দ্ব উপস্থিত থাকে, শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু তথা মানাপমানয়োঃ। এই উচ্চতর আত্মা হইতেছে অক্ষর, কূটস্থ, তাহা প্রাকৃত সত্তার সকল পরিবর্তন ও বিক্ষোভের ঊর্ধ্বে

[১] অনাশ্রিতঃ কর্মফলং কার্য্যং কর্ম করোতি যঃ।
স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্ন চাক্রিয়ঃ॥
যং সন্ন্যাসমিতি প্রাহুর্যোগং তং বিদ্ধি পাণ্ডব।
ন হ্যসন্ন্যস্তসংকল্পো যোগী ভবতি কশ্চন॥
আরুরুক্ষোর্মুনের্যোগং কর্ম কারণমুচ্যতে।
যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে॥৬।১-৩
যদা হি নেন্দ্রিয়ার্থেষু ন কর্মস্বনুষজ্জতে।
সর্বসংকল্পসন্ন্যাসী যোগারূঢ়স্তদোচ্যতে॥৬।৪
জিতাত্মনঃ প্রশান্তস্য পরমাত্মা সমাহিতঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু তথা মানাপমানয়োঃ॥৬।৭

অবস্থিত; আর ইহার সহিত যোগীকে তখনই যুক্ত বলা যায় যখন তিনি ইহারই মত কূটস্থ হন, যখন তিনি সকল বাহ্য দৃশ্য ও পরিবর্তনের ঊর্ধ্বে উঠেন, যখন তিনি আত্মজ্ঞানে পরিতৃপ্ত হন, যখন তিনি সকল বস্তু সকল ঘটনা এবং সকল ব্যক্তির প্রতি সমভাবাপন্ন হন।[১]

তবে যাহাই হউক এই যোগ লাভ করা সহজ নহে, বস্তুত অর্জুন পরে স্পষ্টতই এই ইঙ্গিত করিয়াছেন,[২] কারণ চঞ্চল মন যে-কোন সময়ে বাহ্য বিষয়ের আক্রমণে এই সকল উচ্চভাব হইতে স্খলিত হইতে পারে এবং শোক ও চিত্তবিক্ষোভ ও অসমতার দারুণ করলে পুনরায় পতিত হইতে পারে। মনে হয় এইজন্যই গীতা নিজের জ্ঞান ও কর্মের সাধারণ পদ্ধতি ছাড়াও রাজযোগের ধ্যানের এক বিশেষ পদ্ধতি দিতে অগ্রসর হইয়াছে, মন এবং ইহার সমুদয় ক্রিয়াকে সম্পূর্ণভাবে জয় করিতে এই পদ্ধতি খুবই শক্তিশালী। এই পদ্ধতিতে যোগীকে সদাসর্বদা আত্মার সহিত যোগ অভ্যাস করিতে বলা হইয়াছে যেন ইহাই তাঁহার সাধারণ চেতনা হইয়া পড়ে। তাঁহাকে নির্জন স্থানে একাকী উপবেশন করিতে হইবে, মন হইতে সমস্ত বাসনা ও বিপুল চিন্তা দূর করিতে হইবে। সমগ্র সত্তা ও চিত্তকে আত্ম-বশীভূত করিতে হইবে। "তিনি নির্মল স্থানে নিজের স্থির আসন পাতিবেন, উহা যেন অতি উচ্চ বা অতি নিম্ন না হয়, প্রথমে কুশাসন, তদুপরি মৃগচর্ম, তাহার উপর বস্ত্র আচ্ছাদন করিবেন, তদুপরি উপবেশনপূর্বক মনকে একাগ্র করিয়া এবং মানসিক চৈতন্য ও ইন্দ্রিয়গণের ক্রিয়াকে সংযত করিয়া আত্মশুদ্ধির জন্য যোগ অভ্যাস করিবেন।"[৩] রাজযোগের পদ্ধতি অনুসারে শরীরকে সোজা ও স্থিরভাবে রাখিতে হইবে, দৃষ্টিকে টানিয়া লইয়া ভ্রূমধ্যে স্থাপন করিতে হইবে, দিশশ্চানবলোকয়ন্। মনকে প্রশান্ত ও ভয়মুক্ত করিয়া রাখিতে হইবে এবং ব্রহ্মচর্য ব্রত পালন করিতে হইবে; সমগ্র চিত্তকে সংযত করিয়া ভগবানের দিকে ফিরাইতে হইবে, তাঁহাতে যুক্ত করিতে হইবে যেন চৈতন্যের নিম্নতন ক্রিয়া ঊর্ধ্বতন শান্তির মধ্যে নিমজ্জিত হইয়া যায়। কারণ এই সাধনার দ্বারা নির্বাণের শান্তিলাভই লক্ষ্য। "এইরূপে মন সংযমের দ্বারা যোগ অভ্যাস করিয়া যোগী নির্বাণের পরম শান্তি

[১] জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কূটস্থো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ॥৬।৮

[২] যোঽয়ং যোগস্ত্বয়া প্রোক্তঃ সাম্যেন মধুসূদন।
এতস্যাহং ন পশ্যামি চঞ্চলত্বাৎ স্থিতিং স্থিরাম্॥৬।৩৩

[৩] শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্মনঃ।
নাত্যুচ্ছ্রিতং নাতিনীচং চৈলাজিনকুশোত্তরম্॥৬।১১
তত্রৈকাগ্রং মনঃ কৃত্বা যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ।
উপবিশ্যাসনে যুঞ্জ্যাদ্ যোগমাত্মবিশুদ্ধয়ে॥৬।১২
সমং কায়শিরোগ্রীবং ধারয়ন্নচলং স্থিরঃ।
সংপ্রেক্ষ্য নাসিকাগ্রং স্বং দিশশ্চানবলোকয়ন্॥৬।১৩

লাভ করেন, আমার মধ্যেই সেই পরম শান্তির ভিত্তি, শান্তিং নির্ব্বাণপরমাং মৎসংস্থাম্।"[১]

নির্বাণের এই শান্তি তখনই লাভ করা যায় যখন সমগ্র মানস-চৈতন্য সম্পূর্ণভাবে সংযত হয় এবং বাসনা হইতে মুক্ত হয় এবং আত্মাতে স্থির হইয়া নিবিষ্ট থাকে, তখন বায়ুশূন্য স্থানে নিশ্চল দীপশিখার ন্যায় মন তাহার অস্থির ক্রিয়া হইতে বিরত হয়, তাহার বহির্মুখী গতি বন্ধ হয় এবং মনের এই নিশ্চল নীরবতায় অন্তরের মধ্যে আত্মাকে দেখিতে পাওয়া যায়, মন আত্মা সম্বন্ধে যে মিথ্যা ও আংশিক পরিচয় দেয় এবং অহংয়ের ভিতর দিয়া আত্মাকে যেমন দেখা যায় তেমন দেখা নহে, পরন্তু আত্মার আত্মোপলব্ধিতেই আত্মা প্রকাশিত হয়, স্বপ্রকাশ।[২] তখন জীব সন্তুষ্ট হয় এবং তাহার নিজস্ব প্রকৃত সত্তার সন্ধান পায় এবং নিরতিশয় আনন্দ অনুভব করে—এই আনন্দ ইন্দ্রিয় ও মনের প্রাপ্য অশান্ত সুখ নহে পরন্তু ইহা আভ্যন্তরীণ প্রশান্ত সুখ, ইহার মধ্যে সে মনের চাঞ্চল্য হইতে *সম্পূর্ণ নিরাপদ*, আর তাহার সত্তার অধ্যাত্ম সত্য হইতে স্খলিত হইবার কোনই আশঙ্কা থাকে না। মানসিক দুঃখের তীব্রতম আক্রমণও আর তাহাকে বিচলিত করিতে পারে না, কারণ আমাদের মানসিক দুঃখ আসে বাহির হইতে, তাহা বাহ্য বস্তুর স্পর্শেরই প্রতিক্রিয়া, আর আত্মার সুখ হইতেছে আভ্যন্তরীণ ও স্বপ্রতিষ্ঠ, বাহ্য বস্তুর স্পর্শে মনে যে অস্থির প্রতিক্রিয়াসকলের উদ্ভব হয়, যাঁহারা সেসবের বশ্যতা আর স্বীকার করেন না কেবল তাঁহারাই এই সুখের অধিকারী হইতে পারেন। ইহা হইতেছে দুঃখের সহিত সংযোগ দূর করিয়া দেওয়া, মনের সহিত

প্রশান্তাত্মা বিগতভীর্ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিতঃ।
মনঃ সংযম্য মচ্চিত্তো যুক্ত আসীত মৎপরঃ॥
যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী নিয়তমানসঃ।
শান্তিং নির্ব্বাণপরমাং মৎসংস্থামধিগচ্ছতি॥৬।১৪-১৫
যদা বিনিয়তং চিত্তমাত্মন্যেবাবতিষ্ঠতে।
নিস্পৃহঃ সর্ব্বকামেভ্যো যুক্ত ইত্যুচ্যতে তদা॥
যথা দীপো নিবাতস্থো নেঙ্গতে সোপমা স্মৃতা।
যোগিনো যতচিত্তস্য যুঞ্জতো যোগমাত্মনঃ॥
যত্রোপরমতে চিত্তং নিরুদ্ধং যোগসেবয়া।
যত্র চৈবাত্মনাত্মানং পশ্যন্নাত্মনি তুষ্যতি॥
সুখমাত্যন্তিকং যত্তদ্বুদ্ধিগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ম্।
বেত্তি যত্র ন চৈবায়ং স্থিতশ্চলতি তত্ত্বতঃ॥
যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে॥
তং বিদ্যাদ্দুঃখসংযোগবিয়োগং যোগসংজ্ঞিতম্।
স নিশ্চয়েন যোক্তব্যো যোগোঽনির্ব্বিণ্ণচেতসা॥৬।১৮-২৩

শোকের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়া দেওয়া, দুঃখসংযোগবিযোগম্। সুদৃঢ়ভাবে এই অবিচ্ছেদ্য আনন্দলাভই যোগ, ইহাই দিব্য মিলন; ইহা সকল লাভের পরম লাভ, এই সম্পদের কাছে আর সবই তুচ্ছ। অতএব এই যোগ দৃঢ় অধ্যবসায়ের সহিত অভ্যাস করিতে হইবে, অনির্ব্বিণ্ণচেতসা, যতদিন না মুক্তি লাভ করা যায়, যতদিন না নির্বাণের আনন্দ চিরদিনের জন্য আয়ত্ত করা যায় ততদিন দুষ্করতা বা অসাফল্যের দ্বারা এতটুকু নিরুৎসাহ হওয়া চলিবে না।

এখানে অনুভবাত্মক মনকে স্থির ও শান্ত করার উপরেই বেশী জোর দেওয়া হইয়াছে, এই মনের মধ্যেই চলে বাসনা ও ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া, ইন্দ্রিয়গণ বাহ্য বিষয়ের স্পর্শ গ্রহণ করে এবং আমাদের সাধারণ সুখ-দুঃখ আদি ভাবের প্রতিক্রিয়া দ্বারা তাহাতে সাড়া দেয়; কিন্তু স্বপ্রতিষ্ঠ সত্তার নিশ্চল নীরবতায় মানসিক চিন্তাকেও স্থির ও শান্ত করিতে হইবে।[১] প্রথমত, সঙ্কল্প হইতে উদ্ভূত সমস্ত বাসনাকে সম্পূর্ণভাবেই বর্জন করিতে হইবে, যেন কিছুমাত্র বাদ বা অবশিষ্ট না থাকে, এবং ইন্দ্রিয়গণকে মনের দ্বারা সংযত করিয়া ধরিতে হইবে যেন তাহারা তাহাদের বিশৃঙ্খল ও চঞ্চল অভ্যাসের বশে ইতস্তত ধাবমান হইতে না পারে, কিন্তু তাহার পর মনকেও বুদ্ধির দ্বারা ধরিয়া ভিতরের দিকে টানিয়া লইতে হইবে। দৃঢ়প্রতিষ্ঠ বুদ্ধির দ্বারা মনের ক্রিয়া বন্ধ করিতে হইবে এবং মনকে ঊর্ধ্বতন আত্মায় নিবিষ্ট করিয়া সাধক কোন কিছু চিন্তা করিবেন না। চঞ্চল ও অস্থির মন যখনই যে দিকে ছুটিবে তখনই সেই দিক হইতে তাহাকে ফিরাইয়া আত্মার বশে আনিতে হইবে। মন যখন সম্পূর্ণভাবে শান্ত হইবে, তখনই যোগী ব্রহ্মভূত আত্মার উচ্চতম, নিষ্কলঙ্ক, বিক্ষোভহীন সুখলাভ করিবেন। "এইভাবে রিপুবিক্ষোভের গ্লানি হইতে মুক্ত হইয়া এবং সর্বদা নিজেকে যোগযুক্ত রাখিয়া যোগী সহজে এবং সুখে অনন্ত আনন্দময় ব্রহ্মস্পর্শ উপভোগ করেন।"[২]

অথচ ইহার ফলে জীবিতাবস্থাতে এমন নির্বাণ হয় না যাহাতে সংসারের সমস্ত কাজ, সাংসারিক জীবের সহিত সকলপ্রকার সম্বন্ধ সম্পূর্ণভাবে অসম্ভব হয়, প্রথমে মনে হইতে পারে যে এইরূপ ফলই হইবে। যখন সমস্ত বাসনা

[১] সঙ্কল্পপ্রভবান্ কামাংস্ত্যক্ত্বা সর্ব্বানশেষতঃ।
মনসৈবেন্দ্রিয়গ্রামং বিনিয়ম্য সমন্ততঃ॥
শনৈঃ শনৈরুপরমেদ্বুদ্ধ্যা ধৃতিগৃহীতয়া।
আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ॥
যতো যতো নিশ্চরতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্।
ততস্ততো নিয়ম্যৈতদাত্মন্যেব বশং নয়েৎ॥
প্রশান্তমনসং হ্যেনং যোগিনং সুখমুত্তমম্।
উপৈতি শান্তরজসং ব্রহ্মভূতমকল্মষম্॥৬।২৪-২৭

[২] যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী বিগতকল্মষঃ।
সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তং সুখমশ্নুতে॥৬।২৮

বিপুবিক্ষোভ বন্ধ হইয়া গিয়াছে, যখন মন আর নিজেকে চিন্তার মধ্যে ছাড়িয়া দিতে পারে না, যখন নীরব নির্জন যোগ অভ্যাস হইয়া পড়িয়াছে, তখন আর কি কাজ থাকিতে পারে, বাহ্যস্পর্শময় অনিত্য সংসারের সহিত আর কি সম্বন্ধ থাকিতে পারে? অবশ্য যোগী আরও কিছুকাল শরীর ধারণ করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু তখন তাঁহার পক্ষে পর্বতগুহা, অরণ্য বা শৈলশিখরই যোগ্যতম স্থান বলিয়া মনে হয়, কেবল এইরূপ পারিপার্শ্বিকের মধ্যেই তিনি বাস করিতে পারেন এবং নিরন্তর সমাধিতে মগ্ন থাকাই তাঁহার একমাত্র আনন্দ ও কাজ হইতে পারে। কিন্তু প্রথমত যখন এই নির্জন যোগ অভ্যাস করা হয় তখন অন্য সমস্ত কর্ম পরিত্যাগ করিতে গীতা উপদেশ দেয় নাই। গীতা বলিয়াছে, যাহারা নিদ্রা ও আহার ও খেলা ও কর্ম পরিত্যাগ করিয়াছে তাহাদের এ যোগ হয় না, আবার যাহারা দেহ ও মনের এই সকল ব্যাপারে অত্যধিক মগ্ন তাহাদেরও এ যোগ হয় না; পরন্তু নিদ্রা ও জাগরণ, আহার, বিহার, কর্ম প্রচেষ্টা সবই "যুক্ত" হওয়া আবশ্যক।[১] ইহার সাধারণত এই অর্থ করা যায় যে, সমস্তই পরিমিত, নিয়ন্ত্রিত, যথাযথ মাত্রায় অনুষ্ঠিত হওয়া কর্তব্য এবং বস্তুত ইহাই প্রকৃত অর্থ হইতে পারে। কিন্তু অন্তত যখন যোগ লব্ধ হইয়াছে তখন এই সমস্ত ব্যাপারকেই আর এক অর্থে "যুক্ত" হইতে হইবে, এবং সেই অর্থেই এই কথাটি গীতার অন্য সকল স্থানে ব্যবহৃত হইয়াছে। সকল অবস্থাতে, জাগরণে ও নিদ্রায়, আহারে ও বিহারে ও কর্মে তখন যোগী ভগবানের সহিত যুক্ত থাকিবেন এবং যোগী সমস্ত করিবেন এই জ্ঞানে যে, ভগবানই আত্মা, ভগবানই সব এবং তাঁহার নিজের জীবন, নিজের কর্ম ভগবানের মধ্যেই রহিয়াছে, ভগবানই ধরিয়া রহিয়াছেন। বাসনা, অহং, ব্যক্তিগত সঙ্কল্প, মনের চিন্তা এই সব আমাদের কর্মের প্রবোচক হয় কেবল আমাদের নিম্নতন প্রকৃতিতে, যখন অহং বিনষ্ট হয় এবং যোগী ব্রহ্ম হন, যখন তিনি এক সমুচ্চ ও বিশ্বময় চৈতন্যের মধ্যে বাস করেন, এমনকি তাহাই হন, তখন স্বতঃস্ফূর্তভাবে কর্ম আসে সেখান হইতে, মানসিক চিন্তা অপেক্ষা উচ্চতর জ্যোতির্ময় জ্ঞান আসে সেখান হইতে, ব্যক্তিগত ইচ্ছাশক্তি অপেক্ষা মহত্তর অন্য এক শক্তি সেখান হইতে আসিয়া যোগীর কর্ম সম্পন্ন করিয়া দেয় এবং তাহার ফল আনিয়া দেয়; তখন ব্যক্তিগত কর্ম বন্ধ হইয়া গিয়াছে, সমস্তই ব্রহ্মে সংন্যস্ত হইয়াছে, ভগবান কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে, ময়ি সংন্যস্য কর্ম্মাণি।

ভেদাত্মক মানসিক অহংকে চিন্তা ও অনুভূতি ও কর্ম সম্বন্ধে তাহার প্রেরণা সকলকে ব্রহ্মচৈতন্যে নির্বাণ করিয়া যে আত্মোপলব্ধি লাভ করা যায় তাহার স্বরূপ

[১] নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি ন চৈকান্তমনশ্নতঃ।
ন চাতিস্বপ্নশীলস্য জাগ্রতো নৈব চার্জ্জুন॥
যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা॥৬।১৬-১৭

এবং যোগের[১] ফল বর্ণনা করিবার সময় গীতা বলিয়াছে যে, বিশ্বজ্ঞান (cosmic sense) এই ব্রহ্ম চৈতন্যের অন্তর্ভুক্ত, যদিও তাহা এক নবতর দৃষ্টিতে উন্নীত হয়। "যে মানবের আত্মা যোগযুক্ত, যিনি সর্বভূতের মধ্যে আত্মাকে দেখেন এবং আত্মার মধ্যে সর্বভূতকে দেখেন, তিনি সকল জিনিসকেই সমদৃষ্টিতে দেখেন।"[২] তিনি যাহা কিছু দেখেন তাঁহার নিকট সবই আত্মা, সব তাঁহারই আত্মা, সবই ভগবান। কিন্তু তিনি যদি ক্ষরের পরিবর্তনশীলতার মধ্যে আদৌ বাস করেন তাহা হইলে কি আশঙ্কা নাই যে, এই কঠিন যোগসাধনার সমস্ত ফল তিনি হারাইয়া ফেলিবেন, আত্মাকে হারাইয়া পুনরায় মনের মধ্যে পতিত হইবেন। ভগবান তাঁহাকে হারাইবেন এবং সংসার তাঁহাকে পাইয়া বসিবে, তিনি ভগবানকে হারাইয়া তাঁহার স্থানে পুনরায় অহংকে এবং নিম্নতন প্রকৃতিকে পাইবেন? গীতা বলিয়াছে, না, এরূপ কোন আশঙ্কা নাই—"যে ব্যক্তি সর্বত্র আমাকে দর্শন করেন এবং আমার মধ্যে সবকিছুই দেখেন, আমি তাঁহাকে হারাই না তিনিও আমাকে হারান না।"[৩] কারণ যদিও এই নির্বাণের শান্তি অক্ষরের ভিতর দিয়াই লাভ করিতে হয় তথাপি ইহা পুরুষোত্তমের সত্তার উপরেই প্রতিষ্ঠিত, মৎসংস্থাম্, আর এই সত্তা, ভগবান, ব্রহ্ম, জগতের মধ্যেও পরিব্যাপ্ত এবং যদিও তাহা জগতের অতীত তথাপি সেই অতীত অবস্থাতেই সীমাবদ্ধ নহে। আমাদিগকে দেখিতে হইবে যে, সকল বস্তুই তিনি (ভগবান, পুরুষোত্তম), বাসুদেবঃ সর্বম্, সম্পূর্ণভাবে এই দিব্যদৃষ্টিতেই বাস করিতে হইবে, কাজ করিতে হইবে, এইটিই হইতেছে যোগের পূর্ণতম সিদ্ধি।

কিন্তু কর্ম করা কেন? নির্জনে নিজের আসন পাতিয়া বসিয়া থাকিবে, ইচ্ছা হয় সেখান হইতে সংসারের দিকে চাহিয়া দেখিবে, সংসারকে ব্রহ্মের মধ্যে, ভগবানের মধ্যে দেখিবে, কিন্তু তাহাতে কোনরূপ যোগদান করিবে না, সেখানে বিচরণ করিবে না, বাস করিবে না, কর্ম করিবে না, কেবল সাধারণত আভ্যন্তরীণ সমাধির মধ্যেই বাস করিবে—এইটিই কি অধিকতর নিরাপদ নহে? এইটিই কি এই উচ্চতম অধ্যাত্ম অবস্থার নিয়ম নহে, বিধি নহে, ধর্ম নহে? আবার বলি, না, মুক্ত যোগীর পক্ষে আর কোনও নিয়ম নাই, বিধি নাই, ধর্ম নাই, শুধু ইহাই যে, তিনি ভগবানের মধ্যে বাস করিবেন, ভগবানকে ভালবাসিবেন এবং সর্বভূতের সহিত এক হইবেন; তাঁহার মুক্তি চূড়ান্ত, তাহা সাপেক্ষ মুক্তি নহে, তাহা স্বপ্রতিষ্ঠ, আর কোন কর্তব্যের বিধি, জীবনের ধর্ম বা কোনরূপ গণ্ডির উপর তাহা নির্ভর করে না। আর কোন যোগপ্রণালীতে তাঁহার প্রয়োজন নাই, কারণ তিনি এখন সর্বদাই

[১] যোগক্ষেমং বহাম্যহম্।

[২] সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ॥৬।২৯

[৩] যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি॥৬।৩০

যোগযুক্ত, নিত্যযুক্ত। "যে যোগী একত্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন এবং সর্বভূতের মধ্যে আমাকে ভালবাসেন, তিনি যেখানেই থাকুন আর যাহাই করুন, তিনি আমার মধ্যেই বাস করেন, কর্ম করেন।"[১] তখন সংসারের প্রতি ভালবাসা অধ্যাত্মভাবে অনুপ্রাণিত হয়, ইন্দ্রিয় অনুভূতি হইতে তাহা আত্ম-অনুভূতিতে পরিণত হয়, ভগবৎপ্রেমের উপর তাহা প্রতিষ্ঠিত হয়, আর সেই প্রেমে কোন বিপদ নাই, কোন দোষ নাই। নীচের প্রকৃতিকে ছাড়াইয়া উঠিতে হইলে সংসারের প্রতি বিতৃষ্ণা ও ভয় অনেক সময় দরকার হইতে পারে, কারণ বস্তুত ইহা হইতেছে সংসারের মধ্যে প্রতিফলিত আমাদের অহং-এরই প্রতি বিতৃষ্ণা ও ভয়। কিন্তু ভগবানকে সংসারের মধ্যে দেখিতে পাইলে আর কিছুকেই ভয় হয় না, তখন সকলকেই ভগবানের সত্তার মধ্যে আলিঙ্গন করা যায়, সকলকে ভগবান বলিয়া দেখিলে আর কোন কিছুর প্রতি দ্বেষ বা ঘৃণা থাকে না, তখন সংসারের মধ্যে ভগবানকে এবং ভগবানের মধ্যে সংসারকে ভালবাসা যায়।

কিন্তু অন্ততপক্ষে নীচের প্রকৃতির জিনিসগুলিকে তো বর্জন করিতে হইবে, ভয় করিতে হইবে? এই সকলকে ছাড়াইয়া উঠিবার জন্য যোগীকে যে কত কষ্ট পাইতে হইয়াছে! না, তাহাও নহে, আত্ম-দর্শনের সমতায় সমস্তকেই আলিঙ্গন করা হয়। "হে অর্জুন, যে ব্যক্তি আত্মার উপমায় সকল জিনিসকেই সমানভাবে দেখেন, তাহা সুখই হউক আর দুঃখই হউক তাঁহাকে আমি শ্রেষ্ঠ যোগী মনে করি।"[২] আর ইহার দ্বারা মোটেই বুঝায় না যে, তিনি নিজে দুঃখলেশশূন্য অধ্যাত্ম আনন্দ হইতে চ্যুত হইবেন এবং পরের দুঃখের মধ্য দিয়াই পুনরায় সংসারের দুঃখ ভোগ করিবেন, পরন্তু তিনি যে সকল দ্বন্দ্ব বর্জন করিয়াছেন, জয় করিয়াছেন, সেই সকল দ্বন্দ্বের খেলা অপরের মধ্যে চলিতে দেখিয়া তখনও তিনি সকলকে নিজের মত দেখিবেন, সকলের মধ্যে নিজের আত্মাকে দেখিবেন, সকলের মধ্যে ভগবানকে দেখিবেন এবং সেই সকল জিনিসের বাহ্য দৃশ্যে বিচলিত বা বিভ্রান্ত না হইয়া তাহাদের প্রেরণায় সাহায্য করিতে, নিরাময় করিতে সর্বভূতের কল্যাণ সাধনে নিজেকে নিয়োজিত করিতে, মানবসকলকে অধ্যাত্ম আনন্দের দিকে লইয়া যাইতে, ভগবদ্ অভিমুখে সংসারের প্রগতির জন্য কর্ম করিতে অগ্রসর হইবেন, এই সংসারে যতদিন তাঁহাকে জীবনধারণ করিতে হয় এইভাবেই তিনি দিব্য জীবন যাপন করিবেন। যে ভগবদ্ভক্ত ইহা করিতে পারেন, এইভাবে সকল জিনিসকেই ভগবানের মধ্যে আলিঙ্গন করিতে পারেন, শান্ত দৃষ্টিতে নীচের প্রকৃতিকে, ত্রিগুণাত্মিকা মায়ার খেলাকে অবলোকন করিতে পারেন, গুণসকলের মধ্যে এবং তাহাদের উপরে ক্রিয়া করিতে পারেন অথচ অধ্যাত্ম একত্বের উচ্চভূমি

[১] সর্ব্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ।
সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ত্ততে॥৬।৩১

[২] আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জ্জুন।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ॥৬।৩২

ও শক্তি হইতে বিচ্যুত বা বিচলিত হন না, যিনি ভগবৎ-দর্শনের উদারতায় মুক্ত ও স্বাধীন, ভাগবত-প্রকৃতির শক্তিতে মধুর, মহান ও জ্যোতির্ময়, তাঁহাকেই শ্রেষ্ঠতম যোগী বলা যাইতে পারে। এইরূপ ব্যক্তিই প্রকৃতপক্ষে সংসারকে জয় করিয়াছেন, জিতঃ সর্গঃ।

গীতা সর্বত্র যেমন তেমনি এখানেও ভক্তিকেই যোগের পরাকাষ্ঠা বলিয়াছে, সর্ব্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ, ইহাকে সমগ্র গীতা শিক্ষার শেষ ও সার কথা বলা যাইতে পারে—যে ব্যক্তি সর্বভূতে ভগবানকে ভালবাসেন এবং যাঁহার আত্মা ভাগবত একত্বে প্রতিষ্ঠিত, তিনি যেখানেই থাকুন এবং যাহাই করুন তিনি ভগবানের মধ্যেই বাস করেন, কর্ম করেন। এই কথাটা আরও জোরের সহিত বলিবার জন্য দিব্য গুরু মাঝে অর্জুনের একটা প্রশ্নের (মানুষের চঞ্চল মনের পক্ষে এরূপ কঠিন যোগ আদৌ কেমন করিয়া সম্ভব হইতে পারে এই সংশয়ের) জবাব দিয়া পুনরায় এই কথাতেই ফিরিয়া আসিলেন এবং এইটিই হইল তাঁহার চূড়ান্ত উক্তি। "যোগী তপস্বিগণ অপেক্ষা বড়, জ্ঞানিগণ অপেক্ষা বড়, কর্মিগণ অপেক্ষাও বড়; অতএব হে অর্জুন, তুমি যোগী হও।"[১] যোগী কর্ম ও জ্ঞান ও তপস্যা বা অন্য যেকোন উপায়ে কেবল আধ্যাত্মিক জ্ঞানের জন্যই জ্ঞান চান না, আধ্যাত্মিক শক্তির জন্যই শক্তি চান না, অন্য কোন কিছুই চান না, কেবল ভগবানের সহিত যোগ আকাঙ্ক্ষা করেন, লাভ করেন, কারণ উহার মধ্যেই আর সবকিছু রহিয়াছে, নিজেদের ঊর্ধ্বে উন্নীত হইয়া দিব্যতম সার্থকতা লাভ করিতেছে। কিন্তু আবার যোগীদের মধ্যেও যিনি ভক্ত তিনিই শ্রেষ্ঠতম। "যোগিগণের মধ্যে যে ব্যক্তি তাঁহার সমগ্র অন্তরাত্মা আমাতে সমর্পণ করিয়া আমাকে শ্রদ্ধার সহিত ভজনা করেন, আমার মতে তিনিই আমার সহিত যোগে সর্বাপেক্ষা অধিক যুক্ত।"[২] এইটিই গীতার প্রথম ছয় অধ্যায়ের শেষ কথা এবং ইহার মধ্যেই গীতার অবশিষ্ট অংশের বীজ নিহিত রহিয়াছে, যাহা এখনও বলা হয় নাই এবং যাহা কোথাও পূর্ণভাবে বলা হয় নাই তাহার বীজ এইখানেই রহিয়াছে, কারণ তাহা সকল সময়েই কতকটা গূঢ় রহস্যের মতই রহিয়া গিয়াছে, তাহাই শ্রেষ্ঠতম অধ্যাত্ম তত্ত্ব এবং দিব্য রহস্য।

[১] তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ।
কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্ যোগী ভবার্জ্জুন॥৬।৪৬

[২] যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ॥৬।৪৭

চতুর্বিংশ অধ্যায়

কর্মযোগের সারতত্ত্ব

গীতার প্রথম ছয় অধ্যায়কে গীতাশিক্ষার একরকম স্থূল কাঠামো বলা যাইতে পারে; এখানে প্রধান প্রধান তত্ত্বগুলি মোটামুটি দেখান হইয়াছে, এবং গীতায় বাকী দ্বাদশটি অধ্যায়ে যেসকল বিষয় বিশদভাবে পরিস্ফুট করা হইবে সেগুলি এখানে অসম্পূর্ণভাবে, ইঙ্গিতমাত্র হইয়া রহিয়াছে, অথচ এই বিষয়গুলির নিজস্ব গুরুত্ব খুবই বেশী, সেইজন্যই অবশিষ্ট দুইটি ভাগে সেইগুলিকে বিশদতরভাবে আলোচনা করিবার জন্য রাখা হইয়াছে। গীতা যদি একটি লিখিত মহান শাস্ত্রগ্রন্থ না হইত এবং সেইজন্য ইহার শিক্ষা শেষ করিতেই না হইত, এই শিক্ষা যদি কোন জীবিত গুরু তাঁহার শিষ্যকে দিতেন এবং শিষ্য যেমন গ্রহণ করিতে সক্ষম হয় সেই অনুসারে যথাসময়ে অন্যান্য সত্য বিবৃত করিতেন, তাহা হইলে গুরু ষষ্ঠ অধ্যায়ের শেষেই থামিয়া বলিতে পারিতেন—"প্রথমে এইটুকুই সাধনা কর, তোমার করিবার মত যথেষ্ট জিনিস ইহার মধ্যে রহিয়াছে, এখানেই তুমি যতদূর সম্ভব প্রশস্ততম ভিত্তি পাইবে; সমস্যা ও সংশয়সকল যেমন উঠিবে, আপনা হইতেই সেসকলের সমাধান হইয়া যাইবে অথবা আমিই তোমার জন্য সে সকলের সমাধান করিয়া দিব। উপস্থিত আমি যাহা বলিয়াছি তাহাই তোমার জীবনে সিদ্ধ করিয়া তোল; ভিতরে এই ভাব রাখিয়া কর্ম কর।" সত্য বটে, এখানে এমন অনেক জিনিসই আছে, পরবর্তী অংশে যাহা বলা হইবে, তাহার আলোকে সেগুলিকে না দেখিলে সেগুলির ঠিক অর্থ বুঝা সম্ভব নহে। উপস্থিত সমস্যার মীমাংসার জন্য এবং ভুল বুঝিবার সম্ভাবনা নিরসনের জন্য আমাকেও পরের অনেক কথা এখনই বলিতে হইয়াছে, যেমন পুরুষোত্তমের তত্ত্ব, কারণ এই তত্ত্বের অবতারণা না করিলে আত্মা, কর্ম এবং কর্মের অধীশ্বর সম্বন্ধে কতকগুলি সংশয়ের মীমাংসা করা যাইত না; মানব শিষ্যের মন এখনও ধারণা করিতে পারিবে না এমন মহান তত্ত্বসকলের অবতারণা করিলে পাছে তাহার প্রথম সাধনার পথে দৃঢ় নিষ্ঠা বিচলিত হয়, সেইজন্য গীতা ইচ্ছা করিয়াই এই সংশয়গুলি সমাধান করিবার কোন চেষ্টা এখানে করে নাই।

গুরু এইখানেই শিক্ষা স্থগিত রাখিলে অর্জুনও আপত্তি তুলিয়া বলিতে পারিতেন—"আপনি বাসনা ও আসক্তির বিনাশ সম্বন্ধে, সমতা সম্বন্ধে, ইন্দ্রিয়গণকে জয় করা এবং মনকে নিশ্চল করা সম্বন্ধে, কামক্রোধাদি হইতে মুক্ত এবং নৈর্ব্যক্তিক কর্ম সম্বন্ধে, যজ্ঞার্থে কর্ম সম্বন্ধে, বাহ্যিক ত্যাগ অপেক্ষা আভ্যন্তরীণ ত্যাগের বাঞ্ছনীয়তা সম্বন্ধে অনেক কথাই বলিয়াছেন এবং এইগুলি

কার্যত সাধন করা আমার নিকট যত কঠিন বলিযাই বোধ হউক, এইগুলি আমি বুদ্ধির দ্বারা বুঝিতে পারিয়াছি। কিন্তু আবাব আপনি কর্মেব মধ্যে থাকিবার সমযেই গুণসকলের ঊর্ধ্বে উঠিবার কথা বলিযাছেন, কিন্তু এই সকল গুণ কিভাবে কাজ করে তাহা আপনি আমাকে বলেন নাই, আর যতক্ষণ না আমি তাহা জানিতেছি ততক্ষণ আমাব পক্ষে তাহাদিগকে লক্ষ্য করা এবং তাহাদেব ঊর্ধ্বে উঠা কঠিন হইবে। তাহা ছাড়া আপনি ভক্তিকেই যোগের শ্রেষ্ঠতম অঙ্গ বলিযাছেন, অথচ আপনি কর্ম ও জ্ঞান সম্বন্ধে অনেক কথাই বলিয়াছেন কিন্তু ভক্তি সম্বন্ধে একবকম কিছুই বলেন নাই; আব কাহাকেই বা এই ভক্তি, এই শ্রেষ্ঠতম জিনিস অর্পণ করিতে হইবে? নিশ্চল নীরব নির্গুণ ব্রহ্মকে নিশ্চযই নহে, ভক্তি কবিতে হইবে আপনাকে, ঈশ্বরকে। তাহা হইলে আমাকে বলুন, আপনি কি? জ্ঞান যেমন কর্ম অপেক্ষা বড তেমনই অক্ষর ব্রহ্ম ক্ষর প্রকৃতি অপেক্ষা বড়—বলুন আপনাব স্বরূপ কি? এই তিনটি জিনিসেব মধ্যে সম্বন্ধ কি? কর্ম, জ্ঞান, ভগবদ্ভক্তি ইহাদেব মধ্যে সম্বন্ধ কি? প্রকৃতি-স্থ পুরুষ, অক্ষব পুরুষ এবং যিনি একই সঙ্গে সকলেব অক্ষর আত্মা এবং জ্ঞান ও ভক্তি ও কর্মের অধীশ্বর, যে পবম ভগবান এই মহাযুদ্ধ ও ধ্বংসকাণ্ডে এখানে আমাব সঙ্গে বহিয়াছেন, যিনি এই ঘোর ভীষণ কর্মে আমাব রথে সারথিরূপে বিদ্যমান, ইহাদেব মধ্যে সম্বন্ধ কি?" এই সকল প্রশ্নেব উত্তব দিতেই গীতাব বাকী অংশ লিখিত হইযাছে, বাস্তবিক, বুদ্ধির পক্ষে একটা সম্পূর্ণ সন্তোষজনক মীমাংসা দিতে হইলে এই সকল প্রশ্ন ফেলিযা বাখা চলে না, ইহাদেব আলোচনা ও সমাধান এখনই করিতে হয। কিন্তু বাস্তব সাধনায স্তবেব পব স্তর অতিক্রম করিয়া ক্রমশ অগ্রসর হইতে হয, অনেক জিনিস, বস্তুত উচ্চতম জিনিসগুলি বাকী থাকে, আমরা অধ্যাত্ম উপলব্ধিতে অগ্রসব হইলে তাহারই আলোকে ঐ সকল জিনিস পবে উঠে এবং আপনা-আপনি পূর্ণভাবে মীমাংসিত হইয়া যায়। গীতা কতকটা এই উপলব্ধির রেখাই অনুসবণ কবিযাছে এবং প্রথমে কর্ম ও জ্ঞানের একটা প্রশস্ত আদ্য ভিত্তি স্থাপন করিয়াছে, ইহাব মধ্যে এমন একটা জিনিস রহিযাছে যাহা হইতে ভক্তি ও মহত্তব জ্ঞানে পৌঁছান যাইতে পাবে কিন্তু সেখানে এখনও সম্পূর্ণভাবে পৌঁছান যায নাই। গীতাব প্রথম ছয অধ্যায়ে আমরা এই ভিত্তিটি পাই।

তাহা হইলে যে সমস্যা লইয়া গীতাব আবম্ভ তাহার সমাধান এই ছয় অধ্যাযে কতদূর অগ্রসর হইয়াছে আমরা এইখানে থামিয়া তাহা আলোচনা কবিতে পাবি। এইখানে আবার বলা যাইতে পারে যে, কেবল ঐ সমস্যাটিরই সমাধানেব জন্য জগতের স্বরূপ সম্বন্ধে এবং সাধাবণ জীবনেব পবিবর্তে অধ্যাত্মজীবন লাভ সম্বন্ধে সমগ্র প্রশ্নটি না তুলিলেও চলিতে পাবিত। ব্যবহারিক দিক হইতে, অথবা নীতিশাস্ত্রের ভিত্তিতে অথবা মানসিক যুক্তি কিংবা আদর্শেব দিক হইতে অথবা এই সমস্ত দিক বিবেচনা করিয়াই একটা মীমাংসা কবা চলিত; বস্তুত ঐরূপ সমাধানই আমাদেব আধুনিক পদ্ধতির অনুযায়ী হইত। শুধু এই সমস্যাটিকে

ধবিলে প্রথমত কেবল এই প্রশ্নটি উঠে, হত্যাকাণ্ডেব ব্যক্তিগত পাপ সম্বন্ধে যে নৈতিক বিবাগ, অর্জুন কি তাহাব দ্বাবাই পবিচালিত হইবে, না, দেশেব প্রতি, সমাজেব প্রতি কর্তব্য সম্বন্ধে যে বোধ সমানভাবেই নৈতিক, ন্যায ও ধর্মকে বক্ষা কবা, অন্যায অত্যাচাবেব সশস্ত্র শক্তিব বিরুদ্ধাচাবণ কবিতে সকল মহানুভব ব্যক্তিবই বিবেক যে দাবি কবে তাহার অনুসরণ কবা—এই আদর্শের দ্বারা পবিচালিত হইবে? আমাদেব যুগে, বর্তমান মুহূর্তেই এই প্রশ্ন উঠিয়াছে, নানাভাবে নানাদিক দিযা এই প্রশ্নের সমাধান কবা যায এবং বস্তুতপক্ষে আমবা করিতেছি, কিন্তু এ সমস্ত সমাধানই হইতেছে আমাদেব সাধারণ জীবনেব দিক হইতে, আমাদেব সাধাবণ মানবীয মনেব দিক হইতে। আমাদেব ব্যক্তিগত বিবেকের নির্দেশ পালন কবা উচিত, না, সমাজেব প্রতি, রাষ্ট্রেব প্রতি আমাদেব যে কর্তব্য বহিযাছে তাহাবই অনুসবণ কবা উচিত, একটা আদর্শ নীতির অনুসবণ করা উচিত, না, কার্যক্ষেত্রে যাহা উপযোগী এমন ব্যবহাবিক নীতিরই অনুসরণ কবা উচিত, আত্মাব শক্তিব ("Soul-force") উপব নির্ভর করা উচিত, না, জীবন এখনও অন্তত সমগ্রভাবে আত্মা হইয়া উঠে নাই এবং ন্যাযেব জন্য, সত্যেব জন্য যুদ্ধে অস্ত্রধাবণ কবা কখনও কখনও অবশ্যম্ভাবী হইযা পড়ে, এই কঠোর সত্যকে স্বীকাব কবা উচিত? এইসব প্রশ্ন তুলিযাই সমস্যাটিব সমাধান কবা যাইতে পারে কিন্তু সেসব সমাধান হইবে মানসিক যুক্তি, প্রকৃতি, হৃদয়বৃত্তিব দিক দিযা; এসব সমাধান নির্ভব কবে ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গীব উপবে, আমাদেব সম্মুখে যে সমস্যা উপস্থিত হয তাহাব যে সমাধান আমাদেব পক্ষে উপযোগী বড় জোব তাহাই হইতে পাবে, আমাদেব পক্ষে উপযোগী অর্থাৎ আমাদেব প্রকৃতির, আমাদের নৈতিক ও বুদ্ধিগত বিকাশেব যে স্তবে আমবা বহিয়াছি তাহাবই উপযোগী হইতে পাবে, আমাদের যতটুকু জ্ঞান তাহাবই আলোকে আমরা আমাদেব সাধ্যমত যতটুকু দেখিতে পাবি, কবিতে পারি এই সমাধান হয় তাহাবই অনুযাযী; এইভাবে কোনরূপ চবম মীমাংসায উপনীত হওযা যায না। কাবণ এই মীমাংসা আমাদেব মন হইতে আসে, এই মনেব মধ্যে বহিযাছে আমাদেব সত্তাব নানা বিচিত্র প্রবৃত্তির জটিলতা, আমাদেব বিচাববুদ্ধি, নৈতিকবোধ, আমাদেব কর্মপ্রেবণা; আমাদের প্রাণেব সহজাত প্রবৃত্তি, আমাদেব হৃদযবৃত্তি এবং আমাদের মধ্যে যেসব দুর্লভ জিনিসকে আমবা আত্মাব সহজাত প্রবৃত্তি বা চৈত্য প্রেবণা (psychical preferences) বলিযা অভিহিত কবিতে পাবি—এইসবেব মধ্যে মন একটিকেই বাছিযা লয অথবা, ইহাদেব মধ্যে যাহা হউক একটা সামঞ্জস্য করিয়া লয়। গীতা দেখিযাছে যে, এইদিক দিযা কোন চবম মীমাংসা হইতে পারে না, কেবল একটা সাময়িক কাজচলা মীমাংসা হইতে পাবে মাত্র, অর্জুনকে প্রথমে তৎকাল-প্রচলিত শ্রেষ্ঠ আদর্শ অনুসাবে এইরূপই একটা কাজচলা মীমাংসা দেওয়া হইযাছিল, কিন্তু এইরূপ মীমাংসা গ্রহণ কবিবাব মত মতিগতি অর্জুনের ছিল না, বাস্তবিক অর্জুন ইহাতে সন্তুষ্ট হউক এরূপ ইচ্ছা যে দিব্যগুরুরও ছিল না তাহা খুবই স্পষ্ট। তখন

গুরু এক সম্পূর্ণ বিভিন্ন দিক হইতে, এক সম্পূর্ণ বিভিন্ন উত্তর দিতে অগ্রসর হইলেন।

গীতার মীমাংসা হইতেছে, আমাদের সাধারণ সত্তা ও সাধারণ মনের ঊর্ধ্বে, আমাদের যৌক্তিক ও নৈতিক সংশয়সমূহের ঊর্ধ্বে অন্য এক চৈতন্যের মধ্যে উঠিতে হইবে, সেখানে সত্তার ধর্ম আলাদা এবং সেইজন্য আমাদের কর্মের আদর্শও আলাদা; সেখানে ব্যক্তিগত বাসনা এবং ব্যক্তিগত ভাবাবেগ আর কর্মকে নিয়ন্ত্রিত করে না, সেখানে দ্বন্দ্বসকলের অবসান হয়, সেখানে কর্ম আর আমাদের নিজেদের থাকে না, অতএব সেখানে ব্যক্তিগত পুণ্য বা ব্যক্তিগত পাপবোধের ঊর্ধ্বে উঠা যায়; সেখানে বিশ্বগত, নৈর্ব্যক্তিক ভাবগত সত্তা আমাদের ভিতর দিয়া জগতে তাহার উদ্দেশ্য সম্পাদন করে, সেখানে আমরা নিজেরা এক নূতন ও দিব্য জন্মের দ্বারা সেই সত্তার সত্তায়, সেই চৈতন্যের চৈতন্যে, সেই শক্তির শক্তিতে, সেই আনন্দের আনন্দে পরিণত হই এবং তখন আমরা আর নিম্নতন প্রকৃতিতে বাস করি না বলিয়া আমাদের নিজেদের কোন কর্ম করিবার থাকে না, নিজেদের কোন ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য অনুসরণ করিবার থাকে না, পরন্তু যদি আমরা আদৌ কর্ম করি (কেবল এই একটিমাত্র প্রকৃত সমস্যা ও প্রশ্ন বাকী থাকে), তাহা হইলে আমরা কেবল ভাগবত কর্ম করি, আমাদের বাহ্য প্রকৃতি সে কর্মের কারণ হয় না, সেখান হইতে তাহার প্রেরণা আসে না, পরন্তু বাহ্য প্রকৃতি হয় সে কর্মের কেবল শান্ত অবাধ যন্ত্র কারণ প্রেরণা শক্তি আসে আমাদের ঊর্ধ্বে আমাদের কর্মের অধীশ্বরেরই ইচ্ছা হইতে। আর এইটিকেই যথার্থ মীমাংসা বলিয়া আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করা হইয়াছে, কারণ ইহা আমাদের সত্তার প্রকৃত সত্যের অনুযায়ী, আর আমাদের সত্তার প্রকৃত সত্য অনুসারে জীবনযাপন করাই যে শ্রেষ্ঠ মীমাংসা, আমাদের জীবনের সমস্যাসকলের একমাত্র সম্পূর্ণভাবে সত্য মীমাংসা তাহাতে সন্দেহ নাই। আমাদের মানসিক ও প্রাণিক চরিত্র হইতেছে আমাদের প্রাকৃত জীবনের সত্য, কিন্তু তাহা অজ্ঞানের সত্য, আর যাহা কিছু ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট সেসবই এই স্তরের সত্য, অজ্ঞানের মধ্যে কাজ করিবার জন্য তাহারা কার্যত উপযোগী, কিন্তু যখন আমরা আমাদের সত্তার প্রকৃত সত্যে ফিরিয়া যাই তখন আর তাহাদের কোন উপযোগিতা থাকে না। কিন্তু এইটিই যে সত্য সে সম্বন্ধে আমরা কেমন করিয়া নিঃসন্দেহ হইব? যতক্ষণ আমরা আমাদের সাধারণ মানসিক উপলব্ধি লইয়াই সন্তুষ্ট ততক্ষণ আমরা এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইতে পারিব না, কারণ আমাদের সাধারণ মানসিক উপলব্ধি হইতেছে সম্পূর্ণভাবেই এই অজ্ঞানময়ী নিম্নতন প্রকৃতির উপলব্ধি। আমরা এই মহত্তর সত্যকে জানিতে পারি কেবল যখন উহা আমাদের জীবনের মধ্যে সত্য হইয়া উঠে, অর্থাৎ যখন আমরা যোগের দ্বারা মানসিক উপলব্ধি ছাড়াইয়া অধ্যাত্ম উপলব্ধিতে প্রবেশ লাভ করি। কারণ অধ্যাত্ম উপলব্ধি অনুসারে জীবনযাপন করা, যেন শেষপর্যন্ত আর আমরা মন থাকি না পরন্তু আত্মা হইয়া উঠি, যেন আমাদের বর্তমান প্রকৃতির ত্রুটিসমূহ

হইতে মুক্ত হইয়া আমরা সম্পূর্ণভাবেই আমাদের সত্য ও দিব্য সত্তার মধ্যে বাস করিতে পারি—ইহাই হইতেছে যোগের চরম অর্থ।

এইভাবে আমাদের সত্তার কেন্দ্রকে ঊর্ধ্বে উত্তোলিত করা এবং তাহার ফলস্বরূপ আমাদের সমগ্র জীবন ও চেতনার রূপান্তর সাধন এবং সেই সঙ্গে আমাদের কর্মের ভাব ও প্রেরণার পরিবর্তন (বাহ্যিক লক্ষণ সকলে কর্ম অনেক সময়ে ঠিক একই রকম থাকিতে পারে)—ইহা হইতেছে গীতোক্ত কর্মযোগের সারতত্ত্ব। তোমার সত্তার পরিবর্তন কর, আত্মার মধ্যে পুনর্জন্ম লাভ কর এবং সেই নবজন্ম লাভ করিয়া তোমার অন্তরস্থিত ভগবান তোমাকে যে কর্মে নিযুক্ত করিয়াছেন সেই কর্ম করিতে অগ্রসর হও, ইহাই গীতার বাণীর মর্মকথা। অথবা অন্যভাবে আরও গভীর ও অধিকতর অধ্যাত্ম ব্যঞ্জনার সহিত বলা যাইতে পারে, তোমাকে এখানে যে কর্ম করিতে হইবে সেইটিকেই তোমার আভ্যন্তরীণ অধ্যাত্ম পুনর্জন্মলাভের, দিব্যজন্ম লাভের সাধনস্বরূপ কর, আর যখন দিব্যভাব প্রাপ্ত হইয়াছ তখনও লোকসংগ্রহের নিমিত্ত ভগবানের যন্ত্ররূপে দিব্য কর্মসকল সম্পাদন কর। অতএব এখানে দুইটি জিনিস স্পষ্ট করিয়া বলিতে হইবে, স্পষ্ট করিয়া ধারণা করিতে হইবে; প্রথমত, পরিবর্তনের পন্থাটি, এই ঊর্ধ্বমুখী সঞ্চারণের, এই অভিনব দিব্যজন্ম লাভের পন্থাটি এবং দ্বিতীয়ত, কর্মের স্বরূপ, অথবা যে ভাব লইয়া কর্ম করিতে হইবে, কারণ কর্মের বাহ্য রূপের কিছুমাত্র পরিবর্তন আবশ্যক না হইতে পারে, বস্তুত ইহার অভিপ্রায় ও লক্ষ্য সম্পূর্ণ বিভিন্ন হইয়া যায়। কিন্তু এই দুইটি জিনিস কার্যত একই, কারণ একটির ব্যাখ্যা করিলে অপরটিরও ব্যাখ্যা হইয়া যায়। আমাদের কর্মের ভাব আমাদের সত্তার স্বরূপ হইতে এবং সত্তার আভ্যন্তরীণ প্রতিষ্ঠা হইতে উত্থিত হয়, কিন্তু আবার এই স্বরূপই আমাদের কর্মের ধারা ও অধ্যাত্ম ফলের দ্বারা পরিবর্তিত হয়, আমাদের কর্মের ভাবে খুব বেশী পরিবর্তন হইলে তাহা আমাদের সত্তার স্বরূপকে পরিবর্তিত করে এবং তাহার আভ্যন্তরীণ প্রতিষ্ঠারও পরিবর্তন করিয়া দেয়; আমরা সচেতন শক্তির যে কেন্দ্র হইতে কর্ম করি, ইহা সেইটিকে সরাইয়া দেয়। কেহ কেহ যেমন বলিয়া থাকেন, জীবন ও কর্ম যদি সম্পূর্ণভাবে মিথ্যা মায়া হইত, জীবন বা কর্মের সহিত আত্মার যদি কোন সম্বন্ধ না থাকিত, তাহা হইলে এইরূপ করিতে পারিত না, কিন্তু আমাদের মধ্যে অন্তঃপুরুষ নিজেকে জীবন ও কর্মের দ্বারাই বিকশিত করিয়া তুলিতেছে, বস্তুত ততটা কর্মের দ্বারাই নহে পরন্তু আমাদের অন্তঃপুরুষের কর্মশক্তির আভ্যন্তরীণ ধারার দ্বারাই আত্মার সহিত তাহার সম্বন্ধ নির্ণীত হয়। মহত্তর অধ্যাত্মসিদ্ধি লাভের কার্যকরী উপায়রূপে ইহাই হইতেছে কর্মযোগের সার্থকতা।

গোড়াতে ভিত্তিস্বরূপ আমরা ইহাই পাইতেছি যে, মানুষের এই যে বর্তমান আভ্যন্তরীণ জীবন সম্পূর্ণভাবেই তাহার দৈহিক ও প্রাণিক প্রকৃতির উপর নির্ভর করিতেছে, কেবল মানসিক শক্তির স্বল্প ক্রিয়ার দ্বারা ইহার ঊর্ধ্বে উন্নীত—তাহার

জীবনের সম্ভাবনা ইহা অপেক্ষা অনেক বড, এমনকি ইহা তাহাব প্রকৃত বর্তমান জীবনেরও সবখানি নহে। তাহার মধ্যে রহিয়াছে এক নিগূঢ় আত্মা, তাহাব বর্তমান প্রকৃতি হইতেছে এই আত্মারই একটা বাহ্য রূপ অথবা উহাব আংশিক সক্রিয প্রকাশ। গীতা বরাববই আত্মার সক্রিয়তাকে সত্য বলিযাই ধবিযাছে বলিয়া মনে হয়, চরমপন্থী বৈদান্তিকদেব ন্যায় ইহাকে মিথ্যা মাযা মাত্র বলে নাই, এইরূপ বেদান্ত মত গ্রহণ কবিলে সকল প্রকাব কর্ম ও সক্রিয়তাব মূলেই কুঠাবাঘাত কবা হয়। গীতা এই বিষয়ে নিজ দার্শনিক মতটি ব্যক্ত কবিতে সাংখ্যদর্শনকৃত প্রকৃতি পুরুষের বিভেদ স্বীকাব করিযাছে (অন্যভাবেও ইহা কবা চলিত)—পুরুষ জানে, ধরিয়া থাকে, প্রেরণা দেয় আব প্রকৃতি কর্ম কবে, যন্ত্রেব, আধাবেব, পদ্ধতিব নানা বৈচিত্র্য বিকাশ কবে। কেবল গীতা সাংখ্যেব মুক্ত ও অক্ষব পুরুষকে লইযা ইহাকে বেদান্তের ভাষায় অদ্বিতীয় অক্ষব সর্বব্যাপী আত্মা বা ব্রহ্ম বলিযাছে এবং ইহাব সহিত এই অন্য প্রকৃতিবদ্ধ পুরুষেব প্রভেদ কবিয়াছে, এই শেষোক্ত পুরুষই হইতেছে আমাদের ক্ষব ও ক্রিযাশীল সত্তা, বহুরূপে সকল জিনিসেব অন্তবাত্মা, বৈচিত্র্য ও ব্যক্তিগত চবিত্রের ভিত্তি। কিন্তু তাহা হইলে প্রকৃতিব ক্রিযার স্বরূপ কি?

তিনটি মূল গুণেব পরস্পবেব উপব ক্রিয়াই প্রকৃতিব পদ্ধতি। আব ইহাব আধার কি? প্রকৃতিব কারণসকলের ক্রমিক বিকাশেব দ্বাবা সৃষ্ট বিভিন্নাংশাত্মক সত্তাই হইতেছে আধার, পুরুষেব অনুভূতিতে প্রকৃতিব ক্রিযাসকল যেভাবে প্রতিফলিত হয় তদনুসারে আমবা ঐসব কাবণকে যথাক্রমে উল্লেখ কবিতে পাবি—বুদ্ধি ও অহংভাব, মন, ইন্দ্রিয়গণ এবং জড়শক্তিব রূপসমূহেব ভিত্তিস্বরূপ উপাদান পঞ্চভূত। এই সমস্তই হইতেছে যন্ত্রবৎ, প্রকৃতিব বিভিন্নাংশাত্মক যন্ত্র, আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীব দিক দিযা বলা যাইতে পাবে যে, ইহাবা সকলেই জডশক্তিব অন্তর্গত, প্রকৃতি-স্থ পুরুষ যেমন এক একটি যন্ত্রেব বিবর্তনেব দ্বাবা নিজ সত্তা সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠে তেমনই ইহারাও জডশক্তিব মধ্যে ক্রমশ প্রকটিত হয, তবে ইহাদের অভিব্যক্তিব ক্রম পূর্বে উল্লিখিত ক্রমেব বিপবীত, যথা—প্রথমে জড়পদার্থ (matter), তাহার পব ইন্দ্রিয়ানুভূতি (sensation), তাহাব পব মন, পরে বুদ্ধি এবং শেষে অধ্যাত্ম চৈতন্য। বুদ্ধি প্রথমে প্রকৃতিব ক্রিযাসমূহেই নিবিষ্ট ছিল, এখন সে তাহাদের যথার্থ স্বরূপটি ধবিতে পাবে, বুঝিতে পাবে যে এইসব কেবল তিন গুণের খেলা, পুরুষ ইহাব মধ্যে বদ্ধ হইযা পডিযাছে, পুরুষকে এই সকল ক্রিয়া হইতে স্বতন্ত্র বলিয়াও দেখিতে পাবে; তখনই পুরুষ নিজেকে মুক্ত করিবাব এবং তাহার আদ্য স্বাধীনতা ও অক্ষব জীবনে ফিবিযা যাইবাব সুযোগ লাভ কবে। বেদান্তেব ভাষায় সে তখন আত্মাকে দেখে, সত্তাকে দেখে, সে আব প্রকৃতির কাবণসমূহ ও ক্রিয়াসকলের সহিত, প্রকৃতিব বিবর্তনেব সহিত নিজেকে এক করিয়া দেখে না, সে তাহাব সত্য আত্মা ও সত্তাব সহিতই নিজেকে এক করিয়া দেখে এবং নিজেব অক্ষব অধ্যাত্ম স্বপ্রতিষ্ঠ জীবন ফিবিযা পায।

তখনই সেই অধ্যাত্ম আত্মপ্রতিষ্ঠা হইতে সে মুক্তভাবে নিজের সত্তার প্রভুরূপে ঈশ্ববরূপে নিজেব বিবর্তনেব ক্রিযাকে সমর্থন কবিতে পারে।

মনোবিজ্ঞানেব যেসকল তথ্যেব উপর এই সব দার্শনিক[১] ভেদবিচাব প্রতিষ্ঠিত কেবল সেইগুলিকেই লক্ষ্য করিযা বলিতে পাবা যায় যে, আমরা দুইপ্রকাব জীবনযাপন কবিতে পাবি, (১) নিজেব সক্রিয় প্রকৃতির কর্মপরম্পরায নিমগ্ন পুরুষেব জীবন, সে নিজেকে তাহার মানসিক ও দৈহিক যন্ত্রসকলেব সহিত এক কবিযা দেখে, তাহাদেব দ্বাবা সীমাবদ্ধ হয, নিজের নামরূপেব মধ্যে বদ্ধ হয, প্রকৃতিব অধীন হয, আব (২) আত্মাব জীবন, তাহা এই সকল জিনিসের ঊর্ধ্বে, বৃহৎ, নামরূপের অতীত, বিশ্বময়, মুক্ত, অসীম, তুবীয, তাহা অনন্ত সমতার সহিত তাহাব প্রাকৃত সত্তা ও কর্মকে ধারণ করিযা থাকে, কিন্তু নিজের মুক্তি ও আনন্ত্যেব দ্বাবা তাহাদেব ঊর্ধ্বে থাকে। এখন আমাদেব যাহা প্রাকৃত সত্তা তাহাব মধ্যেই আমবা বাস কবিতে পাবি অথবা আমাদেব যে মহত্তব ও অধ্যাত্ম সত্তা তাহাবই মধ্যে বাস কবিতে পাবি। প্রথমত এই মহৎ প্রভেদটির উপরে গীতার কর্মযোগ প্রতিষ্ঠিত।

অতএব আমাদেব বর্তমান প্রাকৃত সত্তা হইতে অন্তঃপুরুষকে মুক্ত কবাই হইতেছে সমগ্র সমস্যা এবং সমগ্র পদ্ধতি। আমাদের প্রাকৃত জীবনে যে জিনিসটি আব সব কিছুকেই ঢাকিযা বাখিযাছে সেইটি হইতেছে জডপ্রকৃতিব রূপসকলের বশ্যতা, বাহ্যস্পর্শেব বশ্যতা। এইগুলি ইন্দ্রিয়গণেব ভিতব দিয়া আমাদেব প্রাণের সম্মুখে উপস্থিত হয় এবং প্রাণও তৎক্ষণাৎ ইন্দ্রিয়গণেব ভিতব দিযা উহাদিগকে ধবিবাব জন্য, উহাদেব সহিত ব্যবহাব কবিবাব জন্য ধাবিত হয, বাসনা কবে, আসক্ত হইয়া পডে, ফলেব আকাঙ্ক্ষা কবে। মন তাহাব সকল আভ্যন্তবীণ অনুভূতি, প্রতিক্রিয়া, হৃদয়াবেগ, তাহাব প্রত্যক্ষ চিন্তা ও অনুভবেব সকল অভ্যস্ত ধাবায ইন্দ্রিযগণেব এই ক্রিযাবই অনুসরণ কবে; বুদ্ধিও মনের টানে পড়িয়া এই ইন্দ্রিযগত জীবনে নিজেকে ছাড়িযা দেয, এই জীবনে অন্তঃপুরুষ বস্তুসকলেব বাহ্য রূপেব অধীন হইযা পডে, মুহূর্তের জন্যও প্রকৃতপক্ষে ইহার ঊর্ধ্বে উঠিতে পাবে না, বাহ্যজগৎ আমাদেব উপব যে ক্রিয়া করে এবং আমাদের মনে তাহার যেসব ফল ও প্রতিক্রিয়া হয ইহাদেব গণ্ডিব বাহিবে যাইতে পারে না। পারে না অহংবোধেব জন্য, এই অহংবোধেব দ্বাবাই বুদ্ধি আমাদের মন, ইচ্ছা, ইন্দ্রিয় ও শবীবেব মধ্যে প্রকৃতিব ক্রিযাব সমষ্টিকে অন্যের মন, ইচ্ছা, স্নায়ুমণ্ডল, শবীরের উপব প্রকৃতিব ক্রিয়ার প্রভেদ কবে; আমরা জীবন বলিতে বুঝি কেবল প্রকৃতি আমাদেব অহং-এর উপর কিভাবে ক্রিয়া কবিতেছে এবং তাহার স্পর্শে আমাদেব অহং কিভাবে সাডা দিতেছে। আমবা আব কিছুই জানি না, আমরা যে আর কিছু

[১] জডজগৎ ও মনোজগতেব ব্যাপাবসমূহেব মূল তত্ত্ব এবং পবম সত্য বস্তু যাহাই হউক তাহাব সহিত ইহাদেব মূল সম্বন্ধ বিচাববুদ্ধিব সহাযে বিবৃত করাই ফিলজফি philosophy বা দর্শনশাস্ত্র।

তাহা মনে হয় না; আত্মাকেই তখন মনে হয কেবল মন, ইচ্ছা, হৃদযবৃত্তি ও স্নায়বিক ক্রিযা-প্রক্রিয়াব একটা স্বতন্ত্র স্তূপমাত্র। আমবা আমাদেব অহংকে প্রসাবিত করিতে পারি, নিজদিগকে পবিবাব, কুল, সম্প্রদায, দেশ, অধিজাতি (nation) এমনকি সমগ্র মানবজাতির সহিতই এক কবিযা দেখিতে পাবি, কিন্তু তথাপি এইসব ছদ্মবেশের অন্তবালে অহং-ই থাকে আমাদেব কর্মেব মূলতত্ত্ব, কেবল সে বাহ্য বস্তুসকলের সহিত এই উদাবতর ব্যবহাবেব দ্বাবা নিজেব স্বতন্ত্র সত্তার অধিকতব পরিতৃপ্তি লাভ করে।

তখনও আমাদের মধ্যে প্রাকৃত সত্তাব ইচ্ছাই কার্য কবে, বাহ্যজগতেব স্পর্শসকলকে ধবিযা ব্যক্তিগত অহং-এর বিভিন্ন দিককেই পবিতৃপ্ত কবিতে চায, এবং এই ক্রিয়াব ইচ্ছা হইতেছে সকল সমযেই বাসনা কামনাব ইচ্ছা, আমাদেব কর্ম এবং কর্মেব ফলে আসক্তিব ইচ্ছা, ইহা হইতেছে আমাদেব মধ্যে প্রকৃতিবই ইচ্ছা, আমরা বলি বটে যে, ইহা আমাদেব ব্যক্তিগত ইচ্ছা, কিন্তু আমাদেব অহং-এর যে ব্যক্তিগত রূপ তাহা হইতেছে প্রকৃতিব সৃষ্টি, তাহা আমাদেব মুক্ত আত্মা, আমাদেব স্বাধীন সত্তা নহে, হইতেই পারে না। সমস্তটিই হইতেছে প্রকৃতিব গুণেব খেলা। ইহা তমোগুণেব ক্রিযা হইতে পাবে, তখন আমাদেব ব্যক্তিত্ব হয জড, তামসিক, তাহা হয বস্তুসকলেব গতানুগতিক ধাবাব অধীন এবং তাহাতেই সন্তুষ্ট; মুক্ততর কর্ম ও প্রভুত্বেব জন্য সবল প্রযাস করিবাব কোন ক্ষমতাই থাকে না। অথবা ইহা রজোগুণের ক্রিযা হইতে পাবে, তখন আমাদেব ব্যক্তিত্ব হয অস্থির কর্মপ্রবণ, তাহা প্রকৃতিব উপব ঝাঁপাইযা পড়ে, তাহাকে নিজেব প্রযোজনে ও বাসনার কাজে লাগাইতে চেষ্টা কবে, কিন্তু দেখিতে পায না যে তাহাব আপাতদৃষ্ট প্রভুত্ব বস্তুতপক্ষে দাসত্ব ভিন্ন আব কিছুই নহে, কারণ তাহাব প্রযোজন ও বাসনাসমূহ হইতেছে প্রকৃতিরই, আর যতক্ষণ আমবা উহাদেব বশ ততক্ষণ আমাদের কোন স্বাধীনতাই সম্ভব নহে। অথবা ইহা সত্ত্বগুণেবই ক্রিযা হইতে পারে, তখন আমাদেব ব্যক্তিত্ব হয জ্ঞানময়, তাহা বিচাববুদ্ধি অনুসবণে জীবনযাপন কবিতে অথবা সত্য, শিব বা সুন্দবেব কোন আদর্শ সিদ্ধ কবিযা তুলিতে প্রয়াস কবে; কিন্তু এই বিচাববুদ্ধিও প্রকৃতিব বাহ্য রূপেবই অধীন এবং এই সকল আদর্শ আমাদের ব্যক্তিত্বেরই পরিবর্তনশীল ভাব ভিন্ন আব কিছুই নহে, এই সবে শেষপর্যন্ত আমবা কোন নিশ্চিত নীতি বা তৃপ্তি লাভ কবিতে পাবি না। তখনও আমরা একটা পবিবর্তনেব চক্রে ঘূর্ণিত হইতে থাকি, আমাদেব অহং-এব ভিতর দিযা এক শক্তি আমাদিগকে ঘুবায, সে শক্তি আমাদেব মধ্যে, এই সবেব মধ্যেই রহিযাছে, কিন্তু আমরা নিজেবা সে শক্তি নহি অথবা তাহাব সহিত আমাদের যোগ বা সহকাবিতা নাই। তখনও স্বাধীনতা নাই, প্রকৃত প্রভুত্ব নাই।

অথচ স্বাধীনতা সম্ভব। ইহাব জন্য প্রথমে আমাদিগকে আমাদেব ইন্দ্রিযেব উপর বাহ্যজগতে যে ক্রিয়া তাহা হইতে সরিয়া নিজেদের ভিতবে আসিতে হইবে, অর্থাৎ, আমাদিগকে অন্তর্মুখী হইয়া চলিতে হইবে এবং ইন্দ্রিয়গণ যে স্বভাবত

তাহাদেব বাহ্য বিষযেব দিকে ধাবিত হয তাহাদিগকে নিবৃত্ত করিতে হইবে। ইন্দ্রিযগণেব উপব প্রভুত্ব, তাহাবা যেসব বস্তুব জন্য লালাযিত সেসব বর্জন কবিবাব সামর্থ্য—ইহাই হইতেছে প্রকৃত অধ্যাত্মজীবন লাভের পক্ষে প্রথম প্রযোজন, কেবল এইরূপেই আমবা অনুভব করিতে আরম্ভ করি যে, আমাদেব ভিতবে এক আত্মা আছে, বাহ্য বস্তুর স্পর্শ গ্রহণ কবিযা মনের যে অবস্থাবিপর্যয় হয সে আত্মা তাহা হইতে স্বতন্ত্র, সে আত্মা নিজের গভীবতর সত্তায় স্বপ্রতিষ্ঠ, অক্ষব, প্রশান্ত, আত্মবশ, গম্ভীব, স্থিব ও সুমহান, তাহা নিজেই নিজের ঈশ্বর এবং আমাদেব বাহ্যপ্রকৃতিব সাগ্রহ ছুটাছুটিতে সম্পূর্ণ অবিচলিত। কিন্তু যতক্ষণ আমরা বাসনাব বশ ততক্ষণ ভিতবেব এই আত্মাকে অনুভব করা যায় না। কারণ আমাদেব সমগ্র বাহ্যজীবনেব মূল তত্ত্ব এই বাসনা ইন্দ্রিয়ের জীবনেই তৃপ্তি পায়, কাম ক্রোধাদি বিপুগণেব ক্রিযাতেই সে মত্ত থাকে। অতএব আমাদিগকে বাসনা দূব কবিতেই হইবে। আমাদেব প্রাকৃত সত্তাব এই প্রবৃত্তি বিনষ্ট হইলে ইহাব অনুভবাত্মক ফলস্বরূপ কামক্রোধাদি চিত্তবিকারসকল শান্ত হইযা পডিবে; কারণ যে সুখ-দুঃখেব বোধ এই সকল চিত্তবিকাব সৃষ্টি কবে তাহা আমাদেব অন্তর হইতে চলিযা যাইবে, বাসনা বিদূবিত হইলে আব আমবা লাভ ও ক্ষতিতে, জয় ও পবাজযে, সুখময ও বেদনাময বাহ্যস্পর্শে সুখ ও দুঃখ অনুভব করিব না। তখন আসিবে এক প্রশান্ত সমতা। আর যেহেতু তখনও আমাদিগকে সংসারে বাস কবিতে হইবে, কর্ম কবিতে হইবে, আব যেহেতু আমাদেব প্রকৃতি এইরূপ যে কর্ম কবিতে হইলেই ফলেব আকাঙ্ক্ষায কর্ম করিতে হয়, আমাদিগকে সেই প্রকৃতিব পবিবর্তন কবিতেই হইবে এবং কর্মেব ফলে অনাসক্ত হইযা কর্ম করিতে হইবে, নতুবা বাসনা এবং বাসনার সমস্ত পবিণাম থাকিযাই যাইবে। কিন্তু আমাদের মধ্যে কর্মীব এই প্রকৃতি কেমন কবিযা পবিবর্তন কবা যায? কর্মকে অহং ও ব্যক্তিসত্তা হইতে পৃথক কবিতে হইবে, বুদ্ধিব দ্বাবা দেখিতে হইবে যে, এসবই হইতেছে প্রকৃতিব গুণেব খেলা, আমাদেব অন্তঃপুরুষকে এই খেলা হইতে পৃথক কবিতে হইবে, প্রথমেই তাহাকে করিতে হইবে প্রকৃতিব কর্মসকলেব সাক্ষী এবং ঐসকল কর্মকে সেই শক্তিব হস্তে ছাডিযা দিতে হইবে যে শক্তি বস্তুতপক্ষে উহাদের পশ্চাতে বহিযাছে—প্রকৃতির মধ্যে ঐ শক্তি হইতেছে আমাদেব অপেক্ষা মহত্তর, তাহা আমাদেব ব্যক্তিসত্তা নহে, তাহা হইতেছে বিশ্বের অধীশ্বব। কিন্তু মন এই সব কবিতে দিবে না, মনেব স্বভাবই হইতেছে বাহিরেব দিকে ইন্দ্রিযগণের পশ্চাতে ধাবমান হওযা এবং বুদ্ধি ও ইচ্ছাশক্তিকেও নিজেব সঙ্গে টানিয়া লওযা। অতএব মনকে কেমন কবিযা শান্ত কবা যায় তাহা আমাদিগকে শিখিতেই হইবে। আমাদিগকে এমন পূর্ণতম শান্তি ও নিস্তব্ধতা লাভ কবিতে হইবে যাহাতে আমরা আমাদেব অন্তবস্থিত প্রশান্ত, নিশ্চল, আনন্দময আত্মাকে জানিতে পাবি, সে আত্মা বস্তুসকলেব স্পর্শে চিব-অক্ষত চিব-অবিচলিত, তাহা আপনাতে আপনি পূর্ণ, নিজেব মধ্যেই তাহা অনন্ত পবিতৃপ্তি লাভ কবে।

এই আত্মাই হইতেছে আমাদেব স্বপ্রতিষ্ঠ সত্তা। ইহা আমাদেব ব্যক্তিগত জীবনেব মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে। ইহা সর্বভূতেব মধ্যে এক, সর্বব্যাপী, সকল বস্তুব প্রতি সমান, নিজের অনন্ত সত্তাব দ্বারা ইহা সমগ্র বিশ্বলীলাকে ধাবণ কবিযাছে, কিন্তু কোন সসীম বস্তুব দ্বাবা গণ্ডিবদ্ধ নহে, প্রকৃতি ও ব্যক্তিত্বেব পরিবর্তনসকলেব দ্বারা পবিবর্তিত হয না। যখন এই আত্মা আমাদেব অন্তরে প্রকাশিত হয়, যখন আমরা ইহার শান্তি ও নিস্তব্ধতা অনুভব কবি, তখন আমবা এই আত্মা হইযা উঠিতে পাবি, আমবা আমাদেব অন্তঃপুরুষকে প্রকৃতিব মধ্যে তাহাব নিম্নতর অবস্থা হইতে উত্তোলিত কবিযা আত্মাব মধ্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত কবিতে পারি। আমরা ইহা কবিতে পাবি, আমবা যে সকল জিনিস লাভ কবিযাছি, শান্তি, সমতা, বিক্ষোভহীন নৈর্ব্যক্তিকতা—এই সকলেব শক্তিব দ্বাবা। কাবণ যতই আমবা এই সকল জিনিসে বর্ধিত হই, ইহাদিগকে পূর্ণ কবিযা তুলি, আমাদেব সমস্ত প্রকৃতিকে ইহাদেব অধীন কবিযা দিই ততই আমরা এই শান্ত, সম, বিক্ষোভহীন, নৈর্ব্যক্তিক সর্বব্যাপী আত্মা হইয়া উঠি। আমাদেব ইন্দ্রিযগণ ঐ নিথব নিস্তব্ধতাব মধ্যে পতিত হয এবং আমাদেব উপব বাহ্যজগতেব স্পর্শ সকলকে পরম শান্তির সহিত গ্রহণ কবে; আমাদেব মন নিস্তব্ধতাব মধ্যে পতিত হয এবং শান্ত সর্বদর্শী সাক্ষী হইয়া উঠে; আমাদের অহং এই নৈর্ব্যক্তিক সত্তায লয় হইযা যায়। আমরা নিজেবা এই যে আত্মা হইযাছি তাহাব মধ্যেই আমবা সকল বস্তুকে দেখি; আমরা মূল অধ্যাত্ম সত্তায় সর্বভূতেব সহিত এক হইযা উঠি। এই অহংভাবশূন্য শান্তি ও নৈর্ব্যক্তিকতায় কর্ম কবিযা, আমাদেব কর্ম আব আমাদেব থাকে না, তাহাদের প্রতিক্রিযাব দ্বারা আর আমাদিগকে বদ্ধ কবে না, বিক্ষুব্ধ কবে না। প্রকৃতি এবং তাহাব গুণসমূহ তাহার কর্মেব জাল বুনিতে থাকে, কিন্তু আমাদেব দুঃখলেশশূন্য স্বপ্রতিষ্ঠ শান্তিব হানি কবিতে পারে না। সমস্তই সেই এক, সম, সর্বগত ব্রহ্মে সমর্পিত হয।

কিন্তু এখানে দুইটি সমস্যা থাকিযা যায। প্রথমত, শান্ত ও অক্ষব আত্মা এবং প্রকৃতিব কর্ম এই দুইয়ের মধ্যে বিবোধ বহিযাছে বলিযা মনে হয। তাহা হইলে কর্মেব অস্তিত্ব আদৌ কেমন কবিযা সম্ভব হয অথবা একবাব অক্ষব আত্ম-প্রতিষ্ঠায় প্রবেশ লাভ করিলে আব কর্ম কেমন করিযা চলিতে পাবে? সেখানে কর্মের সেই প্রেরণা কোথায় যাহাব দ্বাবা আমাদের প্রস্তুতিব কর্ম সম্ভব হইবে? যদি আমরা সাংখ্যের সহিত বলি যে, প্রেবণা বহিযাছে প্রকৃতিবই মধ্যে, আত্মাব মধ্যে নহে, তাহা হইলে প্রকৃতিতে একটা উদ্দেশ্য থাকা চাই, পুরুষকে অনুবাগ, অহংভাব ও আসক্তির দ্বাবা তাহাদেব কর্মেব মধ্যে টানিযা লইবাব শক্তি থাকা চাই, আর যখন এইসব জিনিস আব নিজদিগকে পুরুষেব চৈতন্যেব মধ্যে প্রতিফলিত করে না তখন প্রকৃতিব আব শক্তি থাকে না এবং সেই সঙ্গে কর্মেব প্রেরণাও বন্ধ হইয়া যায়। কিন্তু গীতা এই মত গ্রহণ কবে নাই, বস্তুত এই মত অনুসারে বহু বহু পুরুষের অস্তিত্ব স্বীকাব কবিতে হয, কেবল এক বিশ্বপুরুষ নহে,

নতুবা জীবেব পৃথক পৃথক জীবন এবং যখন লক্ষ লক্ষ অন্য জীব বদ্ধ বহিয়াছে তখন কোন একটি জীবেব মুক্তি কেমন কবিয়া সম্ভব হয় তাহা বুঝা যায় না। প্রকৃতি একটি স্বতন্ত্র তত্ত্ব নহে, ভগবানেব যে শক্তি বিশ্বসৃষ্টিতে বাহির হইয়াছে তাহাই প্রকৃতি। কিন্তু ভগবান যদি কেবল এই অক্ষর আত্মা হন এবং জীব হয কেবল এমন একটি জিনিস যাহা তাহা হইতে শক্তিতে আবির্ভূত হইয়াছে, তাহা হইলে যে মুহূর্তে সে প্রত্যাবৃত্ত হইবে এবং আত্মায় প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে, সেই মুহূর্তেই পবম ঐক্য ও পবম নিস্তব্ধতা ভিন্ন আর সবই বন্ধ হইয়া যাইবে। দ্বিতীযত, যদি কোন অচিন্ত্য উপাযে কর্ম তখনও চলিতে থাকে, তথাপি যেহেতু আত্মা সকল জিনিসেব প্রতিই সমভাবাপন্ন, সেহেতু কর্ম হইল কি না তাহাতে কিছুই আসিযা যায না, আব যদিও কর্ম অনুষ্ঠিত হয়, কি কর্ম করা হইল তাহাতেও কিছু আসিযা যায় না। তাহা হইলে এই ঘোরতম ও নিষ্ঠুরতম কর্ম কবিতে পুনঃপুনঃ আদেশ কেন, এই বথ, এই যুদ্ধ, এই রথী, এই দিব্য সারথি কেন?

গীতা ইহাব উত্তবে দেখাইযাছে যে, ভগবান অক্ষর আত্মা অপেক্ষাও মহত্তব, অধিকতব ব্যাপক, তিনি একাধাবে এই আত্মা আবাব প্রকৃতির কর্মেব অধীশ্বর। কিন্তু অক্ষবেব যে অনন্ত শান্তি, যে সমতা, যে কর্ম ও ব্যক্তিত্বের অতীত স্বরূপ—ভগবান ভিতরে অক্ষবের এই ভাব লইযাই প্রকৃতিব কর্মসকল পরিচালনা কবেন। আমবা বলিতে পাবি যে, সত্তাব এই প্রতিষ্ঠা হইতেই তিনি কর্ম পবিচালনা কবেন, আব আমবা যতই এই প্রতিষ্ঠায গড়িয়া উঠি ততই আমবা তাঁহার সত্তায় এবং দিবা কর্মেব প্রতিষ্ঠায গড়িযা উঠি। এই অক্ষর প্রতিষ্ঠা হইতেই তিনি প্রকৃতিতে ইচ্ছা ও শক্তিরূপে বহির্গত হন, নিজেকে সর্বভূতে অভিব্যক্ত করেন, জগতে মনুষ্যরূপে জন্মগ্রহণ কবেন, সকলের হৃদযের মধ্যে অধিষ্ঠিত থাকেন, অবতাবরূপে, মানুষেব মধ্যে দিব্য জন্মরূপে নিজেকে প্রকট করেন, আর মানুষ যেমন তাঁহাব সত্তায গড়িয়া উঠে, এই দিব্য জন্মের মধ্যেই সে গড়িয়া উঠে। কর্ম কবিতে হইবে আমাদেব কর্মেব এই অধীশ্ববেব উদ্দেশে যজ্ঞরূপে, এবং আমাদিগকে আত্মায গড়িযা উঠিযা আমাদের সত্তায় তাঁহার সহিত আমাদের একত্ব উপলব্ধি কবিতে হইবে এবং আমাদের ব্যক্তিত্বকে দেখিতে হইবে প্রকৃতিতে তাঁহাবই আংশিক অভিব্যক্তিরূপে। সত্তায় তাঁহার সহিত এক হইয়া আমরা বিশ্বের সকল জীবেব সহিত এক হইযা উঠিব এবং দিব্য কর্ম কবিব, আমাদের নিজেব কাজ বলিযা নহে, পবন্তু লোক বক্ষা ও লোক সংগ্রহেব নিমিত্ত আমাদেব ভিতর দিযা তাঁহাবই কর্ম বলিযা।

এইটি সিদ্ধ কবিযা তোলাই মূল কথা এবং একবাব এইটি সিদ্ধ হইলে, অর্জুনেব সম্মুখে যেসকল সমস্যা উঠিয়াছে সেসব দূব হইয়া যাইবে। সমস্যাটি তখন আব আমাদেব ব্যক্তিগত কর্মের সমস্যা থাকে না, কাবণ যাহা লইযা আমাদেব ব্যক্তিত্ব তাহা তখন সাময়িক ও নীচেব জিনিস হইয়া পড়ে, সমস্যাটি

তখন হয়—ভগবৎ ইচ্ছা আমাদের ভিতব দিযা বিশ্বমাঝে যে কর্ম কবিতেছে তাহারই সমস্যা। এইটি বুঝিতে হইলে আমাদিগকে জানিতে হইবে যে, এই পবম পুরুষ নিজে কি এবং প্রকৃতিতেই বা কি, প্রকৃতির কর্মপবম্পবা কি এবং তাহাদেব লক্ষ্যই বা কি; প্রকৃতি-স্থ পুরুষ এবং এই পবম পুরুষেব মধ্যে যে অন্তবঙ্গ সম্বন্ধ, জ্ঞানযুক্ত ভক্তির উপর যাহার প্রতিষ্ঠা, তাহা জানিতে হইবে। এই সকল প্রশ্নেব মীমাংসাই গীতার বাকী অংশের আলোচ্য বিষয়।

দ্বিতীয় খণ্ড (পূর্বার্ধ)

কর্ম, ভক্তি ও জ্ঞানের সমন্বয়

প্রথম অধ্যায

দুই প্রকৃতি

গীতাব প্রথম ছয অধ্যায লইয়াই গীতা-শিক্ষার প্রথম ভাগ বচিত হইয়াছে। ঐ প্রথম ভাগটি গীতা-কথিত সাধনা ও জ্ঞানেব প্রাথমিক ভিত্তি। সেইভাবেই গীতাব বাকী দ্বাদশ অধ্যাযকে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কবিশিষ্ট দুইটি ভাগ রূপে লইযা আলোচনা কবা যাইতে পারে। প্রথম ভাগেব শিক্ষাকে ভিত্তি করিয়া এই দুই ভাগে গীতাশিক্ষাব বাকী অংশ পবিস্ফুট কবা হইয়াছে। গীতাব সপ্তম অধ্যায হইতে দ্বাদশ অধ্যায পর্যন্ত ভগবানেব প্রকৃতি সম্বন্ধে মোটামুটি একটা তাত্ত্বিক বর্ণনা দেওযা হইযাছে, এবং সেই বর্ণনাকে ভিত্তি কবিযা জ্ঞান ও ভক্তিব নিগূঢ় সমন্বয কবা হইযাছে ঠিক যেমন গীতাব প্রথম ভাগে জ্ঞান ও কর্মের সমন্বয করা হইযাছে। গীতাব সমন্বযেব এই অবস্থায় মাঝখানে একাদশ অধ্যাযে বিশ্বরূপ দর্শনেব বর্ণনাব দ্বাবা এই সমন্বয়কে জীবন্ত ও পরিস্ফুট কবিয়া তোলা হইয়াছে; এবং ইহাব সহিত জীবন ও কর্মেব সম্বন্ধ স্পষ্টভাবে দেখাইয়া দেওযা হইযাছে। এইরূপে সমস্ত শিক্ষাটিকে পুনবায ঘুবাইয়া অর্জুনেব গোডাকাব প্রশ্নে লইয়া আসা হইযাছে, বাস্তবিক অর্জুনেব সেই প্রথম প্রশ্নই গীতাব সমগ্র শিক্ষার কেন্দ্র এবং গীতা ঘুবিযা ঘুবিযা সেই প্রশ্নটিরই চূড়ান্ত মীমাংসা করিযাছে। পরে ত্রযোদশ অধ্যায হইতে গীতা পুরুষ ও প্রকৃতিব প্রভেদ কবিযা গুণত্রয়ের ক্রিয়া, গুণাতীত হওযা, নিষ্কাম কর্ম কেমন জ্ঞানে পবিণত হইয়া ভক্তির সহিত মিলিত হয়—জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি এই তিন মিলিয়া এক হয—এই সব সম্বন্ধে নিজেব মত পবিস্ফুট কবিযাছে, এবং সেখান হইতে তাহাব শিক্ষার মহান চূড়ান্ত কথায় উঠিয়াছে, বিশ্বপ্রভু ভগবানে আত্মসমর্পণেব গুহ্যতম রহস্য ব্যক্ত করিয়াছে।

গীতাব এই দ্বিতীয খণ্ডে কথাগুলি যেমন সহজ ও সংক্ষিপ্তভাবে বলা হইয়াছে, প্রথম খণ্ডে সেরূপ দেখা যায না। যে সকল সংজ্ঞার দ্বাবা মূল সত্যটি বুঝিবাব সূত্র পাওযা যায, প্রথম ছয অধ্যাযে সেসব সংজ্ঞা দেওয়া হয নাই; সংশয়সকল যেমন উঠিযাছে তেমনই তাহাদেব সমাধান কবা হইয়াছে। সেখানে গীতার শিক্ষাটি যেন একটু কষ্টেসৃষ্টে অগ্রসব হইযাছে এবং অনেক কথা ঘুবাইয়া ফিবাইয়া বলা হইযাছে। অনেক এমন কথা আসিয়া পডিয়াছে, যাহাদের সার্থকতা স্পষ্ট বুঝা যায না। কিন্তু এই দ্বিতীয খণ্ডে মনে হয, আমবা যেন আরও পরিষ্কাব ভূমি পাইযাছি। এখানে কথাগুলি আব তেমন আলগা আলগা নহে—সোজাসুজি, স্পষ্ট, সংক্ষিপ্তভাবেই বলা হইয়াছে। কিন্তু, আবার এই সংক্ষিপ্ততার জন্যই এখানে ভুলের সম্ভাবনা বেশী, এবং যাহাতে প্রকৃত অর্থটি হারাইয়া না ফেলি সেজন্য আমাদিগকে এখানে খুব সাবধানতাব সহিতই অগ্রসর হইতে হইবে। কারণ,

এখানে আর আমরা বরাবর মানসিক ও আধ্যাত্মিক উপলব্ধির নিশ্চিত ভূমির উপরে নাই। এখানে অত্যুচ্চ আধ্যাত্মিক সত্যকে, এমনকি, বিশ্বাতীত সত্যকেও এমনভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে যেন তাহা মন-বুদ্ধির গোচর হইতে পারে। এরূপ তাত্ত্বিক (Metaphysical statement) বর্ণনার মুশকিল এই যে, যাহা বাস্তবিক অনন্ত, অসীম, তাহাকে সংজ্ঞার মধ্যে বাঁধিবার চেষ্টা করিতে হয়, সসীম সান্ত মনের গোচর করিবার চেষ্টা করিতে হয়। এইরূপ চেষ্টা করা দরকার হয় বটে, কিন্তু, ইহা কখনই বেশ সন্তোষজনক হইতে পারে না, চরম ও সম্পূর্ণ হইতে পারে না। উচ্চতম আধ্যাত্মিক সত্যকে জীবনের মধ্যে ফুটাইয়া তুলিতে পারা যায়, দর্শন করিতে পারা যায়; কিন্তু তাহার বর্ণনা কেবলমাত্র আংশিক ও অসম্পূর্ণই হইতে পারে। আধ্যাত্মিক ব্যাপারের বর্ণনা করিতে উপনিষদ যে পদ্ধতি ও ভাষা অবলম্বন করিয়াছে, এসব বিষয়ে কেবলমাত্র তাহাই সমীচীন। উপনিষদ অবাধে রূপক ও উপমা ব্যবহার করিয়াছে, মানসিক বুদ্ধির উপযোগী সংজ্ঞা বাঁধিবার চেষ্টা না করিয়া সোজাসুজি প্রত্যক্ষদর্শনের ভাষা প্রয়োগ করিয়াছে; এবং কথাগুলিকে অসীম ব্যঞ্জনা ও আভাসের দ্বারা সত্যের সঙ্কেত করিতে ছাড়িয়া দিয়াছে। কিন্তু, গীতা এরূপ পদ্ধতি অবলম্বন করিতে পারে না, কারণ, মনের সংশয়, বুদ্ধির সংশয় দূর করাই গীতার উদ্দেশ্য। মনের যে অবস্থায় বুদ্ধির মধ্যে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়, বুদ্ধি কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারে না, অথচ আমাদের ভাব ও প্রেরণার মধ্যে বিরোধগুলির সমাধান করিতে সেই বুদ্ধিকেই সালিশ মানিতে হয়, সেই অবস্থার প্রয়োজনকে লক্ষ্য করিয়াই গীতার শিক্ষা কথিত হইয়াছে। বুদ্ধিকে এমন সত্যে লইয়া যাইতে হইবে যাহা বুদ্ধির উপরে; কিন্তু, বুদ্ধির নিজের পদ্ধতি, নিজের ধরন অনুসারেই তাহাকে চালাইতে হইবে। গীতা যে মীমাংসা দিয়াছে, অন্তর্জীবনের নিগূঢ় আধ্যাত্মিক রহস্যের উপর তাহার ভিত্তি। সে ভিত্তি সম্বন্ধে বুদ্ধির কোন অভিজ্ঞতা নাই। অতএব, সেই মীমাংসার সার্থকতা সম্বন্ধে বুদ্ধিকে তুষ্ট করিতে হইলে, জীবনের যেসকল সত্যকে অবলম্বন করিয়া ঐ মীমাংসা করা হইয়াছে, তাহাদের একটা যুক্তিযুক্ত বর্ণনা দেওয়া আবশ্যক।

এ পর্যন্ত যেসকল সত্যের উল্লেখ করিয়া গীতা আপনার মত সমর্থন করিয়াছে, অর্জুনের বুদ্ধির কাছে সেগুলি একেবারে নূতন নহে, এবং সেগুলি কেবল গোড়ার কথা। প্রথমে, আত্মার (the self) সহিত প্রকৃতিস্থ জীবের প্রভেদ করা হইয়াছে। এই প্রভেদের দ্বারা দেখান হইয়াছে যে, যতক্ষণ এই প্রকৃতিস্থ জীব (individual being in Nature) অহঙ্কারের ক্রিয়ার মধ্যে বদ্ধ, ততক্ষণ সে গুণত্রয়ের অধীন থাকিবেই; মানুষের মন-বুদ্ধির যে ক্রিয়া, তাহার দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণের যে ক্রিয়া, সেসব এই গুণত্রয়ের, সত্ত্ব, রজঃ, তমের অস্থির খেলা ভিন্ন আর কিছুই নহে। এই গণ্ডির মধ্যে কোনই সমাধান নাই। প্রকৃত সমাধান পাইতে হইলে এই গণ্ডি ছাড়াইয়া উঠিতে হইবে; এই ত্রিগুণময়ী প্রকৃতির উপরে উঠিয়া এক অদ্বিতীয় অক্ষর পুরুষে ও নীরব আত্মায় পৌঁছিতে হইবে, কারণ তখনই

মানুষ সকল অনর্থের মূল অহঙ্কার ও বাসনার ক্রিয়াকে অতিক্রম করিবে। কিন্তু, এইভাবে মানুষ কি একেবারে নিষ্ক্রিয়তায় উপনীত হইবে না? প্রকৃতির বাহিরে তো কোথাও কর্মশক্তি নাই, কর্মের কোনও প্রয়োজন বা প্রেরণা নাই; কারণ, অক্ষর ব্রহ্ম নিষ্ক্রিয়—সকল বস্তু, সকল কর্ম, সকল ঘটনার প্রতি সম ও নিরপেক্ষ। এইজন্যই গীতা যোগশাস্ত্রোক্ত ঈশ্বরতত্ত্বের অবতারণা করিয়াছে—ঈশ্বর সকল কর্মের, সকল যজ্ঞের প্রভু। গীতা এখানে স্পষ্টভাবে না বলিলেও ইঙ্গিত করিয়াছে যে, এই ঈশ্বর অক্ষর পুরুষেরও উপরে এবং ঈশ্বরের মধ্যেই বিশ্বলীলার নিগূঢ় রহস্য নিহিত আছে। অতএব পুরুষ বা আত্মার ভিতর দিয়া ঈশ্বরে উঠিতে পারিলেই কর্মের বন্ধন হইতে আধ্যাত্মিক মুক্তি লাভ করা যায়, অথচ প্রকৃতির মধ্যে কর্ম করা যায়। কিন্তু, এই যে পরমেশ্বর দিব্যগুরুরূপে দিব্যসারথিরূপে এখানে অবতীর্ণ হইয়াছেন, ইনি কে এবং আত্মার সহিত এবং প্রকৃতিস্থ জীবের সহিত ইঁহার সম্বন্ধই বা কি, তাহা এখনও প্রকাশ করিয়া বলা হয় নাই। আর, ঈশ্বরের ইচ্ছা হইতে কর্মের যে প্রেরণা আসে, তাহা ত্রিগুণময়ী প্রকৃতির প্রেরণা হইতে ভিন্ন কিসে, তাহাও এখনও পরিস্ফুট হয় নাই। এবং যদি উহা ত্রিগুণময়ী প্রকৃতিরই প্রেরণা ভিন্ন আর কিছু না হয়, তাহা হইলে উহার অনুসারে কর্ম করিয়া জীব গুণত্রয়ের বন্ধন কেমন করিয়া এড়াইবে? তাহা হইলে যে মুক্তির ভরসা দেওয়া হইয়াছে, তাহা কি মিথ্যা বা অসম্পূর্ণ হইবে না? সত্তার যেটা ক্রিয়ার দিক তাহাই প্রকৃতি, শক্তি, ক্রিয়াশক্তিরূপে ইচ্ছা তাহার অন্তর্নিহিত। তাহা হইলে ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি ছাড়াও তাহার উপরে কি আর কোনও প্রকৃতি আছে? অহঙ্কার, বাসনা, মন, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি, প্রাণের আবেগ—এই সব ব্যতীত কর্মের, ইচ্ছার, বাস্তব সৃষ্টির কি আর কোন শক্তি আছে?

এখনও এই সন্দেহ ও অনিশ্চয়তা রহিয়াছে। অতএব দিব্য কর্মের ভিত্তি হইবে যে জ্ঞান, সেই জ্ঞান আরও পূর্ণভাবে এখন বুঝাইয়া দেওয়া আবশ্যক। সকল কর্মের মূল উৎস ভগবান সম্বন্ধে পূর্ণ সমগ্র জ্ঞানই এইরূপ দিব্য কর্মের ভিত্তি হইতে পারে। সেই জ্ঞান লাভ করিয়া কর্মী ভগবানের সত্তাতেই মুক্ত হন; কারণ, তিনি সেই মুক্ত আত্মাকে জানেন, যাহা হইতে সকল কর্মের উৎপত্তি; এবং তাহার মুক্তিতে মুক্তি লাভ করেন। তাহা ছাড়া, এই জ্ঞান হইতে এমন আলোক পাওয়া চাই, যেন গীতার প্রথম ভাগের শেষে যে কথা বলা হইয়াছে তাহার সার্থকতা বুঝিতে পারা যায়। আধ্যাত্মিক চেতনা ও কর্মের অন্য সকল প্রেরণা ও শক্তির উপরে ভক্তির স্থান কেমন করিয়া হয়, এই জ্ঞানের মধ্যেই তাহার সমর্থন পাওয়া যাইবে। এই জ্ঞান হইবে সেই পরমেশ্বরের, সেই সর্বভূতমহেশ্বরের, যাঁহার নিকটে জীব পূর্ণ সমর্পণের সহিত নিজেকে নিবেদন করিতে পারে। এই পূর্ণ আত্ম-নিবেদনই সকল প্রেম ও ভক্তির চূড়ান্ত—গুরু এইরূপ জ্ঞান দিবারই প্রস্তাব সপ্তম অধ্যায়ের শ্লোকগুলিতে করিলেন। এইখান হইতে যে তত্ত্বব্যাখ্যার সূত্রপাত হইল, তাহাই গীতার বাকী অংশে ক্রমশ পরিস্ফুট হইয়াছে। তিনি বলিলেন—"আমাতে

মন লাগাইযা এবং আমাকে আশ্রয কবিয়া (অর্থাৎ আমাকে তোমাব সমস্ত চেতনা ও কর্মেব একমাত্র ভিত্তি ও অবলম্বন কবিযা) যোগ সাধনা কবিলে তুমি সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ হইযা সমগ্রভাবে আমাকে যেমন জানিতে পাবিবে তাহা শ্রবণ কব। কোন কিছু বাকী না বাখিযা, কোন কিছু বাদ না দিযা আমি তোমাকে বিজ্ঞানসহ এমন জ্ঞান বলিব, যাহা জানিলে এখানে তোমাব অবিদিত আব কিছু থাকিবে না।" (সপ্তম অধ্যায় ১—২)। এখানে সমগ্র জ্ঞান দিবাব যে প্রস্তাব কবা হইল, তাহাব তাৎপর্য এই যে, বাসুদেবঃ সর্ব্বম্, ভগবানই সব, অতএব ভগবানকে যদি তাঁহাব সব সত্তায় এবং সব শক্তিতে জানিতে পাবা যায, তাহা হইলে সবই জানা যায। কেবল শুদ্ধ আত্মাকে নহে, পরন্তু জগৎকে, কর্মকে, প্রকৃতিকেও জানা যায। তখন আব এখানে জানিতে বাকী কিছুই থাকে না, কাবণ, সবই সেই ভগবান। আমাদেব জ্ঞান এখানে একরূপ সমগ্র নহে, এখানে জ্ঞান দ্বন্দ্বময মন ও বুদ্ধিব উপব নির্ভব কবে, অহঙ্কারেব দ্বাবা খণ্ডিত হয। কেবল সেই জন্যই মনেব দ্বাবা যাহা আমবা উপলব্ধি করি, তাহা অজ্ঞান ভিন্ন আব কিছু নহে। এই মানসিক দ্বন্দ্ব ও অহঙ্কাব হইতে মুক্ত হইযা আমাদিগকে সত্য অখণ্ড জ্ঞান লাভ কবিতে হইবে, এবং ইহাব দুইটি দিক আছে—জ্ঞান ও বিজ্ঞান। মূল তত্ত্বকে জানা—জ্ঞান, মূলতত্ত্বেব বিকাশকে সর্বতোভাবে জানাই বিজ্ঞান। পবম ভাগবত সত্তাব আধ্যাত্মিক উপলব্ধিই জ্ঞান এবং প্রকৃতি পুরুষ প্রভৃতি রূপে বিশ্বলীলাব মাঝে ভগবানেব যে আত্মপ্রকাশ হইয়াছে, সে সম্বন্ধে নিগূঢ় সত্যজ্ঞানই বিজ্ঞান। ইহাব দ্বাবা যাহা কিছু আছে সকল জিনিসেরই দিব্য উৎপত্তি এবং তাহাদেব প্রকৃতিব চবম সত্য জানিতে পারা যায়। গীতা বলিয়াছে এইরূপ পূর্ণ, সমগ্র জ্ঞান সুদুর্লভ,

মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধযে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ॥৭।৩

"সহস্র মনুষ্যেব মধ্যে ক্বচিৎ দুই একজন সিদ্ধিলাভে যত্নশীল হয। আবাব যাহারা এরূপ যত্ন করে এবং সিদ্ধিলাভ কবে, তাহাদেব মধ্যে ক্বচিৎ দুই একজন তত্ত্বতঃ আমাকে জানে (Knows me in all the principles of my existence)।"

এই সমগ্র জ্ঞানেব ভিত্তিস্বরূপ গীতা প্রথমেই দুই প্রকৃতিব, প্রাতিভাসিক (phenomenal) প্রকৃতি ও আধ্যাত্মিক (spiritual) প্রকৃতির মধ্যে প্রভেদ করিয়াছে। এই প্রভেদেব উপবেই কার্যত গীতাব সমস্ত যোগপ্রণালী প্রতিষ্ঠিত।

ভূমিবাপোঽনলো বাযুঃ খং মনো বুদ্ধিবেব চ।
অহঙ্কাব ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিবষ্টধা॥৭।৪
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পবাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যযেদং ধার্য্যতে জগৎ॥৭।৫

"পঞ্চভূত (জড়সত্তাব পঞ্চ অবস্থা), মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, ইহাই আমার অষ্টধা ভিন্ন প্রকৃতি। ইহা অপবা; কিন্তু, ইহা হইতে বিভিন্ন আমার অন্য এক প্রকৃতি আছে জানিও। তাহা পবা প্রকৃতি। তাহাই জীব হইযাছে এবং এই জগৎকে ধরিযা বাখিযাছে।" তত্ত্ববর্ণনায এইটিই গীতাব প্রথম নূতন কথা। ইহাব সাহায্যেই গীতা সাংখ্য দর্শনেব মত হইতে আবম্ভ করিযাও সাংখ্যকে অতিক্রম করিতে পারিয়াছে; এবং সাংখ্যেব বাক্যগুলিকে বাখিযাও তাহাদেব ব্যাপক ও বৈদান্তিক অর্থ দিতে পাবিযাছে। গীতা যে অষ্টধা প্রকৃতিব বর্ণনা দিযাছে, তাহাতে রহিয়াছে ক্ষিতি আদি পঞ্চভূত, বিভিন্ন ইন্দ্রিয়গণসহ মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কার। গীতাব এই বর্ণনা সাংখ্যেবই প্রকৃতিব বর্ণনা। সাংখ্য এইখানেই থামিযাছে এবং এইখানে থামিযাছে বলিযাই সাংখ্য পুরুষ ও প্রকৃতির মধ্যে অলঙ্ঘ্য ব্যবধান তুলিতে বাধ্য হইয়াছে। সাংখ্যকে বলিতে হইযাছে যে, এই দুইটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন আদি বস্তু primary entities)। গীতাও যদি এইখানে থামিত তাহা হইলে গীতাকেও পুরুষ ও বিশ্বপ্রকৃতিব মধ্যে অনতিক্রমণীয বিরোধ স্বীকার করিতে হইত, এবং তাহা হইলে বিশ্বপ্রকৃতি হইত কেবল ত্রিগুণময়ী মায়া; এবং এই বিশ্বপ্রপঞ্চ হইত কেবল মাযাব খেলা, আব কিছুই নহে। কিন্তু, আবও কিছু আছে—এক উচ্চতর তত্ত্ব, এক আধ্যাত্মিক প্রকৃতি আছে, প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্। ভগবানের এক পরমা প্রকৃতি আছে, তাহাই বিশ্বজগতেব প্রকৃত মূল—আদ্যা সৃজনী শক্তি ও কর্মশক্তি। নীচের অজ্ঞান অপবা প্রকৃতি সেই পবা প্রকৃতি হইতে উদ্ভূত, তাহাবই অন্ধকার ছায়া মাত্র। এই উচ্চতম ক্রিযাস্তবে পুরুষ ও প্রকৃতি এক। সেখানে প্রকৃতি পুরুষেবই সঙ্কল্প ও কার্যসাধিকা শক্তি ভিন্ন আব কিছুই নহে; প্রকৃতি পুরুষেরই সক্রিযতা—পুরুষ হইতে স্বতন্ত্র কোন বস্তু নহে—পুরুষই স্বয়ং শক্তিরূপে আবির্ভূত।

এই পবা প্রকৃতি ভগবানেব শক্তিরূপে কেবল যে বিশ্বলীলাব মধ্যে অনুস্যূতই বহিযাছে তাহা নহে। কারণ, তাহা হইলে যে সর্বব্যাপী আত্মা নিষ্ক্রিয়ভাবে সর্বত্রই বিবাজ কবিতেছে, সকল জিনিসেব মধ্যে রহিয়াছে, সকলকেই ধবিযা আছে, বিশ্বলীলা চলিতে একভাবে বাধ্য করিতেছে অথচ নিজে কিছুই করিতেছে না, সেই নিষ্ক্রিয আত্মাব সহিত এই পবা প্রকৃতির কোন প্রভেদই থাকিত না। এই পরা প্রকৃতি সাংখ্যেব অব্যক্তও নহে, ব্যক্ত অষ্টধা প্রকৃতির আদি অপ্রকাশিত বীজ অবস্থাই সাংখ্যের অব্যক্ত, সাংখ্যের মতে তাহাই প্রকৃতির একমাত্র মূল সৃজনীশক্তি, তাহা হইতেই প্রকৃতিব বিভিন্ন যন্ত্র ও ক্রিযাশক্তিব উদ্ভব। আবাব অব্যক্ত তত্ত্বকে বৈদান্তিক মতে ব্যাখ্যা কবিযা বলিলে চলিবে না যে, অব্যক্ত ব্রহ্ম বা আত্মাব মধ্যে যে শক্তি বদ্ধ ও নিহিত বহিয়াছে, যাহা হইতে বিশ্বের উত্থান হইতেছে, যাহাতে বিশ্বের লয হইতেছে, তাহাই এই পরা প্রকৃতি। পরা প্রকৃতি তাহা বটে, কিন্তু তাহা ছাড়া আবও অনেক অধিক; কারণ সেটি পরাপ্রকৃতির নানা আধ্যাত্মিক অবস্থাব মধ্যে কেবল একটি অবস্থা। আত্মা ও জগতের পশ্চাতে

পরমেশ্বরের যে পূর্ণ চিৎশক্তি বহিয়াছে তাহাই পবা প্রকৃতি। অক্ষব পুরুষে ইহা আত্মাব মধ্যে নিমজ্জিত, ইহা সেখানে বহিযাছে কিন্তু কর্ম করিতেছে না, নিবৃত্তিতে রহিয়াছে। ক্ষর পুরুষে এবং জগতে ইহা কর্মে বহির্গত হইযাছে—প্রবৃত্তি। সেখানে প্রকট শক্তিরূপে থাকিযা উহা আত্মার সত্তাব মধ্যে সর্বভূতেব বিকাশ কবিতেছে এবং তাহাদের মধ্যে তাহাদেব অন্তরতম আধ্যাত্মিক প্রকৃতিরূপে আবির্ভূত হইতেছে, তাহাদেব বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ ঘটনাসমূহেব পশ্চাতে স্থাযী সত্যরূপে বিরাজ করিতেছে। উহাই ভূতসকলেব আবির্ভাবেব মূল গুণ ও শক্তি, তাহাদেব বাহ্যপ্রকাশেব পশ্চাতে অন্তবতম সত্তা এবং দিব্যশক্তি। সত্ত্বাদি গুণেব যে দ্বন্দ্ব তাহা এই পরা প্রকৃতি হইতেই উৎপন্ন নীচেব খেলা, স্থূল খেলা। নামরূপেব এসব খেলা, নীচেব প্রকৃতিব মন, প্রাণ, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধিব খেলা, এসব কেবল প্রাতিভাসিক ঘটনা, phenomenon। ঐ আধ্যাত্মিক শক্তি পশ্চাতে না থাকিলে এই প্রাতিভাসিক ঘটনা কখনই সম্ভব হইত না। ঐ শক্তি হইতেই এসব উঠিযাছে, উহার মধ্যেই বহিয়াছে, এবং কেবল উহাব দ্বাবাই চলিতেছে। আমবা যদি শুধু এই প্রাতিভাসিক প্রকৃতিব (phenomenal nature) মধ্যেই থাকি এবং এই প্রাতিভাসিক প্রকৃতির বস্তুসকলকে যেমন দেখায শুধু তেমনি ভাবেই দেখি তাহা হইলে আমাদের কর্মজীবনের প্রকৃত সত্যটি আমবা ধরিতে পাবিব না। প্রকৃত সত্য হইতেছে এই আধ্যাত্মিক শক্তি, দিব্য প্রকৃতি, সকল বস্তুব অন্তবে এই আধ্যাত্মিক গুণ; অথবা বলা যাইতে পাবে, যে আত্মাব মধ্যে বস্তুসকল বহিযাছে, যাহা হইতে তাহাবা তাহাদের সকল শক্তি এবং কর্মেব বীজ পাইতেছে, ইহা সেই আত্মারই অন্তরতম গুণ। সেই সত্যকে, শক্তিকে, গুণকে যদি আমবা ধবিতে পাবি, তাহা হইলেই আমাদের জীবনযাত্রাব সত্য নিযমটি আমবা ধবিতে পাবিব, আমাদের জীবনের দিব্য নীতিটি ধবিতে পাবিব, কেবল জীবনেব অজ্ঞান খেলায মগ্ন থাকিয়া, জ্ঞানের মধ্যেই ইহাব যে মূল ও সার্থকতা আছে তাহাব সন্ধান পাইব।

এখানে যেভাবে গীতার অর্থ বর্ণনা কবা হইল তাহা আমাদেব বর্তমান চিন্তাধাবার, আধুনিক ধ্যান-ধারণার উপযোগী। কিন্তু, গীতা পবা প্রকৃতিব যেরূপ বর্ণনা দিয়াছে, তাহা অনুধাবন করিলে আমবা বুঝিতে পাবিব যে, গীতা বস্তুত এই কথাই বলিয়াছে। কাবণ, প্রথমত শ্রীকৃষ্ণ বলিযাছেন, এই উপবেব প্রকৃতি আমারই পরা প্রকৃতি, প্রকৃতিম্ মে পবাম্। এখানে "আমি" বলিতে বুঝাইতেছে পুরুষোত্তম, পরমেশ্বর, পরমাত্মা, বিশ্বাতীত এবং বিশ্বব্যাপী আত্মা। এই পবমাত্মাব আদ্যা ও সনাতনী প্রকৃতি এবং ইহাব বিশ্বাতীতা এবং সর্বসৃষ্টিব মূলস্বরূপা শক্তি—ইহাকেই পরা প্রকৃতি বলা হইয়াছে। কারণ, শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে তাঁহাব প্রকৃতির ক্রিয়াশীলা শক্তিব দিক হইতে বিশ্বসৃষ্টির কথা বলিয়াছেন, "এতদ্‌যোনিনী ভূতানি"—এই প্রকৃতি হইতেই সর্বভূতের উৎপত্তি। এবং এই শ্লোকেবই দ্বিতীয় পদে সকল সৃষ্টির মূল আত্মার দিক হইতে বিশ্বসৃষ্টিব কথা বলিযাছেন—"'অহং

কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলযস্তথা' আমিই নিখিল জগতেব উৎপত্তির স্থল, আবাব আমাতেই ইহাব লয় হয়। আমা অপেক্ষা বড়, আমার উপবে আর কিছুই নাই।" অতএব এখানে পবমাত্মা পুরুষোত্তম এবং সর্বোত্তমা প্রকৃতি পরা প্রকৃতিকে একই কবা হইযাছে। এখান হইতে বুঝা যায যে, তাহাবা একই সত্যের কেবল দুইটা দেখিবাব ভঙ্গীমাত্র কাবণ কৃষ্ণ যে বলিলেন—"আমিই জগতের উৎপত্তিব স্থান, লযেরও স্থান", তাঁহাব পবা প্রকৃতিই যে এই দুই স্থান তাহা বেশ বুঝা যায়। ভগবান তাঁহাব অনন্ত চেতনাস্বরূপেই পবমাত্মা এবং পবমাত্মাব অনন্ত শক্তি ও ইচ্ছাই পবা প্রকৃতি—পবমাত্মা তাঁহাব অনন্ত চেতনার অন্তর্গত দিব্য তেজ এবং দিব্য কর্ম স্বরূপেই পবা প্রকৃতি। পবমাত্মার মধ্য হইতে এই চিৎশক্তিব বিবর্তন ও বিকাশ (the movement of evolution), পরা প্রকৃতি জীবভূতা, ক্ষর জগতে ইহাব লীলা—ইহাই সৃষ্টি, প্রভবঃ; ক্রিয়াশক্তির প্রত্যাহারে অক্ষবেব মধ্যে এই লীলাব সংহবণ, পরমাত্মাব আত্মস্থ শক্তিতে অবস্থান—ইহাই প্রলয। তাহা হইলে পবা প্রকৃতি বলিতে প্রথমত ইহাই বুঝাইতেছে।

অতএব পবা প্রকৃতি হইতেছে অনাদি ভাগবত সত্তাব সেই অনন্ত কালাতীত চিৎশক্তি, যাহা হইতে জগতের যাবতীয বস্তু প্রকাশিত হইযাছে এবং কালাতীত অবস্থা হইতে কালেব মধ্যে বাহির হইযাছে। কিন্তু জগতে এই বিচিত্র বহুমুখী বিশ্বলীলাকে ধাবণ কবিবার জন্য অধ্যাত্ম সত্তাব প্রযোজন; তাই পরা প্রকৃতি জীবরূপে আবির্ভূত হইয়াছে, জীবভূতা যযেদং ধার্য্যতে জগৎ। ইহাই অন্যভাবে বলা যায, পুরুষোত্তমেব সনাতন বহুধা আত্মা জগতে সমস্ত নামরূপেব মধ্যে ব্যক্তিগত অধ্যাত্ম সত্তারূপে আবির্ভূত হইযাছে। এক অখণ্ড পবমাত্মার জীবনেই জগতেব যাবতীয বস্তু অনুপ্রাণিত। সেই এক পুরুষের সনাতন বহুত্বই সকলের ব্যক্তিত্ব, কর্ম ও নামরূপকে ধাবণ কবিযা রহিয়াছে। আমাদিগকে সতর্ক হইতে হইবে যেন আমবা না ভাবি যে, কালের মধ্যে যে জীব প্রকাশিত হইয়াছে তাহা এবং পবা প্রকৃতি এমনভাবে এক যে পরা প্রকৃতি জীব ভিন্ন আর কিছুই নহে; উহা শুধুই প্রকাশস্বরূপ কিন্তু সৎস্বরূপ নহে। পবমাত্মার পবা প্রকৃতি কখনও এই প্রকাব হইতে পাবে না। কালের মধ্যে যখন প্রকাশের লীলা চলিতেছে তখনও পবা প্রকৃতি ইহা অপেক্ষা আরও বেশী কিছু; নতুবা জগতে উহাব সত্তা কেবল বহুধাই হইত, জগতে একত্বের স্বরূপ থাকিত না। গীতা তাহা বলে নাই; গীতা বলে নাই যে, পবা প্রকৃতি তাহাব মূল সত্তায় জীব, জীবাত্মকম্। গীতা বলিয়াছে, পবা প্রকৃতি জীব হইযাছে, জীবভূতাম্, এবং এই কথা হইতেই বুঝা যায় যে, জীবরূপে আবির্ভাবেব পশ্চাতে পবা প্রকৃতি মূলত আবও কিছু, আরও উচ্চ সত্তা—ইহা এক পবম আত্মাবই স্বরূপ। পরে বলা হইবে যে, জীব ঈশ্বর, কিন্তু আংশিক প্রকাশরূপে ঈশ্বব, মমৈবাংশঃ। এমনকি জগতে যত জীব রহিয়াছে কিংবা অসংখ্য জগতে যত অসংখ্য জীব বহিযাছে, সেই সব মিলিযাও পূর্ণ ভগবান নহে—তাহাবা কেবলমাত্র সেই এক অনন্তেব আংশিক প্রকাশ। তাহাদের

মধ্যে এক অবিভক্ত ব্রহ্ম যেন বিভক্ত হইয়া বিরাজ করিতেছেন—অবিভক্তং ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্। একত্ব উচ্চতর সত্য, বহুত্ব তাহার নীচের সত্য, যদিও উভয়েই সত্য এবং উভয়ের কোনটাই মিথ্যা ভ্রম নহে।

এই অধ্যাত্ম প্রকৃতির একত্বের দ্বারাই জগৎ বিধৃত, যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ—যেমন ইহা হইতেই সর্বভূতসহ জগতের উৎপত্তিও হইয়াছে, এতদ্‌যোনিনী ভূতানি, এবং ইহাই প্রলয়কালের সর্বভূতসহ সমগ্র জগৎকে নিজের মধ্যে টানিয়া লয়—অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা। কিন্তু পরমাত্মার মধ্যে এই যে সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের লীলা চলিতেছে, এই লীলায় জীবই বহুত্বের ভিত্তি। ইহাকে বহুধা আত্মা বলিতে পারা যায়। অথবা জগতে আমরা যে বহুত্ব দেখিতে পাই, জীবই তাঁহার আত্মা—ইহা বলিলেই বোধ হয় আরও ভাল হয়। এই জীব মূল সত্তায় সকল সময়েই ভগবানের সহিত এক, কেবল শক্তিতেই ইহা ভগবান হইতে বিভিন্ন, বিভিন্ন বলিতে ইহা বুঝায় না যে, জীব আদৌ ঐ শক্তি নহে, পরন্তু কেবল ইহাই বুঝায় যে, জীব সেই একই শক্তিকে আংশিক বহুধা ব্যষ্টিগত ক্রিয়ায় ধরিয়া আছে। অতএব সকল বস্তু আদিতে অন্তে এবং স্থিতিকালেও সেই পরমাত্মা। সকলেরই মূল প্রকৃতি পরমাত্মার প্রকৃতি। কেবল নীচের বিশেষাত্মক খেলাতেই মনে হয় যেন তাহারা পরমাত্মা হইতে বিভিন্ন, মনে হয় শরীর, প্রাণ, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার এবং ইন্দ্রিয়গণই বুঝি তাহাদের প্রকৃত স্বরূপ। কিন্তু, এসব বাহিরের গৌণ প্রকাশমাত্র—ইহারা আমাদের প্রকৃতির এবং আমাদের জীবনের নিগূঢ় সত্য নহে।

তাহা হইলে ভগবানের পরা প্রকৃতি বিশ্বের অতীতে সত্তার মূল সত্য ও শক্তি, আবার সেই পরা প্রকৃতিই বিশ্বমাঝে প্রকাশলীলার মূল ভিত্তিস্বরূপ অধ্যাত্ম সত্য। কিন্তু তাহা হইলে এই পরা প্রকৃতির সহিত নীচের প্রাতিভাসিক প্রকৃতির, অপরা প্রকৃতির সম্বন্ধের সূত্র কোথায়? কৃষ্ণ বলিলেন, এসব, এখানে যাহা কিছু আছে সে সমুদায়ই, আমাতে সূত্রে মণিগণের ন্যায় গ্রথিত, ময়ি সর্ব্বমিদং[১] প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব। কিন্তু ইহা কেবল একটি উপমা, ইহাকে বেশী টানা চলে না; কারণ, মণিগণ সূত্রের দ্বারা একসঙ্গে গ্রথিত থাকে মাত্র। সূত্রের সহিত তাহাদের একত্ব বা অন্য কোন সম্বন্ধ নাই, কেবল সেইটিকে অবলম্বন করিয়া মণিগণ পরস্পরের সহিত সংযুক্ত হইয়া রহিয়াছে। অতএব উপমা ছাড়িয়া দিয়া মূল জিনিসটিকে বুঝিবার চেষ্টা করা যাক। পরমাত্মার পরা প্রকৃতি, তাঁহার সত্তার অনন্ত চিৎশক্তি, যাহা আত্মবিদ্, সর্ববিদ্, সর্বজ্ঞ, তাহাই এই প্রাতিভাসিক জগতের বস্তুসকলকে পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ করিয়া রাখিয়াছে, তাহাদের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে, তাহাদের মধ্যে থাকিয়া, তাহাদিগকে ধরিয়া সকলকে একত্র সাজাইয়া এই বিশ্বপ্রপঞ্চ নির্মাণ করিয়াছে। এই এক পরা শক্তি সকলের মধ্যে যে এক পরম

[১] জগৎলীলায় যাহা প্রকাশিত হইয়াছে, সমগ্রভাবে সেই সমুদায়কে বুঝাইতে উপনিষদে 'সর্ব্বমিদং' এই বাক্য ব্যবহৃত হইয়াছে।

সত্তারূপে আবির্ভূত হয় কেবল তাহাই নহে; পরন্তু প্রত্যেকের মধ্যে জীবরূপে, ব্যষ্টিগত অধ্যাত্ম সত্তারূপে আবির্ভূত হয়, আবার প্রকৃতির সকল গুণের সার সত্তারূপেও আবির্ভূত হয়। তাহা হইলে সকল ব্যক্ত রূপের পশ্চাতে ইহারাই গুপ্ত অধ্যাত্ম শক্তি। এই সর্বোত্তম গুণ ত্রিগুণের ক্রিয়া নহে; ত্রিগুণের খেলা গুণের অভিব্যক্তি মাত্র, ইহার আধ্যাত্মিক সারবত্তা নহে। বস্তুত ইহা হইতেছে এই সব বাহ্যিক বৈচিত্র্যের অন্তর্নিহিত, এক অথচ বৈচিত্র্যশীল আভ্যন্তরীণ শক্তি। প্রকটনের ইহাই মূল সত্য। এই সত্যই সকল ব্যক্ত রূপকে ধরিয়া আছে; এবং সকলকে আধ্যাত্মিক ও দিব্য সার্থকতা প্রদান করিতেছে। ত্রিগুণের ক্রিয়া, বুদ্ধি, মন, ইন্দ্রিয়, অহঙ্কার, প্রাণ ও জড়দেহের বাহ্যিক চঞ্চল ক্রিয়া ভিন্ন আর কিছুই নহে, সাত্ত্বিকা ভাবা রাজস্যস্তামসাশ্চ, কিন্তু ইহা হইতেছে প্রকটনের সার স্থির মূল নিগূঢ় শক্তি—স্বভাব। সকল প্রকটনের এবং প্রত্যেক জীবের মূল ধর্ম, স্বধর্ম, ইহার দ্বারাই নির্ণীত হয়, ইহাই জীব প্রকৃতির মূল সত্তা এবং ইহাই তাহার ক্রিয়ার বিকাশ করে। প্রত্যেক জীবের মধ্যে যে তত্ত্ব ভগবানের বিশ্বাতীত আত্মপ্রকাশ (মদ্ভাবঃ) হইতে উৎপন্ন এবং তাহার সহিত সাক্ষাৎভাবে সম্বন্ধযুক্ত, তাহাই এই। দিব্য ভাবের সহিত স্বভাবের এই সম্বন্ধ এবং স্বভাবের সহিত বাহ্যিক ভাবের সম্বন্ধ, দিব্য প্রকৃতির সহিত ব্যষ্টিগত অধ্যাত্ম প্রকৃতির সম্বন্ধ এবং শুদ্ধ মূল স্বরূপে ব্যষ্টিগত অধ্যাত্ম প্রকৃতির সহিত গুণত্রয়ের মিশ্রিত খেলা ও দ্বন্দ্বযুক্ত প্রাতিভাসিক প্রকৃতির সম্বন্ধ, এইখানেই আমরা উপরের দিব্য জীবন এবং নীচের প্রাকৃত জীবনের সম্বন্ধসূত্র দেখিতে পাই। নীচের প্রকৃতির হীন শক্তি ও সম্পদসমূহ পরা প্রকৃতির মহান শক্তি ও সম্পদসমূহ হইতেই উৎপন্ন এবং সেইখানেই তাহাদিগকে ফিরিয়া যাইতে হইবে, তবে তাহারা নিজেদের মূল ও সত্যের সন্ধান পাইবে, নিজেদের কর্মের নিগূঢ় নীতির সন্ধান পাইবে। সেইরকম, জীব যে ত্রিগুণের শৃঙ্খলিত, ক্ষুদ্র, নীচ খেলায় বদ্ধ হইয়া রহিয়াছে, তাহা হইতে যদি—সে মুক্ত হইতে চায় এবং দিব্য ও সিদ্ধ হইতে চায়, তাহা হইলে তাহার স্বভাবের মূল গুণকে অনুসরণ করিয়া তাহাকে তাহার নিজ সত্তার সেই উপরের ধর্মে ফিরিয়া যাইতেই হইবে, সেখানে সে তাহার দিব্য প্রকৃতির ইচ্ছা, শক্তি, সক্রিয়তা ও সর্বোত্তম বিকাশের সন্ধান পাইবে।

ঠিক পরের শ্লোকগুলিতে এই কথাই আরও স্পষ্ট হইয়াছে। সেখানে গীতা কতকগুলি দৃষ্টান্ত দিয়া দেখাইয়াছে, ভগবান জগতের সজীব এবং তথাকথিত নির্জীব পদার্থসমূহের মধ্যে নিজের পরা প্রকৃতির শক্তিতে কিভাবে আবির্ভূত হন। শ্লোকে ছন্দোবদ্ধভাবে প্রকাশ করিতে হইয়াছে বলিয়া সেগুলি ঠিক যুক্তিমত পরপর উল্লিখিত হয় নাই। এখানে আমরা সেগুলিকে যথার্থ ক্রমে সাজাইয়া দিতেছি। প্রথমত, দিব্যশক্তি ও দিব্যসত্তা পঞ্চভূতের মধ্যে, অর্থাৎ জড়ের পঞ্চ মূল অবস্থার মধ্যে আবির্ভূত হইয়া কাজ করিতেছে। "আমি জলে রস, আকাশে শব্দ, পৃথিবীতে গন্ধ, অগ্নিতে তেজ", এবং আমরা এখানে যোগ করিয়া দিতে

পারি, বায়ুতে স্পর্শ। ইহার তাৎপর্য এই যে, পঞ্চভূত[১] যে রূপরসাদি ইন্দ্রিয়ানুভূতির জড় আশ্রয়, স্বয়ং ভগবান নিজের পরা প্রকৃতিতে সেই সকল ইন্দ্রিয়ানুভূতির মূল শক্তি। জড়ের পাঁচটি মূল অবস্থা পঞ্চভূত। ইহারাই নীচের প্রকৃতিতে বস্তুস্বরূপ এবং ইহারাই জড়ের আকারভেদের আশ্রয়স্থল। পঞ্চ তন্মাত্র—রস, স্পর্শ, গন্ধ ইত্যাদি ইহার গুণস্বরূপ। এই তন্মাত্রগুলি সূক্ষ্ম শক্তি। ইহাদের ক্রিয়ার দ্বারাই ইন্দ্রিয়-চৈতন্য জড়বস্তুসমূহের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হয়। প্রাতিভাসিক জগৎ সম্বন্ধে সকল জ্ঞান ও অনুভূতির ইহারাই ভিত্তি। জড়বাদ অনুসারে জড়ই সদ্‌বস্তু, এবং ইন্দ্রিয়ানুভূতি জড় হইতেই উৎপন্ন। কিন্তু অধ্যাত্মবাদ অনুসারে ইহার উল্টাটাই সত্য। জড়বস্তু এবং জড়-আধার ইহারা নিজেই উদ্ভূত শক্তি। জীবের ইন্দ্রিয়ানুভূতির নিকট প্রকৃতির গুণসমূহের ক্রিয়া যে স্থূলভাবে প্রকট হয়, জড় মূলত সেই স্থূলভাব বা অবস্থা ভিন্ন আর কিছুই নহে। এক মূল সনাতন সত্য হইতেছে প্রকৃতির শক্তি। তাহাই ইন্দ্রিয়ানুভূতির ভিতর দিয়া জীবাত্মার সম্মুখে নানারূপে প্রকট হয়। আবার ইন্দ্রিয়েরও যে সার শক্তি, গভীরতম আধ্যাত্মিক শক্তি, সূক্ষ্মতম শক্তি, তাহাও ঐ সনাতন শক্তিরই অংশ ভিন্ন আর কিছুই নহে। কিন্তু প্রকৃতির যে শক্তি নিজ প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত স্বয়ং ভগবানই সেই শক্তি; অতএব প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ই শুদ্ধ সত্তায় সেই ভাগবত প্রকৃতি—ভগবানই তাঁহার নিজ সক্রিয় চৈতন্যশক্তিতে প্রত্যেক ইন্দ্রিয় হইয়াছেন।

এই শ্রেণীতে উল্লিখিত অন্যান্য বস্তু হইতে ইহা আরও স্পষ্ট বুঝা যায়। "আমি চন্দ্র ও সূর্যের প্রভা, মানুষের পৌরুষ, বুদ্ধিমানের বুদ্ধি, তেজস্বীর তেজ, বলবানদের বল, তপস্বীর তপঃশক্তি।" "আমি সর্বভূতের জীবন।" এই সকল বস্তু যাহা হইয়াছে, তাহা হইবার জন্য শক্তির যে মূল গুণের উপরে উহারা নির্ভর করে, প্রত্যেক ক্ষেত্রে সেই শক্তিকেই নির্দেশ করিয়া বলা হইয়াছে যে, তাহাদের প্রকৃতিতে ভাগবত শক্তির অধিষ্ঠানের ঐটিই স্বরূপ লক্ষণ। আবার, "আমি সর্ববেদে প্রণব" অর্থাৎ মূলশব্দ ওঁ। এই ওঁকারই শ্রুতির সকল শক্তিশালী সৃজনক্ষম শব্দের মূল ভিত্তি; শব্দ ও বাক্যের যে শক্তি তাহারই সর্বসাধারণ রূপটি হইতেছে ওঁ। এই ওঁকারের মধ্যে বাক্ ও শব্দের সমস্ত আধ্যাত্মিক শক্তি ও বিকাশ-সম্ভাবনা সংক্ষেপে নিহিত রহিয়াছে। অন্যান্য যেসব শব্দ ভাষার উপাদান, সে সকল এই মূল ওঁকারেরই ক্রমবিকাশ হইতে উৎপন্ন বলিয়া অনুমান করা হয়। এইবার কথাটি খুব পরিষ্কার হইল; ইন্দ্রিয়গণের বা জীবনের বা জ্যোতির, বুদ্ধি, তেজ, বল, পৌরুষ বা তপঃশক্তির যে বাহ্য ব্যক্ত ভাব ও বিকাশ, তাহা পরা প্রকৃতির প্রকৃত স্বরূপ নহে। মূল গুণের যে আধ্যাত্মিক শক্তিকে লইয়া স্ব-ভাব,

[১] প্রাচীন সাংখ্যদর্শনের মতে জড়ের পাঁচটি মূল অবস্থা (elemental or essential conditions)—সূক্ষ্ম (ethereal), জ্যোতির্ময় (radiant), বায়বীয় (gaseous), তরল (liquid) কঠিন (solid)—ইহাদিগকেই যথাক্রমে পঞ্চভূত নাম দেওয়া হইয়াছে—আকাশ, অগ্নি, বায়ু, জল ও পৃথিবী। সাংখ্যমতে এই পঞ্চভূতই রূপ, রস প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ানুভূতির জড় আশ্রয় (physical medium)।

তাহাই পরা প্রকৃতির প্রকৃত স্বরূপ। আত্মার যে শক্তি এইভাবে ব্যক্ত হইয়াছে, আত্মার চেতনার যে জ্যোতি এবং ব্যক্ত জিনিসে ইহার তেজের যে শক্তি, তাহাই মূল শুদ্ধ লক্ষণে হইতেছে অধ্যাত্ম প্রকৃতি। সেই শক্তি, জ্যোতিই সনাতন বীজ, তাহা হইতেই আর সব জিনিস উদ্ভূত ও বিকশিত হইয়াছে—আর সব জিনিস তাহারই বিচিত্র লীলা। অতএব গীতা খুব সাধারণভাবে বলিয়াছে, বীজং মাং সর্ব্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্—"হে পৃথার পুত্র, আমাকেই সর্ব্বভূতের সনাতন বীজ বলিয়া জানিও।" এই সনাতন বীজ আত্মার শক্তি, আত্মাতে সচেতন ইচ্ছা, ভগবান এই বীজ মহদ্‌ব্রহ্মে নিক্ষেপ করেন এবং তাহা হইতেই সর্বভূতের আবির্ভাব হয়। আত্মার এই বীজই সর্বভূতের মূল গুণরূপে আবির্ভূত হয় এবং তাহাদের স্বভাব হয়।

মূল গুণের এই আদি শক্তির সহিত নীচের প্রকৃতিতে উদ্ভূত ব্যক্ত রূপের যে প্রভেদ, বস্তু শুদ্ধ স্বরূপে যাহা (the thing in itself) এবং নিম্নস্তরক্রমে উহা যেরূপ দেখায় (the thing in the lower appearance), এই দুয়ের যে প্রভেদ, তাহাই শেষকালে অতি স্পষ্টভাবেই দেখান হইয়াছে—বলং বলবতামস্মি কামরাগবিবর্জিতম্—"বলবানদিগের কাম ও আসক্তিবর্জিত বল আমি।" ধর্ম্মাবিরুদ্ধো ভূতেষু কামোঽস্মি ভরতর্ষভ—"জীবগণের মধ্যে যে কাম তাহাদের ধর্মের বিরুদ্ধে নহে, আমিই সেই কাম।" আর উপরের প্রকৃতি হইতে যেসকল জিনিস নীচের প্রকৃতিতে আবির্ভূত হইয়াছে, ভাবাঃ (মনের ভাব, বাসনার অনুরাগ, বিপুর প্রেরণা, ইন্দ্রিয়গণের বিষয়ের উপর প্রতিক্রিয়া, বুদ্ধির সীমাবদ্ধ ও দ্বন্দ্বময় খেলা, হৃদয়ের নানা অনুভূতি এবং পাপ পুণ্য বিবেক), যে সকল ভাব সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক, এই যে সব ত্রিগুণের খেলা, গীতা বলিয়াছে, তাহারাই পরা আধ্যাত্মিক প্রকৃতির স্বরূপের খেলা নহে, কিন্তু তাহা হইতে উদ্ভূত; "মত্ত এব," আমা হইতেই যে তাহাদের উৎপত্তি তাহা সত্য, তাহারা অন্য কোথাও হইতে আসে নাই, তবে ন ত্বহং তেষু তে ময়ি, আমি তাহাদের মধ্যে নাই, তাহারাই আমার মধ্যে রহিয়াছে। তাহা হইলে এখানে একটা বেশ প্রভেদ দেখা যাইতেছে, যদিও উহা খুবই সূক্ষ্ম। ভগবান বলিলেন, "আমিই মূল জ্যোতি, তেজ, কাম, বল, বুদ্ধি। কিন্তু, এই সব হইতে নীচের প্রকৃতিতে যাহা উদ্ভূত হইয়াছে আমি মূলসত্তায় তাহা নই এবং তাহাদের মধ্যেও আমি নাই। তবে তাহারা সকলেই আমা হইতে উদ্ভূত এবং আমার সত্তার মধ্যেই রহিয়াছে।" অতএব এই কথাগুলির উপরে নির্ভর করিয়াই আমাদিগকে বুঝিতে হইবে, উপরের প্রকৃতি হইতে সব জিনিস নীচের প্রকৃতিতে কেমন করিয়া আসে, আবার নীচের প্রকৃতি হইতে কেমন করিয়াই বা উপরের প্রকৃতিতে ফিরিয়া যায়।

প্রথম কথাটিতে কোন গোলমাল নাই। বলবান পুরুষের যে বল তাহার স্বরূপ মূলত দিব্য, তাহা সত্ত্বেও ঐ পুরুষ কাম ও আসক্তির অধীন হইয়া পড়ে, পাপে পতিত হয় এবং সংগ্রাম করিতে করিতে পুণ্যের দিকে অগ্রসর হয়। কিন্তু, এরূপ

যে হয় তাহার কারণ সে তাহার সকল বাহ্য ক্রিয়ায় ত্রিগুণের কবলে নামিয়া পড়ে, উপর হইতে, নিজের মূল দিব্য প্রকৃতি হইতে সেই ক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রিত করে না। তাহার এই সব নীচের খেলার জন্য তাহার শক্তির দিব্যস্বরূপের কোনই হানি হয় না। সমস্ত অজ্ঞান, মোহ, সমস্ত স্খলন সত্ত্বেও মূলত তাহা ঠিক একই কথা। তাহার সেই দিব্য প্রকৃতিতে ভগবান অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন। যতক্ষণ না সে পুনরায় জ্ঞানলাভ করিতে পারে, নিজের সত্তার প্রকৃত সূর্যালোকে তাহার সমস্ত জীবনকে আলোকিত করিতে এবং তাহার উপরের প্রকৃতিতে অবস্থিত ভাগবত ইচ্ছার শুদ্ধ শক্তির দ্বারা তাহার ইচ্ছা এবং কর্মসকলকে নিয়ন্ত্রিত করিতে সমর্থ হয়, ততক্ষণ তিনিই নিজের শক্তির দ্বারা তাহাকে তাহার নীচের জীবনের সমস্ত বিশৃঙ্খলার মধ্যে ধরিয়া রহিয়াছেন, রক্ষা করিতেছেন। কিন্তু, ভগবান কেমন করিয়া কাম হইতে পারেন? এই কামকেই যে বলা হইয়াছে আমাদের একমাত্র পরম শত্রু, ইহাকে বধ করিতেই হইবে! কিন্তু, সে কাম হইতেছে ত্রিগুণময়ী নীচের প্রকৃতির কাম। তাহার উৎপত্তি হইতেছে রজঃ গুণ হইতে—রজোগুণসমুদ্ভবঃ; কারণ কাম বলিতে সচরাচর আমরা এইটিকেই বুঝি। কিন্তু অপরটি আধ্যাত্মিক। সে কাম বা ইচ্ছা ধর্মের বিরুদ্ধ নহে।

আধ্যাত্মিক কাম বলিতে কি বুঝিতে হইবে পুণ্য কামনা, নীতিধর্মের অনুযায়ী সাত্ত্বিক[১] কামনা? কিন্তু, তাহা হইলে এখানে একটা স্পষ্ট বিরোধ হয়, কারণ, পরের ছত্রেই বলা হইয়াছে যে, সাত্ত্বিকভাবসকল দিব্যভাব নহে তাহারা শুধু নীচের খেলা। অবশ্য পাপকে বর্জন করিতেই হইবে নতুবা কেহ ভগবানের ধার পর্যন্তও যাইতে পারিবে না, কিন্তু, তেমনই পুণ্যেরও উপরে উঠিতে হইবে, নতুবা আমরা ভাগবত সত্তায় প্রবেশলাভ করিতে পারিব না। সাত্ত্বিক প্রকৃতি লাভ করিতে হইবে, কিন্তু তাহার পর ইহারও উপরে উঠিতে হইবে। নীতিধর্মের অনুযায়ী কর্ম আত্মশুদ্ধির কেবল একটা উপায় মাত্র, ইহার দ্বারা আমরা দিব্য প্রকৃতির দিকে উঠিতে পারি, কিন্তু সেই প্রকৃতি নিজে পাপপুণ্য সকল দ্বন্দ্বের অতীত—বাস্তবিক তাহা না হইলে যে শক্তিমান পুরুষ রাজসিক কাম-ক্রোধের অধীন হইয়া পড়িয়াছে তাহার মধ্যে কোন খাঁটি দিব্য সত্তা, বা দিব্য শক্তি থাকিতেই পারিত না। ধর্মের যে আধ্যাত্মিক অর্থ তাহাতে উহা নৈতিকতা বা নীতিধর্ম হইতে স্বতন্ত্র জিনিস। গীতা অন্যত্র বলিয়াছে, স্বভাবের দ্বারা, স্বপ্রকৃতির মূলনীতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত যে কর্ম, স্বভাবনিয়তং কর্ম্ম, তাহাই ধর্ম। আর এই স্বভাব মূলত আত্মারই শুদ্ধ গুণ। আত্মার অন্তর্নিহিত যে সজ্ঞান ইচ্ছা এবং নিজস্ব কর্মশক্তি তাহারই ভাব, স্বভাব। অতএব গীতা এখানে যে কামের কথা বলিয়াছে তাহা আমাদের মধ্যে ভগবানেরই নিজ উদ্দেশ্যসিদ্ধির ইচ্ছা, তাহা নীচের প্রকৃতির ভোগসুখের লালসা নহে, তাহা ভগবানেরই লীলার আনন্দের, আত্মপ্রকাশের

[১] কারণ পুণ্য সকল সময়েই মূলত এবং কার্যত সাত্ত্বিক।

আনন্দের সন্ধান। জীবনলীলার যে দিব্য আনন্দ স্বভাবের নিয়ম অনুসারে নিজস্ব সজ্ঞান কর্মশক্তিকে প্রকট করিতে চাহিতেছে, ইহা সেই দিব্য আনন্দের কামনা।

কিন্তু তাহা হইলে আবার একথা বলার অর্থ কি যে, নীচের প্রকৃতির ভাব, রূপ, বিকারসকলের মধ্যে ভগবান নাই, এমনকি সাত্ত্বিক ভাবের মধ্যেও ভগবান নাই, যদিও সেসব ভগবানের মধ্যেই রহিয়াছে, ন ত্বহং তেষু তে ময়ি? ভগবান যে কোন না কোন ভাবে এই সবের মধ্যেই রহিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই, নতুবা তাহাদের অস্তিত্বই সম্ভব হইত না। এখানে কেবল ইহাই বুঝাইতেছে যে, ভগবানের যে সত্য পরা অধ্যাত্ম প্রকৃতি, তাহা এই সবের মধ্যে আবদ্ধ নহে; এসব কেবল প্রাতিভাসিক ব্যাপার, অহঙ্কার ও অজ্ঞানের ক্রিয়ার দ্বারা তাঁহার মধ্যে তাঁহার সত্তা হইতেই সৃষ্ট হইয়াছে। অজ্ঞান আমাদিগকে প্রত্যেক জিনিস উল্টাভাবে দেখায় এবং এমন অনুভূতি উপলব্ধি দেয় যাহা অন্তত কতকটা বিকৃত। আমরা মনে করি যে, জীবাত্মা শরীরের মধ্যে রহিয়াছে, যেন উহা শরীরেরই পরিণাম এবং শরীর হইতেই উৎপন্ন, আমাদের অনুভূতিও এইরূপই হয়। কিন্তু বস্তুত শরীরই জীবাত্মার মধ্যে রহিয়াছে, শরীর আত্মার পরিণাম, আত্মা হইতেই উদ্ভূত। আমরা মনে করি, এই বিশাল জড়জগৎ ও মনোজগতের মধ্যে আত্মা যেন আমাদেরই একটা ক্ষুদ্র অংশ, অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ পুরুষ। কিন্তু বস্তুত জগৎটা যত বড়ই দেখাক না কেন, আত্মার অনন্ত সত্তার মধ্যে উহা একটা ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র জিনিস। এখানেও তাই, অনেকটা ঠিক এইভাবেই এই সব জিনিস ভগবানের মধ্যে রহিয়াছে, পরন্তু ভগবান ইহাদের মধ্যে নাই। এই যে ত্রিগুণময়ী নীচের প্রকৃতি ত্রিগুণসকলকে এইরূপ মিথ্যাভাবে দেখায় এবং তাহাদের স্বরূপকে হীন করিয়া দেয় ইহা মায়া, একটা ভ্রমোৎপাদিকা শক্তি; তাই বলিয়া বুঝায় না যে, এসবের কোন অস্তিত্বই নাই, এসবই মিথ্যা। কথা এই যে, ইহা আমাদের জ্ঞানকে বিভ্রান্ত করে, জিনিসের প্রকৃত মূল্য বুঝিতে দেয় না, আমাদিগকে অহঙ্কার, মন, ইন্দ্রিয়, দেহ, খণ্ডিত বুদ্ধির মধ্যে ঢাকিয়া রাখে, আমাদের জীবনের পরম সত্য আমাদের নিকট হইতে লুকাইয়া রাখে। আমরা যে দিব্য অনন্ত অক্ষয় আত্মা, মায়া তাহা আমাদের নিকট হইতে লুকাইয়া রাখে।

ত্রিভির্গুণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্ব্বমিদং জগৎ।
মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্॥৭।১৩

"এই ত্রিবিধ গুণময় ভাবসকলের দ্বারা সমস্ত জগৎ বিভ্রান্ত হয়, এবং ইহাদের অতীত পরম অক্ষয় বস্তু আমাকে চিনিতে পারে না।" যদি আমরা দেখিতে পাইতাম যে, ভগবানই আমাদের জীবনের প্রকৃত সত্য, তাহা হইলে আর সবকেই আমরা ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখিতাম, তাহাদের প্রকৃত সত্য আমাদের নিকট ধরা পড়িত এবং আমাদের জীবন ও কর্ম দিব্যভাব প্রাপ্ত হইত, দিব্যপ্রকৃতির নীতি অনুসারে পরিচালিত হইত।

কিন্তু যাহাই হউক, ভগবান এবং ভাগবত প্রকৃতি যখন এই সকল বিভ্রান্ত ব্যাপারেব মূলে রহিয়াছেন, যখন আমবাই জীব এবং জীবই সেই, তাহা হইলে এই মায়াকে অতিক্রম করা এত কঠিন কেন—মাযা দূবত্যয়া? ইহাব কারণ এই যে, এই মায়া ভগবানেরই মায়া, দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া, "এই গুণময়ী মাযা আমারই দৈবী মায়া।" ইহা নিজে দিব্য এবং ভগবানেব প্রকৃতি হইতে বিকশিত, কিন্তু দেবতারূপী ভগবানেব প্রকৃতি হইতে; ইহা দৈবী, দেবতাদের, অথবা বলিতে পাব, দেবতাব; কিন্তু দেবতাব যে দ্বন্দ্বময নীচেব জাগতিক খেলা, সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক ইহা তাহাই। এই জাগতিক মাযাব আববণ দেবতা আমাদেব বুদ্ধিব চারিদিকে বেষ্টন কবিয়াছেন, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র এই আববণেব জটিল সূত্র বয়ন করিয়াছেন; শক্তি, পবা প্রকৃতি ইহাব ভিত্তি এবং ইহাব প্রত্যেক অংশে অনুস্যূত বহিয়াছে। আমাদিগকে আমাদের মধ্যে এই মাযাব জাল খুলিতে হইবে, ইহার প্রয়োজন শেষ হইলে ইহাকে ভেদ করিযা, ইহাকে ছাড়িয়া, পিছনে ফেলিযা, দেবতাদিগকে ছাড়াইযা সেই এক দেবাদিদেব পবমেশ্বরের দিকে ফিবিতে হইবে। তাঁহার মধ্যে আমরা দেবতাগণেব এবং তাঁহাদেব কার্যেব চবম সার্থকতাব সন্ধান পাইব এবং আমাদেব অক্ষয জীবনেরও অন্তবতম আধ্যাত্মিক সত্যসকলেব সন্ধান পাইব।

"মামেব যে প্রপদ্যন্তে মাযামেতাং তবন্তি তে।"৭।১৪

"আমার দিকে যাহারা ফিবিযা আসে কেবল তাহাবাই এই মাযা অতিক্রম করিতে পারে।"

দ্বিতীয অধ্যায

ভক্তি ও জ্ঞানের সমন্বয়*

গীতায প্রসঙ্গক্রমে বহু দার্শনিক তত্ত্ব স্থান পাইয়াছে বটে, কিন্তু গীতা দার্শনিক তত্ত্বালোচনাব গ্রন্থ নহে, কাবণ, গীতাতে শুধু আলোচনাব জন্যই কোন তত্ত্বেব অবতারণা কবা হয় নাই। গীতা শ্রেষ্ঠ সত্যের সন্ধান করিযাছে, যেন তাহা শ্রেষ্ঠ কাজে লাগান যাইতে পাবে; কেবল তর্কবুদ্ধি বা আধ্যাত্মিক জ্ঞানপিপাসার তৃপ্তিব জন্য নহে, কিন্তু যেন ঐ সত্য আমাদিগকে উদ্ধার করিতে পারে, আমাদের বর্তমান মবজীবনেব অপূর্ণতা হইতে আমাদিগকে মৃত্যুহীন পূর্ণতাব মধ্যে লইয়া যাইতে পাবে। অতএব এই (সপ্তম) অধ্যায়েব প্রথম চতুর্দশ শ্লোকে আমাদের পক্ষে প্রযোজনীয একটি মূল দার্শনিক সত্যেব বর্ণনা করিযা, ইহার পরেই ষোলটি শ্লোকে উহাব প্রযোগ কবিতে অগ্রসব হইয়াছে। এই সত্যকে লইয়াই গীতা কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তিব সমন্বয়েব সূচনা কবিযাছে, ইহাব পূর্বে শুধু কর্ম ও জ্ঞানের মধ্যে যে সমন্বযেব প্রযোজন, তাহা প্রথম ছয অধ্যায়ে সম্পাদিত হইয়াছে।

আমাদেব সম্মুখে বহিয়াছে তিনটি শক্তি (Power)—পুরুষোত্তম, আত্মা ও জীব, আমাদিগকে যে পরিণতি লাভ করিতে হইবে তাহারই চরম সত্য হইতেছে পুরুষোত্তম। এই তিনটিকে অন্যভাবে বলা যাইতে পারে—পরাৎপর (the Supreme), নামরূপের অতীত আত্মা (the impersonal spirit); এবং বহুধা জীবাত্মা (the multiple soul), যাহা আমাদের আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্বের কালাতীত ভিত্তি, সত্য ও সনাতন ব্যষ্টি—মমৈবাংশঃ সনাতনঃ। এই তিনটিই ভাগবত, এই তিনটিই ভগবান। সর্বোত্তমা যে আধ্যাত্মিক প্রকৃতি, অবিদ্যার সকল খণ্ডতা হইতে মুক্ত যে পবা প্রকৃতি, তাহাই পুরুষোত্তমের প্রকৃতি। নৈর্ব্যক্তিক নাম-রূপেব অতীত আত্মাতে সেই দিব্য প্রকৃতিই রহিযাছে; কিন্তু এখানে উহা রহিয়াছে চিববিশ্রামেব অবস্থায—সাম্য, নিষ্ক্রিয়তা, নিবৃত্তিব অবস্থায। আর ক্রিযার জন্য, প্রবৃত্তিব জন্য পবা প্রকৃতি বহুধা আত্মসত্তা (the multiple spiritual personality) হইযাছে, জীব হইযাছে। কিন্তু এই উত্তমা প্রকৃতিব যে নিগূঢ় ক্রিযা তাহা সকল সমযেই আধ্যাত্মিক দিব্য ক্রিযা। দিব্য পবা প্রকৃতিব শক্তিই, ভগবানের সচেতন ইচ্ছাই জীবেব বিশিষ্ট আধ্যাত্মিক গুণশক্তিরূপে আবির্ভূত হয, সেই মূল শক্তিই জীবেব স্বভাব। যেসব কর্ম ও ভাব (becoming) সাক্ষাৎভাবে এই আধ্যাত্মিক শক্তি হইতে উদ্ভূত সে সকলই দিব্যভাব এবং শুদ্ধ ও আধ্যাত্মিক কর্ম। তাহা হইলে ইহাই সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, দিব্যভাবে কর্ম করিতে হইলে মানুষকে

* গীতা সপ্তম অধ্যায, ১৫—২৮ শ্লোক।

তাহার সত্য আধ্যাত্মিক স্বরূপে ফিরিয়া যাইতে হইবে এবং তাহার সকল কর্মকে পরা প্রকৃতি হইতেই প্রবাহিত করিতে চেষ্টা করিতে হইবে; যেন আত্মার ভিতর দিয়া এবং অন্তরতম নিগূঢ় সত্তার ভিতর দিয়াই কর্মের বিকাশ হয়, মনের চিন্তা ও প্রাণের বাসনার ভিতর দিয়া নহে, যেন তাহার সকল কর্ম ভগবদ্ ইচ্ছারই শুদ্ধ প্রবাহে পরিণত হয়, তাহার সমস্ত জীবন দিব্যপ্রকৃতির জীবন্ত বিগ্রহে পরিণত হয়।

কিন্তু আবার ত্রিগুণময়ী নীচের প্রকৃতিও রহিয়াছে, ইহার স্বরূপ হইতেছে অজ্ঞানের স্বরূপ এবং ইহার কর্ম হইতেছে অজ্ঞানের কর্ম, মিশ্রিত, ভ্রান্ত, বিকৃত। এই কর্ম নীচের সত্তার কর্ম, "অহং"-এর কর্ম—ইহা আধ্যাত্মিক ব্যক্তির কর্ম নহে, প্রাকৃত ব্যক্তির কর্ম। এই নীচের মিথ্যা ব্যক্তিত্ব (false personality) হইতে উপরে উঠিবার জন্যই আমাদিগকে নামরূপের অতীত নৈর্ব্যক্তিক আত্মাকে (the impersonal Self) ধরিতে হয় তাহার সহিত নিজদিগকে এক করিতে হয়। তখন, এইভাবে অহং-এর ব্যক্তিত্ব হইতে মুক্ত হইয়া আমরা পুরুষোত্তমের সহিত সত্য ব্যষ্টির সম্বন্ধটি আবিষ্কার করিতে পারি। কর্ম এবং প্রকৃতির কালাধীনের বিকাশে ইহা পুরুষোত্তমের অংশ ও বিশেষ রূপ মাত্র। এরূপ হওয়া অবশ্যম্ভাবী, কারণ ইহা ব্যষ্টি। তথাপি মূল সত্তায় ইহা পুরুষোত্তমের সহিত এক। আবার, নীচের প্রকৃতি হইতে মুক্ত হইলে আমরা উপরের দিব্য আধ্যাত্মিক প্রকৃতিতে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারি। অতএব আত্মা হইতে কর্ম করার অর্থ ইহা নহে যে, বাসনাময় আত্মা হইতে কর্ম করা, কারণ, এই বাসনাময় আত্মা উপরের নিগূঢ় বস্তু নহে; ইহা কেবল নীচের প্রাকৃত ও বাহ্য রূপ, সত্য বস্তুর আভাস বা ছায়া। নিগূঢ় প্রকৃতি অনুসারে, স্বভাব অনুসারে কর্ম করার অর্থ ইহা নহে যে, অহং-এর কামক্রোধাদি রিপুর বশে কর্ম করা, নির্বিকার চিত্তে অথবা আসক্তির সহিত প্রাকৃত প্রেরণা অনুসারে ও গুণত্রয়ের চঞ্চল খেলা অনুসারে পাপ-পুণ্যের অনুষ্ঠান করা। রিপুর বশীভূত হওয়া, স্বেচ্ছায় বা জড়তার বশে পাপের স্রোতে গা ভাসাইয়া দেওয়া—ইহা উচ্চতম নৈর্ব্যক্তিক (highest impersonality) সত্তার আধ্যাত্মিক শান্ত নিষ্ক্রিয় ভাব লাভের পথ নহে অথবা যে দিব্য মানব পরম-পুরুষের ইচ্ছার যন্ত্র হইবে, পুরুষোত্তমের সাক্ষাৎ শক্তি এবং বিগ্রহ হইবে, তাহার কর্মের দিব্যভাব লাভেরও ইহা পথ নহে।

গীতা প্রথম হইতেই নির্দেশ করিয়াছে যে, দিব্যজন্ম, ঊর্ধ্বের জীবন লাভ করিতে হইলে সর্বাগ্রেই প্রয়োজন রাজসিক বাসনাকে এবং ইহা হইতে উদ্ভূত অন্যান্য রিপুগণকে বধ করিতে হইবে; এবং ইহার অর্থ, পাপকে বর্জন করিতে হইবে।[১] আত্মা কর্তৃক প্রকৃতির সর্বপ্রকার আত্মসংযম ও আত্মজয়ের উচ্চ চেষ্টার

[১] কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ।
মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্॥৩।৩৭
তস্মাৎ ত্বমিন্দ্রিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য ভরতর্ষভ।
পাপ্মানং প্রজহি হ্যেনং জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনম্॥৩।৪১

বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া নীচের প্রকৃতি যে নিজের অজ্ঞান, মূঢ় বা দুর্ধর্ষ রাজসিক ও তামসিক বৃত্তিসমূহের অশুদ্ধ ভোগের জন্য কর্ম করে তাহাই পাপ। নীচের প্রকৃতি যে এইভাবে নীচ রাজসিক ও তামসিক ভাবের দ্বারা মানুষকে অশুদ্ধ ভোগের দিকে জোর করিয়া টানিয়া লয়, ইহা হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে হইলে আমাদিগকে প্রকৃতির সর্বোচ্চ ভাব সত্ত্বগুণের আশ্রয় লইতে হইবে। এই সাত্ত্বিক ভাব সকল সময়েই জ্ঞানের আলোক এবং কর্মের সত্য নীতির সন্ধান করে। আমাদের মধ্যে যে পুরুষ রহিয়াছে, যে আত্মা প্রকৃতির গুণসমূহের বিভিন্ন প্রেরণায় সায় দিতেছে, তাহাকে সাত্ত্বিক প্রেরণায় অনুমতি দিতে হইবে। আমাদিগকে সাত্ত্বিক প্রেরণার বশে চলিতে হইবে, রাজসিক বা তামসিক প্রেরণার বশে নহে। কর্মে সকল উচ্চ যৌক্তিকতার এবং সকল প্রকৃত নৈতিকতার ইহাই অর্থ। আমাদের মধ্যে প্রকৃতির যে নিয়ম প্রকৃতির নীচ বিশৃঙ্খল কর্ম হইতে তাহার উপরের সুশৃঙ্খল কর্মের বিকাশ করিতে চাহিতেছে ইহা তাহাই। রিপুর বশে, অজ্ঞানের বশে কর্ম করিলে শোক, দুঃখ, অশান্তিতে পড়িতে হয়। তাহা না করিয়া ইহা জ্ঞানের বশে এবং প্রবুদ্ধ ইচ্ছাশক্তির বশে কর্ম করিয়া আভ্যন্তরীণ সুখ, স্থিরতা ও শান্তি লাভ করিতে চাহিতেছে। আমরা গুণত্রয়ের উপরে উঠিতে পারি না, যদি আমরা আমাদের মধ্যে প্রথমে শ্রেষ্ঠ গুণ সত্ত্বের ধর্ম বিকাশ না করি।

ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ।
মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ॥৭।১৫

"মূঢ়, নরাধম, পাপীগণ আমাকে লাভ করিতে পারে না; কারণ মায়া তাহাদের জ্ঞানকে হরণ করিয়া লয় এবং তাহারা অসুরভাব প্রাপ্ত হয়।" প্রকৃতিতে অবস্থিত আত্মা "আমি"র ছলনায় মুগ্ধ হইয়াই এইরূপ বিমূঢ় হইয়া পড়ে। পাপী ভগবানকে পায় না, কারণ, সে মানবীয় প্রকৃতির নিম্নতম স্তরে পড়িয়া থাকিয়া সর্বদা "আমি" দেবতার তৃপ্তির জন্যই ব্যস্ত থাকে। প্রকৃতপক্ষে এই "আমি"ই তাহার ভগবান। তাহার মন ও বুদ্ধি ত্রিগুণের মায়ার দ্বারা অপহৃত হওয়ায় আত্মার যন্ত্র না হইয়া স্বেচ্ছায় তাহার বাসনার দাস হয়, অথবা আত্মপ্রতারণার বশে তাহার বাসনা তৃপ্তির যন্ত্র হয়। সে দেখে কেবল তাহার এই নীচের প্রকৃতিকে, কিন্তু তাহার উচ্চতম আত্মা বা শ্রেষ্ঠ সত্তাকে সে দেখিতে পায় না, তাহার মধ্যে এবং সংসারের মধ্যে যে ভগবান রহিয়াছেন, তাঁহাকেও দেখিতে পায় না। তাহার "আমি"কে এবং বাসনাকে কেন্দ্র করিয়াই সে সংসারকে বুঝিয়া থাকে; এবং কেবল এই অহঙ্কার ও বাসনারই সেবা করে। ঊর্ধ্বের প্রকৃতি এবং উচ্চতর জীবনধারা লাভের কোনও আকাঙ্ক্ষা না রাখিয়া অহঙ্কার ও বাসনার সেবা করে—ইহাই অসুরের মন, অসুরের ভাব। উপরের দিকে উঠিতে হইলে সর্বপ্রথমেই চাই উপরের প্রকৃতিতে উঠিবার, ঊর্ধ্বের ধর্মে প্রতিষ্ঠিত হইবার আকাঙ্ক্ষা, আস্পৃহা (aspiration), চাই বাসনা অপেক্ষা আরও কোন শ্রেষ্ঠ নীতির অনুসরণ করা। "আমি"র পূজা না

করিযা, "আমি"কেই বড করিয়া দেবতাব আসনে না বসাইযা চাই কোনও মহত্তব দেবতাকে জানা ও পূজা করা, চাই সত্য চিন্তা কবা, সত্য কর্মেব কর্মী হওযা। তবে শুধু ইহাই যথেষ্ট নহে, কারণ সাত্ত্বিক মানুষও ত্রিগুণেব খেলায মুগ্ধ হয, যেহেতু সে তখনও ইচ্ছা ও দ্বেষের অধীন। সে প্রকৃতিব নামরূপেব চতুঃসীমাব মধ্যেই ঘুরিতেছে, এখনও সে উচ্চতম জ্ঞান লাভ কবিতে পাবে নাই, প্রপঞ্চাতীত (transcendental) ও অখণ্ড জ্ঞান লাভ কবিতে পাবে নাই। তথাপি সর্বদা সত্য চিন্তা ও সত্য কর্ম করিবাব উচ্চাকাঙ্ক্ষার ফলে অবশেষে সে পাপেব মোহ হইতে অর্থাৎ বাজসিক বাসনা ও বিপুব মোহ হইতে মুক্ত হয এবং বিশুদ্ধ প্রকৃতি লাভ কবে। তখন ত্রিগুণময়ী মায়াব আধিপত্য ছাডাইযা উঠা তাহাব পক্ষে সম্ভব হয। কেবল পুণ্যের দ্বাবাই মানুষ শ্রেষ্ঠ গতি লাভ কবিতে পাবে না, কিন্তু পুণ্যেব[১] দ্বাবা সর্বশ্রেষ্ঠ গতিব প্রথম যোগ্যতা বা অধিকাব লাভ কবা যায। কাবণ, অসংস্কৃত বাজসিক "আমি"কে অথবা জড়ভাবাপন্ন তামসিক "আমি"কে বর্জন কবা বা ছাড়াইযা উঠা কঠিন। সাত্ত্বিক "আমি" তত কঠিন নহে, এবং অবশেষে যখন ইহা নিজেকে যথেষ্ট শুদ্ধ ও বুদ্ধ কবিযা তোলে, তখন ইহাকে অতিক্রম কবা, রূপান্তরিত কবা বা ধ্বংস কবা সহজেই সম্ভব হয।

অতএব মানুষকে সর্বপ্রথমে নীতিপবাযণ, সুকৃতি (ethical) হইতে হইবে এবং তাহার পর কেবলমাত্র নীতিপবাযণতাব মধ্যেই আবদ্ধ না থাকিযা, তাহাব ঊর্ধ্বে উঠিতে হইবে, অধ্যাত্ম প্রকৃতির আলোক, প্রসাবতা ও শক্তিব মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে। সেখানে সে দ্বন্দ্বমোহেব অতীত হইবে, সেখানে আব সে তাহাব ব্যক্তিগত কল্যাণ বা সুখ খুঁজিবে না, অথবা ব্যক্তিগত দুঃখ ও যন্ত্রণা এড়াইতে চাহিবে না, কারণ, এই সকলেব দ্বাবা তখন আব সে বিচলিত হইবে না, তখন আব সে বলিবে না, "আমি পুণ্যবান", "আমি পাপী", কিন্তু নিজেব উচ্চ অধ্যাত্ম প্রকৃতিতে ভগবানেব ইচ্ছাব দ্বাবা পবিচালিত হইয়া বিশ্বকল্যাণেব জন্য কার্য করিবে। আমরা পূর্বেই দেখিযাছি যে, এই অবস্থায় পৌঁছিতে হইলে সর্বপ্রথমেই প্রয়োজন—আত্মজ্ঞান, সমতা ও নৈর্ব্যক্তিক ভাব (impersonality), জ্ঞানেব সহিত কর্মের সামঞ্জস্য কবিতে হইলে, আধ্যাত্মিকতাব সহিত সাংসারিক কাজের সামঞ্জস্য কবিতে হইলে, কালাতীত আত্মাব অচল নিষ্ক্রিযতাব সহিত প্রকৃতিব ক্রিয়াশীলা শক্তির অনন্ত লীলার সামঞ্জস্য কবিতে হইলে উহাই পথ। কিন্তু, যে কর্মযোগী এইভাবে কর্মযোগ ও জ্ঞানযোগেব সমন্বয কবিযাছে, গীতা এইবাব তাহাব পক্ষে আর একটি আবও মহান প্রযোজনেব কথা বলিতেছে। এখন তাহার কাছে কেবল জ্ঞান ও কর্মই চাওযা হয নাই, ভক্তিও চাওযা

[১] অবশ্য এখানে পুণ্য বলিতে গতানুগতিকভাবে সামাজিক বা লৌকিক বিধিনিষেধেব অনুসবণ বুঝাইতেছে না, ভিতবেব সত্যিকাবেব যে পুণ্য—চিন্তা, ভাব, প্রকৃতি, উদ্দেশ্য ও আচবণেব যে সাত্ত্বিক স্বচ্ছতা তাহাব দ্বাবাই মানুষ ঊর্ধ্বগতিব প্রথম অধিকাব লাভ কবে।

হইতেছে। চাই ভগবদ্‌ভক্তি, ভগবৎপ্রেম, ভগবদুপাসনা, চাই পুরুষোত্তমকে লাভ কবিবাব জন্য আত্মাব আকাঙ্ক্ষা। এ পর্যন্ত স্পষ্টভাবে এই প্রযোজনেব কথা বলা না হইলেও ইহাব জন্য শিষ্যকে ইতিপূর্বেই প্রস্তুত করা হইয়াছে যখন গুরু বলিযাছেন যে, তাঁহাব যোগে সকল কর্মকে ক্রমশ আমাদের জীবনের ঈশ্বরের উদ্দেশে যজ্ঞরূপে পবিণত করিতেই হইবে। সকল কর্ম ঈশ্বরে সমর্পণ কবিযাই এই যোগ পূর্ণ হইবে। শুধু আমাদেব নৈর্ব্যক্তিক আত্মাব (impersonal Self) সমর্পণ নহে, নৈর্ব্যক্তিক ভাবেব ভিতব দিযা সেই ভগবানে সমর্পণ করিতে হইবে যাঁহা হইতে আমাদেব সকল ইচ্ছা, সকল শক্তিব উৎপত্তি। সেখানে যাহা ইঙ্গিত করা হইযাছে এখন তাহা স্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে; এবং এখন আমরা গীতার উদ্দেশ্যটি আবও পূর্ণভাবে দেখিতে আবম্ভ করিতেছি।

এখন আমাদেব সম্মুখে তিনটি পবস্পরসাপেক্ষ প্রক্রিয়া ধবা হইয়াছে, যাহাদেব দ্বাবা আমবা সাধাবণ প্রাকৃত জীবন হইতে মুক্ত হইতে পাবি এবং দিব্য অধ্যাত্মজীবনে গডিযা উঠিতে পাবি।

ইচ্ছাদ্বেষসমুত্থেন দ্বন্দ্বমোহেন ভারত।
সর্ব্বভূতানি সম্মোহং সর্গে যান্তি পরন্তপ॥৭।২৭

"ইচ্ছা দ্বেষ হইতে যে সকল দ্বন্দ্ব উৎপন্ন হয় তাহাদেব মোহে সংসারের সকলেই ভ্রমে পতিত হয।" সেই অজ্ঞান, সেই অহঙ্কাব সর্বত্র ভগবানকে দেখিতে পায না, ধবিতে পাবে না; কাবণ উহা শুধু প্রকৃতির দ্বন্দ্বসমূহকেই দেখিয়া থাকে এবং সর্বদা নিজেব স্বতন্ত্র সত্তা এবং বাসনা ও বিরাগসমূহকে লইয়া ব্যস্ত থাকে। এই চক্র হইতে পবিত্রাণ পাইতে হইলে আমাদের কর্মে সর্বপ্রথম প্রয়োজন হইতেছে বাজসিক "আমি"র পাপ হইতে মুক্ত হওযা, বিপুব জ্বালা হইতে, বাজসিক প্রকৃতিব বাসনাব উপদ্রব হইতে মুক্ত হওয়া এবং আমাদের নৈতিক জীবনেব সাত্ত্বিক প্রেবণা ও সংযমেব দ্বাবাই ইহা সম্পাদন করিতে হইবে। যখন উহা সম্পন্ন হইবে—যেষাং ত্বন্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্ম্মণাম্—অথবা যখন উহা সম্পন্ন কবা হইতেছে, কাবণ কতক দূর অগ্রসব হইবার পরই সাত্ত্বিক প্রকৃতিব যতই বিকাশ হইবে ততই এক উচ্চস্তরেব শান্তি, সমতা ও মুক্তভাব লাভের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইবে—তখন প্রয়োজন হইবে দ্বন্দ্বসকলের উপরে উঠা এবং নৈর্ব্যক্তিক ভাব ও সমতা লাভ কবা, অক্ষবের সহিত একাত্মভাব, সর্বভূতের সহিত একাত্মভাব লাভ কবা। অধ্যাত্মভাবেব এরূপ বিকাশই আমাদের শুদ্ধিকে সম্পূর্ণ কবিযা তুলিবে। কিন্তু যখন ইহা কবা হইতেছে, জীব যখন আত্মজ্ঞানে বর্ধিত হইতেছে, তখন তাহাকে ভক্তিতে বর্ধিত হইতে হইবে। কারণ, জীবকে যে সমতাব এক উদাব ভাব লইযা কর্ম করিতে হইবে শুধু তাহাই নহে—ঈশ্বরার্থ যজ্ঞও কবিতে হইবে। ঈশ্বর সর্বভূতের মধ্যে অবস্থিত, তাঁহাকে এখনও সে সম্পূর্ণভাবে জানে না; কিন্তু তাঁহাকে এইভাবে সে জানিতে পারিবে—সমগ্রম্

মাম্—যখন সর্বত্র এবং সর্বভূতে এক আত্মাকে দর্শন কবাব স্থিব দৃষ্টি সে লাভ করিবে। সমতা এবং একত্বদর্শন যখন পূর্ণরূপে লাভ হইযাছে—তে দ্বন্দ্বমোহনির্মুক্তাঃ—তখন উত্তমা ভক্তি, ভগবানেব প্রতি সর্বতোমুখী ভক্তি হইবে জীবনেব সমগ্র ও একমাত্র নীতি। কর্তব্যাকর্তব্যেব অন্য সকল নীতি সেই আত্মসমর্পণেব মধ্যে নিমজ্জিত হইবে—সর্ব্বধর্ম্মান্ পবিত্যজ্য। জীব তখন এই ভক্তিতে সুদৃঢ় হইবে, তাহাব সকল জীবন, জ্ঞান ও কর্ম উৎসর্গ কবিবাব সঙ্কল্পে সে সুদৃঢ় হইবে; কাবণ তখন সে সর্বনিযন্তা ভগবান সম্বন্ধে পূর্ণ, সমগ্র ঐক্যসাধক জ্ঞানেই নিজেব নিশ্চিত প্রতিষ্ঠা পাইবে, জীবনেব ও কর্মেব চবম ভিত্তি পাইবে—তে ভজন্তে মাম্ দৃঢ়ব্রতাঃ।

সাধাবণভাবে দেখিতে গেলে, জ্ঞান ও নৈর্ব্যক্তিক ভাব লাভ কবিবাব পব আবার ভক্তিব দিকে ফিবিযা আসা অথবা হৃদযবৃত্তিব ক্রিয়া চলিতে দেওযা, ইহা পশ্চাৎগমন বলিযাই মনে হইতে পাবে। কাবণ, ভক্তিতে সকল সময়েই ব্যক্তিত্বেব ভাব, এমনকি, ব্যক্তিত্বেব ভিত্তি রহিয়াছে। কাবণ, ভক্তিব মূল প্রেবণা হইতেছে জগদীশ্বরের প্রতি ব্যষ্টিগত আত্মা বা জীবেব প্রেম ও শ্রদ্ধা। কিন্তু গীতাব দিক হইতে দেখিলে এইরূপ আপত্তি আদৌ উঠিতে পাবে না, কাবণ, নামরূপেব অতীত অনন্ত নৈর্ব্যক্তিক সত্তার (the eternal impersonal) মধ্যে লয হওয়া, নিষ্ক্রিয় হওয়া, গীতাব লক্ষ্য নহে—আমাদেব সমগ্র জীবনেব ভিতব দিযা পুরুষোত্তমেব সহিত মিলিত হওয়াই গীতার লক্ষ্য। সত্য বটে, এই যোগে জীব নিজেব নৈর্ব্যক্তিক ও অক্ষব আত্মসত্তাকে উপলব্ধি করিযা নীচেব ব্যক্তিত্ব হইতে মুক্ত হয, কিন্তু তখনও সে কর্ম কবে এবং প্রকৃতিব ক্ষবলীলায বত বহুধা-আত্মাই সকল কর্মের অধিপতি। নিবতিশয নিষ্ক্রিযতাকে সংশোধন কবিবাব জন্য আমবা যদি ভগবানেব উদ্দেশ্যে যজ্ঞেব আদর্শ না আনি, তাহা হইলে আমাদেব মধ্যে এই যে কর্ম চলিতে থাকে, সেইটাকে দেখিতে হয যেন আদৌ আমাদেব নয, সেটা যেন ত্রিগুণের খেলারই কিছু অবশিষ্টাংশ, তাহার পশ্চাতে দিব্য সত্য কিছুই নাই, তাহা আমাদের যে অহং, যে আমিত্ব লযপ্রাপ্ত হইতেছে, তাহাবই একটা রূপ, নীচের প্রকৃতির খেলারই জেব। তাহাব জন্য আমবা দাযী নহি, কাবণ, আমাদেব জ্ঞান তাহাকে প্রত্যাখ্যান করে এবং তাহা হইতে মুক্ত হইযা বিশুদ্ধ নিষ্ক্রিয অবস্থা লাভ করিতে চায়। কিন্তু অদ্বিতীয আত্মাব শান্ত নৈর্ব্যক্তিক ভাবেব সহিত ঈশ্বরেব উদ্দেশে যজ্ঞার্থে কৃত প্রকৃতির কর্মলীলা যোগ কবিযা দিযা আমবা এই দ্বিবিধ সাধনার দ্বারা নীচেব অহংভাবপূর্ণ ব্যক্তিত্ব হইতে মুক্ত হইতে পাবি এবং আমাদেব প্রকৃত আধ্যাত্মিক স্বরূপের পবিত্রতায় গডিযা উঠিতে পাবি। তখন আব আমবা নীচের প্রকৃতিব বদ্ধ অজ্ঞান "আমি" থাকি না, তখন দিব্য পবা প্রকৃতিতে মুক্ত জীব হই। তখন আর আমবা এই জ্ঞানের মধ্যে থাকি না যে, এক অক্ষব ও নৈর্ব্যক্তিক আত্মা এবং এই ক্ষব বহুধা প্রকৃতি, এই দুইটি পবস্পববিবোধী সত্তা, কিন্তু আমাদের জীবনের এই দুইটি দিক দিয়া একসঙ্গে উঠিযা পুরুষোত্তমেব

আলিঙ্গনেব মধ্যেই বাস করি। এই তিনই আধ্যাত্মিক সত্তা। তৃতীয় সত্তাটিই উচ্চতম, এবং যে দুইটিকে পবস্পবেব বিবোধী দেখায়, তাহাবা ঐ তৃতীয সত্তাবই দুইটি সামনাসামনি দিক ভিন্ন আব কিছুই নহে। কৃষ্ণ পরে বলিবেন'—

"আধ্যাত্মিক পুরুষ দুইটি—নামরূপেব অতীত নৈর্ব্যক্তিক (impersonal) অক্ষব পুরুষ এবং নামরূপযুক্ত (personal) ক্ষর পুরুষ। কিন্তু, আরও একটি উত্তমপুরুষ আছেন, তাঁহাকে পরমাত্মা বলা হয। তিনি সমস্ত জগতেব মধ্যে প্রবিষ্ট হইযা উহাকে ধবিযা আছেন। তিনি ঈশ্বব অব্যয়। আমিই এই পুরুষোত্তম, আমি ক্ষবেব উপব, এমনকি আমি অক্ষব অপেক্ষাও বড়, অক্ষরেরও উপবে। যে আমাকে পুরুষোত্তম বলিয়া জানে, সে সকল জ্ঞানের সহিত সর্বভাবে, তাহার প্রাকৃত জীবনেব সকল দিক দিযা আমাকে ভজনা কবে।" এই যে সম্পূর্ণ জ্ঞানেব সহিত এবং সম্পূর্ণ আত্মনিবেদনেব সহিত ভক্তি, গীতা এখন তাহাই পবিস্ফুট কবিতে আবম্ভ কবিতেছে।

কাবণ, মনে বাখিতে হইবে যে, গীতা শিষ্যেব নিকট জ্ঞানযুক্ত ভক্তিই চাহিযাছে, এবং অন্যান্য প্রকাবেব ভক্তি আপন আপন ভাবে ভাল হইলেও, গীতা বলিযাছে যে, সেসব নিম্নস্তবেব ভক্তি; সাধনমার্গে তাহাবা কল্যাণকর হইতে পাবে বটে, কিন্তু আত্মাব যে চবম সিদ্ধি গীতাব লক্ষ্য, ঐসব ভক্তি সে জিনিস নহে। যেসকল ব্যক্তি বাজসিক আমিত্বেব পাপ বর্জন কবিয়াছে এবং ভগবানের দিকে অগ্রসব হইযাছে, তাহাদেব মধ্যে গীতা চাবি শ্রেণীব ভক্তকে পৃথক কবিযাছে।" কেহ সংসাবেব দুঃখ-কষ্ট হইতে আশ্রয়েব জন্য তাঁহাব দিকে যায—আর্ত। কেহ ঐহিক কল্যাণদাতা বলিযা তাঁহাব উপাসনা কবে—অর্থার্থী। কেহ জ্ঞানেব আকাঙ্ক্ষায তাঁহাব নিকটে আসে—জিজ্ঞাসু। আবার কেহ জ্ঞানের সহিত তাঁহাকে ভজনা করে—জ্ঞানী। গীতা সকলকেই প্রশংসা করিয়াছে, কিন্তু কেবল শেষেবটিকেই সম্পূর্ণভাবে অনুমোদন করিয়াছে। এই সকল চেষ্টার কোনটাই মন্দ নহে, সবগুলিই উদার ও কল্যাণকব—উদারাঃ সর্ব্ব এবৈতে—কিন্তু জ্ঞানেব সহিত যে ভক্তি তাহাই সর্বশ্রেষ্ঠ—বিশিষ্যতে। এই যে কয়েক

দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষবশ্চাক্ষব এব চ।
ক্ষবঃ সর্ব্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষব উচ্যতে॥
উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পবমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।
যো লোকত্রযমাবিশ্য বিভর্ত্যব্যয ঈশ্বরঃ॥
যস্মাৎ ক্ষবমতীতোঽহমক্ষবাদপি চোত্তমঃ।
অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ॥
যো মামেবমসংমূঢো জানাতি পুরুষোত্তমম্।
স সর্ব্ববিদ ভজতি মাং সর্ব্বভাবেন ভাবত॥১৫।১৬-১৯
চতুর্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভবতর্ষভ॥৭।১৬

প্রকাবেব ভক্তি ইহাদিগকে ক্রমান্বয়ে বলিতে পাবা যায, ভাবপ্রবণ প্রকৃতিব ভক্তি (আর্ত), কর্মপ্রবণ প্রকৃতিব ভক্তি (অর্থার্থী), চিন্তাপ্রবণ প্রকৃতিব ভক্তি (জিজ্ঞাসু), এবং সর্বোচ্চ অন্তর্জ্ঞানময সত্তাব (the highest intuitive being) ভক্তি (জ্ঞানী)। এই সত্তাই প্রকৃতিব অন্যান্য অংশকে লইযা ভগবানেব সহিত একত্ব সাধন করে। যাহাই হউক, কার্যত অন্যান্য প্রকাবেব ভক্তিকে প্রাথমিক সাধনা বলিয়া ধরা যাইতে পারে। কারণ, গীতা নিজেই এখানে বলিযাছেন যে, বহু জন্ম পরে সমগ্র জ্ঞান লাভ করিয়া এবং সেই জ্ঞান অনুসাবে জীবনকে গঠন কবিযা তবে মানুষ অবশেষে বিশ্বাতীত ভগবানকে লাভ কবিতে পাবে। কাবণ, যাহা কিছু আছে সেসবই ভগবান, এই জ্ঞান লাভ কবা অতিশয কঠিন, এবং যিনি এইরূপ সমগ্রভাবে ভগবানকে দেখিতে পারেন এবং নিজেব সমগ্র সত্তা লইযা, প্রকৃতিব সর্বভাব লইয়া ভগবানেব মধ্যে প্রবেশ কবিতে পারেন—সর্ব্ববিৎ সর্ব্বভাবেন—সেরূপ মহাত্মা অতি দুর্লভ।[১]

প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, কেবল ঐহিক লাভের জন্যই যে ভক্তি ভগবানেব উপাসনা করে, অথবা সংসাবেব দুঃখ, যন্ত্রণা এড়াইবাব জন্যই ভগবানেব শরণাপন্ন হয়, কেবল ভগবানকে পাইবার জন্যই ভগবানেব উপাসনা কবে না, সে ভক্তি কেমন কবিয়া উদার ও মহৎ হইল—উদাবাঃ? এইরূপ ভক্তিতে কি অহঙ্কার, দুর্বলতা ও বাসনারই প্রাধান্য নহে এবং ইহা কি নীচেব প্রকৃতিবই খেলা নহে? আরো কথা এই যে, যেখানে জ্ঞান নাই সেখানে ভক্ত ভগবানকে সমগ্রভাবে সর্বতোভাবে জানিয়া—বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি—ভগবানেব দিকে অগ্রসব হয না, কিন্তু, অসম্পূর্ণ নামরূপেব ভিতব দিযা ভগবানেব কল্পনা করে, সেসব তাহাব নিজেবই প্রয়োজন স্বভাব ও প্রকৃতির প্রতিচ্ছায়া ভিন্ন আব কিছুই নহে, এবং সেই সব নামরূপেব পূজা কবিয়া সে নিজের প্রাকৃত বাসনাব তৃপ্তি কবিতে চায। ভগবানকে কেহ ইন্দ্র বা অগ্নিরূপে, বিষ্ণু বা শিবরূপে, খ্রীস্ট বা বুদ্ধরূপে কল্পনা করে; কেহ ভগবানকে কতকগুলি প্রাকৃত গুণবাশিব সমষ্টি বলিযা কল্পনা করে—তিনি প্রেমময, ক্ষমাশীল; কেহ বা আবাব ভাবে ভগবান অতি কঠোব ন্যাযপবায়ণ, বিচারপরাযণ, কেহ ভগবানকে ক্রোধপবায়ণ, ভীষণ দণ্ডদাতা ভাবিয়া ভযমিশ্রিত ভক্তির সহিত দেখিয়া থাকে; আবাব কেহ এই সব লক্ষণ কোনরকমে মিলাইযা মিশাইয়া ভগবানেব কল্পনা কবে, অন্তবে এবং বাহিবে সেই ভগবানেব বেদী স্থাপন করে এবং তাঁহাব সম্মুখে লুণ্ঠিত হইযা পার্থিব কল্যাণ ও সুখ প্রার্থনা কবে, অথবা শোক-দুঃখে সান্ত্বনা প্রার্থনা কবে, অথবা নিজেদেব ভ্রান্ত গোঁড়ামিপূর্ণ পবমত অসহিষ্ণু সাম্প্রদাযিক জ্ঞানের সমর্থন প্রার্থনা কবে। এই সবই কতক দূর পর্যন্ত খুবই সত্য। যাহা কিছু আছে সেসবই সর্বব্যাপী বাসুদেব, এরূপ

[১] বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ॥৭।১৯

জ্ঞানসম্পন্ন মহাত্মা অতি দুর্লভ—বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ। বিবিধ বাহ্য বাসনাব দ্বাবা চালিত হইযা মনুষ্যসকল বিপথগামী হয। ঐ সকল বাসনা তাহাদেব ভিতবেব জ্ঞান-ক্রিযাকে হবণ কবিযা লয—কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ। অজ্ঞান তাহাবা, অপব দেবতাব আবাধনা কবে, তাহাবা ভগবানের সেই সব অসম্পূর্ণ রূপেব পূজা কবে যাহা তাহাদেব বাসনাব অনুরূপ হয়—প্রপদ্যন্তেঽন্য-দেবতাঃ। তাহাবা নিজেবা ক্ষুদ্র, তাই এমন সব সঙ্কীর্ণ নিযম বা মতবাদ স্থাপন কবে, যাহা হইতে তাহাদেব প্রকৃতির পরিচয সিদ্ধ হয—তং তং নিযমমাস্থায় প্রকৃত্যা নিযতাঃ স্বযা। এবং এই সবেতেই তাহাদের নিজের ব্যক্তিগত প্রেরণাব দ্বাবাই বাধ্য হয—তাহাবা নিজেদেব প্রকৃতিবই এই সঙ্কীর্ণ প্রযোজনকে অনুসবণ কবিযা চলে এবং সেটিকেই পবম সত্য বলিযা গ্রহণ করে—অনন্তকে তাহার বিশালতাব সহিত গ্রহণ কবিবাব সামর্থ্য তাহাদেব নাই। তাহাদেব শ্রদ্ধা যদি পূর্ণ থাকে তাহা হইলে ভগবান এই সকল বিভিন্ন নামরূপের ভিতর দিযাই তাহাদেব মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কবেন। কিন্তু এই সব ফল ও ভোগ ক্ষণস্থাযী। যাদেব মন ক্ষুদ্র, বুদ্ধি এখনও বিকশিত হয নাই, কেবল তাহারাই এই সকলেব অনুসরণকে ধর্মেব ও জীবনের নীতি বলিযা গ্রহণ কবে। এই পথে আধ্যাত্মিক লাভ যদি কিছু হয, তা কেবল দেবতাদেব নিকট পর্যন্তই পৌঁছান, ক্ষব প্রকৃতির লীলাব মধ্যে ভগবান যে বিভিন্ন নামরূপ গ্রহণ করিযাছেন এবং তাহার ফল প্রদান করিতেছেন, তাহারা ভগবানকে কেবল প্রকৃতিব সেই সব নামরূপের মধ্যে লাভ কবে। কিন্তু যাহারা প্রকৃতিব অতীত ভগবানকে সমগ্র সত্তায় উপাসনা করে তাহারা এই সবকেই পায় এবং এই সবেবই রূপান্তব সাধন কবে—দেবতাগণকে তাহাদের উচ্চতম স্তবে, প্রকৃতিকে তাহাব উচ্চতম শিখবে উত্তোলন কবে, এবং তাহাদিগকে অতিক্রম কবিযা একেবাবে ভগবানেব নিকটেই পৌঁছায, বিশ্বাতীত পরম বস্তুকে লাভ করে—দেবান্ দেবযজো যান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মামপি।

তথাপি পবমেশ্বব ভগবান এই সকল ভক্তকে তাহাদেব অসম্পূর্ণ দৃষ্টিব জন্য পবিত্যাগ কবেন না, কাবণ ভগবানেব এই সকল আংশিক প্রকাশেব অতীত যে অজ, অব্যয়, শ্রেষ্ঠ ভাব, কোনও জীবের পক্ষেই ভগবানকে সেই ভাবে জ্ঞাত হওযা সহজ নহে। মাযার বিবাট আচ্ছাদনে তিনি নিজেকে সমাবৃত করিয়া বাখিযাছেন।[১] তিনি যে জগতেব সহিত এক হইয়াও জগতের অতীত, সর্বত্র অনুস্যূত থাকিযাও অগোচব, সকলেব হৃদযে অধিষ্ঠিত থাকিযাও সকলেবই নিকট প্রকাশিত নহেন, ইহা তাঁহাবই যোগমাযাব দ্বারা সংঘটিত হইয়াছে। প্রকৃতিতে বদ্ধ মানুষ মনে কবে যে, প্রকৃতিব মধ্যে ভগবানের যেসব প্রকাশ তাহাই ভগবানের সব, কিন্তু বস্তুত সেসব কেবল তাঁহাব ক্রিযা, তাঁহাব শক্তি, তাঁহাব অবগুণ্ঠন।

নাঽহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমাযাসমাবৃতঃ।
মূঢোঽযং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যযম্॥৭।২৫

তিনি ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান সবই সমগ্রভাবে জানেন; কিন্তু তাঁহাকে এখনও কেহ জানিতে পারে নাই।[১] তাহা হইলে ভগবান প্রকৃতির নিজের লীলার দ্বারা তাহাদিগকে এইভাবে বিমূঢ় করিবার পর যদি তাহাদিগকে এই সবের ভিতর দিয়াই দেখা না দেন তাহা হইলে কোনও মানুষের পক্ষে, মায়ায় বদ্ধ কোনও জীবের পক্ষেই ভগবানকে পাওয়ার কোনও আশাই থাকিবে না। অতএব, আপন আপন প্রকৃতি অনুসারে যে যেভাবে ভগবানের দিকে অগ্রসর হয়, ভগবান তাহাদের ভক্তি গ্রহণ করেন এবং ভগবৎ প্রেম ও দয়ার দ্বারা তাহার প্রতিদান দেন। এই যেসব বিভিন্ন দেবতার রূপ, বস্তুত ইহাদের ভিতর দিয়া মানুষের অপূর্ণবুদ্ধি ভগবানকে স্পর্শ করিতে পারে, এই যেসব বাসনার অনুসরণ, প্রথমত ইহাদের ভিতর দিয়াই মানুষ ভগবানের দিকে মুখ ফিরায়, কোনও ভক্তি যতই অসম্পূর্ণ হউক না কেন, তাহা একেবারে বৃথা বা নিরর্থক নহে। ইহার মধ্যে অতি বড় প্রয়োজনীয় জিনিসটি রহিয়াছে—শ্রদ্ধা (faith)। "যেকোন ভক্ত শ্রদ্ধার সহিত আমার যেকোন রূপের পূজা করে আমি তাহার সেই শ্রদ্ধা দৃঢ় ও অচল করিয়া দিই।"[২] তাহার নিজের মতানুযায়ী পূজায় তাহার যে বিশ্বাস সেই বিশ্বাসের জোরেই সে তাহার বাসনানুযায়ী ফল লাভ করে এবং সেই সময়ে যে আধ্যাত্মিক সিদ্ধিলাভের সে যোগ্য, সেই সিদ্ধি সে লাভ করে। তাহার সমস্ত কল্যাণ ভগবানের নিকট চাহিতে চাহিতে শেষ পর্যন্ত সে ভগবানকেই তাহার একমাত্র কল্যাণ বলিয়া প্রার্থনা করিবে। তাহার সমস্ত আনন্দের জন্য ভগবানের উপর নির্ভর করিতে করিতে সে ভগবানের মধ্যেই তাহার সমস্ত আনন্দের সন্ধান করিতে শিখিবে। ভগবানকে তাঁহার নামরূপ ও গুণের মধ্যে জানিতে জানিতে অবশেষে সে জানিতে পারিবে যে, ভগবানই সব, তিনি বিশ্বের অতীত এবং তিনিই সকল বস্তুর মূল।[৩]

এইভাবে আধ্যাত্মিক বিকাশের দ্বারা ভক্তি জ্ঞানের সহিত এক হয়। জীব ক্রমশ একমাত্র ভগবানেই আনন্দ লাভ করে, সে জানে যে ভগবানই সকল সত্তা ও চেতনা ও আনন্দ, ভগবানই সকল বস্তু, সকল জীব, সকল ঘটনা। সে প্রকৃতির

[১] বেদাহং সমতীতানি বর্ত্তমানানি চার্জ্জুন।
ভবিষ্যাণি চ ভূতানি মাং তু বেদ ন কশ্চন॥৭।২৬

[২] যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চ্চিতুমিচ্ছতি।
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্॥
স তয়া শ্রদ্ধয়াযুক্তস্তস্যারাধনমীহতে।
লভতে চ ততঃ কামান্ ময়ৈব বিহিতান্ হি তান্॥৭।২১-২২

[৩] নীচের তিন প্রকারের যে ভক্তি, সর্বোত্তম সিদ্ধিলাভের পরও তাহাদের একটা স্থান আছে, কিন্তু তখন তাহারা রূপান্তরিত, তখন সঙ্কীর্ণ ব্যক্তিগত ভাব আর থাকে না। দুঃখ ও পাপ ও অজ্ঞান দূর হউক, এই প্রাকৃত জগতে সর্বোত্তম কল্যাণ, শক্তি, আনন্দ ও জ্ঞান উত্তরোত্তর বিকশিত হউক, পূর্ণভাবে প্রকটিত হউক, এই বাসনার বেগ তখনও হৃদয়ে থাকিতে পারে।

মধ্যে ভগবানকে জানে, আত্মাতে ভগবানকে জানে, আবার ভগবান যে আত্মা ও প্রকৃতির অতীত তাহাও অবগত হয়। সে সর্বদা ভগবানের সহিত যোগে অবস্থান করে—নিত্যযুক্তঃ। যে বিশ্বাতীত সত্তার উপরে আর কিছুই নাই, যে বিশ্বব্যাপী সত্তা ভিন্ন আর কেহ নাই, কিছুই নাই, তাঁহার সহিত চিরন্তন যোগই হয় তাহার সমগ্র জীবন, সমগ্র সত্তা। তাঁহার উপরেই তাহার সকল ভক্তি একান্তভাবে নিবদ্ধ হয়—কোনও অংশদেবতা, বিধি বা মতবাদের উপরে নহে। এই ঐকান্তিক ভক্তিই হয় তাহার জীবনের সমগ্র নীতি। সে সকল সাম্প্রদায়িক ধর্মমত ও বিশ্বাসের উপরে চলিয়া যায়; সকল নৈতিক বিধিনিষেধের উপরে, ব্যক্তিগত সকল বাসনা-কামনার উপরে চলিয়া যায়। তখন আর তাহার কোনও শোক দুঃখ থাকে না যে উপশম করিতে হইবে, কারণ, সে সকল আনন্দের আধারকে লাভ করিয়াছে। কোনও বাসনার তৃপ্তির জন্য তখন তাহাকে লালায়িত হইতে হয় না, কারণ, যিনি সব, সকলের উপরে, তাঁহাকেই সে লাভ করিয়াছে; যিনি সকল সিদ্ধি প্রদান করেন, সে সেই সর্বশক্তিমানের সামীপ্য লাভ করিয়াছে। তাহার কোন সংশয়, কোন অতৃপ্ত জ্ঞানপিপাসা অবশিষ্ট থাকে না, কারণ, যে দিব্য জ্যোতির মধ্যে সে বাস করে, তাহা হইতেই সমস্ত জ্ঞান তাহার উপর বিচ্ছুরিত হয়। ভগবানের প্রতি তাহার পূর্ণপ্রেম এবং সে ভগবানের প্রিয়; কারণ, সে ভগবানে যেরূপ আনন্দ পায়, ভগবানও তাহাতে সেইরূপই আনন্দ পান।[১]

জ্ঞানের সহিত যে ভগবানের ভজনা করে, যে জ্ঞানী-ভক্ত, ইহাই তাহার স্বরূপ। গীতায় ভগবান বলিয়াছেন, এইরূপ জ্ঞানী তাঁহার আত্মা—জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্। অপর ভক্তেরা কেবল প্রকৃতির বিভিন্ন রূপ, বিভিন্ন শক্তিকে আশ্রয় করে, কিন্তু জ্ঞানীভক্ত একেবারে পুরুষোত্তমের আত্মসত্তা ও লীলাকে আশ্রয় করে, তাঁহারই সহিত সে যুক্ত। তাহারই হইয়াছে পরা প্রকৃতিতে দিব্যজন্ম, জীবনে সে পূর্ণবিকশিত, ইচ্ছাশক্তিতে পূর্ণ, প্রেমে অনন্ত, জ্ঞানে সিদ্ধ। তাহাতেই জীবের বিশ্বলীলা সার্থক হইয়াছে; কারণ, সে নিজেকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছে এবং এইভাবেই তাহার জীবনের পূর্ণতম উচ্চতম সত্যকে লাভ করিয়াছে।

[১] যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।

তৃতীয় অধ্যায়

পরম পুরুষ

সপ্তম অধ্যায়ে এপর্যন্ত যাহা বলা হইযাছে, তাহাতে আমাদেব সাধনার নূতন প্রতিষ্ঠাটি খুবই স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে এবং তাহাকে পূর্ণতব কবিযা তুলিবাব সন্ধানও মিলিয়াছে। সংক্ষেপত উহা এই, আমাদিগকে অন্তর্মুখী হইযা এক উচ্চতর চৈতন্যের দিকে, এক পবম সত্তার দিকে অগ্রসব হইতে হইবে। আমাদেব পার্থিব প্রকৃতিকে সম্পূর্ণভাবে বাদ দিতে হইবে না; কিন্তু এখন আমবা মূলত বস্তুত যাহা কিছু, সেসবেবই একটা উচ্চতব, একটা অধ্যাত্ম সিদ্ধি লাভ কবিতে হইবে। কেবল আমাদেব মর্ত্যেব অপবিপূর্ণতা ছাডাইযা দিব্য জীবনেব পূর্ণতা লাভ করিতে হইবে। এরূপ হওযা যে সম্ভব তাহার কাবণ, প্রথমত, মানুষেব মধ্যে যে ব্যষ্টিগত আত্মা, জীবাত্মা রহিয়াছে উহা মূল সনাতন সত্তায় এবং মূল শক্তিতে পরমাত্মা ও ভগবানেবই স্ফুলিঙ্গ, এখানে উহা ভগবানেবই প্রচ্ছন্ন আবির্ভাব, তাঁহারই সত্তার সত্তা, তাঁহারই চৈতন্যেব চৈতন্য, তাঁহাবই প্রকৃতিব প্রকৃতি, কিন্তু এই দেহমনের অজ্ঞানের মধ্যে আবদ্ধ, নিজেব প্রকৃত সত্তা ও সত্য স্বরূপ সম্বন্ধে আত্মবিস্মৃত। দ্বিতীযত, জীবাত্মাব আবির্ভাব হইযাছে দুই প্রকৃতিকে ধবিয়া। মূল প্রকৃতিতে উহা উহার প্রকৃত অধ্যাত্ম সত্তার সহিতই এক থাকে, এবং নীচেব প্রকৃতিতে উহা অহঙ্কার ও অজ্ঞানেব বশে মোহগ্রস্ত হয়। এই শেষেবটিকে বর্জন কবিতে হইবে; এবং অধ্যাত্ম প্রকৃতিকে পুনবায অন্তরের মধ্যে পাইতে হইবে, তাহার পূর্ণ বিকাশ করিতে হইবে, তাহাকে সচল ও সক্রিয কবিযা তুলিতে হইবে। আত্মার আভ্যন্তরীণ বিকাশ সাধন করিয়া, এক নূতন জীবনেব দ্বার উন্মোচন করিযা, এক নূতন শক্তির মধ্যে জন্মগ্রহণ কবিযা আমবা অধ্যাত্ম প্রকৃতিতে ফিরিয়া যাই; এবং আমরা যে ভগবান হইতে এই মর্ত্য রূপেব মধ্যে নামিয়া আসিয়াছি পুনবায় তাঁহারই অংশ হই।

এখানে আমবা দেখিতে পাইতেছি যে, গীতা ভাবতেব তৎকালীন সমসাময়িক মতকে ছাড়াইয়া গিয়াছে। এখানে জীবনকে অস্বীকাব কবিবাব ভাব 'নেতি নেতি'ব ভাব কম; স্বীকাব করাব ভাবই বেশী। প্রকৃতিব আত্মবিনাশেব (a self-annulment of Nature) উপরেই ছিল সেই যুগেব একান্ত ঝোঁক, তাহাব পবিবর্তে আমরা এক পূর্ণতর সমাধানের ইঙ্গিত পাইতেছি। পববর্তীকালে যেসব ভক্তিমূলক ধর্মের বিকাশ হয়, তাহাদেবও অন্তত একটা পূর্বাভাস এখানে দেখিতে পাইতেছি। আমাদেব সাধারণ জীবনেব উপরে যে সত্য বহিযাছে, আমবা যে অহংভাবের মধ্যে বাস কবি তাহাব পশ্চাতে লুক্কাযিত যে সত্য, সে সম্বন্ধে আমাদের যাহা প্রথম অনুভূতি, গীতাবও মতে তাহা হইতেছে এক বিশাল,

নৈর্ব্যক্তিক, অক্ষব আত্মাব শান্তি, তাহাব সমতা ও ঐক্যেব মধ্যে আমবা আমাদের ক্ষুদ্র আমিত্বেব লোপ করি—তাহার শান্ত পবিত্রতার মধ্যে আমাদেব বাসনা ও বিপুব সমস্ত সঙ্কীর্ণ প্রেবণাকে বর্জন করি। কিন্তু, তাহাব পব আমাদেব দৃষ্টি যখন আবও পূর্ণ হয, তখন আমবা দেখিতে পাই এক জীবন্ত অসীম সত্তা, এক দিব্য অপবিমেয পুরুষ, আমবা যাহা কিছু সবই তাঁহা হইতেই উৎপন্ন, আত্মা ও প্রকৃতি, জগৎ ও জীব, যাহা কিছু আমবা, সবই তাঁহার। আত্মায যখন আমরা তাঁহার সহিত এক হই তখন আমবা লযপ্রাপ্ত হই না; ববং এই অনন্তেব মহত্ত্বে স্থিবপ্রতিষ্ঠ হইয়া তাঁহাবই মধ্যে আমবা আমাদেব প্রকৃত সত্তাকে ফিবিয়া পাই। ইহা এক সঙ্গেই সাধিত হয একযোগে তিনটি প্রক্রিয়ার দ্বাবা—তাঁহার ও আমাদের অধ্যাত্ম প্রকৃতিতে প্রতিষ্ঠিত কর্মেব ভিতব দিযা সমগ্রভাবে আত্মার সন্ধান লাভ কবা (an integral self-finding), যাঁহাব মধ্যে সব বহিযাছে, যিনিই সব, সেই দিব্য পবম পুরুষেব জ্ঞানেব ভিতব দিযা সমগ্রভাবে আত্মস্বরূপে গড়িযা উঠা (an integral self-becoming), এবং এই সর্বময়, সর্বশ্রেষ্ঠ ভগবানেব প্রতি প্রেম ও ঐকান্তিক ভক্তিব ভিতর দিয়া সমগ্রভাবে আত্মসমর্পণ কবা (an integral self-giving), আমাদেব সকল কর্মের প্রভু, আমাদের হৃদযের অধিবাসী, আমাদেব সমগ্র চেতনসত্তাব আধাব এই ভগবানের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া। তৃতীযটিই সর্বশ্রেষ্ঠ এবং চবম সিদ্ধিপ্রদ প্রক্রিয়া। যিনি আমাদের সবের মূল তাঁহাকেই আমাদেব সব সমর্পণ কবি। আমাদের অবিবত আত্মসমর্পণের দ্বারা আমাদেব সকল জ্ঞান তাঁহাবই জ্ঞানে পরিণত হয, আমাদের সকল কর্ম তাঁহারই শক্তিব জ্যোতিতে পবিণত হয। আমাদের আত্মসমর্পণে যে প্রেমের আবেগ তাহাই আমাদিগকে তাঁহাব নিকটে পৌঁছাইযা দেয এবং তাঁহার স্বরূপেব গভীবতম বহস্য উদ্ঘাটিত কবিযা দেয। এই যে ত্রিধা সাধনা, উত্তম রহস্যেব দ্বার খুলিবার ত্রিধা শক্তি, প্রেমেব দ্বাবাই তাহা সম্পূর্ণ হয়, প্রেমেব দ্বাবাই তাহা পূর্ণতম সিদ্ধি লাভ কবে।

আমাদেব আত্মসমর্পণ কার্যকবী হইতে হইলে প্রথমেই চাই যেন উহাতে পূর্ণ জ্ঞান থাকে। অতএব সর্বপ্রথমেই এই পুরুষকে জানিতে হইবে তাঁহার দিব্য সত্তাব সকল শক্তিতে ও সকল তত্ত্বে, তত্ত্বতঃ, সনাতন মূল স্বরূপে এবং জীবনলীলায়, সকলেব পূর্ণ সামঞ্জস্যে। কিন্তু প্রাচীনদের নিকট এই জ্ঞানের, তত্ত্বজ্ঞানেব মূল্য কেবল এই ছিল যে, ইহাব শক্তিতে আমবা মবজীবন হইতে মুক্তিলাভ করিয়া এক পবম জীবনেব অমৃতত্ব লাভ কবিতে পাবি। কিন্তু এই মুক্তিও উচ্চতমভাবে কিরূপে গীতাব নিজস্ব অধ্যাত্ম সাধনাব পবিণামে লাভ করা যায, গীতা এখানে তাহাই দেখাইতেছে। গীতাব কথাব মর্ম এই যে, পুরুষোত্তমের জ্ঞানই ব্রহ্ম সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞান। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, যাহারা আমাকে তাহাদেব আশ্রয বলিয়া অবলম্বন কবে—মামাশ্রিত্য, তাহাদেব দিব্য জ্যোতি, তাহাদের মুক্তিদাতা, তাহাদেব আত্মার গ্রহীতা ও আশ্রযদাতা বলিযা ভজনা কবে—যাহাবা জবা ও মরণ হইতে,

মরজীবন এবং ইহার বন্ধন হইতে মুক্তিলাভের জন্য অধ্যাত্মসাধনায় আমার শরণাপন্ন হয়, তাহারা "সেই ব্রহ্মকে" জানিতে পারে, সমগ্রভাবে অধ্যাত্মপ্রকৃতিকে জানিতে পারে এবং অখিল কর্মকে জানিতে পারে।[১] আর যেহেতু তাহারা আমাকে জানে এবং সেই সঙ্গেই অধিভূত, অধিদৈব এবং অধিযজ্ঞকে জানে, সেই জন্য এই দেহের জীবন ছাড়িয়া যাইবার সন্ধিক্ষণেও আমার সম্বন্ধে জ্ঞান তাহাদের থাকে এবং সেই মুহূর্তে তাহাদের সমগ্র চেতনাকে আমার সহিত যুক্ত করিয়া রাখে।[২] সেই জন্যই তাহারা আমাকে পায়। মরজীবনে আর বদ্ধ না থাকায় উহারা উচ্চতম দিব্য পদ ঠিক তাহাদেরই ন্যায় লাভ করে যাহারা নৈর্ব্যক্তিক (impersonal) অক্ষর ব্রহ্মে তাহাদের স্বতন্ত্র সত্তাকে লয় করে। এই নিঃসংশয় সিদ্ধান্ত দিয়াই গীতা সপ্তম অধ্যায় শেষ করিয়াছে।

এখানে আমরা কয়েকটি কথা পাইতেছি, তাহাদের মধ্যেই ভগবানের জগৎলীলায় আত্মপ্রকাশ সম্বন্ধে প্রধান প্রধান মূল সত্যগুলি সংক্ষেপে রহিয়াছে। ভগবানের সৃষ্টিসূত্র ও কার্যপ্রণালীর সকল দিকই উহাদের মধ্যে আছে, জীবাত্মাকে পূর্ণ আত্মজ্ঞানে ফিরিয়া যাইতে হইলে যাহা কিছু প্রয়োজন সবই এখানে রহিয়াছে। প্রথমেই আছে, "সেই ব্রহ্ম"—তদ্‌ব্রহ্ম, পরে প্রকৃতিতে আত্মার মূল প্রকাশ—অধ্যাত্ম; তাহার পর, অধিভূত এবং অধিদৈব যথাক্রমে বহির্জগতের ব্যাপার এবং অন্তর্জগতের ব্যাপার; শেষে, অধিযজ্ঞ, ইহাই জাগতিক কর্ম ও যজ্ঞের নিগূঢ় রহস্য। শ্রীকৃষ্ণ যাহা বলিলেন তাহা ফলত এই—"আমি পুরুষোত্তম (*মাং বিদুঃ*), আমি এই সকলেরই উপরে, তথাপি এই সকলেরই মধ্য দিয়া এবং ইহাদের পারস্পরিক সম্বন্ধের সহায়তাতেই আমাকে সন্ধান করিতে হইবে, জানিতে হইবে—মানুষের চেতনা যে আমাকে ফিরিয়া পাইবার পথ খুঁজিতেছে, তাহার পক্ষে ইহাই একমাত্র পূর্ণ সাধনা।" কিন্তু কেবল এই শব্দগুলি হইতেই ইহাদের অর্থ প্রথমে স্পষ্ট বুঝা যায় না, অন্তত ইহাদের নানারূপ অর্থ করা যাইতে পারে। এই সকল শব্দের দ্বারা ঠিক কি বুঝাইতেছে, তাহা নির্ণয় করিতে হইবে, এবং আদর্শ শিষ্য অর্জুনও তৎক্ষণাৎ তাহাদের ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ সংক্ষেপে উত্তর দিলেন—শুধু তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা করিতে গীতা কোথাও বেশীক্ষণ দাঁড়ায় নাই, গীতা কেবল ততটুকুই এমনভাবে দিয়াছে যেন তাহাদের সত্যটি ধরিতে পারা যায়, এবং সাধক নিজেই অনুভূতি উপলব্ধি লাভ করিতে করিতে অগ্রসর হইতে পারে। প্রাতিভাসিক (the phenomenal) জগতের বিপরীত স্বপ্রতিষ্ঠ (*self-existent*) সত্তাকে বুঝাইতে উপনিষদ্ একাধিকবার "তদ্‌ব্রহ্ম" এই বাক্য ব্যবহার করিয়াছে; মনে হয় এই বাক্যের দ্বারা গীতা আত্মার অক্ষর

[১] জরামরণমোক্ষায় মামাশ্রিত্য যতন্তি যে।
তে ব্রহ্ম তদ্‌বিদুঃ কৃৎস্নমধ্যাত্মং কর্ম চাখিলম্॥৭।২৯

[২] সাধিভূতাধিদৈবং মাং সাধিযজ্ঞঞ্চ যে বিদুঃ।
প্রয়াণকালেঽপি চ মাং তে বিদুর্যুক্তচেতসঃ॥৭।৩০

প্রতিষ্ঠাকে (the immutable self-existence) বুঝিয়াছে, ইহাই ভগবানের শ্রেষ্ঠ আত্মাভিব্যক্তি এবং ইহারই অপরিবর্তনীয় আনন্ত্যের উপরে বাকী সব—যাহা কিছু চলিতেছে, বিকশিত হইতেছে সেই সব—প্রতিষ্ঠিত—অক্ষরম্ পরম্।[১] পরা প্রকৃতিতে জীবের যে আধ্যাত্মিক ভাব ও মূল প্রকাশের ধারা—স্বভাব, গীতার মতে তাহাই অধ্যাত্ম—স্বভাবোঽধ্যাত্মমুচ্যতে। গীতা বলিয়াছে, সৃষ্টির প্রেরণা ও শক্তিকেই কর্ম বলা হয়—বিসর্গঃ কর্ম্মসঞ্জিতঃ। ঐ প্রথম মূল আত্মপ্রকাশ বা স্বভাব হইতে কর্মই বস্তুত সকলকে সৃজন করিতেছে এবং এই স্বভাবের বশেই কার্য করিতেছে, সৃষ্টি করিতেছে, প্রকৃতিতে বিশ্বলীলা প্রকট করিতেছে। ক্ষরলীলার ফলে যাহা কিছুর আবির্ভাব হইতেছে, অধিভূত বলিতে সেই সমস্তই বুঝিতে হইবে—অধিভূতং ক্ষরোভাবঃ, প্রকৃতিতে যে পুরুষ বিরাজ করিতেছেন—প্রকৃতিস্থ আত্মা—তিনিই অধিদৈব। তাঁহার মূল সত্তার যে সব ক্ষরভাব কর্ম প্রকৃতিতে প্রকট করিতেছে, পুরুষের চেতনায় সেসব প্রতিফলিত হইতেছে। অন্তর্যামী পুরুষ সেই সব দেখিতেছেন, উপভোগ করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, "কর্মের ও যজ্ঞের অধিপতি—অধিযজ্ঞ—বলিতে আমাকেই বুঝায়। আমি ভগবান, বিশ্বদেব, পুরুষোত্তম—এখানে এই সব দেহধারীদের মধ্যে আমি গুপ্তভাবে বিরাজ করিতেছি।" অতএব যাহা কিছু আছে—সর্ব্বমিদং—সবই এই কয়েকটি শব্দের সূত্রের মধ্যে পড়িয়াছে।

গীতা এই সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়া জ্ঞানের দ্বারা অন্তিমে যে মুক্তিলাভ করা যায় তাহাই অবিলম্বে বুঝাইতে অগ্রসর হইয়াছে। পূর্ব অধ্যায়ের শেষ শ্লোকে এইরূপ মুক্তিই ইঙ্গিত করা হইয়াছে। অবশ্য পরে গীতা আবার এই কথার আলোচনা করিবে, এ সম্বন্ধে আরও এমন ব্যাখ্যা দিবে কর্মের জন্য এবং আভ্যন্তরীণ উপলব্ধির জন্য যাহা আবশ্যক। ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা এই সকল শব্দ বলিতে যাহা কিছু বুঝায় সেই সবের আরও পূর্ণ জ্ঞানের জন্য অপেক্ষা করিতে পারি। কিন্তু আর অগ্রসর হইবার পূর্বে, এখানে এবং ইহার আগে যাহা বলা হইয়াছে তাহা হইতেই এই সকল বস্তুর পারস্পরিক সম্বন্ধ যতটা বুঝা যায়, তাহা নির্ণয় করা আবশ্যক। কারণ, এখানে বিশ্বলীলার ধারা সম্বন্ধে গীতার মতটি ব্যক্ত হইয়াছে। প্রথমত রহিয়াছে ব্রহ্ম—ইহা উচ্চতম অক্ষর আত্মপ্রতিষ্ঠ (self-existent) সত্তা; দেশ-কাল-নিমিত্তের মধ্যে বিশ্বপ্রকৃতির যে খেলা চলিতেছে তাহার পশ্চাতে সর্বভূত বস্তুত ব্রহ্ম। কারণ, ঐ আত্মপ্রতিষ্ঠা আছে বলিয়াই দেশ, কাল, নিমিত্তের থাকা সম্ভব হইয়াছে। ঐ অপরিবর্তনশীল সর্বব্যাপী অথচ অখণ্ড আধার যদি না থাকিত, তাহা হইলে দেশ, কাল, নিমিত্তের বিভাগ এবং নামরূপের খেলা সম্ভব

[১] অক্ষরং ব্রহ্ম পরমং স্বভাবোঽধ্যাত্মমুচ্যতে।
ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কর্ম্মসংজ্ঞিতঃ॥
অধিভূতং ক্ষরো ভাবঃ পুরুষশ্চাধিদৈবতম্
অধিযজ্ঞোঽহমেবাত্র দেহে দেহভৃতাং বর॥৮।৩-৪

হইত না। কিন্তু নিজে ঐ অক্ষর ব্রহ্ম কিছুই করে না, কোন কিছুর কারণ হয় না, কোন কিছু সঙ্কল্প করে না। ইহা নিরপেক্ষ (impartial), সম, সকলকেই ধরিয়া আছে, কিন্তু কিছুই বাছে না, কিছু উৎপাদন করে না। তাহা হইলে উৎপাদন করে কে, সঙ্কল্প করে কে, পরমপুরুষের দিব্য প্রেরণা দেয় কে? কর্মকে যে পরিচালিত করে এবং অনন্ত সত্তা হইতে কালের মধ্যে কার্যত বিশ্বলীলাকে প্রকট করে, সে কে? স্বভাবরূপে প্রকৃতি। পরাৎপর, ভগবান, পুরুষোত্তম রহিয়াছেন এবং তাঁহার অনন্ত অক্ষরতার উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাঁহার পরা অধ্যাত্ম শক্তির ক্রিয়াকে ধরিয়া রাখিয়াছেন। ভগবান যে দিব্য সত্তা, চৈতন্য, ইচ্ছা বা শক্তিকে বিস্তার করিতেছেন—যয়েদং ধার্যতে জগৎ—তাহাই পরা প্রকৃতি। ভগবান তাঁহার সত্তায় যাহা কিছু আপনা হইতে স্বতন্ত্র করিয়া ধরেন এবং জীবের অধ্যাত্ম প্রকৃতি বা স্বভাবে প্রকট করেন, সেসবেরই মূল শক্তি ও সত্যটি আত্মা ঐ পরা প্রকৃতিতে আত্মসম্বিতের আলোকেই দেখিতে পায়। প্রত্যেক জীবের অন্তর্নিহিত সত্য এবং মূল অধ্যাত্মতত্ত্ব, যাহা নিজেকে লীলার মধ্যে কার্যত প্রকাশ করিয়া ধরিতেছে, সংসার মধ্যে যে মূল দিব্য প্রকৃতি সকল পরিবর্তন, বিকৃতি, বিপর্যয়ের ভিতরেও দিব্য অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে, তাহাই স্বভাব। স্বভাবের মধ্যে যাহা নিহিত আছে সেসব বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে বিসৃষ্ট হইয়াছে, বিশ্বপ্রকৃতি যেন তাহা লইয়া পুরুষোত্তমের অন্তর্দৃষ্টির ছায়ায় যথাশক্তি ব্যবহার করে। নিত্য স্বভাবের মধ্য হইতে, প্রত্যেক ভূতের মূল প্রকৃতি ও অধ্যাত্মসত্তার মধ্য হইতে, প্রকৃতি নানা বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করিয়া উহাকে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিতেছে—নিজের নামরূপের সমস্ত পরিবর্তনের খেলা, দেশ-কাল-নিমিত্তের পরিবর্তনের খেলা প্রকট করিতেছে।[১]

এই সব অভিব্যক্তি, এবং অনবরত অবস্থা হইতে অবস্থার পরিবর্তন—ইহাই কর্ম, প্রকৃতির ক্রিয়া। প্রকৃতিই কর্মী, সৃষ্টির দেবী। স্বভাব যখন সৃষ্টিক্রিয়ায় নিজেকে বিস্তার করে (বিসর্গ), তাহাই কর্মের প্রথম রূপ। সৃষ্টি দুই প্রকারের—ভূত ও ভাব। সৃষ্টিতে যে সকল বস্তু আবির্ভূত হইতেছে, তাহারাই ভূত (ভূতকরঃ), এবং ঐ সকল বস্তু অন্তরে ও বাহিরে যে রূপ গ্রহণ করিতেছে তাহাই ভাব (ভাবকরঃ)। কালের মধ্যে নিয়ত এই সকল জিনিসেরই উৎপত্তি হইতেছে (উদ্ভব); কর্মের সৃষ্টিশক্তিই এই উদ্ভবের মূল। প্রকৃতির শক্তিসমূহের পরস্পর সংযোগে এই সব পরিবর্তনশীল লীলা প্রকট হইতেছে (অধিভূত)। ইহাই জগৎ, ইহাই জীবাত্মার চৈতন্যের বিষয়বস্তু (the object of the soul's consciousness)। এই সমুদয়ের মধ্যে জীবাত্মাই দ্রষ্টা ও ভোক্তাস্বরূপ প্রকৃতিস্থ দেবতা। মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়ের দিব্য শক্তিসমূহ—জীবাত্মা আপন চৈতন্যময় সত্তার যে সকল শক্তির দ্বারা প্রকৃতির খেয়ালকে নিজের মধ্যে প্রতিফলিত করে,

[১] দেশ ও কালের মধ্যে পর্যায়ক্রমে এক অবস্থা হইতে অন্য অবস্থার যে বিকাশ হইতেছে তাহাকেই আমরা নিমিত্ত (causality) বলি।

তাহাদিগকে লইয়াই অধিদৈব। অতএব এই প্রকৃতিস্থ আত্মাই ক্ষর পুরুষ, ইহাই পরিবর্তনশীল আত্মা, ভগবানের শাশ্বত কর্মলীলা। এই আত্মা যখন প্রকৃতি হইতে সরিয়া ব্রহ্মে অবস্থিত, তখন ইহাই অক্ষর পুরুষ, অপরিবর্তনশীল আত্মা, ভগবানের শাশ্বত নিষ্ক্রিয়তা। কিন্তু ক্ষর পুরুষের দেহ ও রূপের মধ্যে দিব্য পরম পুরুষ বাস করেন। মানুষের মধ্যে পুরুষোত্তম রহিয়াছেন, তাঁহাতে অক্ষর সত্তার শান্তি রহিয়াছে। আবার সেই সঙ্গেই তিনি ক্ষরলীলাও উপভোগ করিতেছেন। তিনি যে কেবল বিশ্বের অতীত এক পরম পদে আমাদের নিকট হইতে বহুদূরে রহিয়াছেন শুধু তাহাই নহে, তিনি এখানেও সর্বভূতের দেহের মধ্যে রহিয়াছেন, প্রকৃতিতে এবং মানুষের হৃদ্দেশে বিরাজ করিতেছেন। এখানে তিনি প্রকৃতির কর্মসমূহকে যজ্ঞরূপে গ্রহণ করিতেছেন এবং মানুষ সজ্ঞানে তাঁহার নিকট আত্মসমর্পণ করিবে সেই অপেক্ষায় রহিয়াছেন। কিন্তু সকল সময়ে, এমনকি মানুষের অজ্ঞান ও অহঙ্কারের মধ্যেও, তিনি মানুষের স্বভাবের অধীশ্বর এবং তাহার সকল কর্মের প্রভু। তাঁহার অধ্যক্ষতাতেই প্রকৃতি ও কর্মের ক্রিয়া চলে। তাঁহা হইতেই জীবাত্মা প্রকৃতির ক্ষরলীলায় আবির্ভূত হয়; অক্ষর আত্মপ্রতিষ্ঠার ভিতর দিয়া জীবাত্মা আবার তাঁহাতেই ফিরিয়া যায়, ভগবানের পরমপদ লাভ করে—পরমং ধাম।

জগতে জন্মগ্রহণ করিয়া মানুষ প্রকৃতি এবং কর্মের ক্রিয়ার বশে জগৎ হইতে জগদন্তরে গমনাগমন করে। প্রকৃতিস্থ পুরুষ (Purusha in Prakriti) ইহাই তাহার সূত্র তাহার মধ্যে আত্মা যাহা চিন্তা করে, যাহা ভাবে, যাহা করে সে সর্বদা তাহাই হয়। পূর্বজন্মে সে যাহা ছিল, যাহা করিয়াছে, সেই সবের দ্বারাই তাহার বর্তমান জন্ম নির্ধারিত হইয়াছে। আবার এই জন্মে মৃত্যুকাল পর্যন্ত সে যেরূপ থাকিবে, যাহা ভাবিবে, যাহা করিবে সেই সবের দ্বারাই নির্ধারিত হইবে যে, সে পরলোকে কি হইবে এবং পরজন্মেই বা কি হইবে। জন্ম যদি "হওয়া" (becoming), তাহা হইলে মৃত্যুও "হওয়া", মৃত্যু কোনক্রমেই ফুরাইয়া যাওয়া নহে। শরীর পরিত্যক্ত হয়, কিন্তু জীবাত্মা আপনার পথেই চলিতে থাকে (ত্যক্ত্বা কলেবরম্)। অতএব তাহার মহাযাত্রার সন্ধিক্ষণে সে কিরূপ থাকে তাহার উপর অনেকখানি নির্ভর করে। কারণ যেরূপ "হওয়া"র উপর তাহার চিত্ত মৃত্যুকালে নিবিষ্ট থাকে এবং মৃত্যুর পূর্বেও সর্বদা যাহার চিন্তায় পূর্ণ ছিল, তাহাকে সেই রূপই পাইতে হয়। কারণ প্রকৃতি কর্মের দ্বারা জীবাত্মার চিন্তা ও শক্তিসকলের বিকাশ করে। বস্তুত উহাই তাহার একমাত্র কাজ। অতএব, মানবাত্মা যদি পুরুষোত্তমের পদ লাভ করিতে চায়, তাহা হইলে দুইটি জিনিসের প্রয়োজন। দুইটি শর্ত পূর্ণ করিতেই হইবে; তবেই উহা সম্ভব হইতে পারিবে। পার্থিব জীবনে তাহার সমগ্র অন্তর্জীবনকে ঐ আদর্শের দিকে গড়িয়া তোলা চাই; এবং মৃত্যুকালেও তাহার সেই আদর্শ ও আকাঙ্ক্ষাকে ঐকান্তিকভাবে ধরিয়া থাকা চাই। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, "যে কেহ অন্তিমকালে আমাকে অনুস্মরণপূর্বক তাহার দেহত্যাগ করিয়া গমন

কবে, সে আমার ভাব অর্থাৎ পুরুষোত্তমের ভাব প্রাপ্ত হয়।"[১] ভগবানেব মূল সত্তার সহিত সে মিলিত হয। তাহাই জীবাত্মাব চবম গতি (পবো ভাব)। এইখানেই কর্মেব শেষ পবিণতি—কর্ম এখানে নিজেব মধ্যে আপনাব উৎসে ফিরিয়া আসিযাছে। বিশ্বলীলার মধ্যে আসিয়া জীবাত্মাব মূল অধ্যাত্ম প্রকৃতি, স্বভাব, ঢাকা পডিয়া যায, তাহাব চৈতন্যের অন্যান্য প্রাতিভাসিক ভাবেব বিকাশ হয—তম্ তম্ ভাবম্। জীবাত্মা যখন এই বিকাশের লীলা অনুসবণ কবিযা তাহাব সকল প্রাতিভাসিক ভাবেব ভিতর দিয়াই চলিযা আসিয়াছে, তখন সে তাহাব সেই মূল প্রকৃতিতে ফিবিয়া যায; এবং এইরূপে ফিরিয়া গিযা তাহাব প্রকৃত অধ্যাত্ম সত্তার, আত্মার, সন্ধান পায এবং শ্রেষ্ঠ গতি লাভ কবে (মদ্ভাবম্)। এক হিসাবে বলিতে পারা যায় যে, সে তখন ভগবান হয়, কাবণ, তাহাব প্রাতিভাসিক প্রকৃতি ও জীবনের চরম রূপান্তর সাধনের দ্বারা সে ভগবানেব প্রকৃতিব সহিতই মিলিত হয়।

এখানে গীতা মৃত্যুকালীন মনের ভাব ও চিন্তাব উপর বিশেষ জোর দিযাছে। গীতা কেন এইরূপ জোর দিয়াছে তাহা বুঝা কঠিন হইবে যদি আমবা চৈতন্যের আত্মসৃজনী শক্তি (self-creative power of the consciousness) যাহাকে বলা যাইতে পারে সেই শক্তির পরিচয না লই। আন্তবিক ভক্তি, শ্রদ্ধা এবং পূর্ণ ও ঐকান্তিক সঙ্কল্পের সহিত চিন্তা যাহার উপব নিবদ্ধ হয়, আমাদেব আভ্যন্তবীণ সত্তারও তাহাতে পবিবর্তিত হইবাব সম্ভাবনা হয। এই সম্ভাবনা নিশ্চিত শক্তিতে পরিণত হয যখন আমরা সেই সকল উচ্চতব অধ্যাত্ম এবং আত্মবিকশিত অনুভূতিতে যাই যেগুলি আমাদেব সাধাবণ মনস্তত্ত্বেব ন্যায বাহ্য জিনিসের অধীন নহে (এই সাধাবণ মনস্তত্ত্ব বাহ্যপ্রকৃতিব অধীনতাপাশে বদ্ধ)। সেখানে আমরা দেখিতে পাই যে, যাহাতে আমাদের মনকে নিবদ্ধ কবিয়া বাখি এবং সর্বদা যেদিকে উন্মুখ হইয়া থাকি, আমবা নিশ্চিতভাবে ক্রমশ তাহাই হইযা উঠি। অতএব সেখানে চিন্তার কোন চ্যুতি, স্মৃতিব কোন ভ্রংশতা হইলেই ঐ পরিবর্তনের ব্যাঘাত হইবে, অথবা ইহার ক্রিয়াব কিছু অধঃপতন হইবে এবং আমরা যাহা ছিলাম আবার সেই দিকেই ফিরিয়া যাইব—অন্তত যতক্ষণ না মূলত অনিবর্ত্য ভাবে আমরা আমাদের নূতন ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইতেছি ততক্ষণ এরূপ অধঃপতনের আশঙ্কা আছে। যখন আমবা ঐরূপ প্রতিষ্ঠা লাভ কবিযাছি, যখন উহা আমাদের সাধারণ অনুভূতির উপলব্ধিব বিষয হইয়াছে, তখন উহাব স্মৃতি আপনা হইতেই থাকে; কাবণ তখন উহাই হয় আমাদেব চৈতন্যেব স্বাভাবিক স্বরূপ। এই মরজীবন ছাড়িযা যাইবার সন্ধিক্ষণে আমাদেব মনেব ভাব কিরূপ থাকে তাহার প্রয়োজনীযতা এখন বুঝা গেল। কিন্তু সমস্ত জীবন মনে না কবিযা

[১] অন্তকালে চ মামেব স্মবন্মুক্ত্বা কলেববম্।
যঃ প্রযাতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশযঃ॥৮।৫

কেবল মৃত্যুকালে মনে করিলে, অথবা আমাদের সমস্ত জীবন ধরিযা যথেষ্টভাবে প্রস্তুত না হইলে শুধু মৃত্যুকালীন অনুস্মবণ আমাদিগকে এইরূপ উদ্ধার করিতে পাবে না। লৌকিক ধর্মসকল মুক্তিলাভেব যেসব সহজ পথ দেখাইয়া দেয়, তাহাদেব সহিত গীতাব শিক্ষাব সাদৃশ্য নাই। মৃত্যুকালে ধর্মযাজক আসিয়া মুক্তির পথ পবিষ্কাব কবিযা দিবে, সাবাজীবন পাপে কাটাইয়াও এইভাবে শেষকালে খ্রীস্টানোচিত পবিত্র মৃত্যু ("Christian death") হইবে, অথবা পবিত্র কাশীধামে বা গঙ্গাতীবে মবিতে পাবিলেই মুক্তিলাভেব জন্য আব কিছুরই প্রযোজন হয না—এই সব অজ্ঞান কল্পনার সহিত গীতার শিক্ষা কোথাও মেলে না। যে দিব্য অধ্যাত্মভাবের উপব মনকে দৈহিক মৃত্যুব সময়ে দৃঢ়ভাবে নিবদ্ধ কবিযা বাখিতে হইবে—যম্ স্মবন্ ভাবম্ ত্যজতি অন্তে কলেবরম্—দৈহিক জীবনেও প্রতি মুহূর্তে আত্মাকে অন্তরে সেইভাবে গড়িযা উঠিতে হইবে—সদা তদভাবভাবিতঃ।[১] শ্রীগুরু বলিলেন "অতএব সকল সময়ে আমাকে স্মরণ কব, এবং যুদ্ধ কব, কাবণ যদি তোমাব মন বুদ্ধি সকল সময়ে আমাতে নিবদ্ধ বাখিতে পাব এবং আমাতে অর্পণ কবিতে পাব—ময্যর্পিতমনোবুদ্ধিঃ—তাহা হইলে নিশ্চয তুমি আমাতেই আসিবে। কাবণ সর্বদা যোগ অভ্যাসের দ্বারা অনন্যচিত্ত হইযা তাঁহাকে ভাবিতে ভাবিতে লোক দিব্য পরমপুরুষকে প্রাপ্ত হয।"[২]

এখানে আমবা এই পরমপুরুষেব প্রথম বর্ণনা পাইতেছি—ইনি ভগবান, ইনি অক্ষব অপেক্ষাও মহত্তব ও বৃহত্তব, গীতা পরে ইঁহাকেই পুরুষোত্তম নাম দিয়াছে। তাঁহাব কালাতীত অনন্ততায তিনিও অক্ষর এবং এই সব ব্যক্ত প্রপঞ্চের বহু উপবে, কালেব মধ্যে আমরা তাঁহার সত্তার সামান্য আভাস মাত্র পাই নানা বিচিত্র রূপ ও ছদ্মবেশের মধ্য দিয়া (অব্যক্তোঽক্ষরঃ)। তথাপি তিনি শুধুই অরূপ অনির্দেশ্য নহেন, অথবা তিনি কেবল এই জন্যই অনির্দেশ্য যে, মানুষের মন যত বেশী সূক্ষ্মতাব ধাবণা কবিতে পারে, তিনি তাহা হইতেও সূক্ষ্ম এবং ভগবানের রূপ আমাদেব চিন্তাব অতীত—অণোবণীযাংসম্ অচিন্ত্যরূপম্।[৩] এই পরমপুরুষ পবমাত্মাই দ্রষ্টা, অতি পুবাতন। তাঁহার অনন্ত আত্মদৃষ্টি ও জ্ঞানে তিনিই সমগ্র বিশ্বেব প্রভু এবং শাস্তা। তিনি তাঁহার সত্তাব মধ্যে এই বিশ্বের যাবতীয় বস্তুকে

[১] যং যং বাপি স্মবন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেববম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ॥৮।৬
[২] তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু মামনুস্মব যুধ্য চ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্মামেবৈষ্যস্যসংশযম্॥৮।৭
অভ্যাসযোগযুক্তেন চেতসা নান্যগামিনা।
পবমং পুরুষং দিব্যং যাতি পার্থানুচিন্তযন্॥৮।৮
[৩] কবিং পুবাণমনুশাসিতাবমণোবণীযাংসমনুস্মবেদ্ যঃ।
সর্ব্বস্য ধাতাবমচিন্ত্যরূপমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পবস্তাৎ॥৮।৯

যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়া রাখিয়াছেন—কবিম্ পুরাণম্ অনুশাসিতারম্ সর্ব্বস্য ধাতারম্। বেদবিদ্‌গণ যে স্বয়ম্ভূ অক্ষরব্রহ্মের কথা বলেন, এই পরমাত্মাই সেই ব্রহ্ম। যতিগণ তপস্যার দ্বারা মানসিক বিক্ষেপসমূহের উপর উঠিয়া ইঁহার মধ্যেই প্রবেশ লাভ করেন, ইঁহাকেই পাইবার জন্য তাঁহারা ইন্দ্রিয়সংযম অভ্যাস করেন।[১] সেই অনন্ত সদ্বস্তু সর্বশ্রেষ্ঠ গতি, স্থান, পদ (অতএব কালের মধ্যে জীবাত্মার যে বিকাশ হইতেছে, সেই বিকাশলীলার ইহাই পরম লক্ষ্য); কিন্তু ইহার মধ্যে কোন বিকাশের খেলা নাই, ইহা আদি, সনাতন, পরম অবস্থা বা স্থান—পরমম্ স্থানম্ আদ্যম্।

যোগী অন্তিমকালে মনের যে ভাবে থাকিয়া জীবন হইতে মৃত্যুর ভিতর দিয়া এই পরম দিব্য স্থানে পৌঁছান, গীতা তাহারই বর্ণনা করিতেছে। অচঞ্চল মন, যোগবলে বলীয়ান আত্মা, ভক্তিতে ভগবানের সহিত যোগ (জ্ঞানের দ্বারা নিরাকারের সহিত যোগ থাকে বলিয়া ভক্তিযোগ নিষ্প্রয়োজন হয় না, শেষ পর্যন্ত এই ভক্তি পরম যোগশক্তির অঙ্গরূপেই বিদ্যমান থাকে), এবং প্রাণশক্তি ভ্রূমধ্যে, দিব্যদৃষ্টির অধিষ্ঠানে সংগৃহীত।[২] সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বার রুদ্ধ হয়, মনকে হৃদয়ে নিরোধ করা হয়, প্রাণশক্তিকে বিক্ষেপ হইতে সংগ্রহ করিয়া মস্তকের মধ্যে সন্নিবেশিত করা হয়; বুদ্ধি ওম্ এই পবিত্র অক্ষরের উচ্চারণ এবং ইহার ভাব ধারণা করিতে এবং পরম পুরুষকে স্মরণ করিতে একাগ্র হয়, (মামনুস্মরন্)।[৩] ইহাই দেহত্যাগের প্রচলিত যৌগিক পন্থা—বিশ্বাতীত অনন্তের নিকট সমগ্র শেষ সমর্পণ। তথাপি, ইহা কেবল একটি প্রক্রিয়া মাত্র, মূল প্রয়োজন হইতেছে, জীবনে এমনকি যুদ্ধ ও কর্মের মধ্যেও, সর্বদা অব্যভিচারী ভাবে ভগবানকে স্মরণ করা—মাম্ অনুস্মর যুধ্য চ, এবং সমগ্র জীবনযাত্রাকে বিরতিহীন যোগে পরিণত করা (নিত্যযোগ)।[৪] ভগবান বলিলেন, "যে ইহা করে সে অনায়াসে আমাকে লাভ করে, সেই মহাত্মাই পরম সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়।"[৫]

এইরূপ জীব যখন দেহত্যাগ করিয়া যায়, তখন সে যে অবস্থায় পৌঁছায় তাহা

[১] যদক্ষরং বেদবিদো বদন্তি বিশন্তি যদ্‌যতয়ো বীতরাগাঃ।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি তৎ তে পদং সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে॥৮।১১

[২] প্রয়াণকালে মনসাঽচলেন ভক্ত্যা যুক্তো যোগবলেন চৈব।
ভ্রুবোর্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য সম্যক্ স তং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্॥৮।১০

[৩] সর্ব্বদ্বারাণি সংযম্য মনো হৃদিনিরুদ্ধ্য চ।
মূর্ধ্ন্যাধায়াত্মনঃ প্রাণমাস্থিতো যোগধারণাম্॥
ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ মামনুস্মরন্।
যঃ প্রযাতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্॥৮।১২-১৩

[৪] অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।
তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ॥৮।১৪

[৫] মামুপেত্য পুনর্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতম্।
নাপ্নুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ॥৮।১৫

বিশ্বাতীত (*supracosmic*) অবস্থা। বিশ্বপ্রপঞ্চে যে সকল উচ্চতম স্তরের জগৎ রহিয়াছে, সেখান হইতেও পুনর্জন্মে ফিরিয়া আসিতে হয়; কিন্তু যে জীব পুরুষোত্তমে গমন করিয়াছে সে আর পুনর্জন্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য নহে।[১] অতএব জ্ঞানের দ্বারা অনির্দেশ্য ব্রহ্মের উপাসনা করিয়া যে ফলই পাওয়া যাউক, অন্যতম পূর্ণ উপাসনা জ্ঞান, কর্ম ও প্রেমের সম্মিলনের দ্বারা সর্বকর্মের অধীশ্বর, সকল মানুষের ও সর্বভূতের সুহৃদ স্বয়ম্ভূ ভগবানের উপাসনা করিয়াও সেই ফল পাওয়া যায়। তাঁহাকে এইরূপে জানায় এবং এইভাবে তাঁহার উপাসনা করায় পুনর্জন্মে বা কর্মশৃঙ্খলে বদ্ধ হইতে হয় না; মরলোকের অনিত্য দুঃখময় অবস্থা হইতে (দুঃখালয়ম্ অশাশ্বতম্) চিরন্তন মুক্তিলাভ করিতে জীবের যে আকাঙ্ক্ষা, জীব তাহা পূর্ণ করিতে পারে। জন্মান্তর-চক্র এবং সেই চক্র হইতে মুক্তিলাভ বিষয়ে আরও স্পষ্ট ধারণা দিবার জন্য গীতা এখানে জগৎচক্রের পরিবর্তন সম্বন্ধে প্রাচীন ভারতে যে মত সুপ্রচলিত ছিল তাহাই গ্রহণ করিয়াছে। জগৎ যে সময়ে প্রকট থাকে তাহাকে ব্রহ্মার দিবস বলা হয়, জগৎ যে সময়ে অপ্রকট থাকে তাহাকে ব্রহ্মার রজনী বলা হয়। কালের পরিমাণে উভয়েই সমান। ব্রহ্মার কর্ম চলে সহস্রযুগ ধরিয়া, আবার ব্রহ্মার নিদ্রাও সহস্র নীরব যুগ।[২] দিবসাগমে ব্যক্ত বস্তু সকল অব্যক্তের মধ্য হইতে আবির্ভূত হয়, রাত্রি সমাগমে সকলে অদৃশ্য হয় বা অব্যক্তের মধ্য লীন হয়।[৩] এইরূপে সর্বভূত অবশভাবে প্রকাশ ও প্রলয়ের চক্রে ঘুরিতেছে, পুনঃপুনঃ তাহারা দিবসাগমে আবির্ভূত হইতেছে (ভূত্বা ভূত্বা), এবং অবিরত তাহারা রাত্রিসমাগমে অব্যক্তের মধ্যে ফিরিয়া যাইতেছে।[৪] কিন্তু এই অব্যক্তই ভগবানের দিব্য আদ্য অবস্থা নহে, তাঁহার আর এক অবস্থা (ভাবোঽন্যঃ) আছে, বিশ্বের এই অব্যক্তাবস্থার উপরেও এক বিশ্বাতীত অব্যক্ত, তাহা অনন্তকাল স্বপ্রতিষ্ঠ, তাহা এই ব্যক্ত বিশ্বের বিপরীত অব্যক্ত নহে কিন্তু ইহার বহু উপরে, ইহা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন, অপরিবর্তনীয়, সনাতন—সর্বভূত বিনষ্ট হইলেও তাহা বিনষ্ট হয় না।[৫] "তাঁহাকেই অব্যক্ত অক্ষর বলা হয়, তাঁহাকেই লোকে পরমাত্মা এবং পরমা গতি বলে। যাহারা তাঁহাতে পৌঁছায় তাহাদিগকে আর ফিরিতে হয় না;

আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে॥৮।১৬
সহস্রযুগপর্যান্তমহর্যদ্ ব্রহ্মণো বিদুঃ।
রাত্রিং যুগসহস্রান্তাং তেঽহোরাত্রবিদো জনাঃ॥৮।১৭
অব্যক্তাদ্ব্যক্তয়ঃ সর্ব্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে।
রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে॥৮।১৮
ভূতগ্রামঃ স এবায়ং ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে।
রাত্র্যাগমেঽবশঃ পার্থ প্রভবত্যহরাগমে॥৮।১৯
পরস্তস্মাত্তু ভাবোঽন্যোঽব্যক্তোঽব্যক্তাৎ সনাতনঃ।
যঃ স সর্ব্বেষু ভূতেষু নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি॥৮।২০

তাহাই আমার পরম ধাম।"[১] কারণ, যে জীবাত্মা সেখানে পৌঁছিয়াছে, সে বিশ্বের প্রকাশ ও প্রলয় চক্র হইতে মুক্ত হইয়া গিয়াছে।

জগৎচক্র সম্বন্ধে এই মত আমরা গ্রহণ করি আর না করি, ("অহোরাত্র-বিদ্"গণের জ্ঞানের মূল্য আমাদের কাছে কতখানি তাহার উপরেই উহা নির্ভর করে) গীতা ইহাকে যেভাবে ব্যবহার করিয়াছে তাহাই দ্রষ্টব্য। সহজেই ধারণা হইতে পারে, এই যে সনাতন, অব্যক্ত সত্তা, যাহার পরম ভাবের সহিত বিশ্বের অভিব্যক্তি বা লয়ের কোনই সম্বন্ধ নাই বলিয়া মনে হয়, উহাই চির-অনির্দেশ্য, অজ্ঞাত, নিরুপাধিক ব্রহ্ম, এবং উহাতে পৌঁছিতে হইলে, জীবনলীলায় আমরা যাহা হইয়াছি সেই সব বর্জন করাই আমাদের পক্ষে প্রকৃত পন্থা। মনের জ্ঞান, হৃদয়ের ভক্তি, যৌগিক ইচ্ছা, জাগ্রত প্রাণশক্তি—এই সব সম্মিলিতভাবে একাগ্র করিয়া উহার দিকে আমাদের সমগ্র আন্তর চেতনাকে লইয়া যাওয়া ঠিক পথ নহে। বিশেষত যে নির্বিশেষ ব্রহ্ম সকল সম্বন্ধশূন্য, অব্যবহার্য, তাহার প্রতি ভক্তি প্রযোজ্য বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু, গীতা জোর দিয়াই বলিয়াছে, যদিও এই অবস্থা বিশ্বাতীত, এবং যদিও ইহা চির-অব্যক্ত, তথাপি "সেই পরম পুরুষকে অনন্য ভক্তির দ্বারাই লাভ করিতে হইবে, যাঁহার মধ্যে সর্বভূত বিরাজ করিতেছে, যিনি এই সমগ্র জগৎকে বিস্তার করিয়াছেন।"[২] অর্থাৎ এই পরম পুরুষ আমাদের মায়ার জগৎ হইতে দূরে অবস্থিত একেবারে সম্পূর্ণ সম্বন্ধশূন্য ব্রহ্ম নহেন। পরন্তু তিনি দ্রষ্টা, স্রষ্টা, এই জগৎসমূহের শাস্তা, কবিম্ অনুশাসিতারম্, ধাতারম্। তাঁহাকেই এক এবং সব, বাসুদেবঃ সর্বমিতি জানিয়া ও ভক্তি করিয়া, সকল বস্তু, সকল ঘটনা, সকল কর্মে তাঁহার সহিত আমাদের সমগ্র চেতনাকে যুক্ত করিয়াই আমাদিগকে পরমা গতি, পূর্ণ সিদ্ধি, চরম মুক্তির সাধনা করিতে হইবে।

তাহার পরই আরও রহস্যময় এক সিদ্ধান্তের বর্ণনা। এইটি গীতা প্রাচীন বৈদান্তিক সাধকগণের (*mystics*) নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছে। যোগী যদি পুনরায় মানবজন্ম গ্রহণ করিতে অভিলাষ করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে কোন্ সময়ে দেহত্যাগ করিতে হইবে, আর যদি পুনর্জন্ম এড়াইতে চান তাহা হইলেই বা তাঁহাকে কোন্ সময়ে দেহত্যাগ করিতে হইবে, তাহারই বর্ণনা।[৩] অগ্নি ও জ্যোতিঃ এবং ধূম বা কুহেলিকা, দিবস এবং রাত্রি, শুক্লপক্ষ এবং কৃষ্ণপক্ষ, উত্তরায়ণ এবং দক্ষিণায়ন—এইগুলি পরস্পর বিপরীত। প্রথমগুলিতে দেহত্যাগ করিয়া ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন, কিন্তু দ্বিতীয়গুলির দ্বারা যোগী চান্দ্রমস জ্যোতিঃপ্রাপ্ত হন এবং

[১] অব্যক্তোঽক্ষর ইত্যুক্তস্তমাহুঃ পরমাং গতিম্।
যং প্রাপ্য ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম॥৮।২১

[২] পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া।
যস্যান্তঃস্থানি ভূতানি যেন সর্বমিদং ততম্॥৮।২২

[৩] যত্র কালে ত্বনাবৃত্তিমাবৃত্তিঞ্চৈব যোগিনঃ।
প্রয়াতা যান্তি তং কালং বক্ষ্যামি ভরতর্ষভ॥৮।২৩

পরে তাঁহাকে মানবজন্মে ফিরিয়া আসিতে হয়।[১] এই দুইটিই শুক্ল ও কৃষ্ণমার্গ। উপনিষদে এই দুইটিকে যথাক্রমে দেবযান ও পিতৃযান বলা হইয়াছে। যে যোগী এই দুই মার্গের তত্ত্ব জানেন, তাঁহাকে আর কোন ভ্রমে পতিত হইতে হয় না।[২] এই তত্ত্বের পশ্চাতে জড়জগৎ ও মনোজগতের সম্বন্ধবিষয়ক যেকোন সত্য বা সঙ্কেতসূত্রই থাকুক[৩] (এই বিশ্বাস প্রাচীন সাধকদের যুগ হইতেই চলিয়া আসিতেছে। তাঁহারা প্রত্যেক জড়বস্তুতে মনোজগতের প্রকৃত সঙ্কেত দেখিতেন। তাঁহারা সর্বত্র ভিতরের সহিত বাহিরের, আলোকের সহিত জ্ঞানের, অগ্নির সহিত তপঃশক্তির পারস্পরিক ক্রিয়া ও কতকটা ঐক্যও নির্ণয় করিতেন)—আমাদিগকে কেবল দেখিতে হইবে যে, গীতা এখানে কথাটিকে কিভাবে ঘুরাইয়া শেষ করিয়াছে, "অতএব সকল সময়ে যোগযুক্ত থাক"—তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু যোগযুক্তো ভবার্জুন।

ফলত মূল কথা এই, সমস্ত সত্তাকে ভগবানের সহিত এক করা। এমন সমগ্রভাবে এবং সর্বতোভাবে এক, যেন সর্বদা স্বাভাবিকভাবে যোগযুক্ত হইয়া থাকা যায়। এবং এইরূপে সমগ্র জীবনটিকে, শুধু চিন্তা বা ধ্যানকে নহে, কিন্তু কর্ম, প্রয়াস, যুদ্ধ সবকেই ভগবানের অনুস্মরণে পরিণত করা। "আমাকে স্মরণ কর আর যুদ্ধ কর," ইহার অর্থ অনন্তের নিত্য অনুস্মরণ যেন অনিত্য সংসারের দ্বন্দ্বের মধ্যে মুহূর্তের জন্যও হারাইয়া না যায়। আর ইহা খুবই কঠিন, প্রায় অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়। বস্তুত ইহা কেবল তখনই সম্পূর্ণভাবে সম্ভব হয় যদি অন্যান্য প্রয়োজনগুলি পূর্ণ করা হয়। যদি আমরা আমাদের চেতনায় সকলের সহিত এক আত্মা হইয়া থাকি, সকল সময়ে আমাদের মনে থাকে যে, সেই এক আত্মা ভগবান, এবং আমাদের চক্ষু ও আমাদের অন্যান্য ইন্দ্রিয়গণ সর্বত্র ভগবানকে প্রত্যক্ষ ও অনুভব করে, যেন কোন জিনিসকে কেবল বাহ্যেন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু বলিয়া কখনও ভুল করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব হয়, পরন্তু ঐ বাহ্য রূপের মধ্যে

[১] অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুক্লঃ ষণ্মাসা উত্তরায়ণম্।
তত্র প্রয়াতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ॥
ধূমো রাত্রিস্তথা কৃষ্ণঃ ষণ্মাসা দক্ষিণায়নম্।
তত্র চান্দ্রমসং জ্যোতির্যোগী প্রাপ্য নিবর্ততে॥৮।২৪-২৫
শুক্লকৃষ্ণে গতী হ্যেতে জগতঃ শাশ্বতে মতে।
একয়া যাত্যনাবৃত্তিমন্যয়াবর্ততে পুনঃ॥
নৈতে সৃতী পার্থ জানন্ যোগী মুহ্যতি কশ্চন।
তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু যোগযুক্তো ভবার্জুন॥৮।২৬-২৭

[২] যৌগিক অভিজ্ঞতা হইতে জানা যায় যে, এই তত্ত্বের পশ্চাতে জড়জগৎ ও মনোজগতের সম্বন্ধবিষয়ক একটা সত্য রহিয়াছে, যদিও তাহা সর্বত্র খাটে না, যথা—অন্তরে আলোকের শক্তির সহিত অন্ধকারের শক্তির যে যুদ্ধ চলিতেছে তাহাতে আলোকের শক্তিসমূহ বৎসরের এবং দিনের আলোর সময়ে অধিকতর প্রভাবশালী হয় এবং অন্ধকারের শক্তিগুলির প্রভাব অন্ধকার সময়ে বর্ধিত হয় এবং যতক্ষণ পর্যন্ত শেষ জয়লাভ না হয়, ততক্ষণ এইরূপ প্রতিযোগিতা চলিতে থাকে।

ভগবানকে একই সঙ্গে প্রচ্ছন্ন ও ব্যক্ত দেখিতে পাবি, এবং যদি আমাদের ইচ্ছা ভগবানের ইচ্ছার সহিত চেতনায় এক হয, এবং আমাদেব ইচ্ছাব, মনেব, শবীরেব প্রত্যেক ক্রিয়া ঐ ভগবদিচ্ছা হইতেই আসিতেছে বলিয়া অনুভব কবি—উহা ভগবদিচ্ছারই ক্রিয়া, ভগবদিচ্ছায অনুপ্রাণিত, অথবা তাহাব সহিত একই বলিযা উপলব্ধি করি, তাহা হইলে গীতা যাহা চাহিতেছে তাহা পূর্ণভাবে সম্পাদন কবা যায়। তখন আর ভগবানেব অনুস্মরণ মনেব একটা সাময়িক ব্যাপাব হয় না, পরন্তু তখন উহাই হয় আমাদের জীবনের স্বাভাবিক অবস্থা এবং একভাবে আমাদেব চেতনার সাব বস্তু। তখন জীব তাহার স্বাধিকাব লাভ কবিযাছে, পুরুষোত্তমের সহিত তাহাব সত্য ও স্বাভাবিক সম্বন্ধ, অধ্যাত্ম সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছে—সে ঐক্য সিদ্ধ, আবার অনন্তকাল ধরিয়াই তাহা সাধিত হইযা চলিয়াছে।

চতুর্থ অধ্যায়

গুহ্যাদ্ গুহ্যতরং

যে সত্যটি এইভাবে ধীবে ধীবে পূর্ণ বিকশিত হইয়া উঠিযাছে প্রতি পদে অখণ্ড জ্ঞানেব এক-একটা নূতন দিক ব্যক্ত কবিযাছে এবং তাহার উপর প্রতিষ্ঠিত কবিযাছে এক-একটি অধ্যাত্ম ভাব ও কর্ম, তাহাব মূল্য ও সার্থকতা এইবাব আমবা বুঝিব। সেইহেতু ভগবান অর্জুনের মনকে জাগ্রত ও একাগ্র করিয়া তুলিবাব জন্য, তিনি এখন যাহা বলিতে যাইতেছেন, তাহার গুরু প্রযোজনীয়তার দিকে প্রথমেই তাহাব অবধান আকর্ষণ কবিলেন। কারণ, তিনি অর্জুনের মনকে পূর্ণ ভগবান সম্বন্ধে জ্ঞান ও দৃষ্টির জন্য উন্মুক্ত করিতে এবং একাদশ অধ্যায়ে বিশ্বরূপ দর্শনেব জন্য প্রস্তুত কবিতে উদ্যত হইযাছেন; সেই বিশ্বরূপ দেখিয়া কুরুক্ষেত্রের যোদ্ধা তাহাব জীবনেব, কর্মেব, লক্ষ্যের যিনি কর্তা ও ভর্তা, মানুষের মধ্যে ও জগতেব মধ্যে যিনি ভগবান, তাঁহাব সম্বন্ধে সজ্ঞান হইবে; মানুষের মধ্যে বা জগতেব মধ্যে এমন কিছুই নাই যাহা তাঁহাকে সীমাবদ্ধ করিতে পাবে; কারণ তাঁহা হইতেই সবেব উৎপত্তি, তাঁহাব অনন্ত সত্তার মধ্যেই সবাব খেলা, তাঁহাব ইচ্ছাব দ্বাবাই সব চলিতেছে, বিধৃত হইযা বহিয়াছে, তাঁহার দিব্য জ্ঞানের মধ্যেই সবেব সার্থকতা খুঁজিযা পাওযা যায, তিনিই সকলের মূল ও সারবস্তু ও চরম লক্ষ্য। অর্জুনকে জানিতে হইবে যে, সে নিজে ভগবানেরই মধ্যে রহিয়াছে এবং অন্তর্বস্থিত শক্তিব দ্বাবাই কাজ কবিতেছে, তাহাব কাজ কেবল ভাগবত কর্মের যন্ত্র মাত্র, তাহাব অহঙ্কৃত চেতনা কেবল একটা আচ্ছাদন, তাহার মধ্যে ভগবানের যে অমব স্ফুলিঙ্গ ও অংশ বহিযাছে, তাহাই তাহার অজ্ঞানে বিকৃত হইয়া অহংচেতনা রূপে প্রতিভাত হইতেছে।

তাহাব মনে এখনও যদি কোন সংশয থাকে, এই বিশ্বরূপদর্শনই তাহা দূব কবিযা দিবে, এবং তাহাকে সেই কাজেব জন্য শক্তিমান কবিয়া তুলিবে যে কাজ হইতে সে পশ্চাৎপদ হইয়াছে, সেই কাজেব জন্য সে অলঙ্ঘ্যভাবে নিযোজিত, তাহাব আব ফেবা চলে না—কাবণ ফিরিলে তাহার মধ্যে ভগবানের ইচ্ছা ও আদর্শকে অমান্য কবা হইবে, এই আদেশ ইতিপূর্বেই তাহার ব্যক্তিগত চেতনায প্রকাশিত হইযাছে, কিন্তু বিবাট বিশ্বলীলাব মধ্যেও যে সে-কর্মের নির্দেশ রহিয়াছে, শীঘ্রই তাহা প্রকাশিত হইবে। কাবণ এখন বিশ্বপুরুষ ভগবানেরই দেহরূপে অর্জুনেব সম্মুখে দেখা দিবেন, অনন্তকাল সেই দেহেব আত্মা, তিনি তাঁহার মহান ভীতিব্যঞ্জক স্বরে অর্জুনকে যুদ্ধেব সংঘর্ষে প্রবৃত্ত হইতে আদেশ করিবেন। অর্জুন তাঁহাব দ্বাবা আদিষ্ট হইবে আত্মার মুক্তিসাধন করিতে, এই বিশ্বরহস্যেব মধ্যে তাহাব কর্ম সম্পাদন কবিতে, এবং এই দুইটি—মুক্তিসাধন ও কর্ম—একই সাধনা

হইবে। অর্জুনেব সম্মুখে আত্মজ্ঞানের উচ্চতব আলোক এবং ভগবান ও প্রকৃতি সম্বন্ধে জ্ঞান যতই বেশী উদ্‌ঘাটিত হইতেছে, ততই তাহাব বুদ্ধিব সংশয সমস্ত পবিষ্কার হইযা যাইতেছে। কিন্তু কেবল বুদ্ধিব সংশয পবিষ্কাব হইলেই চলিবে না, তাহাকে দেখিতে হইবে অন্তর্দৃষ্টির দ্বাবা যাহা তাহাব বহির্মুখী মানবীয দৃষ্টিকে আলোকিত করিবে, যেন সে কর্ম করিতে পাবে সমগ্র সত্তাব সম্মতিব সহিত, তাহার প্রতি অঙ্গেব পূর্ণ শ্রদ্ধাব সহিত, তাহাব মধ্যে যে আত্মা তাহাব জীবনেব অধীশ্বর, আবার সেই আত্মাই বিশ্বেব এবং সমগ্র বিশ্বজীবনেব অধীশ্বব, সেই একই আত্মাব প্রতি পূর্ণ ভক্তির সহিত।

ইতিপূর্বে যাহা কিছু বলা হইযাছে, সেসব জ্ঞানেব ভিত্তি স্থাপন কবিযাছে, অথবা ইহাব প্রথমে প্রয়োজনীয উপাদান প্রস্তুত কবিয়াছে, কিন্তু এখন কাঠামোটির পূর্ণ আকার তাহার উন্মুক্ত দৃষ্টিব সম্মুখে ধবা হইবে। ইহাব পবে যাহা আসিবে সেসবও খুবই প্রযোজনীয়, কারণ, সেসব এই কাঠামোব অংশগুলিকে বিশ্লেষণ কবিযা দেখাইবে, কোন্‌টিব কি মর্ম তাহা বুঝাইযা দিবে, কিন্তু যে পুরুষ তাহার সহিত কথা কহিতেছেন, তাঁহাব সম্বন্ধে সমগ্র জ্ঞান মূলত এখনই তাহাব চক্ষের সম্মুখে খুলিয়া ধরা হইবে যেন না দেখা আব তাহাব পক্ষে সম্ভব না হয। পূর্বে যাহা বলা হইযাছে তাহাতে তাহাকে দেখান হইযাছে, অজ্ঞান ও অহঙ্কৃত কর্মের গ্রন্থিতে তাহাকে যে অবশ্যম্ভাবীভাবে বাঁধা থাকিতেই হইবে তাহা নহে—এইরূপ কর্মেই সে এতদিন সন্তুষ্ট ছিল, শেষে উহা আব তাহাব মনকে তৃপ্ত করিতে পারে নাই, উহাতে কোনও সমস্যাবই সমাধান নাই, সংসাবেব কর্মেব মধ্যে যে বিবোধী ভাব বহিযাছে তাহাতে তাহাব মন বিভ্রান্ত হইযা উঠিযাছিল, কর্মেব জালে বদ্ধ হইযা তাহাব হৃদয় ব্যথিত হইয়া উঠিযাছিল, জীবন ও কর্ম সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ কবা ব্যতীত কর্মের বন্ধন হইতে মুক্তিব কোন পথই সে দেখিতে পায নাই। তাহাকে দেখান হইযাছে যে, কর্ম ও জীবনযাত্রাব দুইটি বিরোধী পথ আছে, একটি হইতেছে অহং-এব অজ্ঞানে, অপবটি হইতেছে সত্তাব স্পষ্ট আত্মজ্ঞানে। সে কর্ম কবিতে পাবে বাসনাব সহিত, বিপুব বশে, নীচেব প্রকৃতির গুণত্রয়ের দ্বাবা তাড়িত "অহং" রূপে, পাপ-পুণ্যেব সুখ-দুঃখেব দ্বন্দ্বেব অধীন হইয়া, কর্মেব ফল পবিণামেব চিন্তায, জয-পবাজযেব, শুভ ও অশুভেব চিন্তায বিভোব থাকিয়া, জগৎ-চক্রে বদ্ধ হইযা, কর্ম অকর্ম বিকর্ম যে পবিবর্তন-শীল বিরোধী ভাবেব দ্বাবা মানুষের হৃদয, মন, আত্মাকে বিভ্রান্ত কবে সেসকলেব মধ্যে জড়াইযা পডিযা। কিন্তু অজ্ঞানের কর্মেই সে অকাট্যভাবে বদ্ধ নহে, সে যদি ইচ্ছা করে তবে জ্ঞানেব কর্মও করিতে পাবে। সংসাবে সে কর্ম কবিতে পাবে উচ্চ ভাবুক রূপে, জিজ্ঞাসু রূপে, যোগী রূপে, প্রথমে মুক্তিপ্রার্থী রূপে এবং পবে মুক্ত-আত্মা রূপে। এই মহান সম্ভাবনা উপলব্ধি করা এবং যে জ্ঞান ও আত্মদৃষ্টি কার্যত উহা সম্ভব কবিবে তাহাতে তাহাব বুদ্ধিকে নিবিষ্ট বাখা, ইহাই তাহাব দুঃখ ও মোহ হইতে মুক্তি পাইবাব, মানবজীবনেব সমস্যা হইতে মুক্তি পাইবাব পথ।

আমাদেব মধ্যে এক অধ্যাত্ম সত্তা আছে, তাহা শান্ত, কর্মের অতীত, সম, এই বাহিবেব কর্মজালে বদ্ধ নহে, কিন্তু উহার ধাতা, উৎপত্তিস্থল, অন্তর্যামী সাক্ষীরূপে উহাকে পর্যবেক্ষণ কবে, অথচ উহাতে জড়িত হয না। উহা অনন্ত, সবকে ভিতবে ধবিযা বাখিয়াছে, সকলেব মধ্যে এক আত্মা, প্রকৃতিব সমগ্র কর্মকে নিবপেক্ষভাবে অবলোকন কবিতেছে এবং দেখিতেছে যে, এসব কেবল প্রকৃতির কর্ম, তাহাব নিজেব কর্ম নহে। উহা দেখে যে, অহং এবং অহং-এর ইচ্ছা ও বুদ্ধি সবই প্রকৃতির যন্ত্র এবং ইহাদের সকল কর্মই প্রকৃতির তিন গুণেব জটিল ক্রিয়ার দ্বাবা নিয়ন্ত্রিত হয। ঐ সনাতন অধ্যাত্ম সত্তা নিজে ঐসব হইতে মুক্ত। এইসব হইতে সে মুক্ত, কাবণ তাহাব জ্ঞান আছে, সে জানে যে প্রকৃতি এবং অহং এবং এই সকল জীবের ব্যক্তিক সত্তা (the personal being) লইয়াই সমগ্র জগৎ নহে। কাবণ জগতে অনববত যে ক্ষবলীলা চলিতেছে, মহান বা তুচ্ছ, চমকপ্রদ বা বিষাদজনক নিখিল পবিবর্তনশীল দৃশ্য—কেবল ইহাই জগতেব (existence) সবটুকু নহে। এমন কিছু আছে যাহা সনাতন, অক্ষর, অক্ষয, কালাতীত স্বয়ম্ভূ সত্তা; প্রকৃতির পবিবর্তনসকল তাহাকে স্পর্শ কবে না। উহা সেসবেব নিরপেক্ষ দ্রষ্টা, কাহাকেও বিচলিত কবে না, নিজেও বিচলিত হয় না, নিজে কোনও কর্ম করে না, কাহারও কর্ম তাহাকে স্পর্শ কবে না, সে পুণ্যবানও নহে, পাপীও নহে; কিন্তু নিত্য, শুদ্ধ, পূর্ণ, মহান এবং অক্ষত। অহংভাবাপন্ন মানব যাহাতে ব্যথিত বা আকৃষ্ট হয উহা তাহাতে শোকান্বিত বা হর্ষান্বিত হয না, উহা কাহাবও মিত্রও নহে, কাহারও শত্রুও নহে, কিন্তু সকলের মধ্যে এক সম আত্মা। মানুষ এখন এই আত্মা সম্বন্ধে সচেতন নহে, কাবণ সে বহির্মুখী মনেব মধ্যে জডাইয়া বহিযাছে, সে অন্তরেব মধ্যে বাস কবিতে শিখিতে চায না, অথবা শিখে নাই; নিজেব কর্ম হইতে নিজেকে সে পৃথক কবিযা ধবে না, সবিয়া দাঁডায না এবং ঐ কর্মকে প্রকৃতির কর্ম বলিয়া দেখে না। অহংই বাধা, মোহচক্রেব নাভি। জীবের অন্তরাত্মায অহং-এর লয করাই মুক্তির জন্য সর্বপ্রথম প্রয়োজন। অধ্যাত্ম সত্তা হওযা, আর কেবল মন এবং অহং হইয়া না থাকা, ইহাই এই মুক্তিবাণীব প্রথম কথা।

অর্জুনকে এই জন্য প্রথমেই বলা হইযাছে তাহার কর্মের সমস্ত ফলকামনা পবিত্যাগ কবিতে এবং যাহাই কবিতে হউক সেই কর্তব্য শুধু নিষ্কাম নিরপেক্ষ কর্মীভাবে সম্পাদন করিতে—এই বিশ্বকর্মসমূহেব যিনিই ঈশ্বর হউন তাঁহার হস্তে সমস্ত ফলাফল ছাডিযা দিতে। কারণ, সে নিজে যে ঈশ্বর নহে তাহা খুবই সুস্পষ্ট। তাহাব ব্যক্তিগত অহং-এব তৃপ্তির জন্য প্রকৃতি আপনাব পথে প্রবর্তিত হয় নাই। তাহাব বাসনা, তাহাব অভিলাষ পূর্ণ করিবাব নিমিত্ত বিশ্বপ্রাণ জীবনলীলা কবিতেছে না, তাহাব মানসিক মতামত, তাহার সিদ্ধান্ত ও আদর্শ সার্থক করিবার জন্য বিশ্বমন কাজ কবিতেছে না, তাহাব ক্ষুদ্র দববারে বিশ্বমনের জাগতিক লক্ষ্য বা পার্থিব কর্মধাবা ও উদ্দেশ্য উপস্থিত কবা হয না। এই সব অধিকাবেব দাবি কেবল সেই সকল লোকে কবে যাহাবা নিজেদেব ব্যক্তিত্বেব গণ্ডির মধ্যে বাস

করে এবং সেই ক্ষুদ্র ও সঙ্কীর্ণ প্রতিষ্ঠা হইতে সমস্ত জিনিসকে দেখে। প্রথমেই তাহাকে জগতের উপর তাহার অহঙ্কারের দাবি ছাড়িতে হইবে, এবং লক্ষ লক্ষ লোকের মধ্যে সে কেবল একজন মাত্র এই ভাবে তাহাকে কাজ করিতে হইবে। যে ফলাফল তাহার দ্বারা নির্ণীত নহে কিন্তু নিখিল কর্ম ও উদ্দেশ্যের দ্বারা নির্ণীত হইতেছে, তাহাতে তাহার নিজের চেষ্টা ও যত্নের অংশটুকু যোগাইতে হইবে। কিন্তু তাহাকে ইহা অপেক্ষা আরও বেশী কিছু করিতে হইবে—সে যে কর্তা এই অভিমানও তাহাকে পরিত্যাগ করিতে হইবে। সকল ব্যক্তিত্ব হইতে মুক্ত হইয়া তাহাকে দেখিতে হইবে যে, নিখিল বুদ্ধি, ইচ্ছা, মন, প্রাণই তাহার মধ্যে এবং অপর সকলের মধ্যে কর্ম করিতেছে। প্রকৃতিই নিখিল কর্তা, তাহার কর্ম, প্রকৃতিরই কর্ম, ঠিক যেমন তাহার মধ্যে প্রকৃতির কর্মের ফল তাহার অপেক্ষা এক মহত্তর শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত মহান ফলসমষ্টির অংশমাত্র। অধ্যাত্মভাবে সে যদি এই দুইটি জিনিস করিতে পারে, তাহা হইলে তাহার কর্মের জাল ও বন্ধন তাহা হইতে খসিয়া পড়িবে; কারণ ঐ বন্ধনের সমস্ত গ্রন্থি রহিয়াছে তাহার অহঙ্কারের দাবিতে এবং কর্তৃত্বাভিমানে। রিপুর উদ্বেগ ও পাপ এবং ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ তাহার আত্মা হইতে অদৃশ্য হইবে। তখন তাহা শুদ্ধ, মহান, শান্ত, সকল লোক ও সকল জিনিসে সমভাবাপন্ন হইয়া অন্তরের মধ্যে বাস করিবে। কর্ম তখন অন্তরের মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়া উৎপাদন করিবে না, তাহার আত্মার নির্মলতা ও শান্তির উপর কোন দাগ বা চিহ্ন রাখিয়া যাইবে না। তাহার থাকিবে আভ্যন্তরীণ সুখ, বিরাম, স্বাচ্ছন্দ্য এবং মুক্ত অক্ষত সত্তার অটুট আনন্দ। ভিতরে বা বাহিরে আর তাহার সেই পুরাতন ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্বের জের থাকিবে না, কারণ, সে তখন সজ্ঞানে উপলব্ধি করিবে যে, সে সকলের সহিত এক আত্মা—তাহার বাহ্য প্রকৃতিও নিখিল মন, প্রাণ, ইচ্ছার অচ্ছেদ্য অংশ বলিয়াই তাহার জ্ঞানে অনুভূত হইবে। তাহার স্বতন্ত্র অহংভাবাপন্ন সত্তা অধ্যাত্ম সত্তার নৈর্ব্যক্তিক ভাবের মধ্যে গৃহীত ও নির্বাপিত হইবে; তাহার স্বতন্ত্র অহংভাবাপন্ন প্রকৃতি বিশ্বপ্রকৃতির ক্রিয়ার সহিত একীভূত হইবে।

কিন্তু, এই মুক্তি নির্ভর করে দুইটি যুগপৎ উপলব্ধির উপরে—স্পষ্টভাবে আত্মদর্শন এবং স্পষ্টভাবে প্রকৃতি দর্শন। এই দুইটি উপলব্ধির সামঞ্জস্য এখনও হয় নাই। ইহা কেবল বৈজ্ঞানিকের মানসিক বিচারজনিত নিঃসঙ্গতা নহে, জড়বাদী দার্শনিকও নিজের আত্মা এবং অধ্যাত্ম সত্তার উপলব্ধি না থাকিলেও শুধু প্রকৃতি সম্বন্ধেই কতকটা স্পষ্ট দৃষ্টি লাভ করিয়া এরূপ নিঃসঙ্গ হইতে পারে। ইহা ভাববাদী জ্ঞানীরও (the idealistic sage) মানসিক বিচারজনিত নিঃসঙ্গতা নহে। এরূপ ব্যক্তি বুদ্ধির আলোকসহায়ে অহং-এর অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র এবং বিক্ষোভকারী রূপগুলি অতিক্রম করিতে পারে। ইহা আরও উদার, আরও জীবন্ত, আরও পূর্ণ আধ্যাত্মিক নিঃসঙ্গতা। প্রকৃতির উপরে, মন-বুদ্ধির উপরে যে পরম সত্তা রহিয়াছে, তাহার দর্শন লাভ করিয়াই এই নিঃসঙ্গতা লাভ করা যায়। কিন্তু,

এই নিঃসঙ্গতাও মুক্তির এবং স্পষ্ট জ্ঞানদৃষ্টির কেবল গোড়াকার রহস্য, ইহা দিব্যরহস্যের সমগ্র সূত্র নহে, কারণ, শুধু এইটির দ্বারাই প্রকৃতির ব্যাখ্যা হয় না; এবং অধ্যাত্ম ও নিষ্ক্রিয় আত্মপ্রতিষ্ঠার সহিত কর্মজীবনের বিরোধ থাকিয়া যায়। দিব্য নিঃসঙ্গতা হইবে দিব্য কর্মেরই ভিত্তি। আগে যেমন অহংভাবের বশে প্রকৃতির কার্যে যোগ দেওয়া হইত, তাহার পরিবর্তে দিব্য ভাবে প্রকৃতির কার্যে যোগ দিতে হইবে, দিব্য শান্তি দিব্য ক্রিয়াকে, দিব্য গতিকে ধরিয়া থাকিবে। এই সত্য বরাবরই গুরুর মনে ছিল এবং সেই জন্যই তিনি যজ্ঞরূপে কর্ম করিতে, পরমপুরুষকেই আমাদের সকল কর্মের ঈশ্বর বলিয়া জানিতে এবং অবতারের ও দিব্য জন্মের মর্ম বুঝিতে বিশেষ করিয়া বলিয়াছেন; কিন্তু শান্ত মুক্ত ভাবের প্রতিষ্ঠা প্রথমেই প্রয়োজন বলিয়া এই সত্যের উপর এতক্ষণ তেমন জোর দেওয়া হয় নাই। যেসকল সত্যের দ্বারা আধ্যাত্মিক শান্তি, নিঃসঙ্গতা সমতা এবং ঐক্য লাভ করা যায়, এক কথায় অক্ষর আত্মাকে উপলব্ধি করা যায়, এবং তাহাই হওয়া যায় সেই সকল সত্যই পূর্ণভাবে পরিস্ফুট করা হইয়াছে এবং তাহাদের বৃহত্তম শক্তি ও সার্থকতা দেখান হইয়াছে। অন্য যে মহান প্রয়োজনীয় সত্য এই উপলব্ধিকে পূর্ণতর করিবে, সেটিকে কতকটা অস্পষ্ট রাখা হইয়াছে, অল্প আলোকে দেখান হইয়াছে। পুনঃপুনঃ এই সত্যের প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে বটে, কিন্তু এখন পর্যন্ত সেইটিকে পরিস্ফুট করা হয় নাই। এখন ক্রমান্বয়ে এই কয়েকটি অধ্যায়ে সেই সত্যকে দ্রুত পরিস্ফুট করা হইতেছে।

অবতার, গুরু, জীবনযুদ্ধে মানবাত্মার চিরসারথি শ্রীকৃষ্ণ প্রথম হইতেই নিজের নিগূঢ় রহস্য প্রকাশ করিবার আয়োজন করিতেছিলেন। তাহাই প্রকৃতির গভীরতম রহস্য। এই উদ্যোগের মধ্যে একটি সুর তিনি সকল সময়েই ধরিয়া রাখিয়াছেন এবং তাঁহার সমগ্র সত্যের বৃহত্তম চূড়ান্ত সমন্বয়ের ইঙ্গিত ও ভূমিকাস্বরূপ পুনঃ-পুনঃ তুলিয়াছেন। সেই সুর হইতেছে পরম ভগবানের তত্ত্ব। তিনি মানুষের মধ্যে ও প্রকৃতির মধ্যে বাস করিতেছেন; কিন্তু তিনি মানুষ ও প্রকৃতি হইতে মহত্তর, আত্মার নৈর্ব্যক্তিক ভাবের ভিতর দিয়া তাঁহাকে পাইতে হয়। কিন্তু নৈর্ব্যক্তিক আত্মাই তাঁহার সমগ্র সত্য নহে। পুনঃপুনঃ জোরের সহিত এই সত্যের ইঙ্গিত কেন করা হইয়াছে, এখন আমরা তাহার অর্থ বুঝিতেছি। একই ভগবান যিনি বিশ্বাত্মায়, মানুষে ও প্রকৃতিতে রহিয়াছেন, তিনিই যথোপরি অবস্থিত গুরুর মুখ দিয়া উদ্যোগ করিতেছিলেন যেন জাগ্রত দ্রষ্টা ও কর্মীর সমগ্র সত্তার উপর তিনি তাঁহার একান্ত দাবি উপস্থিত করিতে পারেন। তিনি বলিতেছিলেন, "আমি তোমার অন্তরে রহিয়াছি, আমি এখানে এই মানবশরীরে রহিয়াছি। আমার জন্যই সব কিছুর অস্তিত্ব, সকলে কর্ম করে, চেষ্টা করে। সেই আমিই স্বপ্রতিষ্ঠ আত্মারও নিগূঢ় সত্য; আবার সেই সঙ্গে বিশ্বলীলারও নিগূঢ় সত্য। এই যে 'আমি', ইহাই মহত্তর আমি। যত বড় মানবসত্তাই হউক না কেন, তাহা এই 'আমি'র এক ক্ষুদ্র আংশিক প্রকাশমাত্র, প্রকৃতি নিজে ইহারই এক নীচের খেলা মাত্র। জীবাত্মার

ঈশ্বর, বিশ্বের সকল কর্মের ঈশ্বর, আমিই অদ্বিতীয় জ্যোতি, একমাত্র শক্তি, একমাত্র সত্তা। তোমার অন্তরে এই ভগবানই গুরু, সবিতা—সেই জ্ঞানের স্পষ্ট জ্যোতির প্রকাশকর্তা যাহাতে তুমি তোমার অক্ষর আত্মা এবং তোমার ক্ষর প্রকৃতির প্রভেদ দেখিতে পাইতেছ। কিন্তু এই জ্যোতিরও উপরে উহার উৎসের দিকে চাহিয়া দেখ; তাহা হইলে তুমি পরম আত্মাকে জানিতে পারিবে, তাহারই মধ্যে ব্যক্তিত্বের ও প্রকৃতির অধ্যাত্ম সত্যকে ফিরিয়া পাইবে। অতএব সর্বভূতের মধ্যে এক আত্মাকে দেখ যেন এইভাবে তুমি সর্বভূতের মধ্যে আমাকে দেখিতে পার। সর্বভূতকে এক অধ্যাত্ম আত্মা এবং সত্য বস্তুর মধ্যে দেখ, কারণ, সর্বভূতকে আমার মধ্যে দেখিবার ইহাই পন্থা। সকলের মধ্যে এক ব্রহ্মকে অবগত হও; কারণ, এইভাবেই তুমি পরম ব্রহ্ম ভগবানকে দেখিতে পাইবে। তোমার নিজের আত্মাকে অবগত হও, নিজের আত্মা হও, যেন এইভাবে তুমি আমার সহিত যুক্ত হইতে পার—এই কালাতীত আত্মা আমারই স্পষ্ট জ্যোতি বা স্বচ্ছ আবরণ। ভগবান-আমিই আত্মা ও অধ্যাত্ম সত্তার চরম সত্য।"

অর্জুনকে দেখিতে হইবে যে, এই একই ভগবান শুধু আত্মার উচ্চতর সত্য নহেন, পরন্তু প্রকৃতির এবং তাহার নিজের ব্যক্তিত্বেরও উচ্চতর সত্য—একই সঙ্গে ব্যক্তির এবং বিশ্বের নিগূঢ় রহস্য। তাঁহারই ইচ্ছা প্রকৃতিতে সর্বব্যাপী, প্রকৃতির কর্মসকল তাহা হইতেই আসিতেছে। তিনি সেই সকল কর্ম অপেক্ষা মহত্তর—প্রকৃতির কর্ম, মানুষের কর্ম এবং সকল কর্মের ফল সবই তাঁহার। অতএব তাঁহাকে যজ্ঞরূপে কর্ম করিতে হইবে; কারণ, সেইটিই হইতেছে তাহার কর্মের, সকল কর্মের প্রকৃত সত্য। প্রকৃতিই কর্মী, অহং কর্মী নহে, কিন্তু প্রকৃতি ভগবানের একটা শক্তিমাত্র—ভগবানই প্রকৃতির সকল কর্মের ও চেষ্টার একমাত্র প্রভু—বিশ্বযজ্ঞের যুগযুগান্তরের একমাত্র ঈশ্বর। তাহার কর্ম যখন ভগবানের, তখন তাহার মধ্যে ও জগতে যে ভগবান রহিয়াছেন, যাঁহার দ্বারাই প্রকৃতির রহস্যময় দিব্যলীলায় ঐ সকল কর্ম অনুষ্ঠিত হইতেছে, তাঁহাকেই তাহার সকল কর্ম সমর্পণ করিতে হইবে। আত্মার দিব্য জন্মের জন্য, অহং-এর এবং শরীরের মরত্ব হইতে অধ্যাত্ম ও অনন্তের মধ্যে মুক্তি লাভের জন্য এই দুইটি প্রয়োজন—প্রথমে নিজের কালাতীত অক্ষর আত্মার জ্ঞান ও ইহার ভিতর দিয়া কাল্যাতীত ভগবানের সহিত মিলন। কিন্তু সেই সঙ্গেই এই বিশ্বরহস্যের পশ্চাতে যিনি রহিয়াছেন, সর্বভূতের মধ্যে এবং তাহাদের ক্রিয়ার মধ্যে যে ভগবান রহিয়াছেন, তাঁহার সম্বন্ধেও জ্ঞান। কেবল এইরূপেই আমরা আমাদের সমস্ত প্রকৃতি ও সত্তাকে সমর্পণ করিয়া সেই একের সহিত জীবন্তভাবে যুক্ত হইবার আশা করিতে পারি, যিনি দেশকালের মধ্যে যাহা কিছু আছে সব হইয়াছেন। পূর্ণ আত্মমুক্তির যোগসাধনায় ভক্তির স্থান এইখানেই। অবিনাশী আত্মা বা পরিবর্তনশীলা প্রকৃতি এতদুভয় অপেক্ষাও যিনি মহত্তর, তাঁহার ভজনা ও আরাধনাই এই ভক্তি। তখন সকল জ্ঞান হয় ভজনা ও আরাধনা; কিন্তু সকল

কর্মও হয় ভজনা ও আরাধনা। এই ভজনাতেই প্রকৃতির কর্ম এবং আত্মার মুক্তি একীভূত হইয়াছে, এবং সেই এক ভগবানের উদ্দেশে এক আত্মোৎসর্গে পরিণত হইয়াছে। চরম মুক্তি, নীচের প্রকৃতিকে ছাড়াইয়া উপরে অধ্যাত্মভাবের মূলে যাওয়া—ইহা আত্মার নির্বাণ নহে, কেবল তাহার অহংরূপেরই নির্বাণ হয়। কিন্তু ইহা হইতেছে আমাদের জ্ঞান-ইচ্ছা-প্রেমময় সমগ্র আত্মার পক্ষে ভগবানের বিশ্বসত্তার মধ্যে আর না থাকিয়া বিশ্বাতীত সত্তার মধ্যে গমন করা—ইহা ধ্বংস নহে, সিদ্ধি।

অর্জুনের মনের কাছে এই জ্ঞানটি স্পষ্ট করিয়া ধরিবার জন্য আবশ্যক বলিয়া শ্রীগুরু বাকী দুইটি সংশয়ের মূলোচ্ছেদ করিতে অগ্রসর হইলেন—নৈর্ব্যক্তিক সত্তা ও মানুষের ব্যক্তিগত সত্তার মধ্যে বিরোধ এবং পুরুষ ও প্রকৃতির মধ্যে বিরোধ। যতক্ষণ পর্যন্ত এই দুইটি দ্বন্দ্ব থাকে, ততক্ষণ প্রকৃতির মধ্যে এবং মানুষের মধ্যে ভাগবত সত্তার অস্তিত্ব অস্পষ্ট, অসঙ্গত, অবিশ্বাস্য থাকিয়া যায়। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে, প্রকৃতি গুণসমূহের জড় শৃঙ্খল, আত্মা এই শৃঙ্খলের অধীন অহঙ্কৃত সত্তা। কিন্তু ইহাই যদি তাহাদের সমস্ত সত্য হয়, তাহা হইলে তাহারা ভাগবত সত্তা নহে, হইতেই পারে না। জড় অজ্ঞান প্রকৃতি ভগবানের শক্তি হইতে পারে না; কারণ, ভগবানের শক্তি হইবে কর্মে স্বাধীন, মূলে আধ্যাত্মিক, মহত্ত্বে আধ্যাত্মিক। প্রকৃতিতে বদ্ধ অহঙ্কৃত আত্মা, কেবল মনোময়, প্রাণময়, দেহময় আত্মা, কখনই ভগবানের অংশ এবং নিজে ভাগবত সত্তা হইতে পারে না, কারণ যাহা এইরূপ ভাগবত সত্তা হইবে, তাহা হইবে স্বরূপে ভগবানেরই ন্যায় মুক্ত, অধ্যাত্ম, আত্মবিকাশশীল, স্বপ্রতিষ্ঠ—তাহা হইবে মন, প্রাণ, দেহের ঊর্ধ্বে। এই সংশয় এবং তাহারা যে অজ্ঞানের সৃষ্টি করে সেসব অপসৃত হয় সত্যের একটি মাত্র উজ্জ্বল দীপ্ত রশ্মির দ্বারা। জড়প্রকৃতি কেবল একটা নীচের সত্য, নীচের প্রাতিভাসিক ক্রিয়াই জড়প্রকৃতি নামে অভিহিত। উপরের এক প্রকৃতি আছে, তাহা অধ্যাত্মপ্রকৃতি এবং তাহাই আমাদের অধ্যাত্ম ব্যক্তিত্বের স্বরূপ, আমাদের সত্য ব্যক্তিসত্তা। ভগবান একই সঙ্গে নৈর্ব্যক্তিক (impersonal) আবার ব্যক্তিক (personal)। আমাদের মনের অনুভূতিতে প্রতীয়মান হয় যে, তাঁহার নৈর্ব্যক্তিক ভাব কালের অতীত অনন্ত সৎস্বরূপ, চিৎস্বরূপ, অস্তিত্বোপলব্ধির আনন্দস্বরূপ, তাঁহার ব্যক্তিক ভাব দেখা যায় সত্তার সচেতন শক্তিরূপে, জ্ঞানের, ইচ্ছার এবং বহুধা আত্মপ্রকাশের আনন্দের সচেতন কেন্দ্ররূপে। মূল অক্ষর সত্তায় আমরাও সেই একই নৈর্ব্যক্তিক; আমাদের অধ্যাত্ম-ব্যক্তিস্বরূপে আমরা প্রত্যেকেই সেই মূল শক্তির বহুধা রূপ। কিন্তু এই যে প্রভেদ, ইহা কেবল আত্মপ্রকাশের প্রয়োজনের জন্য। দিব্য নৈর্ব্যক্তিক সত্তাকে ছাড়াইয়া যাইলে দেখা যায় যে, উহাই আবার অনন্ত পুরুষ, পরমাত্মা। উহাই মহান অহম্—সোঽহম্, আমিই সেই—যাঁহা হইতে সমস্ত ব্যক্তিক সত্তা ও প্রকৃতি আবির্ভূত হয় এবং নৈর্ব্যক্তিকভাবে প্রতীয়মান এই যে জগৎ, ইহার মধ্যে

বিচিত্ররূপে লীলা করে। যাহাকিছু বহিযাছে সবই ব্রহ্ম—সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম। ইহাই উপনিষদের কথা, কাবণ ব্রহ্ম এক আত্মা, নিজেকে ক্রমান্বযে চৈতন্যের চারি স্তরে দেখিতেছেন। বাসুদেব শাশ্বত পুরুষই সব, বাসুদেবঃ সর্ব্বম্, ইহাই গীতার কথা। তিনিই ব্রহ্ম, তাঁহাব ঊর্ধ্বেব অধ্যাত্ম প্রকৃতি হইতে তিনি সজ্ঞানে সমস্ত উৎপাদন কবিতেছেন, ধরিযা রাখিয়াছেন। এখানে বুদ্ধি, মন, প্রাণ, ইন্দ্রিয এবং পঞ্চভূতেব বাহ্যদৃশ্য লইযা যে অপবা প্রকৃতি, তাহার মধ্যে সকল বস্তু তিনিই সজ্ঞানে হইয়াছেন। শাশ্বতেব সেই অধ্যাত্ম প্রকৃতিতে তিনিই জীব, জীব তাঁহার শাশ্বত বহুরূপ, সচেতন আত্মশক্তিব বহু কেন্দ্র হইতে তাঁহাবই আত্ম-দর্শন। ভগবান, প্রকৃতি, জীব—এই তিন লইযাই বিশ্বলীলা এবং এই তিনই এক সত্তা।

এই পুরুষ নিজেকে বিশ্বেব মাঝে কেমন কবিযা প্রকাশ কবেন? প্রথমত অক্ষব কালাতীত আত্মরূপে—তাহা সর্বব্যাপী, সকলকে ধবিয়া বহিযাছে, তাহাব শাশ্বততায তাহা শুধুই সত্তা, তাহা ভূতগ্রাম নহে। তাবপব, সেই সত্তায বিধৃত রহিযাছে এক মূল শক্তি বা আত্মবিকাশেব অধ্যাত্ম ধাবা—স্বভাব। তাহাব ভিতব দিযাই অধ্যাত্ম আত্মদৃষ্টির দ্বারা এই সত্তা সঙ্কল্প কবে, বিকাশ কবে—তাহাব মধ্যে যাহাকিছু অপ্রকাশিত রহিযাছে, নিহিত বহিয়াছে, সেই সকলকে মুক্ত কবিযা দিযা সৃষ্টি করে। এইভাবে আত্মায় যাহাকিছু সঙ্কল্পিত হয়, সেই আত্মবিকাশেব শক্তি বা তেজ সেই সবকে বিশ্বকর্মরূপে বিসৃষ্ট কবে। সকল সৃষ্টিই এই ক্রিযা, মূল প্রকৃতিব লীলা, কর্ম। কিন্তু এই সংসাবে উহা পরিণত হইযা উঠিতেছে অপবা প্রকৃতিব মধ্যে—বুদ্ধি, মন, প্রাণ, ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ স্থূল ভূতের বাহ্য রূপেব মধ্যে। তাহা পূর্ণ জ্যোতি হইতে বস্তুত বিচ্ছিন্ন, এবং অজ্ঞানেব দ্বাবা পবিচ্ছিন্ন। সেখানে তাহাব সকল ক্রিয়াই হয প্রকৃতির মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে যে পবমাত্মা বহিযাছেন তাঁহাব উদ্দেশে প্রকৃতিস্থ জীবাত্মাব যজ্ঞ। অতএব পবম ভগবান সকলেব মধ্যেই তাহাদের যজ্ঞেব অধীশ্বর রূপে অধিযজ্ঞ রূপে বিবাজিত। তাঁহাব সান্নিধ্যে, তাঁহাব শক্তিতেই সেই যজ্ঞ নিয়ন্ত্রিত হয়। তাঁহার আত্মজ্ঞানে এবং আত্মসত্তাব আনন্দে তাহা গৃহীত হয়। ইহা জানিলেই বিশ্ব সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞানলাভ কবা হয, জগৎ-মাঝে ভগবানকে দর্শন করা হয এবং অজ্ঞান মায়া হইতে মুক্ত হইবাব দ্বাব খুঁজিযা পাওয়া যায়। কারণ, এই জ্ঞান যখন-যখন কার্যকবী হয, মানুষ তাহাব কর্ম এবং তাহাব সমস্ত চেতনাকে সর্বভূতস্থিত ভগবানে অর্পণ করে, তখন সেই জ্ঞানেব দ্বারা সে তাহাব অধ্যাত্ম সত্তায় ফিরিযা যাইতে সক্ষম হয় এবং ইহাব ভিতব দিযা এই অপরা ক্ষর প্রকৃতিব উপরে শাশ্বত ও ভাস্বর যে বিশ্বাতীত সত্য বস্তু বহিযাছে, তাহাতে পৌঁছিতে সমর্থ হয।

আমাদেব মূল সত্তার এই যে নিগূঢ় সত্য, আমাদেব আভ্যন্তবীণ জীবন ও বাহ্যকর্ম বিকাশে কেমন করিয়া ইহা পূর্ণভাবে প্রযোগ কবা যায়, গীতা এখন তাহাই দেখাইতে অগ্রসর হইয়াছে। গীতা এখন যাহা বলিতেছে তাহা সকল

বহস্যেব গুহ্যতম রহস্য।[১] ইহাই ভগবান সম্বন্ধে সেই সমগ্র জ্ঞান—সমগ্রম্ মাম্—অর্জুনকে যাহা দিতে তিনি প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। ইহাই সমস্ত তত্ত্বের পূর্ণ বিজ্ঞানসহ মূল জ্ঞান, যাহা জানিলে আর জানিতে কিছু বাকী থাকে না। যে অজ্ঞান তাহাব মানবীয মনকে বিমূঢ় কবিয়াছে, এবং তাহার ভগবদ্‌নির্দিষ্ট কর্তব্য কর্ম কবিতে তাহাব ইচ্ছাকে বিমুখ করিয়াছে, সেই অজ্ঞানের গ্রন্থি ইহার দ্বারাই সম্পূর্ণভাবে ছিন্ন হইবে। ইহাই সকল জ্ঞানেব শ্রেষ্ঠ জ্ঞান, সকল রহস্যের শ্রেষ্ঠ বহস্য, বাজবিদ্যা, বাজগুহ্য। ইহা শুদ্ধ এবং উত্তম জ্যোতি। প্রত্যক্ষ অধ্যাত্ম উপলব্ধিব দ্বাবা মানুষ ইহাব প্রমাণ পায, নিজেব মধ্যেই সত্য বলিয়া দেখিতে পাবে। ইহাই প্রকৃত সত্যধর্ম, জীবনেব মূল নীতি। মানুষ যখন ইহাকে ধরিতে পাবে, দেখিতে পাবে এবং শ্রদ্ধাব সহিত এই অনুসারে জীবনকে গঠিত করিতে চায়, তখন ইহার অনুসবণ করা সহজ হয়।

কিন্তু শ্রদ্ধা চাই। শ্রদ্ধা যদি না থাকে, মানুষ যদি তর্কবুদ্ধির উপর নির্ভর করে, তাহা হইলে সেই উচ্চতব জ্ঞানকে জীবনে সত্য করিযা তোলা সম্ভব হয না। তর্কবুদ্ধি বাহ্য ব্যাপাবেব অনুগমন কবে, অধ্যাত্মদৃষ্টিলব্ধ জ্ঞানকে সন্দেহের সহিত যাচাই কবিযা দেখিতে চায় কাবণ তাহা দৃশ্য প্রকৃতিব দ্বন্দ্ব ও অপূর্ণতাসমূহেব সহিত মিলে না—মনে হয়, তাহা এই দ্বন্দ্বময় প্রকৃতিকে অতিক্রম কবিতেছে—এমন কথা বলিতেছে, যাহা আমাদিগকে আমাদের বর্তমান জীবনের প্রত্যক্ষ শোক, দুঃখ, অমঙ্গল, দোষ, ভ্রান্তি ও অক্ষমতা হইতে অশুভ হইতে উপবে লইতে চায। যে জীব সেই উপবেব সত্য ও ধর্মে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পাবে না, তাহাকে মৃত্যু, ভ্রান্তি, অশুভের অধীন সাধারণ মরজীবনের পথে ফিবিতেই হইবে। যে ভাগবত সত্তাকে সে অস্বীকার কবে, তাহাতে গড়িয়া উঠা তাহাব পক্ষে সম্ভব নহে। কাবণ এই যে সত্য, জীবনেব মাঝে ইহাকে সত্য করিয়া তুলিতে হইবে, ইহাবই অনুসবণে জীবনকে গঠিত ও পরিচালিত করিতে হইবে—আত্মাব ক্রমবর্ধনশীল জ্যোতিতে অনুসবণ কবিতে হইবে—মনের অন্ধকাবে তর্কবুদ্ধিব সহায়ে নহে। মানুষকে এই সত্যে গড়িযা উঠিতে হইবে—এই সত্য হইতে হইবে—ইহাব সত্যতা প্রমাণ কবিবার ইহাই এক মাত্র উপায়। নীচের সত্তাকে অতিক্রম কবিযাই মানুষ প্রকৃত দিব্যসত্তা হইতে পারে এবং আমাদের অধ্যাত্ম জীবনেব সত্যকে জীবনেব মধ্যে ফুটাইয়া তুলিতে পারে। সত্য বলিয়া যাহাকিছু ইহাব বিরুদ্ধে উত্থাপন কবা যায়—সে সমস্তই নীচের প্রকৃতিব বাহ্যিক

ইদন্তু তে গুহ্যতমং প্রবক্ষ্যাম্যনসূযবে।
জ্ঞানং বিজ্ঞানসহিতং যজ্‌জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ॥৯।১
বাজবিদ্যা বাজগুহ্যং পবিত্রমিদমুত্তমম্।
প্রত্যক্ষাবগমং ধর্ম্যং সুসুখং কর্তুমব্যযম্॥৯।২
অশ্রদ্দধানাঃ পুরুষা ধর্ম্মস্যাস্য পবন্তপ।
অপ্রাপ্য মাং নিবর্ত্তন্তে মৃত্যুসংসাববর্ত্মনি॥৯।৩

সত্য। নীচেব প্রকৃতির অপূর্ণতা ও অমঙ্গল হইতে, "অশুভ" হইতে মুক্তিলাভ কবা যায় কেবল এক ঊর্ধ্বেব জ্ঞানকে স্বীকার কবিযা—সেখানে ঐ সকল বাহ্যিক অশুভ শেষ পর্যন্ত মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হয, আমাদেবই অজ্ঞানেব সৃষ্টি বলিযা প্রদর্শিত হয়। কিন্তু এইভাবে দিব্য প্রকৃতিব মুক্তিতে গডিযা উঠিতে হইলে আমাদের বর্তমান বদ্ধ প্রকৃতিতে প্রচ্ছন্নভাবে যে ভাগবত সত্তা বহিযাছেন, তাঁহাকে স্বীকার করিতেই হইবে। কাবণ, এই যোগাভ্যাস সম্ভব ও সহজ কেবল এই জন্যই হয যে, আমরা স্বভাবত যাহা, সে সমুদয়ের ক্রিযাকে এই সাধনায় সেই আভ্যন্তরীণ দিব্যপুরুষেব হস্তে আমরা সমর্পণ কবিযা দিই। ভগবানই আমাদেব মধ্যে দিব্যজন্মেব বিকাশ কবিয়া দেন ক্রমবর্ধনশীলভাবে, সহজভাবে, অব্যর্থভাবে, আমাদের সত্তাকে তাঁহারই সত্তাব মধ্যে তুলিযা লইযা এবং ইহাকে তাঁহাবই জ্ঞানে ও শক্তিতে পূর্ণ করিয়া দিয়া, জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা, তিনি তাঁহাব কল্যাণ হস্তেব স্পর্শে আমাদেব মোহাচ্ছন্ন অজ্ঞান প্রকৃতিকে তাঁহাবই নিজেব জ্যোতি ও বিশালতায় রূপান্তরিত কবিযা লন। আমরা পূর্ণ শ্রদ্ধাব সহিত এবং অহংভাবশূন্য হইযা যাহাতে বিশ্বাস কবি এবং ভগবৎপ্রেবণায় যাহা হইতে চাই, অন্তবস্থিত ভগবান তাহা নিশ্চয়ই সম্পন্ন কবিযা দিবেন। কিন্তু এখন যে অহংভাবময় মন ও প্রাণ আমাদের প্রকৃত সত্তা বলিযা অনুমিত হইতেছে, প্রথমেই প্রযোজন যে সেইটি আমাদের অন্তবস্থিত গুহ্য ভগবানেব হস্তে নিজেকে রূপান্তরেব জন্য একান্তভাবে সমর্পণ কবে।

পঞ্চম অধ্যায

দিব্য সত্য ও পন্থা

গীতা অতঃপব সেই চবম ও পূর্ণ বহস্য, সেই এক তত্ত্ব ও সত্যকে উদ্ঘাটিত কবিতে চলিযাছে—সিদ্ধি ও মুক্তিব প্রার্থীকে যাহাতে বাস করিতে শিখিতে হইবে, সেই এক ধর্মকে অনুসবণ করিযাই তাহার অধ্যাত্ম অঙ্গসমূহেব এবং তাহাদেব সকল প্রক্রিযাব পবিপূর্ণ সার্থকতা লাভ কবিতে হইবে। এই চরম সত্য হইতেছে বিশ্বাতীত ভগবানেব রহস্য—তিনিই সব এবং সর্বত্র বিরাজিত, অথচ বিশ্ব এবং বিশ্বেব সকল রূপ অপেক্ষা তিনি এত মহত্তব ও বিভিন্ন যে, এখানে কোন কিছুব মধ্যেই তিনি সীমাবদ্ধ নহেন, কোন কিছুই বস্তুত তাঁহাকে প্রকট কবিতে পাবে না—দেশ ও কালেব মধ্যে যেসব বস্তু আবির্ভূত হইয়াছে এবং তাহাদেব পবস্পবেব মধ্যে যে সম্বন্ধ, এই সকল বুঝাইতে যে ভাষা প্রয়োগ কবা হয তাহা তাঁহাব অচিন্ত্য সত্তাব স্বরূপ ব্যক্ত করিতে সমর্থ নহে। অতএব আমাদেব সিদ্ধিলাভের নীতি হইতেছে আমাদের সমগ্র প্রকৃতি দিয়া ভজনা এবং ইহাব মূল অধিকাবীর নিকট আত্মসমর্পণ। সব শেষে আমাদের এক পথ হইতেছে, এই সংসাবে আমাদেব সমগ্র জীবনকে (শুধু ইহার কোন এক অংশকেই নহে) অনন্তেব দিকে একাগ্রভাবে প্রবাহিত কবা। এক দিব্য যোগের শক্তি ও বহস্যের দ্বাবা আমবা তাঁহার অনির্বচনীয নিগূঢ় সত্তার মধ্য হইতে এই প্রাতিভাসিক জগতেব সীমাবদ্ধ প্রকৃতিব মধ্যে আসিয়াছি। সেই যোগেরই এক বিপরীত প্রক্রিযাব দ্বারা আমাদিগকে প্রাতিভাসিক প্রকৃতির সকল সীমা অতিক্রম করিতে হইবে, এবং সেই মহত্তব চেতনাকে ফিরিযা পাইতে হইবে, যাহার দ্বারা আমবা ভগবানেব মধ্যে, শাশ্বতেব মধ্যে বাস কবিতে পারিব।

ভগবানেব যে শ্রেষ্ঠতম সত্তা তাহা অব্যক্ত—কখনও প্রকাশিত হয না। তাঁহার যে সত্য শাশ্বত মূর্তি তাহা জড়ের মধ্যে ব্যক্ত হয় না, প্রাণও তাহাকে ধরিতে পাবে না, মনও তাহাকে চিন্তা করিতে পাবে না—অচিন্ত্যরূপ, অব্যক্তমূর্তি।[১] আমবা যাহা দেখিতে পাই তাহা কেবল ভগবানেব আত্মসৃষ্ট রূপ—তাঁহার শাশ্বত রূপ, স্বরূপ নহে। এমন একজন আছেন, অথবা এমন এক সত্তা আছে, যাহা বিশ্ব হইতে ভিন্ন, অপ্রকাশ্য, অচিন্ত্য, এক অনির্বচনীয অনন্ত ভাগবত সত্তা—অনন্ত সম্বন্ধে আমরা যতই বিবাট বা যতই সূক্ষ্ম ধারণা করি না কেন, সেই সত্তা সে ধাবণাব বহু ঊর্ধ্বে। এই যেসকল জিনিসেব সমবায়কে আমরা বিশ্বজগৎ বলিয়া

[১] ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা।
মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ॥৯।৪

অভিহিত করি, এই যেসব বিরাট গতিশীলতার সমষ্টি যাহার কোনও সীমানা আমরা নির্ধারণ করিতে পারি না এবং যাহার বিভিন্ন রূপ ও প্রক্রিয়ার মধ্যে আমরা কোনও স্থায়ী বস্তু খুঁজিয়া পাই না, দাঁড়াইয়া ধরিবার মত কোন স্থান, স্তর বা কেন্দ্র খুঁজিয়া পাই না—সেসব এই ঊর্ধ্বতন অনন্ত সত্তা কর্তৃক প্রকট হইয়াছে, নির্মিত হইয়াছে, এই অনির্বচনীয় বিশ্বাতীত রহস্যের উপরে সেসব বিধৃত হইয়া রহিয়াছে। এক আত্মস্বরূপের উপরে এই সব বিধৃত রহিয়াছে, তাহা নিজে অব্যক্ত, অচিন্ত্য। এই যে সব সৃষ্টি অনবরত পরিবর্তিত হইতেছে, চলিতেছে, এই সব জীব, সব ভূত, সব জিনিস, সব জীবন্ত মূর্তি—*ইহারা সকলে মিলিয়া অথবা স্বতন্ত্রভাবে তাঁহাকে* ধারণ করিতে পারে না। তিনি তাহাদের মধ্যে নাই, তাহাদের মধ্যে, তাহাদের দ্বারা তাঁহার জীবন ও কর্মের লীলা চলিতেছে না, ভগবান এই ভূতজগৎ নহেন। তাহারাই তাঁহার মধ্যে রহিয়াছে, তাহাদেরই জীবন ও কর্মের লীলা তাঁহার মধ্যে চলিতেছে, তাঁহা হইতেই তাহাদের সত্য উদ্ভূত; তাহারা তাঁহার সম্ভূতি (becomings), তিনি তাঁহাদের মূল সত্তা (being), মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ। অন্তহীন দেশ ও কালের মধ্যে এই যে সীমাহীন জগৎ, ভগবান তাঁহার সত্তার অচিন্ত্য দেশকালাতীত আনন্ত্যের মধ্যে ইহাকে এক ক্ষুদ্র ব্যাপার রূপে বিস্তৃত করিয়াছেন।

সব তাঁহার মধ্যে রহিয়াছে, ইহা বলিলেও আবার এ বিষয়ের সমস্ত সত্যটা বলা হয় না, প্রকৃত সম্বন্ধটা সমগ্রভাবে বলা হয় না, কারণ একপ বলিলে ভগবানের উপর দেশবাচক ভাব আরোপ করা হয়। কিন্তু ভগবান দেশ ও কালের অতীত।[১] দেশ ও কাল, অনুস্যূতি (immanence) ও ব্যাপ্তি (pervasion) ও অতিক্রান্তি (exceeding)—এসব তাঁহার চৈতন্যের খেলা। তাঁহার ঐশ্বরিক শক্তির এক যোগ আছে—মে যোগঃ ঐশ্বরঃ—সেই যোগের দ্বারা পরম ভগবান তাঁহার আপনার অনন্ত আত্মরূপায়ণের মধ্যে নিজের নানা নামরূপের প্রকাশ করেন, সে আত্মরূপায়ণ জড় নহে, অধ্যাত্ম—জড়জগৎ সেই আত্মরূপায়ণের কেবল বাহ্যিক প্রতিচ্ছবি মাত্র। তাহার সহিত তিনি নিজেকে এক করিয়া দেখেন, তাহার সহিত এবং তাহার মধ্যে যাহাকিছু আশ্রয় পাইয়াছে, সেই সকলের সহিত ভগবান একীভূত হন। এই অনন্ত আত্মদর্শন তাঁহার সমগ্র আত্মদর্শন নহে (Pantheist মতানুসারে ভগবানের সহিত বিশ্বকে যে এক বলা হয় তাহা ইহা অপেক্ষা আরও সঙ্কীর্ণ)। এই আত্মদর্শনে তিনি যাহাকিছু আছে সবের সহিত এক, আবার সেই সঙ্গেই তিনি সেই সবের অতীত, কিন্তু এই যে আত্মা বা অধ্যাত্মসত্তার বিস্তৃত অনন্ততা যাহা বিশ্বকে ধরিয়া রাখিয়াও বিশ্বের অতীত, ভগবান ইহা হইতেও অন্য। তাঁহার বিশ্বচেতন অনন্ত সত্তার মধ্যে এখানে সব কিছুই রহিয়াছে,

[১] ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্।
ভূতভৃন্ন চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ॥৯।৫

কিন্তু আবার সেইটিকেও ভগবানের বিশ্বাতীত সত্তা আত্মচেতনার এক সৃষ্টিরূপে ধরিয়া রহিয়াছে—আমরা বিশ্ব বা সত্তা বা চেতনা বলিতে যাহা বুঝি, ভগবানের সেই বিশ্বাতীত সত্তা সেসকলেরই উপরে। ইহাই ভগবানের সত্তার নিগূঢ় রহস্য যে, তিনি বিশ্বাতীত, অথচ তিনি একেবারেই যে বিশ্বের বাহিরে তাহাও নহে। কারণ এই সবের আত্মরূপে তিনি সর্বত্র অনুস্যূত রহিয়াছেন। ভগবানের এই ভাস্বর মুক্ত আত্মসত্তা—মম আত্মা—সর্বত্র বিরাজ করিতেছে, সর্বভূতের সহিত তাহার নিত্য সম্বন্ধ, তিনি কেবল আছেন বলিয়াই সকলে বিশ্বলীলায় আবির্ভূত হইতেছে—ভূতভৃন্ন চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ। এই জন্যই আমরা দুইটি তত্ত্ব পাইতেছি, সৎ (being) ও সম্ভূতি (becoming), স্বয়ম্ভু আত্মা এবং ইহার উপরে প্রতিষ্ঠিত সর্বভূত, ভূতানি, ক্ষর সত্তা এবং অক্ষর সত্তা। কিন্তু এই যুগল তত্ত্বের উচ্চতম সত্য এবং তাহাদের মধ্যে বিরোধের সমন্বয় কেবল সেইখানেই পাওয়া যাইতে পারে যাহা বিরোধের অতীত, তাহা পরম ভগবান, তিনি তাঁহার যোগমায়ার (অর্থাৎ অধ্যাত্মচেতনার শক্তির) দ্বারা আধার আত্মা এবং আধেয় সর্বভূত এতদুভয়কেই প্রকট করিতেছেন। আমাদের অধ্যাত্মচেতনায় তাঁহার সহিত যুক্ত হইয়াই আমরা তাঁহার সত্তার সহিত আমাদের প্রকৃত সম্বন্ধের সন্ধান পাইতে পারি।

দার্শনিকের ভাষায় গীতার এই শ্লোকগুলির ইহাই অর্থ; কিন্তু তাহাদের ভিত্তি মানসিক যুক্তিতর্কের উপর নহে, পরন্তু অধ্যাত্ম উপলব্ধির উপরে। তাহারা সমন্বয় সাধন করে কারণ অধ্যাত্মচেতনার কতকগুলি সত্য হইতে তাহারা অখণ্ডভাবে উঠিয়াছে। জগতে গুপ্ত বা প্রকাশ্যভাবে যে পরম বা বিশ্বব্যাপী সত্তাই থাকুক আমরা যখন তাহার সহিত নিজেদের সচেতন সম্বন্ধ স্থাপনের চেষ্টা করি, তখন বহুপ্রকারের বিভিন্ন উপলব্ধি আমরা পাই এবং ভিন্ন ভিন্ন লোকের বুদ্ধি এই বিচিত্র উপলব্ধির কোন একটি বিশেষ দিককে লইয়া জগতের মূলতত্ত্ব সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন ধারণায় উপনীত হয়। প্রথমেই আমরা এক ভাগবত সত্তার অস্পষ্ট উপলব্ধি পাই—তিনি আমাদের হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন ও মহত্তর, আমরা যে জগতে বাস করিতেছি তাহা হইতেও তিনি সম্পূর্ণ বিভিন্ন ও মহত্তর—কেবল এইটুকুই, আর বেশী কিছু উপলব্ধি হয় না যতক্ষণ আমরা আমাদের বাহিরের সত্তার মধ্যে বাস করি এবং আমাদের চতুর্দিকে জগতের বাহ্যিক (phenomenal) রূপটাই নিরীক্ষণ করি। কারণ পরম ভগবানের যে পরম সত্য তাহা বিশ্বাতীত, এবং যাহা কিছু বাহিরের প্রাতিভাসিক মনে হয় সেসব স্বচেতন আত্মার আনন্ত্য হইতে ভিন্ন, মনে হয় তাহা এক নীচের সত্যের প্রতিচ্ছবি, হয়তো বা একেবারেই মিথ্যা ভ্রম, মায়া। যতক্ষণ আমরা এই ভেদজ্ঞান লইয়া চলি, ততক্ষণ মনে হয় যে, ভগবান বিশ্বের বাহিরে অবস্থিত। তিনি তাই, শুধু এই অর্থে যে, যেহেতু তিনি বিশ্বাতীত সেইহেতু তিনি বিশ্বের মধ্যে এবং বিশ্বের সৃষ্ট পদার্থের মধ্যে সীমাবদ্ধ নহেন, কিন্তু ইহার অর্থ এই নহে যে, এসব তাঁহার সত্তার বাহিরে, কারণ সেই এক অনন্ত ও

সত্য বস্তুব বাহিরে কিছুই নাই। ভগবান সম্বন্ধে এই প্রথম সত্য আমরা অধ্যাত্মভাবে উপলব্ধি কবি যখন আমাদেব অনুভূতি হয যে, আমবা কেবল তাঁহাব মধ্যেই বাস করিতেছি, তাঁহার মধ্যেই ঘুবিতেছি, ফিবিতেছি—তাঁহা হইতে আমবা যতই বিভিন্ন হই না কেন, আমাদেব অস্তিত্বেব জন্য আমবা তাঁহাবই উপবে নির্ভব করি—এবং এই বিশ্বজগৎও আত্মাবই কেবল একটা প্রকাশ ও লীলা।

কিন্তু আবাব ইহা ছাড়াও আবও উপরেব অনুভূতি আমবা পাই যে, আমাদেব যে আত্মসত্তা তাহা তাঁহাব আত্মসত্তাব সহিত এক। সর্বভূতেব এক আত্মা আমবা উপলব্ধি কবি এবং সে সম্বন্ধে আমরা চেতনা ও দৃষ্টিলাভ কবি। তখন আব আমবা বলিতে পারি না বা ভাবিতে পাবি না যে, আমবা তাঁহা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন, কিন্তু বুঝি যে, স্বপ্রতিষ্ঠ সত্তায আছে আত্মা (Self) এবং বহিঃপ্রকাশ (phenomenon); আত্মাতে সকলেই এক কিন্তু বহিঃপ্রকাশে সকলেই বিভিন্ন। কেবলমাত্র আত্মাব সহিত একান্ত আবেগে যোগ সাধনা কবিলে আমাদেব এমনও অনুভূতি হইতে পারে যে বহিঃপ্রকাশটা কেবল একটা স্বপ্নবৎ, অসত্য। কিন্তু আবার দুই দিকেই সমান আবেগ হইলে আমরা একই সঙ্গে দুই বকম অনুভূতি পাইতে পারি, আত্মসত্তায় তাঁহার সহিত এক পবম ঐক্য উপলব্ধি কবিতে পাবি, অথচ উপলব্ধি হইতে পারে যে, আমবা তাঁহাব সঙ্গে বাস কবিতেছি, তাঁহাব সহিত নানাভাবে নিত্য সম্বন্ধে লিপ্ত হইয়া রহিয়াছি, প্রকৃতপক্ষে আমবা তাঁহাব সত্তা হইতেই উৎপন্ন। এই বিশ্বজগৎ এবং বিশ্বজগতে আমাদেব অস্তিত্ব এসবই আমাদের কাছে হয় ভগবানের স্ব-চেতন সত্তাব এক নিত্য ও সত্য রূপ। এই অপেক্ষাকৃত নীচের সত্যে আমবা পাই তাঁহাব সহিত পার্থক্যেব সম্বন্ধ—অনন্তেব অন্য সমস্ত চেতন বা অচেতন শক্তিব সহিত পার্থক্যের সম্বন্ধ, বিশ্বপ্রকৃতিতে তাঁহাব যে বিশ্ব-আত্মা রহিয়াছে তাহাব সহিত আমাদের ব্যবহারেব সম্বন্ধ। এই সকল সম্বন্ধ বিশ্বাতীত সত্য হইতে বিভিন্ন, তাহাবা আত্মার চেতনাব একটা শক্তিব নীচের সৃষ্টি এবং যেহেতু তাহারা বিভিন্ন এবং যেহেতু তাহাবা সৃষ্ট সেইহেতু একমাত্র বিশ্বাতীত পবমবস্তুর উপাসকগণ এসকলকে আংশিক বা সর্বৈব ভাবেই মিথ্যা, মায়া বলিয়াই ঘোষণা করেন। অথচ এসকল তাঁহা হইতেই আসিযাছে, তাঁহাবই সত্তা হইতে উৎপন্ন রূপ—মিথ্যা শূন্য হইতে তাহাবা সৃষ্ট হয নাই। কাবণ আত্মা সর্বত্র যাহা দেখিতেছে সেসবই সে নিজে এবং তাহাব নিজেব রূপ, তাহা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন কিছুই নহে। আর ইহাও আমরা বলিতে পাবি না যে, এই সকল সম্বন্ধের অনুরূপ কিছুই বিশ্বাতীত সত্তার মধ্যে নাই, আমরা বলিতে পাবি না যে, সেই মূল হইতে উৎপন্ন চৈতন্যশক্তিব দ্বাবা তাহাবা সৃষ্ট অথচ সেই মূলে এমন কিছুই নাই যাহাতে তাহাদেব ভিত্তি ও সার্থকতা, এমন কিছুই নাই যাহা তাঁহার সত্তার এই সকল রূপেব সনাতন সত্য এবং উপবেব স্বরূপ।

আবার অন্য এক দিকে যদি আমরা আত্মা ও আত্মাব রূপসমূহ এতদুভযেব পার্থক্যের উপরে জোর দিই, আমাদেব উপলব্ধি হইতে পারে যে, আত্মা সকলকে

ধবিযা বহিযাছে—সকলেব মধ্যে অনুস্যূত। আমবা স্বীকার করিতে পারি যে, আত্মা সর্বত্র বিদ্যমান, তথাপি আত্মাব রূপসমূহ, যেসব আকারেব মধ্যে আত্মা বিবাজমান, সেসব যে আমাদেব কাছে আত্মা হইতে বিভিন্ন বলিয়াই প্রতিভাত হইতে পাবে, অনিত্যরূপ বলিযা প্রতিভাত হইতে পাবে, শুধু তাহাই নহে, সেসব একেবাবে অসত্য ছাযামাত্র বলিযাই মনে হইতে পাবে। একদিকে আমরা উপলব্ধি কবিতেছি সেই আত্মাকে, সেই অক্ষর পুরুষকে যিনি নিজেব দৃষ্টির মধ্যে বিশ্বের ক্ষব লীলাকে চিবকাল ধরিযা বহিযাছেন, অন্যদিকে আমাদের এই অনুভূতিও হইতেছে যে, ভগবান আমাদেব মধ্যে এবং সর্বভূতের মধ্যে অনুস্যূত রহিয়াছেন, এই অনুভূতিটি আগেকাব অনুভূতি হইতে পৃথকভাবে হইতে পারে অথবা এক সঙ্গে হইতে পাবে অথবা মিশিয়া হইতে পাবে। তথাপি আমাদের মনে হইতে পাবে যে, বিশ্বজগৎ তাঁহাব ও আমাদের চৈতন্যেব কেবল একটা বাহ্যরূপ, অথবা একটা প্রতিরূপ বা প্রতীক যাহার দ্বাবা আমবা তাঁহাব সহিত সার্থক সম্বন্ধ সৃষ্টি কবিতে পাবি এবং ক্রমশ তাঁহাব জ্ঞানে গড়িয়া উঠিতে পাবি। কিন্তু আবাব অন্যদিকে আমাদেব আর এক প্রকার অধ্যাত্ম অনুভূতিলব্ধ জ্ঞান হয যাহাতে আমবা সব জিনিসকেই একেবারে ভগবান বলিয়া দেখিতেই বাধ্য—এই জগতে এবং ইহাব অগণ্য জীবেব মধ্যে তিনি অক্ষররূপেই বিরাজিত নহেন, কিন্তু ভিতবে ও বাহিবে যাহাকিছু হইয়াছে সেসবই তিনি। তখন সবই হয় আমাদের কাছে এক দিব্য সত্যবস্তু যাহা আমাদেব মধ্যে এবং জগতের মধ্যে আবির্ভূত হইতেছে। যদি কেবল এই অনুভূতিই হয, তাহা হইলে আমবা সর্বেশ্বরবাদীদের (pantheistic) ঐক্য পাই—সেই একই সব। কিন্তু, সর্বেশ্বরবাদীদের অনুভূতি কেবল আংশিক অনুভূতি। এই যে বিস্তৃত জগৎ ইহাই ভগবানের সবখানি নহে, ইহা অপেক্ষা মহত্তব এক অনন্ত আছে যাহাব দ্বাবা ইহাব অস্তিত্ব সম্ভব হইয়াছে। বিশ্ব ভগবানের সমগ্র চবম সত্য নহে, কেবল একটা আত্মাভিব্যক্তি, তাঁহার সত্তার একটা সত্য কিন্তু নীচেব খেলা। এই সব অধ্যাত্ম উপলব্ধি—প্রথম দৃষ্টিতে ইহাদেব মধ্যে যতই বৈসাদৃশ্য বা বিবোধ দেখা যাউক, তথাপি ইহাদের সমন্বয় করা যায় যদি আমবা ইহাদেব মধ্যে কোন একটিবই উপবে সব জোর না দিই এবং যদি আমরা এই সহজ সত্যটি স্বীকাব কবি যে, ভাগবত সত্তা বিশ্বজগৎ অপেক্ষা বড়, কিন্তু তথাপি সব সমষ্টিগত ও ব্যষ্টিগত জিনিস সেই ভাগবত সত্তা ব্যতীত আর কিছুই নহে—সকলেই তাঁহার প্রকাশক বলিতে পাবা যায, তাহাদের কোন অংশে বা সমষ্টিতে তাহারা সেই সমগ্র সত্তা নহে, তথাপি সেসব তাঁহার প্রকাশক হইতে পাবিত না যদি তাহাবা ভাগবত সত্তারই উপাদানে নির্মিত না হইযা অন্য কিছু হইত। সেইটিই সত্য বস্তু, কিন্তু তাহাবা তাহাব প্রকাশক সত্য বস্তু।[১]

যদিও আমাদেব মনেব অনুভূতিতে চবম সত্যেব পার্শ্বে এইগুলিকে অপেক্ষাকৃত অসত্য বলিয়াই অনুভূত হইতে পাবে। শঙ্কবেব মাযাবাদে যে যুক্তিতর্ক আছে তাহা বাদ দিযা, উহাব মূলে যে অধ্যাত্ম উপলব্ধি বহিযাছে তাহা ধবিলে দেখা যায যে, উহা এই আপেক্ষিক অসত্যতাব অনুভূতিকে লইযাই

"বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি" বাক্যেব দ্বারা ইহাই উপলক্ষিত হইযাছে, যাহাকিছু এই বিশ্বজগৎ, যাহাকিছু এই বিশ্বজগতে বহিযাছে এবং যাহাকিছু বিশ্বেব উপবে সে সমুদায়ই ভগবান। গীতা প্রথমে তাঁহাব বিশ্বাতীত সত্তাব উপবেই ঝোঁক দিযাছে। নতুবা মানুষেব মন তাহার চবম লক্ষ্যকে হাবাইযা ফেলিবে এবং কেবল বিশ্বেব দিকেই চাহিযা থাকিবে, অথবা বিশ্বেব মধ্যে ভগবানেব কোন আংশিক উপলব্ধিতেই আসক্ত থাকিবে। পরে গীতা তাঁহার বিশ্বসত্তাব উপবে জোব দিযাছে, যাঁহার মধ্যে সকলে চলিতেছে, ফিবিতেছে, কর্ম কবিতেছে। কাবণ, ঐটিই বিশ্বলীলার সার্থকতা, ঐটিই ভগবানের বিবাট অধ্যাত্ম আত্মজ্ঞান, সেখানে ভগবান নিজেকে কাল-পুরুষ রূপে দেখিযা তাঁহাব বিশ্বব্যাপী কর্ম কবিতেছেন। তাহাব পব গীতা বেশ জোর দিযাই স্বীকার কবিতে বলিযাছে যে, ভগবান মানবদেহেব মধ্যে দিব্য অধিবাসীরূপে অধিষ্ঠিত। কারণ, তিনি সর্বভূতেব অন্তবে অধিষ্ঠিত পুরুষ, এবং যদি এই অন্তর্যামী পুরুষকে স্বীকাব কবা না যায তাহা হইলে কেবল যে ব্যষ্টিগত সত্তাব কোন দিব্য সার্থকতা থাকিবে না এবং আমাদেব উচ্চতম অধ্যাত্মজীবন বিকাশেব প্রেবণার শ্রেষ্ঠ শক্তি নষ্ট হইবে শুধু তাহাই নহে, পবন্তু সমাজেব মধ্যে জীবের সম্বন্ধ থাকিযা যাইবে ক্ষুদ্র, সঙ্কীর্ণ, অহঙ্কৃত। অবশেষে, গীতা বিশ্বেব সকল বস্তুর মধ্যে ভগবানেব প্রকাশ অতি বিস্তৃতভাবেই দেখাইযাছে এবং বলিয়াছে যে, জগতে যাহাকিছু আছে সেসব এক ভগবানেবই প্রকৃতি, শক্তি ও চৈতন্য হইতে উদ্ভূত। কাবণ, এই দৃষ্টিও ভাগবতজ্ঞান লাভ কবিতে হইলে মূলত প্রয়োজনীয, এই ভিত্তির উপবেই মানুষ তাহাব সমগ্র সত্তা ও সমগ্র প্রকৃতিকে ভগবদ্ অভিমুখী কবে, জগতে ভাগবত শক্তিব কার্য স্বীকাব কবে, তাহার নিজের মন এবং ইচ্ছাশক্তিকে দিব্য কর্মেব স্বরূপে রূপান্তবিত কবিবাব সম্ভাবনা স্বীকার কবে—সে কর্মেব প্রেবণা আসে উপব হইতে, সে কর্মেব দ্বাবা বিশ্বের প্রযোজন সিদ্ধ হয, সে কর্ম ব্যক্তিব বা জীবেব মধ্য দিযাই সম্পাদিত হয।

তাহা হইলে পবাৎপর ভগবান, বিশ্বচৈতন্যেব পশ্চাতে অক্ষব পুরুষ, মানুষেব মধ্যে ব্যষ্টিগত ভাবগত সত্তা, বিশ্বপ্রকৃতির এবং তাহাব সকল কর্ম জীবেব মধ্যে গোপনভাবে সচেতন অথবা আংশিকভাবে প্রকট ভাগবত সত্তা—এ সকলই এক সত্য বস্তু, এক ভগবান। কিন্তু সেই একই পুরুষেব একটি ভাব সম্বন্ধে যে-সকল সত্য আমরা সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহে বলিতে পাবি, তাঁহাব অন্য ভাব সম্বন্ধে সে সত্যগুলি প্রযোগ কবিবাব চেষ্টা কবিলে সেগুলি উল্টাইযা যায অথবা তাহাদেব অর্থেব পবিবর্তন হয। যেমন ভগবান সব সময়েই ঈশ্বব, কিন্তু তাই বলিযা আমবা চারিটি ক্ষেত্রেই তাঁহার মূল ঈশ্বরত্ব ঠিক একই ভাবে, একই অর্থে প্রযোগ কবিতে

বাড়াবাড়ি কবিযাছে। মনেব উপবে উঠিলে আব এই গোলমাল থাকে না, কাবণ সেখানে ঐ গোলমাল কখনই ছিল না। বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায, দার্শনিক সম্প্রদায বা যোগপন্থাব পশ্চাতে বিভিন্ন অনুভূতি বহিযাছে মনেব ক্ষেত্রে তাহাদেব মধ্যে যে বিবোধ, গভীবতব অনুভূতিব দ্বাবা সেসব বিবোধ দূব হইযা যায এবং অতিমানস অনন্তেব ক্ষেত্রে তাহাদেব মধ্যে ঐক্য ও সামঞ্জস্য সাধিত হয।

পাবি না। বিশ্বপ্রকৃতিতে আবির্ভূত ভাগবত সত্তারূপে তিনি প্রকৃতির সঙ্গে নিবিড় ঐক্যেব সহিত কার্য করেন। বলিতে পাবা যায যে, তখন তিনি নিজেই প্রকৃতি, কিন্তু সেই প্রকৃতিব কার্যেব মধ্যে থাকে এক অধ্যাত্মচেতনা যাহা পূর্ব হইতে সব দেখিতে পায, পূর্ব হইতে সব সঙ্কল্প কবে, ইচ্ছা কবে, সব বুঝিতে পারে, নিজেব বলে সবকে পবিচালিত কবে, কর্ম ও শেষ পর্যন্ত কর্মের ফল নিয়ন্ত্রিত করে। আবাব সকলের শান্ত দ্রষ্টারূপে তিনি অকর্তা, কেবল প্রকৃতিই কর্তা। তিনি প্রকৃতিকে আমাদেব স্বভাব অনুযাযী এই সকল কর্ম কবিতে ছাড়িযা দেন, স্বভাবস্তু প্রবর্ততে, তথাপি এখানেও তিনি ঈশ্বর—প্রভু, বিভু, কাবণ তিনি আমাদেব কর্ম দেখেন, সমর্থন কবেন এবং তাঁহার নীবব অনুমতিব দ্বাবা প্রকৃতিকে কার্য করিতে ক্ষমতা দেন। তাঁহার নিষ্ক্রিযতা দ্বাবা তিনি পরাৎপর ভগবানের শক্তিকে তাঁহাব সর্বব্যাপী নিশ্চল অবস্থিতির ভিতব দিযা প্রেরণ করেন এবং দ্রষ্টা পুরুষেব সমভাবেব দ্বাবা সকল বস্তুতে উহাব ক্রিযাকে সমর্থন কবেন। পরাৎপর বিশ্বাতীত ভগবান রূপে তিনিই সকলেব মূল সৃষ্টিকর্তা। তিনি সকলের উপরে, সকলকে আবির্ভূত হইতে বাধ্য করেন; কিন্তু তিনি যাহা সৃষ্টি করেন তাহার মধ্যে নিজেকে হাবাইযা ফেলেন না, অথবা তাঁহাব প্রকৃতিব কর্মে নিজেকে আসক্ত করেন না। প্রকৃতিব কর্মে যে অলঙ্ঘ্য নিযমানুবর্তিতা, তাহার পিছনে অধ্যক্ষরূপে রহিয়াছে তাঁহাবই মুক্ত সত্তাব ইচ্ছাশক্তি। ব্যষ্টিগত সত্তায় অজ্ঞানেব সময তিনি আমাদের মধ্যে প্রচ্ছন্ন ভগবান, সকলকে অবশভাবে প্রকৃতিব যন্ত্রে ঘূর্ণায়মান করেন, সেই যন্ত্রেব অংশস্বরূপ অহং (ego) ঘুরিতে থাকে, সেই অহং একটা বাধাও বটে আবাব সেই সঙ্গে সহায়ও বটে। কিন্তু, প্রত্যেক জীবের মধ্যেই পূর্ণ ভগবান বিরাজ কবিতেছেন, অতএব আমরা অজ্ঞানকে অতিক্রম করিযা এই অবশতার সম্বন্ধ ছাড়াইযা উঠিতে পাবি। কাবণ, যে এক আত্মা সবকে ধরিয়া রহিয়াছে তাহার সহিত নিজদিগকে এক কবিযা আমবা সাক্ষী ও অকর্তা হইতে পারি। অথবা আমবা আমাদেব ব্যষ্টিসত্তায় আমাদের অন্তরস্থিত ভগবানেব সহিত মানবাত্মার যাহা সত্য সম্বন্ধ তাহাতে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারি, আমাদের প্রাকৃত অংশকে সাক্ষাৎ যন্ত্র বা নিমিত্ত করিতে পারি এবং আমাদেব অধ্যাত্ম সত্তায় সেই অন্তর্যামী পুরুষেব পবম মুক্ত আসক্তিহীন প্রভুত্বের ভাগী হইতে পাবি। এইটিই আমাদিগকে গীতাব মধ্যে স্পষ্টভাবে দেখিতে হইবে, কোন্ সম্বন্ধের ক্ষেত্র হইতে প্রযোগ করা হইতেছে সেই অনুসাবে একই সত্যেব যে এইরূপ বিভিন্ন অর্থ হয তাহা আমাদিগকে স্বীকাব কবিতে হইবে। নতুবা যেখানে বাস্তবিক কোন বিবোধ বা অসামঞ্জস্য নাই সেখানে আমবা তাহা দেখিতে পাইব অথবা অর্জুনের ন্যায় বলিতে হইবে, ব্যামিশ্রেণেব বাক্যেন বুদ্ধিং মোহয়সীব মে।

তাই গীতা এই বলিযা আবম্ভ কবিল যে, ভগবান নিজেব মধ্যে সবকে ধবিয়া বাখিযাছেন, কিন্তু, তিনি নিজে কাহাবও মধ্যে নহেন—মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ। আবাব তখনই বলিলেন, "অথচ সর্বভূত আমাব মধ্যে অবস্থিত

নহে, আমার আত্মা সর্বভূতকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে, তাহাদের মধ্যে অবস্থিত নহে।" আবার যেন আত্মবিরোধ করিয়াই গীতা বলিয়াছে যে, ভগবান মানব-শরীরের মধ্যে রহিয়াছেন, মানবশরীরকে আশ্রয় করিয়াছেন—মানুষীম্ তনুম্ আশ্রিতম্। বলিয়াছে যে কর্ম, ভক্তি ও জ্ঞানের যে পূর্ণ সাধনা, তাহার দ্বারা আত্মার মুক্তি সাধিতে হইলে ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। এই যেসব কথার পরস্পরের মধ্যে বিরোধ রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়, বস্তুত এরূপ কোন বিরোধই নাই। ভগবানের যে বিশ্বাতীত সত্তা তাহাই সর্বভূতের মধ্যে অবস্থিত নহে, সর্বভূতও তাহার মধ্যে অবস্থিত নহে। কারণ, আমরা যে সত্তা (Being) ও সম্ভূতির (Becoming) মধ্যে প্রভেদ করি, তাহা কেবল রূপাত্মক জগতেই প্রযোজ্য। বিশ্বাতীত স্তরে সমস্তই শাশ্বত সত্তা এবং যদি সেখানেও বহুত্ব থাকে তবে সকলেই শাশ্বত সত্তা। এক বস্তুর মধ্যে আর এক বস্তু থাকা, এরূপ স্থানবাচক ভাব সেখানে প্রযোজ্য নহে, কারণ বিশ্বাতীত যে পরম বস্তু তাহা দেশ ও কালের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন নহে, ঈশ্বরের যোগমায়ার দ্বারা ইহজগতেই দেশকালের সৃষ্টি হইয়াছে। সেখানে অধ্যাত্ম সহবর্তিতা, co-existence (তাহা দেশ ও কালের অনুযায়ী সহবর্তিতা নহে), অধ্যাত্ম ঐক্য ও সমানুপাতই ভিত্তি। কিন্তু অন্য পক্ষে, ব্যক্ত জগতে, পরম অব্যক্ত বিশ্বাতীত পুরুষ কর্তৃক বিশ্ব, দেশ ও কালের মধ্যে বিস্তৃত হইয়াছে, সেই বিস্তারে তিনি প্রথমে আত্মারূপে আবির্ভূত হন এবং সকলকে ধারণ করেন—ভূতভৃৎ, তাঁহার সর্বব্যাপী আত্মসত্তায় সর্বভূতকে বহন করেন। এমনকি ইহাও বলা যাইতে পারে যে, পরমাত্মাই এই বিশ্বব্যাপী আত্মার ভিতর দিয়া বিশ্বকে ধরিয়া রহিয়াছেন; তিনি ইহার অদৃশ্য অধ্যাত্ম ভিত্তি এবং সর্বভূতের আবির্ভাবের গুপ্ত অধ্যাত্ম কারণ। আমাদের মধ্যে গুপ্ত আত্মা যেমন আমাদের চিন্তা, কর্ম, গতিকে ধরিয়া রহিয়াছে, সেইভাবে তিনিও বিশ্বকে ধরিয়া রহিয়াছেন। উপলব্ধি হয় যে, তিনি মন, প্রাণ, দেহে ব্যাপ্ত রহিয়াছেন, তাঁহার সত্তার দ্বারা তাহাদিগকে ধরিয়া রহিয়াছেন; কিন্তু এই যে ব্যাপ্তি ইহা চৈতন্যের একটা ক্রিয়া, ইহা জড় বস্তুর ব্যাপ্তি নহে; এই জড় শরীরও আত্মার চৈতন্যের একটা নিত্য ক্রিয়া ভিন্ন আর কিছুই নহে।

এই দিব্য আত্মা সর্বভূতকে ধরিয়া রহিয়াছে, সব তাহার মধ্যে অবস্থিত, মূলত জড়ভাবে নহে, কিন্তু আত্মা অধ্যাত্মভাবে যে নিজেকে বিস্তৃত করিয়াছে তাহারই মধ্যে সকলে অবস্থিত। ঐ অধ্যাত্ম বিস্তৃতিকে আমাদের জড়ানুগত মন ও ইন্দ্রিয় যেভাবে দেখে তাহাই জড়জগতে বিস্তৃত দেশ ও কাল। বস্তুত এখানেও সবই অধ্যাত্ম সহবর্তিতায়, ঐক্যে ও সমানুপাতে রহিয়াছে, কিন্তু ইহা মূল সত্য—যতক্ষণ না আমরা সেই পরা চৈতন্যে ফিরিয়া যাইতে পারিতেছি, ততক্ষণ এ সত্য আমরা প্রয়োগ করিতে পারি না। ততক্ষণ পর্যন্ত ইহা কেবল আমাদের মনের একটা ধারণা মাত্র হইয়া থাকিবে, কিন্তু বাস্তব উপলব্ধিতে ইহার অনুরূপ আমরা কিছুই পাইব না। অতএব এইসব দেশ-কাল-বাচক শব্দ ব্যবহার করিয়াই

আমাদিগকে বলিতে হয় যে, এই বিশ্ব এবং বিশ্বের সকল বস্তু স্বপ্রতিষ্ঠ ভাগবত সত্তার মধ্যে রহিয়াছে, যেমন অন্য সকল জিনিস আকাশের মধ্যে রহিয়াছে। তাই গুরু এখানে অর্জুনকে বলিলেন, "যেমন মহান সর্বত্রগামী বায়ু আকাশে অবস্থিত, ভূতগণও সেইরূপ আমাতে অবস্থিত, এই ভাবেই তোমাকে ইহা ধারণা করিতে হইবে।" বিশ্বসত্তা সর্বব্যাপী ও অনন্ত এবং স্বপ্রতিষ্ঠ সত্তাও সর্বব্যাপী ও অনন্ত; কিন্তু স্বপ্রতিষ্ঠ অনন্ত হইতেছে অচল, স্থির, অক্ষর, আর বিশ্বসত্তা হইতেছে সর্বব্যাপী গতি—সর্বত্রগঃ। আত্মা এক ভিন্ন বহু নহে; কিন্তু বিশ্বসত্তা সর্বভূতরূপে নিজেকে প্রকট করিতেছে এবং মনে হয় যে, উহা সর্বভূতেরই সমষ্টি। একটি হইতেছে সত্তা, অপরটি সত্তার শক্তি, তাহা সর্বমূল সর্বাধার অক্ষর আত্মার সত্তায় চলিতেছে, সৃষ্টি করিতেছে, কর্ম করিতেছে। আত্মা এই সকল সৃষ্ট বস্তুতে বা তাহাদের কোন একটিতে অবস্থান করে না, অর্থাৎ তাহাদের কোন একটির মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে—ঠিক যেমন এখানে আকাশ কোন রূপের মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে, যদিও সকল রূপ শেষ পর্যন্ত আকাশ হইতেই উৎপন্ন। সকল বস্তুকে একত্র করিলেও ভগবান হয় না বা ভগবানকে ধরিয়া রাখিতে পারে না, যেমন সর্বত্রগ বায়ুর মধ্যে আকাশ সীমাবদ্ধ নহে অথবা ঐ বায়ুর রূপ ও শক্তিসকলকে একত্র করিলেও আকাশ হয় না। তথাপি ঐ গতির মধ্যেও ভগবান রহিয়াছেন, তিনি বহুর মধ্যে অবস্থান করিতেছেন প্রত্যেক জীবের ঈশ্বর রূপে। তাঁহার পক্ষে এই দুই প্রকার সম্বন্ধই একই সঙ্গে সত্য। একটি হইতেছে স্বপ্রতিষ্ঠ আত্মসত্তার সহিত বিশ্বলীলার সম্বন্ধ, অপরটি অনুস্যূতি, বিশ্বসত্তার সহিত বিশ্বসত্তার নিজেরই বিভিন্ন রূপের সম্বন্ধ। একটি সত্য হইতেছে সত্তার, তাহা স্বপ্রতিষ্ঠ, নিজের অক্ষরতায় সকলকে ধরিয়া রহিয়াছে, অপর সত্যটি হইতেছে সেই সত্তারই শক্তির, তাহা সত্তারই আত্মগোপন ও আত্মপ্রকাশলীলাকে অনুপ্রাণিত ও পরিচালিত করিতেছে।

পরাৎপর ভগবান বিশ্বসত্তার ঊর্ধ্ব হইতে নিজের প্রকৃতির উপর চাপ দিয়া তাহার মধ্যে যাহাকিছু আছে, যাহাকিছু এককালে ব্যক্ত হইয়া আবার অব্যক্ত হইয়াছে সেসবকে এক অনন্ত আবর্তনে পুনঃপুনঃ সৃষ্টি করেন।[২] বিশ্বমাঝে সকল সৃষ্ট বস্তু এই সৃষ্টিক্রিয়ার দ্বারা অবশ হইয়া চালিত হয়—জগতের যেসব নিয়ম সর্বভূতরূপে প্রকট ভাগবত সত্তার বিশ্বলীলার ছন্দ প্রকাশ করিতেছে—সকল সৃষ্ট বস্তু সেই সব নিয়মের অধীনে পরিচালিত হয়। এই দিব্যপ্রকৃতির ক্রিয়াতেই জীব তাহার যাতায়াতের চক্র অনুসরণ করে—প্রকৃতিম্ মামিকাম্, স্বাম্ প্রকৃতিম্। প্রকৃতির বিকাশের নিয়মানুসারে জীব কখনও এক রূপ, কখনও অন্য রূপ গ্রহণ

যথাকাশস্থিতো নিত্যং বায়ুঃ সর্বত্রগো মহান্।
তথা সর্বাণি ভূতানি মৎস্থানীত্যুপধারয়॥৯।৬
প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ।
ভূতগ্রামমিমং কৃৎস্নমবশং প্রকৃতের্বশাৎ॥৯।৮

করে; দিব্য প্রকৃতিবই একটা আবির্ভাব রূপে জীবের সত্তার যাহা ধর্ম, জীব সকল সময়েই সেই স্বধর্মের রেখা অনুসরণ কবিয়া চলে, প্রকৃতিব ঊর্ধ্বতন সাক্ষাৎ লীলাতেই হউক বা অধস্তন পরোক্ষ লীলাতেই হউক, অজ্ঞানেই হউক বা জ্ঞানেই হউক; কল্পের অন্তে জীব প্রকৃতিব কর্মলীলা হইতে তাহাব অচলতা ও নীববতাব মধ্যে ফিরিয়া যায়। জীব যখন অজ্ঞান, তখন সে প্রকৃতিব কল্পচক্রেব অধীন, নিজে নিজেব প্রভু নহে, কিন্তু প্রকৃতিব বশে পরিচালিত—অবশং প্রকৃতের্বশাৎ, কেবল দিব্য চৈতন্যে ফিরিয়া গিয়াই জীব ঈশ্বরত্ব ও মুক্তি লাভ কবিতে পাবে। ভগবানও ঐ কল্পচক্রের অনুসবণ করেন, কিন্তু উহাব বশে নহে, উহাব প্রকাশক ও পবিচালক আত্মা রূপে, তাঁহাব সমগ্র সত্তা উহাতে নিযোজিত হয না, কিন্তু তাঁহাব সত্তার শক্তির দ্বারা তিনি উহাকে অনুসবণ কবেন, পরিচালিত কবেন। প্রকৃতিব মধ্য দিয়া তাঁহার যেকর্ম চলিতেছে সেকর্মেব তিনিই অধ্যক্ষ, তিনি প্রকৃতিব মধ্যে সঞ্জাত কোন সত্তা নহেন, কিন্তু তিনি সেই সত্তা যিনি অধ্যাত্ম সৃষ্টিকর্তারূপে প্রকৃতিকে সচরাচর বিশ্ব প্রসব করান।[১] তাঁহার শক্তিতে তিনি প্রকৃতিব কর্ম অনুসরণ করেন এবং তাঁহার সকল কর্মের প্রবর্তক হন বটে, কিন্তু তিনি আবাব প্রকৃতিব বাহিবেও বটেন, যেন প্রকৃতির বিশ্বলীলার উপবে বিশ্বাতীত ঐশ্ববিক সত্তায় অধিষ্ঠিত থাকেন, কোন বন্ধনহেতু অবশকাবী বাসনাব দ্বাবা তিনি প্রকৃতিতে আসক্ত নহেন, অতএব তাঁহার কর্মসকলেব দ্বাবা বদ্ধ নহেন, কাবণ তিনি সেসব অপেক্ষা অনন্তগুণে বড এবং সেসকলেব পূর্ববর্তী, কালেব চক্রে যেসব কর্মপরম্পরা চলিতেছে, তাহাদেব পূর্বে, তাহাদেব সমকালে এবং তাহাদের পরেও তিনি যেমন আছেন ঠিক তেমনই থাকেন।[২] তাহাদেব সকল পরিবর্তনে তাঁহার অক্ষর সত্তাব কোনও পবিবর্তন হয না। যে নীবব অধ্যাত্ম সত্তা বিশ্বে ব্যাপ্ত বহিয়াছে, বিশ্বকে ধরিয়া রাখিয়াছে—তাহা বিশ্বেব কোন পবিবর্তনেই বিচলিত হয় না; কারণ যদিও উহা ধবিযা রহিয়াছে, তথাপি উহা ঐ পবিবর্তনেব লীলায় যোগদান কবে না। এই মহত্তম পরাৎপব বিশ্বাতীত সত্তাও সেসকলেব দ্বাবা বিচলিত হয না, কারণ, ইহা তাহাদেব অতীত, চিবকাল তাহাদেব উপবে রহিয়াছে।

কিন্তু আবার যেহেতু এই কর্ম দিব্যপ্রকৃতিব কর্ম—স্বাম্ প্রকৃতিম্, এবং দিব্য-প্রকৃতি কখনও ভগবান হইতে স্বতন্ত্র হইতে পাবে না, দিব্যপ্রকৃতি যাহাই সৃষ্টি করুক না কেন তাহাব মধ্যে নিশ্চয ভগবান অনুস্যূত আছেন। এই যে সম্বন্ধ ইহাই ভগবানের সত্তাব সমগ্র সত্য নহে, কিন্তু আবাব এই সত্যকে আমরা আদৌ

[১] ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূযতে সচবাচবম্।
হেতুনানেন কৌন্তেয জগদ্‌বিপবিবর্ত্ততে॥৯।১০

[২] ন চ মাং তানি কর্ম্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয়।
উদাসীনবদাসীনমসক্তং তেষু কর্ম্মসু॥৯।৯

অবহেলাও কবিতে পাবি না। তিনি মানবদেহের মধ্যে অধিষ্ঠিত বহিয়াছেন।[১] যাহাবা এখানে ভগবানেব অস্তিত্ব স্বীকাব করে না, মানবদেহেব মধ্যে ভাগবত সত্তা প্রচ্ছন্ন হইযা বহিয়াছে বলিযা যাহাবা তাঁহাকে অবজ্ঞা করে, তাহারা প্রকৃতির বাহ্য দৃশ্যের দ্বাবা বিমূঢ় ও প্রতারিত হয়, তাহারা উপলব্ধি করিতে পাবে না যে, অন্তবেব মধ্যে ভগবান গুপ্ত বহিযাছেন, অবতাবে তিনি সজ্ঞানে মানবদেহ ধারণ কবেন, সাধাবণ মানুষে তিনি তাঁহার মাযাব দ্বাবা প্রচ্ছন্ন থাকেন। যাঁহাবা মহাত্মা, যাঁহাবা অহংভাবেব মধ্যে আবদ্ধ নহেন, যাঁহারা অন্তর্যামী ভগবানেব দিকে নিজদিগকে খুলিযা ধবিতে পাবেন তাঁহারা জানেন যে, মানুষেব মধ্যে যে গুপ্ত আত্মা অপূর্ণ মানবীয প্রকৃতিতে আবদ্ধ বলিযা মনে হয়, তাহা সেই একই অনির্বচনীয জ্যোতি যাহাকে আমবা সকলের উপরে পরাৎপর ভগবান বলিযা পূজা কবি। যেখানে তিনি সর্বভূতেব অধিপতি ও ঈশ্বর, ভগবানেব সেই পরম পদ তাঁহাবা জানেন, অথচ তাঁহাবা দেখিতে পান যে, প্রত্যেক ভূতের মধ্যেও তিনি সেই পবাৎপব দেবতা এবং অন্তর্যামী ভগবান। বাকী যাহাকিছু সেসবই বিশ্বমাঝে প্রকৃতিব নানা বৈচিত্র্য বিকাশেব জন্য ভগবানেব খণ্ড প্রকাশ, ভগবান নিজে নিজেকে খণ্ডিত কবেন। তাঁহারা আরও দেখিতে পান যে, তাঁহাবই প্রকৃতি বিশ্বে যাহাকিছু আছে সব হইযাছে সুতবাং ইহসংসাবে প্রত্যেক বস্তুই মূলত ভগবান ভিন্ন আব কিছুই নহে—বাসুদেবঃ সর্ব্বম্ এবং তাঁহাবা যে তাঁহাকে কেবল বিশ্বাতীত পবাৎপব ভগবান বলিয়া পূজা কবেন শুধু তাহাই নহে কিন্তু ইহসংসারে, তাহাব একত্বে এবং প্রত্যেক পৃথক সত্তায তাঁহাকে পূজা করেন।[২] তাঁহারা এই সত্য দর্শন কবেন এবং এই সত্যকে অনুসবণ কবিয়া তাঁহাবা জীবনযাপন কবেন, কর্ম করেন; তাঁহাকেই তাঁহাবা উপাসনা কবেন, জীবনে অনুসবণ করেন, সকল বস্তুব ঊর্ধ্বে অবস্থিত সত্তা রূপে, আবাব বিশ্বমাঝে অবস্থিত ভগবান রূপে, এই দুই রূপেই তাঁহাব পূজা কবেন, কর্মযজ্ঞের দ্বাবা তাঁহাকে সেবা কবেন, জ্ঞানেব দ্বারা তাঁহাকে সন্ধান কবেন, সর্বত্র ভগবান ভিন্ন আব কিছুই দেখেন না এবং তাঁহাদের আত্মা এবং অন্তঃপ্রকৃতি ও বহিঃপ্রকৃতি সহ সমগ্র সত্তাকে তাঁহার দিকে তুলিয়া ধরেন। এইটিকেই তাঁহাবা উদাব ও প্রকৃষ্ট পন্থা বলিযা জানেন; কারণ এইটিই পরাৎপব বিশ্বব্যাপী এবং ব্যষ্টিগত ভগবান সম্বন্ধে সমগ্র জ্ঞানেব উপর প্রতিষ্ঠিত পন্থা।

অবজানন্তি মাং মূঢা মানুষীং তনুমাশ্রিতম।
পবং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম॥৯।১১
মহাত্মানস্তু মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ।
ভজন্ত্যনন্যমনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যযম্॥৯।১৩
জ্ঞানযজ্ঞেন চাপ্যন্যে যজন্তো মামুপাসতে।
একত্বেন পৃথক্ত্বেন বহুধা বিশ্বতোমুখম॥৯।১৫
মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরাযণঃ॥৯।৩৪

ষষ্ঠ অধ্যায়

কর্ম ভক্তি ও জ্ঞান

ইহাই তাহা হইলে সমগ্র সত্য, সর্বাপেক্ষা উচ্চ ও প্রশস্ত জ্ঞান। ভগবান বিশ্বাতীত, সনাতন পরব্রহ্ম—তাঁহাব নিজেবই সত্তা ও প্রকৃতি যে দেশ ও কালের মধ্যে এই বিশ্বরূপে আবির্ভূত হইযাছে, সেসবকে তিনি তাঁহাব দেশ ও কালেব অতীত প্রতিষ্ঠাব দ্বারা ধরিয়া বহিযাছেন। তিনি পবমাত্মা, বিশ্বেব সকল নামরূপ ও গতিধাবাব আত্মাবপে বিবাজ কবিতেছেন। তিনি পুরুষোত্তম, সকল আত্মা ও প্রকৃতি, এই বিশ্বেব বা অন্য সকল বিশ্বেব সকল সত্তা ও সম্ভূতি তাঁহাবই আত্মরূপায়ণ ও আত্মশক্তি-প্রকাশ। তিনি পবমেশ্বব, সকল বিশ্বেব অনির্বচনীয প্রভু, তিনি তাঁহাব নিজের ব্যক্ত শক্তিকে অধ্যাত্মভাবে নিযন্ত্রিত কবিযা জগৎচক্র প্রবর্তিত করিতেছেন এবং জগতে সর্বভূতের স্বাভাবিক ক্রমবিকাশ সাধন করিতেছেন। তাঁহা হইতেই জীব, এখানে এই সত্তায জীবেব অস্তিত্ব, তাঁহাবই চেতনার আলোকে জীব সচেতন, তাঁহাবই ইচ্ছা ও শক্তি দ্বাবা জীব জ্ঞানেব, ইচ্ছাব, কর্মেব ক্ষমতা লাভ কবিযাছে, তাঁহাবই বিশ্বলীলাব দিব্য আনন্দে জীব জীবনকে উপভোগ করিতেছে।

মানুষেব অন্তর-আত্মা হইতেছে এখানে ভগবানেব আংশিক আত্মপ্রকাশ, জগতে তাঁহাব প্রকৃতির কার্যেব জন্য তিনি নিজেকে এইভাবে সীমাবদ্ধ কবিযাছেন, প্রকৃতিঃ জীবভূতাঃ। ব্যষ্টিগত মানুষ তাহাব মূল অধ্যাত্ম সত্তায ভগবানেব সহিত এক। দিব্যপ্রকৃতিব ক্রিয়ায সে ভগবানেব সহিত এক, অথচ কার্যত একটা ভেদ আছে, এবং প্রকৃতিব মধ্যে অবস্থিত ভগবান ও বিশ্বপ্রকৃতিব ঊর্ধ্বে অবস্থিত ভগবান এতদুভযেব মধ্যে অনেক প্রকাব সম্বন্ধ আছে। প্রকৃতিব নীচেব খেলায় অজ্ঞান ও অহঙ্কাবমূলক ভেদনীতির বশে মনে হয যেন মানুষ সেই এক ভগবান হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন; এবং ভেদচেতনাব মধ্যে থাকিযাই সে চিন্তা করে, ইচ্ছা করে, কর্ম কবে, ভোগ করে নিজেব ক্ষুদ্র অহং-এব তৃপ্তিব জন্য, জগতে নিজের ব্যক্তিগত জীবনেব প্রযোজন এবং অন্যান্য মানুষেব সহিত নিজেব বাহ্যিক সম্বন্ধের প্রয়োজন সিদ্ধ করিবাব জন্য। কিন্তু বস্তুত তাহাব সমস্ত সত্তা, সমস্ত চিন্তা, তাহার সমস্ত ইচ্ছা ও কর্ম ও আনন্দভোগ এসবই ভগবানেব সত্তাব, ভগবানেব চিন্তা, ইচ্ছা, কর্ম ও প্রকৃতি-উপভোগেব প্রতিচ্ছাযা—যতক্ষণ সে অজ্ঞানের মধ্যে বাস কবে ততক্ষণ তাহা অহঙ্কাবেব দ্বাবা খণ্ডিত ও বিকৃত। তাহাব নিজেব এই সত্যে ফিরিযা যাওযাই তাহাব মুক্তিলাভেব সোজা পথ, অজ্ঞানেব অধীনতা হইতে পবিত্রাণ পাইবাব সর্বাপেক্ষা নিকট ও প্রশস্ত দ্বাব। মানুষ প্রকৃতিযুক্ত আত্মা, এবং তাহার প্রকৃতিতে রহিযাছে মন ও বুদ্ধি, ইচ্ছা ও কর্ম,

হৃদযাবেগ, সংবেদন এবং জীবনেব আনন্দ উপভোগ কবিবার নিমিত্ত প্রাণেব আকাঙ্ক্ষা, সুতবাং এই সকল শক্তিকে ভগবদভিমুখী কবিযাই তাহার নিজের উচ্চতম সত্যে ফিবিযা যাওযা সম্পূর্ণভাবে সম্ভব করা যাইতে পারে। পরম আত্মা ও ব্রহ্মেব জ্ঞান তাহাকে লাভ করিতে হইবে; তাহাব প্রেম ও ভক্তিকে পবমপুরুষেব দিকেই ফিরাইতে হইবে; তাহার ইচ্ছা ও কর্মকে পরম জগদীশ্বরেব অধীন কবিতে হইবে। তখন সে নীচের প্রকৃতি হইতে দিব্য প্রকৃতিতে উঠিয়া যাইতে পাবিবে, তখন সে তাহার অজ্ঞানের চিন্তা, ইচ্ছা ও কর্ম বর্জন করিয়া ভগবানেব সহিত ঐক্যে, সেই এক আত্মাবই আত্মা, শক্তি, জ্যোতি হইয়া চিন্তা কবিতে, ইচ্ছা করিতে, কর্ম কবিতে পাবিবে; তখন সে ভিতবে ভগবানেব সমস্ত আনন্ত্য উপভোগ কবিবে, আর তাহাকে কেবল এই সব বাহিরের স্পর্শ, ছদ্মবেশ ও বাহ্যরূপেব ভোগ লইযাই থাকিতে হইবে না। এইরূপে দিব্য জীবন যাপন কবিযা, এইরূপে তাহাব সমগ্র আত্মা, সত্তা ও প্রকৃতিকে ভগবদভিমুখী করিয়া, সে পবমব্রহ্মের সত্যতম সত্যেব মধ্যে গৃহীত হইবে।

বাসুদেবঃ সর্ব্বম্, বাসুদেবই সব, ইহা জানা এবং এই জ্ঞানের মধ্যে বাস করা, ইহাই নিগূঢ় বহস্য। সে জানে যে, তিনি আত্মা, অক্ষর, আধাররূপে সকলকে ধবিযা বহিযাছেন আবাব সকল জিনিসেব মধ্যেই অনুস্যূত রহিয়াছেন। নীচের প্রকৃতিব বিশৃঙ্খল ও অশান্ত খেলা হইতে সবিয়া আসিযা সে স্বপ্রতিষ্ঠ আত্মার নিস্তব্ধতা এবং অবিচ্ছেদ্য শান্তি ও জ্যোতিব মধ্যে বাস কবে। সে সেখানে ভগবানেব এই আত্মার সহিত নিত্য ঐক্য উপলব্ধি করে, যে আত্মা সর্বভূতেব মধ্যে বর্তমান বহিয়াছে এবং জগতের সকল গতি, ক্রিয়া ও ব্যাপারকে ধরিযা বহিযাছে। পবিবর্তনশীল জগতের ভিত্তিস্বরূপ এই যে সনাতন অপরিবর্তনশীল অধ্যাত্ম সত্তা, ইহা হইতে সে উপবে মহত্তব সনাতন, বিশ্বাতীত, পবম সত্য বস্তুর দিকে চাহিযা দেখে। সে জানে যে, যাহাকিছু আছে সেসবেরই মধ্যে তিনি দিব্য অধিবাসী, মানুষেব হৃদ্দেশে তিনি গুহ্য ঈশ্বররূপে বর্তমান, এবং তাহাব প্রকৃত সত্তা ও এই আভ্যন্তবীণ অধ্যাত্ম প্রভুব মধ্যে যে মায়াব আববণ বহিয়াছে সে সেই আববণকে অপসৃত কবিযা দেয। সে তাহাব ইচ্ছা, চিন্তা, কর্মকে জ্ঞানে ঈশ্বরের ইচ্ছা, চিন্তা ও কর্মেব সহিত এক কবিয়া দেয়, অন্তর্যামী ভগবানকে সে সকল সময অনুভব কবে এবং তাহাব সমস্ত ইচ্ছা, চিন্তা, কর্ম সেই নিত্য ভগবদনুভূতির সহিত এক সুবে বাঁধা হইযা যায়, সকলের মধ্যে সে ভগবানকে দেখে ও ভজনা কবে এবং সমস্ত মানবীয কর্মকে দিব্য প্রকৃতির উচ্চতম আদর্শে রূপান্তরিত কবে। সে জানে যে, বিশ্বজগতে তাহার চাবিদিকে যাহাকিছু বহিযাছে সেসবের মূল ও সাব সত্তা তিনি—সংসারের সমস্ত জিনিসকে সে দেখে যে, তাহাদের বাহ্যরূপে সেসব হইতেছে *veils*—ছদ্মবেশ, আবার সেই সঙ্গেই দেখে যে, তাহাদের নিগূঢ় মর্মে তাহাবা হইতেছে সেই এক অচিন্ত্য সত্যবস্তুব আত্মপ্রকাশের উপলক্ষ্য ও উপায, যে ঐক্য, ব্রহ্ম, পুরুষ, আত্মা, বাসুদেব, যে সত্তা এই সর্বভূত হইযাছে,

সে সর্বত্র তাহাকে দেখিতে পায। সেইজন্যই তাহাব সমগ্র আভ্যন্তবীণ জীবন অনন্তের সহিত এক সুবে ও ছন্দে গাঁথা হইয়া যায, সে অনন্ত তখন হয সকল জীবে, তাহার ভিতবে ও চতুষ্পার্শে সকল বস্তুতে স্বপ্রকাশ এবং তাহাব সমগ্র বাহ্য জীবন বিশ্ব-উদ্দেশ্য সাধনের বিশুদ্ধ যন্ত্রে পরিণত হয। অন্তবাত্মাব ভিতব দিয়া উপবে সে সেই পবব্রহ্মেব দিকে চাহিযা দেখে, যিনি এখানে এবং সেখানে এক ও অদ্বিতীয় সত্তা। সর্বভূতেব হৃদ্দেশে অবস্থিত ঈশ্ববেব ভিতব দিযা উপবে সে সেই পরম পুরুষেব দিকে চাহিযা দেখে যিনি তাঁহাব উচ্চতম প্রতিষ্ঠায সকল আবাসের উপরে। বিশ্বমাঝে যে ঈশ্বব আবির্ভূত হইয়াছেন তাঁহাব ভিতব দিযা উপবে সেই পরমেশ্ববেব দিকে সে চাহিযা দেখে যিনি তাঁহাব সকল সৃষ্টি, সকল প্রকাশেব উপরে থাকিযা সবকে পরিচালিত কবিতেছেন। এইরূপে জ্ঞানেব সীমাহীন বিকাশ এবং ঊর্ধ্বমুখী দৃষ্টি ও আস্পৃহাব (aspiration) ভিতব দিযা সে তাহাতেই উঠিয়া যায় যাহাকে সে একান্ত সমগ্রভাবে, সর্ব্বভাবেন, ভজনা কবিয়াছে।

এই যে জীবের সমগ্রভাবে ভগবদভিমুখী হওযা, ইহাকেই গীতা জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তির সমন্বয়ের মহান ভিত্তি কবিযাছে। ভগবানকে এইরূপ সমগ্রভাবে জানাব অর্থ, আত্মায়, সমস্ত জগতে এবং সমস্ত জগতেব অতীতে, তাঁহাকে এক বলিয়া জানা—জানা যে, ভগবান একই সঙ্গে এই সবই। অথচ শুধু আবাব এইভাবে জানাই যথেষ্ট নহে, যদি সেই সঙ্গেই হৃদয ও আত্মাকে প্রগাঢভাবে ভগবানেব দিকে তুলিয়া ধরা না হয, যদি তাহা একাগ্র এবং সেই সঙ্গেই সর্বতোমুখী প্রেম, ভক্তি, আস্পৃহাকে উদ্বুদ্ধ না কবে। বস্তুত যে জ্ঞানেব সঙ্গে আস্পৃহা নাই, যাহা হৃদযেব ঊর্ধ্বমুখী ভাবের দ্বাবা সঞ্জীবিত নহে, তাহা সত্য জ্ঞান নহে, তাহা কেবল তর্কবুদ্ধির খেলা, শুষ্কবিচারেব নিষ্ফল প্রযাস। ভগবানেব দর্শন প্রকৃতভাবে লাভ কবিলে তাহা নিশ্চয়ই ভগবানের প্রতি ভক্তি এবং ভগবানকে পাইবাব জন্য তীব্র আবেগ আনিয়া দেয়—ভগবানেব স্বপ্রতিষ্ঠ সত্তাব প্রতি, আবাব আমাদেব মধ্যে এবং সর্বভূতেব মধ্যে যে ভগবান বহিযাছেন তাঁহাবও প্রতি গাঢ অনুবাগ আনিযা দেয। বুদ্ধি দ্বারা জানা মানে, শুধু বুঝা; এইভাবে আরম্ভ কবা কার্যকবী হইতে পাবে, আবাব নাও হইতে পারে—কার্যকবী হইবেই না যদি ঐ জানাব মধ্যে কোন আন্তরিকতা না থাকে, আভ্যন্তরীণ উপলব্ধি লাভেব জন্য ইচ্ছাব কোনও অনুপ্রেরণা না থাকে, ভিতবেব সত্তার উপব কোনও প্রভাব না হয, আত্মায কোন সাডা না আসে; কারণ তাহা হইলে বুঝা যাইবে যে, মস্তিষ্ক বাহ্যিকভাবে বুঝিযাছে কিন্তু আত্মা আভ্যন্তরীণভাবে কিছুই দেখে নাই। সত্য জ্ঞান হইতেছে ভিতবেব সত্তার দ্বাবা জানা, এবং যখন ঐ ভিতরের সত্তায আলোকেব স্পর্শ লাগে, তখন সে যাহা দেখে সেটিকে আলিঙ্গন কবিতে উদ্যত হয়, সেটিকে লাভ কবিতে বাসনা করে, সেটিকে নিজের মধ্যে গড়িয়া তুলিতে এবং নিজে তাহাতে গডিয়া উঠিতে চেষ্টা করে, যে সত্যের মহিমা সে দর্শন কবিযাছে তাহাব সহিত এক হইযা

যাইবাব জন্য সাধনা কবে। এইরূপ জ্ঞানের অর্থ হইতেছে, একাত্মতার উপলব্ধি; আব ঐ ভিতবেব সত্তা নিজেকে পূর্ণ কবিযা তোলে চৈতন্য ও আনন্দের দ্বারা, প্রেমেব দ্বাবা, নিজেব যাহাই সে দর্শন কবিযাছে তাহাকে লাভ করিযা তাহাব সহিত ঐক্যেব দ্বাবা, সুতবাং এই জ্ঞান যখনই জাগিযা উঠে তখনই তাহা এই সত্য ও একমাত্র পবিপূর্ণ সিদ্ধিলাভেব অদম্য প্রেবণা নিশ্চযই আনিয়া দেয। এই জ্ঞানে যাহাকে জানা যায তাহা বাহ্য বস্তু নহে, তাহা দিব্য পুরুষ; আমবা যাহাকিছু তিনি সেই সবেব আত্মা ও ঈশ্বব। তাঁহাতে সমগ্র সত্তাব আনন্দ এবং তাঁহাব প্রতি গভীব ও প্রগাঢ ভক্তি ও ভালবাসা এই জ্ঞানেব প্রাণ ও অবশ্যম্ভাবী ফল। এবং এই ভক্তি শুধুই হৃদযেব কামনা মাত্র নহে, ইহা হইতেছে সমগ্র জীবনের সমর্পণ। অতএব ইহা উৎসর্গেব রূপও নিশ্চয়ই গ্রহণ কবে; এখানে আছে আমাদেব সকল কর্ম ঈশ্বরকে অর্পণ কবা, এখানে আছে আমাদেব সমগ্র বাহ্য ও আভ্যন্তবীণ সক্রিয় প্রকৃতিকে সমস্ত ভিতবেব খেলায এবং সমস্ত বাহিরের খেলায় আমাদের ভক্তির পাত্র ভগবানেব উদ্দেশে উৎসর্গ কবা। আমাদেব অন্তবেব সমস্ত ক্রিযা তাঁহাবই মধ্যে চলিতে থাকে, সেসব তাঁহাকে, সেই ঈশ্বব ও আত্মাকেই, তাঁহাদেব শক্তিব ও প্রচেষ্টাব মূল উৎস ও লক্ষ্যরূপে সন্ধান কবে। আমাদের বাহিরের সমস্ত ক্রিযা জগতেব মধ্যে অবস্থিত তাঁহাব দিকেই প্রসাবিত হয়, জগতের মধ্যেই ভগবানেব সেবাব আযোজন কবে, সে সেবা ও কর্মের নিয়ামক শক্তি হইতেছেন আমাদেব অন্তবস্থিত ভগবান, তাঁহাতেই আমবা বিশ্ব ও বিশ্বেব সকল জীবেব সহিত এক আত্মা। কাবণ জগৎ ও আত্মা, প্রকৃতি এবং তাহাব মধ্যে স্থিত জীব উভযেই সেই একমেবাদ্বিতীযমেব চৈতন্যেব দ্বাবা উদ্ভাসিত, উভযেই সেই বিশ্বাতীত পুরুষোত্তমেব আভ্যন্তবীণ ও বাহ্যিক শরীব। এইভাবে সেই এক আত্মাব মধ্যে মন, হৃদয ও ইচ্ছাব সমন্বয হয এবং সেই সঙ্গে এই সমগ্র মিলনে, এই সর্বতোমুখী ভগবদুপলব্ধিতে, এই দিব্য যোগে জ্ঞান, ভক্তি ও কর্মের সমন্বয় হয।

কিন্তু এই দিব্য যোগেব সাধনা আবম্ভ কবাও অহংভাবে বদ্ধ জীবেব পক্ষে কঠিন—শুধু তাহাই নহে, যাহাবা আবাব শেষ পর্যন্ত আর সব ছাড়িয়া চিবকালেব মত এই যোগেব পথ অবলম্বন কবিযাছে, তাহাদেব পক্ষেও ইহাব পূর্ণ সার্থকতা ও সামঞ্জস্যে পৌঁছান সহজ নহে—মর্ত্য মানুষেব মন অজ্ঞানেব বশে ছাযা ও বাহ্যরূপেব উপব নির্ভব কবিযা বিভ্রান্ত হইযা পডে, ইহা শুধু মানুষের বাহ্যিক শরীব, বাহ্যিক মন, বাহ্যিক জীবনধাবাকেই দেখে কিন্তু জীবেব মধ্যে যে দেবতা অধিষ্ঠিত বহিযাছেন তাঁহাব সম্বন্ধে কোনও মুক্তিপ্রদ দৃষ্টি লাভ কবিতে পারে না। নিজেবই মধ্যে যে দেবতা বহিযাছেন তাঁহাকে সে অগ্রাহ্য করে, এবং অপর মনুষ্যেব মধ্যেও তাঁহাকে দেখিতে পায় না, এবং যদিও ভগবান মানুষের মধ্যে নিজেকে অবতাব ও বিভূতিরূপে প্রকাশিত কবেন তথাপি সে অন্ধ থাকে এবং মানবরূপেব অন্তবালে অবস্থিত ভগবানকে উপেক্ষা বা অবজ্ঞা করে, অবজানন্তি

মাং মূঢা মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।[১] আব যদি সে জীবন্ত মানুষেব মধ্যেই ভগবানকে অগ্রাহ্য কবে তাহা হইলে বাহ্য জগতে ভগবানকে দেখা তাহাব পক্ষে আবও অসম্ভব হয়। কাবণ এই বাহ্য জগৎকে সে দেখে তাহাব ভেদাত্মক অহংভাবেব কারাগাব হইতে, তাহাব সীমাবদ্ধ মনেব কদ্ধ গবাক্ষেব ভিতব দিযা। বিশ্বেব মধ্যে সে ভগবানকে দেখিতে পায় না, যে পবম ভগবান এই বিচিত্র সৃষ্টিপূর্ণ জগৎসমূহের অধীশ্বব এবং তাহাদের মধ্যে বাস কবিতেছেন তাঁহাব সম্বন্ধে সে কিছুই জানে না; যে দৃষ্টির দ্বারা জগতেব সকল বস্তু দিব্যভাব প্রাপ্ত হয এবং জীব নিজের অন্তর্নিহিত দেবত্বে জাগ্রত হইযা উঠে এবং ভগবানের হয, ভগবত্তুল্য হয, সে দৃষ্টি সম্বন্ধে সে সম্পূর্ণ অন্ধ। মানুষেব যে অহং ক্ষুদ্র জিনিসেব পশ্চাতে ছুটিযা বেড়াইতেছে, শুধু সেই সবকেই পাইতে চাহিতেছে এবং তাহাদের দ্বাবা মন, বুদ্ধি, দেহ, ইন্দ্রিযেব পার্থিব ক্ষুধা মিটাইতে চাহিতেছে—সেই অহংযেব জীবনটিকেই সে সহজে দেখিতে পায় এবং তাহাতে তীব্রভাবে আসক্ত হইযা পড়ে। চিত্তেব এই বহির্মুখী গতিব দিকে যাহাবা অতিমাত্রায় সমগ্রভাবে নিজদিগকে ছাড়িয়া দিযাছে, তাহাবা নীচেব প্রকৃতির কবলে পতিত হয, সেইটিকেই একান্তভাবে ধবিযা থাকে এবং নিজেদের জীবনেব ভিত্তি কবে। মানুষের মধ্যে যে বাক্ষসী[২] প্রকৃতি বহিযাছে তাহারা তাহাবই অধীন হইয়া পড়ে, একপ মানুষ প্রাণেব তাড়নাব বশে ইন্দ্রিয়পরায়ণ অহং-এব উগ্র ও অপবিমিত তৃপ্তিব জন্য সবকিছুকেই উৎসর্গ কবে এবং সেই অহংকেই তাহার ইচ্ছা, চিন্তা, কর্ম ও ভোগেব তমোময দেবতা কবিযা তোলে। অথবা আসুবী প্রকৃতিব দাম্ভিক অহঙ্কাব, স্বাভিমানী চিন্তা, স্বার্থপব কর্ম এবং ভোগের আত্মতৃপ্ত অথচ চিব-অতৃপ্ত মানসিক ক্ষুধা—এই সবেব দ্বাবা তাড়িত হইয়া তাহারা বৃথা চক্রে ঘুবিয়া মরে। কিন্তু ভগবান ও আত্মা হইতে বিচ্ছিন্ন এই অহং-চৈতন্যের মধ্যে অবিবত বাস কবিতে থাকিলে, এবং ইহাকেই আমাদেব সকল কর্মেব কেন্দ্র করিযা তুলিলে—আমবা প্রকৃত আত্মজ্ঞানকে একেবাবেই ধরিতে পাবিব না। আত্মাব বিপথগ্রস্ত যন্ত্রগুলিব উপব ইহা যে মোহ বিস্তার কবে তাহা জীবনকে নিষ্ফলভাবে ঘুবায। এই অহং-চৈতন্যেব সমস্ত আশা, কর্ম, জ্ঞানকে যখন দিব্য ও সনাতন আদর্শেব তুলনায বিচাব কবা যায তখন সে-সব শূন্য, ব্যর্থ বলিয়া প্রতীত হয়, কাবণ ইহা মহত্তব আশাব পথ রুদ্ধ কবিযা দেয, মুক্তিপ্রদ কর্মকে বহিষ্কার কবে, সত্য জ্ঞানের আলোককে নির্বাসিত কবে। এই জ্ঞান শুধু বাহ্যদৃশ্য দেখে কিন্তু ভিতবের সত্যকে দেখে না অতএব ইহা মিথ্যা জ্ঞান; এই আশা অনিত্যের পশ্চাতে ছুটে কিন্তু নিত্য বস্তুব সন্ধান কবে না অতএব

[১] অবজানন্তি মাং মূঢা মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পবং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্॥৯।১১

[২] মোঘাশা মোঘকর্মাণো মোঘজ্ঞানা বিচেতসঃ।
বাক্ষসীমাসুবীঞ্চৈব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতাঃ॥৯।১২

ইহা মিথ্যা আশা, ক্ষতিব দ্বাবা এই কর্মেব সমস্ত লাভ নষ্ট হইযা যায় অতএব এই কর্ম অন্তহীন পণ্ডশ্রম।

মানুষেব পক্ষে যে উচ্চতব দৈবী প্রকৃতিকে আশ্রয় করা সম্ভব সেই দৈবী প্রকৃতিব আলোক ও বিশালতার অভিমুখে যেসব মহাত্মারা নিজদিগকে খুলিয়া ধবেন কেবল তাঁহাবাই মুক্তি ও পূর্ণ সিদ্ধি লাভের পথে উঠিয়াছেন, সে পথ প্রথমে সঙ্কীর্ণ কিন্তু পরিশেষে এমনই প্রশস্ত যে ভাষায তাহা বর্ণনা কবা যায় না।[১] মানুষেব মধ্যে অন্তর্নিহিত দেবত্বেব বিকাশ, ইহাই মানুষের প্রকৃত কাজ, এই আসুবী ও বাক্ষসী প্রকৃতিকে দৃঢ সঙ্কল্পেব সহিত দৈবী প্রকৃতির দিকে ফিরান, ইহাই মানবজীবনেব সুবক্ষিত গুপ্ত বহস্য। এই দেবত্ব যতই পরিবর্ধিত হয়, ততই মাযাব আববণ খসিযা পড়ে এবং জীব কর্মের মহত্তব সার্থকতা এবং জীবনের প্রকৃত সত্য দেখিতে পায। মানুষের মধ্যে ভগবানের প্রতি, জগতের মধ্যে ভগবানেব প্রতি দৃষ্টি তখন ঘুবিযা যায; সেই দৃষ্টি অন্তবেব দিক দিয়া দেখে ও বাহিবেব দিক দিযা জানে সেই অসীম আত্মাকে, সেই অবিনাশী সত্তাকে যাঁহা হইতে সকল সৃষ্টিব উদ্ভব হইয়াছে, যিনি সকলেব মধ্যেই রহিযাছেন এবং যাঁহার মধ্যে ও যাঁহাব দ্বারা সবকিছুই নিত্য বিবাজমান রহিয়াছে। অতএব যখন এই দৃষ্টি, এই জ্ঞান মানবাত্মাকে অধিকাব কবে, তখন, তাহাব জীবনেব সমস্ত আস্পৃহা ভগবান ও অনন্তেব প্রতি সর্বাতিবেকী প্রেম এবং অপবিসীম ভক্তিতে পরিণত হয। সেই নিত্য, সনাতন, অধ্যাত্ম, জীবন্ত, বিশ্বব্যাপী সত্য বস্তুতে মন অনন্যভাবে আসক্ত হয, সেই সত্য বস্তু ছাড়া তাহাব কাছে আর কোন জিনিসেবই কোনও মূল্য থাকে না, একমাত্র সেই সর্বানন্দময় পরম পুরুষেই সে পবম প্রীতি লাভ কবে। যে সর্বব্যাপী মহত্ত্ব, জ্যোতি, সৌন্দর্য, শক্তি ও সত্য আপন মহিমায় আপনাকে মানবাত্মাব নিকটে প্রকাশিত কবিযাছে, তাহার গুণকীর্তন করা এবং সেই পবম আত্মা ও অনন্ত পুরুষেব উপাসনা করা, ইহাই হয় তখন সকল বাক্য, সকল চিন্তাব একান্ত লক্ষ্য।[২] ভিতবেব সত্তা সকল আবরণ ভেদ করিয়া বাহিরে আত্মপ্রকাশ কবিবার জন্য এতকাল যে চেষ্টা কবিযাছে এখন সেসব চেষ্টা অন্তবাত্মায ভগবানকে পাইবাব এবং প্রকৃতিতে ভাগবত ভাব বিকাশ কবিবাব অধ্যাত্ম সাধনা ও আস্পৃহাতে পবিণত হয। সমস্ত জীবন হয় সেই ভগবানের সহিত এই মানবাত্মাব নিত্য যোগ ও মিলন। ইহাই পূর্ণভক্তিব ধাবা; নিবেদিত হৃদযেব উৎসর্গেব দ্বাবা উহা আমাদেব সমগ্র সত্তা ও প্রকৃতিকে নিত্য সনাতন পুরুষোত্তমেব দিকে একাগ্রভাবে তুলিযা দেয়। যাঁহারা জ্ঞানের উপরেই বেশী ঝোঁক দেন তাঁহাবাও তাঁহাদেব আত্মা ও প্রকৃতির উপব ভগবদ্ জ্ঞান, ভগবদ্

মহাত্মানস্তু মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ।
ভজন্ত্যনন্যমনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যযম্॥৯।১৩
সততং কীর্ত্তযন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢব্রতাঃ।
নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে॥৯।১৪

দর্শনেব যে নিত্যবর্ধনশীল, সর্বতোমুখী, অনতিক্রম্য প্রভাব তদ্বাবা সেই একই স্থানে উপনীত হন।[১] তাঁহাদেব যজ্ঞ জ্ঞানযজ্ঞ, জ্ঞানেব অনির্বচনীয় আনন্দেব দ্বাবা তাঁহাবা পুরুষোত্তমকে উপাসনা করিতে প্রবৃত্ত হন, জ্ঞানযজ্ঞেন চাপ্যান্যে যজন্তো মামুপাসতে। এই যে ব্যাপক জ্ঞান, সমগ্র সত্তাই ইহাব যন্ত্র এবং অখণ্ড সমগ্রতাই ইহার লক্ষ্য। ইহা পবম সত্তাকে কেবল শূন্যময ঐক্যে কিংবা সকল সম্বন্ধেব অতীত অনির্দেশ্য সত্তারূপে চাওযা নহে। ইহা হইতেছে সেই পবম ও বিশ্বপুরুষকে হৃদযাবেগের সহিত সন্ধান ও লাভ করা, ইহা হইতেছে অনন্তকে তাঁহাব অনন্ততায পাওয়া আবার যাহাকিছু সান্ত আছে সেসবেব মধ্যেও তাঁহাকে পাওযা, এককে তাঁহাব একত্বে দেখা ও আলিঙ্গন কবা আবার তাঁহাকে তাঁহাব সকল বিভিন্ন তত্ত্বে, তাঁহার অসংখ্য মূর্তিতে, শক্তিতে, রূপে, এখানে, সেখানে, সর্বত্র, কালাতীত অবস্থায় আবার কালেব মধ্যে, বহুধা, তাঁহাব ঈশ্বরত্বেব অনন্তভাবে, অসংখ্য জীবে তাঁহাকে দেখা ও আলিঙ্গন কবা, একত্বেন, পৃথক্‌ত্বেন বহুধা বিশ্বতোমুখম্। সহজেই এই জ্ঞান হইয়া উঠে উপাসনা, উদাব ভক্তি, বিশাল আত্মদান, সমগ্র আত্মসমর্পণ, কারণ ইহা হইতেছে এমন এক আত্মাব জ্ঞান, এমন সত্তাব স্পর্শ, এমন এক পরম ও বিশ্বপুরুষেব সহিত আলিঙ্গন, যিনি আমাদেব সবকিছুব উপরেই দাবি বাখেন, আবার আমবা যখন তাঁহার সমীপে যাই তিনি তাঁহাব অনন্ত আনন্দলীলার সমস্ত সম্পদ আমাদেব উপবে অবিবতধাবে ঢালিযা দেন।

কর্মের পথও ভক্তি ও প্রেমপূর্বক আত্মদানে পবিণত হয কাবণ ইহা হইতেছে আমাদের সকল ইচ্ছাশক্তি ও কর্ম পূর্ণভাবে সেই এক পুরুষোত্তমেব উদ্দেশে যজ্ঞরূপে উৎসর্গ কবা। বেদেব বাহ্যিক যজ্ঞানুষ্ঠান একটি শক্তিশালী রূপক, ইহাব উদ্দেশ্য খুব উচ্চ না হইলেও তাহা স্বর্গাভিমুখী; কিন্তু প্রকৃত যজ্ঞ হইতেছে ভিতরেব, ইহাতে সর্বময় ভগবান নিজেই হন বৈধ আচাব, যজ্ঞ এবং যজ্ঞেব প্রত্যেক আনুষঙ্গিক অনুষ্ঠান।[২] সেই অন্তর্যজ্ঞেব সমস্ত ক্রিয়া ও রূপ হইতেছে আমাদের মধ্যে তাঁহাবই শক্তিব আত্মবিধান ও আত্মপ্রকাশ, সেই শক্তি আমাদেব আস্পৃহাকে আশ্রয় কবিযা আপন উৎসেব দিকে উঠিযা চলিযাছে। অন্তর্যামী ভগবান নিজেই অগ্নি, নিজেই হব্য, অহমগ্নিবহং হুতম্, কাবণ ঐ অগ্নি ভগবদ্‌মুখী ইচ্ছাশক্তি এবং এই ইচ্ছাশক্তি আমাদেব মধ্যে স্বযং ভগবান। আব ভগবানেব যে রূপ ও শক্তি উপাদানস্বরূপ আমাদেব প্রকৃতি ও সত্তায বর্তমান, তাহাই অগ্নিতে অর্পিত হব্য, ভগবানেব নিকট হইতে যাহাকিছু পাওযা গিযাছে তাহা সমগ্রভাবেই আপন সত্তার, আপন পবম সত্য ও মূল্যেব সেবায় ও পূজায উৎসর্গ কবা হয।

[১] জ্ঞানযজ্ঞেন চাপ্যান্যে যজন্তো মামুপাসতে।
একত্বেন পৃথক্ত্বেন বহুধা বিশ্বতোমুখম্॥৯।১৫

[২] অহং ক্রতুবহং যজ্ঞঃ স্বধাহমহমৌষধম্।
মন্ত্রোঽহমহমেবাজ্যমহমগ্নিবহং হুতম্॥৯।১৬

মনীষী ভগবান নিজেই হন পবিত্র মন্ত্র, মন্ত্র ভগবদ্‌মুখী চিন্তায় প্রকট ভাগবতসত্তাবই জ্যোতি, ঐ চিন্তাব নিগূঢ় তত্ত্বপূর্ণ জ্যোতির্ময শ্রুতবাক্যে ও মানুষেব নিকট প্রকাশিত অনন্তেব ছন্দে সেই মন্ত্র সজীব হইযা উঠে। জ্ঞানময় ভগবান নিজেই বেদ, আবার বেদে যাহাকিছু জানা যায়, বেদ্য, তাহাও তিনি। তিনি জ্ঞান ও জ্ঞেয় উভয়ই। ঋক্, যজুঃ, সাম, যে জ্ঞানেব বাণী মনকে জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত কবে, যে শক্তিব বাণী কর্মকে যথার্থভাবে নিয়ন্ত্রিত করে, যে শান্তি ও সুসমঞ্জস্য সিদ্ধিব বাণী আত্মাব দিব্যবাসনাব তৃপ্তি আনিযা দেয়, এই সবই ব্রহ্ম, সবই ভগবান।[১] দিব্যচৈতন্যেব মন্ত্র সত্যদৃষ্টির জ্যোতি আনিয়া দেয়, দিব্যশক্তিব মন্ত্র কার্যকবী ইচ্ছাশক্তি আনিযা দেয়, দিব্য আনন্দের মন্ত্র জীবনে অধ্যাত্ম আনন্দেব পূর্ণতা আনিয়া দেয়। সকল বাক্য ও চিন্তা মহান ওঁ-এরই পবিস্ফুবণ, ওঁ-ই সনাতন বাক্য। ইন্দ্রিযগ্রাহ্য বাহ্য বস্তুব রূপের মধ্যে প্রকটিত ওঁ, সকল বস্তু ও রূপ যে সৃজনশীল আত্মরূপায়ণমূলক চৈতন্যক্রিয়াব অভিব্যক্তি তাহাব মধ্যে প্রকটিত ওঁ, সকলের পশ্চাতে অনন্তেব যে আত্মসমাহিত পবাচেতন শক্তি তাহাব মধ্যে প্রকটিত ওঁ—ওঁ-ই সকল বস্তু ও ভাবের, সকল নাম ও রূপেব পবম উৎস, বীজ, আশয়—ইহা নিজেই সমগ্রভাবে পবম স্পর্শাতীত সত্তা, আদি ঐক্য, কালাতীত পবম রহস্য, সকল ব্যক্তজগতেব উর্ধ্বে বিশ্বাতীত সত্তায় স্বয়ম্ভূ।[২] অতএব এই যে যজ্ঞ, ইহা একই সঙ্গে কর্ম ও ভক্তি ও জ্ঞান।

এইরূপে যে জানে, ভজনা কবে, নিজেব সমস্ত কর্মকে এক পবম আত্মোৎসর্গে অনন্তেব নিকট সমর্পণ করে তাহাব পক্ষে ভগবানই সব এবং সবই ভগবান। সে ভগবানকে এই জগতেব পিতা বলিযা জানে, যিনি তাঁহাব সন্তানগণকে পোষণ কবিতেছেন, পালন কবিতেছেন, রক্ষা কবিতেছেন। সে ভগবানকে জগন্মাতা বলিযা জানে, যিনি আমাদিগকে তাঁহার বুকেব মধ্যে ধরিয়া রাখিয়াছেন, আমাদের উপব তাঁহাব প্রেমেব মাধুরী অবিবতধারে বর্ষণ করিতেছেন এবং বিশ্বজগৎ তাঁহার দিব্য সৌন্দর্যেব মূর্তিতে ভবিযা দিতেছেন। সে ভগবানকে এই জগতেব আদি, প্রথম সৃষ্টিকর্তা, পিতামহ বলিযা জানে, দেশ, কাল ও সম্বন্ধেব মধ্যে উৎপাদন ও সৃষ্টি কবিতে যাহাবা ব্রতী বহিযাছে তাহাবা সকলেই তাঁহা হইতে উদ্ভূত। সে ভগবানকে সকল বিশ্বগত ও প্রত্যেক ব্যক্তিগত বিধানেব ঈশ্বর ও বিধাতা বলিয়া জানে। যে মানুষ নিজেকে অনন্তেব নিকট সমর্পণ কবিয়াছে, জগৎ বা নিয়তি বা অনিশ্চয সম্ভাবনা কোন কিছুই তাহাকে আব আতঙ্কিত কবিতে পাবে না; দুঃখ ও অশুভ দেখিযা সে আব বিভ্রান্ত হয না। যাহাব দৃষ্টি আছে তাহার পক্ষে ভগবানই

পিতাহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ।
বেদ্যং পবিত্রমোঙ্কাব ঋক্ সাম যজুরেবচ॥৯।১৭

[১] ওঁ—অ, উ ম—অ, বাহ্য ও স্থূলেব মূল সত্তা, বিবাট, উ, সূক্ষ্ম আভ্যন্তবীণেব মূল সত্তা, তৈজস, ম, নিগূঢ় পবাচেতন মহত্ত্বেব সত্তা, প্রজ্ঞা, ওঁ—সর্বাতীত পবম বস্তু, তুরীয়।—মাণ্ডুক্যোপনিষদ্

পথ এবং ভগবানই গতি, গন্তব্যস্থল,[১] সে পথে নিজেকে হাবাইবাব কোনও সম্ভাবনা নাই, সেই গন্তব্যের দিকে তাহাব সদ্‌বুদ্ধি-পবিচালিত পদক্ষেপ প্রতি মুহূর্তে তাহাকে নিশ্চিতভাবেই লইযা যায। সে জানে ভগবান তাহাব এবং সকলেব প্রভু, তাহাব প্রকৃতিব আধাব, প্রাকৃত জীবেব পতি, প্রণযী ভর্তা, তাহাব সকল চিন্তা ও কর্মের অন্তর্যামী সাক্ষী। ভগবানই তাহাব আবাস, তাহাব গৃহ ও স্বদেশ, তাহার আশা আকাঙ্ক্ষাব আশ্রযস্থল, সকল জীবেব জ্ঞানী অন্তবঙ্গ হিতৈষী বন্ধু। দৃশ্য জগতের সকল সৃষ্টি, স্থিতি, লয, তাহাব দৃষ্টি ও অনুভূতিতে সেই একেবই খেলা; চিবন্তন পুনরাবর্তনলীলায পুনঃপুনঃ তিনি নিজেব আত্মপ্রকাশকে দেশ ও কালে প্রকট করিতেছেন, বক্ষা কবিতেছেন আবাব প্রত্যাহাব কবিতেছেন। একমাত্র তিনিই অবিনাশী বীজ, যাহাকিছুব উৎপত্তি ও ধ্বংস হইতেছে বলিযা মনে হয় তিনি সেসবেব মূল, আবাব অব্যক্ত অবস্থায সেসব তাঁহাব মধ্যেই চিরবিশ্রাম লাভ কবে, নিধানং বীজমব্যযম্। সূর্য ও অগ্নিব তাপেব ভিতব দিযা তিনিই উত্তাপ প্রদান কবেন; তিনিই বর্ষাব প্রাচুর্য আবাব তিনিই শোষণ, এই জড়প্রকৃতি এবং ইহার সমুদয় ক্রিযা তিনিই।[২] মৃত্যু তাঁহাব মুখোশ, এবং অমৃতত্ব তাঁহার আত্মপ্রকাশ। যাহাকিছু আমরা আছে বলি, সৎ, সেসবই তিনি, আবাব যাহাকিছু নাই, অসৎ, বলিয়া আমবা মনে করি সেসবও গুপ্তভাবে অনন্তেব মধ্যে বিবাজমান এবং অনির্বচনীয় ভগবানেব পবম বহস্যময সত্তাব অংশভূত।

উচ্চতম জ্ঞান ও ভক্তি ব্যতীত, যিনি এই সব, সেই পবম পুরুষেব নিকট পূর্ণ আত্মদান ও সমর্পণ ব্যতীত আব কিছুই আমাদিগকে সেই পবম পুরুষেব নিকট লইয়া আসিতে পারিবে না। অন্য ধর্ম, অন্য উপাসনা, অন্য জ্ঞান, অন্য সাধনা সকল সময়েই যথাযথ ফল প্রদান কবে, কিন্তু এসব ফল ক্ষণস্থাযী, ভগবানেব প্রতীক ও আভাসের উপভোগেব মধ্যেই সীমাবদ্ধ। আমাদেব মানসিক অবস্থানুযায়ী সকল সময়েই আমাদেব সম্মুখে দুইটি পথ খোলা আছে, বাহ্যিক জ্ঞান বা অন্তবতম জ্ঞান, বাহ্যিক সাধনা বা নিগূঢ় অন্তবতম সাধনা। বাহ্যিক ধর্ম হইতেছে বাহিবেব কোনও দেবতাকে ভজনা কবা এবং বাহ্যিক কোনও সুখময অবস্থা প্রার্থনা করা, এই পথেব সাধকেবা তাহাদেব চবিত্রকে নির্মল পাপশূন্য করে এবং শাস্ত্রের বাহ্য বিধান পালন কবিবাব জন্য নৈতিক ধর্মানুযাযী কর্ম কবে, তাহাবা প্রতীকস্বরূপ বাহ্যিক যোগেব অনুষ্ঠানাদি সম্পন্ন কবে।[৩] কিন্তু তাহাদেব উদ্দেশ্য হইতেছে পার্থিব জীবনেব অনিত্য নশ্বব সুখ দুঃখেব অন্তে স্বর্গলোকেব

[১] গতির্ভর্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শবণং সুহৃৎ।
প্রভবঃ প্রলযঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যযম্॥৯।১৮

[২] তপাম্যহমহং বর্ষং নিগৃহ্ণাম্যুৎসৃজামি চ।
অমৃতঞ্চৈব মৃত্যুশ্চ সদসচ্চাহমর্জ্জুন॥৯।১৯

[৩] ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পূতপাপা যজ্ঞৈরিষ্ট্বা স্বর্গতিং প্রার্থযন্তে।
তে পুণ্যমাসাদ্য সুবেন্দ্রলোকমশ্নন্তি দিব্যান্ দিবি দেবভোগান্॥৯।২০

আনন্দলাভ কবা, সে সুখ পৃথিবীব সুখেব চেযে মহত্তব কিন্তু তথাপি তাহা ব্যক্তিগত ও লৌকিক ভোগ, যদিও সে লোক এই ক্ষুদ্র দুঃখময পৃথিবীব অপেক্ষা বড। আব এই যে ভোগ তাহাবা কামনা কবে, শ্রদ্ধা ও সদাচারের দ্বারা তাহারা তাহা প্রাপ্ত হয, কারণ কেবল এই জড়জীবন এবং এই পার্থিব সংসাবলীলাই আমাদেব ব্যক্তিগত সম্ভাবনাব চবম নহে বা বিশ্বজগতেব সমগ্র ধারা নহে। অন্যান্য লোক ও জগৎও আছে এবং সে সব পৃথিবী হইতে আরও বিশালতব সুখেব ক্ষেত্র, স্বর্গলোকং বিশালম্। এইরূপে প্রাচীন কালেব বৈদিক ক্রিযাপরাযণ ব্যক্তি বেদত্রযেব বহিবঙ্গ অর্থ আযত্ত কবিতেন, পাপ হইতে নিজেকে মুক্ত কবিতেন, দেবসংসর্গেব মদিবা সোম পান করিতেন, এবং যজ্ঞ ও সৎকর্মেব দ্বারা স্বর্গফল প্রার্থনা কবিতেন।[১] পবলোকে এই দৃঢ়বিশ্বাস এবং এক দিব্যতর লোকে গমনেব আকাঙ্ক্ষা জীবকে এমন শক্তি দেয যাহাব দ্বাবা সে মৃত্যুব পব তাহার শ্রদ্ধা ও আকাঙ্ক্ষাব একান্ত লক্ষ্য-স্বরূপ স্বর্গেব ভোগ লাভ করিতে পারে; কিন্তু আবাব এই মর্ত্য জীবনেই তাহাকে ফিবিযা আসিতে হয, কাবণ এই জীবনেব যে সত্যলক্ষ্য, সেইটিব সন্ধান বা সিদ্ধি সে লাভ করিতে পারে নাই। অন্য কোথাও নহে, এইখানেই সর্বোত্তম ভগবানকে লাভ কবিতে হইবে, অপূর্ণ জড় মানবীয় প্রকৃতি হইতেই জীবের দিব্য প্রকৃতিব বিকাশ করিতে হইবে, এবং ভগবান ও মানব ও বিশ্বেব সহিত ঐক্যেব ভিতব দিযা জীবনের সমগ্র বিশাল সত্যকে জানিতে হইবে, সেই সত্য অনুসারে জীবনকে গডিযা তুলিতে হইবে, যেন জীবনেব মাঝেই তাহাব অত্যাশ্চর্য প্রকাশ দেখিতে পাওযা যায়। এইভাবেই আমাদেব দীর্ঘ পুনবাবর্তন-চক্রেব পবিসমাপ্তি হইবে এবং আমরা এক পবম সিদ্ধির অধিকারী হইব, মানবজন্মে জীবকে এই সুযোগই দেওয়া হইযাছে এবং যতক্ষণ না ইহা সম্পন্ন হইতেছে ততক্ষণ জন্ম জন্মান্তবের শেষ কিছুতেই হইতে পারে না। বিশ্বজগতে আমাদেব জন্মেব এই যে চবম প্রযোজন, তাহার সিদ্ধির জন্য ভগবদ্‌ভক্ত ব্যক্তি একান্ত প্রেম ও ভক্তিব ভিতব দিয়া সর্বদা সেই উদ্দেশ্যেব দিকে অগ্রসব হয, সেই ভক্তিব দ্বাবা পবম বিশ্বপুরুষকেই সে তাহার জীবনের সমগ্র লক্ষ্য কবে—এই পৃথিবীব ক্ষুদ্র অহং-এর ভোগ বা স্বর্গভোগকে নহে; পবম বিশ্বপুরুষকেই সে তাহার সমস্ত চিন্তা, সমস্ত জ্ঞানের সমগ্র লক্ষ্য কবে।[২] *ভগবান ব্যতীত আর কিছুই না দেখা, প্রতি মুহূর্তে তাঁহার সহিত যুক্ত হইযা থাকা,* সকল জীবেব মধ্যে তাঁহাকে ভালবাসা এবং সকল বস্তুতে তাঁহারই আনন্দ গ্রহণ কবা—ইহাই হয তাহাব অধ্যাত্মজীবনেব সমগ্র স্বরূপ। তাহার ভগবদ্-দর্শন তাহাকে জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন কবে না, অথবা জীবনের পূর্ণতার বিন্দুমাত্র হইতেও

[১] তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি।
এবং ত্রযীধর্মমনুপ্রপন্না গতাগতং কামকামা লভন্তে॥৯।২১

[২] অনন্যাশ্চিন্তযন্তো মাং যে জনাঃ পর্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥৯।২২

সে বঞ্চিত হয না; কাবণ ভগবান আপনা হইতেই তাহাকে সকল কল্যাণ, সকল যোগক্ষেম[১] আনিয়া দেন, যোগক্ষেমং বহাম্যহম্। সে যাহা পায, স্বর্গেব সুখ বা পৃথিবীর সুখ তাহার সামান্য ছায়া মাত্র, কাবণ সে যেমন ভাগবতভাবে গড়িযা উঠে, তেমনই ভগবানও তাঁহার অনন্তজীবনেব অজস্র জ্ঞান, শক্তি, আনন্দ লইযা তাহার মধ্যে নামিয়া আসেন।

সাধারণ ধর্ম হইতেছে আংশিক দেবগণের পূজা, পূর্ণ ভগবানের পূজা নহে। পুরাতন বৈদিক ধর্মের যে বহিরঙ্গ দিক তখন বিকশিত হইযাছিল তাহা হইতেই গীতা দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিয়াছে, গীতা এই বহিবঙ্গেব উপাসনাকে বলিযাছে অন্যদেবতার প্রতি যজ্ঞ[২]; অন্যদেবতা যথা দেবান্, পিতৃন, ভূতানি। মানুষ ভগবানের আংশিক শক্তি বা ভাবসকলকে যেমন দেখে বা ধাবণা কবে সেই সবের নিকটেই সাধারণত তাহাদেব জীবন ও কর্মকে উৎসর্গ কবে—মানুষ বা প্রকৃতির মধ্যে যে সকল প্রধান প্রধান জিনিস সহজেই তাহাদেব দৃষ্টি আকর্ষণ কবে, প্রধানত সেই সবের অন্তর্দেবতারূপে অধিষ্ঠিত শক্তি ও ভাবসকলেব উপাসনা তাহারা করিয়া থাকে, অথবা যেসব শক্তি ও ভাব উচ্চ দিব্য প্রতীকেব ভিতর দিযা তাহাদের নিজেদের মানবীয়তাকেই প্রতিফলিত কবে সেই সবেব পূজা করিয়া থাকে। যদি তাহাবা শ্রদ্ধাব সহিত ইহা কবে, তবে তাহাদেব সে শ্রদ্ধা সার্থক হয়; কারণ ভক্তের মনে ভগবানেব যে প্রতীক, রূপ বা কল্পনা বর্তমান থাকে, ভগবান তাহাই স্বীকাব কবেন, যং যং তনুম্, শ্রদ্ধয়া অর্চতি, এবং তাহাব মধ্যে যেরূপ শ্রদ্ধা আছে তদনুসারেই তাহার সম্মুখে উপস্থিত হন। সকল আন্তবিক ধর্মবিশ্বাস ও উপাসনা বস্তুত সেই এক পরম বিশ্বপুরুষেরই উপাসনা, কাবণ তিনিই মানুষেব সকল যজ্ঞ ও তপস্যার প্রভু, তাহাব সকল সাধনা ও উপাসনাব অনন্ত ভোক্তা।[৩] পূজার ধরন-ধাবণ যতই ছোট বা নীচ হউক, আত্মদান ও শ্রদ্ধা যতই অপূর্ণ হউক, নিজের অহংকে পূজা ও সেবা কবিবাব মাযা ও জড প্রকৃতিব বন্ধন ছাড়াইয়া উঠিবার চেষ্টা যতই সামান্য হউক, তথাপি ইহার দ্বাবাই মানবাত্মাব সহিত পরমাত্মাব একটি যোগসূত্র স্থাপিত হয এবং একটা সাড়াও পাওযা যায। তবে জ্ঞান, শ্রদ্ধা ও অর্পণ যেমনটি হয ঐ সাড়াও তদনুরূপই হয, সেই পূজা-উপাসনার ফলপ্রাপ্তি তদনুযায়ীই হয, এসবের সীমাকে ছাডাইযা উঠিতে পাবে না। সুতরাং একমাত্র যে মহত্তব ভগবদ্‌জ্ঞান জীবনলীলাব সমগ্র সত্য দিতে পাবে তাহার সহিত তুলনায় এই নীচের পূজা যজ্ঞেব সত্য ও উচ্চতম বিধি অনুসাবে

[১] যেসব বাহ্যিক ও আভ্যন্তবীণ সম্পদ নাই তাহাদেব প্রাপ্তিকে যোগ বলা যায, এবং সেই লব্ধ সম্পদ বক্ষাই ক্ষেম।—অনুবাদক

[২] যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধায়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্॥৯।২৩

[৩] অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুবেব চ।
ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে॥৯।২৪

অর্পিত হয না। পবম ভগবৎপুরুষকে তাঁহার সমগ্র সত্তায় ও তাঁহার আত্মবিকাশেব সকল তত্ত্বে যে জানা সেই শ্রেষ্ঠ জ্ঞানেব ভিত্তির উপর এই অর্পণ প্রতিষ্ঠিত নহে, ইহা শুধু বহিবঙ্গেব ও আংশিক আভাসের উপরেই অনুবক্ত, ন মাং অভিজানন্তি তত্ত্বতঃ। সেই জন্য এই যজ্ঞের উদ্দেশ্যও পরিচ্ছিন্ন; প্রধানত অহং-এব সেবাই ইহাব লক্ষ্য, ইহাব ক্রিয়া ও অর্পণ আংশিক ও ভ্রান্ত, যজন্তি অবিধিপূর্ব্বকম্। সজ্ঞানে সমগ্রভাবে আত্মসমর্পণ করিতে হইলে চাই ভগবানকে সমগ্রভাবে দর্শন করা, নতুবা কেবল অপূর্ণ ও আংশিক জিনিসই পাওয়া যায় এবং সেসবকে ছাডাইযা উঠিতে না পাবিলে মহত্তর সাধনা ও প্রশস্ততর ভগবদ্ উপলব্ধিব মধ্যে নিজেকে প্রসাবিত করিতে পাবা যায় না। কিন্তু যাহারা পবম বিশ্বপুরুষকেই একান্ত ও সমগ্রভাবে অনুসবণ কবে, তাহারা অন্যান্য সাধনালব্ধ সমস্ত জ্ঞান ও ফল লাভ করে, কিন্তু কোনও এক বিশেষ ভাবের মধ্যে বদ্ধ হয় না, যদিও সকল ভাবেব মধ্যেই ভগবান সম্বন্ধে কি সত্য আছে তাহা তাহারা দেখিতে পায। এই সাধনা পবম পুরুষোত্তমেব দিকে যাইবার পথে ভগবানেব সমস্ত ভাব, সমস্ত রূপকেই আলিঙ্গন করে।[১]

যে ভক্তি গীতা-কৃত সমন্বয়েব চূড়া, এই পূর্ণতম আত্মদান, এই ঐকান্তিক আত্মসমর্পণই সেই ভক্তি। সমস্ত কর্ম ও চেষ্টা এই ভক্তির দ্বারা পরম বিশ্বপুরুষের নিকট অর্পণে পবিণত হয।[২] "তুমি যে কর্ম কব, যাহা ভোগ কর, যে যজ্ঞ কর, যাহা দান কব, যে তপস্যা কব সে সকলই আমাতে অর্পণ কর।" এইরূপে জীবনেব ক্ষুদ্রতম, তুচ্ছতম ঘটনা, নিজ হইতে বা নিজের যাহাকিছু তাহা হইতে নিতান্ত মূল্যহীন দান, ক্ষুদ্রতম কর্ম—সমস্তই তখন এক দিব্য সার্থকতা লাভ করে, সে অর্পণ ভগবানেব গ্রহণযোগ্য হয়, সেইটিকেই উপলক্ষ্য কবিয়া তিনি ভগবদ্‌ভক্তেব আত্মা ও জীবনকে অধিকার কবেন। বাসনা ও অহং কর্তৃক সৃষ্ট সমস্ত ভেদ তখন দূব হয। কর্মেব শুভ ফল লাভ কবিবাব জন্য উদ্বেগ থাকে না, অশুভ ফল এডাইবাব চেষ্টা থাকে না, কিন্তু সকল কর্ম ও সকল ফল সেই পরম পুরুষে সমর্পণ কবা হয যিনি জগতেব সমস্ত কর্ম ও সমস্ত ফলের চির-অধিকারী, সুতবাং আব কর্মবন্ধন থাকে না। কারণ পূর্ণতম আত্মসমর্পণের দ্বারা সমস্ত অহংমুখী বাসনা হৃদয হইতে দূব হইযা যায় এবং জীব আভ্যন্তরীণ সন্ন্যাসের দ্বারা

[১] যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৃন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্‌যাজিনোঽপি মাম্॥৯।২৫
পত্রং পুষ্পং ফলং তোযং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতম অশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥
যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয তৎকুরুষ মদর্পণম্॥
শুভাশুভফলৈরেবং মোক্ষ্যসে কর্ম্মবন্ধনৈঃ।
সংন্যাসযোগযুক্তাত্মা বিমুক্তো মামুপৈষ্যসি॥৯।২৬-২৮

স্বাতন্ত্র্য পরিহার করিয়া ভগবানের সহিত পূর্ণভাবে যুক্ত হয়। সকল ইচ্ছা, সকল কর্ম, সকল ফল ভগবানের হয়, শুদ্ধ ও বুদ্ধ প্রকৃতির ভিতর দিয়া দিব্যভাবে ক্রিয়া করে, সেসব আর সীমাবদ্ধ ব্যক্তিগত অহং-এর থাকে না। সীমাবদ্ধ প্রকৃতি এইভাবে সমর্পিত হইলে অসীমের মুক্ত অবাধ যন্ত্র হয়, জীব তাহার অধ্যাত্ম সত্তা লইয়া অজ্ঞান ও সীমাবন্ধন হইতে উঠিয়া দাঁড়ায়, অনন্তের সহিত তাহার ঐক্যে ফিরিয়া যায়। সনাতন ভগবান জগতের সকল বস্তুর মধ্যেই অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন, তিনি সর্বভূতে সমান এবং সমানভাবে সকল জীবের বন্ধু, পিতা, মাতা, স্রষ্টা, প্রণয়ী, ভর্তা।[১] তিনি কাহারও শত্রু নহেন, কাহারও প্রতি তাঁহার পক্ষপাতী প্রেম নাই, কাহাকেও তিনি পরিত্যাগ করেন নাই, কাহাকেও তিনি চিরকালের জন্য দণ্ডিত করেন নাই। বিনা কারণে খেয়ালী স্বেচ্ছাচারিতার বশে তিনি কাহাকেও কৃপা দেখান নাই; অজ্ঞান মায়ার মধ্যে ঘোরাঘুরি শেষ হইলে শেষপর্যন্ত সকলে সমানভাবে তাঁহার নিকট উপনীত হয়। কিন্তু কেবল এই পূর্ণতম ভক্তির দ্বারাই মানুষের মধ্যে ভগবানের বাস এবং ভগবানের মধ্যে মানুষের বাস সম্বন্ধে সজ্ঞান সচেতন হওয়া যায় এবং তাহা সর্বতোমুখী পূর্ণতম মিলনে পরিণত হয়। উচ্চতম ও সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণের যে প্রেম, তাহার দ্বারাই সর্বাপেক্ষা সরল পথে ও সত্বর ভাগবত ঐক্যে পৌঁছিতে পারা যায়। আমাদের সকলের মধ্যে সমানভাবে যে ভগবান অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন তিনি প্রথমত আর কিছুই চাহেন না, যদি এই সমগ্র আত্মসমর্পণ, শ্রদ্ধা, আন্তরিকতা ও পরিপূর্ণতার সহিত সম্পন্ন হইয়া থাকে। সকলের পক্ষেই এই দ্বার উন্মুক্ত, সকলেই এই মন্দিরে প্রবেশ লাভ করিতে পারে, সেই বিশ্বপ্রেমিকের আলয়ে আমাদের লৌকিক ভেদবৈষম্য সমস্ত দূর হইয়া যায়। সেখানে পুণ্যবানকে বেশী আদর করা হয় না, পাপীকে ভগবৎসান্নিধ্য হইতে তাড়াইয়া দেওয়া হয় না, এই পথ দিয়া পুণ্যবান সদাচারী ব্রাহ্মণ এবং অস্পৃশ্য পাপজন্মা চণ্ডাল সকলে এক সঙ্গেই যাইতে পারে এবং দেখিতে পায় যে, চরম মুক্তি ও অনন্তের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জীবনলাভের দ্বার সকলের পক্ষেই সমানভাবে উন্মুক্ত। ভগবানের সম্মুখে পুরুষ ও স্ত্রী উভয়েরই সমান অধিকার; কারণ পরমাত্মা ব্যক্তিত্বের বা সামাজিক ভেদাভেদের কোনও খাতির করেন না, সকলেই সোজাভাবে তাঁহার নিকট যাইতে পারে, সেজন্য কোনও মধ্যস্থতার, কোনও বাধাসূচক শর্তপূরণের প্রয়োজন হয় না। শুধু ভগবান বলিলেন,[২] "অত্যন্ত দুরাচারও যদি অনন্যভাক্ হইয়া আমাকে ভজনা করে তাহা হইলে তাহাকে সাধু

[১] সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্॥৯।২৯

[২] অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ॥
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি॥৯।৩০-৩১

বলিয়াই বিবেচনা করা উচিত, কারণ সে ব্যক্তির সাধনার যে অবিচলিত সঙ্কল্প তাহা সত্য ও অখণ্ড। সে ব্যক্তি শীঘ্রই ধর্মাত্মা হইয়া উঠে এবং চিরশান্তি প্রাপ্ত হয়।" অন্য কথায়, পূর্ণ আত্মসমর্পণের যে সুদৃঢ় সঙ্কল্প তাহা আত্মার সকল দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দেয় এবং প্রতিদানে লইয়া আসে মানুষের নিকট ভগবানের পূর্ণ অবতরণ ও আত্মদান এবং তাহাই আমাদের নীচের প্রকৃতিকে দ্রুত দিব্যপ্রকৃতিতে রূপান্তরিত করিয়া আমাদের আধারের সকল অংশকে দিব্যজীবনের আদর্শে অবিলম্বে গড়িয়া তুলে। আত্মসমর্পণের ইচ্ছার যে শক্তি তাহা ভগবান ও মানুষের মধ্যস্থিত মায়ার আবরণ ঘুচাইয়া দেয়, সকল ভ্রান্তিকে নাশ করে, সকল বাধাকে ধ্বংস করে। যাহারা নিজেদের মানবীয় শক্তিতে জ্ঞান, পুণ্যকর্ম বা কৃচ্ছ্র আত্মসংযমের দ্বারা ঊর্ধ্বগতি লাভ করিতে চায়, তাহারা অতিকষ্টে সাতিশয় সংশয়ের সহিত অনন্তের দিকে অগ্রসর হয়; কিন্তু মানুষ যখন নিজের অহংকে, নিজের সমস্ত কর্মকে ভগবানে সমর্পণ করে তখন ভগবান নিজে আমাদের কাছে আসেন এবং আমাদের ভার গ্রহণ করেন। অজ্ঞানীকে তিনি দিব্যজ্ঞানের আলোক আনিয়া দেন, দুর্বলকে তিনি ভাগবত ইচ্ছাশক্তির বল আনিয়া দেন, পাপীকে তিনি দিবা পবিত্রতার মুক্তি আনিয়া দেন, দীন-দুঃখীকে তিনি অনন্ত অধ্যাত্ম সুখ ও আনন্দ আনিয়া দেন। তাহাদের দুর্বলতায়, তাহাদের মানবীয় শক্তির ত্রুটি বিচ্যুতিতে কিছুই আসিয়া যায় না। ভগবান বলিতেছেন, "নিশ্চয় জেনো, অর্জুন, আমাকে যে ভালবাসে তাহার বিনাশ নাই।" পূর্ব চেষ্টা ও উদ্যোগ, ব্রাহ্মণের শুচিতা ও পুণ্য, কর্মে ও জ্ঞানে মহান রাজর্ষির জ্ঞানদীপ্ত শক্তি, এ সবেরই মূল্য আছে কারণ দুর্বল অপূর্ণ মানুষের পক্ষে এই উদার দৃষ্টি ও আত্মসমর্পণে উপনীত হওয়া এই সবের দ্বারা অপেক্ষাকৃত সহজ হয়, কিন্তু এরূপ উদ্যোগ না থাকিলেও যাহারা প্রেমদাতা ভগবানের শরণাপন্ন হয়'—ধনোপার্জনের সঙ্কীর্ণতা এবং ধনোৎপাদনের চেষ্টায় মগ্ন বৈশ্য, শত কঠিন বিধিনিষেধ-পিষ্ট শূদ্র, সমাজের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ আত্মবিকাশে বাধাপ্রাপ্ত স্ত্রীলোক, এমনকি পাপযোনি, পূর্বজন্মের কর্মফলে যাহারা অতি নীচ কুলে পতিত, পাবিয়া চণ্ডাল হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সকলেই তৎক্ষণাৎ তাহাদের সম্মুখে ভগবানের দ্বার উন্মুক্ত দেখিতে পায়। মানুষের বাহ্য মন যেসব বাহ্যিক ভেদবৈষম্যকে অতি বড় করিয়া দেখে, সেসব ভেদবৈষম্য অধ্যাত্মজীবনের মধ্যে দিব্যজ্যোতির সাম্য এবং নিরপেক্ষ ভগবানের অনন্ত অজেয় শক্তির সম্মুখে দাঁড়াইতে পারে না।

পার্থিব জগৎ দ্বন্দ্বে পূর্ণ এবং অনিত্য বাহ্যিক সম্বন্ধসকলের দ্বারা বদ্ধ; মানুষ যতদিন এখানে এই সকল জিনিসে আসক্ত হইয়া বাস করে এবং এই জগৎ

মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্॥
কিং পুনর্ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যা ভক্তা রাজর্ষয়স্তথা।
অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্॥৯।৩২-৩৩

তাহাকে যেভাবে চালাইতে চায় সেইটিকেই নিজেব জীবনেব আদর্শ নীতি বলিযা গ্রহণ কবে, ততদিন এ জগৎ তাহার পক্ষে দ্বন্দ্ব, দুঃখ, যন্ত্রণাব জগৎ, অনিত্যং অসুখম্ লোকম্। ইহা হইতে মুক্তিব পথ হইতেছে বাহির হইতে ফিরিয়া অন্তর্মুখী হওয়া; জড়জগৎ যে মনেব উপর চাপিযা বসিযাছে এবং মানুষকে দেহ ও প্রাণেব সঙ্কীর্ণ গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ রাখিযাছে সেই জগতেব সৃষ্ট মায়া হইতে ফিবিযা সত্য ভাগবত সত্তার অভিমুখী হওয়া—সে ভাগবত সত্তা আত্মাব মুক্তিব ভিতব দিযা প্রকটিত হইবার অপেক্ষা কবিতেছে। মাযাময মিথ্যা জগতেব প্রতি যে প্রেম তাহাকে সত্যস্বরূপ ভগবানেব প্রেমে পবিণত কবিতে হইবে। একবাব এই নিগূঢ় অন্তরতম ভগবানকে জানিতে ও ধবিতে পাবিলে, সমগ্র সত্তা, সমগ্র জীবন অত্যুচ্চ গতি লাভ করিবে, অত্যাশ্চর্যভাবে রূপান্তবিত হইবে। বহির্মুখী কর্ম ও দৃশ্যে মগ্ন নীচেব প্রকৃতির অজ্ঞানতার পরিবর্তে চক্ষু সর্বত্র ভগবানকে দেখিতে পাইবে, আত্মার ঐক্য ও সার্বভৌমিকতা দেখিতে পাইবে। জগতেব দুঃখ যন্ত্রণা সর্বানন্দময়েব আনন্দের মধ্যে লোপ পাইবে, আমাদেব দুর্বলতা, ভ্রান্তি ও পাপ অনন্ত ভগবানের সর্বগ্রাহী, সর্বরূপান্তরসাধক শক্তি, সত্য ও পবিত্রতায পবিণত হইবে। মনকে ভাগবত চৈতন্যেব সহিত এক কবা, আমাদেব সমস্ত হৃদযাবেগকে সর্বভূতে বিরাজিত ভগবানেব প্রতি একান্ত প্রেমে পবিণত কবা, আমাদেব সকল কর্মকে জগদীশ্বরেব উদ্দেশে এক যজ্ঞরূপে পবিণত কবা, আমাদেব সকল পূজা উপাসনাকে একমাত্র তাঁহাব প্রতি ভক্তি ও আত্মসমর্পণে পবিণত কবা, পূর্ণযোগে আমাদের সমস্ত সত্তাকে ভগবদভিমুখী কবা—ইহাই পার্থিব জীবন হইতে দিব্যজীবনে উঠিবাব পন্থা।[১] ভগবৎপ্রেম ও ভক্তি সম্বন্ধে ইহাই গীতাব শিক্ষা, ইহার মধ্যে জ্ঞান, কর্ম ও হৃদযেব আকাঙ্ক্ষা পরম সামঞ্জস্যে মিলিযা এক হইয়াছে, সকল সূত্র একত্রে সংগ্রথিত হইয়াছে, এক অত্যুচ্চ সমন্বয, উদাবতম ঐক্য সংসাধিত হইয়াছে।

[১] মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ॥৯।৩৪

সপ্তম অধ্যায

গীতার পরম বাক্য

এখন আমবা গীতোক্ত যোগেব অন্তবতম সারাংশে, উহার শিক্ষাব সমগ্র জীবন্ত কেন্দ্রে উপস্থিত হইয়াছি। এখন আমবা অতি স্পষ্টভাবেই দেখিতে পাইতেছি যে, সীমাবদ্ধ মানবাত্মা যখন অহং ও নীচেব প্রকৃতি হইতে নিবৃত্ত হইয়া শান্ত, নীবব, অচলপ্রতিষ্ঠ অক্ষব আত্মাব মধ্যে উঠে, সে ঊর্ধ্বগতি কেবল একটা প্রথম ধাপ, একটা প্রাবম্ভিক পবিবর্তন মাত্র। আর এখন আমরা ইহাও বুঝিতে পাবিতেছি, কেন গীতা প্রথম হইতেই ঈশ্বরেব উপরে, মানবরূপী ভগবানেব উপবে এত ঝোঁক দিযাছে, তিনি সর্বদাই নিজেকে লক্ষ্য কবিয়া (অহং, মাম্) এমনভাবে কথা বলিতেছেন যেন তিনি এক মহান্ গুহ্য ও সর্বব্যাপী সত্তা, জগৎসকলেব ঈশ্বব মানবাত্মার প্রভু, এমনকি প্রাকৃত বিশ্বজগতের আন্তরিক ও বাহ্যিক বিষযসমূহ যাহাকে কখনও স্পর্শ করিতে পারে না, তিনি সেই চিরশান্ত, অবিচল, অক্ষব, স্বপ্রতিষ্ঠ সত্তা অপেক্ষাও মহত্তব।

সকল যোগই হইতেছে ভগবানের সন্ধান, অনন্তেব সহিত মিলনেব প্রযাস। ভগবান ও অনন্ত সম্বন্ধে আমাদেব উপলব্ধি যত পূর্ণ হয়, তদনুযায়ীই হয সেই সন্ধানেব ধারা, সেই মিলনেব গভীবতা ও পূর্ণতা এবং সেই সিদ্ধির সমগ্রতা। মানুষ মনোময পুরুষ, তাহাকে তাহাব সান্ত মনের ভিতর দিযাই অন্তবেব অভিমুখে অগ্রসব হইতে হয, এই সান্তেরই কোন সন্নিহিত দ্বাব অনন্তের দিকে খুলিযা ধবিতে হয়। সে এমন কোনও পবিকল্পনার সন্ধান কবে যেটিকে তাহার মন ধবিতে পাবে, তাহাব প্রকৃতিব এমন কোনও শক্তিকে সে বাছিয়া লয় যাহা নিজেকে পবমে উন্নীত কবিযা অনন্ত সত্যের দিকে প্রসারিত হইতে পাবে, তাহাকে স্পর্শ কবিতে পারে, যে সত্যেব স্বরূপ তাহাব মনেব ধারণার অতীত। সত্য অনন্ত, সেই জন্যই তাহাব আছে অগণ্য মুখ, তাহার অর্থেব অগণ্য বাক্য, অগণ্য ব্যঞ্জনা, সেই অনন্ত সত্যেব কোনও একটি মুখকে সে দেখিবার চেষ্টা কবে, যেন তাহাকে অবলম্বন কবিযা সাক্ষাৎ অনুভূতিব ভিতব দিযা, সেইটি যাহার একটি রূপ সেই অপবিমেয সত্যে সে পৌঁছিতে পাবে। সে দ্বার যতই সঙ্কীর্ণ হউক, যদি তাহা তাহাব আকাঙ্ক্ষিত আনন্ত্যেব দিকে কতকটা দৃষ্টি খুলিয়া দেয়, তাহার আত্মাকে যে আহ্বান কবিযাছে তাহার অপবিসীম গভীবতা ও দুরারোহ শিখরের দিকে তাহাকে পথ দেখাইযা দেয়, তাহা হইলেই সে পবিতুষ্ট হয। আর যেভাবে সে তাহাব দিকে অগ্রসব হয়, সেও তাহাকে সেইভাবেই গ্রহণ করে, যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে।

দার্শনিক চিন্তাশীল মন ব্যতিরেকী (Abstractive) জ্ঞানেব দ্বারা অনন্তে

পৌঁছিতে চায়। জ্ঞানের কার্য—অবধারণ করা, আর সান্ত বুদ্ধির পক্ষে ইহার অর্থ হইতেছে বিশেষ লক্ষণ দ্বারা নির্দেশ করা, সীমা নির্ধারণ করা। কিন্তু অনির্দেশ্য বস্তুকে নির্দেশ করিবার একমাত্র পন্থা হইতেছে কোন প্রকার সর্বতোমুখী নেতি নেতি। অতএব আমাদের ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি ও হৃদয়ের দ্বারা গ্রাহ্য হয় এমন সকল জিনিসকেই মন অনন্তের পরিকল্পনা হইতে বাদ দিতে অগ্রসর হয়। আত্মা ও অনাত্মাকে সম্পূর্ণ বিরোধী বলিয়া দেখা হয়; এক শাশ্বত অক্ষর অনির্দেশ্য স্বপ্রতিষ্ঠ সত্তা ও সকল সৃষ্ট জিনিস, ব্রহ্ম ও মায়া, অনির্বচনীয় সদ্বস্তু ও যাহাকিছু তাহাকে প্রকট করিতে চাহিতেছে কিন্তু পারিতেছে না—এই সবকে পরস্পরের বিরোধী বলিয়া গণ্য করা হয়; কর্ম ও নির্বাণ—একদিকে বিশ্বশক্তির অবিরত অথচ চিরপরিবর্তনশীল কর্মধারা, অন্যদিকে এক অনির্বচনীয় পরম নিষ্ক্রিয়তা, যেখানে কোনও জীবন নাই, মনোবৃত্তি নাই, কর্মের আর কোনই উপযোগিতা নাই—ইহাদিগকে সম্পূর্ণ বিপরীত বলিয়া ধারণা করা হয়। শাশ্বতের দিকে জ্ঞানের এই প্রবল বেগ মানুষকে অনিত্য ও অস্থায়ী সবকিছু হইতেই সরাইয়া লইয়া যায়। জীবনের উৎসে ফিরিবার জন্য উহা জীবনকেই অস্বীকার করে, আমরা যে রূপে প্রতীয়মান হই সে সমস্তই বর্জিত করা হয়, যেন ইহাদের উপরে আমাদের সত্তার যে নামরূপের অতীত সত্য সেখানে পৌঁছিতে পারা যায়। হৃদয়ের বাসনা, ইচ্ছাশক্তির কর্ম, মনের পরিকল্পনা সবই বর্জিত হয়, এমনকি পরিশেষে জ্ঞানও পরম অজ্ঞেয় ও নির্বিশেষ সত্তার মধ্যে নির্বাপিত, নিমজ্জিত হইয়া যায়। এই যে ক্রমবর্ধমান নিবৃত্তি ও নিশ্চেষ্টতার পথ শেষ পর্যন্ত চরম নিষ্ক্রিয়তায় লইয়া যায়, ইহার দ্বারা মায়াসৃষ্ট আত্মা, অথবা যে সংস্কারসমষ্টিকে আমরা "আমরা" বলিয়া অভিহিত করি, নিজের ব্যক্তিত্বভাবের লয় সাধন করে, জীবনরূপ মিথ্যার অবসান করে, নির্বাণের মধ্যে বিলুপ্ত হইয়া যায়।

কিন্তু এই যে আত্মনির্বাণের কঠিন ব্যতিরেকী প্রণালী, ইহা দুই-চারিজন অসাধারণ প্রকৃতির লোককে আকৃষ্ট করিলেও, মানুষের মধ্যে দেহধারী আত্মাকে সর্বত্র তৃপ্ত করিতে পারে না, কারণ পূর্ণতম শাশ্বতের অভিমুখে যাইবার জন্য তাহার বহুমুখী প্রকৃতির মধ্যে যে প্রবল আগ্রহ রহিয়াছে, ইহা সেসবকে কোনও পথ দেখাইয়া দেয় না। কেবল তাহার ব্যতিরেকী ধ্যানী বুদ্ধিই নহে, তাহার পিপাসু হৃদয়, তাহার কর্মপর ইচ্ছা, তাহার যে ব্যবহারিক মন এমন কোনও সত্যের সন্ধান করিতেছে তাহার নিজের জীবন এবং বিশ্বের জীবন যাহার বিচিত্র প্রকাশ—এই সবেরই আছে শাশ্বত ও অনন্তের দিকে যাইবার প্রয়াস, তাহার মধ্যেই তাহাদের দিব্য উৎস এবং তাহাদের জীবন ও প্রকৃতির সার্থকতা তাহারা পাইতে চায়। এই প্রয়োজন হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে ভক্তিমূলক ও কর্মমূলক ধর্মসকল, তাহাদের শক্তি হইতেছে এই যে, তাহারা আমাদের মানবতার সর্বাপেক্ষা সক্রিয় ও বিকশিত বৃত্তিসকলকে তৃপ্ত করে, ভগবানের দিকে লইয়া যায়—কারণ ইহাদিগকে লইয়া আরম্ভ করিয়াই জ্ঞান ফলপ্রসূ হইতে পারে। এমনকি বৌদ্ধধর্ম আভ্যন্তরীণ আত্মা

ও বাহ্য বস্তু উভয়কেই কঠোর ও অকুণ্ঠভাবে "নেতি" করা সত্ত্বেও নিজেকে প্রথমত কর্মের দিব্য সাধনার উপরে প্রতিষ্ঠিত করিতে এবং ভক্তির স্থলে এক সার্বজনীন প্রেম ও অনুকম্পার অধ্যাত্ম ভাবালুতা আনয়ন করিতে বাধ্য হইয়াছিল, কারণ কেবল এইভাবেই তাহার পক্ষে মানবজাতির জন্য এক সিদ্ধিপ্রদ পন্থা হওয়া, এক বস্তুত মুক্তিপ্রদ ধর্ম হওয়া সম্ভব হইয়াছিল। এমনকি মায়াবাদ যে অতিমাত্রায় যুক্তিতর্কের অনুসরণ করিয়া কর্ম ও মানসিক সৃষ্টিসকলের প্রতি তীব্র অসহিষ্ণুতা দেখাইয়াছে, সেও মানুষকে, বিশ্বকে এবং বিশ্বে ভগবানকে একটা সাময়িক ও ব্যবহারিক সত্তা দিতে বাধ্য হইয়াছে যেন প্রথমে দাঁড়াইবার মত একটা স্থান, ধরিবার মত একটা সূত্র পাওয়া যায়, মানুষের বন্ধন এবং তাহার মুক্তির সাধনাকে কতকটা বাস্তবতা দিবার জন্য মায়াবাদ যেটিকে অস্বীকার করে সেটিকেই স্বীকার করিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছে।

কিন্তু কর্মমুখী ও হৃদয়াবেগমূলক ধর্মসমূহের দুর্বলতা এই যে, তাহারা ভগবানের কোনও বিশেষ ব্যক্তিরূপে এবং সান্তেরই দিব্য ভাবসকলে অতিমাত্রায় নিমগ্ন হইয়া যায়। আর যদি কখনও তাহাদের অনন্ত ভগবৎসত্তা সম্বন্ধে কোনও পরিকল্পনা থাকে, তাহারা আমাদিগকে জ্ঞানের পূর্ণ তৃপ্তি দেয় না, কারণ তাহারা ইহার পরম ও ঊর্ধ্বতম পরিণতি পর্যন্ত যাইতে চাহে না। শাশ্বতের মধ্যে যে পূর্ণ নিমজ্জন এবং একাত্মতার দ্বারা পূর্ণতম মিলন, এই সকল ধর্ম ততদূর পর্যন্ত যায় না—অথচ, সেই একাত্মতাতে মানবাত্মাকে একদিন পৌঁছিতেই হইবে, যদি নেতিমূলক পন্থায় না হয়, যে কোনও উপায়ে কারণ সেইখানেই রহিয়াছে সকল একত্বের ভিত্তি। অন্যপক্ষে, শুধু ধ্যানপরায়ণ নিবৃত্তিমূলক আধ্যাত্মিকতার দুর্বলতা হইতেছে এই যে, তাহা এই পরিণতিতে উপস্থিত হয় অতিরিক্ত নেতির দ্বারা এবং শেষকালে তাহা মানবাত্মাকে একটা অবস্তু বা মিথ্যা কল্পনামাত্র করিয়া তোলে, অথচ বারবার এই আত্মার আকাঙ্ক্ষার জন্যই ঐ মিলনপ্রয়াস, নতুবা তাহার কোন অর্থই থাকে না কারণ আত্মাকে এবং আত্মার আকাঙ্ক্ষাকে ছাড়িয়া দিলে মুক্তি ও মিলন সম্পূর্ণ অর্থহীন হইয়া পড়ে। এই চিন্তাধারা মানবজীবনের অন্যান্য শক্তিকে যতটুকু স্বীকার করে, তাহাকে সে প্রাথমিক নিম্নতর ক্রিয়ার জন্য বাখিয়া দেয়, শাশ্বত ও অনন্তের মধ্যে আসিয়া সে ক্রিয়া কখনই কোন পূর্ণ বা সন্তোষজনক পরিণতি লাভ করিতে পায় না। অথচ এই যে সব জিনিসকে তাহা অসঙ্গতভাবে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখে—সমর্থ ইচ্ছাশক্তি, প্রেমের তীব্র আবেগ, সচেতন মানস সত্তার ব্যবহারিক দৃষ্টি ও সর্বতোমুখী বোধি, এসবও আসিয়াছে ভগবান হইতে, তাহারা ভগবানেরই মূল শক্তিসকলের প্রতিরূপ, তাহাদের উৎপত্তিস্থলে তাহাদের একটা সার্থকতা নিশ্চয়ই আছে এবং ভগবানেরই মধ্যে তাহাদের পূর্ণতালাভের একটা জীবন্ত সাধনাও আছে। তাহাদের চূড়ান্ত দাবি পূরণ না করিলে কোনও ভগবদ্‌জ্ঞানই সমগ্র পূর্ণ বা সর্বতোভাবে সন্তোষজনক হইতে পারে না। ভগবৎসত্তার এই সকল ভাবের পিছনে যে অধ্যাত্মবস্তু রহিয়াছে, বৈরাগ্যমুখী

জিজ্ঞাসার সঙ্কীর্ণতায় তাহাকে নেতি করিয়া অথবা শুদ্ধ জ্ঞানের গর্বে তাহাকে তুচ্ছ করিয়া কোন বিজ্ঞতাই সম্পূর্ণ বিজ্ঞ হইতে পারে না।

গীতার যে মুখ্য চিন্তাধারায় গীতার সকল সূত্রগুলি সংগৃহীত ও মিলিত হইয়াছে, তাহার মহত্ত্ব হইতেছে এমন একটি পরিকল্পনার সমন্বয়মূলক শক্তি যাহা বিশ্বমাঝে মানবাত্মার সমগ্র প্রকৃতিটিরই হিসাব লয়; আর মানুষ পূর্ণতা ও অমৃতত্বের সন্ধানে, কোনও এক ঊর্ধ্বতম আনন্দ, শক্তি ও শান্তির সন্ধানে যে পরম ও অনন্ত সত্য, শক্তি, প্রেমের দিকে আকৃষ্ট হয়, তাহার সেই বহুমুখী প্রয়োজনকে উদার ও যথাযথ ঐক্যসাধনের দ্বারা সার্থকতা দেওয়া হয়। এখানে রহিয়াছে ভগবান, মানব ও বিশ্বজগৎ সম্বন্ধে এক ব্যাপক অধ্যাত্ম দৃষ্টিলাভের দিকে একটা সতেজ ও উদার প্রয়াস। অবশ্য এই অষ্টাদশ অধ্যায়ের মধ্যেই সব জিনিসকে নিঃশেষে ধরা হইয়াছে, আর কোনও অধ্যাত্ম সমস্যার সমাধান হইতে বাকী নাই, এমন নহে; তথাপি এমন এক প্রশস্ত কাঠামো দেওয়া হইয়াছে, যেটিকে কেবল পূরণ করিয়া, পরিস্ফুট করিয়া, সামান্য পরিবর্তিত করিয়া, ইঙ্গিতসকলের অনুসরণ করিয়া, অস্পষ্ট স্থানগুলিকে আলোকিত করিয়া, আমরা আমাদের বুদ্ধির অন্যান্য সমস্যারও সূত্র আবিষ্কার করিতে পারি, আমাদের আত্মার অন্যান্য প্রয়োজনও সিদ্ধ করিতে পারি। গীতা নিজে তাহার উত্থাপিত প্রশ্নাবলীর কোনও সম্পূর্ণ নূতন সমাধান উপস্থিত করে নাই। যে ব্যাপকতা তাহার লক্ষ্য তাহাতে উপনীত হইতে গীতা বিখ্যাত দর্শনগুলিকে ছাড়াইয়া তাহাদের পশ্চাতে উপনিষদের যে মূল বেদান্ত রহিয়াছে সেইখানেই ফিরিয়া গিয়াছে, কারণ সেইখানেই আমরা পাই আত্মা ও মানব ও বিশ্বজগৎ সম্বন্ধে প্রশস্ততম ও গভীরতম সমন্বয়ের দৃষ্টি। কিন্তু উপনিষদগুলিতে অন্তর্জ্ঞানমূলক দৃষ্টি এবং রূপকাত্মক ভাষার জ্যোতির্ময় আচ্ছাদনে আবরিত থাকায় যাহা বুদ্ধির নিকট অনধিগম্য, তাহাকেই গীতা পরবর্তী বুদ্ধিবৃত্তিমূলক চিন্তা ও বিশিষ্ট অভিজ্ঞতার আলোকে প্রকাশ করিয়া ধরিয়াছে।

ব্যতিরেকী চিন্তার দ্বারা যাহারা অনির্দেশ্যের, চির-অব্যক্ত অক্ষরের সন্ধান করে, যে ত্বক্ষরমনির্দ্দেশ্যমব্যক্তং পর্য্যুপাসতে, গীতা নিজের সমন্বয়ের কাঠামোর মধ্যে তাহাদের পন্থাকেও স্থান দিয়াছে। যাহারা এই পন্থার অনুসরণ করে তাহারাও পুরুষোত্তমকে, পরম দিব্য পুরুষকে, সর্বভূতের পরম আত্মাকে, ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হয়, তে প্রাপ্নুবন্তি মামের। কারণ তাঁহার যে ঊর্ধ্বতম স্বপ্রতিষ্ঠ ভাব তাহা অচিন্ত্যই, অচিন্ত্যরূপম্, তাহা এক কল্পনাতীত সদ্বস্তু, সারাৎসার পরাৎপর, বুদ্ধির নির্ধারণের বহু ঊর্ধ্বে। যে নেতিমূলক নিষ্ক্রিয়তা, নীরব নিশ্চলতা, জীবন ও কর্মবর্জনের পন্থা দ্বারা মানুষ এই বোধাতীত নিরুপাধিক বস্তুর সন্ধান করে, গীতার দার্শনিক চিন্তায় তাহা স্বীকৃত ও অনুমোদিত হইয়াছে, কিন্তু তাহা কেবল একটা গৌণ অনুমতি মাত্র। এই নেতিমূলক জ্ঞান সত্যের কেবল একটা দিককে ধরিয়া শাশ্বতের দিকে অগ্রসর হয়, আর সেই দিকটার অনুসরণ হইতেছে দেহধারী প্রাকৃত জীবের পক্ষে

অতিশয় কঠিন, দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে; ইহা এক অতিশয় সঙ্কীর্ণ, এমনকি অনাবশ্যক দুষ্করতার পথ অবলম্বন করিয়া চলে, ক্ষুরস্য ধারাঃ নিশিতের দুরত্যয়া। সকল সম্বন্ধকে অস্বীকার করিয়া নহে, পরন্তু সকল সম্বন্ধের ভিতর দিয়াই মানুষ স্বাভাবিকভাবে অনন্ত ভগবানের দিকে অগ্রসর হইতে পারে, সর্বাপেক্ষা সহজভাবে, ব্যাপকভাবে, অন্তরঙ্গভাবে তাঁহাকে ধরিতে পারে। এই যে বিশ্বমাঝে মানুষের মন, প্রাণ, দেহের জীবনের সহিত সকল সম্বন্ধ হইতে বিচ্যুত করিয়া পরমেশ্বরকে দেখা, অব্যবহার্য্যম্, এইটি বস্তুত প্রশস্ততম ও সত্যতম সত্যও নহে; আর যাহাকে বস্তুসকলের ব্যবহারিক সত্য বলা হয়, সম্বন্ধমূলক সত্য, সেইটিও উচ্চতম আধ্যাত্মিক সত্যের, পরমার্থের, সম্পূর্ণ বিপরীত নহে। বরঞ্চ সহস্র সম্বন্ধের ভিতর দিয়াই আমাদের মানবজীবনের সহিত পরম শাশ্বত বস্তুর নিগূঢ় স্পর্শ ও সংযোগ রহিয়াছে, আর আমাদের প্রকৃতির এবং বিশ্বের প্রকৃতির সকল মূলধারাকে ধরিয়াই, সর্ব্বভাবেন, সেই স্পর্শকে সুস্পষ্ট করিয়া তোলা যায়, ইচ্ছাশক্তি ও বুদ্ধির নিকট সত্য করিয়া তোলা যায়। অতএব এই অপর পন্থাটি মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক ও সহজ, সুখম্ আপ্তুম্। ভগবান নিজেকে এমন করিয়া রাখেন নাই যাহাতে তাঁহাকে পাওয়া আমাদের পক্ষে কঠিন হয়; কেবল একটি মাত্র জিনিসের প্রয়োজন, একটি দাবি পূরণ করা চাই, চাই আমাদের অজ্ঞানের আবরণকে দীর্ণ করিবার একাগ্র অদম্য সঙ্কল্প, যাহা সকল সময়েই আমাদের নিকটে রহিয়াছে, আমাদের মধ্যে রহিয়াছে, যাহা আমাদের মূল সত্তা ও অধ্যাত্মসার, আমাদের ব্যক্তিকতা ও নৈর্ব্যক্তিকতার, আমাদের আত্মা ও প্রকৃতির নিগূঢ় তত্ত্ব, চাই তাহাকে মন ও হৃদয় ও প্রাণ দিয়া সমগ্রভাবে, অবিরতভাবে সন্ধান করা। আমাদের পক্ষে কেবল এই একটি জিনিসই কঠিন, বাকী যা কিছু আমাদের জীবনের পরম অধীশ্বর নিজেই সব দেখিবেন, নিজেই সব সম্পন্ন করিয়া দিবেন, অহম্ ত্বাম্ মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।

গীতার সমন্বয়মূলক শিক্ষা যেখানে শুদ্ধ জ্ঞানের দিকে সর্বাপেক্ষা বেশী ঝোঁক দিয়াছে, আমরা দেখিয়াছি যে ঠিক সেইখানেই গীতা অবিরত এই পূর্ণতর সত্যের ও অধিকতর ফলদায়ক উপলব্ধির পথ পরিষ্কার করিয়াছে। বস্তুত, গীতা স্বপ্রতিষ্ঠ অক্ষর সত্তার উপলব্ধিকে যে রূপ দিয়াছে তাহাতেই উহা উপলক্ষিত হইয়াছে। মনে হয় বটে যে, সর্বভূতের সেই অক্ষর আত্মা প্রকৃতির কর্মপরাম্পরায় সাক্ষাৎভাবে যোগদান না করিয়া সরিয়া রহিয়াছে, কিন্তু সেই অক্ষর আত্মা একেবারে সকল সম্বন্ধশূন্য নহে, সকল প্রকার সংযোগ হইতে সুদূরে নহে। তাহা আমাদের সাক্ষী ও ভর্তা, নীরবে, নৈর্ব্যক্তিকভাবে অনুমতি দিতেছে, এমনকি উদাসীনভাবে ভোগের আনন্দও গ্রহণ করিতেছে। জীব যখন সেই শান্ত আত্মপ্রতিষ্ঠায় অবস্থিত তখনও প্রকৃতির বহুমুখী ক্রিয়া সম্ভব, কারণ সাক্ষী আত্মা হইতেছে অক্ষর পুরুষ, আর প্রকৃতির সহিত পুরুষের সকল সময়েই কিছু সম্বন্ধ রহিয়াছে। কিন্তু এই যে নিশ্চেষ্টতা ও সক্রিয়তা একই সঙ্গে দুইটা দিক, ইহার

সম্পূর্ণ অর্থটি এক্ষণে প্রকাশিত হইতেছে—কারণ নিষ্ক্রিয় সর্বব্যাপী আত্মা ভগবানের কেবল একটা দিকের সত্য মাত্র। যিনি এক অপরিবর্তনীয় আত্মারূপে জগতে ব্যাপ্ত থাকিয়া ইহার সকল পরিবর্তনকে ধরিয়া রাখিয়াছেন, তিনিই আবার মানুষের মধ্যে অবস্থিত ভগবান, সর্বভূতের হৃদ্দেশে অধিষ্ঠিত ঈশ্বর, আমাদের সকল আভ্যন্তরীণ বিকাশ এবং সকল অন্তর্মুখী ও বহির্মুখী বাস্তব কর্মধারার সচেতন কারণ ও প্রভু। যিনি যোগীদের ঈশ্বর তিনিই জ্ঞানপন্থীদের ব্রহ্ম, এক পরম ও বিশ্বব্যাপী আত্মা, এক পরম ও বিশ্বব্যাপী ভগবান।

লৌকিক ধর্মসকলের যে সীমাবদ্ধ সগুণ ভগবান, এই ভগবান তাহা নহেন; কারণ সেসব হইতেছে ইহার কেবল আংশিক ও বাহ্যিক রূপায়ণ, ভগবানের সত্তার যে পরিপূর্ণ সত্য ইনি তাহারই ব্যক্তিকতার দিক, স্রষ্টা ও পরিচালক। ইনি হইতেছেন অদ্বিতীয় পরম পুরুষ, আত্মা, সৎ—সকল দেবতারা এই পুরুষের এক একটি দিক, সকল ব্যষ্টিগত রূপ বিশ্বপ্রকৃতিতে তাঁহারই খণ্ড বিকাশ। ভক্তের যে ইষ্টদেবতা, ভক্ত তাহার বুদ্ধি দিয়া ভগবানের যে বিশিষ্ট নামরূপের পরিকল্পনা করে, বা যে বিগ্রহ তাহার হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষার অনুযায়ী ইনি তাহা নহেন। যিনি সকল ভক্তের, সকল ধর্মের বিশ্বজনীন ঈশ্বর, এই সমস্ত নামরূপ সেই এক দেবের বিভিন্ন শক্তি, বিভিন্ন মুখ; কিন্তু ইনি নিজেই সেই বিশ্বদেব, দেব-দেব। এই ঈশ্বর ভ্রমাত্মিকা মায়ার নির্গুণ অনির্দেশ্য ব্রহ্মের প্রতিবিম্বমাত্র নহেন, কারণ সকল বিশ্বের অতীতে থাকিয়া, আবার ইহার মধ্যেও থাকিয়া তিনি নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন এবং তিনি জগৎসকলের এবং জাগতিক জীবসকলের অধীশ্বর। তিনি পরব্রহ্ম, তিনিই পরমেশ্বর কারণ তিনি পরম আত্মা ও পরম পুরুষ এবং তাঁহার ঊর্ধ্বতম মূল সত্তা হইতে তিনি এই বিশ্বকে উৎপন্ন করিতেছেন, পরিচালিত করিতেছেন, নিজেকে মোহাবিষ্ট করিয়া নহে, পরন্তু সর্ববিদ্ সর্বশক্তিমত্তা লইয়া। আর বিশ্বমাঝে তাঁহার দিব্য প্রকৃতির যে লীলা সেটিও তাঁহার কিংবা আমাদের চেতনার একটা ভ্রান্তিমাত্র নহে। একমাত্র ভ্রমাত্মিকা মায়া হইতেছে নীচের প্রকৃতির অজ্ঞান, তাহা এক অদ্বিতীয় অনির্দেশ্যের অলক্ষ্য ভূমিকার উপরে অসদ্ বস্তুসকল সৃষ্টি করিতেছে না, পরন্তু তাহার ক্রিয়া অন্ধ, ভারাক্রান্ত, সীমাবদ্ধ, সেইজন্য সৃষ্টির গভীরতর সত্যসকলকে সে অহংয়ের রূপের, মন, প্রাণ, জড়ের অন্যান্য অসম্পূর্ণ রূপের ভিতর দিয়া বিকৃতভাবে মানবমনের সম্মুখে ধরিতেছে। এক পরা ভগবৎপ্রকৃতি আছে, তাহাই এই বিশ্বের প্রকৃত সৃজনকর্ত্রী। সকল জীব, সকল বস্তু সেই একই ভগবৎসত্তার বিভিন্ন রূপ; সকল জীবনলীলা একই ঈশ্বরের শক্তির লীলা; সকল প্রকৃতি একই অনন্তের অভিব্যক্তি। তিনি মানুষের অন্তরে ভগবান, জীব তাঁহারই সত্তার সত্তা। তিনি বিশ্বের মধ্যে ভগবান, এই দেশ ও কালের জগৎ তাঁহারই প্রাতিভাসিক আত্মবিস্তার।

সৃষ্টির ও সৃষ্টির অতীত সত্য সম্বন্ধে দৃষ্টির এই ব্যাপকতার জন্যই গীতোক্ত যোগ তাহার সমন্বয়মূলক সার্থকতা ও অতুলনীয় পরিপূর্ণতা লাভ করিয়াছে। যাহা

কিছু আছে সেসবের মধ্যে এই পরম ভগবানই এক অপরিবর্তনীয়, অবিনশ্বর আত্মা. অতএব এই পরিবর্তনরহিত, বিনাশরহিত আত্মার আধ্যাত্মিক উপলব্ধিতে মানুষকে জাগ্রত হইতে হইবে এবং ইহার সহিত তাহার আভ্যন্তরীণ নৈর্ব্যক্তিক সত্তাকে যুক্ত করিতে হইবে। তিনি মানুষের অন্তরস্থিত ভগবান, মানুষের সকল ক্রিয়া উৎপাদন করিতেছেন, পরিচালন করিতেছেন, অতএব মানুষকে তাহার অন্তরস্থিত ভগবান সম্বন্ধে জাগ্রত হইতে হইবে, যে ভগবৎসত্তাকে সে ধারণ করিয়া রহিয়াছে তাহাকে জানিতে হইবে, যাহা কিছু ইহাকে আবৃত করিয়া রাখে, আচ্ছন্ন করিয়া রাখে সেসবকেই ছাড়াইয়া উঠিতে হইবে এবং তাহার সত্তার এই অন্তরতম সত্তার সহিত যুক্ত হইতে হইবে, তাহার চৈতন্যের এই মহত্তর চৈতন্য, তাহার সকল ইচ্ছা সকল কর্মের এই প্রচ্ছন্ন অধীশ্বর, তাহার মধ্যে এই যে সত্তা অবস্থিত রহিয়াছে—যাহা তাহার বিভিন্ন আত্মপ্রকাশের মূল ও লক্ষ্য, তাহার সহিত তাহাকে যুক্ত হইতে হইবে। ভগবান তিনি, তাঁহার যে দিব্য প্রকৃতি আমরা, যাহা কিছু সেই সমুদয়ের মূল, তাহা এই সব নীচের প্রাকৃত সৃষ্টির দ্বারা গভীরভাবে আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে, অতএব মানুষকে তাহার নীচের আপাতদৃশ্য জীবন হইতে, এই অপূর্ণ ও মৃত্যুময় জীবন হইতে নিবৃত্ত হইয়া তাহার সেই মূল অধ্যাত্ম প্রকৃতিতে ফিরিয়া যাইতে হইবে, যাহার স্বরূপ অমৃতত্ব ও পূর্ণতা। এই ভগবানের যাহা কিছু আছে সে সকল বস্তুর মধ্যে এক, তিনি সেই আত্মা যাহা সর্বভূতের মধ্যে রহিয়াছে এবং যাহার মধ্যে সর্বভূত রহিয়াছে, চলিতেছে ফিরিতেছে, অতএব মানুষকে আবিষ্কার করিতে হইবে সকল জীবের সহিত তাহার অধ্যাত্ম ঐক্য, সর্বভূতকে আত্মার মধ্যে এবং আত্মার মধ্যে সর্বভূতকে দেখিতে হইবে, এমনকি সকল বস্তু সকল জীবকে আপনার মত করিয়াই দেখিতে হইবে, আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র, এবং তদনুযায়ী তাহার সকল মনে ইচ্ছায় জীবনে চিন্তা করিতে হইবে, অনুভব করিতে হইবে, কর্ম করিতে হইবে। এখানে বা অন্যত্র যাহা কিছু আছে, এই ভগবানই সে সমুদয়ের আদি এবং তিনি তাঁহার প্রকৃতির দ্বারা এই অসংখ্য সৃষ্ট বস্তু হইয়াছেন, অভূৎ সর্ব্বভূতানি; অতএব মানুষকে চেতন অচেতন সকল বস্তুর মধ্যেই সেই এক অদ্বিতীয়কে দেখিতে হইবে, আরাধনা করিতে হইবে, সূর্যে, নক্ষত্রে, পুষ্পে তাঁহার যে প্রকাশ, মানুষ এবং প্রত্যেক প্রাণীর মধ্যে তাঁহার যে প্রকাশ, প্রকৃতির বিভিন্ন রূপ, বিভিন্ন গুণ ও শক্তির মধ্যে তাঁহার যে প্রকাশ, সবেরই পূজা করিতে হইবে, বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি। দিব্য দৃষ্টি ও দিব্য ঐক্যানুভূতির দ্বারা এবং সর্বশেষে নিবিড় আভ্যন্তরীণ একত্বের দ্বারা তাহাকে বিশ্বের সহিত এক বিশ্ব-ব্যাপকত্ব লাভ করিতে হইবে। নিশ্চেষ্ট, সকল সম্বন্ধরহিত একত্বের মধ্যে প্রেম ও কর্মের কোনও স্থান নাই, কিন্তু এই যে বৃহত্তর ও পূর্ণতর ঐক্য ইহা কর্ম ও শুদ্ধ হৃদয়াবেগের ভিতর দিয়া নিজেকে সিদ্ধ করিয়া তোলে, ইহাই হইয়া উঠে আমাদের সকল কর্মের সকল অনুভবের আধার, উৎস, সারবস্তু, প্রেরণা, দিব্য উদ্দেশ্য। কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম, কোন্ দেবতাকে আমরা

আমাদের সমগ্র জীবন ও কর্ম অর্পণ করিব? ইনিই সেই ভগবান, সেই ঈশ্বর যিনি আমাদের আত্মবলি দাবি করিতেছেন। নিশ্চেষ্ট সকল সম্বন্ধশূন্য যে একত্ব তাহার মধ্যে পূজা ও ভক্তির আনন্দের কোনও স্থান নাই; কিন্তু এই যে সমৃদ্ধতর, পূর্ণতর, নিবিড়তর মিলন, ইহার আত্মা ও হৃদয় ও শীর্ষ হইতেছে ভক্তি। এই ভগবানই আমাদের পিতা, মাতা, প্রেমাস্পদ, বন্ধু, সকল সম্বন্ধের পূর্ণ পরিণতি, সকল জীবের আত্মার আশ্রয়। তিনিই গুহ্যবিদ্যার বিষয় সেই এক পরম ও বিশ্বদেব, আত্মা, পুরুষ, ব্রহ্ম, ঈশ্বর। তিনি তাঁহার দিব্য যোগের দ্বারা এইসকল ভাবেই জগৎকে নিজের মধ্যে প্রকট করিয়াছেন, ইহার অসংখ্য সত্তাসকল তাঁহার মধ্যে এক এবং তিনি তাঁহাদের মধ্যে নানারূপে, নানাভাবে এক। মানুষের দিক দিয়া সেই একই দিব্য যোগ হইতেছে, যুগপৎ তাঁহার এই সকল ভাবে আত্মপ্রকাশ সম্বন্ধে জাগ্রত হওয়া।

এইটিই যে তাঁহার শিক্ষার পরম ও পূর্ণ সত্য, তিনি যাহা প্রকাশ করিতে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন এইটিই যে সেই সমগ্র জ্ঞান, তাহা সম্পূর্ণ ও নিঃসন্দেহভাবে স্পষ্ট করিবার জন্য অবতারপুরুষ এতক্ষণ যাহা বলিতেছিলেন তাহার সার সঙ্কলন করিয়া ঘোষণা করিলেন যে, ইহাই তাঁহার পরম বাক্য, ইহা ভিন্ন অন্য কিছু নহে, ভূয় এব শৃণু মে পরমং বচঃ।[১] আমরা দেখিতে পাই গীতার এই পরম বাক্য হইতেছে, প্রথমত এই স্পষ্ট ঘোষণা যে, সৃষ্টিতে যাহাকিছু রহিয়াছে সেসবেরই পরম ও দিব্য উৎসরূপে, সকল বস্তু যাহার সত্তা হইতে উদ্ভূত, জগতের এবং জগৎবাসী সকল জীবের সেই মহান অধীশ্বররূপে শাশ্বতকে জানা ও আরাধনা করা—ইহাই হইতেছে শাশ্বতের উচ্চতম জ্ঞান, উচ্চতম আরাধনা। দ্বিতীয়ত, ইহা হইতেছে জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয়কে শ্রেষ্ঠতম যোগ বলিয়া ঘোষণা; শাশ্বত ভগবানের সহিত যুক্ত হইতে হইলে, মানুষের পক্ষে এইটিই হইতেছে নির্ধারিত ও স্বাভাবিক পন্থা। পন্থাটির এই সংজ্ঞাকে আরও অর্থগৌরবপূর্ণ করিবার নিমিত্ত, এবং এই যে ভক্তি জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত, জ্ঞানের দিকে উন্মুক্ত এবং ভগবদ্‌নির্দিষ্ট কর্মের ভিত্তি ও অনুপ্রেরণা-শক্তিস্বরূপ, ইহার শ্রেষ্ঠতাকে সুস্পষ্ট করিবার নিমিত্ত, শিষ্যের হৃদয় ও মন দ্বারা ইহাকে গ্রহণ করার প্রয়োজন এখানে সূচিত হইল; এই ধারার অনুসরণ করিয়াই অতঃপর মানবযন্ত্র অর্জুনের প্রতি কর্মের চরম আদেশ প্রদত্ত হইবে। ভগবান বলিলেন, "তোমার আত্মার কল্যাণকামনায় পরম বাক্য আমি তোমাকে বলিব, কারণ তোমার হৃদয় এখন আমাতেই প্রীতি অনুভব করিতেছে", তে প্রীয়মাণায় বক্ষ্যামি। কারণ ভগবানে হৃদয়ের এই যে প্রীতি, ইহাই হইতেছে যথার্থ ভক্তির সমগ্র সার ও উপাদান। পরম বাক্যটি উচ্চারিত হইবামাত্র অর্জুনকে তাহা স্বীকার

[১] ভূয় এব মহাবাহো শৃণু মে পরমং বচঃ।
যৎ তেঽহং প্রীয়মাণায় বক্ষ্যামি হিতকাম্যয়া॥১০।১

করিয়া লইতে হইল এবং জিজ্ঞাসা করিতে হইল, কি উপায়ে ব্যবহারত প্রকৃতির সকল বস্তুতেই ভগবানকে দেখিতে পারা যায়। এই প্রশ্নের সাক্ষাৎ ও সহজ পরিণাম হইল ভগবানকে বিশ্বের আত্মারূপে দর্শন, এবং সেই সঙ্গেই জগতের যুগান্তরকারী কর্মের মহান আদেশ সংঘোষিত হইল।

গীতা ভগবান সম্বন্ধে যে পরিকল্পনাকে সৃষ্টির সমগ্র রহস্য বলিয়া, মুক্তিপ্রদ জ্ঞান বলিয়া জোর দিয়াছে, তাহার দ্বারা বিশ্বাতীত আনন্তের সহিত কালাধীন বিশ্বলীলার সমন্বয় সাধিত হয়, অথচ উভয়ের কোনটিকেই অস্বীকার করা হয় না, কাহারও বাস্তবতা কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ করা হয় না। সর্বেশ্বরবাদ তত্ত্ব, ঈশ্বরবাদ তত্ত্ব, উচ্চতম সত্তা সম্বন্ধীয় তত্ত্ব, আমাদের আধ্যাত্মিক অনুভূতি উপলব্ধির এই সকল বিভিন্ন ধারার গীতা সামঞ্জস্য সাধন করিয়াছে। ভগবান অজ, শাশ্বত, অনাদি; যাহা হইতে তাঁহার উৎপত্তি হইতে পারে, তাঁহার পূর্ববর্তী এমন কোনও বস্তু নাই, থাকিতে পারে না, কারণ তিনি এক অদ্বিতীয় ও কালাতীত ও পূর্ণতম পরম বস্তু। 'কি দেবগণ কি মহর্ষিগণ কেহই আমার উৎপত্তি অবগত নহেন...যিনি আমাকে অজ অনাদি বলিয়া জানেন"[১]. .এইগুলিই হইতেছে সেই পরম বাক্যের প্রথম কথা। আর তাহা এই সমুচ্চ আশ্বাস দিতেছে যে, এই জ্ঞান সঙ্কীর্ণ মানসিক জ্ঞান নহে পরন্তু শুদ্ধ অধ্যাত্ম জ্ঞান—কারণ তাঁহার রূপ ও প্রকৃতি (যদি বিশ্বাতীত পুরুষ সম্বন্ধে এরূপ ভাষা প্রয়োগ করা চলে) মনের ধারণার অতীত 'অচিন্ত্যরূপ'—এই জ্ঞান মরমানবকে অজ্ঞানের সকল মোহ হইতে এবং পাপের সকল বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া দেয়। যে মানবাত্মা এই পরম অধ্যাত্মজ্ঞানের জ্যোতিতে বাস করিতে পারে, সে ইহার দ্বারা বিশ্বের মনঃকল্পিত ভাবমূর্তি ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপ সকলের ঊর্ধ্বে উত্তোলিত হয়। সে এমন এক ঐক্যের অনির্বচনীয় শক্তির মধ্যে উঠিয়া যায় যাহা সবকিছুকে অতিক্রম করিয়া রহিয়াছে অথচ সকলকেই সার্থক করিয়া তুলিতেছে; তাহা এখানেও যেমন, ঊর্ধ্বেও তেমনই। বিশ্বাতীত অনন্ত সম্বন্ধে এই যে অধ্যাত্ম উপলব্ধি, ইহার দ্বারা সর্বেশ্বরবাদের (Pantheism) সঙ্কীর্ণতা অতিক্রমিত হয়। যে অদ্বৈতবাদ ভগবানকে বিশ্বের সহিত এক বলিয়া দেখে, সে তাহার পরিকল্পিত অনন্ত ভগবানকে তাঁহার বিশ্বপ্রকাশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিতে চায়, এবং সেইটিকেই তাঁহাকে জানিবার একমাত্র উপায় বলিয়া আমাদিগকে দেখাইয়া দেয়; কিন্তু ঐ যে উপলব্ধি, উহা আমাদিগকে দেশ ও কালের অতীত শাশ্বতের মধ্যে মুক্তি দেয়। অর্জুন প্রত্যুত্তরে বলিলেন, "কি দেব, কি দানব, কেহই তোমার অভিব্যক্তি জানে না", সমগ্র বিশ্ব, এমনকি অসংখ্য বিশ্ব মিলিয়াও তাঁহাকে

[১] ন মে বিদুঃ সুরগণাঃ প্রভবং ন মহর্ষয়ঃ।
অহমাদিহি দেবানাং মহর্ষীণাঞ্চ সর্ব্বশঃ॥
যো মামজমনাদিঞ্চ বেত্তি লোকমহেশ্বরম্।
অসংমূঢ়ঃ স মর্ত্ত্যেষু সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥১০।২-৩

অভিব্যক্ত করিতে পারে না, তাঁহার অনির্বচনীয় জ্যোতি, অনন্ত মহত্ত্ব ধারণ করিতে পারে না। অন্যান্য নিম্নতর যে ভগবদ্‌জ্ঞান, বিশ্বাতীত ভগবানের চির অব্যক্ত অনির্বচনীয় সত্তাকে ধরিয়াই তাহারা প্রকৃত সত্য হয়।

কিন্তু সেই সঙ্গেই আবার ইহাও সত্য যে, বিশ্বাতীত ভগবৎসত্তা কেবল একটা নেতি নহে, অথবা বিশ্বের সহিত সকল সম্বন্ধশূন্য নির্বিশেষ তৎস্বরূপ নহে। তাহা এক পরম সদ্বস্তু, সকল পূর্ণতার পূর্ণতা। বিশ্বের সকল সম্বন্ধ এই পরম হইতেই উদ্ভূত; সকল বিশ্বসৃষ্টি তাঁহার মধ্যেই ফিরিয়া যায় এবং কেবল তাঁহার মধ্যে গিয়াই তাহাদের সত্য এবং অপরিমেয় সত্তা প্রাপ্ত হয়। "কারণ আমিই দেবগণের ও মহর্ষিগণের সর্বথা উৎপত্তির হেতু।" দেবতাগণ হইতেছেন সেই সকল অক্ষয় শক্তিপুঞ্জ ও অমর ব্যক্তি, যাঁহারা সজ্ঞানে বিশ্বের আন্তরিক ও বাহ্যিক শক্তিসমূহকে অনুপ্রাণিত করিতেছেন, গঠন করিতেছেন, পরিচালিত করিতেছেন। দেবতাগণ হইতেছেন শাশ্বত ও আদি দেবের আধ্যাত্মিক রূপ, তাঁহারা তাঁহা হইতেই নামিয়া আসিয়াছেন জগতের বহুমুখী ক্রিয়ার মধ্যে। দেবতারা বহু ও বিশ্বরূপী—তাঁহারা সত্তার মূল তত্ত্বগুলি এবং তাহার সহস্র বৈচিত্র্য লইয়া একের এই নানামুখী লীলা রচনা করিতেছেন। তাঁহাদের নিজেদের অস্তিত্ব, প্রকৃতি, শক্তি, ক্রিয়া, সমস্তই সর্বপ্রকারে, সকল সূত্রে এবং প্রত্যেক অংশে সেই বিশ্বাতীত অনির্বচনীয় সত্তা হইতে আসিতেছে। এই দিব্য প্রতিনিধিগণের দ্বারা এখানে কিছুই স্বাধীনভাবে সৃষ্ট হয় না, কোনও জিনিসই নিরপেক্ষভাবে উদ্ভাবিত হয় না, প্রত্যেক বস্তুর মূল ও কারণ, তাহার সত্তার ও আত্মপ্রকাশপ্রবৃত্তির আধ্যাত্মিক হেতু রহিয়াছে বিশ্বাতীত ভগবানের মধ্যেই, অহম্ আদিঃ সর্ব্বশঃ। বিশ্বের কোনও জিনিসেরই প্রকৃত কারণ বিশ্বের মধ্যে নাই, সমস্তই আসিতেছে সেই বিশ্বাতীত সত্তা হইতে।

যে সকল মহর্ষিকে বেদের ন্যায় এখানেও সপ্ত আদি ঋষি বলা হইয়াছে,[১] মহর্ষয়ঃ সপ্ত পূর্ব্বে, তাঁহারা হইতেছেন ভগবদ্ প্রজ্ঞার ধী-শক্তি, সেই প্রজ্ঞা নিজের আত্মচেতন অনন্ততা হইতে সকল বস্তুকে উৎপন্ন করিয়াছে, প্রজ্ঞা পুরাণী—নিজের মূল সত্তার সাতটি তত্ত্ব ক্রম অনুসারে বিকশিত করিয়াছে। এই ঋষিগণ হইতেছেন, বেদের সপ্ত ধীয়াঃ, সর্বধারক, সর্ব-উদ্ভাসক, সর্বপ্রকাশক সপ্ত ধী-শক্তির বিগ্রহমূর্তি—উপনিষদ সকল জিনিসকেই বর্ণনা করিয়াছে সপ্তে সপ্তে সাজানো। ইহাদের সহিত যুক্ত হইয়াছে মানবের পিতা চারি শাশ্বত মনু, চত্বারো মনবস্তথা—কারণ ভগবানের যে কর্মপরা প্রকৃতি তাহা চতুর্মুখী এবং মানুষ তাহার চতুর্মুখী স্বভাবের ভিতর দিয়া এই প্রকৃতিকে প্রকাশ করিতেছে। ইহারাও মানসিক সত্তা, ইহাদের নাম হইতেই তাহা প্রকাশ পায়। জীবনের যেসব ক্রিয়া আমরা

[১] মহর্ষয়ঃ সপ্ত পূর্ব্বে চত্বারো মনবস্তথা।
মদ্‌ভাবা মানসা জাতা যেষাং লোক ইমাঃ প্রজাঃ॥১০।৬

দেখিতে পাই, তাহারা নির্ভর করিতেছে প্রচ্ছন্ন বা প্রকট মনের উপর, উহারা হইতেছেন এই সমুদয়ের সৃষ্টিকর্তা, জগতের এই সকল সজীব প্রাণী তাঁহাদের দ্বারাই উদ্ভূত হইয়াছে, সকলেই তাঁহাদের সন্তান, যেষাং লোক ইমাঃ প্রজাঃ। আর এই সকল মহর্ষি এবং এই চারি মনু, ইঁহারা নিজেরাও হইতেছেন পরমাত্মার নিত্য মানস সৃষ্টি, মদ্‌ভাবা মানসা জাতা, তাঁহার বিশ্বাতীত অধ্যাত্ম সত্তা হইতে বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে আবির্ভূত—তাঁহারা স্রষ্টা, কিন্তু বিশ্বের যত স্রষ্টা তিনিই তাঁহাদের স্রষ্টা। সকল অধ্যাত্ম সত্তার অধ্যাত্ম সত্তা, সকল অন্তরাত্মার অন্তরাত্মা, মনের মন, প্রাণের প্রাণ, সকল রূপের আভ্যন্তরিক সার বস্তু, এই বিশ্বাতীত পরম পুরুষ আমরা যাহা কিছু, তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত একটা কিছু নহেন, অন্যপক্ষে আমাদের ও জগতের, সত্তার ও প্রকৃতির, সকল সূত্র, সকল শক্তি তাঁহার দ্বারাই সৃষ্ট, তাঁহার দ্বারাই উদ্ভাসিত।

আমাদের জীবনের এই যে বিশ্বাতীত উৎস, তাঁহার ও আমাদের মধ্যে কোনও অনতিক্রমণীয় ব্যবধানের বিচ্ছেদ নাই, যে সকল জীব তাঁহা হইতে উদ্ভূত হইয়াছে তিনি তাহাদিগকে অস্বীকার করেন না অথবা তাহাদিগকে কেবল মায়ার বিজৃম্ভন বলিয়া উড়াইয়া দেন না। তিনি সৎ (the Being), আর সবকিছু তাঁহারই প্রকাশ (becomings)। তিনি একটা শূন্য হইতে, একটা "নাস্তি" হইতে অথবা একটা অবাস্তব স্বপ্নের মধ্য হইতে সৃষ্টি করেন না। তিনি নিজের মধ্য হইতেই সৃষ্টি করেন, নিজেই সৃষ্ট হন; সকলেই তাঁহার সত্তার মধ্যে, সকলেই তাঁহার সত্তার অংশ। এই যে সত্য ইহা সর্বেশ্বরবাদমূলক দৃষ্টিকে স্বীকার করিয়াও অতিক্রম করিয়া যায়। বাসুদেবই সব, বাসুদেবঃ সর্ব্বম্, কিন্তু বিশ্বে যাহা কিছু আবির্ভূত সেই সমুদয়ই বাসুদেব এই জন্য যে, যাহা কিছু এখানে আবির্ভূত হয় নাই, যাহা কিছু কখনও প্রকট হয় না সেসবও তিনি। তাঁহার সত্তা তাঁহার প্রকাশের দ্বারা কোনরূপে খণ্ডিত হয় না, এই সম্বন্ধের জগতের দ্বারা তিনি এতটুকুও সম্বন্ধ নহেন। যখন তিনি সবকিছু হইতেছেন তখনও তিনি বিশ্বাতীত; যখন তিনি সান্ত রূপ গ্রহণ করিতেছেন তখনও তিনি নিত্য অনন্ত। প্রকৃতি (Nature) তাহার মূল সত্তায় তাঁহারই অধ্যাত্ম শক্তি, আত্মশক্তি; এই অধ্যাত্ম আত্মশক্তি বস্তুসকলের প্রকাশের জন্য তাহাদের আভ্যন্তরীণ প্রকৃতিস্বরূপ অসংখ্য মূল গুণ সৃষ্টি করে এবং তাহাদিগকেই বাহিরের রূপে ও কর্মে প্রকট করে। কারণ, সে শক্তির যে মৌলিক, নিগূঢ়, দিব্য ক্রমবিন্যাস তাহাতে প্রত্যেক বস্তুরই অধ্যাত্ম সত্যটি আসে প্রথমে, তাহা হইতেছে প্রকৃতির গভীরতম একত্বের জিনিস; যে গুণ ও প্রকৃতি তাহাদের মনস্তত্ত্বের সত্য তাহার মধ্যে যথার্থ বস্তু যাহা আছে সেসব নির্ভর করিতেছে ঐ অধ্যাত্ম সত্যের উপর, তাহা আত্মা হইতেই উদ্ভূত; রূপ ও কর্মের যে বাহ্যিক সত্য প্রয়োজনীয়তায় ন্যূনতম এবং ক্রমবিন্যাসে সর্বশেষ, তাহা প্রকৃতির আভ্যন্তরিক গুণ হইতে উদ্ভূত এবং বাহ্য জগতে এই সকল বিচিত্র প্রকাশের জন্য সর্বতোভাবে তাহারই উপর নির্ভর করে। অথবা অন্য কথায় বলা যাইতে পারে

যে, বাহিরের সত্য হইতেছে কেবল অন্তরাত্মার শক্তিসমষ্টির বহিঃপ্রকাশ, এবং সর্বদাই তাহাদের পিছনে তাহাদের বহিঃপ্রকাশের অধ্যাত্ম কারণটি বর্তমান রহিয়াছে।

এই যে সান্ত বাহ্য সৃষ্টি, ইহার ভিতর দিয়া অনন্ত ভগবানই প্রকটিত হইতেছেন। অপরা প্রকৃতি প্রকৃতির গৌণরূপ; অনন্তের মধ্যে সংযোজনার যে বহু সম্ভাবনা নিহিত রহিয়াছে তাহাদের মধ্য হইতে নির্বাচিত কয়েকটির একটা অধস্তন পরিণতি হইতেছে এই অপরা প্রকৃতি। সত্তার যে মূল গুণ ও আত্মপ্রকাশের ধারা তাহা হইতে উদ্ভূত এই সকল সংযোজনা, রূপ ও শক্তির, কর্ম ও গতির সংযোজনা, ইহারা জগৎ ঐক্যের মধ্যে রহিয়াছে সম্পূর্ণ সীমাবদ্ধ সম্বন্ধের ও পারস্পরিক অনুভূতি উপলব্ধির জন্য। আর এই নীচের বাহ্যিক পরিদৃশ্যমান ব্যবস্থায় ভগবানের প্রকাশশক্তি-রূপা প্রকৃতি এক মোহাচ্ছন্ন বিশ্বগত অবিদ্যার বিকৃতির দ্বারা স্বরূপ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া রহিয়াছে, এবং আমাদের মানসিক ও প্রাণিক অনুভূতির জড়ানুগত, ভেদাত্মক ও অহংভাবমূলক ক্রিয়ায় নিজের দিব্য সত্যসকলকে হারাইয়া ফেলিয়াছে। তথাপি এখানেও সবকিছুই ভগবান হইতে আসিতেছে, সবকিছুই হইতেছে প্রভাব, ভাব, প্রবৃত্তি, বিশ্বাতীত সত্তার মধ্য হইতে প্রকৃতির ক্রিয়ার ভিতর দিয়া বিকাশধারা। অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে, "আমি সকলের উৎপত্তিস্থল, আমা হইতে বাহির হইয়া সকলে কর্ম ও গতির বিকাশে চলিয়াছে।" আর ইহা কেবল সেই সব জিনিসের পক্ষেই প্রযোজ্য নহে যাহাদিগকে আমরা ভাল বলি, প্রশংসা করি এবং দিব্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লই, যেসব হইতেছে জ্যোতির্ময়, সাত্ত্বিক, নৈতিক ও শান্তিপ্রদ, অধ্যাত্মভাবে আনন্দপ্রদ,[১] "বুদ্ধি, জ্ঞান, অসংমোহ, ক্ষমা, সত্য, দম, শম, অহিংসা, সমতা, তুষ্টি, তপস্যা ও দান।" পরন্তু ইহা সেই সব বিপরীত জিনিসসকলের পক্ষেও যাহারা মরমানবের মনকে বিভ্রান্ত করিয়া তোলে এবং অজ্ঞান ও তাহার সংমোহ লইয়া আসে, "সুখ ও দুঃখ, জন্ম ও মৃত্যু, ভয় ও অভয়, যশ ও অযশ", আর এইরূপ বাকী যাহা কিছু জ্যোতি ও অন্ধকারের সংমিশ্রণ হইতে উত্থিত, যেসব অসংখ্য মিশ্রিত তন্ত্রী এমনই বেদনায় স্পন্দিত হইতেছে অথচ আমাদের দেহ ও ইন্দ্রিয়ের অধীন মন ও তাহার অজ্ঞান ভাবসকলে জড়িত হইয়া অনবরত উত্তেজনায় শিহরিত হইতেছে। জীবগণের এই সব পৃথক পৃথক ভাব এক মহান আত্মপ্রকাশধারার অন্তর্গত এবং যিনি ইহাদের সকলকে অতিক্রম করিয়া রহিয়াছেন তাঁহা হইতেই তাহারা তাহাদের উদ্ভব ও সত্তা লাভ করিয়াছে। বিশ্বাতীত সত্তা এই সমুদয় জিনিসকে জানেন এবং সৃষ্টি করেন, কিন্তু এই

[১] বুদ্ধির্জ্ঞানমসংমোহঃ ক্ষমা সত্যং দমঃ শমঃ।
সুখং দুঃখং ভবোঽভাবো ভয়ঞ্চাভয়মেব চ॥
অহিংসা সমতা তুষ্টিস্তপো দানং যশোঽযশঃ।
ভবন্তি ভাবা ভূতানাং মত্ত এব পৃথগ্‌বিধাঃ॥১০।৪-৫

পৃথগ্‌ভূত জ্ঞানে জড়িত হইয়া পড়েন না, নিজের সৃষ্টির দ্বারা অভিভূত হন না। এখানে আমাদিগকে লক্ষ্য করিতে হইবে ভূ ধাতু (to become—হওয়া) হইতে উৎপন্ন তিনটি কথাকে কেমন একত্র করিয়া জোর দেওয়া হইয়াছে ভবন্তি, ভাবাঃ, ভূতানাম্। ভগবান নিজেই সমস্ত সৃষ্টি হইয়াছেন, ভূতানি; সমস্ত আভ্যন্তরীণ অবস্থা ও ক্রিয়া তাঁহার ও তাহাদের মানসিক ভাব, ভাবাঃ। এই সকলও—যেমন আমাদের উচ্চতম অধ্যাত্ম ভাবসকল ঠিক তেমনই আমাদের নিম্নতর আভ্যন্তরীণ ভাবসকল এবং তাহাদের পরিদৃশ্যমান পরিণামসকল, সমস্তই পরম পুরুষ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, ভবন্তি মত্ত এব[১]। গীতা সত্তা এবং তাহার প্রকাশ এই দুইয়ের প্রভেদ স্বীকার করিয়াছে এবং এই প্রভেদের উপর জোর দিয়াছে, কিন্তু এই প্রভেদকে বিরোধ বলিয়া প্রতিপন্ন করে নাই। কারণ তাহা হইলে বিশ্বগত একত্বকে উড়াইয়া দেওয়া হয়। ভগবান এক, তাঁহার বিশ্বাতীত সত্তার এক, বস্তুসকলের এক সর্বব্যাপী আধাররূপে এক, তাঁহার বিশ্বপ্রকৃতির একত্বে এক। এই তিনই এক অদ্বিতীয় ভগবান, সকলেই তাঁহা হইতে উদ্ভূত, সকলেই তাঁহার সত্তার প্রকট রূপ, সকলেই শাশ্বতের সনাতন অংশ অথবা কালাধীন প্রকাশ। যদি আমাদিগকে গীতার অনুসরণ করিতে হয়, তাহা হইলে বিশ্বাতীত পরম সত্তার মধ্যে সকল জিনিসের চরম নির্বাণ অনুসন্ধান করা চলিবে না, পরন্তু সেখানেই তাহাদের রহস্যের সুমীমাংসার সন্ধান করিতে হইবে, তাহাদের জীবনের সমন্বয়সাধক সত্যের সন্ধান করিতে হইবে।

কিন্তু অনন্তের আরও একটি পরম সত্য আছে, সেটিকেও মুক্তিপ্রদ জ্ঞানের অপরিহার্য অংশরূপে গ্রহণ করিতে হইবে। সেই সত্য হইতেছে এই যে, বিশ্বের দিব্য নিয়ন্তা তাঁহার বিশ্বাতীত পদ হইতে বিশ্বকে নিরীক্ষণ করিতেছেন, আবার ইহার মধ্যেও নিবিড়ভাবে অনুস্যূত রহিয়াছেন। যে পরমেশ্বর নিজে এই সমুদয় সৃষ্টি হইয়াছেন, অথচ ইহাকে অনন্ত গুণে অতিক্রম করিয়া রহিয়াছেন, তিনি সৃষ্টি হইতে নিবৃত্ত কোনও ইচ্ছাশক্তিশূন্য কারণ মাত্র নহেন। এমন নহে যে, এই জগৎ তাঁহার অনিচ্ছাকৃত সৃষ্টি এবং তাঁহার বিশ্বশক্তির এই সকল পরিণামের জন্য তিনি কোনরূপ দায়িত্ব স্বীকার করেন না, অথবা তাঁহার চৈতন্য হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন এক ভ্রমাত্মিকা চৈতন্যের উপর, মায়ার উপর, ঐ সবকে আরোপ করেন, কিংবা সৃষ্টিকে এক যন্ত্রবৎ অন্ধনিয়মের বশে, অথবা কোন প্রতিনিধির হস্তে, অথবা পাপ ও পুণ্যের চির-দ্বন্দ্বের মধ্যে ছাড়িয়া দেন। এমন নহে যে, তিনি উদাসীন সাক্ষীরূপে দূরে সরিয়া রহিয়াছেন, নির্বিকারভাবে অপেক্ষা করিতেছেন, কখন সব কিছু নিজদিগকে লুপ্ত করিয়া দিবে অথবা তাঁহার অবিচল আদি তত্ত্বের মধ্যে ফিরিয়া আসিবে। তিনি জগৎ ও জনসমূহের মহান ঈশ্বর, লোকমহেশ্বরম্, তিনি

[১] যথা উপনিষদে, আত্মা এব অর্থাৎ সর্ব্বভূতানি, আত্মাই সর্বভূত হইয়াছে, এখানে শব্দগুলির নির্বাচনে এই ব্যঞ্জনা নিহিত রহিয়াছে যে, স্বপ্রতিষ্ঠ সত্তাই এই সর্বভূত হইয়াছে।

শুধু জগতেব মধ্যে থাকিযাই নহে, পরন্তু ঊর্ধ্ব হইতেও, তাঁহাব পরম বিশ্বাতীত পদ হইতেও জগতকে নিযন্ত্রণ কবিতেছেন। বিশ্বকে অতিক্রম করিযাও অবস্থিত নহে, এমন কোন শক্তির দ্বাবা বিশ্ব পরিচালিত হইতে পাবে না। জগতেব উপব এক দিব্য নিয়মের রাজত্ব চলিতেছে, ইহা বলিলে বুঝায যে, ইহাব উপবে এক সর্বশক্তিমান নিয়ন্তার প্রভুত্ব বহিয়াছে, কোন যন্ত্রবৎ শক্তিব বা বিশ্বের আপাতদৃশ্য রূপের মধ্যে সীমাবদ্ধ কোন অলঙ্ঘ্য অন্ধনিযতিব নহে। এইটিই হইতেছে জগৎ সম্বন্ধে ঈশ্ববাদমূলক (theistic) দৃষ্টি, কিন্তু যে ঈশ্বরবাদ সঙ্কোচেব সহিত অতি সন্তর্পণে অগ্রসব হয় এবং জগতেব বৈপবীত্যসকলেব দিকে সোজাভাবে চাহিযা দেখিতে ভয পায়, ইহা সেরূপ ঈশ্বরবাদ নহে, ইহা দেখে ভগবান সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান, এক অদ্বিতীয় আদিদেব, তিনি শুভ-অশুভ, সুখ-দুঃখ, জ্যোতি-অন্ধকার সবকিছুই নিজেব সত্তার উপাদানরূপে নিজের মধ্যে প্রকট কবিতেছেন এবং নিজের মধ্যে যাহা প্রকট কবিয়াছেন, নিজেই তাহা পরিচালন কবিতেছেন। ইহার বৈপরীত্যসকল তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, নিজেব সৃষ্টিব দ্বাবা তিনি কোনরূপে সীমাবদ্ধ হন না, প্রকৃতিকে অতিক্রম করিযাও তিনি তাহার সহিত অতি নিবিড়ভাবে সম্বন্ধযুক্ত এবং তাহাব জীবগণের সহিত অতি অন্তরঙ্গভাবে এক, তাহাদের মূল অধ্যাত্ম সত্তা, আত্মা, ঊর্ধ্বতম চিৎশক্তি, তাহাদের প্রভু, প্রণযী, বন্ধু, আশ্রয়, তিনি তাহাদেব মধ্যে থাকিযা আবার ঊর্ধ্ব হইতেও মর্ত্যজগতে পরিদৃশ্যমান অজ্ঞান, দুঃখ ও পাপ অশুভেব ভিতর দিয়া তাহাদিগকে সর্বদা পরিচালিত করিতেছেন, প্রত্যেককে তাহার প্রকৃতির ভিতব দিযা এবং সকলকে বিশ্বপ্রকৃতির ভিতর দিয়া এক পবম জ্যোতি ও আনন্দ ও অমৃতত্ব ও পবম পদেব দিকে লইযা চলিয়াছেন। এইটিই হইতেছে মুক্তিপ্রদ জ্ঞানেব সমগ্রতা। ভগবান আমাদের মধ্যে ও জগতেব মধ্যে অবস্থিত, আবাব সেই সঙ্গেই তিনি বিশ্বের অতীত অনন্ত সত্তা, ইহাই সেই সমগ্র জ্ঞান। পরাৎপব তিনি, তাঁহাব দিব্য প্রকৃতিব, তাঁহাব অধ্যাত্ম সত্তার কার্যকরী শক্তির দ্বাবা তিনি সর্ব্বমিদং হইযাছেন, তাঁহাব লোকাতীত পবম পদ হইতে সমস্ত নিয়ন্ত্রণ কবিতেছেন। তিনি প্রত্যেক প্রাণীব মধ্যে অন্তরঙ্গভাবে অবস্থিত, বিশ্বেব সকল ঘটনা পবস্পবাব কাবণ, নিয়ন্তা, পরিচালক, অথচ তিনি এত উচ্চ, মহান ও অনন্ত যে তাঁহার কোন সৃষ্টিই তাঁহাকে সীমাবদ্ধ করিতে পারে না।

এই জ্ঞানের স্বরূপ তিনটি পৃথক আশ্বাসপূর্ণ শ্লোকে সুস্পষ্ট কবা হইয়াছে। ভগবান বলিলেন, "যে আমায় অজ, অনাদি ও সর্বলোকেব মহান ঈশ্ববরূপে জানে, সে মর্ত্যলোকে মোহশূন্য হইয়া বাস কবে এবং সর্ববিধ পাপ হইতে মুক্ত হয়। যে আমার এই বিভূতি, এই সর্বব্যাপী ঈশ্ববত্ব এবং আমাব এই যোগ (ঐশ্বব যোগ, যাহার দ্বারা বিশ্বাতীত ভগবান সকল সৃষ্টি অপেক্ষা বৃহত্তব হইযাও সকলেব সহিত এক, সকলেব মধ্যে বাস কবিতেছেন এবং সকলকে স্বীয প্রকৃতির পবিণাম-রূপে নিজের মধ্যে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন) যথার্থরূপে জানে সে অবিকম্পিত

যোগে আমাব সহিত যুক্ত হয়, ইহাতে সন্দেহ নাই। আমি সকলের উৎপত্তিস্থল, আমা হইতেই সকলেব কর্ম ও গতি প্রবর্তিত হইয়া থাকে, ইহা জানিয়া জ্ঞানীগণ আমাব ভজনা কবেন . এবং আমি তাহাদিগকে বুদ্ধিযোগ প্রদান কবি, যাহার দ্বাবা তাঁহাবা আমাকে প্রাপ্ত হন এবং আমি তাঁহাদেব অজ্ঞান-জনিত অন্ধকার বিনষ্ট কবিযা দিই।"[১] ঐ জ্ঞানেব স্বরূপ হইতেই এবং যে যোগসাধনার দ্বাবা ঐ জ্ঞান অধ্যাত্মবিকাশ, অধ্যাত্ম উপলব্ধিতে পরিণত হয় সেই যোগের স্বরূপ হইতেই এই সকল ফল অবশ্যম্ভাবীরূপে প্রাপ্ত হওয়া যায। কাবণ মানুষের মনের ও কর্মেব সকল ভ্রান্তি, তাহাব মন, ইচ্ছা, নৈতিক প্রবৃত্তিব, তাহার হৃদযেব, ইন্দ্রিয়ের, প্রাণের প্রেবণাব যত স্খলন, অনিশ্চযতা ও সন্তাপ, সমুদযেবই মূল হইতেছে তাহার সম্মোহ, এই সম্মোহ, এই তমসাচ্ছন্ন ও ভ্রান্তিময জ্ঞান ও কর্মই মরদেহে অবস্থিত ইন্দ্রিয কর্তৃক বিমূঢ় মনেব পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু যখন সে সকল বস্তুর দিব্য উৎসটিকে দেখিতে পায, যখন সে বিশ্বেব দৃশ্যমান রূপ হইতে বিশ্বাতীত সদ্বস্তুর দিকে অবিচলিতভাবে দৃষ্টিনিক্ষেপ করে এবং সেই সদ্বস্তু হইতে আবাব এই দৃশ্যমান রূপে ফিবিযা আসে, তখন সে মন, ইচ্ছা, হৃদয় ও ইন্দ্রিয়ের এই সম্মোহ হইতে মুক্তিলাভ কবে, জ্ঞানদীপ্ত ও মুক্ত হইযা বিচরণ করে, অসংমূঢ়ঃ মর্ত্যেষু। প্রত্যেক জিনিসকে তাহাব পবম ও যথার্থ স্বরূপে সে দেখে, আর শুধুই তাহার বর্তমান ও আপাতদৃশ্য রূপে নহে, এইভাবে সে প্রচ্ছন্ন যোগসূত্র ও সম্বন্ধসকল দেখিতে পায, সে সজ্ঞানে সমস্ত জীবনকে পবিচালিত কবে, তাহাদের মহান ও সত্য লক্ষ্য অনুসাবে কর্ম কবে এবং নিজেব অন্তবস্থিত ভগবান হইতে যে শক্তি ও জ্যোতি তাহাব নিকট আসে তাহার দ্বাবাই সে সবকিছু নিয়ন্ত্রিত করে। এইভাবেই সে ভ্রান্ত জ্ঞান হইতে, মন ও ইচ্ছাব ভ্রান্ত প্রতিক্রিয়া হইতে, ভ্রান্ত ইন্দ্রিয়ানুভূতি ও ইন্দ্রিযপ্রেবণা হইতে মুক্ত হয়, আব এই সবই হইতেছে এখানকাব সকল পাপ, ভ্রান্তি ও দুঃখেব মূল, সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে, কাবণ এইভাবে বিশ্বাতীত ও বিশ্ব-ব্যাপী সত্তাব মধ্যে বাস কবিযা সে নিজেব ও সকলের ব্যষ্টিগত সত্তাকে তাহাদের মহত্তব স্বরূপে দেখিতে পায এবং তাহাব ভেদাত্মক ও অহমাত্মক ইচ্ছা ও জ্ঞানের মিথ্যা ও ভ্রান্তি হইতে মুক্ত হয। এইটিই হইতেছে অধ্যাত্ম মুক্তির সার তত্ত্ব।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে গীতাব মতে মুক্ত পুরুষেব যে জ্ঞান তাহা জীবন

[১] এতাং বিভূতিং যোগঞ্চ মম যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
সোঽবিকম্পেন যোগেন যুজ্যতে নাত্র সংশয়ঃ॥১০।৭
অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে।
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ॥১০।৮
তেষাং সতত যুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥১০।১০
তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ।
নাশযাম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা॥১০।১১

হইতে বিচ্ছিন্ন এবং সকল সম্বন্ধশূন্য নৈর্ব্যক্তিকতাব চৈতন্য নহে, একটা কিছু-না-করা শান্ত অবস্থা নহে। কারণ মুক্ত পুরুষের মন ও আত্মায় সকল সময়েই এই বোধ, এই সমগ্র অনুভূতি দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত বহিযাছে যে, বিশ্বেব ঈশ্বর ভগবান সমস্ত জগতে ব্যাপ্ত থাকিযা সবকিছুকে অনুপ্রাণিত ও পবিচালিত কবিতেছেন, এতাং বিভূতিং মম যো বেত্তি।[১] তিনি জানেন যে তাঁহাব আত্মা বিশ্বজগতেব অতীত সত্তা, কিন্তু তিনি ইহাও জানেন যে, ঐশ্ববিক যোগেব দ্বাবা তিনি এই বিশ্বেব সহিত এক, যোগম্ চ মম। এবং তিনি বিশ্বাতীত সত্তা, বিশ্বসত্তা ও ব্যষ্টিসত্তাব প্রত্যেকটি দিক পরম সত্যেব সহিত যথার্থ সম্বন্ধে দেখেন এবং সবকে ঐশ্বরিক যোগেব ঐক্যের মধ্যে যথাক্রমে সন্নিবেশিত কবেন। তিনি আব জিনিসসকলকে পৃথক পৃথক করিযা দেখেন না—এইরূপ পার্থক্যে দেখিলে কোন জিনিসেবই সুব্যাখ্যা হয় না অথবা শুধু একটা দিকই দেখা হয। আবাব তিনি যে সকল জিনিসকে গোলমালে একাকার করিযা দেখেন তাহাও নহে—এরূপ গোলমাল কবিযা দেখার ফল হইতেছে ভ্রান্ত দৃষ্টি ও বিশৃঙ্খল কর্ম। তিনি বিশ্বাতীত সত্তায নিশ্চিতভাবে প্রতিষ্ঠিত, আর তিনি বিশ্বেব দ্বন্দ্বে এবং কাল ও ঘটনাচক্রেব গণ্ডগোলে কিছুমাত্র বিক্ষুব্ধ হন না। এই সকল সৃষ্টি ও ধ্বংসেব মধ্যেও তিনি অবিচলিত, তাঁহার আত্মা বিশ্বমাঝে শাশ্বত ও অধ্যাত্মেব সহিত অচল অটল নিষ্কম্প যোগে নিবিষ্ট। এই সবেব ভিতব দিযা তিনি লক্ষ্য কবেন যে, যোগেশ্ববেব দিব্য সঙ্কল্পই অব্যর্থভাবে পূর্ণ হইয়া চলিযাছে এবং তিনি শান্ত বিশ্বব্যাপকত্ব ও সকল বস্তু, সকল প্রাণীব সহিত একত্বের বোধ লইযা কাজ কবেন। আব এই যে সকল বস্তুর সহিত ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শ, ইহাব অর্থ নহে যে, তাঁহাব আত্মা ও মন ভেদাত্মক নীচের প্রকৃতিতে বদ্ধ, কাবণ তাঁহার অধ্যাত্ম উপলব্ধিব ভিত্তি নীচেব প্রাতিভাসিক রূপ ও ক্রিয়া নহে, পবন্তু তাহা হইতেছে আভ্যন্তবীণ সর্বব্যাপী আত্মা এবং পবম বিশ্বাতীত সত্তা। তিনি তাঁহাব প্রকৃতিতে ও সত্তাব ধর্মে ভগবানেবই সদৃশ হন, সাধর্ম্ম্যমাগতাঃ, আত্মার বিশ্বব্যাপকত্বেব মধ্যেও তিনি বিশ্বাতীত, মন প্রাণ দেহের ব্যষ্টিত্বেব মধ্যেও তিনি বিশ্বব্যাপী। এই যোগ একবাব সিদ্ধ, অটল, সুদৃঢ় হইলে, তিনি প্রকৃতির যে কোন ভাবে অবস্থিত থাকিতে পারেন, যে কোন মানবীয় অবস্থা গ্রহণ করিতে পারেন, যে কোন বিশ্বকর্ম কবিতে পাবেন, তাহাতে আব তিনি ভগবদ্ আত্মাব সহিত ঐক্য হইতে কিছুমাত্র স্খলিত হন না, সর্বভূত মহেশ্বরেব সহিত তাঁহাব নিত্য মিলন বিন্দুমাত্রও ক্ষুণ্ণ হয না, সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ত্ততে।

ভাব ও হৃদয়াবেগের ক্ষেত্রে এই জ্ঞান সেই ভগবানেব প্রতি শান্ত প্রেম ও প্রগাঢ় ভক্তিতে পরিণত হয যিনি আমাদের ঊর্ধ্বে বিশ্বাতীত আদিদেব, আব

[১] এতাং বিভূতিং যোগঞ্চ মম যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
সোঽবিকম্পেন যোগেন যুজ্যতে নাত্র সংশযঃ॥১০।৭

এখানে সকল বস্তুব অধীশ্বব, মানুষেব মধ্যে ভগবান, প্রকৃতির মধ্যে ভগবান। প্রথম প্রথম ইহা হয শুধু বুদ্ধিব একটা জ্ঞান, কিন্তু ইহার সহিত যুক্ত হয় হৃদয়েব আবেগময অধ্যাত্মভাব, বুধা ভাব-সমন্বিতাঃ। হৃদয় ও মনের এই যে পরিবর্তন, ইহাই সমগ্র প্রকৃতিব পূর্ণ রূপান্তবেব সূচনা। এক নূতন আভ্যন্তরীণ জন্ম ও বিকাশ আমাদিগকে আমাদেব প্রেম ও ভক্তিব পবম পাত্রের সহিত একত্বের জন্য প্রস্তুত কবিযা তোলে, মদ্ভাবায। এই যে ভগবান তখন জগতেব সর্বত্র এবং ইহার ঊর্ধ্বে দৃষ্ট হন, তাঁহাব মহত্ত্ব, সৌন্দর্য ও পূর্ণতায় প্রগাঢ় প্রেমানন্দ, প্রীতি অনুভূত হয। মন যে জগতেব ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ও বাহ্য সুখের সন্ধান করিতেছে, এই গভীবতর আনন্দোল্লাস তাহার স্থান গ্রহণ কবে, অথবা বলিতে পারা যায় যে, উহা আর সকল আনন্দকে নিজের মধ্যেই টানিয়া লয এবং এক অত্যাশ্চর্য বাসায়নিক ক্রিয়াব দ্বারা মনেব ও হৃদয়েব অনুভবসকলকে এবং সমস্ত ইন্দ্রিয-ক্রিয়াকে রূপান্তবিত কবিযা দেয। সমগ্র চিত্র ভগবদ্ময হইযা উঠে এবং ভগবদ্ চৈতন্যেব সাডায ভবিযা উঠে, সমগ্র জীবন আনন্দানুভূতিব এক সমুদ্রেব মধ্যে নিমজ্জিত হইযা যায। এইরূপ ভগবদ্ প্রেমিকগণের সবল বাক্য ও চিন্তা হয পরস্পরেব সহিত ভগবদ্ বিষযে আলাপন, ভগবদ্তত্ত্ব অনুধাবন। সেই একই আনন্দে সত্তার সকল তৃপ্তি, প্রকৃতিব সকল লীলা, সকল সুখ কেন্দ্রীভূত হয। চিন্তায় ও স্মৃতিতে মুহূর্তে মুহূর্তে নিত্য মিলন হয, আত্মায একত্বেব অনুভূতি কখনও কোনক্রমে ছিন্ন হয না। আব যে মুহূর্তে এই আভ্যন্তরীণ অবস্থা আবম্ভ হয, ইহা যখন অপূর্ণ বহিযাছে তখনও ভগবান পূর্ণ বুদ্ধিযোগেব দ্বাবা ইহাকে দৃঢ করিয়া দেন। তিনি আমাদেব মধ্যে ভাস্বব জ্ঞানেব দীপ প্রজ্জ্বলিত করিয়া তোলেন ভেদাত্মক মন ও বুদ্ধিব অজ্ঞানকে ধ্বংস করিয়া দেন, মানবাত্মার মধ্যে প্রকাশিত হইয়া তিনি দণ্ডাযমান হন।[১] কর্ম ও জ্ঞানেব প্রদীপ্ত সমন্বযের উপব প্রতিষ্ঠিত বুদ্ধিযোগের দ্বাবা আমাদেব নীচেব বিক্ষুব্ধ মানসিক স্তর হইতে সক্রিয় প্রকৃতিব ঊর্ধ্বে সাক্ষী আত্মপুরুষেব অক্ষব শান্তির মধ্যে উন্নযন সম্পন্ন হইয়াছে। কিন্তু এই যে মহত্তর বুদ্ধিযোগ সর্বব্যাপক জ্ঞানেব সহিত প্রেম ও ভক্তির প্রদীপ্ত সমন্বযের উপর প্রতিষ্ঠিত, ইহাব দ্বাবা এখন মানবাত্মা এক বিশাল আনন্দে সর্ব উদ্ভবকর্তা পবমেশ্ববেব সমগ্র লোকাতীত সত্যেব মধ্যে উঠিয়া যায। ব্যষ্টিগত আত্মা ও ব্যষ্টিগত প্রকৃতিব মধ্যে শাশ্বতেব প্রকাশ পূর্ণ হয়, ব্যষ্টিগত আত্মা কালাধীন জন্ম হইতে শাশ্বতেব অনন্তত্বেব মধ্যে ঊর্ধ্বগতি লাভ কবে।

মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধযন্তঃ পবস্পবম্।
কথযন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ বমন্তি চ॥
তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥
তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ।
নাশযাম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা॥১০।৯-১১

অষ্টম অধ্যায়

বিভূতিরূপে ভগবান

এখন একটি অতি প্রযোজনীয় স্থানে উপস্থিত হওয়া গিয়াছে, অধ্যাত্মমুক্তি এবং দিব্যকর্ম সম্বন্ধে গীতা যে শিক্ষা পরিস্ফুট করিতেছিল তাহার সহিত গীতার দার্শনিক তত্ত্বগত সমন্বয়ের বিবৃতি যোগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। অর্জুনের বুদ্ধিতে ভগবান প্রকটিত হইয়াছেন; মনের অনুসন্ধান ও হৃদয়ের দৃষ্টির সম্মুখে তাঁহাকে পরম ও বিশ্বব্যাপী সত্তারূপে, পরম ও বিশ্বব্যাপী পুরুষরূপে, আমাদের জীবনের অন্তর্যামী ঈশ্বররূপে গোচর করান হইয়াছে, মানুষের জ্ঞান, ইচ্ছা ও ভক্তি তাঁহাকেই অজ্ঞান কুহেলিকার ভিতর দিয়া অনুসন্ধান করিতেছিল। এখন কেবল বাকী রহিয়াছে বহুলরূপী বিরাট পুরুষের সাক্ষাৎ দর্শনলাভ, তাহা হইলেই দিব্য প্রকাশনটির নানা দিকের আর একটি দিক পূর্ণ হইবে।

তাত্ত্বিক সমন্বয়টি সম্পূর্ণ হইয়াছে। আত্মাকে নীচের প্রকৃতি হইতে পৃথক করিবার জন্য সাংখ্যকে স্বীকার করা হইয়াছে, এই পার্থক্য সাধন করিতে হইবে বিবেকবুদ্ধির ভিতর দিয়া আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া এবং সেই প্রকৃতির উপাদান স্বরূপ গুণত্রয়ের বশ্যতা হইতে উপরে উঠিয়া। পরমপুরুষ ও পরা প্রকৃতির ঐক্য উদারভাবে প্রকট করিয়া সাংখ্যকে সম্পূর্ণ করা হইয়াছে এবং তাহার সঙ্কীর্ণতা অতিক্রম করা হইয়াছে। অহংকে কেন্দ্র করিয়া যে প্রাকৃত ভেদাত্মক ব্যক্তিরূপ গড়িয়া উঠে তাহার আত্মবিলোপ সাধনের জন্য দার্শনিকদের বেদান্তকে স্বীকার করা হইয়াছে। উদার নৈর্ব্যক্তিকতার দ্বারা ক্ষুদ্র ব্যক্তিকতার নিরসন করিতে, ব্রহ্মের ঐক্যে ভেদাত্মক ভ্রান্তির ধ্বংস করিতে এবং অহং-এর অন্ধ দৃষ্টির পরিবর্তে সর্বভূতকে এক আত্মায় ও আত্মাকে সর্বভূতে দেখিবার সত্যতর দৃষ্টি লাভ করিতে বেদান্তের প্রণালী প্রযুক্ত হইয়াছে। এই বেদান্তের সত্যকে পূর্ণ করিয়া তুলিতে পরব্রহ্মকে নিরপেক্ষভাবে প্রকট করা হইয়াছে, তাহা হইতে সচল ও অচল, ক্ষর ও অক্ষর, কর্ম ও অকর্ম উভয়ই উদ্ভূত। ইহার মধ্যে যেসকল সঙ্কীর্ণতা আসিয়া পড়া সম্ভব সেসব অতিক্রম করিতে পরমপুরুষ ও ঈশ্বরকে নিগূঢ়ভাবে প্রকট করা হইয়াছে, তিনিই সমস্ত প্রকৃতিতে আবির্ভূত হইতেছেন, সকল ব্যক্তিরূপের মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করিতেছেন এবং সকল কর্মেই তাঁহার প্রকৃতির শক্তি প্রয়োগ করিতেছেন। ইচ্ছাশক্তি, মন ও হৃদয়কে, সমগ্র আভ্যন্তরীণ সত্তাকে ঈশ্বরের নিকট, প্রকৃতির দিব্য অধীশ্বরের নিকট সমর্পণ করিবার জন্য যোগকে স্বীকার করা হইয়াছে। ইহাকে পূর্ণ করিয়া তুলিতে বিশ্বের পরম অধীশ্বরকে আদিদেব বলিয়া প্রকট করা হইয়াছে, জীব প্রকৃতিতে তাঁহারই আংশিক সত্তা, মমৈবাংশ। এক অখণ্ড অধ্যাত্ম ঐক্যের জ্যোতিতে সকল বস্তুকেই ঈশ্বর বলিয়া অন্তরাত্মার

যে দৃষ্টি তাহার দ্বারা এই যোগের সকল সম্ভাব্য সঙ্কীর্ণতা অতিক্রমিত হইয়াছে।

ফলে হইয়াছে ভগবৎসত্তা সম্বন্ধে এক অখণ্ড দৃষ্টি, তাহা একই সঙ্গে বিশ্বের বিশ্বাতীত উৎপত্তিস্থল স্বরূপ পরম সত্তা, বিশ্বের শান্ত আধারস্বরূপ সর্বভূতের নিরুপাধিক আত্মা, আবার সকল জীবে, ব্যক্তিতে, দ্রব্যে, শক্তিতে, গুণে অনুস্যূত ভগবান, সেই অনুস্যূত ভগবৎসত্তাই সর্বভূতের অন্তরাত্মা, কার্যকরী প্রকৃতি এবং আন্তর ও বাহ্য রূপায়ণ। এক অদ্বিতীয়কে এইরূপ অখণ্ডভাবে দেখিয়া ও জানিয়াই জ্ঞানযোগ তাহার পরম পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। কর্মযোগ তাহার পূর্ণতম পরিণতি লাভ করিয়াছে সকল কর্মকে তাহাদের অধীশ্বরের নিকট সমর্পণ করিয়া, কারণ প্রাকৃত যে মানব সে এখন কেবল তাঁহার ইচ্ছার একটি যন্ত্রমাত্র, নিমিত্ত মাত্র। ভক্তিযোগের প্রশস্ততম রূপগুলি ব্যাখ্যাত হইয়াছে। জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তির প্রগাঢ় সমন্বয় আত্মার সহিত পরমাত্মার ঊর্ধ্বতম মিলনকে পূর্ণ পরিণতি প্রদান করে। সেই মিলনে জ্ঞানের প্রকাশসকল যেমন বুদ্ধির নিকটে তেমনই হৃদয়ের নিকটেও সত্য হইয়া উঠে। সেই মিলনে যন্ত্ররূপে কর্ম করার দুরূহ আত্মবলি এক জীবন্ত ঐক্যের সহজ স্বচ্ছন্দ ও আনন্দময় অভিব্যক্তিতে পরিণত হয়। অধ্যাত্ম মুক্তির সমগ্র পন্থাটি দেওয়া হইয়াছে; দিব্যকর্মের সমগ্র ভিত্তিটি রচিত হইয়াছে।

দিব্যগুরু এইরূপে যে সম্পূর্ণ জ্ঞান অর্জুনকে দিলেন, অর্জুন তাহা স্বীকার করিয়া লইলেন। তাঁহার মন ইতিমধ্যেই সংশয় ও অন্বেষণ হইতে মুক্ত হইয়াছে; তাঁহার হৃদয় এখন জগতের বাহ্য দিক হইতে, ইহার বিভ্রান্তকারী বাহ্য দৃশ্য হইতে নিবৃত্ত হইয়া ইহার পরম অর্থ ও উৎপত্তির দিকে, ইহার আভ্যন্তরীণ সত্যসকলের দিকে ফিরিয়াছে, ইতিমধ্যেই শোক ও দুঃখ হইতে মুক্ত হইয়াছে এবং এক দিব্য দৃষ্টির অনির্বচনীয় আনন্দের স্পর্শ লাভ করিয়াছে। অর্জুন যে ভাষায় তাঁহার স্বীকৃতি ব্যক্ত করিলেন তাহাতে পুনরায় এই জ্ঞানের সুগভীর সমগ্রতা এবং ইহার সর্বতোমুখী শ্রেষ্ঠতা ও পূর্ণতার উপর জোর দেওয়া হইয়াছে। যে অবতার, নররূপী ভগবান, তাঁহার সহিত কথা কহিতেছেন, প্রথমত, তাঁহাকে তিনি পরম ব্রহ্ম বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেন; তিনি বিশ্বাতীত সর্বাত্মক সত্তা, পরাৎপর; জীব যখন এই ব্যক্তজগৎ ও এই আংশিক প্রকাশ হইতে উঠিয়া তাহার মূলে ফিরিয়া যায় তখন সে তাঁহার মধ্যে বাস করে, পরং ধাম।[১] তাঁহাকে তাঁহার চিরমুক্ত সত্তার পরম পবিত্রতায় তিনি স্বীকার করিয়া লইলেন, পবিত্রম্ পরমম্, আত্মার অক্ষর চিরশান্ত ও স্থির নৈর্ব্যক্তিকতার মধ্যে অহংকে লুপ্ত করিয়া দিয়া মানুষ এই পরম পবিত্রতায় উপনীত হয়। তাহার পর তিনি তাঁহাকে শাশ্বত সনাতন দিব্য পুরুষ বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেন, পুরুষম্ শাশ্বতম্ দিব্যং। তাঁহার মধ্যেই তিনি আদিদেবকে অভিবাদন করিলেন, যে অজাত পুরুষ সকল

১ পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান।
পুরুষং শাশ্বতং দিব্যমাদিদেবমজং বিভুম্॥১০।১২

বিশ্বের সর্বব্যাপী, অন্তর্যামী আত্মপ্রসারী প্রভু তাঁহাব স্তব কবিলেন, আদিদেবমজং বিভুম্। যিনি সকল বর্ণনার অতীত, কারণ কিছুই তাঁহাকে অভিব্যক্ত কবিতে পাবে না, ন হি তে ভগবন্ ব্যক্তিং বিদুর্দেবা ন দানবাঃ,[১] কি দেব, কি দানব কেহই তাঁহাব অভিব্যক্তি জানে না, সেই আশ্চর্যময় পুরুষরূপেই যে তিনি তাঁহাকে স্বীকাব কবিয়া লইলেন শুধু তাহাই নহে, পরন্তু তিনি তাঁহাকে সর্বভূতেব অধীশ্বব এবং তাহাদের সকল রূপায়ণের এক দিব্য কারণ বলিয়াও মানিযা লইলেন, তিনি দেবতাদেরও দেবতা, তাঁহা হইতেই সকল দেবতাব উৎপত্তি, তিনি জগতেব পতি, ঊর্ধ্ব হইতে তাঁহার পরম ও বিশ্বগত প্রকৃতির দ্বাবা ইহাকে প্রকট কবিতেছেন, পবিচালনাও করিতেছেন, ভূতভাবন ভূতেশ দেবদেব জগৎপতে।[২] অবশেষে তিনি তাঁহাকে আমাদেব অন্তবে ও বাহিবে অবস্থিত সেই বাসুদেব বলিযা মানিযা লইলেন যিনি তাঁহার বিশ্বব্যাপী সর্বত্র বিরাজিত সর্বসংগঠনকাবী বিভূতি। সকলকে আশ্রয় কবিয়া ইহসংসাবের সকল বস্তু হইয়াছেন।[৩]

এই সত্যকে তিনি গ্রহণ কবিযাছেন তাঁহাব হৃদয়েব ভক্তি দিযা, তাঁহার ইচ্ছাশক্তির আনুগত্য দিয়া, তাঁহাব বুদ্ধিব ধাবণা দিযা। এই জ্ঞানে এবং এই আত্মসমর্পণের সহিত ভগবানেব যন্ত্ররূপে কর্ম কবিতে তিনি ইতিমধ্যেই প্রস্তুত হইয়াছেন। কিন্তু এক স্থাযী গভীরতব অধ্যাত্ম অনুভূতিব জন্য তাঁহার হৃদযে ও ইচ্ছায় আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হইয়াছে। এই যে সত্য ইহা কেবল পরমপুরুষেব কাছে তাঁহার নিজেব আত্মজ্ঞানেই প্রকট—কারণ অর্জুন বলিযা উঠিলেন "কেবল তুমি, হে পুরুষোত্তম, নিজেকে দিয়া নিজেকে জান", স্বয়মেবাত্মানং বেত্থ ত্বং পুরুষোত্তম। এই যে জ্ঞান ইহা আসে আধ্যাত্মিক তাদাত্ম্যেব দ্বাবা এবং প্রাকৃত মানবের হৃদয় ইচ্ছা বুদ্ধি বিনা সহাযে নিজেদেব ক্রিয়া দ্বাবা ইহা লাভ কবিতে সক্ষম হয় না, কেবল অসম্পূর্ণ মানসিক প্রতিচ্ছাযা পাইতে পাবে, তাহাতে যত প্রকাশিত হয় তাহা অপেক্ষা আবরিত ও বিকৃত হয় অধিক। এই গুহ্য বিদ্যা শুনিতে হয় সেই সব ঋষির নিকট হইতে যাঁহাবা সাক্ষাৎ সত্যকে দেখিযাছেন, ইহার বাক্য শ্রবণ কবিযাছেন এবং সত্তায় ও আত্মায় ইহার সহিত এক হইযাছেন। "সকল ঋষি, দেবর্ষি নাবদ অসিত দেবল ব্যাস প্রভৃতি তোমাকে এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন!"[৪] অথবা যে অন্তর্যামী ভগবান আমাদেব হৃদয়ে জ্ঞানেব জ্বলন্ত দীপ

[১] সর্বমেতদৃতং মন্যে যন্মাং বদসি কেশব।
ন হি তে ভগবন্ ব্যক্তিং বিদুর্দেবা ন দানবাঃ॥১০।১৪

[২] স্বযমেবাত্মনাত্মানং বেত্থ ত্বং পুরুষোত্তম।
ভূতভাবন ভূতেশ দেবদেব জগৎপতে॥১০।১৫

[৩] বক্তুমর্হস্যশেষেণ দিব্যা হ্যাত্মবিভূতয়ঃ।
যাভির্বিভূতিভির্লোকানিমাংস্ত্বং ব্যাপ্য তিষ্ঠসি॥১০।১৬

[৪] আহুস্ত্বামৃষযঃ সর্বে দেবর্ষির্নাবদস্তথা।
অসিতো দেবলো ব্যাসঃ স্বয়ং চৈব ব্রবীষি মে॥১০।১৩

তুলিযা ধবেন তাঁহাব নিকট হইতে দিব্য দৃষ্টি ও দিব্য শ্রুতি সহাযে এই সত্যকে অন্তবেব মধ্যেই লাভ কবিতে হয। স্বয়ং চৈব ব্রবীষি মে, "এবং তুমি স্বয়ং আমাকে এইরূপ বলিতেছ।" একবার এই সত্য প্রকটিত হইলে মনের সম্মতি, ইচ্ছাশক্তিব সম্মতি এবং হৃদযেব আনন্দ ও আনুগত্যসহ তাহাকে বরণ করিয়া লইতে হইবে; পবিপূর্ণ মানসিক শ্রদ্ধা এই তিনটিকে লইয়াই গঠিত। অর্জুন ঠিক এইভাবেই সত্যটিকে গ্রহণ কবিয়াছেন; সর্বমেতদৃতং মন্যে যন্মাং বদসি কেশব, "হে কেশব! তুমি আমাকে যাহা যাহা কহিলে আমাব মন সে সমস্তই সত্য বলিয়া গ্রহণ কবিতেছে।" কিন্তু ইহা ছাড়াও প্রযোজন আমাদেব নিগূঢ় অধ্যাত্ম সত্তায এই সত্যকে আযত্ত কবা, আমাদের অন্তবতম অন্তবাত্মা চায় অলঙ্ঘনীয অনির্বচনীয় অধ্যাত্ম উপলব্ধি—মানসিক অনুভূতি তাহার কেবল উপক্রমণিকা বা ছাযামাত্র এবং সেই অধ্যাত্ম উপলব্ধি ব্যতীত অনন্তেব সহিত পূর্ণ মিলন হওযা সম্ভব নহে।

সেই উপলব্ধি কেমন কবিযা লাভ কবা যায় অর্জুনকে সেই পন্থাই দেওয়া হইতেছে। আব মহান স্বতঃসিদ্ধ যেসব দিব্য তত্ত্ব, সেসব মনকে বিভ্রান্ত করে না। পবমপুরুষ ভগবানের ধাবণা, অক্ষব পুরুষেব অনুভূতি, সর্বত্র চৈতন্যময় অনুস্যূত ভগবৎসত্তাকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ, চৈতন্যময বিশ্বপুরুষেব স্পর্শ—এই সবেব দিকে মন নিজেকে উন্মুক্ত কবিতে পাবে। একবাব মন এই ধাবণায় উদ্ভাসিত হইলে, মানুষ সহজেই পথটি অনুসবণ কবিতে পারে এবং প্রথম প্রথম সাধাবণ মানসিক অনুভূতি উপলব্ধি সকলেব উপবে উঠা যতই কঠিন হউক, শেষ পর্যন্ত আত্মার অনুভূতিতে সেই সকল মূল সত্যে পৌঁছিতে পাবে, যাহারা আমাদেব সত্তার এবং সর্বভূতেব সত্তাব পশ্চাতে বহিযাছে, আত্মনা আত্মনম্। সে সহজেই ইহা পাবে কাবণ এই সকল জিনিস একবাব ধাবণা কবিতে পাবিলেই স্পষ্ট সেসবকে দিব্য সত্য বলিযা বুঝিতে পাবা যায়; আমাদেব মানসিক সংস্কাবাদির মধ্যে এমন কিছুই নাই যাহা ভগবানেব এই সব উচ্চভাবকে স্বীকাব কবার পথে প্রতিবন্ধক হইতে পাবে। কিন্তু কঠিন হইতেছে জগৎ বস্তুত যেরূপ প্রতীযমান হয় তাহার মধ্যেই ভগবানকে দেখা, প্রকৃতিব এই বাস্তব সত্যেব মধ্যে এবং এই সব ঘটনাপরম্পবার ছদ্মবেশেব মধ্যে তাঁহাব সন্ধান পাওযা, কাবণ এখানে সবই এই মহান ঐক্যসাধক ভাবেব বিবোধী। কেমন কবিযা আমবা মানিয়া লই যে ভগবান রহিয়াছেন মানুষে, পশুতে, জড়পদার্থে? উত্তমে ও অধমে? মধুবে ও ভীষণে? শুভে ও অশুভে? ভগবান বিশ্বেব সকল পদার্থে ব্যাপ্ত বহিয়াছেন, ভগবান সম্বন্ধে এইরূপ কোন ধাবণা লইযা যদি আমবা তাঁহাকে জ্ঞানের আদর্শ আলোকেব মধ্যে, শক্তিব মহত্ত্বেব মধ্যে, সৌন্দর্যেব মনোহাবিত্বের মধ্যে, প্রেমের কল্যাণকারিতার মধ্যে, আত্মাব উদাব বিশালতাব মধ্যে, তাহা হইলে এই সকল মহৎ জিনিসের সহিত ইহাদেব বিপবীত যেগুলি বাস্তবে জড়িত রহিযাছে, ইহাদিগকে ঢাকিয়া আচ্ছন্ন কবিযা বাখিযাছে, তাহাদেব দ্বাবা সেই ঐক্যবোধ বিনষ্ট হইয়া যাইবে তাহা আমরা কেমন কবিযা নিবাবণ কবিব? আব যদি মানবীয় মন ও প্রকৃতিব অপূর্ণতা সত্ত্বেও

আমরা ভগবানকে দেখিতে পারি, তাহা হইলে যাহারা তাঁহার প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হয়, আমরা ভগবদ্‌বিরোধী বলিতে যাহা বুঝি, যাহারা কর্মে ও বাস্তবে তাহারই প্রতিনিধি, তাহাদের মধ্যে আমরা কেমন করিয়া ভগবানকে দেখিব? যদি সাধু-সজ্জনের মধ্যে নারায়ণকে দেখা সহজ হয়, পাপীর মধ্যে, দুরাচারীর মধ্যে, পতিতা ও অন্ত্যজের মধ্যে তাঁহাকে দেখা কেমন করিয়া আমাদের পক্ষে সহজ হইবে? জগতের সকল ভেদ বৈষম্যের মধ্যে পরম পবিত্রতা ও ঐক্যের সন্ধান করিতে গিয়া জ্ঞানীকে দৃঢ়স্বরেই বলিতে হয় নেতি, নেতি, ইহা নয়, ইহা নয়। যদিও জগতের অনেক জিনিসেই আমরা ইচ্ছায় হউক বা অনিচ্ছায় হউক সায় দিতে পারি এবং বিশ্বমাঝে ভগবান রহিয়াছেন স্বীকার করিতে পারি, তাহা হইলেও অধিকাংশ জিনিসের সম্মুখেই মন কি পুনঃপুনঃ বলিবে না, "ইহা নয়, ইহা নয়"? মানব মন সর্বদা বাহ্য দৃশ্য ও ঘটনাবলীর মধ্যে আবদ্ধ, তাহার পক্ষে এখানে বুদ্ধির স্বীকৃতি, ইচ্ছাশক্তির সম্মতি, হৃদয়ের শ্রদ্ধা অনেক সময়েই কঠিন হইয়া পড়ে। অন্তত কতকগুলি স্বতঃসিদ্ধ নিদর্শন প্রয়োজন, কতকগুলি এমন সূত্র ও সেতু প্রয়োজন যাহা ঐক্যবোধের কঠিন প্রয়াসের সহায় হইবে।

অর্জুন এইরূপ সহায় ও নিদর্শনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিলেন, যদিও তিনি বাসুদেবই সব, বাসুদেবঃ সর্ব্বম্, এই দিব্য সত্য স্বীকার করিয়াছেন এবং তাঁহার হৃদয় ইহার আনন্দে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে (কারণ ইতিমধ্যেই তিনি দেখিতেছেন যে এই সত্য তাঁহার মনের বৈকল্য ও ভেদবৈষম্য সকল হইতে তাঁহাকে মুক্ত করিতেছে, বিরোধসঙ্কুল জগতের সমস্যাসকলের দ্বারা বিভ্রান্ত তাঁহার সেই মন একটি সূত্র খুঁজিতেছিল, একটি দিশারী সত্যের সন্ধান করিতেছিল; এবং তাঁহার শ্রবণে ইহা অমৃতের ন্যায় অনুভূত হইতেছে, তৃপ্তির্হি নাস্তি মেঽমৃতম্)। তিনি অনুভব করিতেছেন যে পূর্ণ ও সুদৃঢ় উপলব্ধির দুরূহতা দূর করিবার জন্য ঐরূপ নিদর্শন ও আশ্রয় একান্ত প্রয়োজনীয়, কারণ তাহা না হইলে এই জ্ঞানকে কেমন করিয়া হৃদয়ের এবং জীবনের জিনিস করিয়া তোলা যাইবে? তিনি সহায়ক নিদর্শন সকল জানিতে চাহিলেন, শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহার দিব্য বিভূতিসকল সম্পূর্ণভাবে ও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করিতে বলিলেন, প্রার্থনা করিলেন যেন তাঁহার দৃষ্টি হইতে কিছুই না বাদ পড়ে, আর যেন কিছুর দ্বারা তাঁহাকে বিভ্রান্ত হইতে না হয়।[১] তিনি বলিলেন, "তুমি যেসকল বিভূতি দ্বারা সর্বলোক ব্যাপিয়া রহিয়াছ, তোমার সেই দিব্য আত্মবিভূতিসকল নিঃশেষে সমস্ত

[১] বক্তুমর্হস্যশেষেণ দিব্যা হ্যাত্মবিভূতয়ঃ।
যাভির্ব্বিভূতিভির্লোকানিমাংস্ত্বং ব্যাপ্য তিষ্ঠসি॥
কথং বিদ্যামহং যোগিংস্ত্বাং সদা পরিচিন্তয়ন্।
কেষু কেষু চ ভাবেষু চিন্ত্যোঽসি ভগবন্ময়া॥
বিস্তরেণাত্মনো যোগং বিভূতিং চ জনার্দ্দন।
ভূয়ঃ কথয় তৃপ্তির্হি শৃণ্বতো নাস্তি মেঽমৃতম্॥১০।১৬-১৮

বর্ণনা কর। হে যোগিন্! আমি সদা সর্বত্র তোমাকে চিন্তা করিয়া কিরূপে জানিব? হে ভগবান! কি কি প্রধান প্রধান ভাবে আমি তোমাকে চিন্তা করিব? এই যোগের দ্বারা তুমি সবের সহিত এক এবং সবের মধ্যে এক এবং সব তোমারই সত্তার পরিণাম, সবই তোমার প্রকৃতির ব্যাপক বা প্রকৃষ্ট বা প্রচ্ছন্ন শক্তি, সেই যোগ আমাকে বিস্তৃতভাবে এবং পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা কর এবং বার বার বল; আমার নিকটে ইহা অমৃতস্বরূপ, আমি যতই ইহা শ্রবণ করি না কেন, কিছুতেই আমার তৃপ্তি হইতেছে না।" এখানে আমরা গীতার মধ্যে একটা জিনিসের ইঙ্গিত পাইতেছি, যেটি গীতা কোথাও স্পষ্ট করিয়া প্রকাশ করে নাই, কিন্তু উপনিষদের মধ্যে পুনঃপুনঃ তাহার উল্লেখ আছে এবং পরে তাহা বৈষ্ণব ও শাক্তধর্মের দ্বারা গভীরতর দৃষ্টির সহিত বিকশিত হইয়াছিল—জগৎ মাঝে যে ভগবান রহিয়াছেন তাঁহাতে মানুষের আনন্দলাভের সম্ভাবনা, বিশ্বানন্দ, জগজ্জননীর লীলা, ভগবদ্ লীলার মাধুরী ও সৌন্দর্য।

দিব্যগুরু শিষ্যের অনুরোধ রক্ষা করিলেন, কিন্তু প্রথমেই তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিলেন যে, পূর্ণ উত্তর সম্ভব নহে। কারণ ভগবান অনন্ত এবং তাঁহার প্রকাশও অনন্ত। তাঁহার প্রকাশের রূপসকলও অসংখ্য। প্রত্যেক রূপই নিজের মধ্যে লুক্কায়িত কোন ভগবদ্ শক্তির প্রতীক, বিভূতি, যাঁহাদের দৃষ্টি আছে তাঁহারা দেখেন প্রত্যেক সসীম বস্তুই আপন আপন ভাবে অনন্তকে প্রকাশ করিতেছে। তিনি বলিলেন, "হাঁ, আমি তোমাকে আমার দিব্য বিভূতিসকল বর্ণনা করিব, তবে কেবল নিদর্শন হিসাবে প্রধান প্রধান বিভূতির কয়েকটি মাত্র বলিব, এমন কতকগুলি জিনিসের দৃষ্টান্ত দিব যেসবের মধ্যে তুমি খুব সহজেই ভগবানের শক্তি দেখিতে পাইবে, প্রাধান্যতঃ, উদ্দেশতঃ।[২] কারণ জগতে ভগবানের আত্মবিস্তারের অন্ত নাই, নাস্তি অন্তঃ বিস্তরস্য মে। এই কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া গুরু বর্ণনা আরম্ভ করিলেন, বর্ণনার শেষেও আবার তাহার উল্লেখ করিলেন এইটির উপর বিশেষভাবে জোর দিবার জন্য যেন এ সম্বন্ধে আর কোনও ভুল না হইতে পারে। তাহার পর এই অধ্যায়ের শেষ পর্যন্ত আমরা পাই এই সকল প্রধান প্রধান দৃষ্টান্তের, জগতের মানুষ ও জিনিসসকলের মধ্যে যে ভগবদ্ শক্তি অনুস্যূত রহিয়াছে তাহার এই সব প্রকৃষ্ট লক্ষণের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা। প্রথমে মনে হয় যেন সেগুলি এলোমেলোভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে কোন পারম্পর্য নাই, তথাপি সেই বর্ণনায় একটি বিশেষ সূত্র অনুসরণ করা হইয়াছে, যদি আমরা একবার সেই সূত্রটিকে ধরিতে পারি তাহা হইলে এখানকার বক্তব্যের নিগূঢ় অর্থ ও পরিণতি বুঝার পক্ষে সাহায্য হইবে। এই অধ্যায়টির নাম দেওয়া হইয়াছে, বিভূতি যোগ, এ যোগটি অপরিহার্য। ভগবান বিশ্বে যাহা কিছু হইয়াছেন, শুভ-

[২] হন্ত তে কথয়িষ্যামি দিব্যা হ্যাত্মবিভূতয়ঃ।
প্রাধান্যতঃ কুরুশ্রেষ্ঠ নাস্ত্যন্তো বিস্তরস্য মে॥

অশুভ, পূর্ণতা-অপূর্ণতা, আলো-আঁধার, ভগবানের সকল বিভূতির সহিতই সমানভাবে আমাদিগকে ঐক্য উপলব্ধি করিতে হইবে, তথাপি সেই সঙ্গেই আমাদিগকে উপলব্ধি করিতে হইবে যে, ইহার মধ্যে একটা উত্তরোত্তর ক্রমবিকাশের শক্তি রহিয়াছে, বস্তুসকলের মধ্যে ভগবানের আত্মপ্রকাশের একটা ক্রমবর্ধমান শক্তি রহিয়াছে, একটি এমন স্তরবিন্যাসের রহস্য রহিয়াছে যাহা আমাদিগকে নীচের ছদ্মবেশসকল হইতে ক্রমশ উচ্চ হইতে উচ্চতর প্রকাশের ভিতর দিয়া বিশ্বপুরুষের উদার আদর্শ প্রকৃতির দিকে তুলিয়া লইয়া যায়।

এই সংক্ষিপ্ত বর্ণনার আরম্ভ হইল সেই আদিতত্ত্বের উল্লেখ করিয়া যাহা এই বিশ্বপ্রকাশের সকল শক্তির মধ্যে অনুস্যূত রহিয়াছে। সেইটি এই যে, প্রত্যেক জীব প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে ভগবান গুপ্তভাবে বাস করিতেছেন এবং তাঁহাকে সেখানে আবিষ্কার করা যায়; তিনি সকল জীব, সকল বস্তুর মন ও হৃদয় গুহায় বাস করিতেছেন, তিনি তাহাদের বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ জীবনধারার মর্মস্থলে অন্তরাত্মা, যাহা কিছু আছে, যাহা কিছু হইয়াছে বা হইবে তিনি সেসবেরই আদি, মধ্য এবং অন্ত।[১] কারণ এই যে আভ্যন্তরীণ দিব্য আত্মা মন ও হৃদয়ের মধ্যে ইহাদের অগোচরে বাস করিতেছেন, এই যে জ্যোতির্ময় অন্তর্বাসী তাহারই প্রতিনিধিরূপে প্রকৃতিতে প্রতিষ্ঠিত জীবাত্মার অগোচর, ইনিই নিরন্তর কালের মধ্যে আমাদের ব্যক্তিত্বের পরিবর্তনের বিকাশ করিতেছেন এবং দেশের মধ্যে আমাদের ইন্দ্রিয়ানুভূতিমূলক জীবনের বিকাশ করিতেছেন—কাল ও দেশ আমাদের মধ্যে ভগবানেরই ভাবাত্মক গতি ও বিস্তার। সবই এই আত্মদর্শী আত্মা, আত্মবিকাশশীল অধ্যাত্ম সত্তা। কারণ, সর্বদা সকল জীবের মধ্য হইতে, সকল চেতন ও অচেতন সত্তার মধ্য হইতে, এই চিন্ময় পুরুষ নিজের প্রকট সত্তাকে গুণে ও শক্তিতে বিকশিত করিতেছেন, তাহাকে বস্তুসকলের নানা রূপে, আমাদের অন্তঃকরণের বৃত্তিসমূহে, জ্ঞানে, বাক্যে, চিন্তায়, মনের সৃষ্টিতে এবং কর্মীর ভাবাবেগ ও কর্মে, কালের গতিক্রমে, বিশ্বের শক্তিপুঞ্জে ও দেবতায় এবং প্রকৃতির শক্তিসকলে, উদ্ভিদ-জীবনে, পশু-জীবনে, মানব-জীবনে এবং অতিমানব-জীবনে বিকশিত করিতেছেন।

আমরা যদি সকল জিনিস এই জ্ঞানের চক্ষু লইয়া দেখি, গুণ ও পরিমাণের ভেদ বৈষম্যের দ্বারা অথবা শক্তির তারতম্য বা প্রকৃতির দ্বন্দ্বের দ্বারা বিভ্রান্ত না হই, তাহা হইলে আমরা দেখিতে পাইব যে, সকল জিনিসই বস্তুত এই প্রকটনের শক্তি এবং ইহা ছাড়া তাহারা আর কিছুই হইতে পারে না, তাহারা এই বিশ্বাত্মা বিশ্বপুরুষের বিভূতি, এই মহাযোগীর যোগ, এই আশ্চর্যময় আত্মস্রষ্টার সৃষ্টি। জগতে তাঁহার অসংখ্য আত্মপ্রকাশের তিনিই অজাত এবং সর্বব্যাপী ঈশ্বর,

[১] অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ।
অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামন্ত এব চ॥১০।১৯-২০

অজঃ, বিভুঃ; সব জিনিসই তাঁহার আত্মপ্রকৃতিতে তাঁহারই শক্তি ও কর্ম, তাঁহারই বিভূতি। তিনি তাহাদের সবকিছুর মূল, তাহাদের আদি, তাহাদের চির-পরিবর্তমান অবস্থায় তিনি তাহাদিগকে ধরিয়া রহিয়াছেন, তিনিই তাহাদের মধ্য, আবার তিনিই তাহাদের অন্ত, প্রত্যেক সৃষ্ট বস্তু ধ্বংসকালে তাঁহারই মধ্যে পরম গতি লাভ করে বা লয়প্রাপ্ত হয়। তিনি নিজের চৈতন্য হইতে তাহাদিগকে বাহির করিয়া আনেন এবং তাহাদের মধ্যে লুক্কায়িত থাকেন, তিনি তাহাদিগকে নিজের চৈতন্যের মধ্যে প্রত্যাহার করিয়া লন এবং তাহারা কিছুকালের জন্য বা চিরকালের জন্য তাঁহার মধ্যে লুক্কায়িত থাকে। আমাদের নিকট যাহা প্রতিভাত হয় তাহা কেবল সেই অদ্বৈত একের আত্মপ্রকাশের একটি শক্তি, আমাদের ইন্দ্রিয়ানুভূতি ও দৃষ্টির সম্মুখ হইতে যাহা লুপ্ত হয় তাহা কেবল একের সেই আত্মপ্রকাশ শক্তির ক্রিয়া মাত্র। সকল শ্রেণী, গণ (Genus), প্রজাতি (Species), ব্যক্তি এইরূপ বিভূতি। কিন্তু তিনি তাঁহার আত্মপ্রকাশের শক্তির ভিতর দিয়াই আমাদের নিকট প্রতিভাত হন, সেই জন্য যাহা কিছু বিশেষ গুণসম্পন্ন অথবা বিশেষ শক্তির সহিত কার্য করিতেছে বলিয়া প্রতীত হয় তাহার মধ্যেই ভগবান বিশেষভাবে প্রকট। আর সেইজন্যই প্রত্যেক শ্রেণীর জীবে আমরা তাঁহাকে সর্বাপেক্ষা বেশী দেখিতে পাই তাহাদেরই মধ্যে, যাহাদের মধ্যে সেই শ্রেণীর বিশিষ্ট প্রকৃতি শ্রেষ্ঠভাবে, উৎকৃষ্টভাবে, সর্বাপেক্ষা সার্থকতার সহিত আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। এই সবকেই বিশেষ অর্থে বিভূতি নামে অভিহিত করা হয়। তথাপি সর্বোচ্চ শক্তি এবং প্রকাশ অনন্তের অতি ক্ষুদ্র আভাস মাত্র; এমনকি সমগ্র বিশ্ব তাঁহার মহত্ত্বের একটি মাত্র কণায় অনুপ্রাণিত, তাঁহার জ্যোতির একটি মাত্র রশ্মির দ্বারা উদ্ভাসিত, তাঁহার আনন্দ ও সৌন্দর্যের ক্ষীণ আভাসমাত্র লাভ করিয়া মহিমান্বিত। সংক্ষেপে ইহাই হইতেছে বিভূতি বর্ণনার সারাংশ, ইহা হইতে আমরা এই ফলই লাভ করি, এইটিই নিগূঢ় অর্থ।

ভগবান অবিনশ্বর অনাদি অনন্ত কাল; এইটাই তাঁহার সর্বাপেক্ষা সুস্পষ্ট বিভূতি, সমস্ত জগৎলীলার মূল তত্ত্ব, অহম্ এব অক্ষয়ঃ কালঃ। সেই কালের ও প্রকাশের লীলায় ভগবান বস্তু সকলকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন এবং আপন আপন স্থানে প্রতিষ্ঠিত করিতেছেন, তাঁহার এই সকল কার্যের দ্বারা তিনি দিব্যশক্তিময় ধাতারূপে আমাদের ধারণায় বা অনুভূতিতে প্রতীয়মান হন। আবার দেশরূপে তিনিই সকল দিক হইতে আমাদের সম্মুখীন হন, লক্ষ লক্ষ তাঁহার শরীর, অসংখ্য তাঁহার মন, সর্বভূতে তিনি প্রকাশমান; আমরা আমাদের সকল দিকে তাঁহারই মুখ দেখিতে পাই, ধাতা অহং বিশ্বতোমুখঃ। কারণ এই যে, কোটি কোটি জীব ও বস্তু সকলের মধ্যে, সর্ব্বভূতেষু একই সঙ্গে ক্রিয়া করিতেছে তাঁহার আত্মা এবং চিন্তা ও শক্তির রহস্য, তাঁহার দিব্য সৃজনপ্রতিভা, তাঁহার আশ্চর্যময় গঠননৈপুণ্য এবং সম্বন্ধ, সম্ভাবনা এবং অনিবার্য কার্যকারণ-পরম্পরা নির্ধারণের অভ্রান্ত নীতি। আবার তিনি জগতে সর্বসংহারকর্তা মৃত্যুরূপে আমাদের নিকট প্রতিভাত হন,

মনে হয় তিনি যেন সৃষ্টি করিতেছেন শুধু শেষকালে তাঁহার সৃষ্টিসকলকে ধ্বংস করিবার জন্যই, অহম্ মৃত্যুঃ সর্ব্বহরঃ। অথচ তাঁহার প্রকটন শক্তির কার্য বন্ধ হয় না, কারণ পুনর্জন্ম এবং নবসৃষ্টির শক্তি মৃত্যু ও ধ্বংসের সহিত সমান গতিতে চলিয়াছে, অহম্ উদ্ভবঃ চ ভবিষ্যতাম্। সর্বভূতের অন্তর্নিহিত যে দিব্য আত্মা তাহাই বর্তমানকে ধরিয়া রহিয়াছে, অতীতকে সংহরণ করিতেছে, ভবিষ্যতকে সৃষ্টি করিতেছে।

তাহার পর এই যে সব সজীব সত্তা, বিশ্বদেবতা, অতিমানব, মানব এবং মানবেতর প্রাণী, ইহাদের মধ্যে এবং এই সকল গুণ, শক্তি, বস্তুর মধ্যে—প্রত্যেক শ্রেণীর যাহা প্রধান, শীর্ষস্বরূপ, গুণে সর্বোত্তম, তাহাই ভগবানের একটি বিশিষ্ট শক্তি, বিভূতি। ভগবান বলিলেন, আমি আদিত্যগণের মধ্যে বিষ্ণু, রুদ্রগণের মধ্যে শিব, দেবগণের মধ্যে ইন্দ্র, দৈত্যগণের মধ্যে প্রহ্লাদ, পুরোহিতগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বৃহস্পতি, সেনাপতিগণের মধ্যে রণদেবতা স্কন্দ, মরুৎগণের মধ্যে মরীচি, যক্ষরক্ষোগণের মধ্যে ধনপতি কুবের, নাগগণের মধ্যে অনন্ত নাগ, বসুগণের মধ্যে অগ্নি, গন্ধর্বগণের মধ্যে চিত্ররথ, জনয়িতাদের মধ্যে প্রেমের দেবতা কন্দর্প, জলদেবতাগণের মধ্যে বরুণ, পিতৃগণের মধ্যে অর্যমা, দেবর্ষিগণের মধ্যে নারদ, নিয়মস্থাপয়িতাগণের মধ্যে নিয়মের দেবতা যম বায়ুগণের মধ্যে পবনদেবতা। আবার অন্যদিকে আমি জ্যোতি ও দীপ্তিগণের মধ্যে জ্যোতির্ময় সূর্য, নিশার নক্ষত্রগণের মধ্যে চন্দ্র, তরঙ্গায়িত জলাশয় সমূহের মধ্যে সাগর, শিখরগণের মধ্যে সুমেরু, পর্বতমালা সমূহের মধ্যে হিমালয়, নদীসকলের মধ্যে গঙ্গা, অস্ত্র সমূহের মধ্যে দিব্যাস্ত্র বজ্র। সকল লতাবৃক্ষের মধ্যে আমি অশ্বত্থ, অশ্বগণের মধ্যে ইন্দ্রের অশ্ব উচ্চৈঃশ্রবা, গজেন্দ্রগণের মধ্যে ঐরাবত, বিহঙ্গগণের মধ্যে গরুড়, সর্পগণের মধ্যে সর্পরাজ বাসুকী, ধেনুগণের মধ্যে কামধেনু, মৎস্যগণের মধ্যে মকর, অরণ্যের পশুগণের মধ্যে সিংহ। আমি বৎসরের প্রথম মাস মার্গশীর্ষ (অগ্রহায়ণ), ঋতুসমূহের মধ্যে আমি সুন্দরতম বসন্ত ঋতু।

ভগবান অর্জুনকে বলিলেন, সজীব সত্তাসকলের মধ্যে আমি সেই চৈতন্য যাহার দ্বারা তাহারা নিজদিগকে এবং নিজেদের পারিপার্শ্বিক অবস্থা সমূহকে অবগত হয়। ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে আমি মন, মনের দ্বারাই তাহারা বস্তুসকলের জ্ঞান লাভ করে এবং তাহাদের উপর প্রতিক্রিয়া করে। তাহাদের মনের, চরিত্রের, শরীরের, কর্মের সকল গুণই আমি। আমি কীর্তি, শ্রী, বাক্, স্মৃতি, মেধা, ধৃতি, ক্ষমা, তেজস্বিগণের তেজ আমি, বলবানগণের বল আমি। আমি দৃঢ়সঙ্কল্প ও অধ্যবসায় ও জয়, আমি পুণ্যবানগণের সত্ত্বগুণ, চতুরগণের দ্যূত ছল, আমি শাসকদের শাসনদণ্ড, জিগীষুদের নীতি। আমি গুহ্যবিষয় সমূহের মধ্যে মৌন, জ্ঞানীর জ্ঞান, তার্কিকের তর্কবুদ্ধি। অক্ষর সমূহের মধ্যে আমি অ-কার, সমাস সমূহের মধ্যে দ্বন্দ্ব, বাক্য সমূহের মধ্যে পূত একাক্ষর ওঁ-কার, ছন্দ সমূহের মধ্যে গায়ত্রী, বেদ সমূহের মধ্যে সামবেদ এবং মন্ত্র সমূহের মধ্যে বৃহৎ সাম। আমি

গণকদের মধ্যে কাল। দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্পকলা প্রভৃতি বিদ্যা সমূহের মধ্যে আমি অধ্যাত্মবিদ্যা। মানুষের যাবতীয় সামর্থ্য আমি, বিশ্বের এবং বিশ্বের অন্তর্গত জীবসকলের যাবতীয় শক্তি আমি।

যাহাদের মধ্যে আমার শক্তিসকল মানবীয় সিদ্ধির উচ্চতম সীমায় উঠে, তাহারা সর্বদা আমিই, আমার বিশেষ বিভূতি। আমি নরগণের মধ্যে নরাধিপ, নেতা, বীর, শ্রেষ্ঠ পুরুষ। যোদ্ধাগণের মধ্যে আমি রাম, বৃষ্ণিগণের মধ্যে কৃষ্ণ, পাণ্ডবগণের মধ্যে ধনঞ্জয়। দিব্যজ্ঞানসম্পন্ন ঋষি আমার বিভূতি; মহর্ষিগণের মধ্যে আমি ভৃগু। মহান দ্রষ্টা, অনুপ্রাণিত কবি যিনি ভাবের আলোকে এবং বাক্যের ধ্বনিতে সত্যকে দেখেন এবং প্রকট করেন, তিনিও আমি, মানবাধারে আমারই জ্যোতি, দ্রষ্টাকবিগণের মধ্যে আমি উশনা। মহৎ মুনি, মনীষী, দার্শনিক মানুষের মধ্যে আমারই শক্তি, আমারই বৃহৎ মনীষা, মুনিগণের মধ্যে আমি ব্যাস। কিন্তু প্রকাশক্রমের যতই বৈচিত্র্য থাকুক না কেন, সকল জিনিসই আপন আপন ভাবে ও প্রকৃতিতে ভগবানের বিভিন্ন শক্তি, আমা ব্যতীত জগতে স্থাবর-জঙ্গম, সজীব-নির্জীব, কিছুই থাকিতে পারে না। সর্বভূতের আমি দিব্য বীজ এবং সকলে সেই বীজেরই শাখা ও পুষ্প, আত্মার বীজরূপে যাহা আছে, তাহাই তাহারা প্রকৃতিতে বিকাশ করিতে পারে। আমার দিব্য বিভূতিসকলের সীমা সংখ্যা নাই, আমি যাহা বলিলাম ইহা কেবল সংক্ষিপ্ত বর্ণনা, আমি কেবল কতকগুলি প্রধান প্রধান ইঙ্গিতের আলোক দিয়াছি, এবং দৃঢ়ভাবে অসংখ্য সত্যের দ্বার খুলিয়া দিয়াছি। জগতের সুন্দর ও শ্রীমান যত জীব দেখিবে, মানবজাতির মধ্যে, তাহার ঊর্ধ্বে এবং তাহার নীচে যাহাকেই দেখিবে মহান এবং শক্তিমান, তাহাকে আমার প্রভা, জ্যোতি, শক্তি বলিয়া এবং আমারই সত্তার তেজোময় অংশ হইতে উদ্ভূত বলিয়া জানিবে। কিন্তু এই জ্ঞানের অত খুঁটিনাটি জানিবার প্রয়োজন কি? ইহাই জানিয়া রাখ যে আমি এই জগতে এবং সর্বত্র বিরাজ করিতেছি, আমি সকলের মধ্যে আছি এবং সকলের উপাদান, আমি ব্যতীত আর কিছুই নাই, আমাকে ছাড়া আর কিছুই নাই। আমি এই সমগ্র বিশ্বকে ধরিয়া রহিয়াছি আমার অসীম শক্তির একটি মাত্রার দ্বারা, আমার অমেয় অধ্যাত্ম সত্তার ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশের দ্বারা। এই সকল জগৎ শাশ্বত অপরিমেয় ভগবানের স্ফুলিঙ্গ, ইঙ্গিত, স্ফুরণ মাত্র।

নবম অধ্যায়

বিভূতি তত্ত্ব

গীতায় দশম অধ্যায়টি প্রথম দৃষ্টিতে যেরূপ মনে হয় তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী প্রয়োজনীয়। যে মতবাদ সংসারের জীবন হইতে চরম মুক্তি চায়, মানব আত্মাকে সংসারলীলা হইতে বিমুখ করিয়া বিশ্বের অতীত, সকল সম্বন্ধের অতীত সুদূর নিরুপাধিক সত্তার দিকে লইতে চায়, গীতার মধ্যে কেবল সেই মতবাদের সমর্থন খুঁজিতে গেলে এই দশম অধ্যায়ের প্রকৃত মূল্য ও মর্যাদা বুঝা যায় না। মানুষের মধ্যে ভগবান রহিয়াছেন—এই মহান সত্যই গীতার বাণী। তিনি ক্রমবর্ধমান যোগশক্তির বলে নীচের প্রকৃতির মায়া-আবরণ সরাইয়া নিজেকে প্রকাশিত করেন, মানবাত্মার সকাশে নিজের বিশ্বসত্তা প্রকট করেন, তাঁহার বিশ্বাতীত পরম সত্যসকল প্রকট করেন, মানুষের মধ্যে এবং সর্বভূতের মধ্যেই যে তিনি রহিয়াছেন তাহা স্পষ্টভাবেই দেখাইয়া দেন। এই যে দিব্যযোগ, মানুষের ভাগবত সত্তায় গড়িয়া উঠা, মানবাত্মার মধ্যে মানুষের অন্তর্দৃষ্টির সম্মুখে ভগবানের আত্মপ্রকাশ, ইহারই ফলে আমরা আমাদের ক্ষুদ্র অহং হইতে মুক্ত হইয়া এক দিব্য মানবতার ঊর্ধ্বতন প্রকৃতিতে উঠিতে সক্ষম হই। মর্ত্যজীবনের জালে, গুণত্রয়ের জটিল বন্ধনে নহে, পরন্তু সেই উচ্চতর অধ্যাত্ম প্রকৃতির মধ্যে বাস করিয়া, জ্ঞান ভক্তি ও কর্মে ভগবানের সহিত এক হইয়া এবং নিজের সমস্ত সত্তাকে ভগবানে অর্পণ করিয়া মানুষ চরমতম বিশ্বাতীত গতি লাভ করিতে পারে, কিন্তু আবার সংসারের মধ্যেও কর্ম করিতে পারে, সে কর্ম তখন আর অজ্ঞানের কর্ম থাকে না, ভগবানের সহিত ব্যক্তিগত জীবনের সত্য সম্বন্ধে, আত্মার সত্যে, পূর্ণ অমৃতত্বে সে কর্ম করা হয়, সে কর্ম আর অহং-এর জন্য সম্পাদিত হয় না, পরন্তু জগতে ভগবানের জন্যই সম্পাদিত হয়। অর্জুনকে এই কর্মের জন্য আহ্বান করা, সে নিজে কি সত্তা ও শক্তি এবং তাহার ভিতর দিয়া কোন্ মহান সত্তা ও শক্তির ইচ্ছা কার্য করিতেছে তাহা তাহাকে জানাইয়া দেওয়া, ইহাই মানবদেহধারী ভগবানের উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যেই ভগবান কৃষ্ণ তাহার রথের সারথি হইয়াছেন, এই জন্যই অর্জুনের গভীর বিষাদ আসিয়াছিল, মানুষ সাধারণত যেসব ক্ষুদ্র বাসনা ও আদর্শ লইয়া কার্য করে সেসবের প্রতি তাহার বিষম বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছিল; সেসবের পরিবর্তে তাহাকে উচ্চতর অধ্যাত্ম প্রেরণা দিবার জন্য ভগবান কুরুক্ষেত্রে, অর্জুনের ভগবদ্‌নির্দিষ্ট কর্ম সম্পাদনের পরম মুহূর্তে তাহার সম্মুখে আত্মপ্রকাশ করিলেন। অর্জুনকে বিশ্বরূপ দর্শন করাইবার জন্য এবং যুদ্ধ করিতে ভগবদ্ আদেশ শুনাইবার জন্য এতক্ষণ তাহাকে প্রস্তুত করা হইয়াছে। এখন সেই সময় আসন্ন, কিন্তু এই অধ্যায়ে বিভূতিযোগের ভিতর দিয়া তাহাকে

যে জ্ঞান দেওয়া হইবে, ইহা না হইলে অর্জুন তাঁহার প্রকৃত কর্ম বুঝিতে পারিতেন না।

বিশ্বলীলার যে নিগূঢ় রহস্য, গীতাতে তাহা আংশিকভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। আংশিকভাবে, কারণ সে রহস্যের অনন্ত গভীরতাসকল কে সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করিতে পারে? কোন্ মতবাদ, কোন্ দর্শনশাস্ত্র বলিতে পারে যে, এই অত্যাশ্চর্য বিশ্বলীলার সমস্ত মর্ম অল্প পরিসরের মধ্যেই ব্যাখ্যা করিয়া দিয়াছে কিংবা একটা সঙ্কীর্ণ মতবাদের মধ্যেই নিঃশেষে ধরিয়া দিয়াছে? কিন্তু গীতার যাহা উদ্দেশ্য, সে উদ্দেশ্যসাধনের জন্য যতটুকু আবশ্যক, গীতা তাহা প্রকাশ করিয়াছে। গীতাতে আমরা দেখিতে পাই, জগৎ কেমন করিয়া ভগবান হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, ভগবান জগতে অনুস্যূত রহিয়াছেন, জগৎ ভগবানের মধ্যে রহিয়াছে; সর্বভূত সকল সৃষ্টি মূলত এক। আমরা দেখিতে পাই, প্রকৃতির অজ্ঞানে আবদ্ধ মানুষের সহিত ভগবানের সম্বন্ধ কি, মানুষ কেমন করিয়া আত্মজ্ঞানে উদ্বুদ্ধ হয়, এক মহত্তর চৈতন্যে নবজন্ম লাভ করে, নিজেরই উচ্চতর অধ্যাত্মসত্তায় উঠিতে সক্ষম হয়। কিন্তু যখন প্রাথমিক অজ্ঞান হইতে মুক্ত হইয়া এই নূতন আত্মদৃষ্টি ও চেতনা লাভ করা যায়, তখন সেই মুক্তপুরুষ তাহার চতুষ্পার্শ্বস্থিত জগৎকে কি চক্ষে দেখিবে? যে বিশ্বলীলার মূল রহস্য সে পাইয়াছে, সেই বিশ্বলীলার প্রতি তাহার ভাব, তাহার আচরণ কিরূপ হইবে? প্রথমেই সে সর্বভূতের ঐক্যজ্ঞান লাভ করিবে এবং সেই জ্ঞানের চক্ষুতেই সবকিছুকে দেখিবে। সে দেখিবে যে, তাহার চারিপাশে যাহাকিছু রহিয়াছে সেসব একই ভাগবত সত্তার অংশ, রূপ, শক্তি। তখন হইতে সেই দৃষ্টিই হইবে তাহার চেতনার সমস্ত অন্তর্মুখী ও বহির্মুখী প্রচেষ্টার আরম্ভ, ইহাই হইবে তাহার সকল কর্মের মূল দৃষ্টি, অধ্যাত্ম প্রতিষ্ঠা। সে দেখিবে সমস্ত বস্তু, সমস্ত জীব সেই একের মধ্যেই বাস করিতেছে, চলিতেছে, ফিরিতেছে, কর্ম করিতেছে, সেই দিব্য ও শাশ্বত সত্তার মধ্যে বিধৃত রহিয়াছে। কিন্তু সে আরও দেখিবে যে, সেই এক ভগবান সকলের মধ্যেই অধিবাসী, সকলের আত্মা, সকলের মধ্যেই মূল অধ্যাত্ম সত্তা, তিনি তাহাদের চেতন প্রকৃতিতে গুপ্তভাবে বিদ্যমান না থাকিলে তাহারা আদৌ বাঁচিতে পারিত না, চলিতে, ফিরিতে বা কর্ম করিতে পারিত না, তাঁহার ইচ্ছা, শক্তি, অনুমতি বা প্রশ্রয় ব্যতীত মুহূর্তের জন্যও তাহাদের বিন্দুমাত্র নড়াচড়া সম্ভব হইত না। সে দেখিবে যে, তাহারা নিজেরাও, তাহাদের আত্মা, মন, প্রাণ, শরীরাধার এসব সেই এক আত্মা ও অধ্যাত্ম সত্তারই শক্তি ও ইচ্ছার পরিণাম। তাহার কাছে সমস্তই হইবে সেই এক বিশ্বপুরুষের সম্ভূতি (becoming)। সে দেখিবে যে, তাহাদের চেতনা সমগ্রভাবেই সেই বিশ্বপুরুষের চেতনা হইতে সমুদ্ভূত, তাহাদের শক্তি ও সঙ্কল্প সেই পুরুষেরই শক্তি ও সঙ্কল্প হইতে আহৃত এবং তাঁহারই আশ্রিত, তাহাদের আংশিক প্রকৃতি এখন যেরূপ রহিয়াছে তাহাতে তাহা ভগবানের প্রকাশ বা ছদ্মবেশ, রূপ বা বিকৃতি যাহাই মনে হউক না কেন, সে দেখিবে যে তাহা সেই বিশ্বপুরুষের মহত্তর দিব্য

প্রকৃতি হইতেই সৃষ্ট। বাহ্যত বস্তুসকল যেমনই বিসদৃশ বা বিশৃঙ্খল দেখা যাউক, যেমনই দুর্বোধ্য হউক, তাহারা আর তাহার এই দৃষ্টির পূর্ণতাকে কিছুতেই এতটুকুও ক্ষুণ্ণ করিবে না বা তাহার বিরোধী হইবে না। সে যে মহত্তর চৈতন্যের মধ্যে উঠিয়াছে, এইটিই তাহার মূল ভিত্তি, তাহার চতুর্দিকে এই জ্যোতির প্রকাশ অপরিহার্য, এইটিই যথার্থ দৃষ্টির একমাত্র সিদ্ধ পন্থা, এক সত্য যাহা দ্বারা অন্য সকল সত্যই সম্ভব হয়।

কিন্তু জগৎ ভগবানের কেবল আংশিক প্রকাশ, ইহা নিজেই ভগবান নহে। প্রাকৃত প্রকাশ যেমনই হউক না কেন, ভগবান তাহা হইতে অনন্ত গুণে বড়। সকল বন্ধনের অতীত তাঁহার এই আনন্ত্যে তিনি এত উচ্চে রহিয়াছেন যে, যত প্রকারেরই জগৎ হউক না কেন, বিশ্বপ্রকৃতি যতই অশেষ বৈচিত্র্যের সহিত বিস্তৃত, বহুলাত্মক হউক না কেন, তাঁহাকে কিছুতেই সমগ্রভাবে প্রকাশ করিতে পারে না, যদিও আমাদের সান্ত দৃষ্টির সম্মুখে তাহা অনন্ত বলিয়া প্রতিভাত হয়, নাস্তি অন্তঃ বিস্তরস্য মে। অতএব মুক্ত জীবের দৃষ্টি বিশ্বজগতের অতীতে পরম ভগবানকে দেখিবে। সে দেখিবে যে, জগৎ ভগবানের একটি রূপ কিন্তু তিনি সকল রূপের অতীত, দেখিবে যে, ভগবানের কৈবল্যাত্মক সত্তার মধ্যে জগৎ নিত্য হইলেও একটা গৌণ ক্রম। সে দেখিবে সকল সান্ত ও আপেক্ষিক বস্তু অনপেক্ষ অনন্ত ভগবানেরই এক একটি রূপ, এবং সকল সান্ত বস্তুর ঊর্ধ্বে এবং তাহাদের প্রত্যেকের ভিতর দিয়াও সে সেই একই ভগবানে পৌঁছিবে, প্রত্যেক প্রাকৃত ব্যাপার, প্রাকৃত জীব এবং আপেক্ষিক ক্রিয়ার ঊর্ধ্বে সে সর্বদা সেই একই ভগবানকে লক্ষ্য করিবে, এই সকলের দিকে এবং ইহাদের অতীতে দৃষ্টিপাত করিয়া সে ভগবানের মধ্যেই প্রত্যেকের অধ্যাত্ম সার্থকতার সন্ধান পাইবে।

এই সব তাহার মনের কাছে কেবল বুদ্ধির পরিকল্পনা মাত্র হইবে না, জগতের প্রতি এইরূপ মনোভাব কেবল একটা চিন্তার ধারা বা কর্মোপযোগী মতবাদ মাত্র হইবে না। কারণ, তাহার জ্ঞান যদি কেবল এইরূপ পরিকল্পনামূলক হয়, তাহা হইলে তাহা হইবে একটা দার্শনিক মতবাদ (Philosophy), একটা মানসিক রচনা, তাহা অধ্যাত্ম জ্ঞান ও দৃষ্টি হইবে না, অধ্যাত্মভাব ও চেতনা হইবে না। ভগবান ও জগৎকে অধ্যাত্মভাবে দেখা কেবল চিন্তামূলক একটা ক্রিয়া নহে, এমনকি প্রধানত বা মূলতও তাহা নহে। ইহা প্রত্যক্ষ অনুভূতি, মন যেমন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা মূর্তি, বস্তু, ব্যক্তি প্রত্যক্ষ করে ও অনুভব করে, তাহারই মত বাস্তব, সুস্পষ্ট, সন্নিকট, নিত্য, কার্যকরী, নিবিড়। কেবল স্থূল মনই ভাবে যে, ভগবান ও আত্মা একটা অবাস্তব পরিকল্পনা মাত্র, নাম, রূপ, প্রতীক বা কল্পনার সাহায্য ভিন্ন ভগবানকে দেখা যায় না, ধারণা করা যায় না। আত্মা আত্মাকে দেখে, দিব্যভাবাপন্ন চেতনা ভগবানকে দেখে ঠিক সেইরূপ প্রত্যক্ষভাবে বা আরও অধিক প্রত্যক্ষভাবে, ঠিক সেইরূপ নিবিড়ভাবে বা আরও অধিক নিবিড়ভাবে, যেমন স্থূল চৈতন্য জড়বস্তুকে দেখে। ইহা ভগবানকে দেখে, অনুভব করে, ধ্যান করে,

ইন্দ্রিয়গোচর করে। কারণ অধ্যাত্ম চেতনার সম্মুখে সমস্ত দৃশ্যমান জগৎ প্রতীয়মান হয় যেন জড়ের জগৎ নহে, প্রাণের জগৎ নহে, এমনকি মনেরও জগৎ নহে, কিন্তু আত্মার জগৎ, এই সব জিনিস তাহার নিকট প্রতীয়মান হয় যেন ভগবৎ-চিন্তা, ভগবৎ-শক্তি ভগবৎ-রূপে। বাসুদেবের মধ্যে বাস করা, কর্ম করা, ময়ি বর্ত্ততে, বলিতে গীতা ইহাই বুঝিয়াছে। অধ্যাত্ম চেতনা ভগবানকে যে ঐক্যবোধমূলক নিবিড় জ্ঞানের দ্বারা অবগত হয় তাহা এত অত্যন্ত ভাবে অধিক সত্য যে মনের প্রতীতি বা ইন্দ্রিয়ের অনুভূতি কখনই সেরূপ হইতে পারে না। এইভাবে ইহা সেই বিশ্বাতীত কেবলকেও অবগত হয় যিনি সমস্ত জগৎলীলার পশ্চাতে ও ঊর্ধ্বে রহিয়াছেন, যিনি ইহাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, ইহাকে অতিক্রম করিয়া রহিয়াছেন এবং চিরদিন ইহার অবস্থা-বিপর্যয়ের বাহিরে অবস্থান করিতেছেন। আর এই ভগবান নিজের যে অচল অক্ষর সত্তার দ্বারা জগতের সমস্ত পরিবর্তন লীলাকে ব্যাপিয়া রহিয়াছেন, ধরিয়া রহিয়াছেন, সেইটিকে ঐ অধ্যাত্ম চেতনা অবগত হয় সেইরূপ ঐক্যবোধের দ্বারা, আমাদের নিজেদের কালাতীত অপরিবর্তনশীল অবিনাশী সত্তার সহিত ঐ অক্ষর সত্তার তাদাত্ম্য (identity) উপলব্ধির দ্বারা। আবার এই ভাবেই ইহা সেই দিব্য পুরুষকেও জানিতে পারে যিনি এই সকল বস্তু ও ব্যক্তির মধ্যে নিজেকে নিজে অবগত হন, যিনি নিজের চেতনায় এই সকল বস্তু ও জীব হইয়াছেন এবং নিজের অনুস্যূত ইচ্ছার দ্বারা তাহাদের চিন্তা ও রূপসকল গঠন করিয়া দিতেছেন, তাহাদের কর্মসকল পরিচালন করিতেছেন। ইহা ভগবানকে কৈবল্যাত্মক (Absolute) সত্তারূপে, বিশ্বের আত্মারূপে, আবার জীবের আত্মা, অন্তর পুরুষ ও প্রকৃতি রূপে নিগূঢ় জ্ঞানে অবগত হয়। এমনকি এই যে বাহ্য প্রকৃতি (external Nature), ইহাকেও সে অবগত হয় ঐক্যবোধ এবং আত্মোপলব্ধির দ্বারা, কিন্তু সে ঐক্য বৈচিত্র্যের বাধক নহে, তাহা সম্বন্ধকে অস্বীকার করে না, বিশ্বলীলার একই শক্তির বিভিন্ন ক্রম, উচ্চতর এবং নিম্নতর ক্রিয়া স্বীকার করে। কারণ প্রকৃতি ভগবানের বিচিত্র আত্মপ্রকাশলীলার শক্তি, আত্মবিভূতি।

সাধারণ মানবমন অজ্ঞানের বশে জগতে প্রকৃতিকে যেরূপ দেখে, অথবা অজ্ঞানের পরিণামে উহা যেরূপ, এই অধ্যাত্ম চেতনা, জগৎ সম্বন্ধে এই অধ্যাত্ম জ্ঞান কিন্তু সেভাবে দেখিবে না। এই প্রকৃতিতে অজ্ঞানের যাহা কিছু আছে, যাহা কিছু অপূর্ণ বা দুঃখময় বা বিকৃত ও ঘৃণ্য, সেসব ভগবানের প্রকৃতির একটা সম্পূর্ণ বিপরীত কিছু নহে, কিন্তু তাহাদের পিছনে তাহাদের প্রকৃত মূল রহিয়াছে, তাহাদের পিছনে এমন অধ্যাত্ম শক্তি আছে যাহার মধ্যে গিয়া তাহারা নিজেদের সত্য সত্তা ও সার্থকতা লাভ করিতে পারে। এক আদ্যা ও সৃজনশীলা পরমা প্রকৃতি আছে যাহার মধ্যে ভাগবত শক্তি ও সঙ্কল্প নিজের পূর্ণ স্বরূপ এবং শুদ্ধ প্রকাশের আনন্দ উপভোগ করে। জগতে আমরা যেসব শক্তি ক্রিয়মাণ দেখিতে পাই, তাহাদের উচ্চতম সিদ্ধতম শক্তি সেইখানেই পাওয়া যায়। সেইটিই

আমাদের নিকট প্রতীয়মান হয় ভগবানের আদর্শ প্রকৃতিরূপে, সে প্রকৃতি পূর্ণ জ্ঞানের, পূর্ণ তেজ ও ইচ্ছাশক্তির, পূর্ণ প্রেম ও আনন্দের। তাঁহার অনন্তগুণ, অগণন শক্তিসকল সেখানে আশ্চর্যভাবে বৈচিত্র্যময়, সে সমুদয় সেই পূর্ণ জ্ঞান, পূর্ণ তেজ, পূর্ণ প্রেম ও আনন্দের স্বতঃস্ফূর্ত অবাধ সামঞ্জস্যময় স্বচ্ছন্দ আত্মপ্রকাশ। সেখানে সবই হইতেছে সকল আনন্ত্যের বহুমুখী ঐক্য। সেই আদর্শ ভগবদ্ প্রকৃতিতে প্রত্যেক শক্তি, প্রত্যেক গুণই শুদ্ধ, পূর্ণ, আত্মস্থ, আপন আপন ক্রিয়ায় সামঞ্জস্যময়; সেখানে কোন কিছুই নিজের স্বতন্ত্র সীমাবদ্ধ আত্মবিকাশের জন্য চেষ্টা করে না, সকলেই এক অনির্বচনীয় ঐক্যের সহিত কর্ম করে। সেখানে *সকল ধর্মই (ভগবদ্ শক্তি ও গুণের যাহা যথার্থ ক্রিয়া, গুণকর্ম, তাহাই ধর্ম) এক স্বচ্ছন্দ সাবলীল ধর্ম*। ভগবানের সেই চিৎ শক্তি, তপঃ, অপরিসীম স্বাধীনতার সহিত কর্ম করে, কোনও একমাত্র নীতির বন্ধনে বদ্ধ থাকে না, কোনও এক সঙ্কীর্ণ পদ্ধতির দ্বারা সীমাবদ্ধ হয় না, নিজের অনন্তলীলা নিজেই উপভোগ করে, তাহার আত্মপ্রকাশের সত্যে কখনও পদস্খলন হয় না, তাহা চিরসিদ্ধ।

কিন্তু যে জগতে আমরা বাস করিতেছি সেখানে রহিয়াছে নির্বাচন ও পার্থক্যের ভেদমূলক নীতি। সেখানে আমরা দেখিতে পাই, যেসকল শক্তি ও গুণ প্রকট হইতে চাহিতেছে তাহারা প্রত্যেকেই যেন শুধু নিজের জন্যই সচেষ্ট, প্রত্যেকেই চেষ্টা করিতেছে যেকোন উপায়ে যতদূর সম্ভব শুধু নিজেরই আত্মপ্রকাশ করিতে এবং অন্যান্য শক্তি ও গুণের নিজ নিজ স্বতন্ত্র আত্মপ্রকাশের জন্য সহবর্তী বা প্রতিযোগী চেষ্টার সহিত নিজের চেষ্টার ভাল বা মন্দ যাহা সম্ভব কোনও রকম একটা আপোস করিতে। এই দ্বন্দ্বময় পার্থিব প্রকৃতির মধ্যে ভগবান অবস্থান করিতেছেন এবং এই সকল শক্তির ক্রিয়া যে নিগূঢ় ঐক্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহার অব্যভিচারী বিধানে সেই দ্বন্দ্বের মধ্যেই একটা সুসঙ্গতি আনিয়া দিতেছেন। কিন্তু এই সুসঙ্গতি আপেক্ষিক (relative), মনে হয় উহা এক মূল ভেদ হইতেই উত্থিত, বিভিন্ন জিনিসসকলের ঘাত-প্রতিঘাতে একরকম সঙ্গতি হইয়াছে, কোনও মূল ঐক্য হইতে উহার উৎপত্তি নহে। অন্তত মনে হয় যে, ঐ ঐক্য দমিত ও গুপ্ত রহিয়াছে, নিজেকে খুঁজিয়া পাইতেছে না, কখনই ছদ্মবেশ ছাড়াইয়া আত্মপ্রকাশ করিতে সক্ষম হইতেছে না। বস্তুত ইহা নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে না, যতক্ষণ না এই পার্থিব প্রকৃতিতে আবির্ভূত ব্যক্তিগত জীব নিজের মধ্যে সেই উচ্চতর দিব্য প্রকৃতির সন্ধান পাইতেছে যাহা হইতেই এই নীচের ক্রিয়ার উৎপত্তি। তথাপি জগতে যেসব গুণ ও শক্তি ক্রিয়া করিতেছে, মানুষে, পশুতে, উদ্ভিদে, জড়পদার্থে নানাভাবে কর্ম করিতেছে, যে কোনও রূপ তাহারা গ্রহণ করুক না কেন, তাহারা সকলেই দিব্য গুণ ও দিব্য শক্তি। সকল শক্তি ও গুণই ভগবানের শক্তি। প্রত্যেকেই ঊর্ধ্বে দিব্য প্রকৃতি হইতে আসিয়াছে, এখানে নীচের প্রকৃতিতে নিজের আত্মপ্রকাশের জন্য চেষ্টা করিতেছে, এইসব বাধা প্রতিবন্ধকের মধ্যে নিজের প্রতিষ্ঠা ও বাস্তব উপযোগিতার শক্তিকে বর্ধিত

করিতেছে এবং যখন নিজের আত্মশক্তির শিখরে উঠিতেছে, তখন ভাগবত ভাবের সাক্ষাৎ প্রকাশের সমীপবর্তী হইতেছে এবং ঊর্ধ্বে পরা আদর্শ দিব্য প্রকৃতির মধ্যে নিজের যে সিদ্ধ স্বরূপ সেই দিকে নিজেকে চালিত করিতেছে। কারণ প্রত্যেক শক্তিই ভগবানের সত্তা ও শক্তি এবং শক্তির বিস্তার ও আত্মপ্রকাশ সকল সময়ে ভগবানেরই বিস্তার ও প্রকাশ।

এমনও বলা যায় যে, আমাদের মধ্যে জ্ঞানের শক্তি, ইচ্ছার শক্তি, প্রেমের শক্তি, আনন্দের শক্তি, যেকোন শক্তি খুব বাড়িয়া উঠিয়া নীচের রূপের গণ্ডীটিকে ভাঙিয়া ফেলিতে পারে এবং সেই শক্তি ভেদাত্মক ক্রিয়া হইতে মুক্ত হইয়া ভগবানের অসীমতা ও শক্তির সহিত যুক্ত হয়। ভগবানের দিকে টানের যখন পরাকাষ্ঠা হয়, তখন তাহা মনকে জ্ঞানের পূর্ণতম দৃষ্টির ভিতর দিয়া মুক্ত করে, হৃদয়কে পূর্ণ প্রেম ও আনন্দের ভিতর দিয়া মুক্ত করে, সমস্ত জীবনকে এক উচ্চতর জীবন লাভের পূর্ণ ঐকান্তিক সঙ্কল্পের ভিতর দিয়া মুক্ত করিয়া দেয়। কিন্তু এই যে বিস্ফোরণের ফলে নীচের বন্ধন টুটিয়া যায়, আমাদের বর্তমান প্রকৃতির উপর ভগবানের স্পর্শ হইতেই তাহা সম্ভব হয়, তাহা শক্তিটিকে সাধারণ সীমাবদ্ধ ভেদাত্মক ক্রিয়া ও বিষয় সকল হইতে ফিরাইয়া শাশ্বতের দিকে, বিশ্বব্যাপী ও বিশ্বাতীত সত্তার দিকে পরিচালিত করে, অনন্ত, পূর্ণ ভগবানের অভিমুখে লইয়া যায়। সর্বত্র বিদ্যমান থাকিয়া ভাগবত শক্তি এইরূপ জীবন্তভাবে কার্য করিতেছে, এই সত্যই বিভূতি-তত্ত্বের ভিত্তি।

অনন্ত ভগবদ্ শক্তি সর্বত্র বিদ্যমান রহিয়াছে এবং গুপ্তভাবে এই নীচের জগৎকে ধরিয়া রহিয়াছে, পরা প্রকৃতির্মে যয়া ধার্য্যতে জগৎ, কিন্তু ইহা নিজেকে পিছনে রাখে, প্রত্যেক প্রাকৃত সত্তার হৃদয়ে লুকাইয়া থাকে, সর্ব্বভূতানাম্ হৃদ্দেশে, যতক্ষণ না জ্ঞানের জ্যোতিতে যোগমায়ার আবরণ বিদীর্ণ হইতেছে। মানুষের অধ্যাত্ম সত্তা অর্থাৎ জীবের আছে দিব্য প্রকৃতি। সে হইতেছে এই প্রকৃতিতে ভগবানের আবির্ভাব, প্রকৃতিঃ জীবভূতাঃ, এবং তাহার মধ্যে সমস্ত দিব্য শক্তি ও গুণ, ভাগবত সত্তার জ্যোতি, বল, শক্তি প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। কিন্তু এই যে নীচের প্রকৃতিতে আমরা বাস করিতেছি, এখানে জীব নির্বাচনের ও সসীম রূপায়ণের নীতি অনুসরণ করে এবং এখানে শক্তির যেকোন ধারা, যেকোন গুণ বা অধ্যাত্মভাব সঙ্গে লইয়া সে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, অথবা তাহার আত্মপ্রকাশের বীজ স্বরূপ সম্মুখে আনিয়াছে, সেইটিই হয় তাহার স্বভাবের কার্যকরী অংশ, তাহার আত্মবিকাশের মূল ধর্ম এবং সেইটিই তাহার স্বধর্ম, তাহার কর্মের নীতি নির্ণয় করিয়া দেয়। আর কেবল যদি ইহাই সব হইত তাহা হইলে কোনও সমস্যা বা দুরূহতা থাকিত না, মানুষের জীবন হইত ভাগবত সত্তার জ্যোতির্ময় ক্রমবিকাশ। কিন্তু আমাদের জগতের এই যে নীচের শক্তি, অপরা প্রকৃতি, ইহার স্বরূপ হইতেছে অজ্ঞান ও অহঙ্কার, ইহা ত্রিগুণময়ী। অহঙ্কার এই প্রকৃতির স্বরূপ, সেইজন্য জীব নিজেকে ভেদাত্মক অহং বলিয়া ধারণা করে, তাহার ন্যায় অপরের

মধ্যেও স্বতন্ত্র আত্মপ্রকাশের যে প্রবৃত্তি রহিয়াছে তাহার সহিত সহযোগে এবং সংঘর্ষে অহংভাবের বশে আত্মপ্রকাশের চেষ্টা করে। সে জগৎকে দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়া ধরিতে চায়, ঐক্য ও সামঞ্জস্যের ভিতর দিয়া নহে, অহংকেই জীবনের কেন্দ্র করিয়া সে বিরোধকে বাড়াইয়া তোলে। এই প্রকৃতির স্বরূপ হইতেছে অজ্ঞান, মোহাচ্ছন্ন দৃষ্টি এবং অপূর্ণ ও আংশিক আত্মপ্রকাশ, সেইজন্য সে নিজেকে জানিতে পারে না, নিজের সত্তার ধর্ম সম্বন্ধে সজ্ঞান হইতে পারে না, কিন্তু বিশ্বশক্তির নিগূঢ় প্রেরণায় সংস্কারের বশে অন্ধভাবে উহার অনুসরণ করে কষ্টেসৃষ্টে, ভিতরে বহু দ্বন্দ্ব লইয়া অগ্রসর হয়, পথভ্রষ্ট হইবার খুব বেশী সম্ভাবনা থাকে। এই প্রকৃতি ত্রিগুণময়ী, সেইজন্য আত্মবিকাশের এই বিশৃঙ্খল ও কষ্টকর প্রয়াস নানা অক্ষমতার, বিকৃতির ও আংশিক আত্মোপলব্ধির রূপ গ্রহণ করে। যখন অজ্ঞান ও অপ্রবৃত্তিমূলক তমোগুণের আধিপত্য হয়, তখন সত্তার শক্তি দুর্বল বিশৃঙ্খলায় সর্বদা অক্ষমতার সহিত কর্ম করে, অজ্ঞানের শক্তিসমূহের অন্ধ নিয়মের বশবর্তী হইয়া কর্ম করে, তাহাদিগকে ছাড়াইয়া উপরে উঠিবার কোনও আকাঙ্ক্ষা থাকে না। যখন প্রবৃত্তি-বাসনা-ভোগমূলক রজোগুণের আধিপত্য হয়, তখন দেখা দেয় একটা সংগ্রাম, একটা চেষ্টা, শক্তি ও সামর্থ্য বৃদ্ধি পায়, কিন্তু পদে পদে স্খলন হয়, সে চেষ্টা হয় ব্যথাসঙ্কুল, উগ্র, ভ্রান্ত পদ্ধতি ও আদর্শের দ্বারা বিপথে চালিত হয়, সত্য ধারণা, পদ্ধতি ও আদর্শসমূহকে বিকৃত ও দূষিত করা হয়, বিশেষত অহঙ্কারকে অতিশয়, এমনকি অতিমাত্রায় বাড়াইয়া দিবার প্রবণতা আসে। যখন জ্যোতি-স্থৈর্য-শান্তিমূলক সত্ত্বগুণের আধিপত্য হয়, তখন কর্ম অধিকতর সুসমঞ্জস হয়, প্রকৃতিকে যথাযথ ব্যবহার করা হয়, কিন্তু এই যে যথাযথ ব্যবহার ইহা ব্যক্তিগত জ্ঞানের দ্বারা সীমাবদ্ধ, নীচের প্রকৃতির যে মানসিক বুদ্ধি, জ্ঞান ও ইচ্ছাশক্তি এই সবেরই উচ্চতর রূপের ঊর্ধ্বে উঠিবার সামর্থ্য থাকে না। এই জটিলতার জাল হইতে মুক্ত হওয়া, অজ্ঞান, অহং ও গুণত্রয়ের উপরে উঠা, ইহাই দিব্য সিদ্ধিলাভের পথে প্রকৃত প্রথম ধাপ। এইরূপে উপরে উঠিয়াই জীব তাহার নিজের দিব্য প্রকৃতির, নিজের সত্য জীবনের সন্ধান পায়।

অধ্যাত্ম চেতনায় জ্ঞানের যে মুক্ত দৃষ্টি তাহা জগৎকে দেখিবার সময় কেবল এই নীচের দ্বন্দ্বময়ী প্রকৃতিকেই দেখে না। আমরা যদি আমাদের এবং অপরের প্রকৃতির কেবল বাহিরের দৃশ্যমান দিকটাই অবলোকন করি, তাহা হইলে সেটা অজ্ঞানের চক্ষুতে দেখা হয়, তাহা হইলে আমরা ভগবানকে সর্বত্র সমানভাবে জানিতে পারি না, সাত্ত্বিক জীবে, রাজসিক জীবে, তামসিক জীবে, দেবতায় ও দানবে, পাপাত্মায় ও পুণ্যবানে, জ্ঞানীতে ও মূর্খে, মহতে ও ক্ষুদ্রে, মানুষে, জন্তুতে, উদ্ভিদে, জড়জগতে সর্বত্র সমানভাবে ভগবানকে দেখিতে পারি না। যিনি জ্ঞানের মুক্ত দৃষ্টি লাভ করিয়াছেন তিনি একই সঙ্গে তিনটি জিনিস প্রকৃতির সমগ্র নিগূঢ় সত্য বলিয়া দেখেন। সর্বপ্রথমেই তিনি দেখেন যে, সকলের মধ্যে ভগবৎপ্রকৃতি

গুপ্তভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে, ক্রমবিকাশের জন্য অপেক্ষা করিতেছে, তিনি দেখেন যে, এই ভগবৎপ্রকৃতিই সকল বস্তুর প্রকৃত শক্তি, এই যেসব বিচিত্র গুণ ও শক্তির আপাতদৃষ্ট ক্রিয়া এসব সেই ভগবৎপ্রকৃতি হইতেই সার্থকতা লাভ করিতেছে, আর তিনি এইসব ক্রিয়ার অর্থ ইহাদের আপন অহং ও অজ্ঞানের ভাষায় নহে, পরন্তু ভগবৎপ্রকৃতির আলোকেই দেখিয়া থাকেন। সেইজন্যই তিনি দ্বিতীয়ত দেখিতে পান যে, দেব ও রাক্ষস, মানুষ ও পশুপক্ষী, সরীসৃপ, সাধু এবং অসাধু, মূর্খ এবং পণ্ডিত, ইহাদের কর্মের মধ্যে যে বিভিন্নতা আপাতদৃষ্ট হয়, সে সব ভগবদ্ গুণ ও শক্তিরই নানা অবস্থায়, নানা ছদ্মবেশের ক্রিয়া ভিন্ন আর কিছুই নহে। তিনি ছদ্মবেশের দ্বারা প্রতারিত হন না, কিন্তু প্রত্যেক ছদ্মবেশের অন্তরালেই ভগবানকে চিনিতে পারেন। তাঁহার দৃষ্টি বিকৃতি বা অসম্পূর্ণতা লক্ষ্য করে কিন্তু অন্তঃস্থলে প্রবেশ করিয়া পিছনে আত্মার যে সত্য রহিয়াছে সেইখানে পৌঁছায়, বিকৃতি ও অপূর্ণতার মধ্যেও আত্মাকে দেখিতে পায়, দেখে যে আত্মা নিজে নিজেকে অন্ধ করিয়া রাখিয়াছে, নিজেকে পাইবার জন্য সংগ্রাম করিতেছে, নানারূপ আত্মপ্রকাশ ও অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া পূর্ণ আত্মজ্ঞানের অভিমুখে, নিজেরই অনন্ত ও পূর্ণতম সিদ্ধির দিকে অগ্রসর হইয়াছে। মুক্ত পুরুষের দৃষ্টি বিকৃতি ও অপূর্ণতার উপরেই অযথা ঝোঁক দেয় না কিন্তু সকলকেই দেখিতে পায় হৃদয়ে পূর্ণ প্রেম ও উদারতার সহিত, বুদ্ধিতে পূর্ণ বোধের সহিত, আত্মায় পূর্ণ সমতার সহিত। তৃতীয়ত তিনি দেখেন আত্মপ্রকাশের শক্তিসকল ভগবানের দিকেই উঠিতে চেষ্টা করিতেছে, যেখানেই তিনি দেখিতে পান গুণ ও শক্তির সমুচ্চ প্রকাশ, ভাগবত সত্তার প্রদীপ্ত শিখা, যেখানে তিনি দেখেন আত্মা, মন, প্রাণ নীচের প্রকৃতির সাধারণ স্তর হইতে উঠিয়া সমুজ্জ্বল জ্ঞান, মহান শক্তি, তেজ, সক্ষমতা, সাহস, বীরত্ব, প্রেম ও আত্মদানের কল্যাণময় মধুরতা, আবেগ ও মহিমা, বিশিষ্ট পুণ্য, মহৎ কর্ম, মনোহর সৌন্দর্য ও সুষমা, দেবতুল্য সুন্দর সৃষ্টি, এইসব অসাধারণ মহত্ত্বের পরিচয় দিতেছে সেখানেই তিনি সেই সবকে শ্রদ্ধা করেন, অভ্যর্থনা করেন, উৎসাহিত করেন। আত্মার মুক্ত দৃষ্টি মহৎ বিভূতির মধ্যে দেখে যে মানুষের দেবত্ব জাগ্রত হইয়া উঠিতেছে।

ইহা হইতেছে ভগবানকে শক্তিরূপে চেনা—ব্যাপকতম অর্থে শক্তি, শুধু বলের শক্তি নহে পরন্তু জ্ঞানের, ইচ্ছার, প্রেমের, কর্মের, পবিত্রতার, মধুরতার সৌন্দর্যের শক্তি। ভগবান হইতেছেন সৎ, চিৎ, আনন্দ, জগতের প্রত্যেক জিনিস সৎ-এর শক্তি, চিৎ-এর শক্তি, আনন্দের শক্তি দ্বারা নিজেকে বাহিরে প্রকট করিতেছে এবং নিজের দিব্যস্বরূপ লাভ করিতেছে; এই জগৎ ভগবদ্ শক্তির কর্মের জগৎ। ঐ শক্তি অসংখ্য প্রকারের জীবে নিজেকে এখানে নানারূপে গড়িতেছে এবং প্রত্যেকের মধ্যেই তাহার বিশেষ বিশেষ শক্তি রহিয়াছে। প্রত্যেক শক্তিই এক একটি রূপের মধ্যে স্বয়ং ভগবান, ভগবান সিংহও হইয়াছেন আবার হরিণও হইয়াছেন, দানবও হইয়াছেন আবার দেবতাও হইয়াছেন, আকাশের উপর

প্রদীপ্যমান অচেতন সূর্য হইয়াছেন, আবার পৃথিবীর উপর মননশীল মানুষও হইয়াছেন। গুণত্রয়ের ক্রিয়া হইতে যে বিকৃতির উদ্ভব তাহা কেবল একটা গৌণ ভাব, মুখ্য ভাব নহে, মূল জিনিস হইতেছে ভগবদ্ শক্তি যাহা নিজের আত্মপ্রকাশের সন্ধান করিতেছে। উচ্চ মনীষী, বীর, নেতা, সিদ্ধগুরু, ঋষি, নবী, ধর্মপ্রবর্তক, সাধু, মানবপ্রেমিক, বড় কবি, বড় শিল্পী, বড় বৈজ্ঞানিক, আত্মসংযমী সন্ন্যাসী, জগজ্জয়ী শক্তিমান মানব, সকলের মধ্যে ভগবানই নিজেকে প্রকট করিতেছেন। কার্যটিও—মহৎ কাব্য, সর্বাঙ্গসুন্দর রূপ, গভীর প্রেম, মহৎ কর্ম, দিব্য সিদ্ধি, এসবই ভাগবতলীলা, ভগবানের আত্মপ্রকাশ।

এই যে সত্য, সকল প্রাচীন শিক্ষাদীক্ষাই ইহাকে স্বীকার করিয়াছে, শ্রদ্ধা করিয়াছে, কিন্তু আধুনিক মানবমনের একটা দিক এই সত্যের প্রতি কেমন যেন বিরূপ, ইহার মধ্যে কেবল বল ও শক্তির পূজাই দেখিতেছে, মনে করিতেছে এইভাবে শক্তিমানের পূজা করা অজ্ঞানপ্রসূত, ইহাতে মানুষকে হীন করা হয়, ইহা শুধু আসুরিক অতিমানবের তত্ত্ব। অবশ্য এই সত্যকে লোকে ভুলভাবে গ্রহণ করিতে পারে, বস্তুত সকল সত্যকেই ভুলভাবে গ্রহণ করা যায়, কিন্তু এই সত্যের যথাযোগ্য স্থান আছে, প্রকৃতির দিব্য ব্যবস্থায় ইহার অপরিহার্য ক্রিয়া আছে। গীতা সত্যটিকে সেই যথাস্থান ও যথার্থ রূপ দিয়াছে। সকল মানুষ, সকল জীবে ভাগবত সত্তা রহিয়াছে, এই জ্ঞানের উপর ঐ সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে; এই সত্য যেন উচ্চ-নীচ, উজ্জ্বল-ম্লান সকল প্রকার প্রকাশের প্রতি হৃদয়ের সমতা রাখার বিরোধী না হয়। মূর্খ, নীচ, দুর্বল, অধম, পতিত সকলের মধ্যেই ভগবানকে দেখিতে হইবে ও ভালবাসিতে হইবে। বিভূতিকেও যে পূজা করিতে হইবে, তাহা বাহ্যিক ব্যক্তিটিকে নহে, কিন্তু যে ভগবান তাহার মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করিতেছেন সেই ভগবানকেই পূজা করিতে হইবে (তবে বিভূতির বাহ্য ব্যক্তিস্বরূপকে ভগবানের প্রতীক হিসাবে পূজা করা চলিতে পারে)। কিন্তু তাই বলিয়া এই সত্যটিকে অস্বীকার করা চলে না যে, প্রকাশেরও উচ্চ-নীচ ক্রম আছে, প্রকৃতি তাহার আত্মপ্রকাশের ধারায় স্তরে স্তরে ঊর্ধ্বের দিকে চলিয়াছে, অনিশ্চিত, অস্পষ্ট, অস্ফুট প্রতীকসকল হইতে ভগবানের প্রথম সুস্পষ্ট প্রকাশের দিকে চলিয়াছে। প্রত্যেক মহৎ ব্যক্তি, প্রত্যেক মহৎ কর্ম, প্রকৃতির নিজেকে অতিক্রম করিবার সামর্থ্যের নিদর্শন এবং সর্বশেষ ও পরম ঊর্ধ্বায়ণের আশ্বাস। প্রকৃতির বিকাশে মানুষ নিজেই পশু পক্ষী সরীসৃপের তুলনায় একটা উচ্চতর ক্রম, যদিও সকলের মধ্যেই এক ব্রহ্ম রহিয়াছেন, সমং ব্রহ্ম। কিন্তু মানুষ নিজেকেও অতিক্রম করিয়া যত ঊর্ধ্বতম শিখরে উঠিতে পারে এখনও সেখানে পৌঁছায় নাই, ইতিমধ্যে যখনই তাহার মধ্যে আত্মবিকাশের কোনও মহত্তর শক্তির ইঙ্গিত পাওয়া যাইবে, সেইটিকেই তাহার পরম ঊর্ধ্বগতির আশা ও সূচনা বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। যেসকল অগ্রগামী মহাজন নিজেদের যে-কোনরূপ সিদ্ধির দ্বারা মানুষকে অতিমানবত্বের সম্ভাবনা দেখাইয়া দেন বা সেই দিকে পরিচালিত

করেন তাঁহাদের চিহ্নিত পথের দিকে চক্ষু তুলিয়া চাহিলে মানুষের অন্তর্নিহিত দেবত্বের অশ্রদ্ধা করা হয় না, বরং সে শ্রদ্ধা আরও উচ্চ, আরও গভীরতর অর্থে পূর্ণ হইয়া উঠে।

অর্জুন নিজেই একজন বিভূতি, অধ্যাত্মবিকাশে তিনি একজন উচ্চস্তরের মানব, সমসাময়িক জনগণের মধ্যে তিনি বিশিষ্ট ব্যক্তি, তিনি নারায়ণের, মানবরূপে অবতীর্ণ ভগবানের, নির্বাচিত যন্ত্র। এক স্থানে গুরু সকলের পরম ও এক আত্মারূপে বলিয়াছেন, তাঁহার প্রিয় বা অপ্রিয় কেহই নাই, আবার অন্যান্য স্থলে তিনি বলিয়াছেন যে, অর্জুন তাঁহার প্রিয়, তাঁহার ভক্ত, সেই জন্যই তিনি অর্জুনের ভার লইয়াছেন, তাঁহাকে পথ দেখাইতেছেন, দৃষ্টি ও জ্ঞান দিবার জন্য তিনি অর্জুনকেই নির্বাচিত করিয়াছেন। এখানে গুরুর কথায় বিরোধ রহিয়াছে বলিয়া মনে হইলেও বস্তুত কোনই বিরোধ নাই। বিশ্বের আত্মারূপে ভগবদ্ শক্তি সকলের প্রতিই সমান, প্রত্যেকের প্রতি প্রত্যেকের কর্ম অনুযায়ী ফল প্রদান করেন, কিন্তু পুরুষোত্তমের সহিত মানুষের একটা ব্যক্তিগত সম্বন্ধও আছে, যে মানব তাঁহার নিকট আসে তিনিও বিশেষ করিয়া তাহার নিকটে যান। এই যেসব বীর ও শক্তিমান পুরুষ কুরুক্ষেত্রের মহাসমর প্রাঙ্গণে সমবেত হইয়াছেন, ইহারা সকলেই ভগবানের ইচ্ছার যন্ত্র, প্রত্যেকের ভিতর দিয়া প্রত্যেকের স্বভাব অনুসারে ভগবানই কর্ম করিতেছেন, কিন্তু তিনি তাহাদের অহং-এর অন্তরালে থাকিয়া কর্ম করিতেছেন। অর্জুন এমন অবস্থায় পৌঁছিয়াছেন যখন তাঁহার এই অজ্ঞান আবরণ ভেদ করা যাইতে পারে এবং মানবদেহে অবতীর্ণ ভগবান তাঁহার বিভূতিকে তাহার কর্মের রহস্য উদ্ঘাটন করিয়া দেখাইতে পারেন। এমনকি এইরূপ প্রকাশ অপরিহার্য। অর্জুন এক মহান কর্মের যন্ত্র, সে কর্ম বাহ্যত অতি ভীষণ বটে, কিন্তু মানবজাতিকে প্রগতির পথে অনেকখানি অগ্রসর করাইয়া দিবার জন্য তাহা প্রয়োজনীয়, ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার দিকে মানবজাতির যে প্রয়াস তাহার সহায়তায় এই যুদ্ধ একটি প্রধান ঘটনা। মানবের যুগাবর্তনের ইতিহাস, মানবের আত্মা ও প্রাণে ভাগবত সত্তারই ক্রমবর্ধমান প্রকাশ, এই ইতিহাসের প্রত্যেক মহান ঘটনা ও অবস্থা ভগবানেরই এক একটি আবির্ভাব। অর্জুন ভগবানের নিগূঢ় ইচ্ছার প্রধান যন্ত্র, কুরুক্ষেত্রের মহান কর্মী, তিনি যাহাতে কার্যটিকে ভগবানের কর্ম বলিয়া জানিয়াই সজ্ঞানে করিতে পারেন সেইজন্য তাঁহাকে দিব্য মানব হইতে হইবে। কেবল তাহা হইলেই সে কর্ম অধ্যাত্মভাবে প্রাণময় হইয়া উঠিবে, তাহার প্রকৃত আধ্যাত্মিক সার্থকতা, তাহার নিগূঢ় উদ্দেশ্যের জ্যোতি ও শক্তি লাভ করিবে। অর্জুনকে আত্মজ্ঞান লাভের জন্য আহ্বান করা হইল; তাঁহাকে দেখিতে হইবে যে, ভগবানই এই বিশ্বের অধীশ্বর, জগতের সকল জীব, সকল ঘটনার উৎপত্তিস্থল, সমস্তই প্রকৃতিতে ভগবানের আত্মপ্রকাশ, সর্বত্র ভগবানকে দেখিতে হইবে। তাহার নিজের মানুষরূপে ও বিভূতিরূপে ভগবানকে দেখিতে হইবে, নীচ উচ্চ সকল স্তরের সত্তার মধ্যে ভগবানকে দেখিতে হইবে, উচ্চতম শিখরে

ভগবানকে দেখিতে হইবে; দেখিতে হইবে মানুষও উন্নত অবস্থায় বিভূতি, সেখান হইতে পরম মুক্তি ও মিলনের মধ্যে উচ্চতম শিখরে উঠিতেছে। কাল যে সৃষ্টি ও ধ্বংস করিতেছে, সেটিকেও ভগবানের রূপ, ভগবানের পদক্ষেপ বলিয়া দেখিতে হইবে—সেই পদক্ষেপে জগতের যুগান্তর সাধিত হয়, মানুষের মধ্যে ভগবদ্ সত্তা সেই যুগান্তরের বেগকে অবলম্বন করিয়া জগৎ মাঝে বিভূতিরূপে ভগবদ্ কর্ম সম্পাদন করিতে করিতে পরম সিদ্ধি লাভ করে। অর্জুনকে এই জ্ঞান দেওয়া হইয়াছে; এখন তাঁহাকে ভগবানের মহাকালরূপ দেখান হইবে এবং সেই রূপের সহস্র সহস্র মুখ হইতে মুক্ত বিভূতির প্রতি ভগবদ্ নির্দিষ্ট কর্ম সম্পাদনের নিমিত্ত আদেশ ঘোষিত হইবে।

দশম অধ্যায়

বিশ্বরূপ দর্শন

সংহারক মহাকাল

বিশ্বরূপ দর্শন গীতার একটি সর্বাপেক্ষা পরিচিত এবং কবিত্বশক্তিপূর্ণ অংশ, কিন্তু গীতার চিন্তাধারায় ইহার যে বিশিষ্ট স্থান রহিয়াছে সেইটি সহসা ধরিতে পারা যায় না। ইহা যে একটি কবিত্বময় ও দিব্যার্থময় রূপক তাহা সুস্পষ্ট এবং আমাদিগকে দেখিতে হইবে কিভাবে ইহাকে আনা হইয়াছে, আবিষ্কার করিতে হইবে ইহার গূঢ়ার্থব্যঞ্জক অংশগুলির নির্দেশ কি, তবেই আমরা ইহার প্রকৃত মর্ম বুঝিতে পারিব। যে অধ্যাত্মসত্তা ও শক্তি এই বিশ্বকে পরিচালিত করিতেছে তাহার জীবন্ত রূপ, অদৃশ্য ভগবানের দৃশ্য মহত্ত্ব, তাঁহার স্থূল শরীরটিই দেখিবার জন্য অর্জুনের যে ইচ্ছা তাহার দ্বারাই তিনি ইহাকে আহ্বান করিলেন। জগতের যে পরম গুহ্য অধ্যাত্ম তত্ত্ব তাহা তিনি শ্রবণ করিয়াছেন, ভগবান হইতেই সব, সবই ভগবান এবং সকল বস্তুর মধ্যেই ভগবান বাস করিতেছেন, লুক্কায়িত রহিয়াছেন এবং প্রত্যেক সসীম বস্তুর মধ্যেই তাঁহাকে প্রকট করিতে পারা যায়।[১] যে মোহ এমন দৃঢ়ভাবে মানুষের ইন্দ্রিয় ও মনকে অধিকার করিয়া রহিয়াছে, বস্তুসকল ভগবান ছাড়া নিজেদের মধ্যেই নিজদিগকে লইয়া থাকিতে পারে অথবা প্রকৃতির অধীন কোনও জিনিস স্বাধীনভাবে চলিতে পারে, নিজদিগকে পরিচালিত করিতে পারে, এই ধারণা অর্জুনের চিত্ত হইতে অপসারিত হইয়াছে—ঐটিই ছিল তাঁহার সংশয়ের, তাঁহার বিমূঢ়তার, তাঁহার কর্মত্যাগের প্রকৃত কারণ। এখন তিনি জানিয়াছেন যে, সত্তাসকলের উৎপত্তি ও লয়ের প্রকৃত অর্থ কি। তিনি জানিয়াছেন যে, দিব্য চৈতন্যময় আত্মার অব্যয় মাহাত্ম্যই এই দৃশ্য প্রপঞ্চের নিগূঢ় তত্ত্ব। সর্বভূতের মধ্যে এই মহান শাশ্বত অধ্যাত্ম সত্তা, সবই তাঁহার যোগ এবং সকল ঘটনা সেই যোগেরই পরিণাম ও প্রকাশ, নিখিল প্রকৃতি সেই গোপন ভগবৎসত্তায় পূর্ণ এবং নিজের মধ্যে তাহাকে প্রকট করিতে প্রয়াসী। কিন্তু অর্জুন সেই ভগবৎসত্তার স্থূলরূপ ও শরীরটিও দেখিতে চান, যদি তাহা সম্ভব হয়। তিনি তাঁহার গুণসকল শ্রবণ করিয়াছেন এবং তাঁহার আত্মপ্রকাশের ধারা কি, ক্রম কি

মদনুগ্রহায় পরমং গুহ্যমধ্যাত্মসংজ্ঞিতম্।
যত্ত্বয োক্তং বচস্তেন মোহোঽয ং বিগতো মম॥১১।১
ভবাপ্যয ৌ হি ভূতানাং শ্রুতৌ বিস্তরশো ময া।
ত্বত্ত: কমলপত্রাক্ষ মাহাত্ম্যমপি চাব্যয ম॥১১।২

তাহাও বুঝিয়াছেন; কিন্তু এখন তিনি তাঁহাব সেই অব্যয় আত্মরূপ দর্শন কবান।[১] অবশ্য তাঁহাব নিষ্ক্রিয় অক্ষব সত্তার অরূপ স্তব্ধতা নহে, পবন্তু সেই পবম পুরুষ যাঁহা হইতে সকল তেজ ও কর্মেব উৎপত্তি, সকল রূপ যাঁহাব ছদ্মবেশ, যিনি বিভূতিতে নিজেব শক্তি প্রকট করেন—কর্মের ঈশ্বর, জ্ঞান ও ভক্তিব ঈশ্বব, প্রকৃতি এবং তাহাব সকল জীবেব ঈশ্বব। এই মহত্তম সর্বব্যাপী দর্শনেব জন্য তাঁহাকে প্রার্থনা কবান হইল কারণ এইভাবেই বিশ্বমাঝে প্রকট পবমাত্মাব নিকট হইতে তাঁহাকে বিশ্বকর্মে তাঁহাব নিজেব কর্তব্য সম্পাদন কবিবাব আদেশ গ্রহণ করিতে হইবে।

অবতার উত্তব দিলেন, তোমাকে যাহা দেখিতে হইবে, মানবীয় চক্ষু তাহা ধরিতে পাবে না, কারণ মানুষেব চক্ষু কেবল জিনিসসকলেব বাহ্যিক রূপই দেখিতে পায় অথবা তাহাদিগকে ভিন্ন ভিন্ন প্রতীকরূপে দেখে, ইহাবা প্রত্যেকে অনন্ত বহস্যেব কেবলমাত্র কয়েকটি দিকেব আভাস দেয়।[২] কিন্তু দিব্যচক্ষু, অন্তবতম দৃষ্টি, যাহাব দ্বারা পবম ভগবানকে তাঁহাব যোগশক্তিতে দেখিতে পাওয়া যায়, সেই চক্ষু এখন আমি তোমাকে দিতেছি। তুমি দেখিবে আমাব নানাবিধ, নানা বর্ণের, নানা আকৃতিব শত-শত সহস্র-সহস্র দিব্য রূপ, তুমি দেখিবে আদিত্যগণ, রুদ্রগণ, মরুদ্‌গণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয, তুমি এমন অনেক অদ্ভুত জিনিস দেখিবে যাহা কেহ কখনও দেখে নাই, আমাব দেহেব মধ্যে সমগ্র জগৎকে সংগ্রথিত ও একত্রিত দেখিতে পাইবে, আর যাহা কিছু দেখিতে চাও সবই দেখিতে পাইবে, এইটিই তাহা হইলে মূলভাব, ভিতরেব অর্থ। ইহা হইতেছে বহুব মধ্যে এককে দর্শন, একেব মধ্যে বহুকে দর্শন—সবই সেই এক। দিব্যযোগেব চক্ষুতে এই যে দর্শন মুক্তি আনিয়া দেয, যাহাকিছু আছে, যাহাকিছু ছিল, যাহা-কিছু হইবে সেসবেবই সার্থকতা দেখাইয়া দেয, সবেবই ব্যাখ্যা কবিযা দেয। একবার এই দর্শন লাভ করিতে পাবিলে এবং ইহাকে ধাবণ কবিতে পাবিলে, ইহা ভগবদ্ জ্যোতিব কুঠারে সকল সংশয ও ভ্রান্তিব মূল ছিন্ন কবিযা দেয এবং সকল

[১] এবমেতদ্ যথাথ ত্বমাত্মানং পরমেশ্বব।
দ্রষ্টুমিচ্ছামি তে রূপমৈশ্ববং পুরুষোত্তম॥
মন্যসে যদি তচ্ছক্যং ময়া দ্রষ্টুমিতি প্রভো।
যোগেশ্বব ততো মে ত্বং দর্শযাত্মানমব্যযম্॥১১।৩-৪

[২] ন তু মাং শক্যসে দ্রষ্টুমনেনৈব স্বচক্ষুষা।
দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্ববম্॥১১।৮
পশ্য মে পার্থ রূপাণি শতশোঽথ সহস্রশঃ।
নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ॥
পশ্যাদিত্যান্ বসূন্ রুদ্রানশ্বিনৌ মরুতস্তথা।
বহূন্যদৃষ্টপূর্ব্বাণি পশ্যাশ্চর্য্যাণি ভাবত॥
ইহৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং পশ্যাদ্য সচবাচবম্।
মম দেহে গুডাকেশ যাচ্চান্যদ্ দ্রষ্টুমিচ্ছসি॥১১।৫-৭

দ্বন্দ্ব, সকল বিবোধকে বিলুপ্ত কবিয়া দেয়। এই যে দর্শন ইহা সামঞ্জস্য করে, ঐক্যসাধন কবে। এই দর্শনে ভগবানকে যেভাবে দেখা যায় যদি তাহাব সহিত আত্মা ঐক্যবোধ লাভ কবিতে পারে (অর্জুন এখনও তাহা পারেন নাই, তাই আমবা দেখি তিনি ভযে অভিভূত হইযা পড়িলেন), জগতে ভীষণ যাহাকিছু আছে সেসবেবও ভীষণতা দূব হইযা যায়। সেইটিকেও আমরা ভগবানেরই একটি ভাব বলিযা দেখিতে পাই, এবং যখন আমরা ইহার মধ্যে তাঁহার দিব্য উদ্দেশ্যের সন্ধান পাই, শুধু এইটিকেই স্বতন্ত্রভাবে দেখি না, তখন আমবা সর্বতোমুখী আনন্দ ও বিপুল সাহসেব সহিত জগৎকে সমগ্রভাবেই ববণ করিয়া লইতে পাবি, আমাদেব উপব যে কর্মেব ভাব অর্পিত হইয়াছে অবিচলিত পদক্ষেপে তাহার দিকে অগ্রসব হইতে পাবি। যে দিব্য জ্ঞান সকল জিনিসকে ঐক্যেব দৃষ্টিতে দেখে, বিচ্ছিন্নভাবে আংশিকভাবে দেখে না এবং সেইজন্যই বিমূঢ় হয় না, আত্মা একবার সেই জ্ঞানে প্রবেশলাভ কবিতে পারিলে জগৎকে এবং আর যাহা কিছু সে দেখিতে ইচ্ছা কবে সবকেই নূতনভাবে আবিষ্কাব করিতে পারে, যচ্চান্যদ্-দ্রষ্টুমিচ্ছসি। সকলেব মধ্যে সম্বন্ধ-স্থাপনকাবী, ঐক্য-স্থাপনকারী, এই দৃষ্টির ভিত্তিতে সে দিব্যজ্ঞান হইতে পূর্ণতর দিব্যজ্ঞানের দিকে অগ্রসব হইতে পারে।

তাহাব পব পবম ঐশ রূপ অর্জুনের দৃষ্টিগোচর কবা হইল।[১] সে রূপ অনন্ত ভগবানেব, তাঁহাব মুখ সর্বত্র এবং তাঁহার মধ্যে সমস্ত আশ্চর্যময় বস্তু, তিনি অনববত তাঁহার সত্তাব যেসকল অপরূপ প্রকটন কবিতেছেন তাহাদের শেষ নাই—সমগ্র বিশ্বে প্রসাবিত ভগবান তিনি, অসংখ্য চক্ষু দিয়া দেখিতেছেন, অসংখ্য মুখ দিযা কথা কহিতেছেন, অসংখ্য দিব্য-অস্ত্রে তিনি যুদ্ধের জন্য সজ্জিত, দিব্য আভবণে ভূষিত, দিব্য বস্ত্র পবিহিত, দিব্য পুষ্পের মালায অলঙ্কৃত, দিব্য সৌগন্ধ্যে অনুলিপ্ত। ভগবানেব এই শরীরেব এমন প্রভা যেন আকাশে একেবারে সহস্র সূর্য উদিত হইয়াছে। সেই দেবদেবেব শরীবে সমগ্র জগৎ বহুধা বিভক্ত অথচ একীভূত দেখা যাইতেছে। অর্জুন দেখিলেন অত্যাশ্চর্যময, সুন্দর,

[১] এবমুক্ত্বা ততো রাজন্ মহাযোগেশ্ববো হবিঃ।
দর্শযামাস পার্থায পবমং রূপমৈশ্ববম্॥
অনেকবক্ত্রনযনমনেকাদ্ভুতদর্শনম্।
অনেকদিব্যাভবণং দিব্যানেকোদ্যতাযুধম্॥
দিব্যমাল্যাম্ববধবং দিব্যগন্ধানুলেপনম্।
সর্বাশ্চর্যমযং দেবমনন্তং বিশ্বতোমুখম্॥
দিবি সূর্যসহস্রস্য ভবেদ্ যুগপদুত্থিতা।
যদি ভাঃ সদৃশী সা স্যাদ্ভাসস্তস্য মহাত্মনঃ॥
তত্রৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং প্রবিভক্তমনেকধা।
অপশ্যদ্দেবদেবস্য শবীরে পাণ্ডবস্তদা॥
ততঃ স বিস্ময়াবিষ্টো হৃষ্টরোমা ধনঞ্জযঃ।
প্রণম্য শিবসা দেবং কৃতাঞ্জলিরভাষত॥১১।৯-১৪

ভীষণ ভগবান, জীবগণের অধিপতি, যিনি তাঁহার অধ্যাত্মসত্তার মহিমা ও মহত্ত্বে এই উদ্দাম ও বিকট, সুশৃঙ্খলাময় ও চমৎকার, মধুর ও ভয়ঙ্কর জগৎ প্রকটিত করিয়াছেন এবং তিনি বিস্ময়ে, হর্ষে, ভয়ে অভিভূত হইয়া অবনতমস্তকে নমস্কারপূর্বক ভক্তিপূর্ণবাক্যে করজোড়ে সেই বিরাট মূর্তির স্তব করিতে লাগিলেন—"হে দেব, তোমার দেহে আমি সকল দেবতা, বিশেষ বিশেষ ভূতবর্গ, কমলাসনস্থ সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা এবং ঋষিগণ ও দিব্য সর্পগণকে দর্শন করিতেছি। আমি দেখিতেছি অসংখ্য বাহু, অসংখ্য উদর, অসংখ্য নেত্র, অসংখ্য মুখ, সর্বত্র আমি তোমার অনন্তরূপ দর্শন করিতেছি, কিন্তু হে বিশ্বেশ্বর, বিশ্বরূপ, আমি তোমার অন্ত মধ্য আদি দেখিতে পাইতেছি না। আমি তোমাকে দেখিতেছি কিরীটী, গদাচক্রধারী, আমার চতুর্দিকে দীপ্তিমান, তেজোপুঞ্জ তুমি দুর্নিরীক্ষ্য, সর্বব্যাপী দ্যুতি, সূর্য-প্রভ, অগ্নি-প্রভ অপ্রমেয়। তুমি পরম অক্ষর এবং তুমিই জ্ঞাতব্য, তুমি এই বিশ্বের পরম আধার ও আশ্রয় তুমিই শাশ্বত ধর্মসমূহের অবিনশ্বর প্রতিপালক, তুমিই সনাতন পুরুষ।"[১]

কিন্তু এই মহান রূপের মধ্যেই ভীষণ সংহারকেরও মূর্তি রহিয়াছে। এই যে অপ্রমেয়, যাঁহার অন্ত নাই, আদি নাই, ইহারই মধ্যে সকল জিনিসের উদ্ভব, স্থিতি ও লয়।[২] এই যে ভগবান অসংখ্য বাহুর দ্বারা জগৎসমূহকে আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছেন এবং কোটি কোটি হস্তের দ্বারা সংহার করিতেছেন, সূর্য ও চন্দ্রসকল যাঁহার চক্ষু, ইঁহার মুখমণ্ডলে হুতাশন প্রজ্বলিত, এবং নিজ তেজরশ্মিতে তিনি নিরন্তর নিখিল বিশ্বকে সন্তপ্ত করিতেছেন। তাঁহার রূপ অতিশয় ভয়ঙ্কর ও চমৎকার; একাকীই তাহা দিক্‌সমূহে ব্যাপ্ত রহিয়াছে এবং স্বর্গ ও মর্ত্যের সমগ্র

[১] পশ্যামি দেবাংস্তব দেব দেহে সর্ব্বাংস্তথা ভূতবিশেষসঙ্ঘান্।
ব্রহ্মাণমীশং কমলাসনস্থমৃষীংশ্চ সর্ব্বানুরগাংশ্চ দিব্যান্॥
অনেকবাহূদরবক্ত্রনেত্রং পশ্যামি ত্বাং সর্ব্বতোঽনন্তরূপম্।
নান্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ॥
কিরীটিনং গদিনং চক্রিণং চ তেজোরাশিং সর্ব্বতোদীপ্তিমন্তম্।
পশ্যামি ত্বাং দুর্নিরীক্ষ্যং সমন্তাদ্দীপ্তানলার্কদ্যুতিমপ্রমেয়ম্॥
ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
ত্বমব্যয়ঃ শাশ্বতধর্মগোপ্তা সনাতনস্ত্বং পুরুষো মতো মে॥১১।১৫-১৮

[২] অনাদি মধ্যান্তমনন্তবীর্য্যমনন্তবাহুং শশিসূর্য্যনেত্রম্।
পশ্যামি ত্বাং দীপ্তহুতাশবক্ত্রং স্বতেজসা বিশ্বমিদং তপন্তম॥
দ্যাবাপৃথিব্যোরিদমন্তরং হি ব্যাপ্তং ত্বয়ৈকেন দিশশ্চ সর্ব্বাঃ।
দৃষ্ট্বাদ্ভুতং রূপমুগ্রং তবেদং লোকত্রয়ং প্রব্যথিতং মহাত্মন॥১১।১৯-২০
অমী হি ত্বাং সুরসঙ্ঘা বিশন্তি কেচিদ্ভীতাঃ প্রাঞ্জলয়ো গৃণন্তি।
স্বস্তীত্যুক্ত্বা মহর্ষিসিদ্ধসঙ্ঘাঃ স্তুবন্তি ত্বাং স্তুতিভিঃ পুষ্কলাভিঃ॥১১।২১
রুদ্রাদিত্যা বসবো যে চ সাধ্যা বিশ্বেঽশ্বিনৌ মরুতশ্চোষ্মপাশ্চ।
গন্ধর্ব্ব যক্ষাসুর সিদ্ধসঙ্ঘা বীক্ষন্তে ত্বাং বিস্মিতাশ্চৈব সর্ব্বে॥১১।২২

ব্যবধান জুড়িয়া বিরাজ করিতেছে। ভীতাস্তঃকরণে স্তব করতে করিতে সুরসঙ্ঘ তাঁহার মধ্যে প্রবেশ করিতেছে, মহর্ষি ও সিদ্ধগণ "শান্তি হউক, কল্যাণ হউক" ইহা বলিয়া তাঁহাকে বহুলভাবে স্তব করিতেছেন। দেবগণ, রুদ্রগণ, গন্ধর্ব যক্ষ অসুরগণ তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিয়া চমৎকৃত হইতেছে। তাঁহার নয়নসকল প্রদীপ্ত ও বিশাল; তাঁহার মুখমণ্ডল করাল দংষ্ট্রাযুক্ত এবং ভক্ষণ করিবার জন্য বিস্ফারিত; প্রলয় কালের হুতাশন সদৃশ তাঁহার ভীষণ আনন।[১] সেই মহাযুদ্ধে উভয়পক্ষের নৃপতিগণ, সেনাপতিগণ, বীরগণ তাঁহার দংষ্ট্রাকরাল ভয়ানক মুখসমূহের মধ্যে দ্রুত প্রবেশ করিতেছেন, দেখা যাইতেছে কেহ কেহ তাঁহার বিশাল দংষ্ট্রার সন্ধিস্থলে সংলগ্ন, তাঁহাদের মস্তক চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইতেছে; যেমন বহু নদী সমুদ্রাভিমুখে ধাবিত হয় অথবা যেমন পতঙ্গগণ প্রজ্বলিত অগ্নিতে প্রবেশ করে তেমনই লোকসমূহ অবশভাবে মরণের নিমিত্ত অতি বেগে তাঁহার অগ্নিময় মুখসমূহের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে। সেই সকল প্রদীপ্ত বদন লইয়া সেই করাল মূর্তি চারিদিক লেহন করিতেছেন, সমগ্র জগৎ তাঁহার অগ্নিময় তেজে পরিব্যাপ্ত এবং তাঁহার অত্যুগ্র দীপ্তিতে সন্তপ্ত। জগৎ এবং তাহার লোকসমূহ ধ্বংসভয়ে কম্পিত ও ব্যথিত এবং চারিদিকে যে ভয় ও যন্ত্রণা অর্জুনও তাহাতে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছেন। তিনি সেই করাল মূর্তি ভগবানকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "এই উগ্র মূর্তিধারী তুমি কে, আমাকে বল। হে দেববর, আমি তোমাকে নমস্কার করিতেছি, তুমি প্রসন্ন হও। আদিপুরুষ তোমাকে জানিবার আমার নিতান্ত ইচ্ছা হইতেছে, কারণ তোমার সঙ্কল্প ও কর্মধারা আমি বুঝিতেছি না।"[২]

রূপং মহত্তে বহুবক্ত্রনেত্রং মহাবাহো বহুবাহূরুপাদম্।
বহূদরং বহুদংষ্ট্রাকরালং দৃষ্ট্বা লোকাঃ প্রব্যথিতাস্তথাহম্॥
নভঃস্পৃশং দীপ্তমনেকবর্ণং ব্যাত্তাননং দীপ্তবিশালনেত্রম্।
দৃষ্ট্বা হি ত্বাং প্রব্যথিতান্তরাত্মা ধৃতিং ন বিন্দামি শমং চ বিষ্ণো॥
দংষ্ট্রাকরালানি চ তে মুখানি দৃষ্ট্বৈব কালানলসন্নিভানি।
দিশো ন জানে ন লভে চ শর্ম্ম প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস॥॥১১।২৩-২৫
অমী চ ত্বাং ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রাঃ সর্ব্বে সহৈবাবনিপালসঙ্ঘৈঃ।
ভীষ্মো দ্রোণঃ সূতপুত্রস্তথাসৌ সহাস্মদীয়ৈরপি যোধমুখ্যৈঃ॥
বক্ত্রাণি তে ত্বরমাণা বিশন্তি দংষ্ট্রাকরালানি ভয়ানকানি।
কেচিদ্বিলগ্না দশনান্তরেষু সংদৃশ্যন্তে চূর্ণিতৈরুত্তমাঙ্গৈঃ॥
যথা নদীনাং বহবোঽম্বুবেগাঃ সমুদ্রমেবাভিমুখা দ্রবন্তি।
তথা তবামী নরলোকবীরা বিশন্তি বক্ত্রাণ্যভিবিজ্বলন্তি॥
যথা প্রদীপ্তং জ্বলনং পতঙ্গা বিশন্তি নাশায় সমৃদ্ধবেগাঃ।
তথৈব নাশায় বিশন্তি লোকাস্তবাপি বক্ত্রাণি সমৃদ্ধবেগাঃ॥
লেলিহ্যসে গ্রসমানঃ সমন্তাল্লোকান্ সমগ্রান্ বদনৈর্জ্বলদ্ভিঃ।
তেজোভিরাপূর্য্য জগৎ সমগ্রং ভাসস্তবোগ্রাঃ প্রতপন্তি বিষ্ণো॥
আখ্যাহি মে কো ভবানুগ্ররূপো নমোঽস্তু তে দেববর প্রসীদ।
বিজ্ঞাতুমিচ্ছামি ভবন্তমাদ্যং ন হি প্রজানামি তব প্রবৃত্তিম্॥১১।২৬-৩১

অর্জুনের এই যে শেষ প্রশ্ন ইহার মধ্যে বিশ্বরূপের দুইটি ভাবের ইঙ্গিত রহিয়াছে। এইটি হইতেছে সনাতন চির-পুরাতন বিশ্বপুরুষের রূপ, সনাতনম্ পুরুষম্ পুরাণম্, ইনিই চিরকাল সৃষ্টি করিতেছেন কারণ সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা ইঁহারই দেহে দৃশ্য দেবগণের মধ্যে একজন, তিনি হইতেছেন সর্বদা জগতের স্থিতি, কারণ তিনিই শাশ্বত ধর্মসকলের প্রতিপালক, কিন্তু তিনিই আবার সর্বদা ধ্বংস করিতেছেন যেন পুনরায় নূতন সৃষ্টি করিতে পারেন, তিনি কাল, তিনি মৃত্যু, তিনি নটরাজ রুদ্র, তিনি কালী মুণ্ডমালা পরিয়া উলঙ্গিনী হইয়া সমরে নৃত্য করিতেছেন এবং নিহত অসুরগণের শোণিতে নিজেকে রঞ্জিত করিতেছেন, তিনিই ঘূর্ণ্যাবর্ত, দাবানল, ভূমিকম্প, তিনিই দুঃখ, দুর্ভিক্ষ, বিপ্লব, ধ্বংস এবং সর্বগ্রাসী সমুদ্র। আর এই যে তাঁহার শেষোক্ত রূপ, এইটিই তিনি এখন সম্মুখে ধরিলেন। এই রূপের সম্মুখ হইতে মানুষের মন স্বভাবতই প্রত্যাবৃত হয়, এবং সে চক্ষু মুদিয়া থাকে এই আশায় যে সে নিজে না দেখিলে হয়তো বা সেই ভীষণমূর্তি তাহাকে দেখিতে পাইবে না। মানুষের দুর্বল হৃদয় শুধু চায় মনোরম ও আরামদায়ক সত্য, আর তাহা না পাওয়া গেলে চায় মনোরম মিথ্যা কাহিনী, ইহা সত্যকে তাহার পূর্ণতায় চায় না, কারণ তাহার মধ্যে এমন অনেক কিছুই আছে যাহা স্পষ্ট নহে, মনোরম নহে, আরামপ্রদ নহে, পরন্তু বুঝা কঠিন এবং সহ্য করা আরও কঠিন। অপর ধর্মপন্থী, তরলবুদ্ধি আশাবাদী, ভাবপ্রবণ আদর্শবাদী, ইন্দ্রিয় ও হৃদয়াবেগের দাস মানুষ, নির্মম সিদ্ধান্তসকলকে, বিশ্বজগতের কর্কশ ও ভীষণ দিকগুলিকে বিকৃত ব্যাখ্যার দ্বারা উড়াইয়া দিতে চায়। ভারতের ধর্মকে অনেকেই অজ্ঞভাবে নিন্দা করিয়া থাকে কারণ উহা এই লুকোচুরি খেলায় যোগ দেয় না, বরং ভগবানের যেমন মধুর ও সুন্দর ভাবগুলির তেমনই ভীষণ ভাবগুলিরও প্রতীক গড়িয়া তুলিয়াছে এবং সর্বদা সম্মুখে রাখিয়াছে। কিন্তু ইহার সুদীর্ঘ চিন্তাধারা ও অধ্যাত্মসাধনার গভীরতা ও উদারতার কল্যাণে ইহা এই সব দৌর্বল্যসূচক সঙ্কোচ অনুভব করে নাই বা সেসবকে প্রশ্রয় দেয় নাই।

ভারতের আধ্যাত্মিকতা জানে যে, ভগবান প্রেমময়, শান্তিময় এবং সুস্থির শাশ্বত—যে গীতা আমাদিগকে এই সব ভীষণ রূপ দর্শন করাইয়াছে, সেই গীতাই বলিয়াছে যে, ভগবান সর্বভূতের প্রেমিকরূপে, সুহৃদরূপে তাহাদের মধ্যে প্রকট। কিন্তু তাঁহার দিব্যভাবে জগৎপরিপালনের নির্মম দিকও রহিয়াছে, ধ্বংসের দিক এবং তাহা প্রথম হইতেই আমাদের চক্ষে পড়ে, এইটিকে দেখিতে অস্বীকার করার অর্থ ভগবৎপ্রেম, শান্তি ও আনন্দের পূর্ণ মর্ম গ্রহণে অসমর্থ হওয়া, এমনকি তাহার উপরে একটা পক্ষপাত ও মিথ্যার ভার আরোপ করা হয়, কারণ ইহাকে যে একান্ত প্রীতিদায়ক রূপ দেওয়া হয়, আমরা যে জগতে বাস করিতেছি তাহার প্রকৃতির সহিত সেটির মিল হয় না। এই যে আমাদের সংগ্রামের, কষ্টকর প্রয়াসের জগৎ, ইহা ভীষণ, বিপজ্জনক, ধ্বংসকারী, গ্রাসকারী জগৎ, এখানে জীবনের অস্তিত্ব ক্ষণভঙ্গুর, মানুষের আত্মা ও দেহ এখানে অসংখ্য বিপদের মধ্যে বিচরণ

করে, এইটি এমন জগৎ যে এখানে আমাদের প্রতি পদক্ষেপে, ইচ্ছায় হউক বা অনিচ্ছায় হউক, কোন না কোন জিনিসকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিতে হয়, এখানে জীবনের প্রত্যেক নিঃশ্বাস মরণেরও নিঃশ্বাস। যাহা কিছু অশুভ বলিয়া, ভীষণ বলিয়া আমাদের মনে হয়, সেসবের দায়িত্ব একটি প্রায়-সর্বশক্তিমান শয়তানের স্কন্ধে চাপাইয়া দেওয়া, অথবা প্রকৃতির অংশ বলিয়া উপেক্ষা করা এবং এইভাবে ভগবৎপ্রকৃতি এবং জাগতিক প্রকৃতির মধ্যে এক অনতিক্রমণীয় ব্যবধানের সৃষ্টি করা, যেন প্রকৃতি ভগবান ছাড়া একটা কিছু, অথবা সমস্ত দায়িত্ব মানুষ এবং তাহার পাপের উপরে চাপাইয়া দেওয়া, যেন জগৎ কিরূপ হইবে সে বিষয়ে তাহার মতের খুব প্রাধান্য ছিল বা সে ভগবানের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কিছু সৃষ্টি করিতে পারিত—এইসব কৌশলের দ্বারা লোকে যে কোনরকমে নিজেদের ভুলাইতে চায়, ভাবতের অধ্যাত্ম চিন্তাধারা কখনও এসবের আশ্রয় গ্রহণ করে নাই। আমাদিগকে সাহসভরে সত্যের দিকে চাহিয়া দেখিতে হইবে এবং দেখিতে হইবে যে, আর কেহ নহে স্বয়ং ভগবানই নিজের সত্তার মধ্যে এই জগৎকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং এমনি করিয়াই সৃষ্টি করিয়াছেন। আমাদিগকে দেখিতে হইবে, প্রকৃতি নিজের সন্তানগণকে উদরসাৎ করিতেছে, কাল জীবসকলের জীবন গ্রাস করিতেছে, সর্বব্যাপী ও অপরিহার্য মৃত্যু, এবং মানুষে ও প্রকৃতিতে রুদ্র শক্তিসকলের প্রচণ্ডতা, এই সব হইতেছে পরম ভগবানেরই বহু বিশ্বরূপের একটি রূপ। আমাদিগকে দেখিতে হইবে যে, ভগবান মুক্তহস্ত অমিত সৃষ্টিকর্তা, সাহায্যদাতা, শক্তিমান ও করুণাময় রক্ষাকর্তা, আবার সেই ভগবানই গ্রাসকর্তা ও ধ্বংসকর্তা। সুখ, মাধুর্য ও আনন্দ যেমন তাঁহার স্পর্শ, তেমনই যে দুঃখ ও অশুভের পীড়ন-যন্ত্রে আমরা দুর্বিষহ যন্ত্রণা ভোগ করি তাহাও তাঁহারই স্পর্শ। যখন আমরা পূর্ণ মিলনের দৃষ্টি লইয়া দেখি এবং আমাদের সত্তার গভীরতম প্রদেশে এই সত্য অনুভব করি, কেবল তখনই আমরা সেই ছদ্মবেশেরও পশ্চাতে সর্বমঙ্গলময় ভগবানের শান্ত ও সুন্দর মুখ পূর্ণভাবে আবিষ্কার করিতে পারি এবং এই যে বেদনার স্পর্শ আমাদের দোষ-ত্রুটির পরীক্ষা করে তাহার মধ্যেই বন্ধুর স্পর্শ, মানুষের অধ্যাত্মজীবন-বিকাশকর্তার স্পর্শ উপলব্ধি করিতে পারি। জগতে যেসব দ্বন্দ্ব-বিরোধ, সেসব ভগবানেরই দ্বন্দ্ব-বিরোধ, আর কেবল সেই সবকে স্বীকার করিয়া লইয়া, তাহাদের মধ্য দিয়া যাইয়াই আমরা তাঁহার পরম সামঞ্জস্যের মহত্তর সুরসঙ্গতিগুলির মধ্যে, তাঁহার বিশ্বাতীত ও বিশ্বগত আনন্দের শিখর ও অনন্তপ্রসারী পুলকস্পন্দনসকলের মধ্যে উপনীত হইতে পারি।

গীতা যে সমস্যাটি তুলিয়াছে এবং তাহার যে সমাধান দিয়াছে, তাহাতে বিশ্বপুরুষকে এই স্বরূপেই দেখাইতে হয়। সমস্যাটি হইতেছে এক বিরাট যুদ্ধের, ধ্বংসের, হত্যাকাণ্ডের—যাহা সর্বনিয়ন্তা ভগবদিচ্ছার দ্বারাই আনীত হইয়াছে এবং তাহাতে চির-অবতার নিজে প্রধান যোদ্ধার রথের সারথিরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। এই রূপ যিনি দর্শন করিতেছেন তিনি নিজেই সেই প্রধান যোদ্ধা, সংগ্রামপরায়ণ

মানবাত্মার প্রতিভূ তিনি, তাঁহাকে তাঁহার ক্রমবিকাশের পথে বাধাস্বরূপ নির্মম ও অত্যাচারী শক্তিসকলকে দমন করিতে হইবে এবং এক উচ্চতর অধিকারের, মহত্তর ধর্মের রাজ্য স্থাপন ও উপভোগ করিতে হইবে। যে বিরাট উপপ্লবে আত্মীয় আত্মীয়কে হত্যা করে, জাতিসকল সমূলে বিনষ্ট হয়, সমগ্র সমাজই বিশৃঙ্খলা ও অনাচারের আবর্তে ডুবিয়া যাইবে বলিয়া মনে হয়, তাহার ভীষণ স্বরূপে বিকল হইয়া তিনি পিছাইয়া পড়িয়াছেন, নিয়তির নির্ধারিত কর্ম করিতে অস্বীকৃত হইয়াছেন এবং তাঁহার দিব্য বন্ধু ও দিশারীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, কেন তাঁহাকে এই ভীষণ কর্মে নিযুক্ত করা হইল, কিং কর্ম্মণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সি? তখন তাঁহাকে দেখান হইয়াছে, যেকোন কর্মই সে করুক না কেন, কেমন করিয়া ব্যক্তিগতভাবে সেই কর্মের বাহ্যিক স্বরূপের উপরে উঠা যায়, কেমন করিয়া দেখা যায় যে, কার্যনির্বাহিকাশক্তিরূপিণী প্রকৃতিই কর্মের কর্ত্রী, তাঁহার প্রাকৃত সত্তা যন্ত্রস্বরূপ, ভগবান প্রকৃতির এবং কর্মসকলের অধীশ্বর, কোনরূপ বাসনা বা স্বার্থপরতা না রাখিয়া সকল কর্মই যজ্ঞরূপে তাঁহাকে অর্পণ করিতে হইবে। তাঁহাকে আরও দেখান হইয়াছে যে, ভগবান এই সব জিনিসের ঊর্ধ্বে রহিয়াছেন, তাহাদের স্পর্শের অতীত, অথচ তিনি মনুষ্যে ও প্রকৃতিতে ও তাহাদের কর্মে নিজেকে প্রকট করিতেছেন এবং সংসারের সবকিছুই ভগবানের এই লীলাবর্তের অঙ্গ। কিন্তু এখন তাঁহাকে এই সত্যের মূর্তিমান বিগ্রহের সম্মুখীন করা হইল, এই মহান ভগবদ্ রূপের মধ্যে তিনি ভীষণতা ও ধ্বংসের দিকটিকে অতিশয় পরিবর্ধিতাকারে দেখিলেন, তিনি অভিভূত হইয়া পড়িলেন, তাঁহার পক্ষে সহ্য করা কঠিন হইয়া উঠিল। কারণ বিশ্বপুরুষকে এমন করিয়া প্রকৃতির মধ্যে নিজেকে প্রকট করিতে হয় কেন? এই যে মরজীবন সৃজন ও ধ্বংসের বহ্নিতে এই জগদ্‌ব্যাপী সংগ্রাম, অনর্থকারী বিপ্লবের এইরূপ পুনঃপুনঃ সংঘটন, জীবগণের এই কষ্টকর প্রয়াস, নিদারুণ দুঃখ ও যন্ত্রণা ও মৃত্যু—এসবের কি অর্থ? তিনি সেই পুরাতন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন এবং শাশ্বত প্রার্থনা ব্যক্ত করিলেন—"আমাকে বল, এই উগ্রমূর্তিধারী তুমি কে? আদিপুরুষ তোমাকে জানিবার জন্য আমার অত্যন্ত ইচ্ছা হইতেছে; কারণ আমি তোমার সঙ্কল্প ও কর্ম্মধারা কিছুই জানি না। তুমি প্রসন্ন হও।"[১]

ভগবান উত্তর দিলেন, ধ্বংসই আমার কর্মের সঙ্কল্প, সেই সঙ্কল্প লইয়াই আমি এই ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে ("ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র" মানবের কর্মক্ষেত্রেরই রূপক) দণ্ডায়মান হইয়াছি, মহাকালের গতিতে এই জগদ্‌ব্যাপী ধ্বংসকাণ্ড উপস্থিত হইয়াছে। পূর্ব হইতেই দৃষ্ট আমার এক উদ্দেশ্য আছে, তাহা অনিবার্যরূপেই সিদ্ধ হইবে, কোন মানুষ যোগ দিক বা না দিক কিছুতেই সে উদ্দেশ্যকে বাধা দিতে,

[১] আখ্যাহি মে কো ভবানুগ্ররূপো নমোঽস্তু তে দেববর প্রসীদ।
বিজ্ঞাতুমিচ্ছামি ভবন্তমাদ্যং ন হি প্রজানামি তব প্রবৃত্তিম্॥১১।৩১

পরিবর্তন করিতে বা ক্ষুণ্ণ করিতে পারিবে না; মানুষ পৃথিবীতে আদৌ তাহা সম্পন্ন করিবার পূর্বে আমার সঙ্কল্পের শাশ্বত দৃষ্টিতে আমি পূর্বেই সব করিয়া রাখিয়াছি। মহাকালরূপে আমাকে পুরাতন সংগঠন সকলকে ধ্বংস করিতে হয় এবং নূতন, মহান, গরিমাময় রাজ্য গড়িয়া তুলিতে হয়। এই যুদ্ধ তুমি নিবারণ করিতে পারিবে না, ইহাতে ভাগবত শক্তি ও জ্ঞানের মানবীয় যন্ত্রস্বরূপ তোমাকে ধর্মের জন্য সংগ্রাম করিতে হইবে এবং ধর্মবিরোধীগণকে নিধন করিতে হইবে, জয় করিতে হইবে। প্রকৃতিতে আবির্ভূত মানবাত্মা তুমি, আমি প্রকৃতির ক্ষেত্রে তোমাকে যে ফল প্রদান করিব, ধর্ম ও ন্যায়ের রাজ্য, তাহাও তোমাকে ভোগ করিতে হইবে। ইহাই যেন তোমার পক্ষে যথেষ্ট হয়—তোমার আত্মায় ভগবানের সহিত এক হওয়া, তাঁহার আদেশ মাথা পাতিয়া লওয়া, তাঁহার ইচ্ছা সম্পাদন করা, জগতে এক মহান উদ্দেশ্য পূর্ণ হইতেছে, শান্তভাবে তাহা অবলোকন করা। "আমি লোকক্ষয়কারী মহাকাল প্রবৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছি, লোকসকলকে ধ্বংস করাই এখানে আমার সঙ্কল্প ও কর্মধারা। তুমি যুদ্ধ না করিলেও প্রতিপক্ষীয় যোদ্ধাগণের মধ্যে কেহই জীবিত থাকিবে না।[১] অতএব উঠ, যশোরাশি লাভ কর, তোমার শত্রুগণকে জয় করিয়া সমৃদ্ধিশালী রাজ্য ভোগ কর। তাহারা ইতিপূর্বে আমারই দ্বারা নিহত হইয়া আছে, হে সব্যসাচিন্! তুমি নিমিত্তমাত্র হও। আমার দ্বারা যাহারা নিহত হইয়াছে সেই দ্রোণ, ভীষ্ম, জয়দ্রথ, কর্ণ এবং অন্যান্য বীর যোদ্ধাগণকে বধ কর, ব্যথিত বা ক্ষুব্ধ হইও না। যুদ্ধ কর, তুমি শত্রুদিগকে জয় করিতে পারিবে।" এই মহান ও ভীষণ কর্মের ফল কি হইবে সে সম্বন্ধে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইল, ভবিষ্যদ্বাণী করা হইল, মানুষ যে বাসনার বশবর্তী হইয়া ফল কামনা করে সে ফল নহে—কারণ কর্মফলে আসক্তি রাখা চলিবে না—পরন্তু ভগবদিচ্ছার পরিপূরণ, যে কার্যটি করিতে হইবে তাহার সম্পাদনের গৌরব ও সাফল্য, এই গৌরব ভগবান বিভূতিরূপে নিজেকেই দিতেছেন। এইভাবেই সেই জগৎ-যুদ্ধের প্রধান নায়ককে কর্মে প্রবৃত্ত হইবার শেষ ও অলঙ্ঘনীয় আদেশ প্রদান করা হইল।

যিনি কালের অতীত তিনিই মহাকাল ও বিশ্বপুরুষরূপে আবির্ভূত হইয়া আদেশ প্রদান করিলেন। কারণ ভগবান যখন বলিলেন, কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ, আমি সত্তাসকলের ধ্বংসকারী মহাকাল, তাহার অর্থ নিশ্চয়ই ইহা নহে যে, তিনি শুধুই মহাকাল এবং মহাকালের সমগ্র মূল তত্ত্বই হইতেছে ধ্বংস করা। কিন্তু

কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো লোকান্ সমাহর্ত্তুমিহ প্রবৃত্তঃ।
ঋতেঽপি ত্বাং ন ভবিষ্যন্তি সর্বে যেঽবস্থিতাঃ প্রত্যনীকেষু যোধাঃ॥
তস্মাত্ত্বমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব জিত্বা শত্রূন্ ভুঙ্ক্ষ্ব রাজ্যং সমৃদ্ধম্।
ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্ব্বমেব নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্॥
দ্রোণং চ ভীষ্মং চ জয়দ্রথং চ কর্ণং তথান্যানপি যোধবীরান্।
ময়া হতাংস্ত্বং জহি মা ব্যথিষ্ঠা যুধ্যস্ব জেতাসি রণে সপত্নান্॥১১।৩২-৩৪

এইটিই বর্তমানে তাঁহার সঙ্কল্প ও কর্মধারা, প্রবৃত্তি। ধ্বংস সকল সময়েই সৃষ্টির সহিত এক সঙ্গে বা পর্যায়ক্রমে চলে এবং ধ্বংস ও নবসৃষ্টি করিতে করিতেই জীবনের অধীশ্বর তাঁহার সুদীর্ঘ রক্ষাকার্য সম্পাদন করেন। তাহা ছাড়া ধ্বংস হইতেছে প্রগতির জন্য প্রথম প্রয়োজন। অন্তর বাজ্যে যে মানুষ তাহার নীচের সত্তার রূপগুলিকে ধ্বংস না করে, সে উচ্চতর জীবনের মধ্যে উঠিতে সক্ষম হয় না। বাহিরের রাজ্যেও যে রাষ্ট্র বা জনসমাজ বা জাতি তাহার জীবনের প্রাচীন রূপগুলিকে ভাঙ্গিয়া ফেলিতে এবং পুনর্গঠন করিতে খুব বেশী দিন ধরিয়া ইতস্তত করে, সে নিজেই ধ্বংসের অধীন হয়, জীর্ণ হইয়া বিনষ্ট হইয়া যায় এবং তাহার ধ্বংসস্তূপ হইতে অন্য রাষ্ট্র, জনসমাজ এবং জাতি গড়িয়া উঠে। প্রাচীনকালে যেসব অতিকায় জীব এই পৃথিবীর বাসিন্দা ছিল তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়াই মানুষ পৃথিবীতে নিজের স্থান করিয়া লইতে পারিয়াছে। দানবগণকে বধ করিয়াই দেবগণ বিশ্বে ভগবদ্‌বিধানের ধারাকে অক্ষুণ্ণ রাখে। যে কেহ অকালে এই যুদ্ধ ও ধ্বংসের নীতিকে উঠাইয়া দিতে চায়, সে বিশ্বপুরুষের মহত্তর ইচ্ছার বিরুদ্ধে বৃথা চেষ্টা করে। যে কেহ তাহার নিম্নতন প্রকৃতির দুর্বলতার জন্য ইহা হইতে সরিয়া থাকিতে চায় (যেমন অর্জুন প্রথমে চাহিয়াছিলেন এবং সেইজন্যই ভগবান তাহার এই কাতরতাকে মিথ্যা কৃপা, অযশস্কর অনার্যসেবিত অস্বর্গ্য ক্লৈব্য ও হৃদয়-দৌর্বল্য বলিয়া তীব্র ভাষায় নিন্দা করিয়াছিলেন) সে প্রকৃত ধর্মের পথ অনুসরণ করিতেছে না, পরন্তু প্রকৃতির কর্মের এবং জীবনের যে সকল কঠোর সত্য সেইগুলির সম্মুখীন হইবার অধ্যাত্ম সাহসেরই অভাব দেখাইতেছে। মানুষ যুদ্ধের নীতিকে অতিক্রম করিতে পারে কেবল তাহার মধ্যে অমৃতত্বের মহত্তর নীতি আবিষ্কার করিয়া। কেহ কেহ ইহাকে সেইখানে সন্ধান করেন যেখানে ইহা নিবন্তর রহিয়াছে, শুদ্ধ আত্মার ঊর্ধ্বতন স্তরসকলে এবং ইহাকে লাভ করিবার জন্য তাঁহারা মৃত্যুর কবলিত সংসার হইতে সরিয়া যাইতে চাহেন। এইরূপে ব্যক্তিগত সমাধান মিলিতে পারে, কিন্তু তাহাতে মানবজাতির বা জগতের কোনই লাভ হয় না, অথবা শুধু এইটুকু ফল হয় যে, ঐ অধ্যাত্ম শক্তি তাহাদিগকে যে তাহাদের ক্রমবিকাশের দুষ্কর পথে সাহায্য করিতে পারিত, সেই সাহায্যটুকু হইতেই তাহারা বঞ্চিত হয়।

তাহা হইলে যিনি শ্রেষ্ঠ মানব, দিব্য কর্মী, বিশ্বপুরুষের ইচ্ছার অবাধ যন্ত্র, তিনি যখন দেখিবেন যে, বিশ্বপুরুষ এক বিরাট বিপ্লবে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, সংহারক মহাকালরূপে লোকসকলকে বিনাশ করিবার জন্য তাঁহার সম্মুখে উত্থিত ও প্রবৃদ্ধ হইয়াছেন, এবং তাঁহাকেও স্থূল অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত যোদ্ধারূপে অথবা লোক-সকলের নেতা, দিশারী বা অনুপ্রেরকরূপে সম্মুখে আনা হইয়াছে (তাঁহার স্বভাবজ অন্তর্নিহিত শক্তি তাঁহাকে এই অবস্থায় আনিবেই, *স্বভাবজেন স্বেন কর্ম্মণা*), তখন তিনি কি করিবেন? তিনি কি বিরত হইবেন, স্তব্ধ হইয়া বসিয়া থাকিবেন, ঐ কর্মে প্রবৃত্ত না হইয়া প্রতিবাদ করিবেন? কিন্তু বিরত হইয়া কোনও লাভ নাই, তাহাতে

ঐ সংহারক ইচ্ছার পরিপূরণ নিবারিত হইবে না, বরং ঐ ছিদ্রকে ধরিয়া অনর্থ আরও বাড়িয়া উঠিবে। ভগবান বলিলেন, তুমি যুদ্ধ না করিলেও, আমার এই ধ্বংসের সঙ্কল্প পূর্ণ হইবেই, ঋতেঽপি ত্বাং। যদি অর্জুন বিরত হন, এমনকি যদি কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধও সংঘটিত না হয়, সেই বিরতির ফলে অবশ্যম্ভাবী উপপ্লব, বিশৃঙ্খলা, আসন্ন ধ্বংস আরও দীর্ঘ, আরও ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিবে। কারণ এই সব জিনিস কেবল আকস্মিক ঘটনা নহে, যে অনিবার্য বীজ রোপিত হইয়াছে তাহার ফল ভোগ করিতেই হইবে। যেমন কর্ম তেমন ফল হইবেই। তাঁহার প্রকৃতিও তাঁহাকে সত্যসত্যই বিরত হইতে দিবে না, প্রকৃতিঃ ত্বাম্ নিযোক্ষ্যতি। গুরু শেষে অর্জুনকে এই কথাই বলিয়াছেন "অহঙ্কারের বশে তুমি যে জল্পনা করিতেছ, '*আমি যুদ্ধ করিব না*', *তোমার সে সঙ্কল্প বৃথাই। প্রকৃতি তোমাকে তোমার কর্মে* নিযুক্ত করিবেই। মোহের বশে তুমি যাহা করিতে চাহিতেছ না, তোমার স্বভাবজনিত স্বীয় কর্মের দ্বারা বদ্ধ হইয়া তোমাকে তাহা করিতেই হইবে।"[১] তাহা হইলে কি অন্যপন্থা অবলম্বন করিবে, স্থূল অস্ত্রশস্ত্র প্রয়োগ না করিয়া কোনরকম অধ্যাত্ম শক্তি, যৌগিক শক্তি ও প্রণালী প্রয়োগ করিবে? কিন্তু সেইটিও হইবে ঐ কর্মেরই কেবল আর একটি রূপ, তাহাতেও ধ্বংস সংঘটিত হইবে, আর এইভাবে যে অন্য পন্থা অবলম্বন তাহাও বিশ্বপুরুষেরই ইচ্ছা অনুসারে হইবে, ব্যক্তিগত অহং-এর ইচ্ছা অনুসারে নহে। এমনকি ধ্বংসের শক্তি এই নূতন শক্তি হইতেই পুষ্টিলাভ করিয়া আরও ভয়ঙ্করূপে প্রবল হইয়া উঠিতে পারে এবং কালী আবির্ভূত হইয়া তাঁহার ভীষণতর অট্টহাসির রোলে জগৎকে পূর্ণ করিয়া তুলিতে পারেন। প্রকৃত শান্তি হইতেই পারে না যতক্ষণ না মানুষের হৃদয় শান্তির যোগ্য হইয়া উঠিতেছে, বিষ্ণুর রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না, যতক্ষণ না রুদ্রের ঋণ পরিশোধিত হইতেছে। তবে কি প্রত্যাবৃত্ত হইতে হইবে? এই যে মানবজাতি এখনও অপরিণত অবস্থায় রহিয়াছে ইহাকে প্রেম ও ঐক্যের বাণী শুনাইতে হইবে? প্রেম ও ঐক্যধর্মের প্রচারক থাকিবেনই, কারণ শেষ পর্যন্ত ঐ পথেই মুক্তি আসিবে। কিন্তু মানুষের মধ্যে কালধর্ম যতদিন না পূর্ণ হইতেছে, ততদিন বাহিরের সত্যের পরিবর্তে ভিতরের সত্য, দৃশ্যমান সত্যের পরিবর্তে পরম সত্য প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে না। খ্রীস্ট ও বুদ্ধের আবির্ভাব-তিরোভাব হইয়া গেল, কিন্তু রুদ্র এখনও তাঁহার কবলে জগৎকে ধরিয়া রহিয়াছেন। ইতিমধ্যে স্বার্থপরতার ছিদ্রান্বেষী শক্তিসকল ও তাহাদের অনুচরগণের দ্বারা উৎপীড়িত অত্যাচারিত মানব তাহার অগ্রগতির জন্য ভীষণ ও দুরূহ সংগ্রামে বীর যোদ্ধার তরবারির সাহায্য ভিক্ষা করিতেছে এবং মহাপুরুষের আশ্বাসবাণী শুনিতে চাহিতেছে।

যদহঙ্কারমাশ্রিত্য ন যোৎস্য ইতি মন্যসে।
মিথ্যৈষ ব্যবসায়স্তে প্রকৃতিস্ত্বাং নিযোক্ষ্যতি॥
স্বভাবজেন কৌন্তেয় নিবদ্ধঃ স্বেন কর্ম্মণা।
*কর্তুং নেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিষ্যস্যবশোঽপি তৎ॥*১৮।৫৯-৬০

তাঁহার জন্য যে নির্ধারিত শ্রেষ্ঠ পন্থা তাহা হইতেছে অহংভাবশূন্য হইয়া ভগবদিচ্ছা সম্পাদন করা, যাহা ভগবদ্‌নির্দিষ্ট বলিয়া তিনি দেখিতে পাইতেছেন তাহারই মানবীয় নিমিত্ত ও যন্ত্র হওয়া, তাঁহার মধ্যে, মানুষের মধ্যে, যে ভগবান রহিয়াছেন সর্বদা তাঁহাকে স্মরণে রাখা, মাম্ অনুস্মরন্, তাঁহার প্রকৃতির অধীশ্বর তাঁহাকে যে পথে চালাইবেন সেই পথই অনুসরণ করা। নিমিত্তমাত্রম্ ভব সব্যসাচিন্। কাহারও প্রতি তিনি ব্যক্তিগত শত্রুতা, ক্রোধ, ঘৃণা পোষণ করিবেন না, স্বার্থপর বাসনা বা আবেগের বশবর্তী হইবেন না, দুর্দান্ত অসুরের ন্যায় দ্বন্দ্বের দিকে ধাবিত হইবেন না, উপদ্রব ও ধ্বংসের জন্য উন্মত্ত হইবেন না, কিন্তু তিনি তাঁহার কার্য করিবেন লোকসংগ্রহায়। কার্যটির ঊর্ধ্বে তিনি দৃষ্টিপাত করিবেন কার্যের লক্ষ্যের দিকে, যাহার জন্য তিনি যুদ্ধ করিতেছেন। কারণ মহাকালরূপী ভগবান ধ্বংস করেন শুধু ধ্বংসের জন্যই নহে পরন্তু এক মহত্তর ধর্মরাজ্য স্থাপনের জন্য, প্রগতিশীল বিবর্তনের পথ পরিষ্কার করিয়া দিবার জন্য। বহির্মুখী মন যাহা দেখিতে পায় না, এই যুদ্ধের মহত্ত্ব, জয়ের গৌরব, তিনি গভীরতর অর্থে গ্রহণ করিবেন, যদি প্রয়োজন হয় তিনি সেই জয়েরই গৌরব গ্রহণ করিবেন যাহা পরাজয়ের ছদ্মবেশে আসে এবং মানুষকে সমৃদ্ধিশালী রাজ্যভোগের দিকেই লইয়া যায়। বিশ্বসংহারমূর্তির আনন দর্শনে ভীত না হইয়া, তিনি ইহার মধ্যে দেখিবেন সেই শাশ্বত আত্মাকে যিনি সকল বিনশ্বর দেহের মধ্যে অবিনশ্বর এবং ইহার পশ্চাতে দেখিবেন সেই চির-সারথির মুখ যিনি মানবের পথপ্রদর্শক, সর্বভূতের সুহৃদ্, সুহৃদম্ সর্ব্বভূতানাম্। এই করাল বিশ্বরূপ দর্শন করা হইল, স্বীকার করা হইল, তাহার পর এই অধ্যায়ের অবশিষ্ট অংশে এই আশ্বাসময় সত্যটিকেই নির্দেশ করা হইয়াছে, পরিশেষে শাশ্বতের এক অধিকতর হৃদয়গ্রাহী মুখ ও মূর্তি দর্শন করান হইয়াছে।

একাদশ অধ্যায়

বিশ্বরূপ দর্শন

দুই ভাব

সেই ভীষণ বিশ্বরূপদর্শনের প্রভাব তখনও অর্জুনের উপর রহিয়াছে, সেই অবস্থায় অর্জুন ভগবানের বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রথমেই যে কথাগুলি উচ্চারণ করিলেন সেগুলি এই মৃত্যু ও ধ্বংসমূর্তির পশ্চাতে যে মহত্তর উৎসাহ ও আশ্বাসপ্রদ সত্য রহিয়াছে তাহারই নির্দেশে পূর্ণ। তিনি বলিয়া উঠিলেন,[১] "হে কৃষ্ণ, তোমার নামকীর্তনে সমস্ত জগৎ হৃষ্ট ও পুলকিত হয়, রাক্ষসকুল ভয়ে দিগ্‌দিগন্তে পলায়ন করে, সিদ্ধগণ অবনতমস্তকে তোমাকে নমস্কার করেন—এ সমস্তই যুক্তিযুক্ত ও যথোচিত। হে মহাত্মন্! তোমাকে তাঁহারা কেনই বা নমস্কার না করিবেন? কারণ তুমিই আদি স্রষ্টা ও কর্মকর্তা, তুমি সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা অপেক্ষাও গরীয়ান। হে অনন্ত, হে দেবেশ, হে জগন্নিবাস, তুমি অক্ষর, তুমি সৎ, তুমি অসৎ এবং তুমিই পরাৎপর। তুমি পুরাণ পুরুষ, তুমি আদি-দেব এবং তুমিই এই বিশ্বের পরম নিধান, তুমিই জ্ঞাতা, তুমিই জ্ঞেয় এবং তুমিই পরম-ধাম; হে অনন্তরূপ! তোমার দ্বারাই বিশ্ব বিস্তৃত হইয়াছে।[২] যম, বায়ু, অগ্নি, সোম, বরুণ, সবই তুমি; তুমি প্রজাপতি, জীবসকলের পিতা এবং প্রপিতামহ। তোমাকে পুনঃপুনঃ সহস্র সহস্রবার নমস্কার, সম্মুখে তোমাকে নমস্কার, পশ্চাৎভাগে তোমাকে নমস্কার, সকল দিক হইতে তোমাকে নমস্কার, কারণ যাহা কিছু আছে সেসবই তুমি। তুমি অনন্তবীর্য ও অমিতবিক্রম, তুমি সর্বত্র ব্যাপ্ত, তুমিই সব।"

এই পরম বিশ্বপুরুষ এখানে মানবমূর্তি লইয়া নরদেহে তাঁহার সম্মুখে বিরাজ করিতেছিলেন, তিনি দিব্য মানব, দেহধারী ভগবান, অবতার—কিন্তু ইতিপূর্বে

স্থানে হৃষীকেশ তব প্রকীর্ত্যা জগৎ প্রহৃষ্যত্যনুরজ্যতে চ।
রক্ষাংসি ভীতানি দিশো দ্রবন্তি সর্বে নমস্যন্তি চ সিদ্ধসঙ্ঘাঃ॥১১।৩৬
কস্মাচ্চ তে ন নমেরন্মহাত্মন্ গরীয়সে ব্রহ্মণোঽপ্যাদিকর্ত্রে।
অনন্ত দেবেশ জগন্নিবাস ত্বমক্ষরং সদসত্তৎ পরং যৎ॥
ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণস্ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
বেত্তাসি বেদ্যং চ পরং চ ধাম ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ॥
বায়ুর্যমোঽগ্নির্বরুণঃ শশাঙ্কঃ প্রজাপতিস্ত্বং প্রপিতামহশ্চ।
নমো নমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো নমস্তে॥
নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে নমোঽস্তু তে সর্বত এব সর্ব।
অনন্তবীর্যামিতবিক্রমস্ত্বং সর্ব্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্ব্বঃ॥১১।৩৭-৪০

অর্জুন তাঁহাকে চিনিতে পারেন নাই। তিনি কেবল তাঁহার মানব স্বরূপটিই দেখিয়াছেন এবং ভগবানের প্রতি শুধু মানুষেরই মত ব্যবহার করিয়াছেন। পার্থিব ছদ্মবেশ ভেদ করিয়া তাহার পশ্চাতে যে ভগবান বিরাজিত, মানবরূপটি যাঁহার কেবল একটি আধার, একটি প্রতীক মাত্র, তাঁহাকে তিনি দেখিতে পান নাই, তাই এখন তাঁহার অন্ধ অবহেলা ও অসতর্ক অজ্ঞানের জন্য তিনি সেই ভগবানের ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন।[১] "হঠকারিতার বশে তোমাকে কেবল আমার মানবসখা মাত্র জ্ঞান করিয়া, প্রমাদেই হউক বা প্রণয়েই হউক তোমার এই মহিমা না জানিয়া 'হে কৃষ্ণ, হে যাদব, হে সখা' এইরূপ যত সব বাক্য প্রয়োগ করিয়াছি, বিহারে, শয্যায়, উপবেশনে, ভোজনে, একাকী বা তোমার সম্মুখে, তোমার প্রতি যত কিছু অসম্মান প্রদর্শন করিয়াছি, হে অপ্রমেয় আমার সেসব অপরাধ ক্ষমা কর। এই চরাচর সমস্ত লোকের তুমি পিতা, তুমি পূজ্য, তুমি গুরু হইতেও গরীয়ান।[২] ত্রিজগতে তোমার সমানই কেহ নাই, তাহা হইলে হে অমিতপ্রভাব, তোমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কেই বা হইতে পারে? অতএব হে বন্দনীয় ঈশ্বর। তোমাকে দণ্ডবৎ প্রণামপূর্বক তোমার প্রসাদ প্রার্থনা করিতেছি। পিতা যেমন পুত্রের, সখা যেমন সখার, প্রিয় যেমন প্রিয়ের অপরাধ ক্ষমা করেন, তুমি তদ্রূপ আমার অপরাধ ক্ষমা কর। যাহা কেহ কখনও দেখে নাই, আমি দেখিয়াছি ও পুলকিত হইয়াছি, কিন্তু আমার মন ভয়ে ব্যাকুল। হে দেব, তোমার সেই অন্য রূপটি দেখাও। আমি পূর্বের ন্যায় তোমার কিরীট-গদা-চক্রধারী রূপটি দেখিতে আকাঙ্ক্ষা করি। হে সহস্রবাহু, হে বিশ্বমূর্তি, তোমার চতুর্ভুজ মূর্তি ধারণ কর।"[৩]

প্রথমোক্ত কথাগুলি হইতেই ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, এই করাল রূপসকলের পশ্চাতে যে সত্য লুক্কায়িত রহিয়াছে তাহা আশ্বাসময়, উৎসাহজনক এবং আনন্দপূর্ণ সত্য। এমন কিছু সেখানে রহিয়াছে যাহাতে ভগবানের সান্নিধ্যে, ভগবানের নামে জগতের হৃদয় হৃষ্ট ও পুলকিত হয়। ইহা সেই গভীর তত্ত্ব যাহার কল্যাণে আমরা কালীর করাল-বদনের মধ্যে মায়ের মুখ দেখিতে পাই, এমনকি

[১] সখেতি মত্বা প্রসভং যদুক্তং হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি।
অজানতা মহিমানং তবেদং ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাপি॥
যচ্চাবহাসার্থমসৎকৃতোঽসি বিহারশয্যাসনভোজনেষু।
একোঽথবাপ্যচ্যুত তৎসমক্ষং তৎক্ষাময়ে ত্বামহমপ্রমেয়ম্॥১১।৪১-৪২

[২] পিতাসি লোকস্য চরাচরস্য ত্বমস্য পূজ্যশ্চ গুরুর্গরীয়ান্।
ন ত্বৎসমোঽস্ত্যভ্যধিকঃ কুতোঽন্যো লোকত্রয়েঽপ্যপ্রতিমপ্রভাবঃ॥
তস্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায় কায়ং প্রসাদয়ে ত্বামহমীশমীড্যম্।
পিতেব পুত্রস্য সখেব সখ্যুঃ প্রিয়ঃ প্রিয়ায়ার্হসি দেব সোঢ়ুম্॥
অদৃষ্টপূর্ব্বং হৃষিতোঽস্মি দৃষ্ট্বা ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো মে।
তদেব মে দর্শয় দেব রূপং প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস॥১১।৪৩-৪৫

[৩] কিরীটিনং গদিনং চক্রহস্তমিচ্ছামি ত্বাং দ্রষ্টুমহং তথৈব।
তেনৈব রূপেণ চতুর্ভুজেন সহস্রবাহো ভব বিশ্বমূর্তে॥১১।৪৬

ধ্বংসের মধ্যে সর্বভূত-সুহৃদের বরাভয়প্রদ হস্ত দেখিতে পাই, অশুভের মধ্যে শুদ্ধ অপরিবর্তনীয় কল্যাণরূপকে দেখিতে পাই এবং মৃত্যুর মধ্যেই অমৃতত্বের অধিপতিকে দেখিতে পাই। দিব্যকর্মের অধীশ্বরের করালমূর্তির সম্মুখ হইতে অন্ধকারের দুর্দান্ত দানবীয় শক্তিসকল, রাক্ষসসকল, নিহত, পরাজিত, অভিভূত হইয়া পলায়ন করে। কিন্তু সিদ্ধগণ, যাঁহারা মৃত্যুঞ্জয়ের নাম জানেন ও কীর্তন করেন এবং তাঁহার সত্তার সত্যে বাস করেন, তাঁহারা তাঁহার প্রত্যেক রূপের সম্মুখেই প্রণত হন এবং জানেন প্রত্যেক রূপের মধ্যে কি বস্তু আছে এবং তাহার অর্থ কি। বাস্তবিক কাহারও ভয় করিবার প্রয়োজন নাই, ভয়ের কারণ আছে শুধু তাহাদেরই যাহাদিগকে ধ্বংস হইতে হইবে—অশুভ, অজ্ঞান, নিশা-চমূ, রাক্ষসী শক্তিসংঘ। করাল রুদ্রের যত গতি, যত ক্রিয়া সমুদয়েরই লক্ষ্য সিদ্ধি, দিব্য জ্যোতি ও পূর্ণতা।

কারণ এই যে আত্মা, এই ভগবৎপুরুষ, ইনি শুধু বাহ্যরূপেই সংহারক, এই সব সসীম বস্তুর ধ্বংসকর্তা মহাকাল; কিন্তু নিজের সত্তায় তিনি অনন্ত, বিশ্বদেবগণের অধীশ্বর, তাঁহারই মধ্যে জগৎ এবং ইহার সমুদয় ক্রিয়া নিশ্চিতভাবে বিধৃত। তিনি আদি এবং সর্বদা উদ্ভাবনশীল সৃষ্টিকর্তা, তিনি সৃষ্টিশক্তির মূর্তরূপ ব্রহ্মা অপেক্ষাও গরীয়ান, তাঁহার যে ত্রয়ীভাব, স্থিতি ও ধ্বংসের সাম্যের দ্বারা বিচিত্রিত সৃষ্টি, ইহারই শুধু একটি ভাবরূপে তিনি ব্রহ্মাকে বিশ্বরূপের মধ্যে দেখাইয়াছেন। প্রকৃত যে দিব্য সৃষ্টি তাহা শাশ্বত, তাহা হইতেছে সসীম জিনিসের মধ্যে অনন্তের নিত্য প্রকাশ, পরমাত্মা তাঁহার অগণন অনন্ত জীবাত্মায়, তাহাদের কর্মের মহিমায়, তাহাদের রূপের সৌন্দর্যে নিজেকে চিরকাল লুক্কায়িত ও প্রকটিত করিতেছেন। তিনি সনাতন, অক্ষর, সৎ অসৎ, ব্যক্ত চির-অব্যক্ত, যেসব জিনিস ছিল কিন্তু এখন আর নাই বলিয়া মনে হয়, যেসব জিনিস আছে কিন্তু ধ্বংস হইবেই বলিয়া মনে হয়, যেসব জিনিস ভবিষ্যতে হইবে এবং লোপ পাইবে—এসব তাঁহারই দুই ভাব। কিন্তু এই সকলের ঊর্ধ্বে তিনি যাহা তাহা হইতেছে তৎ পরং, পরম পুরুষ, তিনি সকল নশ্বর জিনিসকে কালের এক আনন্ত্যের মধ্যে ধরিয়া রহিয়াছেন, সেখানে সবই চিরবিরাজমান। তাঁহার অক্ষর সত্তা রহিয়াছে কালের অতীত আনন্ত্যে, কাল এবং সৃষ্টি তাহারই চিরপ্রকাশমান রূপ।

তাঁহার এই যে সত্য, ইহার মধ্যেই সকলের সমন্বয় হইয়াছে; যুগপৎ ও পরস্পরসাপেক্ষ সত্যসকলের সামঞ্জস্য সেই এক সত্য হইতে উদ্ভূত এবং এই সকলকে লইয়াই সেই সত্য। এই সত্য হইতেছে পরমাত্মার, যাঁহার পরমা প্রকৃতি হইতে জগতের উৎপত্তি, জগৎ সেই অনন্তেরই একটি নীচের রূপ; তিনি পুরাণ পুরুষ, কালের অন্তর্গত সুদীর্ঘ ক্রমবিকাশধারার উপর তিনি অধ্যক্ষ হইয়া আছেন; তিনি আদিদেব সকল দেব, মানব ও জীব তাঁহারই সন্তান, শক্তি, আত্মসত্তা, তাঁহারই সত্তার সত্যে সকলের আধ্যাত্মিক সার্থকতা; তিনি জ্ঞাতা, তিনিই মানুষের মধ্যে তাঁহার নিজের সম্বন্ধে, জগৎ সম্বন্ধে, ভগবান সম্বন্ধে জ্ঞানের বিকাশ করিয়া

দেন; তিনি সকল জ্ঞানের একমাত্র জ্ঞেয, যিনি মানুষেব হৃদয, মন ও আত্মাব সম্মুখে নিজেকে প্রকাশ করেন, আমাদেব মধ্যে জ্ঞানেব প্রত্যেক নববিকাশ তাঁহারই আংশিক প্রকাশ, আব আমাদেব যে শ্রেষ্ঠতম জ্ঞান তাহাতে তিনিই অন্তরঙ্গভাবে, গভীবভাবে, সমগ্রভাবে দৃষ্ট ও আবিষ্কৃত হন। তিনি উচ্চ পবম সংস্থান, পরং নিধানং, বিশ্বে যাহা কিছু আছে তিনিই সবকে সৃষ্টি কবিতেছেন, ধরিয়া বহিয়াছেন, নিজের মধ্যে গ্রহণ কবিতেছেন। তাঁহাব দ্বাবা তাঁহাব নিজেবই সত্তাব মধ্যে জগৎ বিস্তৃত হইয়াছে, তাঁহাব সর্বজযী শক্তি দ্বাবা, তাঁহাব অলৌকিক আত্মরূপাযণ, তেজ এবং অন্তহীন সৃষ্টিব আনন্ত্যেব দ্বাবা। তাঁহাব অনন্ত ভৌতিক ও আধ্যাত্মিক রূপসকলকে লইযাই সমগ্র বিশ্ব। নিম্নতম হইতে উচ্চতম সমস্ত দেবতাই তিনি, জীবগণেব পিতা, সকলেই তাঁহাব সন্ততি, তাঁহাব প্রজা। তিনি ব্রহ্মার সৃষ্টিকর্তা, এই সকল বিভিন্ন জাতিব জীবগণেব দিব্য স্রষ্টা যাঁহাবা, তিনি তাঁহাদের পিতাব পিতা, প্রপিতামহ। এই সত্যটির উপব পুনঃপুনঃ জোব দেওযা হইয়াছে। পুনবায় পুনবাবৃত্তি কবা হইল যে, তিনি সবই, প্রত্যেকটিই তিনি, সর্ব্বঃ। তিনি অনন্ত বিশ্বসত্তা আবার প্রত্যেক ব্যষ্টিসত্তা, প্রত্যেক বস্তুই তিনি, আমাদেব প্রত্যেকের মধ্যে যে এক শক্তি ও সত্তা বহিয়াছে তাহা তিনিই, তিনি অনন্ত তেজ যাহা অসংখ্য বস্তুসকলের মধ্যে নিজেকে নিক্ষেপ কবিতেছে, তিনি অপ্রমেয ইচ্ছা এবং গতি ও কর্মেব মহতী বীর্য নিজেব মধ্য হইতে কালেব সকল প্রবাহ এবং প্রাকৃত জগতে আত্মার সমুদয ঘটনাকে রূপ দিতেছেন, গঠন কবিতেছেন।

এই সত্যটির উপর পুনঃপুনঃ জোব দেওযায মানুষেব মধ্যে এই যে মহান ভগবান বিরাজ কবিতেছেন তাঁহাব কথা স্বভাবতই আসিযা পড়ে। বিশ্বরূপদ্রষ্টাব হৃদয়ে ক্রমান্বয়ে তিনটি তত্ত্ব উপলক্ষিত হইল। প্রথমত, তাঁহাব উপলব্ধি হইল, এই যে মানবসন্তান পৃথিবীর একটি অনিত্য জীবরূপে তাঁহাব পার্শ্বে বিচবণ করিয়াছেন, তাঁহার সন্নিকটে উপবেশন কবিযাছেন, তাঁহাব সহিত এক শয্যায শয়ন কবিয়াছেন, এক স্থানে ভোজন কবিযাছেন এবং যাঁহাব সহিত তিনি কত ব্যঙ্গ কৌতুক করিযাছেন, যিনি যুদ্ধে, মন্ত্রণা পবিষদে এবং সাধাবণ ব্যাপাবে কর্মী হইয়াছেন, ইঁহাব দেহে, মর মানবেব এই মূর্তিটিব মধ্যে ববাববই একটি মহান ও বিবাট তাৎপর্যপূর্ণ কিছু লুক্কাযিত ছিল—এক দেবতা, এক অবতাব, এক বিশ্বশক্তি, একমেবাদ্বিতীয়ম্, এক বিশ্বাতীত পবম সত্তা। এই যে গুহ্য দেবত্ব, যাহাব মধ্যে মানুষ এবং তাহাব সমগ্র ইতিহাসেব তাৎপর্য নিহিত বহিযাছে এবং যাহা হইতে সমস্ত বিশ্বজীবন অনির্বচনীয মহত্ত্বপূর্ণ নিগূঢ় সার্থকতা লাভ করিতেছে, অর্জুন এই দিকে অন্ধ ছিলেন। কেবল এখনই তিনি দেখিলেন ব্যষ্টি-আযতনের মধ্যে বিশ্ব-আত্মা, মানবদেহেব মধ্যে ভগবান, প্রকৃতিব এই প্রতীকেব মধ্যে অধিষ্ঠিত বিশ্বাতীত পবম পুরুষ। দৃশ্যমান বস্তুসকলেব এই যে বিবাট, অনন্ত, অপ্রমেয় সত্তা, এই যে সীমাহীন বিশ্বরূপ যিনি প্রত্যেক ব্যষ্টিরূপকে অতিক্রম করিয়া আছেন, আবার প্রত্যেক ব্যষ্টিরূপই যাঁহার আবাসগৃহ, অর্জুন কেবল এখনই

তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন। কাবণ সেই মহান সত্তা সমান এবং অনন্ত, ব্যষ্টিতে এবং বিশ্বে তিনি একই। আব প্রথমেই তাঁহার মনে হইল যে, তাঁহাব অন্ধতা, ভগবানেব প্রতি সাধাবণ মানুষেব ন্যায ব্যবহাব, তাঁহাব সহিত কেবল মানসিক ও শাবীবিক সম্বন্ধ ছাড়া আব কিছু না দেখা—তাঁহাব পক্ষে এসব হইয়াছে সেই মহান শক্তিমযেব বিরুদ্ধে পাপ। কাবণ যাঁহাকে তিনি কৃষ্ণ, যাদব, সখা বলিয়া সম্বোধন কবিযাছেন, তিনিই এই অপ্রমেয় মহত্ত্ব, এই অতুলনীয বীর্য, এই সর্বভূতস্থিত আত্মা যাঁহাব সৃষ্টি এই বিশ্ব প্রপঞ্চ। মানবীয তনুটিকে অবজ্ঞা না কবিযা সেইটিকে আশ্রয কবিযা যিনি বিবাজিত তাঁহাকেই বিস্ময়, ভক্তি ও অনুবাগেব সহিত তাঁহাব দেখা ও উপাসনা করা উচিত ছিল।

কিন্তু দ্বিতীয় তত্ত্বটি হইতেছে এই যে, মানবীয় রূপ এবং মানবীয় সম্বন্ধেব ভিতব দিযা যাহা মূর্ত হইয়াছে সেইটিও সত্য, বিশ্বরূপেব কবাল স্বরূপের সহিত সেইটি যুক্ত থাকিযা আমাদেব মনেব কাছে উহাকে সহনীয় করিয়া তুলিয়াছে। ভগবানেব বিশ্বাতীত সত্তা এবং বিশ্বাত্মক রূপ দেখিতে হইবে, কারণ তাহা ছাড়া মানবীযতাব গণ্ডী অতিক্রম কবা সম্ভব নহে। সেই ঐক্যসাধক একত্বের মধ্যে সবকে লইতে হইবে। কিন্তু শুধু এইটিব দ্বারা বিশ্বাতীত সত্তা এবং নীচেব প্রকৃতিতে বদ্ধ এই সসীম জীবাত্মাব মধ্যে অলঙ্ঘ্য ব্যবধানেব সৃষ্টি হইবে। অনন্ত স্বরূপেব যে পূর্ণ তেজ, সীমাবদ্ধ ব্যষ্টিগত প্রাকৃত মানবেব স্বতন্ত্র ক্ষুদ্রতার পক্ষে তাহা অসহনীয। একটি যোগসূত্র চাই যাহাব সাহায্যে সে বিবাট বিশ্বপুরুষকে দেখিতে পাবে নিজেব ব্যষ্টিগত প্রাকৃত সত্তায, নিজেব সন্নিকটে। তিনি শুধু তাঁহার বিশ্বব্যাপী ও অপ্রমেয বীর্যেব দ্বারা তাহার সব কিছুকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন না, পবন্তু মানবীয মূর্তিতে তাহাকে সাহায্য কবিতেছেন এবং অন্তরঙ্গ ব্যক্তিগত সম্বন্ধেব ভিতব দিযা তাহাকে ঐক্যেব মধ্যে তুলিযা লইতেছেন। যে ভক্তিব দ্বাবা সীমাবদ্ধ জীব অনন্তেব সম্মুখে প্রণত হয, তাহা তখনই পূর্ণ মাধুর্যে ভবিযা উঠে এবং সখ্য ও ঐক্যেব নিগূঢ়তম সত্যেব সমীপবর্তী হয়, যখন তাহা গভীব হইয়া অধিকতব অন্তবঙ্গ ভক্তিতে পবিণত হয, ভগবানকে পিতারূপে অনুভব কবা যায, পবমাত্মা ও জীবাত্মাব মধ্যে পবস্পবেব প্রতি আকর্ষণমূলক প্রেমেব অনুভব লাভ কবা যায। কাবণ ভগবান মানব-আত্মা, মানব দেহেব মধ্যে বাস করেন। তিনি পবিচ্ছদেব ন্যায মানবীয মন ও মূর্তিব দ্বাবা নিজেকে আববিত করেন। মরদেহেব মধ্যে অবস্থিত জীবাত্মা পরস্পবেব মধ্যে যেসব সম্বন্ধ স্থাপন করে, ভগবানও সেই সব সম্বন্ধ স্থাপন কবেন এবং ভগবানকে অবলম্বন করিয়াই সেসব পায় তাহাদের পূর্ণতম সার্থকতা এবং মহত্তম সিদ্ধি। ইহাই বৈষ্ণব ভক্তি, এখানে গীতার কথাগুলিব মধ্যে ইহাব বীজ বহিযাছে, কিন্তু পববর্তীকালে ইহাদের অধিকতর গভীব, আনন্দময ও সার্থকতাপূর্ণ বিকাশ হইযাছিল।

আব এই দ্বিতীয় তত্ত্বটি হইতেই আর একটি তত্ত্ব আপনিই উদ্ভূত হইতেছে। এই যে বিশ্বাতীত এবং বিশ্বময় পুরুষেব রূপ, মুক্ত আত্মাব শক্তিব পক্ষে ইহা

মহান, উৎসাহপ্রদ, সাহসপ্রদ, ইহা বীর্যের উৎস, এই দর্শন সমতা সাধন করে, উন্নয়ন করে, সকল জিনিসের সার্থকতা দেখাইয়া দেয়; কিন্তু সাধারণ মানবের পক্ষে ইহা অসহনীয়, ভয়ঙ্কর, দুর্বোধ্য। এই যে সর্বগ্রাসী কাল এবং ধারণাতীত ইচ্ছাশক্তির ভীষণ ও মহান রূপ, এই বিরাট অপ্রমেয় গহন কর্মধারা, ইহার পিছনে যে আশ্বাসপ্রদ সত্য রহিয়াছে সেটিকে জানিলেও হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন হয়। কিন্তু আবার দিব্য নারায়ণের প্রসন্ন মধ্যবর্তী রূপও আছে, সেখানে ভগবান মানুষের অতি সন্নিকট এবং তাহার মধ্যেই বিরাজিত, তিনি যুদ্ধে এবং যাত্রাপথে সারথি, সাহায্য করিবার জন্য তিনি চতুর্ভুজ, তিনি ভগবানের মানবীয়ভাবাপন্ন প্রতীক, এই সহস্রবাহু বিশ্বরূপ নহেন। নির্ভর করিবার জন্য মানুষকে এই মধ্যবর্তী রূপটিই সর্বদা সম্মুখে রাখিতে হইবে। কারণ যে সত্য আশ্বাস প্রদান করে, নারায়ণের এই রূপই তাহার প্রতীক। বিশ্বের কর্মধারাসকল তাহাদের বিরাট আবর্তন, পশ্চাদ্‌গতি, অগ্রগতির ভিতর দিয়া মানুষের অন্তরাত্মা ও অন্তর্জীবনের পক্ষে যে বিশাল অধ্যাত্ম আনন্দে চরম পরিণতি লাভ করে, যেটি তাহাদের অত্যাশ্চর্য কল্যাণময় লক্ষ্য, সেইটি অন্তরঙ্গ, দৃশ্য, জীবন্ত, সহজবোধ্য হইয়া উঠে নারায়ণের এই সৌম্যমূর্তির সাহায্যে। এই মানবীয়-ভাবাপন্ন দেহধারী পুরুষের সহিত মিলন ও সান্নিধ্যই হয় তাহাদের পরিণাম—মানুষের সহিত ভগবানের নিত্য সাহচর্য। মানুষ জগতে ভগবানের জন্যই জীবনযাপন করে, ভগবান মানুষের মধ্যে বাস করেন, এই রহস্যময় জগৎলীলাকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া মানুষের মধ্যে নিজের দিব্য ইচ্ছাসকলই পূর্ণ করেন। আর মানুষের এই পরিণামেরও পরে হইতেছে অধিকতর আশ্চর্যময় ঐক্য, শাশ্বতের শেষ রূপান্তরসকলের মধ্যে নিবিড়ভাবে বাস করা।

অর্জুনের প্রার্থনার উত্তরে ভগবান তাঁহার স্বকীয় সাধারণ নারায়ণ রূপ পুনরায় ধারণ করিলেন, স্বকং রূপম্, প্রসাদ ও প্রেম ও মাধুরী ও সৌন্দর্যের রাঞ্জনীয় মূর্তি।[১] কিন্তু অন্য যে বিরাট মূর্তিটি তিনি সম্বরণ করিতেছেন সেইটির অপরিমেয় গূঢ়ার্থের কথা প্রথমেই বলিলেন। তিনি বলিলেন—"যাহা তুমি এখন দেখিতেছ, ইহা আমার পরম মূর্তি, আমার তেজোময় রূপ, বিশ্বাত্মক, আদ্য, আমার এই রূপ তুমি ভিন্ন এ পর্যন্ত আর কোন মানব দেখিতে পায় নাই।[২] আমি আমার আত্মযোগের দ্বারা ইহা দেখাইয়াছি। কারণ ইহা আমার আত্মার, আমার নিগূঢ় অধ্যাত্ম সত্তারই রূপ, এই রূপে পরাৎপর পরম পুরুষ নিজেকে বিশ্বলীলায় প্রকট করিয়াছেন; আমার সঙ্গে যে পূর্ণযোগে যুক্ত কেবল সে-ই এই রূপ অবিচলিত ভাবে দেখিতে পারে, তাহার স্নায়ুমণ্ডলী কম্পিত হয় না, তাহার মন বিশৃঙ্খল ও বিভ্রান্ত হইয়া পড়ে না, কারণ ইহার বাহ্যরূপে যাহা ভয়ঙ্কর ও দুঃসহনীয় আছে সে

[১] ইত্যর্জুনং বাসুদেবস্তথোক্ত্বা স্বকং রূপং দর্শয়ামাস ভূয়ঃ।
আশ্বাসয়ামাস চ ভীতমেনং ভূত্বা পুনঃ সৌম্যবপুর্মহাত্মা॥১১।৫০

[২] ময়া প্রসন্নেন তবার্জুনেদং রূপং পরং দর্শিতমাত্মযোগাৎ।
তেজোময়ং বিশ্বমনন্তমাদ্যং যন্মে ত্বদন্যেন ন দৃষ্টপূর্বম্॥১১।৪৭

শুধু তাহাই দেখে না, কিন্তু ইহার মহান ও আশ্বাসময় নিগূঢ় মর্মও উপলব্ধি করিতে পারে। আর তোমারও উচিত বিমূঢ় ও অবশ না হইয়া আমার এই ঘোর রূপ দর্শন করা,[১] কিন্তু তোমার নিম্নতন প্রকৃতি এখনও ইহাকে সেই মহৎ সাহস ও স্থৈর্যের সহিত দর্শন করিবার জন্য প্রস্তুত হয় নাই, অতএব তোমার জন্য আমি পুনরায় আমার নারায়ণ রূপ ধারণ করিতেছি, তাহার মধ্যে মানুষের মন পৃথকভাবে, মানবীয় শক্তির অনুযায়ী প্রশমিত ভাবে সুহৃদরূপী ভগবানের সৌম্যভাব, আনুকূল্য ও আনন্দকে দেখিতে পায়।" মহত্তর রূপটি অদৃশ্য হইবার পর ভগবান আবার বলিলেন,[২] "কেবল অসাধারণ শ্রেষ্ঠ মহাত্মারাই ঐ রূপ দেখিতে পান। দেবতাগণই নিত্য এই রূপ দর্শনের আকাঙ্ক্ষা করেন। বেদের দ্বারা, তপস্যার দ্বারা, দানের দ্বারা, যজ্ঞের দ্বারা ইহাকে লাভ করা যায় না, ইহাকে দেখা যায়, জানা যায়, ইহার মধ্যে প্রবেশ করা যায় কেবল সেই ভক্তির দ্বারা যাহা সর্বভূতে শুধু আমাকেই শ্রদ্ধা করে, ভজনা করে, ভালবাসে।"

কিন্তু তাহা হইলে এই রূপের এমন কি বৈশিষ্ট্য যাহার জন্য ইহা এতদূর ধারণাতীত যে, মানবজ্ঞানের সকল সাধারণ প্রয়াস, এমনকি তাহার অধ্যাত্ম সাধনারও গভীরতম তপস্যা অন্য সাহায্য ব্যতিরেকে সে রূপই দর্শনে সমর্থ হয় না? তাহা এই যে, মানুষ অন্যান্য উপায়ে একমেবাদ্বিতীয়ম্ সত্তার কোন একটি বিশেষ ভাবকে আংশিকভাবে, স্বতন্ত্রভাবে জানিতে পারে, তাঁহার ব্যষ্টিগত, বিশ্বগত বা বিশ্বাতীত রূপসকলকে জানিতে পারে, কিন্তু ভগবানের সকল ভাবের সমন্বয়মূলক এই যে মহত্তম ঐক্য, যাহাতে এক সময়ে একসঙ্গে একই রূপের মধ্যে সমস্ত প্রকটিত, সমস্ত অতিক্রমিত, সমস্ত সংসিদ্ধ—ইহাকে নহে। কারণ বিশ্বাতীত, বিশ্বগত, ব্যষ্টিগত ভগবান, আত্মা ও প্রকৃতি, অনন্ত ও সান্ত, দেশ ও কাল ও কালাতীত ভাব, সৎ (Being) ও সম্ভূতি (Becoming), ভগবান সম্বন্ধে আমরা যাহা কিছু ভাবিতে, জানিতে চেষ্টা করি, কৈবল্যাত্মক সত্তাই হউক বা প্রকটিত বিশ্বলীলাই হউক, সবই এখানে এক অনির্বচনীয় ঐক্যে অত্যাশ্চর্যরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। এই দর্শন লাভ করা যায় কেবল সেই অনন্য ভক্তি দ্বারা, সেই প্রেমের ও নিবিড় ঐক্যের দ্বারা যাহা পূর্ণ বিকশিত কর্ম ও জ্ঞানের মুকুটস্বরূপ। ইহাকে জানা, ইহাকে দর্শন করা, ইহার মধ্যে প্রবেশ করা, পরম পুরুষের এই পরম

মা তে ব্যথা মা চ বিমূঢ়ভাবো দৃষ্ট্বা রূপং ঘোরমীদৃঙ্মমেদম্।
ব্যপেতভীঃ প্রীতমনাঃ পুনস্ত্বং তদেব মে রূপমিদং প্রপশ্য॥১১।৪৯

সুদুর্দর্শমিদং রূপং দৃষ্টবানসি যন্মম।
দেবা অপ্যস্য রূপস্য নিত্যং দর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ॥
নাহং বেদৈর্নতপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া।
শক্য এবংবিধো দ্রষ্টুং দৃষ্টবানসি মাং যথা॥
ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবংবিধোঽর্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুং চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুং চ পরন্তপ॥১১।৫২-৫৪

রূপের সহিত এক হওয়া তখনই সম্ভব হয় এবং এইটিকেই গীতা নিজ যোগের লক্ষ্য বলিয়া প্রচার করিয়াছে। এক পরম চৈতন্য আছে, তাহার ভিতর দিয়া বিশ্বাতীতের মহিমার মধ্যে প্রবেশ করা এবং তাঁহার মধ্যে অক্ষর আত্মা এবং ক্ষর সর্বভূতকে ধারণ করা সম্ভব হয়—সকলের সহিত এক হইয়াও সকলের ঊর্ধ্বে থাকা, জগতের অতীত হওয়া অথচ বিশ্বময় ও বিশ্বাতীত ভগবানের সমগ্র প্রকৃতিকে একই সঙ্গে আলিঙ্গন করা সম্ভব হয়। মন ও দেহের মধ্যে বন্দী সীমাবদ্ধ মানুষের পক্ষে ইহা কঠিন সন্দেহ নাই, কিন্তু ভগবান বলিলেন,[১] "আমার কর্ম কর, আমাকে পরম পুরুষ, পরম লক্ষ্য বলিয়া স্বীকার কর, আমার ভক্ত হও, আসক্তি বর্জন কর, সর্বভূতের প্রতি বৈরিতাশূন্য হও, কারণ এইরূপ মানুষই আমাকে প্রাপ্ত হয়।" অন্য কথায়, নিম্নতন প্রকৃতিকে জয়, সর্বভূতের সহিত ঐক্য, বিশ্বাত্মক ভগবান এবং বিশ্বাতীত সত্তার সহিত একত্ব, কর্মে ভগবদিচ্ছার সহিত ঐক্য, অদ্বিতীয় একের প্রতি, সর্বভূতস্থিত ভগবানের প্রতি পূর্ণতম প্রেম—ইহাই হইতেছে পন্থা যাহা দ্বারা মানুষ সকল সীমা লঙ্ঘন করিয়া সেই সম্পূর্ণ অধ্যাত্ম মুক্তি এবং সেই অচিন্ত্য রূপান্তর লাভ করিতে পারে।

[১] মৎকর্ম্মকৃন্মৎপরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জ্জিতঃ।
নির্ব্বৈরঃ সর্ব্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব॥১১।৫৫

দ্বাদশ অধ্যায়

পথ ও ভক্ত

গীতার একাদশ অধ্যায়ে গীতাশিক্ষার মূল উদ্দেশ্যটি সাধিত হইয়াছে এবং তাহাকে কতকটা পূর্ণ করিয়া তোলা হইয়াছে। দিব্য কর্মের আদেশ দেওয়া হইয়াছে, যে আত্মা জগতের মধ্যে এবং ইহার জীবসকলের মধ্যে রহিয়াছে এবং যাহার মধ্যে জগতের সকল ক্রিয়া সংঘটিত হইতেছে তাহার সহিত যোগে, জগতের হিতের জন্য কর্ম করিতে হইবে এবং বিভূতি সে আদেশ মানিয়া লইয়াছেন। শিষ্যকে তাহার সাধারণ মানবোচিত পুরাতন ভাব, তাহার অজ্ঞানের আদর্শ, উদ্দেশ্য, দৃষ্টিভঙ্গী, স্বার্থচেতনা হইতে, শেষকালে তাহার অধ্যাত্ম সঙ্কটের সময় যেসব আর তাহার কোন কাজেই লাগে নাই সেসব হইতে তাহাকে ফিরানো হইয়াছে। সেই প্রতিষ্ঠায় যে কর্মটিকে তিনি পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, ঠিক সেই ঘোর কর্ম, ভয়াবহ প্রয়াসকেই তিনি এখন স্বীকার করিতে, এক নূতন আভ্যন্তরীণ ভিত্তিতে গ্রহণ করিতে সম্মত হইয়াছেন। এক সমন্বয়কারী মহত্তর জ্ঞান, এক দিব্যতর চৈতনা, এক উচ্চ নৈর্ব্যক্তিক উদ্দেশ্য, যে ভগবদিচ্ছা আদি জ্যোতি হইতে উৎসারিত হইয়া এবং অধ্যাত্ম প্রকৃতির প্রেরণাশক্তি লইয়া জগতের উপর ক্রিয়া করিতেছে, তাহার সহিত ঐক্যের আধ্যাত্মিক স্থিতি—ইহাই হইতেছে কর্মের নূতন আভ্যন্তরীণ নীতি, ইহাই পূর্বতন অজ্ঞান কর্মকে রূপান্তরিত করিয়া দিবে। যে জ্ঞান ভগবানের সহিত ঐক্য স্থাপন করে এবং ভগবানের ভিতর দিয়া সকল বস্তু, সকল জীবের সহিত সজ্ঞান একত্বে উপনীত হয়, যে সঙ্কল্প অহংভাবশূন্য, যাহা কেবল কর্মের নিগূঢ় অধীশ্বরের আদেশে তাঁহার যন্ত্ররূপে কাজ করে, যে দিব্য প্রেমের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা পরম আত্মার সহিত অন্তরঙ্গ হৃদ্যতা, এই তিন শক্তির পূর্ণতা ও একত্বের দ্বারা সংসিদ্ধ বিশ্বাতীত সত্তা, বিশ্বপুরুষ ও প্রকৃতি এবং সকল জীবের সহিত যে আভ্যন্তরীণ সর্বব্যাপী একত্ব—এইগুলিকেই তাঁহার কর্মসকলের ভিত্তি করিবার জন্য মুক্ত পুরুষকে বলা হইয়াছে। কারণ সেই ভিত্তি হইতেই তাঁহার আভ্যন্তরীণ আত্মা নিরাপদে প্রকৃতিকে যন্ত্ররূপে কাজ করিতে দিতে পারে, তিনি সকলপ্রকার বিচ্যুতির কারণের উপরে উঠেন, অহঙ্কার ও তাহার সকল সঙ্কীর্ণতা হইতে মুক্ত হন, পাপ ও অশুভ বা কর্মফল ভোগের সকলপ্রকার ভয় হইতেই পরিত্রাণ লাভ করিয়া, বাহ্য প্রকৃতি এবং সীমাবদ্ধ কর্মের যে বন্ধন হইতেছে অজ্ঞানের গ্রন্থি তাহা অতিক্রম করিয়া উচ্চতর অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত হন। তিনি তখন জ্যোতির শক্তিতে কর্ম করিতে পারেন, অস্পষ্ট আলোকে বা অন্ধকারে নহে এবং ভগবদ্ সম্মতি তাঁহার আচরণের প্রতি পদক্ষেপকেই সমর্থন করে। আত্মার স্বাধীনতা এবং প্রকৃতিস্থ জীবের বন্ধন, এই দুইয়ের বিরোধের দ্বারা যে

সমস্যার উদ্ভব হইয়াছিল, আত্মার সহিত প্রকৃতির জ্যোতির্ময় সমন্বয়ের দ্বারা তাহার সমাধান হইয়াছে। ঐ বিরোধ আছে অজ্ঞানের অধীন মনে, আত্মার জ্ঞানের সম্মুখে আর তাহার অস্তিত্ব থাকে না।

কিন্তু আরও কিছু বলিবার আছে, তাহা হইলেই এই মহান অধ্যাত্ম পরিবর্তনের অর্থটি সমগ্রভাবে পরিস্ফুট করা হয়। দ্বাদশ অধ্যায়ে এই অবশিষ্ট জ্ঞাতব্যই অবতারণা করা হইয়াছে এবং পরবর্তী ছয় অধ্যায়ে ইহার বিকাশ সাধন করিয়া এক মহান চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছে। এই যে জিনিসটি এখনও বলিতে বাকী রহিয়াছে, এইটি হইতেছে অধ্যাত্ম মুক্তি সম্বন্ধে প্রচলিত বেদান্ত মতের সহিত গীতার শিক্ষার প্রভেদ লইয়া—গীতা আত্মার সম্মুখে এক উদারতর ব্যাপক মুক্তির পথ খুলিয়া দিয়াছে। এখন আবার সেই প্রভেদটির উপরেই বিশেষ জোর দেওয়া হইতেছে। প্রচলিত বেদান্তের পথ হইতেছে, কঠোর ও অনন্য জ্ঞানের ভিতর দিয়া। যে যোগ, যে একত্বকে ইহা অধ্যাত্ম মুক্তির উপায় এবং সার তত্ত্ব বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে, সেইটি হইতেছে শুদ্ধ জ্ঞানের যোগ, এক পরম অক্ষর, এক সম্পূর্ণ অনির্দেশ্য সত্তার সহিত নিখর একত্ব—সে সত্তা অব্যক্ত ব্রহ্ম, অনন্ত, নিস্তব্ধ স্পর্শাতীত, উদাসীন, এই যে নানা সম্বন্ধের জগৎ এ সবেরই বহু ঊর্ধ্বে। গীতা যে পথ দেখাইয়াছে তাহাতে অবশ্য জ্ঞানই অপরিহার্য ভিত্তি, কিন্তু তাহা হইতেছে সমগ্র জ্ঞান। নৈর্ব্যক্তিকভাবে সর্বকর্মসাধনই প্রাথমিক অপরিহার্য পন্থা; কিন্তু গভীর এবং উদার প্রেম ও ভক্তিই হইতেছে অধ্যাত্ম সিদ্ধি এবং অমৃতত্বের আনন্দ লাভ করিবার পক্ষে বলবত্তম ও উচ্চতম শক্তি; সম্বন্ধাতীত অব্যক্ত সত্তা, উদাসীন নিষ্ক্রিয় ব্রহ্ম এইরূপ প্রেম ও ভক্তিতে কোনও সাড়া দিতে পারে না, কারণ এসব জিনিসের জন্য চাই একটা সম্বন্ধ, নিবিড় ব্যক্তিগত অন্তরঙ্গ ভাব। যে ভগবানের সহিত মানবাত্মাকে এই নিবিড়তম ঐক্যে প্রবেশ করিতে হইবে, তিনি অবশ্য তাঁহার পরম পদে বিশ্বাতীত অচিন্ত্য সত্তা, সকল প্রকাশনের বহু ঊর্ধ্বে, পরব্রহ্ম, কিন্তু তিনিই আবার সর্বভূতের জীবন্ত পরম আত্মা। তিনি পরম ঈশ্বর, সকল কর্ম ও বিশ্বপ্রকৃতির প্রভু। তিনি একই সময়ে জীবের অন্তরপুরুষরূপে তাহার দেহ মন আত্মার মধ্যে বিরাজ করেন, আবার সেসবকে অতিক্রম করিয়া থাকেন। তিনি পুরুষোত্তম, পরমেশ্বর ও পরমাত্মা এবং এই সকল সমতুল্য রূপের মধ্যেই তিনি সেই এক শাশ্বত ভগবান। এই সমগ্র সমন্বয়সাধক জ্ঞানে উদ্বুদ্ধ হওয়াই আত্মার চরম মুক্তিলাভের এবং প্রকৃতির কল্পনাতীত অচিন্ত্য সংসিদ্ধিলাভের প্রশস্ত দ্বার। এই যে ভগবানে তাঁহার সকল রূপের সম্মিলন হইয়াছে, ইহারই উদ্দেশ্যে আমাদের কর্ম, আমাদের ভক্তি, আমাদের জ্ঞানকে নিত্য আভ্যন্তরীণ যজ্ঞরূপে উৎসর্গ করিতে হইবে। এই যে পরম পুরুষ, পুরুষোত্তম, বিশ্বের অতীত আবার ইহার আধারস্বরূপ আত্মা, ইহার অধিবাসী, ইহার অধিপতি, যিনি ঠিক এইভাবেই কুরুক্ষেত্রের মহান বিশ্বরূপের মধ্যে প্রকটিত হইয়াছেন, ইঁহারই মধ্যে মুক্ত আত্মাকে প্রবেশ করিতে হইবে; আর সে ইহা

পারিবে যখন সে একবার তাঁহাকে তাঁহার সকল তত্ত্ব এবং সকল শক্তির সহিত জানিয়াছে, দর্শন করিয়াছে, যখন সে তাঁহার অনন্তমুখী ঐক্যকে ধারণা করিতে, উপভোগ করিতে সমর্থ হইয়াছে, জ্ঞাতুম্ দ্রষ্টুম্ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুম্ চ।

অদ্বিতীয় একের মধ্যে নিমজ্জিত হইয়া জীবের ব্যক্তিগত সত্তার যে আত্ম-বিস্মৃত বিলোপসাধন, সাযুজ্যমুক্তি, গীতার মুক্তি তাহা নহে; ইহা একই সঙ্গে সকল প্রকারের মিলন। এখানে আছে পরম ভগবানের সহিত মূল সত্তায়, চৈতন্যের অন্তরঙ্গতায় এবং আনন্দের ঐক্যে সম্পূর্ণ সংযোজন, সাযুজ্য—কারণ এই যোগের একটি লক্ষ্য হইতেছে ব্রহ্ম হওয়া, ব্রহ্মভূতঃ। এখানে আছে পরম-পুরুষের শ্রেষ্ঠতম সত্তার মধ্যে আনন্দময় চিরনিবাস, সালোক্য—কারণ বলা হইয়াছে, তুমি আমার মধ্যে বাস করিবে, নিবসিষ্যসি ময়্যেব। এখানে আছে ঐক্যসাধক সামীপ্যে অনন্ত প্রেম ও ভক্তি, এখানে মুক্ত জীব তাহার প্রেমাস্পদ ভগবানের আলিঙ্গনে আবদ্ধ, তাহার সকল আনন্দের আধার আত্মায় পরিবৃত সামীপ্য। এখানে আছে ভগবদ্ প্রকৃতির সহিত জীবের মুক্ত প্রকৃতির একত্ব, সাদৃশ্য মুক্তি, কারণ মুক্ত জীবের সিদ্ধাবস্থা হইতেছে ভগবানেরই তুল্য হওয়া মদ্ভাবমাগতঃ, এবং সত্তার ধর্মে, কর্মে ও প্রকৃতির ধর্মে তাঁহার সহিত এক হওয়া, সাধর্ম্যম্ আগতাঃ। প্রাচীনপন্থী জ্ঞানযোগের লক্ষ্য হইতেছে এক অনন্ত সত্তার অতলতায় নিমজ্জিত হওয়া, সাযুজ্য, তাহা কেবল এইটিকেই পূর্ণ মুক্তি বলিয়া গণ্য করে। ভক্তিযোগ ভগবানের সামীপ্য কিংবা তাঁহার মধ্যে নিত্য নিবাসকেই মহত্তর মুক্তি বলিয়া জ্ঞান করে, সালোক্য, সামীপ্য। কর্মযোগ চায় সত্তা ও প্রকৃতির শক্তিতে একত্ব, সাদৃশ্য। কিন্তু গীতা তাহার উদার সমগ্রতায় এই সকলকেই অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়াছে এবং সকলের সমন্বয় করিয়া এক মহত্তর, সমৃদ্ধতম দিব্যমুক্তি ও সংসিদ্ধিতে পরিণত করিয়াছে।

এই প্রভেদটি সম্বন্ধে অর্জুনকে দিয়া প্রশ্ন করান হইল। মনে রাখিতে হইবে যে, নৈর্ব্যক্তিক অক্ষর পুরুষ এবং পুরুষোত্তম যিনি একই সময়ে নৈর্ব্যক্তিক এবং দিব্যপুরুষ এবং এই দুইয়েরও বহু ঊর্ধ্বে, এই উভয়ের মধ্যে যে প্রভেদ (কৃষ্ণ পুনঃ পুনঃ অহম্, মাম্ বলিতে যে ভাগবত "আমি"-কে বুঝিয়াছেন তাহাতে এই মুখ্য প্রভেদটি উপলক্ষিত হইয়াছে), এ পর্যন্ত স্পষ্টভাবে, সঠিকভাবে এই প্রভেদটি করা হয় নাই। আমরা বরাবর এই প্রভেদটি পূর্ব হইতেই ধরিয়া লইয়াছি, যাহাতে প্রথম হইতেই গীতার বাণীর পূর্ণ মর্মটি বুঝিতে পারা যায়, নতুবা এই মহত্তর সত্যের আলোকে নূতনভাবে দেখিয়া আমাদিগকে সেই একই কথা পুনরায় বলিতে হইত। অর্জুনকে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, প্রথমত তাঁহার স্বতন্ত্র ব্যক্তিস্বরূপকে এক অদ্বিতীয় শাশ্বত ও অক্ষর আত্মার শান্ত নৈর্ব্যক্তিকতার মধ্যে নিমজ্জিত করিতে, এ শিক্ষা তাঁহার পূর্ব ধারণাসকলের অনুযায়ীই হইয়াছিল এবং ইহা বুঝা তাঁহার পক্ষে কঠিন হয় নাই। কিন্তু এখন তাঁহার সম্মুখে দেখান হইতেছে এই মহত্তম বিশ্বাতীত সত্তাকে, এই বিশালতম বিশ্বপুরুষকে এবং জ্ঞান, কর্ম ও

ভক্তি দ্বারা ইহার সহিতই একত্বলাভ করিবার জন্য তাঁহাকে আদেশ করা হইতেছে, অতএব, এ সম্বন্ধে যে সন্দেহ উঠিতে পারে তাহার সমাধান করা ভাল মনে করিয়াই তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "যে সকল ভক্ত এইভাবে নিত্যযুক্ত হইয়া তোমাকে উপাসনা করে, ত্বাম্, এবং যাহারা অব্যক্ত, অক্ষর আত্মার উপাসনা করে, ইহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যোগবেত্তা কাহারা?"[১] আত্মনি অথ ময়ি, "আমাতে তাহার পর আত্মাতে", এই সব বাক্যের দ্বারা প্রথমেই যে প্রভেদ করা হইয়াছিল, এখানে সেইটিই পুনরায় সূচিত হইতেছে। অর্জুন প্রভেদ করিলেন, ত্বাম আর অক্ষরম্ অব্যক্তম্। তাঁহার বক্তব্যের সারমর্ম এই, তুমি সকল সত্তার পরম উৎস ও আদি, সকল বস্তুতে অনুস্যূত ভগবৎসত্তা, তোমার রূপসকলের দ্বারা বিশ্ব ব্যাপিয়া অবস্থিত শক্তি তুমি, তোমার বিভূতি সকলের মধ্যে, জীবগণের মধ্যে, প্রকৃতির মধ্যে প্রকট পুরুষ তুমি, তোমার মহীয়ান বিশ্বযোগের দ্বারা কর্মের অধীশ্বররূপে জগতের মধ্যে এবং আমাদের হৃদয়ের মধ্যে তুমি বিরাজিত। এইভাবেই তোমায় আমাকে জানিতে হইবে, ভক্তি করিতে হইবে, আমার সকল সত্তায়, চেতনায়, চিন্তায়, অনুভবে ও কর্মে তোমার সহিত নিজেকে যুক্ত করিতে হইবে, সততযুক্ত। কিন্তু তাহা হইলে এই যে অক্ষর সত্তা যাহা কখনও ব্যক্ত হয় না, কখনও কোন রূপ পরিগ্রহ করে না, সকল কর্ম হইতে স্বতন্ত্র থাকে, সরিয়া দাঁড়ায়, জগতের সহিত বা ইহার কোনও বস্তুর সহিত কোনরূপ সম্বন্ধ রাখে না, যাহা চিরনিস্তব্ধ, অদ্বিতীয়, নৈর্ব্যক্তিক, অচল—ইহা কি? সকল প্রচলিত মতবাদ অনুসারে এই শাশ্বত আত্মাই হইতেছে মহত্তর তত্ত্ব, ব্যক্ত ভগবান একটি নিম্নতন রূপ, ব্যক্ত নহে, অব্যক্তই হইতেছে শাশ্বত অধ্যাত্ম সত্তা। তাহা হইলে এই যে যোগ অভিব্যক্তিকে স্বীকার করে, নিম্নতন বস্তুকে স্বীকার করে এইটি কেমন করিয়া মহত্তর যোগ-জ্ঞান হইল?

শ্রীকৃষ্ণ দৃঢ়তার সহিত এই প্রশ্নের সুস্পষ্ট উত্তর দিলেন। "যাহারা আমার উপর মন নিবেশ করে এবং নিত্যযুক্ত হইয়া পরম শ্রদ্ধার সহিত আমাকে উপাসনা করে, আমার মতে তাহারাই শ্রেষ্ঠতম যোগী।"[২] তাহাই পরম শ্রদ্ধা যাহা সকলের মধ্যে ভগবানকে দেখে, যাহার দৃষ্টিতে ব্যক্ত ও অব্যক্ত একই ভগবান। তাহাই পূর্ণতম যোগ যাহা ভগবানকে পায় প্রতি মুহূর্তে, প্রত্যেক কর্মে এবং প্রকৃতির সকল

[১] এবং সততযুক্তা যে ভক্তাস্ত্বাং পর্য্যুপাসতে।
যে চাপ্যক্ষরমব্যক্তং তেষাং কে যোগবিত্তমাঃ॥১২।১

[২] ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে।
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ॥
যে ত্বক্ষরমনির্দ্দেশ্যমব্যক্তং পর্য্যুপাসতে।
সর্ব্বত্রগমচিন্ত্যং চ কূটস্থমচলং ধ্রুবম্॥
সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং সর্ব্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ।
তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ॥১২।২-৪

সমগ্রতা দিয়া। কিন্তু যাহারা কঠিন পথ ধরিয়া অনির্দেশ্য অব্যক্ত অক্ষরের অভিমুখে আরোহণ করিতে চায়, ভগবান বলিলেন, তাহারাও আমাকে প্রাপ্ত হয়। কারণ তাহাদের লক্ষ্যে কোনও ভুল নাই, কেবল তাহাদের পথ অধিকতর কঠিন এবং তাহা ততখানি সম্পূর্ণ ও উৎকৃষ্ট নহে। অব্যক্ত কৈবল্যাত্মক সত্তাকে প্রাপ্ত হইবার জন্য এখানে যে ব্যক্ত অক্ষর সত্তা রহিয়াছে ইহারই মধ্য দিয়া তাহাদিগকে উঠিতে হয় এবং তাহাদের পক্ষে এইটিই সর্বাপেক্ষা সহজ পন্থা। এই ব্যক্ত অক্ষর সত্তা হইতেছে আমারই সর্বব্যাপী নৈর্ব্যক্তিকতা ও প্রশান্তি; বিরাট, অচিন্ত্য কূটস্থ, ধ্রুব, সর্বত্র বিদ্যমান ইহাই ক্ষর পুরুষের কর্মকে ধারণ করিয়া থাকে কিন্তু তাহাতে যোগদান করে না। মন ইহার মধ্যে অবলম্বন করিবার কিছুই পায় না; ইহাকে পাওয়া যায় কেবল এক নিশ্চল অধ্যাত্ম নৈর্ব্যক্তিকতা ও প্রশান্তি দ্বারা, আর যাহারা শুধু ইহাকেই অনুসরণ করে তাহাদিগকে মন ও ইন্দ্রিয়গণের কর্মকে সম্যকরূপে সংযত করিতে হয়, এমনকি সম্পূর্ণভাবেই প্রত্যাহার করিতে হয়। তথাপি তাহাদের বুদ্ধির সমতা দ্বারা, সকল জিনিসের মধ্যে এক আত্মাকে দর্শনের দ্বারা এবং সর্বভূতের হিতের জন্য স্থির শান্ত ও শুভ সঙ্কল্পের দ্বারা তাহারাও সকল বস্তু, সকল জীবের মধ্যে আমাকে প্রাপ্ত হয়। যাহারা তাহাদের সত্তার সকল ভাবে, সর্ব্বভাবেন, নিজদিগকে ভগবানের সহিত যুক্ত করে এবং বিশ্বের বস্তুসকলের জীবন্ত উৎস অচিন্ত্য দিব্য পুরুষের মধ্যে সমগ্র ও পূর্ণভাবে প্রবেশ করে, ঠিক তাহাদেরই ন্যায় এই যেসব উপাসক এই অধিকতর কষ্টকর অনন্য একত্বের ভিতর দিয়া এক সম্বন্ধবিহীন অব্যক্ত কৈবল্যাত্মক সত্তাকে লাভ করিতে চায় ইহারাও পরিশেষে সেই একই শাশ্বতকে প্রাপ্ত হয়। কিন্তু এ পথটি তেমন সরল নহে এবং ইহা অধিকতর ক্লেশদায়ক। অধ্যাত্মভাবাপন্ন মানবপ্রকৃতির পক্ষে এইটি সমগ্র ও স্বাভাবিক গতি নহে।

আর ইহা মনে করাও ভুল যে, এই পথটি অধিকতর ক্লেশদায়ক সেই জন্যই ইহা উচ্চতর এবং অধিকতর ফলদায়ী প্রণালী। গীতার যে অপেক্ষাকৃত সুগম পন্থা তাহা অধিকতর দ্রুত, স্বাভাবিক ও সহজভাবে সেই একই পূর্ণ মুক্তির দিকে লইয়া যায়। কারণ ইহা ভাগবত পুরুষকে স্বীকার করে বলিয়া যে দেহধারী প্রকৃতির মানসিক ও ইন্দ্রিয়সম্বন্ধীয় বন্ধনসকলে আসক্ত হইয়া পড়ে তাহা নহে। বরঞ্চ ইহা জন্ম ও মৃত্যুর বাহ্যিক বন্ধন হইতে অচিরে নিশ্চিতভাবে মুক্তি আনিয়া দেয়।[১] অনন্য জ্ঞান-পন্থার যোগীকে নিজের প্রকৃতির নানাপ্রকার দাবির সহিত কষ্টকর দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হইতে হয়, তিনি তাহাদিগকে উচ্চতম ভোগ হইতেও বঞ্চিত করেন এবং তাঁহার অধ্যাত্মসত্তার ঊর্ধ্বমুখী প্রবৃত্তিগুলিকেও বর্জন করেন যখনই তাহারা কোনরূপ সম্বন্ধের সূচনা করে অথবা নেতিমূলক কৈবল্যাত্মক সত্তায় পৌঁছাইয়া

[১] তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।
ভবামি নচিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্॥১২।৭

দিতে অক্ষম হয়। অন্যপক্ষে গীতার যে জীবন্ত পন্থা তাহা আমাদের সত্তার তীব্রতম ঊর্ধ্বমুখী গতিকে আবিষ্কার করে এবং সেইটিকে ভগবদ্‌মুখী করিয়া জ্ঞান, সঙ্কল্প, অনুভব, সিদ্ধিলাভের স্বাভাবিক প্রেরণা, এই সকলকে শক্তিশালী সহায়রূপে ব্যবহার করিয়া পূর্ণ মুক্তির দিকে অগ্রসর হয়। অব্যক্ত ব্রহ্ম তাহার অনির্দেশ্য একত্বে এমন জিনিস যে দেহধারী ক্বচিৎ তাহাকে লাভ করিতে পারে এবং তাহাও পারে কেবল সর্বদা দুঃখ স্বীকার করিয়া, সকল অঙ্গকে নিগ্রহ করিয়া, প্রকৃতিকে কঠোরভাবে ক্লেশ ও যন্ত্রণা দিয়া, দুঃখম্ অবাপ্যতে, ক্লেশোঽধিক-তরস্তেষাম্[১]। অনির্দেশ্য অদ্বিতীয় সত্তা যাহারা তাহার নিকট উঠিয়া আসে সকলকেই গ্রহণ করে, কিন্তু কোনরূপ সম্বন্ধের দ্বারা সাহায্য করে না, আরোহণ-কারীদিগকে ধরিবার মত কোনও অবলম্বন দেয় না। সবই করিয়া লইতে হয় কঠোর তপস্যার দ্বারা, কঠিন ও একক ব্যক্তিগত প্রয়াসের দ্বারা। কিন্তু যাহারা গীতার পন্থায় পুরুষোত্তমের উপাসনা করে তাহাদের পথ কত পৃথক! যখন তাহারা অনন্যযোগে তাঁহাকে ধ্যান করে, যেহেতু তাহারা সকলকেই বাসুদেব বলিয়া দেখে, তিনি প্রতি স্থানে, প্রতি মুহূর্তে, অসংখ্য মূর্তিতে তাহাদিগকে দেখা দেন তাহাদের মধ্যে জ্ঞানের প্রদীপ উজ্জ্বল করিয়া ধরেন এবং ইহার দিব্য ও সুখময় জ্যোতিতে সমগ্র জীবনকে প্লাবিত করিয়া দেন। জ্ঞানদীপ্ত তাহারা প্রত্যেক মূর্তিতেই পরম আত্মাকে চিনিতে পারে, সকল প্রকৃতির ভিতর দিয়া একেবারেই তাহারা প্রকৃতির অধীশ্বরকে প্রাপ্ত হয়, সকল সত্তার ভিতর দিয়া সকল সত্তার অন্তঃপুরুষকে প্রাপ্ত হয়, নিজেদের ভিতর দিয়া তাহারা নিজের যাহা কিছু সেসবেরই আত্মাকে প্রাপ্ত হয়, অবাধে শত দ্বার যুগপৎ বিদীর্ণ করিয়া তাহারা তাহাকে প্রাপ্ত হয় যাহা হইতে প্রত্যেক জিনিসের উৎপত্তি। অন্য প্রণালীটি কঠিন সম্বন্ধহীন স্তব্ধতার পথ, তাহা চায় সকল কর্ম হইতে সরিয়া যাইতে, কিন্তু দেহধারী জীবের পক্ষে ইহা অসম্ভব। আর এখানে সকল কর্ম পরম কর্মেশ্বরকে যজ্ঞরূপে উৎসর্গ করা হয় এবং তিনি পরম ইচ্ছাশক্তিরূপে যজ্ঞের ইচ্ছাকে চরিতার্থ করেন, ইহার সকল বোঝা তুলিয়া লন এবং আমাদের মধ্যে দিব্য প্রকৃতির কর্মের ভার নিজে গ্রহণ করেন। আর যখন ভক্ত বিপুল প্রেমাবেগে মানবের ও সর্বভূতের দিব্য সখা ও প্রেমাস্পদের উপরে সমগ্র হৃদয় ও চিত্ত নিবেশ করে, তাঁহাতেই আনন্দ আকাঙ্ক্ষা করে, তখনও পরমপুরুষ সমুদ্ধর্তা ও রক্ষাকর্তারূপে দ্রুত তাহার সমীপে উপস্থিত হন এবং তাহার মন, হৃদয়, দেহে সুখময় আলিঙ্গন দিয়া তাহাকে এই মৃত্যুসমাকুল সংসার সাগর হইতে উদ্ধার করেন এবং শাশ্বতের চির-নিরাপদ বক্ষের মধ্যে তুলিয়া লন।

তাহা হইলে এইটিই দ্রুততম, উদারতম, মহত্তম পন্থা। ভগবান মানবাত্মাকে

[১] ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে॥১২।৫

বলিলেন,[১] আমাতে তোমার সমস্ত মন স্থাপন কর, সমস্ত বুদ্ধি নিবেশ কর। আমি দিব্য প্রেম ও ইচ্ছা ও জ্ঞানের পরম জ্যোতিতে এই সকলকে অভিষিক্ত করিয়া ইহাদের উৎস আমারই মধ্যে তুলিয়া লইব। সংশয় করিও না, এই মরজীবনের ঊর্ধ্বে তুমি আমার মধ্যেই বাস করিবে। যে অমর আত্মা শাশ্বত প্রেম, সঙ্কল্প ও জ্ঞানের আবেগ, শক্তি ও জ্যোতিতে মহিমান্বিত হইয়াছে, ক্ষুদ্র পার্থিব প্রকৃতির শৃঙ্খল, তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারে না। অবশ্য এই পথেও বিঘ্ন আছে; কারণ নীচের প্রকৃতি রহিয়াছে তাহার প্রচণ্ড অথবা স্থূল নিম্নমুখী আকর্ষণ লইয়া, তাহা আরোহণের গতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে এবং উন্নয়ন ও ঊর্ধ্বমুখী উল্লাসের গতিপথ অবরুদ্ধ করে। ভাগবত চৈতন্যকে যখন কোন অপূর্ব মুহূর্তে অথবা কোন প্রশান্ত ও প্রোজ্জ্বল অবকাশে প্রথম লাভ করা যায়, তখনও তাহাকে একেবারে ধরিয়া রাখা সম্ভব হয় না, বা ইচ্ছামত পুনরায় ডাকিয়া আনা যায় না;[২] অনেক সময়েই ব্যক্তিগত চৈতন্যকে ভগবানে স্থির নিবিষ্ট করিয়া রাখা যায় না; জ্যোতি হইতে নির্বাসনের কত দীর্ঘ রজনী আছে, বিদ্রোহ, সংশয়, ব্যর্থতার কত প্রহর বা মুহূর্ত আছে। তথাপি যোগ অভ্যাসের দ্বারা এবং অনুভূতি উপলব্ধির পুনরাবৃত্তির দ্বারা সেই উচ্চতম অধ্যাত্ম সত্য সত্তার মধ্যে বিকশিত হয় এবং প্রকৃতিকে স্থায়ীভাবে অধিকার করিয়া লয়। মনের বহির্মুখী প্রবৃত্তির প্রাবল্য ও দুর্নিবারতার জন্য এইরূপ অভ্যাসও কি অতি কঠিন? তাহা হইলে সহজ পথ, কর্মেশ্বরের উদ্দেশে সকল কর্ম করা যেন মনের প্রত্যেক বহির্মুখী গতি সত্তার ভিতরের অধ্যাত্ম সত্যের সহিত সংযুক্ত হয় এবং কর্মের ভিতর দিয়াই শাশ্বত সত্যের দিকে, নিজের উৎসের দিকে ফিরিয়া যায়। তখন প্রাকৃত মানবের মধ্যে পুরুষোত্তমের প্রতিষ্ঠা গড়িয়া উঠিবে এবং ক্রমশ সে ইহার দ্বারা পূর্ণ হইয়া একটি দেবতায়, এক অধ্যাত্মপুরুষে পরিণত হইবে; সকল জীবন হইবে ভগবানের নিত্য অনুস্মরণ, এবং সিদ্ধিরও বিকাশ হইবে এবং পরম ভাগবত সত্তার সহিত মানবাত্মার সমগ্র জীবনের একত্ব বিকশিত হইবে।

কিন্তু এমনও হইতে পারে যে ভগবানের এইরূপ নিত্য অনুস্মরণ এবং আমাদের সমস্ত কর্ম তাঁহাতে উৎসর্গ করা সীমাবদ্ধ মনের পক্ষে সাধ্যাতীত বলিয়া অনুভূত হয়, কারণ স্মৃতিভ্রংশতাবশত সে মন কর্ম এবং কর্মের বাহ্যিক লক্ষ্যের দিকেই আকৃষ্ট হয় এবং ভিতরের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে এবং প্রত্যেক ক্রিয়াকে ভগবানের দিব্য বেদীতলে অর্পণ করিতে ভুলিয়া যায়। তাহা হইলে পথ হইতেছে

[১] ময়্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়।
নিবসিষ্যসি ময়্যেব অত ঊর্ধ্বং ন সংশয়ঃ॥১২।৮
অথ চিত্তং সমাধাতুম্ ন শক্নোষি ময়ি স্থিরম্।
অভ্যাসযোগেন ততো মামিচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয়॥
অভ্যাসেঽপ্যসমর্থোঽসিমৎকর্ম্মপরমো ভব।
মদর্থমপি কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্ সিদ্ধিমবাপ্স্যসি॥১২।৯-১০

কর্মে নীচেব সত্তাকে সংযত করা এবং ফলেব আকাঙ্ক্ষা না বাখিযা কর্ম কবা। সকল ফল বর্জন কবিতে হইবে, সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং, যে দিব্য শক্তি কর্মকে পরিচালিত কবিতেছে তাহাব নিকট উৎসর্গ কবিতে হইবে, অথচ সে শক্তি প্রকৃতিব উপব যে কর্মেব ভার অর্পণ কবে তাহা সম্পাদন কবিতে হইবে। কাবণ এই উপাযে বাধা ক্রমশ হ্রাস পায় এবং সহজেই দূব হইযা যায, মন ঈশ্বরকে স্মরণ কবিতে এবং ভাগবত চেতনাব মুক্তিব মধ্যে নিজেকে নিবিষ্ট কবিতে সুযোগ পায়। আব এইখানে গীতা শক্তি অনুযাযী সাধনাব ক্রম নির্দেশ কবিযাছে এবং এই নিষ্কাম কর্মযোগকেই শ্রেষ্ঠ স্থান দিযাছে।[১] কোন প্রচেষ্টা ও অনুভূতিব পুনবাবৃত্তি, অভ্যাস, মহান ও শক্তিশালী বস্তু, কিন্তু ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইতেছে জ্ঞান, বস্তুসকলেব পশ্চাতে যে সত্য বহিযাছে চিন্তাকে তদভিমুখী কবিযা সফল ও জ্যোতির্ময কবিয়া তোলা, আবাব এই মানসিক জ্ঞান অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ হইতেছে সম্পূর্ণ একাগ্রতার সহিত সত্যকে নীবরে ধ্যান কবা যেন চৈতন্য পবিশেষে ইহাব মধ্যে বাস কবিতে পাবে এবং সর্বদা ইহাব সহিত এক হইতে পাবে। কিন্তু ইহা অপেক্ষাও শক্তিশালী হইতেছে কর্মেব ফল পবিত্যাগ কবা, কাবণ তাহা অনতিবিলম্বে সকল বকম বিক্ষোভেব কারণ নাশ কবে এবং স্বতঃসিদ্ধভাবে আভ্যন্তরীণ স্থিবতা ও শান্তি স্থাপন কবে, আব স্থিবতা ও শান্তিই হইতেছে সেই ভিত্তি যাহাকে আশ্রয় কবিযা সবকিছু পূর্ণতা লাভ কবিতে পাবে এবং প্রশান্ত আত্মাব অধিকাবেব মধ্যে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ হইতে পারে। তখন চৈতন্য নিরুদ্বেগ হইতে পাবে, সানন্দে নিজেকে ভগবানে নিবিষ্ট কবিতে পাবে এবং অবিচলিতভাবে সিদ্ধিলাভেব দিকে অগ্রসর হইতে পারে। তখন জ্ঞান, সঙ্কল্প ও ভক্তি অটুট শান্তিব সুদৃঢ় ভূমি হইতে শাশ্বতেব আকাশেব মধ্যে নিজেদেব শিখব উন্নীত কবিতে পারে।

তাহা হইলে যে ভক্ত এই পন্থা অনুসবণ কবিযা শাশ্বতেব অনুবক্ত হয তাহাব দিব্য প্রকৃতি কি হইবে, তাহাব চেতনার ও সত্তাব মহত্তব অবস্থাটি কি হইবে? গীতা প্রথম হইতেই যে সমতা, নিষ্কামতা ও অধ্যাত্মমুক্তিব প্রযোজনীযতা ব্যক্ত করিয়াছে, এখানে কযেকটি শ্লোকে তাহাবই বর্ণনা দেওযা হইযাছে। সর্বদা এইটিই হইবে ভিত্তি এবং সেইজন্য প্রাবম্ভেই ইহার উপর এত জোব দেওযা হইযাছিল। এবং সেই সমতায ভক্তি, পুরুষোত্তমেব প্রতি প্রেম ও অনুবাগ আত্মাকে এক মহত্তম, শ্রেষ্ঠতম সিদ্ধির দিকে তুলিযা লইযা যাইবে, এই শান্ত সমতাই হইবে তাহার উদাব প্রতিষ্ঠা-ভূমি। এই মূলগত সমচৈতন্যেব কযেকটি সূত্র এখানে

[১] অথৈতদপ্যশক্তোঽসি কর্ত্তুং মদ্‌যোগমাশ্রিতঃ।
সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবান্॥১২।১১

[২] শ্রেযো হি জ্ঞানমভ্যাসাজ্‌জ্ঞানাদ্ধ্যানং বিশিষ্যতে।
ধ্যানাৎ কর্ম্মফলত্যাগস্ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরম্॥১২।১২

দেওযা হইযাছে।[১] প্রথমত, অহংভাবেব, "আমি" ও "আমাব" ভাবেব বর্জন, নির্ম্মমঃ, নিবহঙ্কাবঃ। যিনি পুরুষোত্তমেব ভক্ত তাঁহাব হৃদয় ও মন বিশ্ব-প্রসারিত, তাহা অহং-এব সকল সঙ্কীর্ণ প্রাচীর ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে। বিশ্বপ্রেম তাঁহাব হৃদযে বিবাজিত, সেখান হইতে সর্বভূতেব প্রতি করুণা সর্বতোমুখী সমুদ্রের ন্যায প্রবাহিত হইতেছে। তাঁহাব থাকিবে সর্বভূতেব প্রতি মৈত্রী ও করুণা, কোন জীবের উপবেই তাঁহাব ঘৃণা নাই, কারণ তিনি ধৈর্যশীল, চিরসহিষ্ণু, তিতিক্ষাশালী, তিনি ক্ষমাব নির্ঝব। তাঁহাব আছে কামনাশূন্য সন্তোষ, সুখে দুঃখে, আনন্দে ও যন্ত্রণায় স্থিব সমতা, অবিচলিত আত্মসংযম এবং যোগিজনসুলভ দৃঢ় অটল সঙ্কল্প ও স্থিবনিশ্চযতা এবং এমন প্রেম ও ভক্তি যাহা সমস্ত মন ও বুদ্ধিকে তাঁহার চৈতন্য ও জ্ঞানেব অধীশ্বব ভগবানে অর্পণ কবে। অথবা সংক্ষেপে তিনি হইবেন এমন ব্যক্তি যিনি বিক্ষুব্ধ চঞ্চল নীচেব প্রকৃতি হইতে এবং ইহার হর্ষ, ভয়, উদ্বেগ, ক্রোধ, কাম প্রভৃতিব তবঙ্গ হইতে মুক্ত, তিনি হইবেন শান্ত আত্মা তাঁহাব দ্বারা জগৎ সন্তপ্ত বা ব্যথিত হয় না, তিনিও জগতেব দ্বারা সন্তপ্ত বা ব্যথিত হন না—তিনি শান্ত আত্মা তাই তাঁহাব নিকটে সকলেই শান্ত।

অথবা তিনি হইবেন এমন ব্যক্তি যিনি সকল কামনা ও কর্ম তাঁহার জীবনের অধীশ্বরকে উৎসর্গ কবিয়া দিয়াছেন, তিনি শুদ্ধ ও শান্ত, যাহাই আসুক সকল বিষযে উদাসীন, কোন ফল, কোন ঘটনার দ্বাবাই তিনি ব্যথিত বা ক্ষুব্ধ হন না, তিনি সর্বাবম্ভপবিত্যাগী, অহঙ্কাবেব বশে, ব্যক্তিগতভাবে ও মনের দ্বাবা তিনি আভাম্ভবীণ ও বাহ্যিক কোন কর্মই আরম্ভ কবেন না, তিনি তাঁহাব মধ্য দিযা ভাগবত ইচ্ছা ও ভাগবত জ্ঞানকে তাঁহাব নিজের সঙ্কল্প, ব্যক্তিগত অভিলাষ বা বাসনাব দ্বাবা বিচ্যুত না করিয়া অবাধে প্রবাহিত হইতে দেন, অথচ ঠিক সেই জন্যই তিনি তাঁহাব প্রকৃতিব সকল কর্মে হন ক্ষিপ্র ও সুকৌশলী, কাবণ পবম ভগবানেব ইচ্ছাব সহিত এই যে নিখুঁত ঐক্য, এই যে শুদ্ধ যন্ত্রভাব, ইহা হইতেই আসে কর্মেব সর্বশ্রেষ্ঠ কৌশল। আবাব তিনি হইবেন এমন ব্যক্তি যিনি সুখের

অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী॥
সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চযঃ।
মযার্পিতমনোবুদ্ধির্যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিযঃ॥
যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ।
হর্ষামর্ষভযোদ্বেগৈর্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিযঃ॥
অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ।
সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিযঃ॥
যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমানযঃ স মে প্রিযঃ॥
সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানযোঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ॥১২।১৩-১৮

স্পর্শ আকাঙ্ক্ষা কবেন না, তাহাতে হর্ষান্বিত হন না, দুঃখেব স্পর্শেও দ্বেষ কবেন না বা তাহাব ভারে শোকাচ্ছন্ন হন না। তিনি শুভ ও অশুভের প্রভেদ লোপ করিয়া দিযাছেন, কাবণ তাঁহার ভক্তি তাঁহাব শাশ্বত প্রেমিক ও প্রভুব হস্ত হইতে সকল জিনিসই সমানভাবে মঙ্গলময বলিযা গ্রহণ কবেন। যিনি ভগবানেব প্রিয ভগবদ্ভক্ত তাঁহার আত্মায আছে উদার সমতা, শত্রু-মিত্র, মান-অপমান, সুখ-দুঃখ, শীত-উষ্ণ, মানুষের সাধারণ প্রকৃতি এই যেসব দ্বন্দ্বে পীড়িত হয এসবেবই প্রতি তাঁহার সমভাব। কোন ব্যক্তি বা বস্তুতে, কোন স্থান বা নিকেতনে তাঁহাব কিছুমাত্র আসক্তি থাকিবে না;[১] তিনি যেরূপ পবিস্থিতিব মধ্যেই থাকুন, মানুষ তাঁহাব প্রতি যেরূপ ব্যবহাবই কৰুক, তাঁহার পদ বা ভাগ্য যাহাই হউক সবেতেই তিনি সন্তুষ্ট ও পবিতৃপ্ত। সকল জিনিসেই তাঁহাব মন থাকিবে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ, কাবণ তাহা শ্রেষ্ঠতম আত্মায় নিত্য অবস্থিত এবং তাঁহার প্রেম ও ভক্তি একমাত্র ভগবানে চিবনিবিষ্ট। সমতা, কামনাশূন্যতা এবং নীচেব অহংভাবময প্রকৃতিব এবং তাহাব দাবিসকল হইতে মুক্তি—গীতা মহান মুক্তির একমাত্র সর্বাঙ্গসম্পন্ন ভিত্তিস্বরূপ সর্বদা এইগুলিকেই প্রযোজনীয বলিয়াছে। শেষ পর্যন্ত তাহাব মূল শিক্ষা ও প্রথম প্রয়োজনটিব উপব পুনঃপুনঃ জোর দেওযা হইয়াছে—শান্ত জ্ঞানময আত্মা যাহা সকল জিনিসের মধ্যেই এক অধ্যাত্ম সত্তাকে দেখিতে পায়, স্থিব অহংভাবশূন্য সমতা যাহা এই জ্ঞানেরই ফল, নিষ্কাম কর্ম যাহা এই সমতাব মধ্যে কর্মেশ্ববকে উৎসর্গ করা হয়, মানুষের সমগ্র মানসিক প্রকৃতিকে মহত্তব আভ্যন্তবীণ ভাগবত সত্তার হস্তে সমর্পণ। আব এই সমতার শিখব হইতেছে সেই প্রেম যাহাব ভিত্তি জ্ঞানে, যাহা যন্ত্রভাবে কর্ম করায় পবিপূর্ণতা লাভ কবে, যাহা সকল জিনিস, সকল বস্তুর প্রতিই প্রসারিত, যে ভাগবত পুরুষ এই বিশ্বেব স্রষ্টা ও অধীশ্বব, সুহৃদম্ সর্ব্বভূতানাম্ সর্ব্বলোকমহেশ্বরম্, তাঁহার প্রতি উদাব একনিষ্ঠ সর্বতোমুখী প্রেম।

এইটিই হইতেছে সেই ভিত্তি, সেই বিধান, সেই উপায যাহা দ্বাবা শ্রেষ্ঠতম অধ্যাত্মমুক্তি লাভ কবিতে হইবে; ভগবান বলিলেন, যাহাদেব ইহা কোনরূপে আছে তাহারা সকলেই আমার প্রিয, ভক্তিমান্ মে প্রিযঃ। কিন্তু আমাব অতীব প্রিয, অতীব মে প্রিয়াঃ, হইতেছে ভগবানেব নিকটতম সেই সকল ভক্ত যাহাদেব ভগবদ্ভক্তি আবও উদারতর ও মহত্তর সিদ্ধির দ্বারা পূর্ণতা লাভ কবিযাছে, এই মাত্র আমি সেইটিরই পথ ও প্রণালী তোমাকে দেখাইলাম।[২] সেই সব ভক্ত পুরুষোত্তমকেই তাহাদের একমাত্র পরম লক্ষ্য করে এবং এই শিক্ষায বর্ণিত অমৃত ধর্ম পূর্ণতম শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার সহিত যথাযথভাবে অনুষ্ঠান করে। গীতাব ভাষায় ধর্ম শব্দের অর্থ হইতেছে, সত্তা ও তাহার কর্মেব স্বভাবসিদ্ধ নীতি এবং আভ্যন্তবীণ

[১] তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ।
অনিকেতঃ স্থিবমতির্ভক্তিমান্ মে প্রিযো নবঃ॥১২।১৯

[২] যে তু ধর্ম্যামৃতমিদং যথোক্তং পর্য্যুপাসতে।
শ্রদ্দধানা মৎপবমা ভক্তাস্তেঽতীব মে প্রিযাঃ॥১২।২০

প্রকৃতি হইতে উৎসাবিত এবং তদ্বাবা নির্ধাবিত কর্ম, স্বভাবনিযতম্ কর্ম। মন, প্রাণ, দেহেব যে নিম্নতন অজ্ঞান চৈতন্য তাহাতে আছে বহু ধর্ম, বহু নীতি, বহু আদর্শ ও নিযম, কাবণ মানসিক, প্রাণিক ও দৈহিক প্রকৃতির আছে বহু বিচিত্র রূপাযণ ও শ্রেণী। অমৃত ধর্ম এক; উচ্চতম আধ্যাত্মিক ভাগবত চৈতন্য এবং তাহাব শক্তিসকলেব ধর্ম। তাহা গুণত্রযেব অতীত এবং তাহা লাভ করিতে হইলে এই সকল নীচেব ধর্ম পবিত্যাগ কবিতেই হইবে, সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য। সেসবের পবিবর্তে শাশ্বতেব এক মুক্তিপ্রদ একত্বসাধক চৈতন্য ও শক্তিই হইবে আমাদের কর্মেব একমাত্র অনন্ত উৎস, আমাদের কর্মেব ছাঁচ, নিয়ামক শক্তি ও দৃষ্টান্তস্বরূপ আদর্শ। আমাদেব নিম্নতন ব্যক্তিগত অহংভাবকে ছাড়াইয়া উঠা, শাশ্বত সর্বব্যাপী অক্ষবপুরুষের নৈর্ব্যক্তিক ও সমতাপূর্ণ শান্তির মধ্যে প্রবেশ করা, সেই শান্তি হইতে আমাদেব সকল প্রকৃতি, সকল সত্তাব সমগ্র আত্মসমর্পণের দ্বারা অক্ষবেবও উপবে যে অন্যতম ও উচ্চতব পুরুষ বহিয়াছেন, হৃদয়েব আকাঙ্ক্ষাকে তদভিমুখী কবা, ইহাই হইতেছে এই যোগেব প্রথম প্রয়োজন। সেই আকাঙ্ক্ষাব শক্তিতেই আমবা অমৃত-ধর্মে উঠিতে সক্ষম হই। সেখানে সত্তায় চৈতন্যে ও ভাগবত আনন্দে শ্রেষ্ঠতম উত্তম পুরুষের সহিত এক হইযা, তাঁহার পরম ক্রীড়াত্মিকা প্রকৃতিশক্তিব (স্বা প্রকৃতি) সহিত এক হইযা মুক্ত আত্মা অনন্তভাবে জ্ঞান লাভ কবিতে পারে, অসীমভাবে ভালবাসিতে পারে, এক উচ্চতম অমৃতত্ব ও পূর্ণতম মুক্তিব যথার্থ শক্তিতে অটলভাবে কর্ম করিতে পারে। গীতার অবশিষ্টাংশে এই অমৃত ধর্মেব উপবেই পূর্ণতর আলোকসম্পাত কবা হইযাছে।

দ্বিতীয় খণ্ড (উত্তরার্ধ)

পরম রহস্য

ত্রযোদশ অধ্যায়

ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ

গীতা শেষ ছয অধ্যাযে জীবেব পক্ষে নীচের প্রকৃতি হইতে দিব্য প্রকৃতিব মধ্যে উঠিবাব পন্থাটি সুস্পষ্ট ও সম্পূর্ণ জ্ঞানের উপরে প্রতিষ্ঠিত কবিবার জন্য, গুরু ইতিপূর্বেই অর্জুনকে যে শিক্ষা দিয়াছেন সেইটিই অন্য প্রকারে বর্ণনা কবিযাছে। মূলত ইহা সেই একই জ্ঞান, কিন্তু বিশেষ অংশ ও সম্বন্ধগুলিকে পবিস্ফুট কবা হইযাছে এবং তাহাদেব সম্পূর্ণ মর্ম বুঝান হইয়াছে, যেসকল চিন্তা ও সত্য কেবল প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ কবা হইয়াছিল অথবা অন্য উদ্দেশ্যের অনুসবণে সাধাবণভাবে ব্যক্ত কবা হইযাছিল সেইগুলিকে বিবৃত কবিযা তাহাদের সম্পূর্ণ সার্থকতা দেখান হইযাছে। যথা, প্রথম ছয অধ্যাযে অক্ষর আত্মার সহিত প্রকৃতিতে বদ্ধ জীবাত্মাব প্রভেদ কবিবাব জন্য যে জ্ঞান প্রযোজন সেইটিকে পূর্ণ প্রাধান্য দেওযা হইযাছে। পবম আত্মা, পবমপুরুষেব কথা সংক্ষেপেই উপলক্ষিত হইযাছে, পবিস্ফুট কবা হয নাই, জগতেব কর্মের সার্থকতা বুঝাইবার জন্য তাঁহাব অস্তিত্ব ধবিযা লওযা হইযাছে এবং তাঁহাকেই জীবনেব অধীশ্বব বলিযা ঘোষণা কবা হইযাছে, কিন্তু ইহা ছাড়া এমন আব কিছুই নাই যাহা হইতে বুঝা যায যে তিনি কি এবং তাঁহাব সহিত অন্যান্যেব সম্বন্ধ কি তাহাব ইঙ্গিতও করা হয নাই, পবিস্ফুট কবা তো দূবেব কথা। এই যে জ্ঞানকে অপ্রকট বাখা হইযাছিল, অবশিষ্ট অধ্যাযগুলিতে সেইটিকেই সুস্পষ্ট আলোকে প্রকাশ কবা হইযাছে এবং বিশেষ প্রাধান্য দেওযা হইযাছে। ঈশ্বব, ঊর্ধ্বতন ও নিম্নতন প্রকৃতির প্রভেদ, প্রকৃতির মধ্যে অবস্থিত সর্বস্রষ্টা সর্বাধাব ভগবান, সকল সত্তাব মধ্যে একমেবাদ্বিতীযম্— পববর্তী ছয অধ্যাযে (৭-১২) জ্ঞানেব সহিত কর্ম ও প্রেমেব মূল ঐক্য প্রতিষ্ঠাব জন্য এই তত্ত্বগুলিব উপবেই বিশেষ জোব দেওযা হইয়াছে। কিন্তু এখন প্রয়োজন পবমপুরুষ, অক্ষব আত্মা ও জীবেব সহিত কর্মময়ী ও গুণময়ী প্রকৃতিব সঠিক সম্বন্ধটি আবও সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত কবা। সেইজন্য অর্জুনকে দিযা এমন প্রশ্ন কবান হইল যাহাব উত্তবে এই সকল অস্পষ্ট বিষযগুলি আবও স্পষ্ট হইতে পাবে। তিনি পুরুষ ও প্রকৃতি বিষযে জিজ্ঞাসা কবিলেন, ক্ষেত্র কি, ক্ষেত্রজ্ঞ কি, জ্ঞান কি, জ্ঞেয় কি জানিতে চাহিলেন।[১] এইখানেই নিহিত বহিযাছে আত্মা ও জগৎ সম্বন্ধে সমুদয় জ্ঞান, জীবকে যদি প্রাকৃত অজ্ঞান দূব কবিতে হয এবং জ্ঞানেব, জীবনের, কর্মের যথাযথ ব্যবহাব কবিযা এবং এসকল জিনিসে ভগবানের সহিত নিজেবই সম্বন্ধেব

প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব ক্ষেত্রং ক্ষেত্রজ্ঞমেব চ।
এতদ্বেদিতুমিচ্ছামি জ্ঞানং জ্ঞেযঞ্চকেশব॥১৩।১

যথাযথ ব্যবহার করিযা নিশ্চিত পদক্ষেপে জগতেব শাশ্বত আত্মাব সহিত সত্তাগত একত্বের মধ্যে উঠিতে হয, তাহা হইলে এখনও এই জ্ঞানেবই প্রযোজন বহিযাছে।

গীতাব চিন্তাধারাব শেষ পবিণতিব পূর্বাভাসস্বরূপ এই সকল বিষযে গীতা-শিক্ষার মূলতত্ত্ব ইতিপূর্বেই কতক পবিমাণে পবিস্ফুট কবা হইযাছে, কিন্তু গীতাবই দৃষ্টান্ত অনুসবণ কবিযা বর্তমান আলোচ্য বিষযেব প্রসঙ্গে আমবা সেসবেব পুনরুল্লেখ করিতেছি। কর্মকে যদি স্বীকাব কবা হয, জগতে ভগবদিচ্ছাব যন্ত্রস্বরূপ আত্মজ্ঞানেব সহিত সম্পাদিত দিব্য কর্ম (ঐ কর্ম আভ্যন্তবীণভাবে পবম পুরুষেব উদ্দেশে ভক্তির সহিত যজ্ঞরূপে উৎসর্গ কবা হইলে) যদি ব্রাহ্মীস্থিতিব সহিত সম্পূর্ণ অবিবোধী বলিযা এবং ভগবদ্‌মুখী সাধনাব অপবিহার্য অঙ্গ বলিযা মানিযা লওয়া হয, তাহা হইলে এই পন্থা কার্যত কিভাবে অধ্যাত্মজীবনেব মহান উদ্দেশ্যসাধনে, নিম্নতন প্রকৃতি হইতে ঊর্ধ্বতন প্রকৃতিতে আবোহণে সহায হইবে? সমস্ত জীবন, সমস্ত কর্ম হইতেছে পুরুষ ও প্রকৃতিব মধ্যে আদানপ্রদান। সেই আদানপ্রদানেব আদি স্বরূপ কি? অধ্যাত্মবিকাশেব চবম সীমায উহা কিসে পবিণত হয? যে জীব নিম্নতব ও বাহ্যতব প্রেবণাসকল হইতে মুক্ত হইযা অন্তবে অন্তবে আত্মার উচ্চতম স্থিতিতে এবং জগতে ইহাব শক্তিব কর্মেব গভীবতম প্রেবণায বিকশিত হইযা উঠে—তাহাকে এই পন্থা কোন্ সিদ্ধিব মধ্যে লইযা যাইবে? এই সকল প্রশ্ন এখানে নিহিত বহিযাছে (অন্য প্রশ্নও আছে, গীতা সেসবের উত্থাপন বা মীমাংসা কবে নাই, কাবণ সেই যুগেব মানবমনেব নিকট সেসকল প্রশ্ন তীব্র হইযা উঠে নাই), এবং জগৎ সম্বন্ধে বেদান্ত, সাংখ্য ও যোগেব শিক্ষার যে উদাব সমন্বযে গীতার সমগ্র চিন্তাধাবাব আবম্ভ, তাহাবই আলোকে এই সব প্রশ্নেব উত্তব দেওযা হইযাছে।

যে জীবাত্মা এখানে প্রকৃতিব মধ্যে দেহধাবী রূপে আবির্ভূত হয তাহাব আত্ম-অভিজ্ঞতায আছে তিনটি সত্য। প্রথমত সে হইতেছে একটি অধ্যাত্ম সত্তা, দৃশ্যত অজ্ঞানেব দ্বারা প্রকৃতিব বাহ্য ক্রিযাব বশীভূত এবং তাহাব গতিশীলতাব মধ্যে সক্রিয, চিন্তাশীল, ক্ষব ব্যক্তিরূপে, প্রকৃতিব সৃষ্ট একটি জীবরূপে, অহংরূপে প্রতিভাত। পবে যখন সে এই সব কর্ম ও গতিব পিছনে সবিযা দাঁড়ায তখন সে তাহাব নিজেব উচ্চতব সত্তাকে দেখিতে পায এক শাশ্বত নৈর্ব্যক্তিক আত্মা ও অক্ষব অধ্যাত্ম সত্তারূপে সে নিজেব উপস্থিতিব দ্বাবা এই কর্ম ও গতিব ধাবাকে সমর্থন কবা ব্যতীত ইহাতে কোনরূপ যোগদান কবে না, শুধু উদাসীন সমতাপূর্ণ সাক্ষিরূপে ইহাকে অবলোকন কবে। আব শেষত যখন সে এই দুইটি বিরোধী সত্তাবই ঊর্ধ্বে চাহিযা দেখে, সে এক মহত্তব অনির্বচনীয সত্যেব সন্ধান পায, যাহা হইতে উভয়েরই উৎপত্তি, সেই শাশ্বত সত্তা আত্মাব আত্মা এবং সকল প্রকৃতি ও সকল কর্মেব অধীশ্বব এবং শুধুই অধীশ্বব নহেন, পবন্তু বিশ্বমধ্যে তাঁহাব শক্তিব এই সকল ক্রিযাব তিনিই আদি এবং অধ্যাত্ম আধাব ও ক্ষেত্র এবং শুধুই আদি ও আধাব নহেন পবন্তু সকল শক্তি, সকল বস্তু, সকল সত্তাব মধ্যে অধ্যাত্ম

অধিবাসী এবং শুধুই অধিবাসী নহেন পবন্তু এই যে তাঁহাব সত্তাব এই শাশ্বত শক্তিকে আমবা প্রকৃতি বলিযা অভিহিত কবি ইহাব যাবতীয় বিকাশেব দ্বাবা তিনি নিজেই সকল তেজ ও শক্তি, সকল বস্তু, সকল সত্তা হইযাছেন। এই প্রকৃতিও দুইপ্রকাব, একটি উৎপন্ন ও অপবা, অপরটি মূল ও পবা। বিশ্বযন্ত্র পবিচালনেব এক নিম্নতন প্রকৃতি আছে, তাহাব সহিত সংযোগে প্রকৃতিস্থ জীব মাযাসম্ভূত একটা অজ্ঞানেব মধ্যে (ত্রৈগুণ্যমযী মাযা) বাস কবে, সে নিজেকে দেহগত প্রাণ ও মন লইযা গঠিত অহং বলিযা ধাবণা কবে, প্রকৃতিব গুণত্রয়েব শক্তির অধীনে কর্ম কবে, মনে কবে যে, সে বদ্ধ, দুঃখময়, ব্যক্তিত্বেব দ্বাবা সীমাবদ্ধ, পুনর্জন্ম ও কর্মেব চক্রে শৃঙ্খলিত, বাসনাময বস্তু, নশ্বব, আপন প্রকৃতিব ক্রীতদাস। এই নিম্নতন বিশ্বশক্তিব ঊর্ধ্বে বহিযাছে জীবেব নিজেব প্রকৃত সত্তাব এক উচ্চতম ভাগবত ও অধ্যাত্ম প্রকৃতি, সেখানে সে চিবকাল শাশ্বত পুরুষ ভগবানেব সচেতন অংশ, আনন্দময, মুক্ত, বিবর্তনেব ছদ্মবেশেব ঊর্ধ্বে, মৃত্যুহীন, অবিনাশী, ভগবানেবই একটি শক্তি। এই ঊর্ধ্বতন প্রকৃতিব দ্বাবা, অধ্যাত্ম বিশ্বভাবেব উপর প্রতিষ্ঠিত দিব্য জ্ঞান, প্রেম ও কর্মেব ভিতব দিয়া শাশ্বতেব মধ্যে উঠা—ইহাই পূর্ণ অধ্যাত্মমুক্তিব মূল সূত্র। এতটুকু সুস্পষ্ট কবিযাই বলা হইযাছে, এখন আমাদিগকে আবও সবিস্তাবে দেখিতে হইবে এই রূপান্তব সম্বন্ধে আবও কি সব বিবেচ্য বহিযাছে, বিশেষত এই দুই প্রকৃতিব প্রভেদ কি এবং আমাদেব মুক্তির দ্বারা আমাদেব কর্মে, আমাদেব অধ্যাত্মস্থিতিতে কি পবিবর্তন হয। সেই উদ্দেশ্যে গীতা উচ্চতম জ্ঞানেব যে কতকগুলি অংশ এতক্ষণ পর্যন্ত পিছনে রাখিয়াছিল সেইগুলিব বিশদ আলোচনা আবম্ভ কবিতেছে। বিশেষ কবিযা সত্তা (Being) ও বিবর্তনেব (Becoming) মধ্যে, পুরুষ ও প্রকৃতিব মধ্যে সম্বন্ধ, গুণত্রয়েব ক্রিযা, ঊর্ধ্বতম মুক্তি, ভাগবত পুরুষেব নিকট মানবাত্মাব উদারতম পূর্ণতম আত্মসমর্পণ, এই বিষযগুলি আলোচনা কবা হইযাছে। শেষেব এই ছয অধ্যায়ে গীতা যাহা কিছু বলিযাছে সেসবেব মধ্যে পবম প্রযোজনীয অনেক জিনিস আছে, কিন্তু যে শেষ তত্ত্ব লইযা গীতা পবিসমাপ্ত হইযাছে সেইটিই হইতেছে পরম বহস্যময়, কাবণ তাহাবই মধ্যে আমবা পাইব গীতা-শিক্ষাব মূল কথাটি, মানবাত্মাব প্রতি ইহাব মহাবাক্য এবং ইহাব শ্রেষ্ঠতম বাণী।

প্রথমত, সমগ্র জগৎকে দেখিতে হইবে প্রকৃতিব মধ্যে পুরুষেব সৃষ্টি ও কর্মেব ক্ষেত্র বলিযা। গীতা "ক্ষেত্র" শব্দেব ব্যাখ্যা কবিতে গিযা বলিয়াছে, এই দেহকেই আত্মাব ক্ষেত্র বলা হয এবং এই দেহেব মধ্যেই এমন একজন আছেন যিনি এই ক্ষেত্রকে জানেন, প্রকৃতিব বেত্তা, ক্ষেত্রজ্ঞ।[১] যাহাই হউক পবে যেসব সংজ্ঞা

১ ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীযতে।
এতদ্ যো বেত্তি তং প্রাহুঃ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি তদ্বিদঃ॥
ক্ষেত্রজ্ঞং চাপি মাং বিদ্ধি সর্বক্ষেত্রেষু ভারত।
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞযোর্জ্ঞানং যৎ তজ্জ্ঞানং মতং মম॥১৩।১-২

দেওয়া হইয়াছে তাহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, কেবল এই স্থূল দেহটিই ক্ষেত্র নহে, পরন্তু এই দেহ যাহা কিছুর আধার, প্রকৃতির ক্রিয়া, মন, আমাদের সত্তার বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ স্বাভাবিক কর্ম, এই সবও ক্ষেত্র। এই ব্যাপকতর শরীরও শুধু ব্যষ্টিগত ক্ষেত্র; ঐ একই ক্ষেত্রজ্ঞের ইহা অপেক্ষা এক বৃহত্তর, সর্বগত, বিশ্বশরীর বিশ্বক্ষেত্র আছে। কারণ প্রত্যেক দেহধারী জীবেই রহিয়াছেন এই একই ক্ষেত্রজ্ঞ, প্রত্যেক সত্তায় তিনি প্রধানত ও মূলত এইটিকেই ব্যবহার করেন, (তাঁহার প্রকৃতির শক্তির একটি মাত্র বাহ্য ফলস্বরূপ এইটিকে তিনি তাঁহার বাসের জন্য গড়িয়া তুলিয়াছেন, ঈশা বাস্যম্ সর্বম্ যৎকিঞ্চ), তাঁহার গতিময় শক্তির প্রত্যেক স্বতন্ত্র সংহত কেন্দ্রকে তাঁহার বিকাশমান ছন্দসকলের প্রথম ভিত্তি ও ক্ষেত্র করেন। প্রকৃতিতে তিনি জগৎকে সেইভাবেই জানেন যেভাবে উহা এই এক সীমাবদ্ধ দেহের চৈতন্যের উপর ক্রিয়া করে এবং ইহার মধ্যে প্রতিফলিত হয়, আমাদের এক একটি মন যেভাবে জগৎকে দেখে, আমাদের পক্ষে জগৎ তাহাই —আর পরিশেষে, এই ক্ষুদ্র বলিয়া প্রতীত দেহাশ্রিত চৈতন্যও নিজেকে এমনভাবে প্রসারিত করিতে পারে যে সে নিজের মধ্যেই সমগ্র বিশ্বকে ধারণ করে, আত্মনি বিশ্বদর্শনম্। কিন্তু স্থূলত, এইটি হইতেছে এক বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড (a microcosm in a macrocosm) এবং ঐ বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডটিও একটি শরীর ও ক্ষেত্র, তাহার মধ্যে অধ্যাত্ম ক্ষেত্রজ্ঞ বাস করিতেছেন।

ইহা স্পষ্ট হইয়াছে যখন গীতা অতঃপর আমাদের সত্তার এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য দেহের স্বরূপ, প্রকৃতি, উৎপত্তি, বিকার ও শক্তিগুলি বর্ণনা করিয়াছে।[১] আমরা তখন দেখিতে পাই যে, ক্ষেত্র বলিতে নিম্নতন প্রকৃতির সমগ্র ক্রিয়াকেই বুঝাইতেছে। সেই সমগ্রই হইতেছে এখানে আমাদের মধ্যে অবস্থিত দেহধারী আত্মার কর্মক্ষেত্র, এই ক্ষেত্রেই সে ক্ষেত্রজ্ঞ। এই প্রাকৃত জগতের মূল কর্মপদ্ধতি অধ্যাত্মদৃষ্টিতে যেরূপ দেখা যায় সে সম্বন্ধে বহুমুখী ও বিস্তারিত জ্ঞানের জন্য গীতা বেদ ও উপনিষদের দ্রষ্টা প্রাচীন ঋষিগণ কর্তৃক গীত বিবিধ ছন্দের এবং ব্রহ্মসূত্রেরও উল্লেখ করিয়াছে, বেদ ও উপনিষদের মধ্যে আমরা পাই ব্রহ্মকর্তৃক সৃষ্ট এই সব বস্তু সম্বন্ধে অনুপ্রেরিত ও সাক্ষাৎদৃষ্টিমূলক বর্ণনা এবং ব্রহ্মসূত্রের মধ্যে পাই যুক্তিসম্মত দার্শনিক বিশ্লেষণ।[২] গীতা শুধু সাংখ্য মনীষিগণের ভাষায় আমাদের নিম্নতন প্রকৃতির সংক্ষিপ্ত কার্যকরী বর্ণনা দিয়াই সন্তুষ্ট হইয়াছে। প্রথমেই নির্বিশেষ অব্যক্ত শক্তি; তাহার পর, ইহা হইতেই বাহ্যজগতের পঞ্চ

[১] তৎ ক্ষেত্রং যচ্চ যাদৃক্ চ যদ্বিকারি যতশ্চ যৎ।
স চযো যৎপ্রভাবশ্চ তৎ সমাসেন মে শৃণু॥১৩।৩

[২] ঋষিভির্বহুধা গীতং ছন্দোভির্বিবিধৈঃ পৃথক্।
ব্রহ্মসূত্রপদৈশ্চৈব হেতুমদ্ভির্বিনিশ্চিতৈঃ॥
মহাভূতান্যহঙ্কারো বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ।
ইন্দ্রিয়াণি দশৈকং চ পঞ্চ চেন্দ্রিয়গোচরাঃ॥১৩।৪-৫

মহাভূত অর্থাৎ জড়ের পাঁচটি মূল অবস্থার বিকাশ, তাহার পর, অন্তর্জগতের ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি ও অহঙ্কারের বিকাশ, পরিশেষে পাঁচটি ইন্দ্রিয়গোচর বিষয় অর্থাৎ জগৎকে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অনুভব করিবার পাঁচটি বিভিন্ন প্রণালী, বিশ্বপ্রকৃতি বাহ্যজগতের উপাদান পঞ্চভূত হইতে যেসব বস্তু সৃষ্টি করিয়াছে তাহাদের সহিত ব্যবহারের জন্য এই সকল শক্তির বিকাশ করিয়াছে—এই সকল ইন্দ্রিয়সম্বন্ধের ভিতর দিয়া ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধিসমন্বিত অহং বিশ্বের পদার্থসকলের উপর ক্রিয়া করে। ইহাই হইতেছে ক্ষেত্রের গঠন। তাহার পর হইতেছে এক সাধারণ চৈতন্য, তাহা বিশ্বপ্রকৃতিকে তাহার কর্মে প্রথমে অনুপ্রাণিত করে এবং পরে জ্ঞানালোকিত করে, ঐ চৈতন্যের এক বৃত্তি আছে, তাহার দ্বারা প্রকৃতি বস্তুসকলের সম্বন্ধগুলিকে একত্র ধরিয়া রাখে, সংঘাত, আমাদের চৈতন্যের নিজ বিষয়সকলের সহিত যেসব আভ্যন্তরীণ ও বাহ্য সম্বন্ধ তাহাদেরও আছে ধৃতি।[১] এইগুলিই হইতেছে ক্ষেত্রের আবশ্যকীয় শক্তি; এই সবই হইতেছে একই সঙ্গে মানসিক, প্রাণিক ও দৈহিক প্রকৃতির সাধারণ এবং সর্বগত শক্তি। সুখ ও দুঃখ, রাগ ও দ্বেষ, এইগুলিই ক্ষেত্রের প্রধান বিকার। বেদান্তের দিক হইতে আমরা বলিতে পারি যে, সুখ ও দুঃখ হইতেছে প্রাণ ও ইন্দ্রিয়ের বিকার, আত্মার স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ যখন নিম্নতন প্রকৃতির ক্রিয়ার সংস্পর্শে আসে তখন তাহা এইভাবেই বিকৃত হয়। আর ঐ দিক হইতেই বলিতে পারি যে, রাগ ও দ্বেষ হইতেছে অনুরূপ মানসিক বিকার, আত্মা তাহার যে ইচ্ছাশক্তির প্রতিক্রিয়ার দ্বারা প্রকৃতির স্পর্শে সাড়া দেয়, প্রকৃতি তাহাকে এইভাবেই বিকৃত করিয়া দেয়। এই সকল বিপরীত ভাবের দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়াই নিম্নতন প্রকৃতির অহংরূপী আত্মা জগৎকে ভোগ করে। অভাবাত্মক যথা—যন্ত্রণা, বিরাগ, দুঃখ, দ্বেষ এইগুলি হইতেছে বিকৃত প্রতিক্রিয়া অথবা যদি খুব ভাল হয় তো অজ্ঞানসম্ভূত বিপরীত প্রতিক্রিয়া; ভাবাত্মক যথা—অনুরাগ, সুখ, হর্ষ, আকর্ষণ, এই সব হইতেছে অনিয়মিত প্রতিক্রিয়া অথবা যদি খুব ভাল হয় তো অপর্যাপ্ত এবং সত্য অধ্যাত্ম অনুভূতির প্রতিক্রিয়ার তুলনায় স্বরূপত নিকৃষ্ট।

প্রাকৃতজগতের সহিত আমাদের যে প্রথম কারবার তাহার মূল স্বরূপ এই সকল জিনিস লইয়াই গঠিত, কিন্তু ইহাই যে আমাদের জীবনের সম্যক বর্ণনা নহে তাহা সুস্পষ্ট, ইহা আমাদের বাস্তব জীবন কিন্তু ইহাই আমাদের সকল সম্ভাবনার সীমা নহে। ঊর্ধ্বের এক বস্তুকে জানিবার আছে, জ্ঞেয়ম্, আর যখন ক্ষেত্রজ্ঞ ক্ষেত্র হইতে নিবৃত্ত হইয়া ইহার মধ্যে অবস্থিত আপনাকেই জানিতে চায় এবং ইহার বাহ্যদৃশ্যের পশ্চাতে যাহা কিছু রহিয়াছে সবকেই জানিতে চায় তখনই আরম্ভ হয় প্রকৃত জ্ঞান, জ্ঞানম্—যেমন ক্ষেত্রজ্ঞ সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞান তেমনই ক্ষেত্র সম্বন্ধেও

[১] ইচ্ছা দ্বেষঃ সুখং দুঃখং সংঘাতশ্চেতনা ধৃতিঃ।
এতৎ ক্ষেত্রং সমাসেন সবিকারমুদাহৃতম্॥১৩।৬

প্রকৃত জ্ঞান। এই যে অন্তর্মুখী হওয়া, কেবল ইহাই অজ্ঞান হইতে মুক্তি আনিয়া দেয়। কারণ যতই আমরা ভিতরের দিকে অগ্রসর হই, ততই আমরা বস্তুসকলের মহত্তর ও পূর্ণতর সত্যকে আয়ত্ত করিতে পারি এবং যেমন ভগবান ও জীব সম্বন্ধে তেমনই জগৎ ও জাগতিক ব্যাপার সম্বন্ধে পূর্ণ সত্যটিকে প্রণিধান করিতে পারি। অতএব দিব্যগুরু বলিলেন, ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ উভয়েরই যে জ্ঞান, *ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্জ্ঞানং*, আত্মজ্ঞান এবং জগৎ-জ্ঞানের সংযোগ, এমনকি সমন্বয়সাধন এইটিই প্রকৃত আলোক এবং একমাত্র সত্য জ্ঞান। কারণ জীবাত্মা ও প্রকৃতি উভয়েই ব্রহ্ম, কিন্তু প্রাকৃত জগতের প্রকৃত সত্য আবিষ্কৃত হইতে পারে কেবল সেই মুক্ত জ্ঞানী পুরুষের দ্বারা যিনি আত্মার সত্যটিকেও আয়ত্ত করিয়াছেন। এক ব্রহ্ম, আত্মা ও প্রকৃতিতে এক অদ্বিতীয় সদ্বস্তু, ইহাই সকল জ্ঞানের লক্ষ্য।

তাহার পর গীতা অধ্যাত্মজ্ঞান কি, তাহাই বর্ণনা করিয়াছে, অথবা সেই জ্ঞানের জন্য কি কি জিনিস প্রয়োজন, যে মানুষের আত্মা আভ্যন্তরীণ জ্ঞানের অভিমুখী হইয়াছে তাহার চিহ্ন কি, লক্ষণ কি তাহাই বলিয়াছে। এই সব লক্ষণ জ্ঞানীর স্বরূপ বলিয়া আবহমান কাল হইতে সুপরিচিত—বাহ্যিক ও ঐহিক জিনিসসকলের প্রতি আসক্তি হইতে তাঁহার হৃদয়ের ঐকান্তিক নিবৃত্তি, তাঁহার অন্তরমুখী ও ধ্যানরত ভাব, তাঁহার অচঞ্চল মন ও শান্ত সমতা, মহত্তম অন্তরতম সত্যসকলের উপর, বাস্তব ও নিত্য পদার্থসকলের উপর তাঁহার চিন্তা ও সঙ্কল্পের দৃঢ় অভিনিবেশ। প্রথমেই হইতেছে একটা নৈতিক অবস্থা, প্রাকৃত সত্তার সাত্ত্বিক নিয়ন্ত্রণ।[১] তাঁহার মধ্যে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে সাংসারিক গর্ব ও দম্ভের সম্পূর্ণ অভাব, সরলতা, ক্ষমাশীল ধৈর্যশীল হিতৈষী হৃদয়, মন ও শরীরের শুচিতা, শান্ত স্থৈর্য, আত্মসংযম এবং নিম্নতন প্রকৃতির উপর প্রভুত্ব এবং আচার্যের প্রতি হৃদয়ের অর্ঘ্য অর্পণ, সে আচার্য অন্তরস্থিত দিব্যগুরুই হউন অথবা দিব্য জ্ঞানের মূর্ত বিগ্রহ মানবগুরুই হউন—কারণ গুরুকে যে ভক্তি করা হয় ইহাই তাহার তাৎপর্য। তাহার পর হইতেছে পূর্ণ অনাসক্তি ও সমতার মহত্তর ও মুক্ততর ভাব, ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়সকলের প্রতি প্রাকৃত সত্তার আকর্ষণ দৃঢ়তার সহিত অপনোদন করা, যে নিত্য অশান্ত অহং বোধ, অহং জ্ঞান, অহং প্রেরণা সাধারণ মানুষকে উৎপীড়িত করে তাহার দাবিসকল হইতে পূর্ণ মুক্তিলাভ, তখন আর পুত্র দারা গৃহাদিতে আসক্ত বা মগ্ন থাকিবার প্রবৃত্তি থাকে না। এই সকল প্রাণিক ও পশুসুলভ প্রবৃত্তির পরিবর্তে থাকে আসক্তিশূন্য সঙ্কল্প ও ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধি, লক্ষ্যহীন ও যন্ত্রণাপূর্ণভাবে জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধির অধীন যে সাধারণ জীবন প্রাকৃত মানব যাপন করে তাহার দোষময় স্বরূপের সুতীব্র অনুভূতি, সকল ইষ্ট বা অনিষ্ট ঘটনার

[১] অমানিত্বমদম্ভিত্বমহিংসা ক্ষান্তিরার্জ্জবম্।
আচার্য্যোপাসনং শৌচং স্থৈর্য্যমাত্মবিনিগ্রহঃ॥১৩।৭

প্রতি সর্বদা সমচিত্ততা (কারণ আত্মা অন্তরে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকে, বাহ্য ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত তাহাকে স্পর্শও করিতে পারে না),[১] আর থাকে জনতা এবং মানবীয় সভা সমিতির বৃথা গোলমাল হইতে নিবৃত্ত, নির্জনতার দিকে আকৃষ্ট ধ্যানপরায়ণ মন। পরিশেষে, যেসকল জিনিস বাস্তবিকই প্রয়োজনীয় ভিতরে দৃঢ়তার সহিত সেইগুলির অভিমুখ হওয়া, জগতের প্রকৃত অর্থ ও প্রধান তত্ত্বসকল সম্বন্ধে *দার্শনিক অনুভূতি*, আভ্যন্তরীণ জ্ঞান ও জ্যোতির শান্ত নিরবচ্ছিন্নতা, অব্যভিচারী ভক্তিযোগ, ভগবৎপ্রেম, বিশ্বব্যাপী সনাতন ভাগবত সত্তার প্রতি হৃদয়ের গভীর ও নিরবচ্ছিন্ন অনুরাগ।[২]

অধ্যাত্মজ্ঞাননিষ্ঠ মনকে যে একমাত্র জ্ঞেয়ের অভিমুখী হইতে হইবে তাহা হইতেছে অনাদি ব্রহ্ম, তাহাতে নিবিষ্ট হইলে যে জীবাত্মা এখানে মেঘাবৃত এবং প্রকৃতির কুহেলিকায় আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে সে তাহার স্বাভাবিক ও মূল অমৃতচৈতন্য এবং লোকোত্তরতা ফিরিয়া পায় এবং উপভোগ করিতে পারে।[৩] অনিত্য বস্তুতে নিবিষ্ট থাকা, বাহ্যদৃশ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা—ইহাই মৃত্যুকে স্বীকার করা, নশ্বর জিনিসসকলের মধ্যে তাহাই হইতেছে নিত্য সত্য যাহা আভ্যন্তরীণ ও অক্ষর। জীব যখন নিজেকে প্রকৃতির বাহ্য দৃশ্যাবলীর দ্বারা অভিভূত হইতে দেয় তখন সে নিজেকে হারাইয়া ফেলে এবং তাহার দেহসকলের জন্ম ও মৃত্যুচক্রে ঘুরিতে থাকে। সেখানে ব্যক্তিত্ব ও ব্যক্তিগত অনুরাগসকলের অন্তহীন পরিবর্তন আবেগের সহিত অনুসরণ করিতে করিতে সে আর নিবৃত্ত হইয়া তাহার নৈর্ব্যক্তিক ও অজাত আত্মসত্তাকে লাভ করিতে সমর্থ হয় না। তাহা করিতে সমর্থ হওয়ার অর্থ নিজেকে পাওয়া এবং নিজের প্রকৃত সত্তায় ফিরিয়া যাওয়া। সেই সত্তাই বিভিন্ন রূপে জন্মগ্রহণ করে, কিন্তু তাহার বিভিন্ন রূপসকলের বিনাশে নিজে বিনষ্ট হয় না। জন্ম ও মৃত্যু যে আনন্ত্যের পক্ষে বাহ্যিক ঘটনামাত্র তাহা উপভোগ করাই জীবের পক্ষে প্রকৃত অমৃতত্ব ও লোকোত্তরতা। সেই অনন্ত বা সেই আনন্ত্যই ব্রহ্ম। ব্রহ্ম হইতেছে তৎ, বিশ্বাতীত সত্তা এবং বিশ্বব্যাপী সত্তা; ব্রহ্ম সেই মুক্ত অধ্যাত্ম পুরুষ যিনি সম্মুখে প্রকৃতির সহিত জীবাত্মার খেলাকে

ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যমনহঙ্কার এব চ।
জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিদুঃখদোষানুদর্শনম্॥
অসক্তিরনভিষ্বঙ্গঃ পুত্রদারগৃহাদিষু।
নিত্যঞ্চ সমচিত্তত্বমিষ্টানিষ্টোপপত্তিষু॥১৩।৮-৯
ময়ি চানন্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী।
বিবিক্তদেশসেবিত্বমরতির্জ্জনসংসদি॥
অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্।
এতজ্জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোঽন্যথা॥১৩।১০-১১
জ্ঞেয়ং যত্তৎ প্রবক্ষ্যামি যজ্জ্ঞাত্বামৃতমশ্নুতে।
অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম ন সৎ তন্নাসদুচ্যতে॥১৩।১২

ধরিয়া থাকেন এবং পশ্চাতে তাহাদের অবিনশ্বর একত্বের ভিত্তিস্বরূপ হন, ব্রহ্ম একই সঙ্গে ক্ষর অক্ষর দুইই, এক হইয়াও সর্ব। তাঁহার উচ্চতম বিশ্বাতীত পদে ব্রহ্ম হইতেছেন তুরীয় অনন্ত, অনাদি ও অপরিবর্তনীয়, এই যে সৎ অসৎ, নিত্য অনিত্যের প্রাতিভাসিক দ্বন্দ্বের মধ্যে বাহ্যজগৎ চলিতেছে. ব্রহ্ম এসবেরই ঊর্ধ্বে। কিন্তু একবার যদি জগৎকে এই অনন্তের সত্তায় ও আলোকে দর্শন করা যায় তাহা হইলে মন ও ইন্দ্রিয়ের সম্মুখে জগৎ যেমন প্রতিভাত হইতেছে তাহা হইতে তাহা ভিন্ন হইয়া পড়ে; কারণ তখন আমরা বিশ্বকে দেখি আর মন প্রাণ ও জড়ের ঘূর্ণাবর্ত নহে, শক্তি ও সত্তার বিভিন্ন রূপের সমবায় মাত্র নহে, পরন্তু এই অনন্ত ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নহে। যিনি এই সর্ব জগৎকে নিজ সত্তার দ্বারা অমিতভাবে পূর্ণ ও বেষ্টিত করিয়া রাখিয়াছেন (বস্তুত এই জগৎলীলাও তিনিই),

সকল সসীম বস্তুর উপরেই তাঁহার অসীমতার জ্যোতি নিক্ষেপ করিতেছেন, অদেহী ও সহস্র দেহসম্পন্ন যে পুরুষের শক্তিময়হস্তসকল, দ্রুতগামী পাদসকল আমাদের চতুর্দিকে রহিয়াছে, আমরা যেদিকেই ফিরি না কেন অসংখ্য রূপের মধ্যে আমরা যাঁহার শীর্ষ ও চক্ষু ও মুখমণ্ডল দেখিতে পাই, যাঁহার শ্রবণ সর্বত্র শাশ্বতের নীরবতা ও জগৎসমূহের সঙ্গীত শ্রবণ করিতেছে, তিনিই হইতেছেন সেই বিশ্বময় বিশ্বপুরুষ যাঁহার আলিঙ্গনের মধ্যে আমরা বাস করিতেছি।[১]

পুরুষের সহিত প্রকৃতির সকল সম্বন্ধই ব্রহ্মের আনন্ত্যের অন্তর্বর্তী ঘটনা; ইন্দ্রিয় ও গুণ, তাহাদের প্রকাশক ও উপাদান, এসবই হইতেছে এই পরম পুরুষের কৌশল, তাঁহার নিজেরই শক্তি বস্তুসকলের মধ্যে যেসব কর্মধারাকে নিরন্তর গতিময় করিয়া তুলিতেছে এই সব কৌশলের দ্বারাই তাহারা সম্মুখে প্রতিভাত হয়।[২] তিনি নিজে ইন্দ্রিয়সকলের সীমার অতীত, তিনি সকল জিনিসকে দেখেন কিন্তু স্থূল চক্ষু দিয়া নহে, সকল জিনিস শ্রবণ করেন কিন্তু স্থূল কর্ণ দিয়া নহে, সকল জিনিস অবগত হন কিন্তু খণ্ডতাসাধক মনের দ্বারা নহে—মন কেবল আভাস দিতে পারে কিন্তু সত্যজ্ঞান লাভ করিতে পারে না। কোন গুণের দ্বারা

সীমাবদ্ধ নহেন, নিজ সত্তার মধ্যে তিনি সকল গুণকে ধারণ করেন, নিয়ন্ত্রিত করেন এবং তিনি নিজেরই প্রকৃতির গুণময়ী ক্রিয়া উপভোগ করেন। তিনি কিছুতেই আসক্ত নহেন, কিছু দ্বারা বদ্ধ নহেন, তিনি যাহাই করুন কিছুতেই লিপ্ত হন না; প্রশান্ত তিনি, এক উদার ও অবিনশ্বর মুক্তির মধ্যে তিনি তাঁহার বিশ্বময়ী শক্তির সকল কর্ম ও গতি ও আবেগকে ধরিয়া থাকেন। বিশেষ যাহাকিছু আছে

[১] সর্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।
সর্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি॥
[২] সর্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্বেন্দ্রিয়বিবর্জিতম্।
অসক্তং সর্বভৃচ্চৈব নির্গুণং গুণভোক্তৃ চ॥১৩।১৩-১৪

তিনিই সেসব হইয়াছেন; আমাদের অন্তরে যাহা আছে সব তিনি, আমাদের বাহিরে যাহাকিছু আমরা প্রত্যক্ষ করি সেসবও তিনি।[১] অন্তর বাহির, দূর ও নিকট, স্থাবর ও জঙ্গম, তিনি একই সঙ্গে এই সব হইয়াছেন। তিনি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আমাদের জ্ঞানের অগোচর, আবার শক্তি ও সত্তার যে ঘনীভূত অবস্থা আমাদের মন ধারণা করিতে পারে তাহাও তিনি। তিনি অবিভাজ্য এবং অদ্বিতীয়, অথবা নানা রূপে, নানা জীবে নিজেকে বিভক্ত করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়, এই সকল ভিন্ন ভিন্ন সত্তারূপে তিনি প্রতিভাত হন।[২] সকল বস্তুই তাঁহার মধ্যে ফিরিয়া যাইতে পারে, আত্মার মধ্যে তাহাদের স্বপ্রতিষ্ঠ সত্তার অবিভাজ্য ঐক্যে প্রত্যাবর্তন করিতে পারে। সবই নিত্য তাঁহা হইতে প্রসূত, তাঁহার আনন্ত্যে বিধৃত, নিত্য তাঁহার ঐক্যের মধ্যে পুনর্গৃহীত। তিনি সকল জ্যোতির জ্যোতি এবং আমাদের সকল অজ্ঞান অন্ধকারের অতীত জ্যোতির্ময় পুরুষ।[৩] তিনি জ্ঞান, তিনি জ্ঞেয়। যে অধ্যাত্ম অতিমানস জ্ঞান প্রদীপ্ত মনকে পরিপ্লাবিত করে এবং তাহাকে রূপান্তরিত করিয়া দেয়, এই অধ্যাত্ম পুরুষই হইতেছেন সেই জ্ঞান, যে মায়া-অন্ধ জীবকে তিনি প্রকৃতির ক্রিয়ার মধ্যে পাঠাইয়াছেন তাহার সম্মুখে জ্যোতি রূপে তিনি নিজেকেই প্রকট করেন। এই শাশ্বত জ্যোতি প্রত্যেক জীবেরই হৃদয়ে অধিষ্ঠিত, তিনিই ক্ষেত্রের গোপন জ্ঞাতা, ক্ষেত্রজ্ঞ; এই ক্ষেত্রের এবং তাঁহার অভিব্যক্ত সম্ভূতি ও ক্রিয়ার এই সমুদয় রাজ্যের অধিষ্ঠাতারূপে তিনি সকল বস্তুর হৃদয়ে বিরাজ করেন। মানুষ যখন নিজের মধ্যে এই শাশ্বত ও বিশ্বময় ভগবানকে দেখিতে পায়, যখন সে সকল বস্তুর অন্তরপুরুষকে জানিতে পারে এবং প্রকৃতির মধ্যে আত্মার সন্ধান পায়, যখন সে উপলব্ধি করে যে সমগ্র বিশ্ব এই শাশ্বতের মধ্যে একটি তরঙ্গের ন্যায় উত্থিত হইতেছে, যাহা কিছু আছে সবই হইতেছে এক অদ্বিতীয় সত্তা, তখন সে ভগবানের জ্যোতিতে জ্যোতির্ময় হইয়া উঠে এবং প্রকৃতির জগৎসকলের মধ্যে মুক্ত হইয়া দাঁড়ায়।[৪] দিব্য জ্ঞান এবং ভক্তির সহিত পূর্ণভাবে এই ভগবানের অভিমুখী হওয়া, ইহাই মহান অধ্যাত্ম মুক্তির নিগূঢ় রহস্য। মুক্তি, প্রেম এবং অধ্যাত্ম জ্ঞান আমাদিগকে মর প্রকৃতি হইতে অমৃতত্বের মধ্যে উত্তোলিত করে।

পুরুষ ও প্রকৃতি শাশ্বত ব্রহ্মের দুইটি দিক মাত্র, এই আভাসিক দ্বৈতভাবই

[১] বহিরন্তশ্চ ভূতানামচরং চরমেব চ।
সূক্ষ্মত্বাত্তদবিজ্ঞেয়ং দূরস্থং চান্তিকে চ তৎ॥১৩।১৫
অবিভক্তং চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্।
ভূতভর্তৃ চ তজ্জ্ঞেয়ং গ্রসিষ্ণু প্রভবিষ্ণু চ॥১৩।১৬
[২] জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিস্তমসঃ পরমুচ্যতে।
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদি সর্বস্য ধিষ্ঠিতম্॥১৩।১৭
[৩] ইতি ক্ষেত্রং তথা জ্ঞানং জ্ঞেয়ং চোক্তং সমাসতঃ।
মদ্ভক্ত এতদ্বিজ্ঞায় মদ্ভাবায়োপপদ্যতে॥১৩।১৮

তাঁহার বিশ্বলীলার ভিত্তিস্বরূপ।[১] পুরুষ অনাদি ও শাশ্বত, প্রকৃতিও অনাদি ও শাশ্বত; কিন্তু প্রকৃতির গুণসমূহ এবং আমাদের সচেতন উপলব্ধিতে প্রকৃতি যেসব নিম্নতন রূপ লইয়া প্রতিভাত হয়, পুরুষ ও প্রকৃতির সম্বন্ধ হইতেই ইহাদের উৎপত্তি। ইহারা প্রকৃতি হইতেই উদ্ভূত; কার্য ও কারণ, কর্ম ও কর্মের ফল, শক্তি ও শক্তির ক্রিয়া—এই যে তাহাদের বাহ্য শৃঙ্খলা ইহা প্রকৃতি কর্তৃকই সৃষ্ট, এখানে যাহা কিছু অনিত্য ও পরিবর্তনশীল সবই আসিতেছে প্রকৃতি হইতে। অনবরত তাহারা পরিবর্তিত হইতেছে এবং তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে পুরুষ ও প্রকৃতিও পরিবর্তিত হইতেছে বলিয়া মনে হয়, কিন্তু স্বরূপত এই দুইটি শক্তিই শাশ্বত এবং সকল সময়ে একই রহিয়াছে। প্রকৃতি সৃষ্টি করে, কর্ম করে, তাহার সেই সৃষ্টি ও কর্ম উপভোগ করে পুরুষ; কিন্তু তাহার ক্রিয়ার এই নিম্নতন রূপে প্রকৃতি এই উপভোগকে মোহগ্রস্ত ও ক্ষুদ্র সুখ-দুঃখ ভোগে পরিণত করে। জীব বা ব্যক্তিগত পুরুষ প্রকৃতির গুণাত্মক ক্রিয়াসকলের দ্বারা বলপূর্বক আকর্ষিত হয় এবং প্রকৃতির গুণসমূহের এই আকর্ষণ তাহাকে অবিরত নানা জন্মের মধ্যে টানিয়া লইয়া যায়, সেখানে তাহাকে নানা পরিবর্তন ও অবস্থাবিপর্যয়, প্রকৃতির মধ্যে জন্মগ্রহণের শুভ ও অশুভ ভোগ করিতে হয়।[২] কিন্তু ইহা হইতেছে পুরুষের কেবল বাহ্যিক অনুভূতি, আর ক্ষর প্রকৃতির সহিত সঙ্গের ফলে পুরুষ ক্ষরভাবাপন্ন হয়। এই দেহের মধ্যে অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন প্রকৃতির ও আমাদের ভগবান, পরমাত্মা, পরমপুরুষ, প্রকৃতির মহান ঈশ্বর, তিনি প্রকৃতির কার্য সাক্ষিরূপে দর্শন করেন, তাহার ক্রিয়ায় অনুমতি দেন, সে যাহা কিছু করে তাহা সমর্থন করেন, তাঁহার বিচিত্র সৃষ্টি নিয়ন্ত্রিত করেন, প্রকৃতি যে তাঁহার নিজেরই সত্তার নানা রূপ সৃষ্টি করিয়া খেলা করিতেছে, নিজের বিশ্বগত আনন্দ দিয়া তিনি তাহা উপভোগ করেন।[৩] এই যে আত্মজ্ঞান, আমাদের মনকে ইহাতে অভ্যস্ত করিয়া তুলিতে হইবে, তবেই আমরা নিজদিগকে সনাতন ভগবানের অংশ বলিয়া প্রকৃতভাবে জানিতে পারিব।[৪] একবার যদি এই আত্মজ্ঞান সুদৃঢ় হয়, তাহা হইলে আমাদের অন্তরপুরুষ প্রকৃতির সহিত ব্যবহারে বাহ্যত যেভাবেই চলুক, দৃশ্যত সে যাহাই

[১] প্রকৃতিং পুরুষং চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি।
বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতিসম্ভবান্॥
কার্য্যকারণকর্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে।
পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে॥১৩।১৯-২০

[২] পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙ্‌ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্।
কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্‌যোনিজন্মসু॥১৩।২১

[৩] উপদ্রষ্টানুমন্তা চ ভর্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ।
পরমাত্মেতি চাপ্যুক্তো দেহেঽস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ॥১৩।২২

[৪] য এবং বেত্তি পুরুষং প্রকৃতিঞ্চ গুণৈঃ সহ।
সর্বথা বর্তমানোঽপি ন স ভূয়োঽভিজায়তে॥১৩।২৩

করুক বা ব্যক্তিকতা ও কর্মশক্তি ও দেহধারী অহং-এর যেকোন রূপই গ্রহণ করুক, সে থাকে নিজ সত্তায় মুক্ত, আর জন্মান্তরচক্রে বদ্ধ নহে, কারণ আত্মার নৈর্ব্যক্তিকতায় সে আভ্যন্তরীণ অজাত অধ্যাত্মসত্তার সহিত এক হইয়া যায়। বিশ্বে যাহা কিছু আছে সেসবের যে অহমিকাশূন্য পরম অহং, তাহার সহিত মিলন হইতেছে ঐ নৈর্ব্যক্তিকতা।

এই জ্ঞান আসে আভ্যন্তরীণ ধ্যানের দ্বারা, তাহার ভিতর দিয়া শাশ্বত আত্মা আমাদের আত্মসত্তার মধ্যেই আমাদের নিকট প্রকট হয়।[১] অথবা ঐ জ্ঞান আসে সাংখ্যযোগের দ্বারা, পুরুষ প্রকৃতির ভেদ সাধনের দ্বারা। অথবা উহা আসে কর্মযোগের দ্বারা, মন ও হৃদয় ও আমাদের সমস্ত কর্মশক্তিকে ভগবানের দিকে উন্মুক্ত করায় ব্যক্তিগত সঙ্কল্প ও ইচ্ছা লুপ্ত হইয়া যায়, প্রকৃতিতে আমাদের সমুদয় কর্মের ভার ভগবান স্বয়ং গ্রহণ করেন। আমাদের আভ্যন্তরীণ আত্মারই প্রেরণায় যেকোন যোগ, ঐক্য সাধনের যেকোন পন্থা ধরিয়া অধ্যাত্মজ্ঞান প্রবুদ্ধ হইতে পারে। অথবা আমরা এই জ্ঞান লাভ করিতে পারি অন্যের নিকট হইতে সত্যটি শ্রবণ করিয়া এবং মন শ্রদ্ধা ও একাগ্রতার সহিত যাহা শ্রবণ করে তাহারই মর্ম অনুযায়ী মনকে গঠিত করিয়া।[২] কিন্তু যেভাবেই লাভ করা যাউক, ইহা আমাদিগকে মৃত্যুর পারে অমৃতত্বে লইয়া যায়। জ্ঞান আমাদিগকে দেখাইয়া দেয় প্রকৃতির নশ্বরতার সহিত পুরুষের পরিবর্তনশীল ব্যাপারসকলের ঊর্ধ্বে অবস্থিত আমাদের ঊর্ধ্বতম আত্মাকে, তিনিই প্রকৃতির সকল কর্মের পরম অধীশ্বর, সকল বস্তু সকল জীবের মধ্যে তিনি এক এবং সম, দেহ গ্রহণ করিয়াও তিনি জাত হন না, এই সকল দেহের ধ্বংস হইলেও তিনি মৃত্যুর অধীন হন না।[৩] এইটিই সত্য দর্শন, আমাদের মধ্যে যাহা শাশ্বত ও অবিনশ্বর তাহারই দর্শন। যতই আমরা সর্বত্র সমভাবে অবস্থিত এই আত্মাকে দর্শন করি ততই আমরা আত্মার সেই সমতায় প্রতিষ্ঠিত হই, যতই আমরা এই বিশ্বময় সত্তার মধ্যে বাস করি ততই আমরা নিজেরাও বিশ্বময় সত্তা হইয়া উঠি, যতই আমরা এই শাশ্বত পুরুষকে অবগত হই ততই আমরা নিজেদের শাশ্বতভাব পরিগ্রহ করি এবং চিরন্তন হই। আমরা

[১] ধ্যানেনাত্মনি পশ্যন্তি কেচিদাত্মানমাত্মনা।
অন্যে সাংখ্যেন যোগেন কর্মযোগেন চাপরে॥১৩।২৪

[২] অন্যে ত্বেবমজানন্তঃ শ্রুত্বান্যেভ্য উপাসতে।
তেঽপি চাতিতরন্ত্যেব মৃত্যুং শ্রুতিপরায়ণাঃ॥১৩।২৫

[৩] যাবৎ সংজায়তে কিঞ্চিৎ সত্ত্বং স্থাবরজঙ্গমম্।
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞসংযোগাৎ তদ্বিদ্ধি ভরতর্ষভ॥
সমং সর্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্।
বিনশ্যৎস্ববিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি॥
সমং পশ্যন্ হি সর্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্।
ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি পরাং গতিম্॥১৩।২৬-২৮

নিজদিগকে আত্মার শাশ্বতভাবের সহিত এক করিয়া দিই, আর আমাদের মানসিক ও দৈহিক অজ্ঞানতার খণ্ডতা ও দুর্দশার সহিত নহে। তখন আমরা দেখিতে পাই যে, আমাদের সকল কর্মই প্রকৃতির ক্রমবিবর্তন ও প্রক্রিয়া, আমাদের যে প্রকৃত আত্মা সে কর্মকর্তা নহে, পরন্তু সে হইতেছে ঐ কর্মের মুক্ত সাক্ষী ও ঈশ্বর ও অনাসক্ত ভোক্তা।[১] বিশ্বলীলার এই যে বাহিরের দিক, এই সমস্তই হইতেছে এক শাশ্বত পুরুষের সত্তার মধ্যে ভূতসমূহের পৃথক পৃথক ভাব, বিশ্বশক্তি সেই পুরুষের গভীরতায় নিহিত নিজ বিজ্ঞানের বীজসমূহ হইতে এই সমুদয় বিস্তৃত করিয়াছে, প্রকট করিয়াছে, মেলিয়া দিয়াছে,[২] কিন্তু যদিও পরমাত্মা আমাদের এই শরীরে প্রকৃতির ক্রিয়াসকল পরিগ্রহ করেন, উপভোগ করেন, তথাপি ইহার নশ্বরতা তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, কারণ তিনি জন্ম মৃত্যুর অতীত শাশ্বত, তিনি প্রকৃতির মধ্যে যে বহু রূপ গ্রহণ করেন সেসবের দ্বারা সীমাবদ্ধ হন না কারণ তিনি এই সকল ব্যক্তরূপের এক অদ্বিতীয় পরম আত্মা, তিনি গুণসকলের পরিবর্তনে পরিবর্তিত হন না কারণ তিনি নিজে গুণাত্মক নহেন, তিনি কর্মের মধ্যেও কর্ম করেন না, কর্ত্তারমপি অকর্ত্তারম্, কারণ তিনি প্রকৃতির কর্মকে ধরিয়া থাকেন আত্মায় সেই কর্মের ফলসকল হইতে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত থাকিয়া, বস্তুত তিনিই সকল কর্মের মূল, কিন্তু তাঁহার প্রকৃতির লীলা দ্বারা তিনি কোনরূপেই পরিবর্তিত বা বিকৃত হন না।[৩] যেমন সর্বব্যাপী আকাশ বহু রূপ পরিগ্রহ করিয়াও তাহাদের দ্বারা বিকৃত বা পরিবর্তিত হয় না, পরন্তু সকল সময়েই এক শুদ্ধ, সূক্ষ্ম, মৌলিক পদার্থরূপেই বিদ্যমান থাকে, ঠিক তেমনই এই আত্মা যাহা কিছু সম্ভব সকল কর্ম করিয়া সকল রূপ ধরিয়াও সে সকলের মধ্যে সেই এক শুদ্ধ অক্ষর সূক্ষ্ম অনন্ত সত্তারূপে বিদ্যমান থাকে।[৪] সেইটিই জীবের পরা গতি, সেইটিই দিব্য সত্তা, দিব্য ভাব, মদ্‌ভাব, এবং যে কেহ অধ্যাত্ম জ্ঞান লাভ করে সে-ই শাশ্বতের সেই পরম অমৃতত্বের মধ্যে উঠিতে পারে।

এই ব্রহ্ম, আপন প্রাকৃত বিবর্তনের ক্ষেত্রের এই অধ্যাত্ম জ্ঞাতা, ক্ষেত্রজ্ঞ, আর তাঁহারই চিরন্তনী শক্তি এই যে প্রকৃতি নিজেকে সেই ক্ষেত্ররূপে পরিণত করিতেছে, মর প্রকৃতির মধ্যেই আত্মার এই অমৃতত্ব—এই সব জিনিসকে লইয়াই আমাদের জীবনের সমগ্র সত্য। আমাদের আভ্যন্তরীণ আত্মার দিকে যখন আমরা

[১] প্রকৃত্যৈব চ কর্ম্মাণি ক্রিয়মাণানি সর্ব্বশঃ।
যঃ পশ্যতি তথাত্মানমকর্ত্তারং স পশ্যতি॥১৩।২৯

[২] যদা ভূতপৃথগ্‌ভাবমেকস্থমনুপশ্যতি।
তত এব চ বিস্তারং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা॥১৩।৩০

[৩] অনাদিত্বান্নির্গুণত্বাৎ পরমাত্মায়মব্যয়ঃ।
শরীরস্থোঽপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে॥১৩।৩১

[৪] যথা সর্ব্বগতং সৌক্ষ্ম্যাদাকাশং নোপলিপ্যতে।
সর্ব্বত্রাবস্থিতো দেহে তথাত্মা নোপলিপ্যতে॥১৩।৩২

ফিরি তখন তাহা তাহার জ্যোতির্ময় সত্যের দ্বারা প্রকৃতির সমগ্র ক্ষেত্রটিকে উদ্ভাসিত করিয়া তোলে।[১] সেই জ্ঞানসূর্যের আলোকে আমাদের মধ্যে জ্ঞানচক্ষু খুলিয়া যায় এবং আমরা সেই সত্যের মধ্যে বাস করি, আর এই অজ্ঞানের মধ্যে নহে। তখন আমরা উপলব্ধি করি যে, আমাদের বর্তমান মানসিক ও শারীরিক প্রকৃতির মধ্যে আমাদের যে সীমাবদ্ধতা সেটা অন্ধকারের ভ্রান্তি মাত্র, তখন আমরা নিম্নতন প্রকৃতির ধর্ম হইতে, মন ও দেহের ধর্ম হইতে মুক্ত হই, আমরা আত্মার পরম পদে প্রতিষ্ঠিত হই।[২] সেই মহিমময় সমুচ্চ পরিবর্তনই হইতেছে শেষ রূপান্তর, দিব্য অনন্ত সম্ভূতি, মরপ্রকৃতিকে পরিহার করা, এক অমৃতময় জীবন পরিগ্রহ করা।

[১] যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃৎস্নং লোকমিমং রবিঃ।
ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কৃৎস্নং প্রকাশয়তি ভারত॥১৩।৩৩

[২] ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োরেবমন্তরং জ্ঞানচক্ষুষা।
ভূতপ্রকৃতিমোক্ষং চ যে বিদুর্যান্তি তে পরম্॥১৩।৩৪

চতুর্দশ অধ্যায়

গুণাতীত

গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ের শ্লোকগুলিতে কয়েকটি নিশ্চয়াত্মক বিশেষণের দ্বারা পুরুষ ও প্রকৃতির যেসব ভেদ দেখান হইয়াছে, তাহাদের পৃথক শক্তি এবং ক্রিয়ার কয়েকটি সংক্ষিপ্ত কিন্তু গূঢ়ার্থব্যঞ্জক লক্ষণ বলা হইয়াছে, বিশেষত যে দেহধারী জীবাত্মা প্রকৃতির গুণসকলকে ভোগ করার দরুন তাহার অধীন হইয়া পড়ে এবং যে পরমাত্মা গুণসকলকে ভোগ করে কিন্তু তাহার অধীন হয় না কারণ সে নিজে তাহাদের অতীত, এই দুয়ের মধ্যে যে ভেদ করা হইয়াছে—এইগুলিই হইতেছে ভিত্তি যাহার উপর গীতার সাধর্ম্যের সমগ্র আদর্শটি, মুক্ত পুরুষ তাহার সত্তার সজ্ঞান ধর্মে ভগবানের সহিত কেমন করিয়া এক হয় সেই আদর্শটি প্রতিষ্ঠিত। সেই মুক্তি, সেই একত্ব, সেই দিব্য প্রকৃতিলাভ, সাধর্ম্য, ইহাকেই গীতা অধ্যাত্মমুক্তির সারতত্ত্ব বলিয়া, অমৃতত্বের পূর্ণ মর্ম বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে। এই যে সাধর্ম্যকে পরম সার্থকতা দেওয়া, এইটিই গীতার শিক্ষার প্রধান কথা।

অমৃতত্ব বলিতে প্রাচীন অধ্যাত্ম শিক্ষায় কখনই শরীরের মৃত্যুর পর কেবল ব্যক্তিগত অস্তিত্ব থাকা বুঝায় নাই; সে অর্থে সকল সত্তাই অমর, কেবল রূপেরই ধ্বংস হয়। যেসকল জীব মুক্তিলাভ করে না, তাহারা যুগবিবর্তনের ধারায় জীবনযাপন করিয়া চলে, ব্যক্ত জগৎসকলের প্রলয় হইলে সকলেই ব্রহ্মের মধ্যে লীন বা গুপ্ত থাকে, নূতন কল্পারম্ভে আবার তাহারা জন্মগ্রহণ করে। প্রলয় হইতেছে এক কল্পের অন্ত, তাহাতে একটি বিশ্বরূপের সাময়িকভাবে ধ্বংস হয় এবং তাহার সহিত যত ব্যক্তিরূপ ঘুরিতেছে তাহাদেরও ধ্বংস হয়, কিন্তু তাহা হইতেছে একটা সাময়িক বিরতি মাত্র, একটা নীরব অবকাশের পরে আবার প্রকটিত হয় নূতন সৃষ্টি, নূতন সমাহার, পুনর্গঠন, তাহাতে তাহারা পুনরায় আবির্ভূত হইয়া তাহাদের প্রগতির প্রেরণাশক্তি ফিরিয়া পায়। আমাদের দৈহিক মৃত্যুও একটা প্রলয়, গীতা এখনই ঐ শব্দটিকে এই মৃত্যুর অর্থেই ব্যবহার করিবে, প্রলয়ম্ যান্তি দেহভৃৎ, দেহধারী জীব প্রলয়প্রাপ্ত হয়। জড়ের যে রূপকে অজ্ঞানের বশে সে নিজ সত্তা বলিয়া মনে করিয়াছে এবং এখন যাহা পঞ্চভূতে মিশিয়া যাইতেছে তাহারই প্রলয় হয়। কিন্তু জীবাত্মা নিজে বর্তমান থাকে এবং কিছুকাল পরে ঐ পঞ্চভূত হইতেই নির্মিত নূতন দেহ ধারণ করিয়া পুনরায় জন্মজন্মান্তর চক্রে ঘুরিতে থাকে, ঠিক যেমন বিশ্বপুরুষ কিছুকাল বিশ্রাম ও বিরতির পর আবার কালচক্রে তাঁহার অন্তহীন আবর্তন আরম্ভ করেন। কালচক্রের আবর্তনে এই যে অমরত্ব ইহা সকল দেহধারী আত্মারই আছে।

গভীরতর অর্থে যে অমরত্ব তাহা এইরূপ মৃত্যুর পরেও উদ্বর্তন এবং পুনঃপুনঃ

আবর্তন হইতে পৃথক জিনিস। অমরত্ব হইতেছে সেই পরমপদ যাহাতে আত্মা জানে যে, সে জন্ম-মৃত্যুর অতীত, নিজের প্রকাশনের স্বরূপের দ্বারা সে সীমাবদ্ধ নহে, সে অনন্ত, অক্ষয়, অপরিবর্তমান শাশ্বত,—অমর, কারণ সে কখনও জন্মায় নাই, তাই কখনও মরে না। ভাগবত পুরুষোত্তম, তিনি পরম ঈশ্বর এবং পরমব্রহ্ম, তিনি অমর শাশ্বততার চির অধিকারী, শরীর গ্রহণ করিলে বা অনবরত নানা বিশ্বরূপ বিশ্বশক্তি পরিগ্রহ করিলেও তাঁহার কোনও ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না, কারণ তিনি সর্বদা এই আত্মজ্ঞানে বাস করেন। তাঁহার স্বরূপই হইতেছে নিজের শাশ্বততা সম্বন্ধে অবিক্রিয় ভাবে সচেতন থাকা, তাঁহার যে আত্মজ্ঞান তাহার আদি নাই, অন্ত নাই। তিনি এখানে সকল দেহেরই দিব্য অধিবাসী, কিন্তু প্রত্যেক দেহে তিনি অজাত, সে আবির্ভাবের দ্বারা তাঁহার চৈতন্যে তিনি সীমাবদ্ধ হন না, তিনি যে দৈহিক প্রকৃতি পরিগ্রহ করেন তাহার সহিত এক হইয়া পড়েন না; কারণ সেইটি গৌণ ঘটনা মাত্র। পুরুষোত্তমের এই যে নিত্যসচেতন শাশ্বত সত্তা ইহার মধ্যে বাস করাই মুক্তি, অমৃতত্ব।[১] কিন্তু এখানে এই মহত্তর অধ্যাত্ম অমৃতত্ব লাভ করিতে হইলে দেহধারী জীবকে নিম্নতর প্রকৃতির ধর্ম অনুসারে জীবনযাপন করা বন্ধ করিতেই হইবে, ভগবানের যে পরম জীবনধারা তাহারই ধর্ম গ্রহণ করিতে হইবে, বস্তুত সেইটিই তাহার নিজের মূলসত্তার প্রকৃত ধর্ম। যেমন তাহার নিগূঢ় আদি সত্তায় তেমনি তাহার জীবনের অধ্যাত্ম বিকাশধারাতেও তাহাকে ভগবানের সাদৃশ্যে গড়িয়া উঠিতে হইবে।

এই যে মহান সিদ্ধি, মানব প্রকৃতি হইতে ভাগবত প্রকৃতির মধ্যে উঠা, ইহা আমরা পারি কেবল ভগবদ্‌মুখী জ্ঞান, এষণা ও ভক্তির প্রয়াসের দ্বারা। কারণ যদিও জীব পরম ভগবান কর্তৃক নিজের সনাতন অংশরূপে, নিজের অমর প্রতিভূরূপে বিশ্বপ্রকৃতির কর্মধারার মধ্যে প্রেরিত তথাপি সে এই কর্মধারাসকলের ধর্মের দ্বারা বাধ্য হইয়া, অবশম্ প্রকৃতের্বশাৎ, নিজেকে বাহ্য চেতনায় প্রকৃতির বন্ধনসকলের সহিত এক করিয়া দেখে, সে নিজেকে যে প্রাণ মন দেহ বলিয়া দেখে তাহারা তাহাদের আভ্যন্তরীণ অধ্যাত্ম সত্য এবং অনুস্যূত ভগবৎসত্তা সম্বন্ধে আত্মবিস্মৃত। আত্মজ্ঞানে ফিরিয়া যাওয়া, পুরুষের সহিত প্রকৃতির আপাতদৃশ্য সম্বন্ধের নহে পরন্তু প্রকৃত সম্বন্ধের জ্ঞান লাভ করা, ভগবানকে, নিজদিগকে এবং জগৎকে অধ্যাত্ম অনুভূতির দ্বারা জানা, আর শুধু ভৌতিক ও

[১] গীতায় কোথাও কোনরূপ আভাস দেওয়া হয় নাই যে, অব্যক্ত অনির্দেশ্য বা কৈবল্যাত্মক ব্রহ্মের মধ্যে ব্যষ্টিগত অধ্যাত্ম সত্তার লয়সাধনই অমৃতত্বের প্রকৃত অর্থ, প্রকৃত অবস্থা অথবা যোগের প্রকৃত লক্ষ্য। পক্ষান্তরে গীতা পরে বলিয়াছে যে, ঈশ্বরের যে পরম পদ তাহার মধ্যে বাস করাই অমৃতত্ব, ময়ি নিবসিষ্যসি পরং ধাম, এবং এখানে অমৃতত্বকে বলিয়াছে সাধর্ম্য, পরাম্ সিদ্ধিম্, পরমেশ্বরের সহিত সত্তা ও প্রকৃতির ধর্মে এক হওয়া, তখনও আপন সত্তায় অক্ষুণ্ণ থাকা এবং বিশ্বধারা সম্বন্ধে সচেতন থাকা, কিন্তু ইহার ঊর্ধ্বে থাকা, যেমন সকল মুনিরা এখনও রহিয়াছেন, মুনয়ঃ সর্ব্বেঽ, তাঁহারা সৃষ্টিকালে জন্মের অধীন হন না প্রলয়কালেও ব্যথাপ্রাপ্ত হন না, সর্গেঽপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ।

বাহ্যিক অনুভূতির দ্বারা নহে, আভ্যন্তরীণ চৈতন্যের গভীরতম সত্যের ভিতর দিয়া, ইন্দ্রিয়ানুগ মন এবং বহির্মুখী বুদ্ধির বিভ্রান্তকারী প্রাতিভাসিক জ্ঞানের ভিতর দিয়া নহে—ইহাই এই সিদ্ধিলাভের অপরিহার্য পন্থা। আত্মজ্ঞান ও ভগবদ্ জ্ঞান ব্যতীত, আমাদের প্রাকৃত জীবনের দিকে অধ্যাত্ম দৃষ্টিপাত ব্যতীত সিদ্ধি আসিতেই পারে না এবং এই জন্যই প্রাচীন ঋষিগণ জ্ঞানের দ্বারা মুক্তির উপর এত জোর দিয়াছিলেন—সে জ্ঞান শুধু বিচারবুদ্ধির দ্বারা বস্তুসকলকে জানা নহে, পরন্তু তাহা হইতেছে মনোময় জীব মানুষের এক মহত্তর অধ্যাত্মচৈতন্যে গড়িয়া উঠা। জীব পূর্ণতা লাভ না করিলে, ভাগবত প্রকৃতিতে গড়িয়া না উঠিলে জীবের মুক্তি হইতেই পারে না; নিরপেক্ষ ভগবান হঠাৎ খেয়ালের বশে বা তাঁহার কৃপায় খামখেয়ালী সনদের দ্বারা তাহা আনিয়া দিবেন না। দিব্যকর্মসকল মুক্তির জন্য ফলপ্রদ হয় কারণ তাহারা আমাদের জীবনের আভ্যন্তরীণ অধীশ্বরের সহিত ক্রমবিকাশমান একত্বের দ্বারা আমাদিগকে এই সিদ্ধির দিকে এবং আত্মা ও প্রকৃতি ও ভগবানের জ্ঞানের দিকে লইয়া যায়। ভগবৎপ্রেম ফলপ্রদ হয় কারণ ইহার দ্বারা আমরা আমাদের ভক্তির একমাত্র পরম পাত্রের সাদৃশ্যে গড়িয়া উঠি এবং পরম ভগবানের প্রেমকে প্রতিদানরূপে নামাইয়া আনি, তাহা আমাদিগকে তাঁহার জ্ঞানের জ্যোতিতে এবং তাঁহার শাশ্বত অধ্যাত্ম সত্তার উন্নয়নকারী শক্তি ও পবিত্রতায় প্লাবিত করিয়া দেয়। সেইজন্যই গীতা বলিল যে এইটিই পরম জ্ঞান, জ্ঞানানাং জ্ঞানমুত্তমম্, কারণ ইহা পরম সিদ্ধি ও পরম অধ্যাত্মপদে লইয়া যায় এবং জীবকে ভগবানের সাধর্ম্যে লইয়া আসে।[১] ইহাই সনাতন জ্ঞান, মহান অধ্যাত্ম উপলব্ধি, ইহার দ্বারা সকল মুনি পরম সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, পরম ভগবানের সহিত সত্তার ধর্মে এক হইয়া উঠিয়াছেন এবং তাঁহার শাশ্বততার মধ্যে অনন্ত কালের জন্য বাস করিতেছেন, সৃষ্টিকালেও জন্মগ্রহণ করেন না এবং বিশ্বপ্রলয়ের ব্যথাতেও ব্যথিত হন না। তাহা হইলে এই যে সিদ্ধি ও এই যে সাধর্ম্য—ইহাই অমৃতত্বের পন্থা এবং সেই অপরিহার্য বিধান যাহা ব্যতীত জীব শাশ্বতের মধ্যে সজ্ঞানে বাস করিতে পারে না।

মানবাত্মা যদি নিজ গুহ্য মূল সত্তায় ভগবানের সহিত অক্ষয়ভাবে এক না হইত এবং তাঁহার ভাগবতত্বের অঙ্গ ও অংশ না হইত তাহা হইলে সে ভগবানের সাদৃশ্যে গড়িয়া উঠিতে পারিত না; যদি সে কেবল মানসিক, প্রাণিক ও দৈহিক প্রকৃতিরই জীব হইত, তাহা হইলে সে অমর হইত না বা কখনও অমর হইতে পারিত না। সমস্ত সৃষ্টিই ভাগবত সত্তার প্রকটন এবং আমাদের অভ্যন্তরে যাহা রহিয়াছে তাহা শাশ্বত অধ্যাত্ম সত্তারই অংশ। অবশ্য আমরা নিম্নতর জড়প্রকৃতির

[১] পরং ভূয়ঃ প্রবক্ষ্যামি জ্ঞানানাং জ্ঞানমুত্তমম্।
যজ্জ্ঞাত্বা মুনয়ঃ সর্ব্বে পরাং সিদ্ধিমিতো গতাঃ॥
ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্যমাগতাঃ।
সর্গেঽপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ॥১৪।১-২

মধ্যে আসিয়াছি এবং আমরা ইহার প্রভাবের অধীন, কিন্তু আমরা সেখানে আসিয়াছি পরমা অধ্যাত্ম প্রকৃতি হইতে; এই অধঃস্থ অপূর্ণ অবস্থা আমাদের আপাতদৃশ্য সত্তা, কিন্তু অন্যটিই আমাদের প্রকৃত সত্তা। শাশ্বত ভগবান আত্মসৃষ্টিরূপে এইসব বিশ্বধারাকে প্রকট করিয়াছেন। তিনি একই সঙ্গে এই বিশ্বের পিতা ও মাতা,[১] মহৎ ব্রহ্ম, বিজ্ঞান হইতেছে যোনি, তাহাতে তিনি তাঁহার আত্মসৃজনের বীজ নিক্ষেপ করেন।[২] অধি-আত্মা (the Over-Soul) রূপে তিনি বীজ নিক্ষেপ করেন, মাতারূপে, তাঁহার চেতনাময় তেজে পরিপূর্ণ চিৎশক্তি, প্রকৃতি-আত্মা (Nature-Soul) রূপে তিনি সেই বীজকে তাঁহার অপরিমিত অথচ আত্মপরিমিত বিজ্ঞানে পরিপূর্ণ এই অনন্ত সারসত্তার মধ্যে গ্রহণ করেন। তিনি এই মহতের গর্ভে সেই দিব্য বীজকে গ্রহণ করেন এবং সেইটিকে আদি ভাবময় সৃষ্টিতে উৎপন্ন মন ও দেহের রূপে গড়িয়া তোলেন। আমরা যাহা কিছু দেখিতে পাই সে সমুদয়ই ঐ সৃষ্টিক্রিয়া হইতে উৎপন্ন; কিন্তু এখানে যাহা জন্মিতেছে তাহা অজাত অনন্তের কেবল সসীম ভাব ও রূপ। অধ্যাত্ম সত্তা হইতেছে শাশ্বত, তাহার সকল প্রকাশের ঊর্ধ্বে; অধ্যাত্ম সত্তার মধ্যে শাশ্বত অনাদি প্রকৃতি অন্তহীন সৃষ্টি এবং সমাপ্তিহীন প্রলয়ের ভিতর দিয়া চিরকাল কল্প-কল্পান্তের ছন্দে অগ্রসর হইতেছে। প্রকৃতির মধ্যে যে পুরুষ নানা রূপ গ্রহণ করিতেছে সেও প্রকৃতি অপেক্ষা কম শাশ্বত নহে, অনাদি উভৌ অপি। এমনকি প্রকৃতির মধ্যে যখন সে অবিরাম কল্পের চক্রে ঘুরিতেছে, তখনও সে যে শাশ্বত হইতে ইহাদের মধ্যে আসিয়াছে সেই শাশ্বত সত্তায় জন্ম ও মৃত্যুর চক্রের ঊর্ধ্বে চিরবিরাজমান, এমনকি এখানে তাহার আপাতদৃশ্য চৈতন্যেও সে সেই সত্তাগত ও নিত্য লোকত্তরতা সম্বন্ধে সজ্ঞান হইতে পারে।

তাহা হইলে এই প্রভেদটা কেমন করিয়া হয়, কেমন করিয়া পুরুষ জন্ম, মৃত্যু ও বন্ধনের প্রতিভাসের মধ্যে আসিয়া পড়ে—কারণ ইহা খুবই স্পষ্ট যে এটা শুধুই প্রতিভাস (appearance)[৩] ইহা হইতেছে চৈতন্যের একটি নিম্নতর ক্রিয়া বা অবস্থা, এই নীচের প্রবর্তনার সঙ্কীর্ণ সীমাবদ্ধ ক্রিয়ায় প্রকৃতির গুণসকলের সহিত এবং মন, প্রাণ, দেহের আত্মপরায়ণ অহংভাবে বদ্ধ কর্মগ্রন্থির সহিত নিজেকে আত্মবিস্মৃতির বশে এক করিয়া দেখা। যদি আমরা নিম্নতর ক্রিয়ার মোহকরী-শক্তি হইতে সরিয়া আমাদের পূর্ণভাবে চৈতন্যময় সত্তার মধ্যে ফিরিয়া যাইতে চাই এবং আত্মার মুক্ত প্রকৃতি ও তাহার শাশ্বত অমৃতত্ব লাভ করিতে চাই তাহা হইলে প্রকৃতির গুণসমূহের ঊর্ধ্বে উঠা ত্রৈগুণ্যাতীত হওয়া অপরিহার্য। সাধর্ম্যের সেই

[১] মম যোনির্মহদ্ব্রহ্ম তস্মিন গর্ভং দধাম্যহম্।
সম্ভবঃ সর্ব্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত॥১৪।৩
সর্ব্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্ত্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ।
তাসাং ব্রহ্ম মহদ্যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা॥১৪।৪

অবস্থাটিই অতঃপব গীতা পবিস্ফুট কবিতে অগ্রসব হইতেছে। পূর্বেকাব একটি অধ্যাযে গীতা ইহাব উল্লেখ কবিযাছে এবং একটু জোব দিযা সংক্ষেপে বর্ণনা কবিযাছে, কিন্তু এখন আবও যথাযথভাবে দেখাইযা দিতে হইবে এই সব গুণ কি, কেমন কবিয়া তাহারা পুকষকে বদ্ধ কবিযা বাখে এবং অধ্যাত্ম মুক্তি হইতে বঞ্চিত কবিয়া বাখে; এবং গুণসকলেব অতীত হওযাব অর্থ কি।

প্রকৃতিব গুণগুলি সবই মূলত গুণাত্মক (qualitative) এবং সেই জন্যই সেসবকে প্রকৃতিব গুণ বলা হয়। বিশ্বেব যেকোন অধ্যাত্ম পবিকল্পনায এই বকমই হইতে বাধ্য, কাবণ অধ্যাত্ম সত্তা ও জডেব মধ্যে যোগসূত্র হয চৈত্য শক্তি (psyche or soul power) এবং মূল ক্রিযাটি হয চেতনাত্মক ও গুণাত্মক, ভৌতিক বা পবিমাণাত্মক নহে; কাবণ গুণই বিশ্বশক্তিব সকল ক্রিযায অভৌতিক তত্ত্ব, অধিকতর আধ্যাত্মিক তত্ত্ব, তাহাব আদ্যা গতিশক্তি। জড বিজ্ঞানেব প্রাধান্য আমাদিগকে প্রকৃতি সম্বন্ধে একটা বিভিন্ন ধাবণায অভ্যস্ত কবিযা তুলিযাছে, কাবণ সেখানে প্রথমেই যে জিনিসটি আমাদেব দৃষ্টি আকর্ষণ কবে সেইটি হইতেছে তাহাব কর্মসমূহেব পরিমাণেব দিকেব প্রাধান্য এবং তাহাব রূপসৃষ্টিব জন্য পরিমাণ অনুযাযী যোগাযোগেব উপর নির্ভবতা। এমনকি সেখানেও আবিষ্কৃত হইযাছে যে, জড় হইতেছে শক্তিবই সত্তা বা ক্রিযা, শক্তি স্বপ্রতিষ্ঠ জডসত্তাব সম্প্রেবণা মাত্র নহে অথবা জডেব অন্তর্নিহিত একটা ক্রিযা মাত্র নহে, আব এই আবিষ্কাব বিশ্বপ্রকৃতি সম্বন্ধে প্রাচীন ব্যাখ্যাব কতকটা পুনবাবির্ভাবেব সূচনা কবিয়াছে। প্রাচীন ভাবতীয মনীষীগণেব বিশ্লেষণ প্রকৃতিব পবিমাণাত্মক ক্রিযা, মাত্রা, স্বীকার করিয়াছিল, কিন্তু তাঁহাদেব মতে সেইটি প্রকৃতিব অপেক্ষাকৃত বাহ্যিক ও স্থূল নিযমানুগত কার্যসম্পাদন ধাবাবই বৈশিষ্ট্য, কিন্তু যে অন্তর্গূঢ় ভাবাত্মক কর্মসম্পাদনশক্তি বস্তুসকলকে তাহাদেব গুণ ও স্বভাব অনুযাযী সুবিন্যস্ত কবে, সেইটিই প্রধান নিশ্চযাত্মক শক্তি এবং সকল বাহ্যিক পবিমাণাত্মক বিন্যাসের মূলে বহিয়াছে। স্থূল জগতেব মূলে ইহা দৃষ্টিগোচব হয না এই জন্য যে, অন্তর্নিহিত চেতনাত্মক সত্তা, মহদ্ ব্রহ্ম, সেখানে জডবস্তু ও জডশক্তিব ক্রিযায আচ্ছাদিত এবং লুক্কাযিত। কিন্তু স্থূল জগতেও একই গুণসম্পন্ন বস্তুসকলেব বিভিন্ন মিশ্রণ ও পবিমাণের যেরূপ আশ্চর্যজনক বিভিন্ন ফল হয, তাহাব কোন যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যাই সম্ভব হইত না যদি না গুণ-পবিবর্তন সাধক এক শ্রেষ্ঠতব শক্তি না থাকিত, সেই শক্তি এই সকল স্থূল বিন্যাসকে কৌশলরূপে বাবহাব কবিতেছে। অথবা একেবারেই বলা ভাল যে, বিশ্বশক্তিব এক নিগূঢ় চেতনাময ক্ষমতা আছে, বিজ্ঞান, (যদিই আমরা ধবিযা লই যে, শক্তি এবং তাহাব ভাবাত্মক যন্ত্র, বুদ্ধি, উভয়েই স্বরূপত জড, mechanical) তাহা এই সকল বাহ্যিক যোগাযোগেব গাণিতিক পরিমাণ ঠিক করিয়া দেয এবং তাহাদেব ক্রিযাফল নির্ধাবণ কবে। অধ্যাত্ম সত্তাব মধ্যে সেই সর্বশক্তিমান বিজ্ঞানই এই সকল কৌশল উদ্ভাবন ও প্রয়োগ করিতেছে। আর প্রাণিক ও মানসিক জীবনে গুণ একেবারেই প্রকাশ্যভাবে

প্রধান শক্তিরূপে দেখা দেয, সেখানে শক্তির পরিমাণ গৌণ। কিন্তু বস্তুত মানসিক, প্রাণিক, দৈহিক সকল জীবনই গুণেব সীমার অধীন, সকলেই ইহার নিয়ন্ত্রণে পবিচালিত যদিও জীবনেব ক্রমপর্যাযে যতই আমরা নীচেব দিকে যাই ততই সে সত্য বেশী বেশী অস্পষ্ট হইযা যায়। কেবল অধ্যাত্ম সত্তা নিজেব ভাবময় সত্তা ও ভাবময শক্তি, মহৎ ও বিজ্ঞানেব বলে এই সকল বিধান নিরূপণ কবে, সে নিজে ঐভাবে গুণেব দ্বাবা নিযন্ত্রিত হয না, গুণ বা পবিমাণ কিছুবই সীমাব অধীন নহে কাবণ তাহাব অপবিমেয এবং অনির্দেশ্য আনন্ত্য এই সব গুণ ও পরিমাণেব অতীত, এসবকে সে নিজেব সৃষ্টিকার্যেব জন্য বিকাশ ও ব্যবহাব কবে।

কিন্তু আবাব প্রকৃতির যে গুণাত্মক ক্রিযা সূক্ষ্মতায ও বৈচিত্র্যে এইরূপ অনন্ত জটিলতাময, সে সমুদযই তিনটি সাধাবণ গুণেব ছাঁচে ঢালা, সে তিনটি গুণ সর্বত্র বিদ্যমান, পবস্পবেব সহিত সংগ্রথিত, প্রায অচ্ছেদ্য—সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ। মানুষেব চেতনাব উপব এইসব গুণেব যে ক্রিযা, গীতায় কেবল তাহারই বর্ণনা দেওযা হইযাছে, অথবা সেই প্রসঙ্গে খাদ্য প্রভৃতি দ্রব্যে তাহাদের যে ক্রিয়াব দ্বারা তাহাবা মানুষেব মন বা প্রাণেব উপব প্রভাব বিস্তাব কবে তাহারও বর্ণনা কবা হইযাছে। যদি আমবা আবও ব্যাপক সংজ্ঞা চাই তাহা হইলে বোধ হয তাহার কিছু ইঙ্গিত পাইব ভাবতীয ধর্মেব সেই রূপকাত্মক পবিকল্পনায যাহা এই গুণত্রয়ের এক একটি গুণকে বিশ্বদেবত্রযীব এক একটি দেবতার গুণ বলিযা নির্দেশ কবিয়াছে, বক্ষাকর্তা বিষ্ণুব গুণ সত্ত্ব, সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মাব গুণ রজঃ, সংহাবকর্তা রুদ্রের গুণ তমঃ। এই পবিকল্পনাব পশ্চাতে এই ত্রিবিধ বিশেষণের যুক্তিবত্তাব সন্ধান করিলে আমবা গুণত্রযকে বিশ্বশক্তিব ক্রিয়াব বিভিন্ন ভাবরূপে গ্রহণ করিযা বলিতে পাবি যে, তাহাবা প্রকৃতিব তিনটি নিত্য সহচবী ও অবিচ্ছেদ্য শক্তি—সাম্য (equilibrium), প্রবৃত্তি (kinesis), জাড্য (inertia)। কিন্তু উহারা ঐরূপ দৃষ্ট হয কেবল শক্তিব বাহ্যিক ক্রিযাব ক্ষেত্রে। কিন্তু অন্যবকম দেখা যায় যদি আমরা চৈতন্য ও শক্তিকে এক অদ্বিতীয সত্তাবই যুগ্মভাব বলিয়া দেখি, প্রকৃত সত্তায় উভযেই চিব-সহবর্তী, যদিও জড প্রকৃতির প্রাথমিক বাহ্য প্রপঞ্চে চৈতন্য-জ্যোতি নিশ্চেতন তমসাবৃত, শক্তিব বিবাট ক্রিযাব মধ্যে অদৃশ্য হইযা গিয়াছে বলিয়াই মনে হয, আবাব অধ্যাত্ম নিশ্চলতাব বিপবীত সীমায শক্তিব ক্রিযা দ্রষ্টা বা সাক্ষী চৈতন্যেব নীববতাব মধ্যে অদৃশ্য হইযা গিযাছে বলিয়া মনে হয। এই যে দুই অবস্থা ইহাবা হইতেছে বাহ্যত বিচ্ছিন্ন পুরুষ ও প্রকৃতিব বিপবীত সীমা, কিন্তু কেহই আপন চবম সীমায তাহাব শাশ্বত সাথীকে একেবাবে লুপ্ত করিযা দেয না, বড জোব নিজেব সত্তাব বিশিষ্ট ধাবাটিব গভীবে লুক্কাযিত কবিয়া রাখে। অতএব যেহেতু অচেতনবৎ শক্তিব মধ্যেও চৈতন্য নিত্য বিরাজ করিতেছে, এই তিনটি গুণেব যে চৈত্য শক্তি তাহাদেব বাহ্যিক ক্রিযাকে অনুপ্রাণিত কবিতেছে তাহার সন্ধান আমবা নিশ্চযই পাইব। চৈতন্যেব দিক দিয়া গুণত্রযেব সংজ্ঞা এইভাবে নির্দেশ কবা যাইতে পাবে, তমঃ প্রকৃতিব নিশ্চেতনাব শক্তি, রজঃ বাসনা কামনার

দ্বারা সম্বুদ্ধ তাহাব সক্রিয় অন্বেষু অজ্ঞানেব শক্তি, সত্ত্ব তাহাব সিদ্ধিপ্রদ সামঞ্জস্যসাধক জ্ঞানেব শক্তি।

প্রকৃতিব গুণত্রয় বিশ্বজগতে সকল সত্তায অচ্ছেদ্যভাবে বিমিশ্রিত। জাড্যেব তত্ত্ব তমঃ হইতেছে অপ্রবর্তক ও অচেষ্ট নিশ্চৈতন্য, তাহা সকল আঘাত, সকল স্পর্শ সহ্য করিয়া যায়, সেসবকে জয কবিতে কোনও উদ্যম কবে না, কেবলমাত্র এই গুণটি থাকিলে বিশ্বশক্তির সমগ্র ক্রিয়া বিশ্লিষ্ট ও বিধ্বস্ত হইযা যাইত এবং বস্তুসত্তাব পূর্ণ বিলয হইত। কিন্তু ইহা চালিত হইতেছে বজোগুণেব গতিকাবক শক্তির দ্বারা এবং জড়েব নিশ্চৈতন্যেব মধ্যেও ইহাব সহিত মিলিত ও জড়িত বহিয়াছে সঙ্গতি, সাম্য ও জ্ঞানেব স্থিতিমূলক তত্ত্ব, তাহা অধিকৃত না হইলেও অন্তর্নিহিত। জড়শক্তিব যে মূল ক্রিয়া তাহাতে সে তামসিক নিশ্চেতন যন্ত্রবৎ বলিযাই প্রতিভাত হয় এবং তাহাব গতিক্রিযায ধ্বংসমুখী বলিযাই মনে হয। কিন্তু উহা মূক বাজসিক প্রবৃত্তিব এক বিশাল শক্তি ও সম্প্রেবণাব দ্বাবা প্রভাবিত, উহাব বিক্ষেপ ও বিধ্বংসেব মধ্যেই, এমনকি ইহাদেব দ্বাবাই ঐ শক্তি উহাকে গঠন ও সৃজন কার্যে চালিত কবিতেছে; আবার উহাব বাহ্যত নিশ্চেতন শক্তিব মধ্যে একটা সাত্ত্বিক বুদ্ধিতত্ত্ব রহিযাছে এবং উহাকে প্রভাবিত কবিতেছে, দুইটি বিবোধী প্রবৃত্তির উপরে একটা সামঞ্জস্য ও স্থিতিসাধক শৃঙ্খলা স্থাপন কবিতেছে। বজঃ হইতেছে প্রকৃতিতে সৃজনমুখী প্রচেষ্টা, গতি ও সম্প্রেবণাব তত্ত্ব, "প্রবৃত্তি", জড়েব মধ্যে বজোগুণ এইভাবেই দেখা দেয, কিন্তু ইহা আবও স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয প্রাণের প্রধান লক্ষণ প্রচেষ্টা ও বাসনা ও কর্মেব চেতন বা অর্ধচেতন আবেগ রূপে—কারণ এই আবেগই হইতেছে সকল প্রাণময সত্তাব স্বরূপ। আব উহা যদি শুধু নিজের প্রকৃতি অনুসাবেই চলিতে পায তাহা হইলে অবিবাম কিন্তু নিত্যপবিবর্তনশীল ও চঞ্চল জীবন ও কর্ম ও সৃষ্টিব প্রবর্তন কবিবে, কিন্তু কোন স্থায়ী ফল হইবে না। কিন্তু একদিকে সে মৃত্যু ও ক্ষয ও জড়তা সম্বলিত তমোগুণেব বিধ্বংসী শক্তিব সম্মুখীন হইতেছে, আবার অন্যদিকে তাহাব অজ্ঞান ক্রিয়া সত্ত্বেব শক্তিব দ্বারা ব্যবস্থিত, সুসমঞ্জসীকৃত এবং বিধৃত হইতেছে, সত্ত্বেব এই শক্তি নিম্নতব প্রাণীসকলেব মধ্যে রহিয়াছে অবচেতনরূপে, মানসিক সত্তাব বিকাশের সহিত উহা ক্রমশ অধিকতর সচেতন হইযা উঠিতেছে এবং সর্বাপেক্ষা সচেতন হইতেছে পুনর্গঠিত মানসিক সত্তায সঙ্কল্প ও তর্কশক্তিরূপে প্রকট বিকশিত বুদ্ধির প্রচেষ্টার মধ্যে। সত্ত্ব হইতেছে বোধাত্মক জ্ঞানেব তত্ত্ব, সুসঙ্গতি পবিমিতি ও সাম্যেব তত্ত্ব, শুধু নিজেব প্রকৃতি অনুসাবে চলিতে পাবিলে সত্ত্ব সুদৃঢ় ও জ্যোতির্ময সুসঙ্গতিসকলেব কোনরূপ স্থায়ী সামঞ্জস্যেব দিকে লইযা যাইত, কিন্তু জগতের গতি পরম্পবায় উহা চিবন্তন কর্মপ্রবৃত্তিব চঞ্চল দ্বন্দ্ব ও ক্রিয়াকে অনুসবণ করিতে বাধ্য হয় এবং অজ্ঞান ও অপ্রবৃত্তির শক্তিসকলেব দ্বাবা অভিভূত ও সীমাবদ্ধ হইযা পড়ে। প্রকৃতিব গুণত্রয়ের মিশ্রিত এবং পবস্পবেব দ্বাবা ব্যাহত ক্রিযার দ্বারা পরিচালিত জগতেব ইহাই হইতেছে দৃশ্যরূপ।

বিশ্বশক্তিব এই যে সাধাবণ বিশ্লেষণ, গীতা প্রকৃতিতে মানুষের বন্ধন এবং তাহাব অধ্যাত্ম মুক্তিলাভ প্রসঙ্গে মানবীয মনস্তত্ত্বেব উপর ইহার প্রযোগ কবিযাছে। গীতা বলিযাছে, সত্ত্ব নির্মল গুণ বলিয়া জ্যোতি ও জ্ঞানের হেতু হয এবং সেই নির্মলতাব কল্যাণেই তাহা প্রকৃতিতে কোনরূপ রোগ, অসুস্থতা বা দুঃখেব সৃষ্টি কবে না।[১] যখন এই দেহের সকল দ্বাব দিয়া জ্যোতিব প্লাবন প্রবেশ কবে, বোধ, প্রত্যক্ষ ও জ্ঞানেব জ্যোতি, যেন কোন বদ্ধ গৃহের সমস্ত দ্বার ও জানালা সূর্যালোকেব দিকে উন্মুক্ত হইযা যায়—যখন বুদ্ধি হয় অবহিত ও প্রকাশময, ইন্দ্রিযগণ হয উজ্জীবিত, সমস্ত মানসসত্তা হয তৃপ্ত ও উজ্জ্বলতায় পবিপূর্ণ এবং স্নাযবীয সত্তা হয় সুস্থির, সমুজ্জ্বল স্বাচ্ছন্দ্য ও স্বচ্ছতায়, 'প্রসাদে', পূর্ণ তখন বুঝিতে হইবে যে প্রকৃতিতে সত্ত্বগুণেব সমধিক বৃদ্ধি ও অভ্যুত্থান হইযাছে। কাবণ জ্ঞান এবং একটা সুসমঞ্জস স্বাচ্ছন্দ্য ও সুখ হইতেছে সত্ত্বের বিশিষ্ট পবিণাম ফল। পবিতৃপ্ত সঙ্কল্প ও বুদ্ধির আভ্যন্তরীণ প্রসাদ যে সন্তোষ আনযন কবে, সাত্ত্বিক সুখ শুধু তাহাই নহে, পবন্তু আত্মা আত্মজ্ঞানে নিজেকে প্রাপ্ত হইযা যে আনন্দ ও পবিতৃপ্তি লাভ কবে, অথবা চতুষ্পার্শ্বস্থ প্রকৃতি ও তাহার প্রদত্ত প্রত্যক্ষ ও ভোগ্য বিষযসকলের সহিত দ্রষ্টা পুরুষের একটা সুসঙ্গতি বা একটা যথাযথ ও সত্য সামঞ্জস্যেব দ্বাবা যে আনন্দ ও পরিতৃপ্তির উদ্ভব হয় সেই সমস্ত লইযাই সাত্ত্বিক সুখ।

আবাব বজঃ হইতেছে বাগাত্মক, অনুবাগ ও বাসনাব আকর্ষণই ইহার মূলগত লক্ষণ।[২] বিষযবাসনাতে জীবেব যে আসক্তি রজঃ তাহারই সন্তান; অপ্রাপ্ত ভোগেব জন্য প্রকৃতিব যে তৃষ্ণা তাহা হইতেই ইহার উদ্ভব হয়। অতএব ইহা অস্থিবতা, দাহ, কাম, লোভ ও উত্তেজনায পূর্ণ, লালসাময় সম্প্রেরণার জিনিস, আব মধ্যম গুণটি যখন বর্ধিত হয তখন এই সবই আমাদের মধ্যে প্রবল হইয়া উঠে। ইহা হইতেছে বাসনাব শক্তি, সকল সাধাবণ ব্যক্তিগত কর্মারম্ভ এবং আমাদেব প্রকৃতিতে যে চাঞ্চল্য, স্পৃহা, প্রণোদনা কর্মেব দিকে আমাদিগকে পবিচালিত কবে—ইহাই সেসবেব প্রবর্তক। অতএব স্পষ্টতই রজঃ হইতেছে প্রকৃতিব গুণসকলেব মধ্যে ক্রিয়াত্মক শক্তি (Kinetic force)। ইহাব ফল হইতেছে কর্মেব লালসা, কিন্তু শোক, বেদনা, সকলরকম দুঃখও ইহার ফল; কাবণ সে নিজেব বিষয়কে যথাযথভাবে অধিকার কবিতে পারে না—বস্তুত বাসনার অর্থই হইতেছে না-পাওযা—এমনকি সে যে বস্তু অর্জন করে তাহারও সুখ হয়

৩এ সত্ত্বং নির্মলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ম্।
সুখসঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ॥১৪।৬
সর্ব্বদ্বারেষু দেহেঽস্মিন্ প্রকাশ উপজায়তে।
জ্ঞানং যদা তদা বিদ্যাদ্‌বিবৃদ্ধং সত্ত্বমিত্যুত॥১৪।১১
বজো বাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবম্।
তন্নিবধ্নাতি কৌন্তেয কর্মসঙ্গেন দেহিনম্॥১৪।৭

বিক্ষুব্ধ ও অনিশ্চিত, কারণ তাহার স্পষ্ট জ্ঞান নাই কেমন করিয়া অধিকার করিতে হয়, আর সুসামঞ্জস্য ও যথাযথ ভোগের প্রকৃত রহস্য কি তাহাও সে দেখিতে পায় না। জীবনের যত অজ্ঞানময় ও আবেগময় লিপ্সা সেসবই হইতেছে প্রকৃতির রজোগুণের অন্তর্গত।

শেষত তমোগুণ হইতেছে জড়তা এবং অজ্ঞান হইতে উদ্ভূত এবং ইহার ফলও হইতেছে জড়তা ও অজ্ঞান। তমোগুণের অন্ধকারই জ্ঞানকে আবৃত করে এবং সকল প্রমাদ ও ভ্রান্তির সৃষ্টি করে। অতএব ইহা হইতেছে সত্ত্বের বিপরীত, কারণ সত্ত্বের সার হইতেছে জ্ঞান, প্রকাশ এবং তমোগুণের সার হইতেছে জ্ঞানের অভাব, অপ্রকাশ। কিন্তু তমঃ যেমন ভ্রান্তি, অমনোযোগ, ভুল বুঝা বা না বুঝা প্রভৃতি অক্ষমতা ও শৈথিল্য আনয়ন করে, তেমনই কর্মেরও অক্ষমতা ও শৈথিল্য আনয়ন করে, আলস্য, অবসাদ এবং নিদ্রা এই গুণের অন্তর্গত। অতএব ইহা রজোগুণের বিপরীত, কারণ রজোগুণের সার হইতেছে গতি, প্রেরণা ও প্রবৃত্তি কিন্তু তমোগুণের সারতত্ত্ব হইতেছে জড়তা, অপ্রবৃত্তি, তমঃ হইতেছে নিশ্চেতনার অপ্রবৃত্তি আবার নৈষ্কর্ম্যেরও অপ্রবৃত্তি, ইহা দুইভাবেই নেতিমূলক।

প্রকৃতির এই তিন গুণসকল মনুষ্যের মধ্যেই রহিয়াছে, ক্রিয়া করিতেছে, ইহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়, কাহারও সম্বন্ধেই বলা চলে না যে, সে সম্পূর্ণভাবে কোনও গুণ বর্জিত বা তিনটির কোনও একটি হইতে মুক্ত, অন্য গুণকে বাদ দিয়া কেবলমাত্র একটি গুণের ছাঁচে কেহই গঠিত হয় নাই। যে পরিমাণেই হউক, সকল মনুষ্যের মধ্যেই রহিয়াছে বাসনা ও কর্মের রাজসিক প্রেরণা এবং জ্যোতি ও সুখের সাত্ত্বিক অবদান, কতকটা সঙ্গতি, নিজের সহিত এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও বস্তুসকলের সহিত মনের কিয়ৎপরিমাণ সামঞ্জস্য। আবার সকলেরই আছে কিছু অসামর্থ্য ও অজ্ঞান ও নিশ্চেতনা। কিন্তু এই সকল গুণ তাহাদের শক্তির পরিমাণাত্মক ক্রিয়ায় অথবা তাহাদের উপাদানের যোগাযোগে কোনও মানুষের মধ্যেই অপরিবর্তনীয় নহে; কারণ তাহারা পরিবর্তনশীল এবং নিরন্তর পরস্পরের সহিত সংঘাত, স্থান-বিনিময় এবং ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় রত রহিয়াছে। কখনও এক গুণ অগ্রগামী হয়, কখনও আর এক গুণ বর্ধিত হয়, আধিপত্য করে এবং প্রত্যেকেই আমাদিগকে নিজ বিশিষ্ট ক্রিয়া ও পরিণামের অনুগত করে।[১] কেবল যখন কোন একটি গুণ সাধারণভাবে মোটের উপর প্রবল থাকে, তখনই কোন মানুষকে সাত্ত্বিক বা রাজসিক বা তামসিক প্রকৃতির লোক বলা যাইতে পারে, কিন্তু এইটি হয় কেবল একটি মোটামুটি বর্ণনা, ইহা একান্ত বা সম্পূর্ণ বর্ণনা নহে। গুণ তিনটি হইতেছে এক ত্রিধা শক্তি, তাহাদের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার দ্বারা তাহারা প্রাকৃত মানবের চরিত্র ও প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করিয়া দেয়

[১] রজস্তমশ্চাভিভূয় সত্ত্বং ভবতি ভারত।
রজঃ সত্ত্বং তমশ্চৈব তমঃ সত্ত্বং রজস্তথা॥১৪।১০

এবং সেই প্রকৃতি ও তাহার বিচিত্র ধারাসকলের ভিতর দিয়া তাহার কর্মও নির্ধারণ করে। কিন্তু এই ত্রিধা শক্তি আবার একই সময়ে বন্ধনের ত্রিধা পাশ। গীতা বলিয়াছে, 'প্রকৃতি হইতে উদ্ভূত এই তিন গুণ দেহস্থ অব্যয় অধিবাসীকে দেহের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখে।'[১] এক অর্থে আমরা সহজেই বুঝিতে পারি যে, গুণের ক্রিয়া অনুসরণ করিয়া চলিলে এই বন্ধন অবশ্যম্ভাবী, কারণ তাহারা সকলেই তাহাদের সসীম স্বরূপ ও ক্রিয়ার দ্বারা সীমাবদ্ধ এবং তাহারা সীমাবন্ধনের সৃষ্টি করে। তমঃ হইতেছে উভয় দিকেই একটা অসামর্থ্য, অতএব স্পষ্টতই সীমার মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখে। রাজসিক বাসনা কর্মের প্রবর্তক বলিয়া অধিকতর প্রত্যক্ষ শক্তি, তথাপি আমরা বেশই দেখিতে পাই যে, বাসনা মানুষকে সীমার মধ্যে একান্তভাবে আসক্ত করিয়া রাখে বলিয়া ইহা সকল সময়েই একটা বন্ধন। কিন্তু জ্ঞানের ও সুখের শক্তি সত্ত্ব কেমন করিয়া বন্ধন হইয়া উঠে? এইরূপ হয় কারণ সত্ত্ব হইতেছে মানসিক প্রকৃতির তত্ত্ব, সীমাবদ্ধ এবং সীমাবদ্ধকারী জ্ঞানের তত্ত্ব এবং এমন সুখের তত্ত্ব যাহা কোন বিশেষ বিষয়কে যথাযথ অনুসরণ করা বা লাভ করার উপর নির্ভর করে, অথবা মনের বিশেষ বিশেষ অবস্থার উপর নির্ভর করে, মনের এমন আলোকের উপর নির্ভর করে যাহা অল্পাধিক স্পষ্ট সন্ধ্যার আলোক ভিন্ন আর কিছুই নহে। ইহার যে সুখ তাহা কেবল সাময়িক তীব্রতা বা পরিচ্ছিন্ন স্বাচ্ছন্দ্য। কিন্তু আমাদের অধ্যাত্মসত্তার যে অসীম অধ্যাত্ম জ্ঞান এবং মুক্ত স্বপ্রতিষ্ঠ আনন্দ তাহা ভিন্ন বস্তু।

কিন্তু তাহা হইলে প্রশ্ন উঠে যে, আমাদের যে অনন্ত অব্যয় অধ্যাত্ম সত্তা তাহা প্রকৃতির মধ্যে জড়িত হইলেও কেমন করিয়া নিজেকে প্রকৃতির নিম্নতর ক্রিয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ করিয়া রাখে এবং এই বন্ধন স্বীকার করিয়া লয়? সে যে পরম অধ্যাত্ম সত্তার অংশ তাহারই মত নিজের সক্রিয় বিকাশধারার স্বরচিত সীমাবন্ধনসকল উপভোগ করিবার সময়েও কেনই বা সে নিজের আনন্ত্যে চিরমুক্ত থাকিতে পারে না? গীতা বলিতেছে যে, গুণসমূহের প্রতি এবং তাহাদের ক্রিয়ার পরিণামফলের প্রতি আমাদের আসক্তিই ইহার কারণ। সত্ত্ব সুখে আসক্ত করে, রজঃ কর্মে আসক্ত করে, তমঃ জ্ঞানকে আবৃত করিয়া ভ্রান্তি ও নিষ্ক্রিয়তার প্রমাদে আসক্ত করে।[২] আবার "সত্ত্ব সুখে আসক্তি ও জ্ঞানে আসক্তি দ্বারা বন্ধন করে, রজঃ দেহীকে কর্মের আসক্তি দ্বারা বন্ধন করে, তমঃ প্রমাদ ও আলস্য ও নিদ্রার দ্বারা বন্ধন করে।"[৩] অন্য কথায়, জীব গুণসকল ও তাহাদের ফলভোগে

সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ।
নিবধ্নন্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমব্যয়ম্॥১৪।৫
সত্ত্বং সুখে সঞ্জয়তি রজঃ কর্মণি ভারত।
জ্ঞানমাবৃত্য তু তমঃ প্রমাদে সঞ্জয়ত্যুত॥১৪।৯

[২] তত্র সত্ত্বং নির্মলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ম্।
সুখসঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ॥১৪।৬

আসক্ত হইযা নিজেব চেতনাকে প্রকৃতিতে প্রাণ মন দেহেব নিম্নতন ও বাহ্যিক ক্রিয়ায় নিবিষ্ট করে এবং এই সকলেব বাহ্যরূপের মধ্যে নিজেকে অবরুদ্ধ কবে এবং পশ্চাতে অধ্যাত্মসত্তায় তাহাব নিজেব যে মহত্তব চৈতন্য বহিযাছে তাহা ভুলিযা যায়, মুক্তিদাযক পুরুষের স্বচ্ছন্দ শক্তি ও অধিকাব সম্বন্ধে অজ্ঞান থাকে। অতএব ইহা স্পষ্ট যে, মুক্ত ও সিদ্ধ হইতে হইলে আমাদিগকে এই সকল জিনিস হইতে প্রত্যাবর্তন কবিতে হইবে, গুণসমূহ হইতে সবিযা গিযা তাহাদেব অতীত হইতে হইবে এবং প্রকৃতির অতীত সেই মুক্ত অধ্যাত্ম চৈতন্যেবই শক্তিতে ফিবিযা যাইতে হইবে।

কিন্তু এইভাবে সকল কর্ম বন্ধ হইযা যাইবে বলিযাই মনে হইতে পাবে, কাবণ সকল প্রাকৃত কর্মই গুণেব দ্বাবা অনুষ্ঠিত হয, প্রকৃতি তাহাব গুণসকলেব ভিতব দিযা কর্ম সম্পাদন করে। জীবাত্মা নিজে নিজে কর্ম কবিতে পাবে না, তাহাকে প্রকৃতি এবং তাহাব গুণের দ্বাবা কাজ কবিতে হয। অথচ গীতা যেমন গুণসমূহ হইতে মুক্তিলাভ করিতে বলিতেছে তেমনই কর্মেব প্রয়োজনেব উপরেও জোব দিতেছে। গীতা যে ফলকামনা ত্যাগেব উপব এত জোব দিযাছে, এইখানেই তাহার সার্থকতা দেখিতে পাওযা যায, কাবণ ফলকামনাই জীবেব বন্ধনেব সর্বাপেক্ষা প্রবল কারণ এবং ইহাকে পবিত্যাগ কবিযা জীব কর্মেব মধ্যেও মুক্ত থাকিতে পারে। তামসিক কর্ম হইতে অজ্ঞান উৎপন্ন হয়, বাজসিক কর্মেব ফল দুঃখ; অতএব এইরূপ কর্মেব ফলে আসক্ত হইযা কোনই লাভ নাই কাবণ ইহাদেব সহিত ঐ সকল অবাঞ্ছনীয জিনিস জড়িত বহিয়াছে। কিন্তু সুকৃত কর্মেব ফল হইতেছে নির্মল ও সাত্ত্বিক,[১] তাহাব আভ্যন্তবীণ পবিণাম জ্ঞান ও সুখ। তথাপি এই সকল সুখময জিনিসেবও প্রতি আসক্তি সম্পূর্ণভাবে বর্জন কবিতে হইবে, কাবণ প্রথমত, মনের মধ্যে তাহাদেব রূপ হইতেছে সীমাবদ্ধ ও সীমাবদ্ধকাবী এবং দ্বিতীয়ত, সত্ত্ব সকল সমযেই বজঃ ও তমঃ গুণেব সহিত জড়িত এবং তাহাদেব দ্বাবা অবরুদ্ধ হইয়া থাকায় যেকোন মুহূর্তে তাহাদেব দ্বাবা অভিভূত হইতে পাবে, সেইজন্য ঐ সব সুখময ফলের স্থায়িত্ব সর্বদাই অনিশ্চিত। কিন্তু যদিও কোন ব্যক্তি ফলে আসক্তি হইতে মুক্ত হয়, কর্মটিতেই তাহাব আসক্তি থাকিতে পাবে, শুধু কাজটির জন্য কাজ করাতেই তাহার আসক্তি থাকিতে পাবে এবং ইহাই রাজসিক বন্ধনের মূল স্বরূপ; অথবা অবশভাবে প্রকৃতিব প্রেবণায চালিত হইযা কাজ করা হয়, তখন তাহা হয তামসিক, অথবা যে কাজটি কবা হইতেছে তাহাব

রজো রাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবম্।
তন্নিবধ্নাতি কৌন্তেয কর্মসঙ্গেন দেহিনম্॥
তমস্ত্বজ্ঞানজং বিদ্ধি মোহনং সর্বদেহিনাম্।
প্রমাদালস্যনিদ্রাভিস্তন্নিবধ্নাতি ভারত॥১৪।৭-৮

[১] *কর্মণঃ সুকৃতস্যাহুঃ সাত্ত্বিকং নির্মলং ফলম্।*
রজসস্তু ফলং দুঃখমজ্ঞানং তমসঃ ফলম্॥১৪।১৬

ন্যাযাভাব আকর্ষণেই কাজটি কবা হয় এবং সেইটি হয় সাত্ত্বিক বন্ধনেব কারণ, সাধু ও জ্ঞানী ব্যক্তিদেব উপব ইহাব প্রভাব খুব প্রবল। আব এখানে সুস্পষ্ট পন্থা হইতেছে গীতাব আব একটি উপদেশ, কর্মটিকেই কর্মেশ্বরের নিকট অর্পণ কবা এবং কেবল তাঁহাব ইচ্ছাব নিষ্কাম এবং সমতাপূর্ণ যন্ত্র হওয়া। প্রকৃতিব গুণ ভিন্ন আব কিছুকেই আমাদেব কর্মেব কর্তা ও কাবণ বলিযা না দেখা এবং গুণসমূহের ঊর্ধ্বে যে পবম সত্তা রহিয়াছে তদভিমুখী হওযা, ইহাই নিম্নতন প্রকৃতি হইতে ঊর্ধ্বে উঠিবাব পন্থা।[১] কেবল এইভাবেই আমবা ভগবানের নিজস্ব গতি ও স্থিতি লাভ কবিতে পাবি, মদ্‌ভাব এবং এইভাবে জন্ম ও মবণ এবং তাহাদের আনুষঙ্গিক জবা ও দুঃখ হইতে মুক্ত হইযা মুক্ত জীব পরিশেষে অমৃতত্ব এবং যাহাকিছু শাশ্বত সবই উপভোগ কবিবে।

অর্জুন জিজ্ঞাসা কবিলেন, কিন্তু এইরূপ ব্যক্তিব লক্ষণ কি, তাঁহাব আচবণ কিরূপ, কেমন কবিযাই বা তিনি কর্মেব মধ্যেও ত্রিগুণাতীত হইয়া থাকেন?[২] কৃষ্ণ বলিলেন, লক্ষণ হইতেছে সমতা, সে সম্বন্ধে আমি বার বার বলিয়াছি, লক্ষণ এই যে, তিনি ভিতবে সুখদুঃখে সমান, সুবর্ণ মৃত্তিকা ও প্রস্তবে সমভাবাপন্ন, তাঁহার নিকট প্রিয-অপ্রিয, স্তুতি-নিন্দা, মান-অপমান, শত্রুপক্ষ-মিত্রপক্ষ সব সমান। তিনি জ্ঞানময, অবিচল, অপবিবর্তনীয আভ্যন্তবীণ শান্তি ও স্থৈর্যে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত। তিনি কোন কর্মেব প্রবর্তন কবেন না, পবন্তু প্রকৃতিব গুণসমূহকেই সকল কর্ম কবিতে দেন। তাঁহাব বাহ্যিক মানস সত্তায এবং শাবীবিক গতিবিধিতে সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ প্রবৃত্ত বা নিবৃত্ত হইতে পাবে এবং তাহাদেব পরিণামস্বরূপ জ্ঞান, কর্মে প্রবৃত্তি অথবা নিষ্ক্রিযতা এবং মন ও প্রাণেব মোহ উত্থিত হইতে পাবে, কিন্তু কখন কোন্‌টা উঠিল বা যাইল তাহাতে তিনি উল্লসিত হন না, অন্যপক্ষে আবার এই সকল জিনিসেব ক্রিযায বা বিবতিতে তাঁহাব দ্বেষও নাই, কুণ্ঠাও নাই।[৩] তিনি

নান্যং গুণেভ্যঃ কর্তারং যদা দ্রষ্টানুপশ্যতি।
গুণেভ্যশ্চ পরং বেত্তি মদ্ভাবং সোঽধিগচ্ছতি॥
গুণানেতানতীত্য ত্রীন দেহী দেহসমুদ্ভবান্।
জন্মমৃত্যুজরাদুঃখৈর্বিমুক্তোঽমৃতমশ্নুতে॥১৪।১৯-২০
কৈর্লিঙ্গৈস্ত্রীন গুণানেতানতীতো ভবতি প্রভো।
কিমাচারঃ কথং চৈতাংস্ত্রীন গুণানতিবর্ত্ততে॥১৪।২১
প্রকাশং চ প্রবৃত্তিং চ মোহমেব চ পাণ্ডব
ন দ্বেষ্টি সংপ্রবৃত্তানি ন নিবৃত্তানি কাঙ্ক্ষতি॥
উদাসীনবদাসীনো গুণৈর্যো ন বিচাল্যতে।
গুণা বর্তন্ত ইত্যেব যোঽবতিষ্ঠতি নেঙ্গতে॥
সমদুঃখসুখঃ স্বস্থঃ সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ।
তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ো ধীরস্তুল্যনিন্দাত্মসংস্তুতিঃ॥
মানাপমানযোস্তুল্যস্তুল্যো মিত্রারিপক্ষযোঃ।
সর্বারম্ভপরিত্যাগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে॥১৪।২২-২৫

গুণাত্মিকা প্রকৃতি হইতে ভিন্ন অন্য এক তত্ত্বের সচেতন জ্যোতির মধ্যে সমাসীন, যে ব্যক্তি এক ঊর্ধ্বতর আকাশের মধ্যে উঠিয়াছে তাহার নিকট যেমন মেঘমুক্ত সূর্য তেমনই সেই মহত্তর চৈতন্য এই সকল শক্তির ঊর্ধ্বে এবং ইহাদের গতিসকলের দ্বারা বিচলিত না হইয়া তাঁহার মধ্যে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ থাকে। সেই ঊর্ধ্বদেশ হইতে তিনি দেখেন যে, গুণসমূহই কর্মে ব্যাপৃত রহিয়াছে এবং তাহাদের ঝঞ্ঝা ও নিস্তব্ধতা প্রকৃতিরই প্রক্রিয়া, তিনি নিজে সেসব নহেন তাঁহার আত্মপুরুষ ঊর্ধ্বে অবিচল এবং তাঁহার অধ্যাত্মসত্তা এই সকল সদাচঞ্চল জিনিসের অস্থির পরিবর্তনে যোগদান করে না। ইহা হইতেছে ব্রাহ্মীস্থিতির নৈর্ব্যক্তিকতা; কারণ সেই উচ্চতর তত্ত্ব, সেই মহত্তর উদার ঊর্ধ্বস্থিত চৈতন্য, কূটস্থ—তাহাই অক্ষর ব্রহ্ম।

তথাপি এখানে স্পষ্টতই দ্বৈত স্থিতি রহিয়াছে, দুইটি বিপরীত ভাগে সত্তাকে ছেদ করা হইয়াছে, অক্ষর ও ক্ষর—অক্ষর পুরুষে বা ব্রহ্মে অবস্থিত মুক্ত আত্মা অমুক্ত ক্ষর প্রকৃতির ক্রিয়া নিরীক্ষণ করিতেছে। ইহা অপেক্ষা কি কোন মহত্তর স্থিতি নাই, পূর্ণতর পূর্ণতার তত্ত্ব নাই? অথবা এই ভেদাত্মক স্থিতি অপেক্ষা কোন উচ্চতর চৈতন্য কি শারীর ক্ষেত্রে সম্ভব নহে? যোগের লক্ষ্য কি ক্ষর প্রকৃতিকে বর্জন করা, প্রাকৃত দেহসম্ভূত গুণসকলকে বর্জন করা এবং ব্রহ্মের নৈর্ব্যক্তিকতা ও শাশ্বত শান্তির মধ্যে বিলীন হওয়া? ঐরূপ লয় বা ব্যষ্টিগত পুরুষের বিলোপ সাধনই কি মহত্তম মুক্তি? মনে হয় ইহা ভিন্ন আরও কিছু রহিয়াছে, কারণ গীতা পরিশেষে বলিতেছে—সকল সময়ে এই সুর তুলিয়াই সমাপ্তি করিতেছে—"যিনি অব্যভিচারী ভক্তিযোগের দ্বারা আমাকে ভজনা করেন, আমাকে লাভ করিতে চান, তিনিও এই গুণত্রয়কে অতিক্রম করেন এবং তিনিও ব্রহ্ম হইবার যোগ্য হন।"[১] এই যে "আমি" ইনিই পুরুষোত্তম, ইনিই নীরব নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মের ভিত্তি এবং অমৃতত্ব ও অক্ষয় অধ্যাত্মজীবনের ভিত্তি এবং শাশ্বত ধর্ম ও ঐকান্তিক সুখের ভিত্তি। অতএব এমন এক পদ রহিয়াছে, অবিচল সাক্ষীরূপে গুণসমূহের দ্বন্দ্ব অবলোকন করিতেছে যে অক্ষর পুরুষ, তাহারও শান্তি অপেক্ষা সে পদ মহত্তর। ব্রহ্মের অক্ষরতারও ঊর্ধ্বে এক উচ্চতম অধ্যাত্ম অনুভূতি ও প্রতিষ্ঠা রহিয়াছে, কর্মের রাজসিক প্রবৃত্তি অপেক্ষা মহত্তর এক শাশ্বত ধর্ম রহিয়াছে, এমন এক পূর্ণতম আনন্দ রহিয়াছে যাহাকে রাজসিক দুঃখ স্পর্শ করিতে পারে না, যাহা সাত্ত্বিক সুখেরও ঊর্ধ্বে এবং এসব জিনিস পাওয়া যায় ও অধিকার করা যায় পুরুষোত্তমের সত্তা ও শক্তির মধ্যে বাস করিয়া। কিন্তু যেহেতু ইহা ভক্তির দ্বারা

[১] মাং চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূযায কল্পতে॥
ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ।
শাশ্বতস্য চ ধর্ম্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ॥১৪।২৬-২৭

অর্জন করা যায়, ইহার পদ হইবে সেই দিব্য আনন্দ যাহা নিরতিশয় প্রেমের মিলনে এবং পূর্ণ ঐক্যোপলব্ধিতে অনুভূত হয়, যাহাতে ভক্তির পরম পরিণতি, নিরতিশয়প্রেমাস্পদত্বম্ আনন্দতত্ত্বম্। আর সেই আনন্দের মধ্যে উঠা, সেই অনির্বচনীয় ঐক্যের মধ্যে উঠা—ইহাই অধ্যাত্মসিদ্ধির পরিপূর্ণতা এবং শাশ্বত অমৃতত্বপ্রদায়ী ধর্মের চরম সার্থকতা।

পঞ্চদশ অধ্যায়

পুরুষত্রয়

গীতার শিক্ষা প্রারম্ভ হইতে শেষ পর্যন্ত তাহার সকল ধারায় এবং সকল সাবলীল গতিবৈচিত্র্যের ভিতর দিয়া একটি কেন্দ্রীয় ভাবের অভিমুখে অগ্রসর হইয়াছে এবং বিভিন্ন দার্শনিক সম্প্রদায়ের মতবৈষম্যসকলের সাম্যতা সাধন ও সামঞ্জস্য করিয়া এবং যত্নসহকারে অধ্যাত্ম অনুভূতিসমূহের সমন্বয় সাধন করিয়া সেই কেন্দ্রীয় ভাবে উপনীত হইতেছে, এই সকল অধ্যাত্ম অনুভূতির আলোক অনেক সময়েই পরস্পরবিরোধী, অন্তত স্বতন্ত্রভাবে গ্রহণ করিলে এবং অনন্যভাবে তাহাদের বিকিরণের বাহ্যিক রেখা ধরিয়া চলিলে তাহারা বিভিন্ন দিকে লইয়া যায়, কিন্তু এখানে সেসকলকে সংগ্রহ করিয়া এক সমন্বয় সাধক দৃষ্টিতে এক কেন্দ্রানুগত করা হইয়াছে। এই যে কেন্দ্রীয়ভাব, ইহা হইতেছে ত্রিধা চৈতন্যের পরিকল্পনা, এই চৈতন্য তিন অথচ এক, ইহা সৃষ্টির সকল স্তর ব্যাপিয়া বর্তমান রহিয়াছে।

এই জগতের মধ্যে এমন এক অধ্যাত্মসত্তা কাজ করিতেছে যাহা অগণন বাহ্যরূপের মধ্যেও এক। ইহাই জন্ম ও কর্মের বিকাশকর্তা, জীবনের গতিদায়ক শক্তি, প্রকৃতির অসংখ্য পরিবর্তনের মধ্যে অন্তর্যামী ও সহযোগী চৈতন্য, দেশ ও কালের মধ্যে এই যেসব বিক্ষোভ উহাই এই সবের উপাদানভূত সদ্বস্তু; উহা নিজেই কাল, দেশ ও ঘটনা। উহাই জগৎসমূহের মধ্যে এই সব বহুসংখ্যক আত্মা; উহাই সমুদয় দেব, মানব, জীব, বস্তু, শক্তি, গুণ, পরিমাণ, বিভূতি ও অধিষ্ঠাতা। উহাই প্রকৃতি, ঐ অধ্যাত্মসত্তার শক্তি; উহাই বিষয়সমূহ, নাম, ভাব ও রূপের মধ্যে উহারই বাহ্যপ্রকাশ, উহাই সর্বভূত, সকলেই এই অদ্বিতীয় স্বয়ম্ভূ অধ্যাত্ম বস্তুর, এই এক ও শাশ্বতের নানা অংশ, নানা জন্ম, নানা সম্ভূতি। কিন্তু আমরা চক্ষুর সম্মুখে যাহাকে স্পষ্টত ক্রিয়মাণ দেখিতেছি তাহা এই শাশ্বত এবং তাঁহার চৈতন্যময়ী শক্তি নহে; ইহা হইতেছে প্রকৃতি, সে তাহার ক্রিয়াবলীর অন্ধ আবেগে তাহার কর্মের অন্তর্নিহিত অধ্যাত্মসত্তা সম্বন্ধে অজ্ঞান। তাহার কাজ যন্ত্রবৎচালিত কতকগুলি মূল গুণ বা শক্তিতত্ত্বের বিশৃঙ্খল, অজ্ঞান, সীমাবদ্ধ ক্রিয়া এবং তাহাদের স্থিরনির্দিষ্ট বা পরিবর্তনশীল পরিণাম-পরম্পরা। আর তাহার ক্রিয়ার বশে যেকোন আত্মা সম্মুখে প্রকট হইতেছে সেও দৃশ্যত অজ্ঞান, দুঃখভোগী এবং এই নিম্নতন প্রকৃতির অসম্পূর্ণ ও অসন্তোষজনক ক্রিয়ায় আবদ্ধ। তথাপি এই প্রকৃতির মধ্যে যে অন্তর্নিহিত সত্তা তাহা আপাতত যেরূপ দেখায় বস্তুত সেরূপ নহে; কারণ ইহাই ক্ষর পুরুষ, বিশ্ব-আত্মা, বিশ্ব-প্রপঞ্চ ও প্রকটনের যে ক্ষরভাব তাহারই অন্তরাত্মা—ইহার সত্য স্বরূপ লুক্কায়িত, বাহ্যরূপই ব্যক্ত, মূলত ইহা

অক্ষর ও পরমপুরুষের সহিত অভিন্ন। ইহার ব্যক্ত বাহ্যরূপসমূহের পশ্চাতে যে সত্য লুক্কায়িত রহিয়াছে, আমাদিগকে সেইখানেই যাইতে হইবে; এই সকল আবরণের অন্তরালে যে অধ্যাত্ম সত্তা রহিয়াছে আমাদিগকে তাহারই সন্ধান লইতে হইবে এবং সবকেই এক বলিয়া দেখিতে হইবে, 'বাসুদেবঃ ইতি সর্ব্বম্', ব্যষ্টিগত, বিশ্বগত, বিশ্বাতীত সবই সেই এক বাসুদেব। কিন্তু যতক্ষণ আমরা নিম্নতন প্রকৃতিতে সমাহৃত হইয়া বাস করি ততক্ষণ আভ্যন্তরীণ সত্য অনুসারে সম্পূর্ণভাবে ইহা কার্যে পরিণত করা সম্ভব নহে। কারণ এই নিম্নতর ক্রিয়ায় প্রকৃতি হইতেছে এক অজ্ঞান, এক মায়া, সে নিজের অঞ্চলের অন্তরালে ভগবানকে রাখিয়াছে, নিজের নিকটে এবং নিজের জীবসকলের নিকটে তাঁহাকে গোপন করিতেছে। ভগবান নিজেই সর্বসৃজনকারিণী যোগমায়ার দ্বারা লুক্কায়িত হইয়াছেন, নিত্য অনিত্যের রূপে প্রকট হইয়াছে, পুরুষ নিজেই অভিব্যক্তি-সমূহের দ্বারা সমাহিত ও সমাবৃত হইয়া রহিয়াছেন। ক্ষরপুরুষকে যদি একক স্বতন্ত্রভাবে ধরা যায়, ক্ষর বিশ্বকে অবিভাজ্য অক্ষর এবং বিশ্বাতীত হইতে পৃথকভাবে দেখা যায়, তাহা হইলে জ্ঞানের পূর্ণতা হয় না, আমাদের সত্তার পূর্ণতা হয় না, অতএব মুক্তিও হয় না।

কিন্তু অন্য আর একটি অধ্যাত্মসত্তা আমরা অবগত হই, তাহা এই সবের কোনটিই নহে, তাহা হইতেছে আত্মা, শুধু আত্মাই আর কিছুই নহে। এই অধ্যাত্মসত্তা শাশ্বত, চিরকাল একই প্রকার, তাহা কখনই অভিব্যক্তির দ্বারা পরিবর্তিত বা প্রভাবিত হয় না, তাহা এক, অবিচল, অবিভক্ত স্বয়ম্ভূসত্তা, তাহা প্রাকৃতিক বস্তু ও শক্তিসকলের বিভাগের দ্বারা যেন বিভক্ত হইয়াছে এইরূপ প্রতীয়মানও হয় না, তাহা প্রকৃতির কর্মের মধ্যে নিষ্ক্রিয়, প্রকৃতির গতির মধ্যে গতিহীন। ইহাই সর্বভূতের আত্মা অথচ অবিচল, উদাসীন, স্পর্শাতীত, যেন এই যেসব বস্তু তাহার উপর নির্ভর করিতেছে ইহারা অনাত্মা, ইহারা যেন তাহার নিজেরই ফল নহে, শক্তি নহে, পরিণাম নহে, পরন্তু এক অবিচল অসহযোগী দ্রষ্টার সম্মুখে যেন এক কর্মের অভিনয় প্রকটিত হইতেছে। কারণ যে মন এই অভিনয়মঞ্চে নামিয়া ইহাতে যোগ দিতেছে সে আত্মা নহে, আত্মা উদাসীনভাবে এই অভিনয়কে নিজের মধ্যে ধরিয়া রহিয়াছে। এই অধ্যাত্মসত্তা কালের অতীত, যদিও তাহাকে কালের মধ্যেই দেখিতে পাই; তাহা দেশে পরিব্যাপ্ত নহে, যদিও আমরা দেখি তাহা যেন দেশ ব্যাপিয়া বিরাজ করিতেছে। ইহাকে আমরা সেই পরিমাণে জানিতে পারি যে পরিমাণে আমরা বাহির হইতে ফিরিয়া অন্তর্মুখী হই, অথবা ক্রিয়া ও গতির পশ্চাতে যে এক শাশ্বত ও অবিচল সত্তা রহিয়াছে তাহার সন্ধান করি, অথবা কাল এবং তাহার সৃষ্টি হইতে সরিয়া যাহা কখনও সৃষ্ট হয় নাই তাহাতে যাই, প্রকট প্রপঞ্চ হইতে সরিয়া মূল সত্তায় যাই, ব্যক্তি হইতে নৈর্ব্যক্তিকতায়, বিবর্ত হইতে অপরিবর্তনীয় স্বপ্রতিষ্ঠ সত্তায় যাই। এইটিই অক্ষর পুরুষ, ক্ষরের মধ্যে অক্ষর, চলমানের মধ্যে অবিচল, নশ্বর বস্তুসকলের মধ্যে

অবিনশ্বর। অথবা যেহেতু ব্যাপ্তি কেবল প্রতিভাসমাত্র সেহেতু বলিতে পারা যায় যে, অক্ষর অবিচল ও অবিনশ্বরের মধ্যেই সকল ক্ষর ও নশ্বর বস্তুর গতিক্রিয়া চলিতেছে।

যে ক্ষর সত্তা সকল প্রাকৃত বস্তু বলিয়া এবং সর্বভূত বলিয়া আমাদের সম্মুখে দৃষ্ট হইতেছে তাহা ব্যাপকভাবে অবিচল ও শাশ্বত অক্ষরের মধ্যেই বিচরণ করিতেছে, কর্ম করিতেছে। আত্মার এই চলিষ্ণু শক্তি আত্মার সেই মূলগত অবিচলতার মধ্যেই ক্রিয়া করিতেছে, যেমন জড় প্রকৃতির দ্বিতীয় তত্ত্ব বায়ু তাহার একীকরণ ও স্বতন্ত্রীকরণের, আকর্ষণ ও বিকর্ষণের স্পর্শগুণাত্মক শক্তি লইয়া, তৈজস (দীপ্তিময়, বাষ্পীয়, বৈদ্যুতিক) ও অন্যান্য ভৌতিক ক্রিয়ার সৃজনাত্মক শক্তিকে বিধৃত করিয়া আকাশের সূক্ষ্ম বিরাট নিশ্চলতার মধ্যে ব্যাপকভাবে বিচরণ করিতেছে। এই অক্ষর পুরুষ হইতেছে বুদ্ধির ঊর্ধ্বে আত্মা, 'যঃ বুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ'—ইহা আমাদের সত্তার মধ্যে প্রকৃতির উচ্চতম আভ্যন্তরীণ তত্ত্ব মুক্তিদায়ক বুদ্ধিরও অতীত, এই বুদ্ধির ভিতর দিয়াই মানুষ তাহার অস্থির চিরচঞ্চল মানসিক সত্তা হইতে তাহার স্থির শাশ্বত অধ্যাত্ম সত্তার মধ্যে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া অবশেষে জন্মের দৃঢ়ানুবন্ধতা ও কর্মের সুদীর্ঘ শৃঙ্খল হইতে মুক্ত হয়। এই আত্মাই তাহার উচ্চতম স্থিতিতে (পরং ধাম) সেই অব্যক্ত যাহা আদ্যা বিশ্বপ্রকৃতির অব্যক্ত তত্ত্ব হইতেও ঊর্ধ্বে এবং যদি জীব এই অক্ষরের মধ্যে ফিরিয়া যায় তাহা হইলে বিশ্ব ও প্রকৃতির বন্ধন তাহা হইতে খসিয়া পড়ে এবং সে জন্ম অতিক্রম করিয়া এক অপরিণামী শাশ্বত সত্তার মধ্যে চলিয়া যায়। তাহা হইলে জগতে আমরা এই দুইটি পুরুষকেই দেখিতে পাই, একটি ইহার ক্রিয়ার সম্মুখে আসিয়া প্রকট হইতেছে, অপরটি রহিয়াছে পশ্চাতে, চিরনীরবতায় অচঞ্চল, তাহা হইতেই কর্ম উদ্ভূত হইতেছে, তাহার মধ্যেই সকল কর্ম কালাতীত সত্তায় বিরতি ও নির্বাণ লাভ করিতেছে। 'দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ।'

যে সমস্যাটি আমাদের বুদ্ধি সমাধান করিতে পারে না সেটি হইতেছে এই যে, মনে হয় যেন এই দুইটি পুরুষ সম্পূর্ণ বিপরীত, তাহাদের মধ্যে সম্বন্ধের কোন প্রকৃত সূত্র নাই অথবা সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছেদ সাধন না করিয়া একটি হইতে অপরটিতে যাইবার কোন পথ নাই। ক্ষর পুরুষ কর্ম করিতেছে, অন্তত কর্মের প্রেরণা দিতেছে, অক্ষরের মধ্যে স্বতন্ত্রভাবে, অক্ষর পুরুষ সরিয়া রহিয়াছে, আত্মসমাহিত, নিজের নিষ্ক্রিয়তায় ক্ষর হইতে স্বতন্ত্র। প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয় যে, যদি আমরা সাংখ্যদের ন্যায় পুরুষ ও প্রকৃতির আদি ও সনাতন দ্বিত্ব মানিয়া লই (যদিও চিরন্তন বহুপুরুষ স্বীকার না করি) তাহা হইলেই সম্ভবত ভাল হয়। জিনিসটি অধিকতর যুক্তিসঙ্গত ও সহজবোধ্য হয়। তখন আমাদের অক্ষরের অনুভূতি হইবে প্রত্যেক পুরুষের নিজেরই মধ্যে প্রত্যাহার, প্রকৃতি হইতে এবং সেই জন্যই জীবনের ব্যবহারে অন্যান্য জীবের সহিত সংস্পর্শ হইতে সরিয়া

আসা, কারণ প্রত্যেক পুরুষই নিজের মূলসত্তায় স্বয়ংসিদ্ধ, অনন্ত ও পূর্ণ। কিন্তু সে যাহাই হউক, শেষ অনুভূতি হইতেছে সকল সত্তার একত্বের অনুভূতি, তাহা কেবল অনুভূতির সাম্য নহে, একই প্রাকৃত শক্তির নিকট সকলের সমান বশ্যতা নহে, কিন্তু অধ্যাত্মসত্তার একত্ব, এই সব অন্তহীন রূপবৈচিত্র্যের ঊর্ধ্বে, আপেক্ষিক জীবনের এই সকল আপাতদৃশ্য ভেদবিভাগের পশ্চাতে সচেতন সত্তার বিরাট একাত্মতা। সেই উচ্চতম অনুভূতির উপরেই গীতার প্রতিষ্ঠা। বস্তুত মনে হয় বটে যে, গীতা বহু পুরুষের নিত্যতা স্বীকার করিয়াছে, তাহারা তাহাদের শাশ্বত ঐক্যের অনুগত এবং তাঁহার দ্বারা বিধৃত, কারণ বিশ্বপ্রপঞ্চ চিরন্তন এবং অন্তহীন যুগযুগান্তের ভিতর দিয়া প্রকটন চলিয়াছে; আর গীতা এমন কথা কোথাও স্পষ্টভাবে বলে নাই বা কোন বাক্যের দ্বারা ইঙ্গিতও করে নাই যে, জীবাত্মা অনন্ত সত্তার মধ্যে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হইবে, লয় হইবে। কিন্তু তাহা হইলেও গীতা জোর দিয়া স্পষ্টভাবেই বলিয়াছে যে, অক্ষর পুরুষই হইতেছে এই সব বহু জীবের এক আত্মা, অতএব ইহা স্পষ্ট যে, এই দুই পুরুষই হইতেছে একই শাশ্বত ও বিশ্বসত্তার দ্বৈত স্থিতি। এইটি হইতেছে একটি অতি প্রাচীন সিদ্ধান্ত; উপনিষদের যে উদারতম দৃষ্টি, এই সিদ্ধান্তটিই হইতেছে তাহার সমগ্র ভিত্তি; যথা, ঈশ উপনিষদ বলিয়াছে যে, ব্রহ্ম অচল ও সচল দুইই, 'তদেজতি তন্নৈজতি', এক এবং বহু, আত্মা এবং সর্বভূত, বিদ্যা এবং অবিদ্যা, সনাতন অজাত স্থিতি এবং সর্বভূতের সম্ভূতি এবং ইহাদের মধ্যে একটিতে বাস করিয়া তাহার নিত্য সঙ্গী অপরটিকে বাদ দেওয়াকে ঈশা অন্ধং তমঃ বলিয়া, একদেশদর্শী জ্ঞানের অন্ধকার বলিয়া অভিহিত করিয়াছে। গীতার ন্যায় উপনিষদও দৃঢ়তার সহিত বলিয়াছে যে, অমৃতত্ব উপভোগ করিতে হইলে এবং শাশ্বতের মধ্যে বাস করিতে হইলে মানুষের পক্ষে উভয় তত্ত্বকেই জানা আবশ্যক, গ্রহণ করা আবশ্যক, গীতা যেমন বলিয়াছে, 'সমগ্রম্ মাম্'। গীতার শিক্ষা এবং উপনিষদ সমূহের এই দিকের শিক্ষা এ পর্যন্ত একই, কারণ তাহারা সদ্বস্তুর দুইটি দিকই অবলোকন করে, স্বীকার করে অথচ সিদ্ধান্তরূপে এবং বিশ্বের পরম সত্যরূপে একত্বে উপনীত হয়।

কিন্তু এই যে মহত্তর জ্ঞান ও উপলব্ধি, আমাদের ঊর্ধ্বতম দৃষ্টির নিকট ইহা যতই সত্য হউক, যতই হৃদয়গ্রাহী হউক, ইহাকে এখনও একটি অতি বাস্তব ও গুরুতর সমস্যা খণ্ডন করিতে হইবে, ব্যবহারের দিক দিয়া এবং যুক্তির দিক দিয়াও যে বিরোধ রহিয়াছে তাহার সমাধান করিতে হইবে; প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয় যে, এই বিরোধ অধ্যাত্ম উপলব্ধির উচ্চতম শিখর পর্যন্ত স্থায়ী হয়। এই যে সচল আভ্যন্তর ও বাহ্য উপলব্ধি, শাশ্বত পুরুষ ইহা হইতে ভিন্ন, ইহা অপেক্ষা এক মহত্তর চেতনা আছে, 'ন ইদম্ যদ্ উপাসতে' (কেন উপনিষদ); অথচ সেই সঙ্গে এই সবই সেই শাশ্বত পুরুষ, এই সবই আত্মার চিরন্তন আত্মদর্শন, সর্ব্বং খলু ইদং ব্রহ্ম, অয়ম্ আত্মা ব্রহ্ম (মাণ্ডুক্য উপনিষদ)। শাশ্বত পুরুষই সর্বভূত হইয়াছেন, 'আত্মা অভূৎ সর্ব্বভূতানি' (ঈশ উপনিষদ)। শ্বেতাশ্বতর যেমন বলিয়াছে, "তুমিই

ঐ কুমার, তুমিই ঐ কুমারী, আবার তুমিই ঐ বৃদ্ধ দণ্ড হস্তে চলিতেছ,"[১] ঠিক যেমন গীতাতে ভগবান বলিয়াছেন যে, তিনিই কৃষ্ণ ও অর্জুন, ব্যাস ও উশনা, তিনিই সিংহ, তিনিই অশ্বত্থ বৃক্ষ, তিনিই সকল জীবের চেতনা, বুদ্ধি, সকল গুণ ও অন্তরাত্মা। কিন্তু এই দুইটি পুরুষ কেমন করিয়া এক হয়? তাহারা যে প্রকৃতিতে এতটা বিপরীত শুধু তাহাই নহে, উপলব্ধিতেও তাহাদিগকে এক করা কঠিন। কারণ যখন আমরা বিবর্তনের চঞ্চলতায় বাস করি, তখন আমরা কালাতীত স্বপ্রতিষ্ঠ সত্তার অমৃতত্ব সম্বন্ধে সজ্ঞান হইতে পারিলেও তাহার মধ্যে বাস করিতে পারি কিনা সন্দেহ। আবার যখন আমরা কালাতীত সত্তায় প্রতিষ্ঠিত হই, তখন কাল ও দেশ ও ঘটনা আমাদের নিকট হইতে খসিয়া পড়ে এবং অনন্তের মধ্যে দুঃস্বপ্নের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে আরম্ভ হয়। প্রথম দৃষ্টিতে সর্বাপেক্ষা সহজবোধ্য সিদ্ধান্ত ইহাই হয় যে, প্রকৃতিতে পুরুষের যে চঞ্চলতা তাহা ভ্রান্তি, যতক্ষণ আমরা ইহার মধ্যে বাস করি ততক্ষণই ইহা সত্য কিন্তু মূলত সত্য নহে এবং সেই জন্যই যখন আমরা আত্মার মধ্যে প্রত্যাবৃত্ত হই, উহা আমাদের নিষ্কলঙ্ক মূল সত্তা হইতে খসিয়া পড়ে। এইভাবেই সাধারণত এই সমস্যার সহজ সমাধান করা হয়। 'ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা'।

গীতা এই ব্যাখ্যার আশ্রয় গ্রহণ করে নাই, ইহার নিজের মধ্যেই অত্যধিক ত্রুটি রহিয়াছে, তাহা ছাড়া ইহা ঐ ভ্রান্তির কোন সঙ্গত কারণ দেখাইতে পারে না—কারণ ইহা শুধুই বলে যে, এসব হইতেছে এক রহস্যময় ও দুর্বোধ্য মায়া, তাহা হইলে আমরাও তো ঠিক ঐ ভাবেই বলিতে পারি যে, ইহা এক রহস্যময় ও দুর্বোধ্য যুগ্মতত্ত্ব, আত্মা নিজেকে আত্মার নিকট হইতে লুকাইতেছে। গীতা মায়ার কথা বলিয়াছে, কিন্তু গীতার মতে উহা হইতেছে কেবল এক ভ্রান্তি-উৎপাদক আংশিক চেতনা, তাহা পূর্ণ সত্যকে ধরিতে পারে না, চঞ্চলা প্রকৃতির ব্যাপারসকলের মধ্যেই বাস করে, যে পুরুষের সে সক্রিয় শক্তি (মে প্রকৃতিঃ) তাঁহাকে দেখিতে পায় না। যখন আমরা এই মায়াকে অতিক্রম করি, জগৎ লুপ্ত হইয়া যায় না, কেবল ইহার সমগ্র অর্থের পরিবর্তন হইয়া যায়। অধ্যাত্ম দৃষ্টিতে আমরা দেখি না যে, এসবের কোন অস্তিত্বই নাই পরন্তু দেখি যে, সবই আছে, কিন্তু যে অর্থে আছে তাহা বর্তমান ভ্রান্ত অর্থ অপেক্ষা সম্পূর্ণ বিভিন্ন, সবই ভাগবত আত্মা, ভাগবত সত্তা, ভাগবত প্রকৃতি, সবই বাসুদেব। গীতার নিকট জগৎ সত্য, ঈশ্বরের সৃষ্টি, শাশ্বতের শক্তি, পরব্রহ্মের প্রকটন, এমনকি ত্রিগুণময়ী মায়ারূপ এই যে নিম্নতর প্রকৃতি ইহাও পরা ভাগবত প্রকৃতি হইতে উদ্ভূত। আর আমরা একান্তভাবে এই প্রভেদের আশ্রয় লইতে পারি না যে, এখানে দুইটি তত্ত্ব রহিয়াছে, একটি নিম্নতর সক্রিয় ও অনিত্য আর একটি কর্মের অতীত ঊর্ধ্বতন

[১] ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং কুমার উত বা কুমারী।
ত্বং জীর্ণো দণ্ডেন বঞ্চসি তং জাতো ভবসি বিশ্বতোমুখঃ।
—শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ ৪।৩

শান্ত স্তব্ধ শাশ্বত তত্ত্ব এবং আমাদের মুক্তি হইতেছে এই আংশিক তত্ত্ব হইতে উঠিয়া সেই মহৎ তত্ত্বে যাওয়া, কর্ম হইতে নীরবতায় যাওয়া। কারণ গীতা জোর দিয়াই বলিয়াছে যে, যতদিন আমাদের জীবন ততদিন আমরা আত্মা ও তাহার নীরবতায় সচেতন হইয়া থাকিতে পারি, অথচ প্রাকৃত জগতে শক্তির সহিত কর্ম করিতে পারি এবং এইরূপ করাই কর্তব্য। এবং গীতা স্বয়ং ভগবানেরই দৃষ্টান্ত দিয়াছে, তিনি জন্মগ্রহণের বাধ্যতায় বদ্ধ নহেন, পরন্তু মুক্ত, বিশ্বপ্রপঞ্চের অতীত, অথচ তিনি চিরকাল কর্মে রত রহিয়াছেন, বর্ত্ত এব চ কর্ম্মণি। অতএব সমগ্র ভাগবত প্রকৃতির সাধর্ম্য লাভ করিয়াই এই দ্বৈত উপলব্ধির সম্পূর্ণ একত্ব সাধন সম্ভব হয়। কিন্তু এই একত্বের মূল সূত্র কি?

পুরুষোত্তম সম্বন্ধে গীতার যে পরম দৃষ্টি তাহারই মধ্যে গীতা এই একত্বের সূত্র পাইয়াছে, কারণ গীতার মতে সেইটিই হইতেছে পূর্ণ ও উচ্চতম উপলব্ধির আদর্শ স্বরূপ, ইহা হইতেছে কৃৎস্নবিদ্‌গণের, সমগ্র জ্ঞানশীল ব্যক্তিগণের জ্ঞান। অক্ষর হইতেছেন "পর", বিশ্বপ্রকৃতিতে যেসব বস্তু রহিয়াছে, যে কর্ম চলিতেছে তাহাদের সম্পর্কে অক্ষর পুরুষ হইতেছেন পরম সত্তা। ইহাই সর্বভূতের অক্ষর আত্মা এবং পুরুষোত্তমই সর্বভূতের অক্ষর আত্মা। প্রকৃতিতে তাঁহার নিজের শক্তি দ্বারা অস্পৃষ্ট, তাঁহার নিজেরই বিবর্তনের প্রেরণা দ্বারা অক্ষুব্ধ, তাঁহার নিজেরই গুণসকলের ক্রিয়া দ্বারা অবিচলিত তাঁহার যে স্বপ্রতিষ্ঠ সত্তা, সেই সত্তার মুক্ত অবস্থাতেই তিনি অক্ষর। কিন্তু ইহা সমগ্র জ্ঞানের একটি প্রধান দিক হইলেও, কেবল একটি দিক মাত্র। পুরুষোত্তম আবার সেই সঙ্গেই অক্ষর পুরুষের অতীত, কারণ তিনি এই অক্ষরতা অপেক্ষা বৃহত্তর, তিনি তাঁহার সত্তার শাশ্বত পদের (পরমধামের) মধ্যেও সীমাবদ্ধ নহেন। তথাপি আমাদের মধ্যে যাহা কিছু শাশ্বত ও অক্ষর রহিয়াছে তাহার ভিতর দিয়াই আমরা সেই পরম পদে পৌঁছিতে পারি যেখান হইতে আর পুনর্জন্মের মধ্যে আসিতে হয় না এবং এইরূপ মুক্তিই প্রাচীনকালের মনীষীগণের সাধনার লক্ষ্য ছিল। কিন্তু যখন শুধু অক্ষরের ভিতর দিয়া সন্ধান করা যায়, তখন এই মুক্তির প্রয়াস হয় অনির্দেশ্যের সন্ধান, ইহা আমাদের প্রকৃতির পক্ষে কষ্টসাধ্য কারণ আমরা এখানে জড়ের মধ্যে দেহধারণ করিয়া রহিয়াছি, 'গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে'। আমাদের অন্তরস্থিত শুদ্ধ সূক্ষ্ম আত্মা, অক্ষর, বৈরাগ্যের প্রেরণায় যে অনির্দেশ্যের মধ্যে উঠিয়া যায় তাহা এক 'পরঃ অব্যক্তঃ', সেই পরম অব্যক্ত অক্ষরও পুরুষোত্তম। সেইজন্যই গীতা বলিয়াছে, যাহারা অনির্দেশ্যের উপাসনা করে তাহারাও আমাকে, শাশ্বত ভগবানকে, লাভ করে। কিন্তু তিনি আবার পরম অব্যক্ত অক্ষর হইতেও মহত্তর, সকল পরম অসৎ হইতে, নেতি নেতি হইতে মহত্তর কারণ তাঁহাকে পরম পুরুষ বলিয়াও জানিতে হইবে, তিনি তাঁহার নিজের সত্তায় এই সমগ্র বিশ্বকে বিস্তৃত করিয়াছেন। তিনি এক পরম রহস্যময় সর্ব, এখানকার সকল জিনিসের এক অনির্বচনীয় পরম সৎ। তিনি ক্ষরের মধ্যে ঈশ্বর, তিনি শুধু ঊর্ধ্বেই পুরুষোত্তম

নহেন, পরন্তু এখানে সর্বভূতের হৃদ্দেশেই ঈশ্বর। আর সেখানে তাঁহার উচ্চতম শাশ্বত "পরঃ অব্যক্ত" পদেও তিনি পরমেশ্বর, তিনি উদাসীন ও সম্বন্ধবর্জিত অনির্দেশ্য নহেন, পরন্তু তিনি আত্মা এবং বিশ্বের মূল, পিতা ও মাতা, আদি প্রতিষ্ঠা ও শাশ্বত আশ্রয়, তিনি সকল লোকের ঈশ্বর এবং সকল যজ্ঞ ও তপস্যার ভোক্তা, 'ভোক্তারং যজ্ঞতপসাম্ সর্ব্বলোকমহেশ্বরম্'। তাঁহাকে জানিতে হইবে যুগপৎ ক্ষরে ও অক্ষরে, তাঁহাকে জানিতে হইবে অজাত পুরুষ হইয়াও তিনি সকলের জন্মে নিজেকে আংশিকভাবে প্রকট করিতেছেন এবং নিত্য অবতাররূপে নিজেও অবতীর্ণ হইতেছেন, তাঁহাকে তাঁহার সমগ্রতায় জানিতে হইবে, 'সমগ্রম্ মাম্'—কেবল তাহা হইলেই জীব নীচের প্রকৃতির বাহ্যরূপসকল হইতে সহজেই মুক্ত হইতে পারে এবং এক বিরাট ত্বরিত বিকাশ ও প্রশস্ত অপরিমেয় ঊর্ধ্বায়নের দ্বারা ভাগবত সত্তা ও পরাপ্রকৃতির মধ্যে ফিরিয়া যাইতে পারে। কারণ ক্ষরের সত্যও পুরুষোত্তমের সত্য। পুরুষোত্তম সর্বভূতের হৃদয়মধ্যে রহিয়াছেন এবং তাঁহার অগণন বিভূতির মধ্যে প্রকট হইতেছেন, পুরুষোত্তম হইতেছেন কালের মধ্যে বিশ্বপুরুষ এবং তিনিই মুক্ত মানবাত্মাকে দিব্যকর্মের জন্য আদেশ দিতেছেন। তিনি অক্ষর ও ক্ষর দুইই অথচ তিনি অন্য, কারণ তিনি এই দুই বিপরীত সত্তা অপেক্ষা অধিকতর এবং মহত্তর,

উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।
যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ॥১৫।১৭

"কিন্তু ক্ষর ও অক্ষর হইতে পৃথক হইতেছেন উত্তম পুরুষ, তিনি পরমাত্মা বলিয়া খ্যাত, তিনি অক্ষয় ঈশ্বর, লোকত্রয়ে প্রবেশ করিয়া তাহাদিগকে ভরণ করিতেছেন।" গীতা আমাদের জীবনের এই দুইটি আপাতবিরোধী দিকের যে সমন্বয় সাধন করিয়াছে এই শ্লোকটিই তাহার মূল সূত্র।

প্রথম হইতেই পুরুষোত্তমতত্ত্বের সূচনা করা হইয়াছে, আভাস দেওয়া হইয়াছে, উল্লেখ করা হইয়াছে, প্রথম হইতেই এইটিকে পরোক্ষভাবে ধরিয়া লওয়া হইয়াছে, কিন্তু কেবল এখন এই পঞ্চদশ অধ্যায়েই ইহাকে স্পষ্টভাবে বিবৃত করা হইতেছে এবং একটি বিশেষ নাম দিয়া প্রভেদটিকে পরিস্ফুট করা হইতেছে। পরক্ষণেই কিভাবে ইহাকে গ্রহণ করা হইয়াছে এবং বিকাশ করা হইয়াছে তাহা খুবই শিক্ষাপ্রদ। আমাদিগকে বলা হইয়াছে যে, ভাগবত প্রকৃতির মধ্যে উঠিতে হইলে, মানুষকে প্রথমে পূর্ণ অধ্যাত্ম সমতায় প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে এবং ত্রিগুণময়ী নীচের প্রকৃতির ঊর্ধ্বে উঠিতে হইবে। এইভাবে নীচের প্রকৃতিকে অতিক্রম করিয়া আমরা নৈর্ব্যক্তিকতায় সুদৃঢ় হই, কর্মের ঊর্ধ্বে অবিচল প্রতিষ্ঠা লাভ করি, গুণের সকল সীমা, সকল সঙ্কীর্ণতা হইতে মুক্ত হই—এবং এইটিই হইতেছে পুরুষোত্তমের প্রকট প্রকৃতির একটি দিক, আত্মার শাশ্বততা ও একত্বরূপে, অক্ষররূপে তাহার আবির্ভাব। কিন্তু আবার পুরুষোত্তমের এক অনির্বচনীয় শাশ্বত

বহুত্বও রহিয়াছে, জীবের প্রকটনের আদি রহস্যের পশ্চাতে এইটিই হইতেছে উচ্চতম সত্যতম সত্য। অনন্তের আছে এক শাশ্বত শক্তি, তাঁহার দিব্য প্রকৃতির এক আদিহীন অন্তহীন ক্রিয়া এবং সেই ক্রিয়ায় দৃশ্যত নৈর্ব্যক্তিক শক্তিসকলের খেলা হইতে জীব-ব্যক্তিত্বের আশ্চর্য রহস্য আবির্ভূত হইতেছে, 'প্রকৃতিঃ জীবভূতা'। ইহা সম্ভব এই জন্য যে, ব্যক্তিত্বও ভগবানের একটি স্বরূপ এবং অনন্তের মধ্যেই ইহার উচ্চতম অধ্যাত্মসত্য ও অর্থ নিহিত রহিয়াছে। কিন্তু অনন্তের মধ্যে যে ব্যক্তি তাহা নীচের প্রকৃতির অহংভাবাপন্ন ভেদাত্মক আত্মবিস্মৃত ব্যক্তিত্ব নহে, তাহা হইতেছে মহিমান্বিত, বিশ্বময় ও বিশ্বাতীত, অমৃত ও দিব্য। পরম পুরুষের এই রহস্যই হইতেছে প্রেম ও ভক্তির নিগূঢ় তত্ত্ব। আমাদের মধ্যে যে পুরুষ, যে শাশ্বত জীবাত্মা রহিয়াছে সে যে শাশ্বত ভগবানের, পরম পুরুষ পরমেশ্বরের একটি অংশ তাঁহার নিকটে নিজেকে, নিজের যাহা কিছু সবকেই অর্পণ করিতেছে। এই যে আত্মসমর্পণ, আমাদের ব্যক্তিস্বরূপের ও ইহার কর্মসকলের যিনি অনির্বচনীয় অধীশ্বর তাঁহার প্রতি প্রেম ও ভক্তি দ্বারা আমাদের ব্যক্তিগত প্রকৃতির উন্নয়ন ইহাতেই জ্ঞান সম্পূর্ণতা লাভ করে, ইহাতেই কর্মযজ্ঞের পূর্ণ পরিণতি ও পূর্ণ সার্থকতা—অতএব এই সকল জিনিসের ভিতর দিয়াই মানবাত্মা ভাগবত প্রকৃতির এই যে অন্য শক্তিময় গতিময় রহস্য, এই যে অন্য মহান ও নিগূঢ় দিক, ইহার মধ্যে নিজেকে পূর্ণতমভাবে সিদ্ধ করিয়া তোলে এবং সেই সিদ্ধি দ্বারা অমৃতত্ব, ঐকান্তিক সুখ এবং শাশ্বত ধর্মের প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হয়। এই যে যুগ্ম প্রয়োজন, এক অদ্বিতীয় আত্মার সমতা এবং এক অদ্বিতীয় ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি, এই দুইটি যেন ব্রাহ্মীস্থিতি লাভের, ব্রহ্মভূয়ায়, দুইটি স্বতন্ত্র পন্থা—একটি শান্তিময় সন্ন্যাসের পথ, অপরটি দিব্য প্রেম ও দিব্য কর্মের পথ—এইভাবে পৃথকরূপে বর্ণনা করিয়া গীতা এখন পুরুষোত্তমের মধ্যেই ব্যক্তিক ও নৈর্ব্যক্তিকের সমন্বয় করিতে এবং তাহাদের সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে অগ্রসর হইতেছে। কারণ গীতার লক্ষ্য হইতেছে একদেশদর্শিতা ও ভেদাত্মক অত্যুক্তি বর্জন করিয়া জ্ঞান ও অধ্যাত্ম অনুভূতির দুইটি দিককে একত্র মিলিত করিয়া পরম সিদ্ধিলাভের একক ও পূর্ণতম পন্থায় পরিণত করা।

প্রথমেই গীতা বেদান্তের অনুসরণ করিয়া অশ্বত্থবৃক্ষরূপে বিশ্বপ্রপঞ্চের বর্ণনা দিয়াছে।[১] এই বিশ্ববৃক্ষের দেশে বা কালে আদি নাই অন্ত নাই, কারণ ইহা শাশ্বত এবং অবিনাশী, অশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ম্। দেহধারী মানবের এই জড়জগতে ইহার

ঊর্দ্ধমূলমধঃশাখমশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ম্।
ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি যস্তং বেদ স বেদবিৎ॥
অধশ্চোর্দ্ধং প্রসৃতাস্তস্য শাখা গুণপ্রবৃদ্ধা বিষয়প্রবালাঃ।
অধশ্চ মূলান্যনুসন্ততানি কর্ম্মানুবন্ধীনি মনুষ্যলোকে॥
ন রূপমস্যেহ তথোপলভ্যতে নান্তো ন চাদির্ন চ সংপ্রতিষ্ঠা।
অশ্বত্থমেনং সুবিরূঢ়মূলমসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিত্ত্বা॥১৫।১-৩

প্রকৃত রূপ উপলব্ধি হয না, আর এখানে ইহাব কোন স্থাযী ভিত্তিও দেখিতে পাওয়া যায় না, ইহা হইতেছে এক অনন্ত গতিপ্রবাহ এবং ইহাব ভিত্তি বহিযাছে ঊর্ধ্বে অনন্তের পবম পদের মধ্যে। ইহাব মূল তত্ত্ব হইতেছে পুরাণী চিবন্তনী কর্মপ্রবৃত্তি, তাহা চিবকাল সকল সৃষ্টিব আদি পুরুষ হইতে নিঃসৃত হইতেছে, তাহার আরম্ভ নাই শেষ নাই, আদ্যম্ পুরুষম্ যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা পুবাণী। অতএব ইহার আদি মূল রহিয়াছে কালের ঊর্ধ্বে শাশ্বতেব মধ্যে, কিন্তু ইহাব শাখাসকল নীচের দিকে বিস্তৃত এবং ইহাব অন্যান্য শিকডগুলিকে ইহা এখানে নীচের দিকে মনুষ্যলোকে প্রসাবিত ও অনুপ্রবিষ্ট কবিতেছে, এইসব শিকড হইতেছে সুদৃঢ় ও দুশ্ছেদ্য আসক্তি ও কামনা এবং তাহাদেব ফলস্বরূপ আবও অধিক কামনা এবং অন্তহীন ক্রমবর্ধমান কর্মধাবা। বেদের ছন্দসকল ইহাব পত্রনিচয়ের সহিত উপমিত হইয়াছে এবং যে মনুষ্য এই বিশ্ববৃক্ষকে জানে সেই বেদবিৎ। আমরা বেদ সম্বন্ধে অন্তত বেদবাদ সম্বন্ধে যে নিন্দাসূচক মতবাদ প্রথমেই আলোচনা করিয়াছি, এখানে তাহাব তাৎপর্য বুঝা যাইতেছে। কাবণ বেদ আমাদিগকে যে জ্ঞান দেয তাহা হইতেছে দেবতাদেব সম্বন্ধে জ্ঞান, বিশ্বেব তত্ত্ব ও শক্তিসকলের জ্ঞান এবং ইহাব ফল হইতেছে কামনাব সহিত যে যজ্ঞ কবা যায তাহাবই ফল, ত্রিভুবনে, মর্ত্যে, স্বর্গে ও মধ্যলোকে ভোগ ও ঐশ্বর্যরূপ ফল। এই বিশ্ববৃক্ষেব শাখাসকল ঊর্ধ্বে ও নিম্নে উভয়দিকেই বিস্তৃত, নিম্নে জড়জগতেব মধ্যে, ঊর্ধ্বে অতিভৌতিক লোকসকলেব মধ্যে, তাহাবা প্রকৃতিব গুণসকলেব দ্বারা বর্ধিত হয, কারণ গুণত্রয়ই বেদের সমগ্র বিষযবস্তু, ত্রৈগুণ্যবিষযাঃ বেদাঃ। বেদের ছন্দসকল হইতেছে পত্রনিচয এবং বিধিপূর্বক যজ্ঞানুষ্ঠানেব দ্বাবা যে ভোগ্য বিষযসকল পূর্ণভাবে প্রাপ্ত হওযা যায়, তাহারা নিত্যমঞ্জবিত নবপল্লব। অতএব যতদিন মানুষ গুণসকলেব ক্রিযা উপভোগ কবে এবং বাসনাতে আসক্ত থাকে, ততদিন সে প্রবৃত্তির জালে, জন্ম ও কর্মেব চক্রে আবদ্ধ থাকে, অনববত পৃথিবী ও মধ্যলোক ও স্বর্গলোক এই সবেব মধ্যেই ঘুবিতে থাকে, পবন্তু তাহাব পবম অধ্যাত্ম আনন্ত্যেব মধ্যে ফিরিযা যাইতে পাবে না। ঋষিগণ ইহা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। মুক্তিলাভের জন্য তাঁহারা ধবিযাছিলেন নিবৃত্তিমার্গ, অর্থাৎ আদি কর্মপ্রেরণার বিরতি এবং এই নিবৃত্তিমার্গেব পবিণতি হইতেছে জন্মেবই অবসান এবং শাশ্বতের উচ্চতম বিশ্বাতীত পদেব মধ্যে লোকোত্তব গতি লাভ। কিন্তু ইহাব জন্য প্রয়োজন হইতেছে, দৃঢ় অনাসক্তি অসিব দ্বাবা এই সকল সুদৃঢ় বাসনামূলকে ছেদন কবা এবং তাহার পব সেই পবম পদ অন্বেষণ কবা, যে পদ একবাব লাভ কবিতে পাবিলে পুনরায আর মর্ত্যজীবনেব মধ্যে ফিবিবাব কোনই বাধ্যতা থাকে না। এই নীচের মাযাব মোহ হইতে মুক্ত হওযা, অহংভাবশূন্য হওযা, আসক্তিরূপ মহাদোষকে জয করা, সকল কামনাকে বিশেষভাবে নিবৃত্ত কবা, সুখ ও দুঃখেব দ্বন্দ্ব বর্জন করা, শুদ্ধ অধ্যাত্ম চেতনায় সর্বদা দৃঢনিষ্ঠ থাকা—এই সকল ধাপই সেই পরম অনন্তেব মধ্যে যাইবাব পন্থা। সেখানে আমবা পাই সেই কালাতীত

সত্তাকে যাহা সূর্য, চন্দ্র বা অগ্নির দ্বারা উদ্ভাসিত নহে, পরন্তু নিজেই শাশ্বত পুরুষেব জ্যোতি। বেদান্তেব কথা—আমি ফিবিয়া চলিযাছি শুধু সেই আদিপুরুষেব সন্ধান করিতে এবং মহান পন্থায় তাঁহাকে লাভ করিতে। ঐটিই পুরুষোত্তমেব উচ্চতম পদ, তাঁহাব বিশ্বাতীত স্থিতি।

কিন্তু মনে হইতে পারে যে, ইহা সন্ন্যাসের নিষ্ক্রিযতাব দ্বাবাই বেশ লাভ কবা যায, এমনকি উৎকৃষ্টভাবে, বিশিষ্টভাবে সাক্ষাৎভাবেই লাভ করা যায়। অক্ষবেব পথই ইহাব নির্দিষ্ট পথ বলিয়া মনে হয, সম্পূর্ণভাবে কর্ম ও জীবন পরিত্যাগ, সন্ন্যাসীব নির্জনতা, সন্ন্যাসীব নিষ্ক্রিযতা। এখানে কর্মের আদেশ দিবার স্থান কোথায, অন্তত তাহার প্রেবণা কোথায, প্রয়োজন কোথায? আর এসবের সহিত লোকসংগ্রহ, কুরুক্ষেত্রেব বক্তপাত, কালপুরুষের প্রবৃত্তি, লক্ষশরীব বিশ্বপুরুষ এবং তাঁহাব উদাত্ত আদেশ—"উঠ, শত্রুগণকে জয কর, সমৃদ্ধিশালী রাজ্যভোগ কব"—এসবেব কি সম্বন্ধ? আব প্রকৃতির মধ্যে যে পুরুষ ইনিই বা কি? এই যে পুরুষ, এই ক্ষর, আমাদেব পবিবর্তনময় জীবনের ভোক্তা—ইনিও পুরুষোত্তম; ইনি হইতেছেন তিনিই, তাঁহাবই শাশ্বত বহু রূপে পুরুষোত্তম, ইহাই গীতাব উত্তর। "আমাবই সনাতন অংশ জীবলোকে জীবরূপে আবির্ভূত হয়।"[১] এই কথাটি, এই বিশেষণটি সাতিশয অর্থপূর্ণ এবং প্রয়োজনীয়। কাবণ ইহা হইতে বুঝা যায় যে, প্রত্যেক জীব, প্রত্যেক সত্তা তাহাব অধ্যাত্ম সত্যে স্বয়ং ভগবানই, প্রকৃতির মধ্যে তাহাব দ্বারা ভগবানেব প্রকাশ বস্তুত যতই আংশিক হউক না কেন। আর কথাব যদি কোনও অর্থ থাকে তাহা হইলে ইহার দ্বারা আবও বুঝায যে, প্রত্যেক প্রকাশশীল পুরুষ, বহু জীবেব প্রত্যেক জীবই হইতেছে এক একটি শাশ্বত ব্যক্তি, একমেবাদ্বিতীযম্ সত্তাব এক শাশ্বত অজাত অমৃত শক্তি। এই প্রকাশশীল পুরুষকে আমবা জীব নামে অভিহিত কবি, কাবণ ইহা এখানে এই জীবজগতে একটি জীবন্ত সত্তারূপে প্রতীযমান হয় এবং মানুষেব মধ্যে এই আত্মাকে আমরা মানবাত্মা বলিযা থাকি এবং তাহাব মানবধর্মটিই অনুধাবন কবি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা ইহাব আপাতদৃশ্য রূপ হইতে মহত্তব বস্তু এবং ইহার মানবতাব মধ্যেই সীমাবদ্ধ নহে। অতীতে ইহাব প্রকাশ মানুষ অপেক্ষাও ন্যূন ছিল, ভবিষ্যতে ইহা মননশীল মানুষ অপেক্ষা অনেক বড় কিছু হইতে পাবে। আব যখন এই জীব সকল অজ্ঞানেব সীমাব উপবে উঠে, তখন সে তাহার দিব্য প্রকৃতি প্রাপ্ত হয়, তাহাব মানবত্ব ঐ দিব্য প্রকৃতির কেবল সাময়িক আচ্ছাদন, উহার সার্থকতা আংশিক ও অসম্পূর্ণ। ব্যষ্টিগত জীব ঊর্ধ্বে শাশ্বতের মধ্যে আছে এবং চিরদিনই ছিল, কাবণ উহা নিজে সনাতন। এই জন্যই গীতা এমন কোন কথা কোথাও বলে নাই যাহা হইতে আদৌ মনে হইতে পারে যে, জীব সম্পূর্ণভাবে লযপ্রাপ্ত হয়,

[১] মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।
মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিযাণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি॥১৫।৭

পরন্তু গীতা বলিযাছে, জীবেব পক্ষে পবম পদ হইতেছে পুরুষোত্তমেব মধ্যে বাস করা, নিবসিষ্যসি মযেব। গীতা যখন সর্বভূতেব এক আত্মাব কথা বলিতেছে তখন মনে হইতে পারে যে, গীতা অদ্বৈতবাদেব ভাষা ব্যবহাব কবিতেছে, কিন্তু শাশ্বত জীবের (মমৈবাংশঃ সনাতনঃ) নিত্য সত্য তাহাতে এমন একটি বিশেষণ যোগ কবিযা দিতেছে, মনে হয গীতা প্রায বিশিষ্টাদ্বৈতবাদই স্বীকাব কবিতেছে—তবে ইহা হইতেই একেবাবে এমন সিদ্ধান্তে উপনীত হওযা ঠিক হইবে না যে, কেবল এইটিই হইতেছে গীতার দার্শনিক তত্ত্ব অথবা ইহা পববর্তী বামানুজ মতেব সহিত এক। তথাপি এইটুকু খুবই স্পষ্ট যে, এক অদ্বিতীয ভাগবত সত্তাব মধ্যেই একটি বহুত্বের তত্ত্ব বহিয়াছে, তাহা শুধু মাযা নহে, তাহা শাশ্বত ও সত্য।

এই সনাতন জীব ভাগবত পুরুষ হইতে অন্য কিছু নহে অথবা তাঁহা হইতে বস্তুত পৃথকও নহে। ঈশ্বর নিজেই তাঁহাব একত্বেব অন্তর্নিহিত শাশ্বত বহুত্বেব দ্বারা (সকল সৃষ্টিই কি অনন্তেব এই সত্যেবই প্রকাশ নহে?) আমাদেব মধ্যে অমব আত্মারূপে চিরবিবাজমান বহিযাছেন, এই দেহ পবিগ্রহ কবিযাছেন এবং যখন এই অস্থাযী গৃহ পবিত্যক্ত হইযা পঞ্চভূতে মিশিযা যাইতেছে তখন এখান হইতে চলিয়া যাইতেছেন। মন ও ইন্দ্রিযসকলের বিষযসমূহ উপভোগ কবিবাব জন্য তিনি প্রকৃতিব আন্তরিক শক্তি মন ও পঞ্চেন্দ্রিযকে সঙ্গে কবিযা লইযা আসিতেছেন এবং তাহাদের বিকাশ কবিতেছেন,[১] এবং যাইবাব সমযেও বাযু যেমন পুষ্পমাত্র হইতে গন্ধকে লইযা যায সেইরূপ সেই সবকে সঙ্গে কবিয়া লইযা যাইতেছেন। কিন্তু পবিবর্তনমযী প্রকৃতিব মধ্যে ঈশ্বব ও জীবেব অভিন্নতা আমাদেব কাছে বাহ্যদৃশ্যের দ্বাবা আচ্ছাদিত থাকে এবং প্রকৃতিব গতিশীল ভ্রান্তিসকলেব ভিড়ের মধ্যে হারাইযা যায়। আব যাহাবা প্রকৃতিব রূপসকলেব দ্বারা, মানবতা বা অন্য কোন রূপেব দ্বাবা নিজদিগকে নিযন্ত্রিত হইতে দেয়, তাহাবা কখনই ইহাকে দেখিতে পাইবে না, তাহাবা উপেক্ষা কবিবে, মানবতনু-আশ্রিত ভগবানকে অবজ্ঞা কবিবে। তিনি যখন আসিতেছেন বা যাইতেছেন অথবা অবস্থান করিতেছেন, ভোগ কবিতেছেন, গুণান্বিত হইতেছেন, তখন তাহাদের অজ্ঞান তাঁহাকে দেখিতে পাইবে না, কেবল দেখিবে সেখানে মন ও ইন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষগোচব কি বহিয়াছে, সেই মহত্তব সত্যকে দেখিতে পাইবে না যাহা শুধু জ্ঞানচক্ষুর দ্বাবাই পবিলক্ষিত হইতে পাবে।[২] তাহাবা কখনও তাঁহাব দর্শন পাইবে না, সেজন্য যত্ন কবিলেও দর্শন পাইবে না, যতক্ষণ না তাহাবা বাহ্য

[১] শরীরং যদবাপ্নোতি যচ্চাপ্যুৎক্রামতীশ্বরঃ।
গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বাযুর্গন্ধানিবাশযাৎ॥
শ্রোত্রং চক্ষুঃ স্পর্শনঞ্চ রসনং ঘ্রাণমেব চ।
অধিষ্ঠায মনশ্চাযং বিষযানুপসেবতে॥১৫।৮-৯

[২] উৎক্রামন্তং স্থিতং বাপি ভুঞ্জানং বা গুণান্বিতম্।
বিমূঢা নানুপশ্যন্তি পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুষঃ॥১৫।১০

চৈতন্যে প্রতিবন্ধক সকলকে দূর কবিযা দিতেছে এবং নিজেদের মধ্যে অধ্যাত্মসত্তাকে গড়িযা তুলিতেছে, নিজেদেব প্রকৃতির মধ্যেই যেন তাহাব জন্য রূপ সৃষ্টি কবিতেছে। নিজেকে জানিতে হইলে মানুষকে হইতে হইবে কৃতাত্মা, অধ্যাত্ম ছাঁচে নির্মিত ও পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইতে হইবে, অধ্যাত্ম দৃষ্টিতে জ্ঞানময হইতে হইবে। আমবা স্বরূপত যে ভাগবত পুরুষ, জ্ঞানচক্ষুসম্পন্ন যোগিগণ নিজেদেব অন্তহীন সত্তাব মধ্যে, নিজেদেব আত্মাব আনন্ত্যেব মধ্যে তাঁহাকে দেখিতে পান। জ্ঞানালোকিত তাঁহাবা নিজেদেব মধ্যেই ঈশ্বরকে দেখিতে পান এবং স্থূল ভৌতিক রূপেব বন্ধন হইতে, মানস ব্যক্তিত্বেব রূপ হইতে, অনিত্যপ্রাণের রূপ হইতে মুক্ত হন, তাঁহাবা আত্মাব সত্যে অমব হইয়া বাস করেন। কিন্তু তাঁহারা তাঁহাকে শুধু নিজেদেব মধ্যেই দেখেন না, পবন্তু সকল বিশ্বেব মধ্যে দেখেন। যে সূর্যের জ্যোতি সমগ্র জগৎকে উদ্ভাসিত কবিতেছে, তাহাব মধ্যে তাঁহারা আমাদেব অন্তর্বাসী ভগবানেবই জ্যোতি দেখিতে পান, চন্দ্রে যে জ্যোতি, অগ্নিতে যে জ্যোতি তাহা ভগবানেবই জ্যোতি।[১] ভগবানই পৃথিবীতে প্রবেশ করিয়াছেন, তিনিই ইহার জড় শক্তিব আত্মা এবং তাঁহাব শক্তিব দ্বাবা যাবতীয বস্তুসকলকে ধবিযা বহিযাছেন। ভগবানই সোমদেবতা, তিনি ধবিত্রীমাতাব রসের দ্বারা লতাবৃক্ষকে পুষ্ট কবিতেছেন এবং তাহাকে শস্যশ্যামলা কবিতেছেন। যে প্রাণবহ্নি প্রাণিগণের স্থূল ভৌতিক শবীবকে বক্ষা করিতেছে এবং ইহার খাদ্যকে পবিপাক করিয়া তাহাদেব প্রাণশক্তিকে পুষ্ট কবিতেছে, তাহা ভগবান ব্যতীত আর কিছুই নহে। তিনি সকল জীবেব হৃদযে অধিষ্ঠিত, তাঁহা হইতেই স্মৃতি, জ্ঞান, বিচাব বিতর্ক। তিনিই সেই বস্তু যাহাকে সকল বেদেব দ্বাবা এবং সর্ববিধ জ্ঞানেব দ্বাবা অবগত হওয়া যায়; তিনিই বেদেব জ্ঞাতা, তিনিই বেদান্তেব বচযিতা। অন্য কথায়, ভগবান একই সঙ্গে জড়েব আত্মা, প্রাণেব আত্মা, মনেব আত্মা, আবার যে অতিমানস বিজ্ঞান জ্যোতি মন ও সীমাবদ্ধ তর্কবুদ্ধিব অতীত তিনি তাহারও আত্মা।

এইভাবে ভগবান তাঁহাব যুগ্ম আত্মারূপ বহস্যে, যুগ্ম শক্তিরূপে আবির্ভূত, দ্বৌ ইমৌ পুরুষৌ, একই সঙ্গে তিনি এই পরিবর্তনময় সর্বভূতের আত্মাকে ধবিয়া

[১] যতন্তো যোগিনশ্চৈনং পশ্যন্ত্যাত্মন্যবস্থিতম্।
যতন্তোঽপ্যকৃতাত্মানো নৈনং পশ্যন্ত্যচেতসঃ॥১৫।১১
যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ভাসযতেঽখিলম্।
যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তত্তেজো বিদ্ধি মামকম্॥
গামাবিশ্য চ ভূতানি ধাবযাম্যহমোজসা।
পুষ্ণামি চৌষধীঃ সর্বাঃ সোমো ভূত্বা বসাত্মকঃ॥
অহং বৈশ্বানবো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ।
প্রাণাপানসমাযুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুর্বিধম্॥
সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনঞ্চ।
বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যো বেদান্তকৃদ্বেদবিদেব চাহম্॥১৫।১২-১৫

রহিয়াছেন, ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি, আবাব যে অপরিবর্তনীয আত্মা তাহাদেব উর্ধ্বে তাঁহার শাশ্বত নীরবতা ও শান্তিব অক্ষুব্ধ অচলতায বিবাজ কবিতেছে তাহাকেও ধরিয়া রহিয়াছেন।[১] মানুষের মন ও হৃদয ও ইচ্ছাশক্তির মধ্যে যে ভাগবত সত্তা রহিয়াছে তাহারই শক্তিতে ইহারা এই দুই পুরুষের দ্বাবা বিভিন্ন দিকে প্রবলভাবে আকর্ষিত হয়, মনে হয় যেন এই আকর্ষণ পরস্পরেব বিবোধী ও বিসদৃশ, পরস্পরকে বিনষ্ট করিতেই চাহিতেছে। কিন্তু ভগবান কেবলই ক্ষর নহেন, কেবলই অক্ষরও নহেন। তিনি অক্ষর আত্মা হইতে মহত্তর আবাব পবিবর্তনশীল জিনিসসকলের আত্মা হইতে আরও বেশী মহত্তব। তিনি যে একই সঙ্গে দুইই হইতে পাবেন তাহাব কারণ তিনি তাহাদেব হইতে ভিন্ন, অন্য, তিনি সকল বিশ্বেব উর্ধ্বে পুরুষোত্তম, অথচ তিনি জগতে ব্যাপ্ত হইযা বহিযাছেন, বেদে ব্যাপ্ত হইযা রহিয়াছেন, আত্মজ্ঞানে ব্যাপ্ত হইয়া রহিযাছেন, বিশ্ব-উপলব্ধিতে ব্যাপ্ত হইযা রহিয়াছেন। আর যে এইভাবে তাঁহাকে পুরুষোত্তম বলিয়া জানে ও দেখে, সে আর জগতের বাহ্য দৃশ্যে বা এই দুইটি আপাতবিবোধী সত্তাব পৃথক আকর্ষণে বিমূঢ় হইয়া পড়ে না। সেই জ্ঞানীব মধ্যে এই দুইটি প্রথমে পবস্পবেব সম্মুখীন হয়, একটি বিশ্বকর্মেব প্রবৃত্তিরূপে, আর একটি আত্মাব মধ্যে নিবৃত্তিরূপে, কোন কর্মের সহিত এই আত্মার কোন সম্পর্ক নাই, সকল কর্ম প্রকৃতিব অজ্ঞানেব, অথবা শুধু এইরূপ বলিয়াই মনে হয়। অথবা তাহাবা তাঁহাব চৈতন্যেব সম্মুখে বিরোধী দাবি লইয়া উপস্থিত হয়, একটি শুদ্ধ, অনির্দেশ্য, অবিচল, শাশ্বত, স্বপ্রতিষ্ঠ সৎরূপে, আর একটি ইহার বিপবীত অসৎরূপে—ক্ষণস্থাযী গঠন ও সম্বন্ধ, ভাব ও রূপ, নিত্য পরিবর্তনশীল সম্ভূতি ও সৃজন এবং লয়কাবী কর্ম ও বিবর্তনের জাল, জন্ম ও মৃত্যু, আবির্ভাব ও তিরোভাব এই সবেব জগৎ রূপে। তিনি তাহাদিগকে আলিঙ্গন করিযা অতিক্রম কবেন, তাহাদেব বিরোধেব সমন্বয করেন এবং বিশ্ববেত্তা সর্ববিদ হন। তিনি আত্মা ও ভূতসকলের সমুদয অর্থটি দেখিতে পান; তিনি ভগবানের অখণ্ড সত্তাকে, সমগ্রম্ মাম্, পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন, তিনি ক্ষর ও অক্ষরকে পুরুষোত্তমের মধ্যে মিলিত করেন। যিনি তাঁহার ও সর্বভূতের পরম আত্মা, তাঁহার ও সকল শক্তিব এক অদ্বিতীয় অধীশ্বব, জগতেব মধ্যে ও বাহিবে নিকট ও দূর শাশ্বত সত্তা, তাঁহাকে তিনি ভালবাসেন, পূজা

[১] দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষবশ্চাক্ষব এব চ।
ক্ষবঃ সর্ব্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষব উচ্যতে॥
উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পবমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।
যো লোকত্রযমাবিশ্য বিভর্ত্যব্যয ঈশ্বরঃ॥
যস্মাৎ ক্ষবমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ।
অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ॥
যো মামেবমসংমূঢো জানাতি পুরুষোত্তমম্।
স সর্ব্ববিদ্ ভজতি মাং সর্ব্বভাবেন ভাবত॥১৫।১৬-১৯

কবেন, দৃঢনিষ্ঠাব সহিত অবলম্বন করেন, ভজনা করেন। আব তিনি ইহা করেন তাঁহাব শুধু কোন একটি দিক বা অংশের দ্বারা নহে, কেবল অধ্যাত্মভাবাপন্ন মনের দ্বারাই নহে, কেবল প্রগাঢ কিন্তু অনুদাব হৃদয়েব প্রখর আলোকেই নহে অথবা কেবল কর্মেব ভিতব সঙ্কল্পেব অভীপ্সাব দ্বাবাই নহে, পবন্তু তাঁহাব সত্তা ও তাঁহার সম্ভূতিব, তাঁহাব আত্মা ও তাঁহাব প্রকৃতির সমস্ত পূর্ণ সম্বুদ্ধ ক্রিয়ার দ্বারা। তাঁহার অবিচল স্বপ্রতিষ্ঠ সত্তাব সমতায তিনি ভাগবত এবং সকল বস্তু, সকল জীবের সহিত এক, তিনি সেই সীমাহীন সমতাকে, সেই গভীর ঐক্যকে তাঁহাব মন, হৃদয, প্রাণ ও দেহের মধ্যে নামাইয়া আনেন এবং তাহার উপরে দিব্য প্রেম, দিব্য কর্ম, দিব্য জ্ঞান এই ত্রি-সত্যকে অবিভাজ্য সমগ্রতায় প্রতিষ্ঠিত করেন। ইহাই গীতাপ্রদর্শিত মুক্তিব পন্থা।

আব বস্তুত এইটিই কি প্রকৃত অদ্বৈত নহে, যাহা এক অদ্বিতীয সত্তাব মধ্যে এতটুকুও বিভেদ কবে না? এই যে আত্যন্তিক ভেদশূন্য অদ্বৈতবাদ, ইহা প্রকৃতিব বহুব মধ্যেই সকলভাবে এককে এক বলিযাই দেখে, যে পবম সত্য বিশ্বাতীত সত্তা আত্মাব মূল এবং বিশ্বেব সত্য তাহাব মধ্যে যেমন এককে এক বলিয়া দেখে তেমনই আত্মাব সত্তাব এবং বিশ্বেব সত্তার মধ্যেও দেখে এবং উহা কি বিশ্ব প্রবৃত্তি, কি বিশ্বেব নিবৃত্তি বা পবম নিবৃত্তি কিছুবই দ্বারা সীমাবদ্ধ নহে। অন্তত ইহাই হইতেছে গীতাব অদ্বৈত। গুরু অর্জুনকে বলিলেন, এইটিই গুহ্যতম শাস্ত্র, এইটিই পবম শিক্ষা ও বিদ্যা ইহাই আমাদিগকে উচ্চতম জগৎ রহস্যের অন্তঃস্থলে লইযা যাইতে পাবে।[১] এইটিকে পূর্ণভাবে অবগত হওযা, জ্ঞানে অনুভবে শক্তিতে উপলব্ধিতে ইহাকে অধিকাব কবা—ইহাই হইতেছে রূপান্তরিত বুদ্ধিতে সিদ্ধিলাভ কবা, হৃদযে দিব্যভাবে পবিতৃপ্ত হওযা এবং ইহাই হইতেছে সকল সঙ্কল্প, ক্রিয়া ও কর্মেব পবম অর্থ ও লক্ষ্যে কৃতকার্য হওয়া। অমৃতত্ব লাভ কবিবার, উচ্চতম ভাগবত প্রকৃতিব অভিমুখে উঠিবাব, শাশ্বত ধর্মে প্রতিষ্ঠিত হইবাব ইহাই পন্থা।

[১] ইতি গুহ্যতমং শাস্ত্রমিদমুক্তং মযানঘ।
এতদবুদ্ধা বুদ্ধিমান্ স্যাৎ কৃতকৃত্যশ্চ ভাবত॥১৫।২০

ষোড়শ অধ্যায়

অধ্যাত্ম কর্মের পরিপূর্ণতা

গীতার চিন্তাধাবার বিকাশ এখন এমন এক স্থলে আসিযা পৌঁছিযাছে যে এখন কেবল একটি প্রশ্নেব সমাধান বাকী বহিয়াছে—প্রশ্নটি হইতেছে আমাদেব বদ্ধ অপূর্ণ প্রকৃতির, কেমন কবিযা ইহা শুধু মূলত নহে পবন্তু ইহাব প্রত্যেক ক্রিয়ায় নীচেব সত্তা হইতে ঊর্ধ্বেব সত্তায বিকাশ লাভ কবিবে, তাহাব বর্তমান ক্রিয়ার ধর্ম হইতে উঠিযা শাশ্বত ধর্মে গডিযা উঠিবে। এই সমস্যাটি গীতাব কয়েকটি সিদ্ধান্তেব মধ্যেই অনুস্যূত বহিযাছে, কিন্তু এখন সেটিকে অধিকতব স্পষ্ট কবিযা আমাদেব বুদ্ধিব সম্মুখে ধবা আবশ্যক। তৎকালে মনস্তত্ত্বেব যে জ্ঞান পরিচিত ছিল, গীতা তাহা ধরিয়া লইয়াই অগ্রসব হইযাছে এবং সেইজন্য তাহাব চিন্তাধারার বিকাশ করিতে এমন অনেক কথাই সে সংক্ষেপে সাবিতে পাবিযাছে, ধরিয়া লইয়াছে বা একেবারেই বাদ দিয়াছে যেগুলি আমাদিগকে খুব স্পষ্ট কবিযা ব্যক্ত কবিতে হইবে, সুনির্নীত কবিতে হইবে। ইহাব শিক্ষা প্রথমেই আমাদেব জাগতিক কর্মেব জন্য এক নূতন উৎস, নূতন প্রতিষ্ঠাব প্রস্তাব কবিযাছে; উহাই আবম্ভ এবং শেষও হইযাছে উহাকে ধবিয়াই। ঠিক মোক্ষলাভেব কোন পন্থা নির্দেশ করা গীতাব গোড়ায় লক্ষ্য ছিল না, সে লক্ষ্য ছিল মুক্তিসাধনাব সহিত কর্মেব সামঞ্জস্য দেখান এবং অধ্যাত্ম মুক্তিলাভেব পবও তাহাব সহিত জাগতিক কর্মেব সামঞ্জস্য দেখান, মুক্তস্য কর্ম্ম। প্রসঙ্গক্রমে অধ্যাত্মমুক্তি ও সিদ্ধিলাভেব একটি সমন্বযমূলক যোগ বা অন্তব-বৃত্তিগত সাধনাব বিকাশ কবা হইযাছে এবং এই যোগের ভিত্তিস্বরূপ কযেকটি তাত্ত্বিক সিদ্ধান্তেব, আমাদেব সত্তা ও প্রকৃতিব কয়েকটি সত্যেব, অবতারণা কবা হইযাছে। কিন্তু মূল লক্ষ্যটি, অর্জুনেব সেই মূল বাধা ও সমস্যাটি ববাবরই স্মবণে রহিয়াছে। অর্জুনের হৃদয মন বিদ্রোহী হওযায তিনি কর্মের প্রচলিত স্বাভাবিক ও যুক্তিসম্মত ভিত্তি ও আদর্শ হইতে চ্যুত হইযা পড়িয়া কর্মেব এক নূতন ও সন্তোষজনক অধ্যাত্মনীতিব সন্ধান চাহিযাছেন, মানুষেব গতানুগতিক যুক্তি এবং প্রকৃতিব আংশিক সত্যসকল অনুসবণ কবিযা তিনি আব কর্ম করিতে পারেন না, তাই তিনি জানিতে চাহিযাছেন কেমন কবিযা আত্মার সত্যের মধ্যে বাস কবা যায, অথচ কুরুক্ষেত্রেব যুদ্ধে তাহাব উপব যে কর্মের ভার পড়িয়াছে তাহা তিনি সম্পাদন কবিতে পাবেন। নৈর্ব্যক্তিক ও বিশ্বগত আত্মাব নিস্তব্ধতার মধ্যে শান্ত, অনাসক্ত, নিস্তব্ধ হইয়া থাকিতে হইবে, অথচ কর্মময়ী প্রকৃতিব কর্মসকল সুসম্পন্ন কবিতে হইবে এবং আবও উদাবভাবে আমাদের অন্তরস্থিত শাশ্বত ভগবানেব সহিত এক হইতে হইবে এবং জগতে তাঁহাব সমস্ত ইচ্ছা সম্পন্ন করিতে হইবে, উন্নীত, মুক্ত বিশ্ব-প্রসাবিত ব্যক্তিক

প্রকৃতিব বিশুদ্ধ শক্তি ও দিব্য ঊর্ধ্ব স্থিতিব ভিতব দিযা সেই ভাগবত ইচ্ছা কার্য কবিবে—ইহাই গীতাব সমাধান।

এখন দেখা যাউক সবলতম, স্পষ্টতম ভাষায ইহার অর্থ কি, অর্জুনেব সংশয় ও বিদ্রোহেব মূলে যে সমস্যাটি বহিযাছে তাহার কি সমাধান এখানে পাওযা যাইতেছে। একজন মানুষরূপে, একটি সামাজিক জীবরূপে তাঁহার কর্তব্য হইতেছে ক্ষত্রিযেব মহান কার্য সম্পন্ন কবা, নতুবা সমাজেব কাঠামো ভাঙ্গিয়া পডিবে, জাতিধর্মসকল লুপ্ত হইবে, অত্যাচাব, অনাচার, অবিচারের বিপ্লবী প্রচণ্ডতাব বিরুদ্ধে ন্যায ও সুবিচাবেব সুসমঞ্জস শৃঙ্খলা বক্ষা কবা সম্ভব হইবে না। অথচ শুধু কর্তব্যেব প্রেবণাই এই যুদ্ধেব প্রধান নাযককে আর সন্তুষ্ট কবিতে পাবিতেছে না, কাবণ কুরুক্ষেত্রে ভীষণ বাস্তবতাব মধ্যে তাহা অতি রূঢ সংশয়পূর্ণ দুর্বোধ্য রূপ লইযা উপস্থিত হইযাছে। তাঁহাব সামাজিক কর্তব্য পালনেব অর্থ সহসা এইরূপ দাঁডাইযাছে যে, তাঁহাকে বিবাট পাপ, দুঃখ, যন্ত্রণারূপ পবিণামে সম্মতি দিতে হইবে, সামাজিক শৃঙ্খলা ও ন্যায বক্ষাব প্রচলিত পদ্ধতিগুলিই সেসবেব পবিবর্তে বিষম বিশৃঙ্খলা ও সংপ্লবেব সৃষ্টি করিতে চলিয়াছে। ন্যায়সঙ্গত দাবি ও স্বার্থেব যে নীতি, যাহাকে আমবা ন্যায্য অধিকার বলিয়া অভিহিত করি, তাহা হইতে তাঁহাব আব কোন সাহায্যই হইতেছে না, কারণ যুদ্ধ কবিযা নিজের জন্য, নিজেব ভ্রাতা, নিজেব পক্ষেব জন্য তাঁহাকে যে বাজ্য জয কবিতে হইবে তাহা ন্যাযত তাঁহাদেবই, সে অধিকাব বজায বাখাব অর্থ আসুবিক অত্যাচাব দমন কবা, ন্যায ধর্মেব প্রতিষ্ঠা কবা, কিন্তু সে ন্যায় ধর্ম হইতেছে রক্তাক্ত এবং সে রাজ্য হইবে দুঃখেব বাজ্য, তাহাব উপর এক মহাপাপেব, সমাজেব এক মহান অনিষ্টের, জাতিব প্রতি এক গুরু অপবাধেব কলঙ্ক অঙ্কিত থাকিবে। আর ধর্মেব অনুশাসন, নীতিব দাবি হইতেও যে তিনি বেশী কিছু সাহায্য পাইবেন তাহাও নহে কারণ এখানে ধর্মে ধর্মে বিবোধ ঘটিতেছে। এই সমস্যার সমাধান করিতে হইলে চাই এক নূতন, এক মহত্তব অথচ এ পর্যন্ত অনাবিষ্কৃত নীতি, কিন্তু সে নীতি কি?

তাঁহাব কর্ম হইতে সবিযা দাঁডানো, সাধুজনোচিত নিষ্ক্রিয়তাব আশ্রয লওয়া, এবং এই যে অপূর্ণ জগতে কর্মেব উদ্দেশ্য ও উপাযসকল সন্তোষজনক নহে ইহাকে নিজেব ভাগ্যের উপর ছাড়িযা দেওযা—ইহা একটি সম্ভব সমাধান, সহজেই কার্যে পবিণত কবা যায, সহজেই অবধাবণ কবা যায, কিন্তু ঠিক এই সহজ সমাধানটিই গুরু পুনঃপুনঃ নিষেধ কবিযাছেন। জগতের যিনি ঈশ্বব তিনি মানুষেব নিকট কর্ম চান, তিনিই তাঁহাব সকল কর্মেব অধীশ্বব, তাঁহার এই জগৎ হইতেছে কর্মেব ক্ষেত্র, সে কর্ম মানুষ অহংভাবেব বশে কবিতে পারে, অথবা সীমাবদ্ধ মানবীয বুদ্ধিব অজ্ঞানে বা আংশিক আলোকে কবিতে পারে, অথবা তাহা সাক্ষাৎ জ্ঞান ও প্রেবণাব এক উচ্চতব ও ব্যাপকতর দৃষ্টিসম্পন্ন স্তব হইতে অনুপ্রেবিত হইতে পাবে। আবাব এই বিশেষ কর্মটিকে অশুভ বলিয়া পবিত্যাগ কবাও আব এক প্রকাব সমাধান হইতে পাবে, অদূরদর্শী নীতিপবাযণ মানুষ

এইরূপ সমাধান গ্রহণ করিতেই তৎপর; কিন্তু এইভাবে এড়াইবার চেষ্টাও গুরু অনুমোদন করেন নাই। অর্জুন যদি বিরত হন তাহা হইলে আরও বেশী পাপ ও অশুভ সংঘটিত হইবে, তাঁহার বিরতির যদি কোন ফল হয় তো ইহাই হইবে যে, অন্যায় ও অত্যাচার জয়ী হইবে, ভাগবত কর্মের যন্ত্ররূপে তাঁহার নিজের যাহা ব্রত তাহা প্রত্যাখ্যান করা হইবে। জাতির ভাগ্য নির্ণয়ে এক দারুণ সন্ধিক্ষণ আবির্ভূত হইয়াছে, অন্ধশক্তির ক্রিয়া দ্বারা নহে, অথবা কেবলমাত্র মানুষের ভাবনা, স্বার্থ, উন্মাদনা, অহঙ্কারের বিশৃঙ্খল সংঘাত দ্বারাও নহে, পরন্তু এই সকল বাহ্যদৃশ্যের পশ্চাতে যে ঐশী ইচ্ছা রহিয়াছে তাহারই দ্বারা। এই সত্যটি অর্জুনকে দেখাইয়া দিতে হইবে; তাঁহার ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত বাসনা এবং দুর্বল মানবীয় বিরাগসকলের যন্ত্ররূপে নহে, পরন্তু এক বিশালতর ও অধিকতর জ্যোতিষ্মান শক্তির, এক মহত্তর, সর্ববিৎ, দিব্য ও বিশ্বব্যাপী ইচ্ছার যন্ত্ররূপে নৈর্ব্যক্তিকভাবে, অবিচলিতভাবে কর্ম-করা তাঁহাকে শিখিতে হইবে। আন্তর ও বাহ্য ভগবৎসত্তার সহিত তাঁহার অন্তরপুরুষকে মহাযোগে যুক্ত করিয়া তাঁহার নিজের যে পরম আত্মা এবং বিশ্বের অনুপ্রেরক আত্মা তাহার সহিত শান্ত যোগে নৈর্ব্যক্তিকভাবে এবং বিশ্বজনীনভাবে তাঁহাকে কর্ম করিতে হইবে।

কিন্তু এই সত্যকে ঠিকমত দেখিতে পারা যায় না এবং এইপ্রকার কর্ম ঠিকমত অনুষ্ঠান করা যায় না, বাস্তব হইয়া উঠে না যতক্ষণ মানুষ অহং-এর দ্বারা, এমনকি বুদ্ধি ও মানসিক প্রজ্ঞার যে অর্ধ-প্রবুদ্ধ অজ্ঞান সাত্ত্বিক অহং তাহারই দ্বারা পরিচালিত হয়। কারণ এইটি হইতেছে আত্মার সত্য, এইটি হইতেছে একটা অধ্যাত্ম প্রতিষ্ঠা হইতে কর্ম। কেবলমাত্র মানসিক বুদ্ধিগত জ্ঞান নহে, পরন্তু অধ্যাত্ম জ্ঞান এইপ্রকার কর্মের জন্য অবশ্য প্রয়োজন, একমাত্র এইরূপ জ্ঞানই ইহার আলোক, বাহন, প্রণোদক হইতে পারে। অতএব প্রথমেই গুরু দেখাইয়া দিলেন, এই যেসব চিন্তা ও অনুভব অর্জুনকে বিব্রত বিমূঢ় ও বিপর্যস্ত করিতেছে, সুখ ও দুঃখ, বাসনা ও পাপ, বাহ্য ফলাফল বিবেচনা করিয়া কর্ম নিয়ন্ত্রিত করিতে মনের প্রবৃত্তি, জগতের সহিত বিশ্বপুরুষের ব্যবহারে যাহা কিছু রুদ্র ও ভীষণ বলিয়া মনে হয় সেসবের সম্মুখে মানুষের কাতরতা—আমাদের চৈতন্য যে প্রাকৃত অজ্ঞানের অধীন সেই অধীনতা হইতেই এ সকলের উৎপত্তি, নীচের প্রকৃতিতে বদ্ধ আত্মা নিজেকে স্বতন্ত্র অহং বলিয়া দেখে, তাহার উপর বস্তুসকলের যে ক্রিয়া তাহার প্রতিক্রিয়ায় সুখ-দুঃখ, পাপ-পুণ্য, ন্যায়-অন্যায়, সৌভাগ্য-দুর্ভাগ্য এই সব দ্বন্দ্বের উদ্ভব করে। এই সকল প্রতিক্রিয়া এক ভ্রান্তির জটিল জাল সৃষ্টি করে, তাহার মধ্যে আত্মা নিজের অজ্ঞানের দ্বারা নিজেকে হারাইয়া ফেলে ও বিভ্রান্ত হয়। তাহাকে আংশিক ও অসম্পূর্ণ সমাধানসকল অনুসরণ করিয়া চলিতে হয়, সেসবের দ্বারা সাধারণ জীবনের কাজ সাধারণত ত্রুটি বিচ্যুতির ভিতর দিয়া কোনরকমে চলিতে পারে, কিন্তু উদারতর দৃষ্টি ও গভীরতর অনুভূতির সম্মুখে তাহাদের কোনই উপযোগিতা থাকে না। কর্ম ও জীবনের প্রকৃত মর্ম বুঝিতে

হইলে, মানুষকে এইসকল বাহ্য দৃশ্যের পশ্চাতে আত্মার সত্যের মধ্যে যাইতে হইবে, প্রকৃত বিশ্বজ্ঞানের ভিত্তি লাভ করিতে হইলে প্রথমে আত্মজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে।

প্রথমেই প্রয়োজন হইতেছে বাসনা ও বিক্ষোভ ও চাঞ্চল্যকর হৃদয়াবেগ হইতে এবং মানবীয় মনের এই বিক্ষুব্ধ ও বিকৃতিকারক পরিস্থিতি হইতে আত্মাকে মুক্ত করিয়া নির্বিকার সমতার আকাশে, নৈর্ব্যক্তিক শান্তির স্বর্গে, অহংশূন্য অনুভূতি ও দৃষ্টির মধ্যে প্রবেশ করা। কারণ কেবল সেই বিশুদ্ধ ঊর্ধ্বতর আকাশে, সকল ঝঞ্ঝা ও মেঘ হইতে নির্মুক্ত স্তরেই আত্মজ্ঞান আসিতে পারে এবং বিশ্বের বিধান ও প্রকৃতির সত্যকে ব্যাপক দৃষ্টিতে এবং অবিচল সর্বতোমুখী সর্বত্র প্রবেশকারী জ্যোতিতে স্থিরভাবে দেখা যাইতে পারে। এই যে ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্ব প্রকৃতির অবশ যন্ত্র, প্রকৃতির হস্তের নির্বিরোধী অক্ষম পুত্তলিকা, তাহার সৃষ্টির মধ্যে একটি সৃষ্ট রূপ—ইহার পশ্চাতে রহিয়াছে এক নৈর্ব্যক্তিক আত্মা, সকলের মধ্যে এক, তাহা সব জিনিসকেই দেখিতেছে, জানিতেছে; এক সম, নিরপেক্ষ, বিশ্বব্যাপী সত্তা সৃষ্টিকে ধরিয়া রহিয়াছে, এক সাক্ষীচৈতন্য প্রকৃতিকে জিনিসসকলের স্বভাব অনুযায়ী বিকাশ করিতে দিতেছে, কিন্তু প্রকৃতির কর্মের মধ্যে বদ্ধ হইতেছে না, নিজেকে হারাইয়া ফেলিতেছে না। অহং এবং বিক্ষোভময় ব্যক্তিত্ব হইতে সরিয়া এই শান্ত, সম, সনাতন, বিশ্বময় নৈর্ব্যক্তিক আত্মার মধ্যে আসাই হইতেছে দৃষ্টিসম্পন্ন যৌগিক কর্ম করিবার প্রাথমিক সাধনা; যে ভাগবত সত্তা ও অব্যর্থ ইচ্ছা আমাদের নিকট এখন অপরিস্ফুট হইলেও বিশ্বমাঝে নিজেকে প্রকট করিতেছে, তাহার সহিত সজ্ঞান যোগেই এইরূপ কর্ম সম্পাদিত হয়।

যখন আমরা এই নৈর্ব্যক্তিক আত্মার প্রসারতার মধ্যে শান্তভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়া বাস করি, তখন আমাদের ক্ষুদ্র মিথ্যা "আমি", আমাদের কর্মের অহং, ইহার বিশালতার মধ্যে লয়প্রাপ্ত হয় কারণ সেই আত্মা হইতেছে বিরাট, শান্ত, নিশ্চল, নৈর্ব্যক্তিক, এবং আমরা দেখিতে পাই যে, প্রকৃতিই কর্ম করিতেছে, আমরা নহি, সকল কর্মই প্রকৃতির কর্ম, তাহা ছাড়া আর কিছুই হইতে পারে না। আর এই যে জিনিসটিকে আমরা প্রকৃতি বলি, শাশ্বত সত্তা যখন সচল হইতেছে এই প্রকৃতি তাহারই বিশ্বভূতা কার্যনির্বাহিকা শক্তি, সেই সত্তা তাহার সৃষ্ট জীবগণের প্রতি শ্রেণীর মধ্যে এবং শ্রেণীর অন্তর্গত প্রত্যেক ব্যষ্টির মধ্যে তাহার স্বভাব অনুসারে এবং স্বভাব অনুযায়ী কর্ম অনুসারে বিভিন্ন আকার ও রূপ গ্রহণ করিতেছে। প্রত্যেক জীবকেই আপন আপন প্রকৃতি অনুসারে কর্ম করিতে হয়, আর কিছুর দ্বারাই সে কর্ম করিতে পারে না। অহং, ব্যক্তিগত ইচ্ছা ও বাসনা এসবই এক বিশ্বশক্তির জীবন্ত সচেতন রূপ ও সীমাবদ্ধ স্বাভাবিক ক্রিয়া ভিন্ন আর কিছুই নহে, সে শক্তি নিজে অরূপ ও অনন্ত এবং ইহাদের অনেক ঊর্ধ্বে; বুদ্ধি, প্রজ্ঞা, মন, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, দেহ, ইহাদিগকে আমরা আমাদের বলিয়া মনে করি, গর্ব করি, ইহারা সবই হইতেছে প্রকৃতির যন্ত্র, প্রকৃতির সৃষ্টি। কিন্তু নৈর্ব্যক্তিক আত্মা কর্ম করে না

এবং প্রকৃতির অংশও নহে, সে পশ্চাৎ হইতে ও ঊর্ধ্ব হইতে কর্মকে অবলোকন করে এবং স্বরাটরূপে, মুক্ত নির্বিকার জ্ঞাতারূপে, সাক্ষীরূপে বিরাজ করে। যে জীব এই নৈর্ব্যক্তিকতার মধ্যে বাস করে, আমাদের প্রকৃতিকে যন্ত্র করিয়া যেসব কর্ম সম্পাদিত হইতেছে সেসবের দ্বারা সে স্পৃষ্ট হয় না, সে এসবে সাড়া দেয় না, ইহাদের ফলস্বরূপ সুখ-দুঃখ, অনুরাগ-বিরাগ, বাসনা-বিতৃষ্ণা, এইরূপ যে সহস্র দ্বন্দ্ব আমাদিগকে আকৃষ্ট করিতেছে, বিচলিত বিক্ষুব্ধ করিতেছে, এসবের দ্বারা সে স্পৃষ্ট হয় না। সে সকল মনুষ্য, সকল বস্তু, সকল ঘটনাকেই সমতার সহিত দর্শন করে, লক্ষ্য করে যে প্রকৃতির গুণসকল গুণসকলের উপর ক্রিয়া করিতেছে, সে ঐ যন্ত্রের সমগ্র রহস্যটি দেখিতে পায়, কিন্তু সে নিজে এই সকল গুণের অতীত, এক শুদ্ধ কৈবল্যাত্মক মূল সত্তা, নির্বিচল, মুক্ত, শান্ত-প্রতিষ্ঠ। প্রকৃতি তাহার কর্ম করে এবং নৈর্ব্যক্তিক বিশ্বগত আত্মা তাহাকে ধারণ করিয়া থাকে কিন্তু মজ্জিত হয় না, আসক্ত হয় না, জড়িত হয় না, বিক্ষুব্ধ বা বিভ্রান্ত হয় না। যদি আমরা এই সমতাময় আত্মায় বাস করিতে পারি—আমরাও শান্ত-প্রতিষ্ঠ হইতে পারি, আমাদের ইন্দ্রিয়াদি যন্ত্রে যতক্ষণ প্রকৃতি তাহার প্রেরণা চালাইতে থাকে ততক্ষণ আমাদের কর্ম চলিতে থাকে, কিন্তু ভিতরে থাকে অধ্যাত্মমুক্তি ও নিস্পন্দতা।

এই যে আত্মা ও প্রকৃতির দ্বৈত, পুরুষ নিস্পন্দ, প্রকৃতি কর্মময়ী, এইটিই আমাদের জীবনের সবখানি নহে; এ বিষয়ে ইহারাই প্রকৃতপক্ষে দুইটি চরম কথা নহে। যদি তাহাই হইত, তাহা হইলে হয় আত্মার পক্ষে সকল কর্মই সমান হইত, এই কর্মটা করা হইবে, না, ঐ কর্মটা করা হইবে, না, কর্ম হইতে বিরত হইতে হইবে, ইহা সদা-পরিবর্তনশীল গুণসকলের কোন অনিয়ন্ত্রিত আবর্তনের দ্বারাই নির্ধারিত হইত—অর্জুন দেহেন্দ্রিয়াদিতে রাজসিক প্রেরণার বশে যুদ্ধ করিতে চালিত হইতেন অথবা তামসিক জাড্য বা সাত্ত্বিক উদাসীনতা দ্বারা কর্ম হইতে নিবৃত্ত হইতেন—অথবা অর্জুনের কর্ম করা এবং কেবল এইভাবে কর্ম করাই যদি অবশ্যম্ভাবী হইত তাহাও প্রকৃতির যন্ত্রবৎ অন্ধ নিয়মের দ্বারাই নির্ধারিত হইত। তাহা ছাড়া, পুরুষ প্রতিনিবৃত্ত হইয়া নৈর্ব্যক্তিক নিস্পন্দ আত্মার মধ্যে বাস করিত, কর্মময়ী প্রকৃতির মধ্যে আর আদৌ বাস করিত না, এবং শেষ ফল হইত নিস্পন্দতা, নিষ্ক্রিয়তা, বিরতি, জাড্য, পরন্তু গীতা যে কর্মের নির্দেশ দিতেছে তাহা আর হইত না। আর শেষ কথা, এই দ্বৈতবাদ পুরুষ আদৌ কেন প্রকৃতি ও তাহার ক্রিয়ার মধ্যে বদ্ধ হইতে আসে তাহার কোন প্রকৃত ব্যাখ্যা দিতে পারে না, কারণ এক চির-অবদ্ধ আত্মচেতন পুরুষ নিজে বন্ধনের মধ্যে পড়িবে, নিজের আত্মজ্ঞান হারাইবে এবং সেই জ্ঞানে তাহাকে আবার ফিরিয়া যাইতে হইবে ইহা কখনই হইতে পারে না। পক্ষান্তরে এই শুদ্ধ পুরুষ, এই আত্মা চিরকালই রহিয়াছে, একইভাবে রহিয়াছে, সে চিরকালই কর্মের এক আত্মচেতন নৈর্ব্যক্তিক স্বতন্ত্র সাক্ষী বা নিরপেক্ষ ধারণ-কর্তা। এই যে ফাঁক, এই যে অসম্ভব শূন্যতা, ইহাই আমাদিগকে বাধ্য করে দুইটি পুরুষের অথবা একই পুরুষের দুইটি সংস্থিতির

পরিকল্পনা করিতে, একটি আত্মার মধ্যে নিগূঢ়—তাহার স্বপ্রতিষ্ঠ সত্তা হইতে সব অবলোকন করিতেছে—অথবা হয়তো কিছুই দেখিতেছে না, আর একটি নিজেকে প্রকৃতির মধ্যে নিক্ষিপ্ত করিয়াছে, তাহার কর্মে যোগ দিয়াছে এবং তাহার সৃষ্টিসকলের সহিত নিজেকে এক করিয়া দেখিতেছে। কিন্তু পুরুষ ও প্রকৃতি বা মায়ার যে দ্বৈতবাদ এইভাবে দুই পুরুষের দ্বৈতদ্বারা সংশোধিত হয়, এইটিও গীতার দার্শনিক তত্ত্বের সবখানি নহে। গীতা ইহার ঊর্ধ্বে এক উচ্চতম পুরুষোত্তমের, পরম সর্বব্যাপী একত্বের সন্ধান দিয়াছে।

গীতা বলিয়াছে যে, এক পরম রহস্য, উচ্চতম সত্য আছে যাহা এই দুই বিভিন্ন অভিব্যক্তির সত্যকে ধরিয়া রহিয়াছে, তাহাদের সামঞ্জস্য বিধান করিতেছে। এক পরাৎপর আত্মা, ঈশ্বর ও ব্রহ্ম রহিয়াছেন, একা তিনি ব্যক্তিক এবং নৈর্ব্যক্তিক উভয়ই, কিন্তু ইহাদের প্রত্যেকেরই অপেক্ষা অন্যতর ও মহত্তর। তিনি পুরুষ, আত্মা, আমাদের সত্তার অন্তরতম সত্তা, কিন্তু তিনিই আবার প্রকৃতি; কারণ প্রকৃতি হইতেছে সর্বাত্মার শক্তি, কর্মে ও সৃষ্টিতে স্বয়ং প্রবৃত্ত শাশ্বত ও অনন্তের শক্তি। তিনি পরম অনির্বচনীয়, তিনি বিশ্বপুরুষ, তিনিই তাঁহার প্রকৃতি দ্বারা এই সকল জীব হইয়াছেন। তিনি পরম আত্মা ও ব্রহ্ম, তিনিই তাঁহার বিদ্যা মায়া এবং অবিদ্যা মায়ার দ্বারা বিশ্বরহস্যের দ্বৈত সত্য প্রকট করিতেছেন। তিনি পরম ঈশ্বর, তাঁহার শক্তির অধিনায়ক, তিনিই এই সমগ্র প্রকৃতিকে এবং এই অগণ্য ভূতসকলের ব্যক্তিত্ব, শক্তি ও কর্মকে সৃষ্টি করিতেছেন, চালিত করিতেছেন, নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন। প্রত্যেক জীবই এই স্বপ্রতিষ্ঠ একমেবাদ্বিতীয়ং সত্তার অংশ সত্তা, এই সর্বাত্মার একটি শাশ্বত আত্মা, এই পরম ঈশ্বর ও তাঁহার বিশ্বপ্রকৃতির একটি আংশিক অভিব্যক্তি। এখানে সবই এই ভগবান, বাসুদেবঃ সর্ব্বম্; কারণ প্রকৃতি দ্বারা এবং প্রকৃতিস্থ পুরুষের দ্বারা তিনিই সর্বভূত হইতেছেন এবং সব তাঁহা হইতে উদ্ভূত হইতেছে, তাঁহার মধ্যে এবং তাঁহা দ্বারা জীবন ধারণ করিতেছে, যদিও তিনি নিজে সকল বিশালতম অভিব্যক্তি, গভীরতম অধ্যাত্মসত্তা বা বিশ্বময় রূপ অপেক্ষাও মহত্তর। এইটিই হইতেছে সৃষ্টির পূর্ণ সত্য, বিশ্বকর্মের সকল রহস্য, আমরা দেখিয়াছি যে, গীতার শেষ অধ্যায়গুলিতে এই রহস্যটিই পরিস্ফুট হইয়াছে।

কিন্তু এই যে মহত্তর সত্য, ইহার দ্বারা অধ্যাত্ম কর্মের নীতি কিভাবে পরিবর্তিত বা প্রভাবিত হয়? ইহা প্রথমেই এই বিষয়ে পরিবর্তন করে যে, আত্মা ও জীব ও প্রকৃতির সম্বন্ধের সমগ্র অর্থটি পরিবর্তিত হইয়া যায়, ইহা এক নূতন দৃষ্টি খুলিয়া দেয়, যেসব স্থানে ফাঁক ছিল সেগুলি পূর্ণ করিয়া দেয়, মহত্তর প্রশস্ততা লাভ করে, সত্য এবং অধ্যাত্মভাবে প্রত্যক্ষ, নির্দোষভাবে সমগ্র সার্থকতা লাভ করে। জগৎ শুধু প্রকৃতির গুণের দ্বারা অন্ধভাবে চালিত ও নিয়ন্ত্রিত হইতেছে, আর অন্যদিকে রহিয়াছে এক নৈর্ব্যক্তিক স্বপ্রতিষ্ঠ সত্তার নিস্পন্দতা, তাহার কোন গুণ নাই, আত্মনিয়মনের শক্তি নাই, সৃষ্টি করিবার সামর্থ্য নাই, প্রেরণাও নাই—জগৎ

সম্বন্ধে এই ধারণাবও পরিবর্তন হইযা যায। এই অসন্তোষজনক দ্বৈতবাদেব মধ্যে যে ফাঁক বহিয়াছে তাহার সমাধান হয় এবং জ্ঞান ও কর্মেব মধ্যে, পুরুষ ও প্রকৃতির মধ্যে এক উন্নযনকাবী ঐক্য প্রকটিত হয়। নিস্পন্দ, নৈর্ব্যক্তিক পুরুষ সত্য—ইহা হইতেছে ভগবানেব স্থিরতাব, শাশ্বতের নিশ্চল নীববতাব, পরমেশ্বরের সকল জন্ম, বিবর্তন, কর্ম ও সৃষ্টির অতীত অবস্থাব সত্য, তাঁহাব স্বপ্রতিষ্ঠ সত্তার শান্ত অনন্ত মুক্তি, তাহা সৃষ্টিব দ্বাবা বদ্ধ বিক্ষুব্ধ বা বিচলিত হয না, প্রকৃতির ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া দ্বারা স্পৃষ্ট হয না। প্রকৃতি নিজেও আব দুর্বোধ্য মায়া থাকে না, কিন্তু শাশ্বতেরই একটি ক্রিযা বলিয়া প্রতিভাত হয, তাহাব সকল চঞ্চলতা ও কর্মবহুত্ব এক অক্ষর পুরুষ ও আত্মাব অনাসক্ত ও সাক্ষীস্বরূপ শান্তিব উপরেই প্রতিষ্ঠিত ও বিধৃত। প্রকৃতির যে অধীশ্বব একই সঙ্গে বিশ্বেব এক এবং বহুধা আত্মা, এবং তাঁহার আংশিক প্রকাশেব দ্বাবা এই সব সত্তা, শক্তি, চৈতন্য, দেব, পশু, বস্তু, মনুষ্য হইতেছেন, তিনিই সেই অক্ষব পুরুষরূপে বিবাজ করিতেছেন। গুণময়ী প্রকৃতি হইতেছে তাঁহাবই শক্তির নিম্নতব, স্বেচ্ছায সঙ্কুচিত ক্রিযা, ইহা অপূর্ণভাবে সচেতন অভিব্যক্তিব প্রকৃতি এবং সেই জন্যই কতকটা অজ্ঞানের প্রকৃতি। তাহাব যে বাহ্য শক্তি এখানে বাহ্য ক্রিযায় মগ্ন তাহাব নিকটে আত্মার সত্য এবং ভগবানেব সত্য লুক্কাযিত বহিযাছে (অনেকটা যেমন মানুষেব বাহ্য চেতনার নিকটে তাহাব গভীবতব সত্তা লুক্কাযিত থাকে) যতক্ষণ না তাহাব মধ্যে অন্তঃপুরুষ এই গুপ্ত বস্তুকে আবিষ্কাব কবিতে প্রবৃত্ত হয, নিজেব মধ্যে প্রবেশ করে এবং নিজের বাস্তব সত্যসকলেব, নিজের মহত্ত্ব ও গভীবতা সকলেব সন্ধান পায়। এই জন্যই তাহাকে আত্মজ্ঞান লাভে সমর্থ হইবাব জন্য তাহাব ক্ষুদ্র ব্যক্তিক ও অহংভাবময় সত্তা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইযা তাহাব বৃহৎ, নৈর্ব্যক্তিক, অক্ষব, বিশ্বগত আত্মায় যাইতে হয। কিন্তু পবমেশ্বব রহিযাছেন শুধু আত্মাতেই নহে পরন্তু প্রকৃতিতেও। তিনি সর্বভূতের হৃদ্দেশে বহিযাছেন এবং তাঁহাব অধিষ্ঠানের দ্বাবা এই মহান প্রকৃতি-যন্ত্রটিব আবর্তন নিযন্ত্রিত কবিতেছেন। তিনি সকলের মধ্যে অধিষ্ঠিত বহিযাছেন, সকলে তাঁহার মধ্যে বাস কবিতেছে, তিনিই সব, কাবণ সবই হইতেছে তাঁহার বিবর্তন, তাঁহাব সত্তাব বিভিন্ন অংশ বা রূপ। কিন্তু এখানে সবই চলিযাছে এক নীচেব আংশিক ক্রিযায, এই ক্রিযা এক গূঢ়, এক উচ্চতর, মহত্তব ও পূর্ণতর ভাগবত প্রকৃতি হইতে, ভগবানেব শাশ্বত অনন্ত প্রকৃতি বা পূর্ণ আত্মশক্তি, দেবাত্মশক্তি হইতে উদ্ভূত। মানুষের মধ্যে যে সিদ্ধ, সমগ্রভাবে চেতন আত্মা লুক্কাযিত বহিযাছে যাহা ভগবানেব সনাতন অংশ, শাশ্বত ভাগবত সত্তার অধ্যাত্ম সত্তা, তাহা আমাদেব মধ্যে ব্যক্ত হইতে পাবে এবং আমাদিগকেও তাহাব অভিমুখে উন্মুক্ত কবিতে পাবে যদি আমবা তাহাব ক্রিযাব এবং আমাদেব জীবনেব এই সত্য সত্যেব মধ্যেই সর্বদা বাস কবি। যে ভগবানকে চায় তাহাকে তাহার অক্ষব ও শাশ্বত নৈর্ব্যক্তিক সত্তাব সত্যেব মধ্যে ফিবিয়া যাইতে হইবে এবং সেই সঙ্গেই তাহাকে সর্বত্র সেই ভগবানকে দেখিতে হইবে

যাঁহা হইতে সে উদ্ভূত হইযাছে, দেখিতে হইবে যে তিনিই সব, এই পবিবর্তনশীলা প্রকৃতিব সর্বত্র, তাহাব প্রত্যেক অংশ ও পরিণামের মধ্যে এবং তাহার সকল কর্মেব মধ্যে তাঁহাকে দেখিতে হইবে এবং সেখানেও তাহাকে ভগবানের সহিত এক হইতে হইবে, সেখানেও তাঁহাব মধ্যে বাস কবিতে হইবে, সেখানেও ভাগবত ঐক্যেব মধ্যে প্রবেশ করিতে হইবে। সে সাধক সেই সমগ্রতায় তাঁহার গভীব মূল সত্তাব দিব্যশান্তি ও মুক্তির সহিত তাঁহাব দিব্যভাবাপন্ন প্রাকৃত সত্তায যন্ত্রস্বরূপ কর্ম কবিবাব পবম শক্তিব সমন্বয সাধন কবেন।

কিন্তু ইহা কেমন কবিয়া কবিতে হইবে? প্রথমত আমাদেব কর্ম-সঙ্কল্পের পশ্চাতে ভাবটি যদি ঠিক হয তাহা হইলেই ইহা কবা যাইতে পাবে। সাধককে তাহাব সকল কর্মকেই কর্মেশ্ববেব উদ্দেশ্যে যজ্ঞরূপে দেখিতে হইবে, তিনি শাশ্বত ও বিশ্বগত সত্তা এবং তাহাব নিজেবই ঊর্ধ্বতম আত্মা এবং অন্য সকলেবও আত্মা, তিনি বিশ্বমধ্যে সর্বত্রাধিষ্ঠিত, সর্বাধার, সর্বনিয়ন্তা পরম ভগবান। প্রকৃতির সমগ্র কর্মই এইরূপ যজ্ঞ, অবশ্য এ যজ্ঞ প্রথমত সেই সকল দেবশক্তিকে অর্পণ কবা হয যাঁহাবা তাহাকে চালিত কবিতেছেন এবং তাহাব মধ্যে বিচবণ কবিতেছেন, কিন্তু এই সকল দেবশক্তি সেই অদ্বিতীয় এক ও অপরিচ্ছিন্ন সত্তারই পবিচ্ছিন্ন নামরূপ ভিন্ন আব কিছুই নহে। মানুষ সাধাবণত প্রকাশ্যভাবে অথবা কোন ছদ্মবেশেব অন্তবালে নিজেব অহংকেই যজ্ঞ অর্পণ কবে, তাহার অর্ঘ্য হইতেছে তাহাব নিজেবই স্বৈবতা ও অজ্ঞানেব মিথ্যাচার। সে তাহার জ্ঞান, কর্ম, অভীপ্সা, উদ্যম ও প্রচেষ্টা দেবগণকে অর্পণ কবে, আংশিক, সাময়িক ও ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য সিদ্ধিব জন্য। অন্যপক্ষে জ্ঞানী মুক্তপুরুষ তাঁহার সমস্ত কর্মকে একমেবাদ্বিতীযম্ শাশ্বত ভগবানে অর্পণ কবেন, ইহাদের ফলের উপর বা তাঁহার নিম্নতব ব্যক্তিগত বাসনা কামনা পবিতৃপ্তিব উপব তাঁহার কোন আসক্তি থাকে না। তিনি কর্ম কবেন ভগবানের জন্য, নিজেব জন্য নহে, জগতের কল্যাণের জন্য, বিশ্বেব অন্তঃপুরুষেব জন্য, তাঁহার নিজেব ব্যক্তিগত সৃষ্টি কোন বিশেষ উদ্দেশ্যের জন্য নহে, অথবা তাঁহার মনেব ইচ্ছা বা প্রাণেব কামনার কোন বস্তুব জন্য নহে, তিনি কর্ম কবেন ভাগবত প্রতিনিধিরূপে, বিশ্ব-ব্যবসায নিজেই মালিক বা স্বতন্ত্র ব্যবসাদাব হিসাবে নহে। আবও লক্ষ্য কবিবাব বিষয় এই যে, ইহা প্রকৃতপক্ষে সম্ভব হয কেবলমাত্র ততখানিই যতখানি মন সমতা, বিশ্বজনীনতা, নৈর্ব্যক্তিকতা লাভ কবিতে পাবে এবং বাসনাময অহং-এব সকলবকম ছদ্মবেশ হইতে মুক্ত হইতে পারে, কাবণ এইগুলি না থাকিলে ঐরূপ কর্ম কবিতেছি বলা ছলনা, না হয় ভ্রান্তিমাত্র। জগতেব সমগ্র ব্যাপাবটিই হইতেছে বিশ্বের অধীশ্বরের কর্ম, স্বপ্রতিষ্ঠ অধ্যাত্মসত্তাব কাববাব, উহা তাঁহাবই বিবামহীন সৃষ্টি, ক্রমবর্ধমান অভিব্যক্তি, প্রকৃতিব মধ্যে অর্থপূর্ণ প্রকাশ ও জীবন্ত প্রতীক। ফলগুলি তাঁহার, তিনি যেরূপ বিধান কবেন সেইরূপই পবিণাম হয, আমাদেব ব্যক্তিগত কর্ম কেবল গৌণভাবে তাহাতে সাহায্য কবে, ইহাব মূলে যতটা ব্যক্তিগত দাবিব প্রেবণা থাকে ততটাই

ইহা আমাদের অন্তবস্থিত এই আত্মা ও পুরুষের দ্বারা নিযন্ত্রিত বা ব্যাহত হয়, এই আত্মা ও পুরুষ সকলের মধ্যেই রহিয়াছে, বস্তুসকলকে বিশ্বগত উদ্দেশ্য ও কল্যাণের জন্য পরিচালিত করিতেছে, আমাদের ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য নহে। নৈর্ব্যক্তিকভাবে, নিষ্কামভাবে, কর্মের ফলে আসক্তি বর্জন করিয়া কর্ম করা, ভগবানের জন্য, জগতের জন্য, মহত্তর আত্মার জন্য এবং বিশ্বগত ইচ্ছাপূর্তির জন্য কর্ম করা—এইটিই হইতেছে মুক্তি ও সিদ্ধিলাভের পক্ষে প্রথম ধাপ।

কিন্তু এই ধাপের ঊর্ধ্বে রহিয়াছে সেই মহত্তর সাধনাটি, আমাদের অন্তর্বাসী ভগবানের নিকটে আমাদের সকল কর্মের আভ্যন্তরীণ সমর্পণ। কারণ অনন্ত প্রকৃতিই আমাদের কর্মসকল প্ররোচিত করিতেছে—এবং তাহার মধ্যে ও ঊর্ধ্বে এক ভাগবত ইচ্ছা আমাদের নিকট হইতে কর্ম দাবি করিতেছে। আমাদের অহং কর্মটিকে যে প্রকার রূপ দেয় তাহা হইতেছে আমাদের তমঃ, রজঃ ও সত্ত্বগুণের ক্রিয়া, তাহা নীচের প্রকৃতির মধ্যে একটা বিকৃতি। অহং নিজেকে কর্তা বলিয়া মনে করে তাই ঐ বিকৃতির উদ্ভব হয়; কর্মটির দ্বারা সীমাবদ্ধ ব্যক্তিগত প্রকৃতির রূপ ধারণ করে এবং জীব তাহার সহিত এবং তাহার সঙ্কীর্ণ রূপগুলির সহিত আবদ্ধ হইয়া পড়ে, তাহার মধ্যে যে অনন্ত শক্তি রহিয়াছে সেখান হইতে মুক্ত ও শুদ্ধভাবে কর্মটিকে উৎসারিত হইতে দেয় না। আর অহং কর্মে ও কর্মের ফলে শৃঙ্খলিত হয়। সে যেমন কর্মটির উৎপত্তির দায়িত্ব এবং ব্যক্তিগত সঙ্কল্প নিজেরই বলিয়া দাবি করে, তেমনিই তাহাকে উহার ব্যক্তিগত পরিণাম ও প্রতিক্রিয়া ভোগ করিতে হয়। মুক্ত সিদ্ধ কর্মের জন্য প্রয়োজন আমাদের জীবনের যিনি দিব্য অধীশ্বর তাঁহাকে কর্মটি এবং ইহার উৎপত্তি প্রথমে নিবেদন করা এবং শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ করা; কারণ আমরা ক্রমশ বেশী বেশী উপলব্ধি করি যে, কর্মটি আমাদের মধ্যে অধিষ্ঠিত এক পরম সত্তার দ্বারা গৃহীত হইতেছে, অন্তরাত্মা এক আভ্যন্তরীণ শক্তি ও ভাগবত পুরুষের সহিত গভীর প্রগাঢ় অন্তরঙ্গতা এবং নিবিড় ঐক্যের মধ্যে আকর্ষিত হইতেছে এবং কর্মটি মহত্তর আত্মা হইতে, এক শাশ্বত সত্তার সর্বজ্ঞানময় অনন্ত বিশ্বব্যাপী শক্তি হইতে সাক্ষাৎভাবে উৎসারিত হইতেছে, ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত অহং-এর অজ্ঞান হইতে নহে। কর্মটি প্রকৃতি অনুসারেই নির্বাচিত ও গঠিত হইতেছে কিন্তু প্রকৃতির মধ্যে যে ভাগবত ইচ্ছা রহিয়াছে সম্পূর্ণভাবে তাহার দ্বারাই এবং সেই জন্যই তাহা অন্তরে মুক্ত ও সিদ্ধ, বাহিরে তাহার দৃশ্যরূপ যাহাই হউক না কেন, কর্মটি অনন্ত পুরুষের এই আভ্যন্তরীণ অধ্যাত্ম পরিচিতি লইয়া আসে যে, ইহা "কর্তব্য কর্ম", এইটি করিতে হইবে, সর্বদর্শী কর্মেশ্বরের আপন ধারায় কর্মটি এবং কর্মের গতিটি বিহিত হইয়াছে। মুক্ত ব্যক্তি যখন যন্ত্রস্বরূপ তাহার ব্যক্তিগত সত্তাকে এবং তাহার প্রকৃতির বিশেষ সঙ্কল্প ও শক্তিকে কর্মটির সাধন ও নিমিত্তরূপে ধরিয়া দেয় তখনও তাহার আত্মা নিজের নৈর্ব্যক্তিকতার মধ্যে মুক্ত থাকে। সেই সঙ্কল্প ও শক্তি আর তখন স্বতন্ত্রভাবে অহঙ্কৃতভাবে তাহার নিজের নহে, তখন তাহা অতিব্যক্তিক ভগবানেরই একটি

শক্তি। ভগবান তাঁহার নিজেরই আত্মার এই অভিব্যক্তিতে, তাঁহার অগণ্য ব্যক্তিরূপের মধ্যে এই বিশেষ ব্যক্তিরূপটিতে ইহার প্রাকৃত সত্তার বৈশিষ্ট্য বা স্বভাবকে ধরিয়া কর্ম করেন। এইটিই হইতেছে মুক্ত পুরুষের কর্মের মহান রহস্য, উত্তমম্ রহস্যম্। ইহা হইতেছে—মানবাত্মার পক্ষে ভাগবত জ্যোতিতে বিকশিত হইয়া উঠার, এক উচ্চতম বিশ্বপ্রকৃতির সহিত নিজের প্রকৃতির যোগসাধন করিবার ফল।

এই পরিবর্তন জ্ঞান ভিন্ন সংঘটিত হইতে পারে না। ইহার জন্য প্রয়োজন হয় আত্মা ও ভগবান ও জগৎ সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান এবং সেই জ্ঞান আমাদিগকে যে মহত্তর চৈতন্যের মধ্যে লইয়া যায় তাহার মধ্যে বাস করা, তাহাতে বর্ধিত হইয়া উঠা। আমরা এখন জানি সে জ্ঞান কি। ইহা মনে রাখিলেই যথেষ্ট হইবে যে, মানবীয় মানসদৃষ্টি অপেক্ষা এক বিভিন্ন ও উদারতর দৃষ্টির উপর তাহার প্রতিষ্ঠা—এক পরিবর্তিত দৃষ্টি ও অনুভূতি যাহার দ্বারা মানুষ সর্বপ্রথমে অহঙ্কারের এবং অহং-এর সকল সম্বন্ধের সঙ্কীর্ণতা হইতে মুক্ত হয় এবং সকলের মধ্যে এক আত্মাকে, ভগবানের মধ্যে সকলকে, সর্বভূতকে বাসুদেবরূপে, সকলকেই ভগবানের যন্ত্ররূপে এবং নিজ সত্তাকেও সেই এক ভগবানের সার্থকতাময় সত্তা ও অধ্যাত্ম শক্তিরূপে অনুভব করে, দর্শন করে, এক ঐক্যসাধক অধ্যাত্ম চেতনায় সে অন্যের জীবনের ঘটনাগুলিকেও দেখে যেন তাহারা তাহার নিজেরই জীবনের ঘটনা, ইহা কোনরূপ বিচ্ছেদের প্রাচীর থাকিতে দেয় না এবং সর্বভূতের সহিত বিশ্বজনীন সৌহার্দ্যে বাস করে, মানুষ যতক্ষণ বিশ্বলীলার মধ্যে আছে সর্বভূতের জন্য যে কর্ম করা কর্তব্য তাহা সম্পাদন করে ভগবান কর্তৃক নির্ধারিত ধারার অনুসরণে এবং কালের অধীশ্বর বিশ্বপুরুষের আজ্ঞার দ্বারা নিরূপিত সীমার মধ্যে। এইভাবে জীবনযাপন করিয়া এবং এই জ্ঞানে কর্ম করিয়া মানবাত্মা ব্যক্তিকতায় ও নৈর্ব্যক্তিকতায় শাশ্বতের সহিত যুক্ত হয়, ঠিক যেমন শাশ্বত পুরুষ নিজে কর্ম করেন সেইরূপ কালের মধ্যে কর্ম করিয়াও শাশ্বতের মধ্যে বাস করে, প্রকৃতিতে সম্পাদিত কর্মের রূপ ও গতি যাহাই হউক, সে হয় মুক্ত, সিদ্ধ, আনন্দময়।

মুক্তপুরুষ কৃৎস্নবিদ্, তাঁহার জ্ঞান পূর্ণ ও সমগ্র এবং তিনি কৃৎস্নকৃৎ, মনের সৃষ্ট বাধাসকল হইতে মুক্ত হইয়া তাঁহার অন্তবস্থিত ভাগবত ইচ্ছার তেজ, স্বাতন্ত্র্য ও অনন্ত শক্তিতে তিনি সকল কর্ম সম্পাদন করেন। আর যেহেতু তিনি শাশ্বত পুরুষের সহিত যুক্ত, তাঁহার শাশ্বত সত্তার শুদ্ধ অধ্যাত্ম ও অপরিমেয় আনন্দও তাঁহার আছে। যে পুরুষের তিনি অংশ, যিনি তাঁহার সকল কর্মের অধীশ্বর এবং তাঁহার অন্তরাত্মা ও প্রকৃতির দিব্য প্রেমাস্পদ তাঁহাকে তিনি ভজনা করেন। তিনি শুধু নির্বিকার শান্ত দ্রষ্টা মাত্র নহেন, শাশ্বত পুরুষের দিকে তিনি শুধু তাঁহার জ্ঞান ও সঙ্কল্পকেই উন্নীত করেন না, তাঁহার প্রেম ও ভক্তি ও আবেগপূর্ণ হৃদয়কেও তদভিমুখী করেন। কারণ হৃদয়ের ঐ উন্নয়ন না হইলে তাঁহার সমগ্র প্রকৃতি সিদ্ধ

ও ভগবানের সহিত যুক্ত হয না, আত্মাব শান্তিব উল্লাসকে অন্তঃপুরুষেব আনন্দোল্লাসেব দ্বাবা রূপান্তবিত কবা আবশ্যক। ব্যক্তিরূপী জীবেব ঊর্ধ্বে এবং নৈর্ব্যক্তিক ব্রহ্ম বা আত্মাব ঊর্ধ্বে তিনি বিশ্বাতীত পুরুষোত্তমে উপনীত হন, সেই পুরুষোত্তম আপন নৈর্ব্যক্তিকতায় অক্ষব এবং ব্যক্তিকতাব মধ্যে নিজেকে প্রকট কবেন এবং এই দুই বিভিন্ন দিক দিযা তিনি আমাদিগকে তাঁহাব দিকে আকৃষ্ট কবেন। মুক্ত সাধক ব্যক্তিকভাবে সেই উচ্চতম পবমপদে উঠেন ভগবানে তাঁহাব অন্তরাত্মার প্রেম ও প্রীতি দ্বারা এবং তাঁহাব কর্মের অধীশ্ববেব প্রতি তাঁহাব অন্তরস্থিত সঙ্কল্পেব ভজনা দ্বারা, এই সর্বোত্তম ও সর্বময ভাগবত পুরুষেব স্বপ্রতিষ্ঠ, পূর্ণ, নিগূঢ় সত্তায তাঁহাব যে আনন্দ তাহাব দ্বাবাই তাঁহাব নৈর্ব্যক্তিক বিশ্বাত্মক-জ্ঞানেব শান্তি ও প্রসাবতা সর্বাঙ্গসম্পন্ন হইয়া উঠে। এই আনন্দ তাঁহাব জ্ঞানকে গৌববময় করিযা তোলে এবং পরমাত্মাব যে নিজ সত্তায এবং তাহাব অভিব্যক্তিতে চিরন্তন আনন্দ তাহার সহিত ইহাকে যুক্ত কবিয়া দেয; ইহা তাঁহাব ব্যক্তিরূপকেও ভাগবত পুরুষেব অতিব্যক্তিকতাব মধ্যে সংসিদ্ধ কবিযা তোলে এবং তাঁহার প্রাকৃত সত্তাকে ও কর্মকে এক কবিযা দেয।

কিন্তু এই সব পরিবর্তনেব অর্থ হইতেছে নীচেব মানবীয প্রকৃতি হইতে সম্পূর্ণভাবে ঊর্ধ্বেব ভাগবত প্রকৃতিব মধ্যে উত্তীর্ণ হওযা। ইহা হইতেছে আমাদের সমগ্র সত্তাকে, অন্তত আমাদেব যে মানস সত্তা সঙ্কল্প কবে, জ্ঞানার্জন কবে, অনুভব করে, সেইটিকে আমবা যাহা আছি তাহাব ঊর্ধ্বে এক উচ্চতম অধ্যাত্ম চেতনার মধ্যে, এক তুষ্টিপ্রদ পূর্ণতম অধ্যাত্মশক্তিব মধ্যে, এক গভীবতম উদাবতম অধ্যাত্ম আনন্দেব মধ্যে সমগ্রভাবে উন্নীত কবা। আব আমাদেব বর্তমান প্রাকৃত জীবনকে ছাড়াইয়া উঠিয়া ইহা বেশই সম্ভব, পার্থিব জীবনের ঊর্ধ্বে কোন স্বর্লোকে কিংবা তাহাকে ছাডাইয়াও কোন বিশ্বাতীত লোকোত্তব চৈতন্যে ইহা বেশই সম্ভব; ভগবানের কৈবল্যাত্মক এবং অনন্ত শক্তি ও স্থিতিতে উপনীত হইয়া ইহা সংঘটিত হইতে পাবে। কিন্তু যতক্ষণ আমবা এখানে এই শবীবে, এই প্রাণে, এই কর্মে রহিয়াছি, এইরূপ পরিবর্তন সংঘটিত হইলে আমাদেব নীচেব প্রকৃতিব কি গতি হইবে? কারণ বর্তমানে আমাদের যাবতীয কর্ম তাহাদেব রূপে ও গতিতে প্রকৃতির দ্বাবাই নিরূপিত হয, আর এখানে এই প্রকৃতি হইতেছে ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি এবং সকল প্রাকৃত জীবে ও সকল প্রাকৃত কর্মেই বহিয়াছে গুণত্রয়—অজ্ঞান ও অপ্রবৃত্তি সহ তমোগুণ, প্রবৃত্তি ও কর্ম সহ বজোগুণ, তাহাব বিপু-তাড়না ও শোক ও বিকৃতি, জ্যোতি এবং সুখ সহ সত্ত্বগুণ, এবং এই সকল জিনিসের বন্ধন। আব যদি স্বীকাব করিয়াই লওযা যায যে, জীব আত্মায গুণত্রয়ের অতীত হইল, তথাপি তাহাব যন্ত্রস্বরূপ প্রকৃতিতে কেমন কবিযা সে গুণত্রয়ের কর্ম ও ফল ও বন্ধন হইতে মুক্ত হইবে? কাবণ গীতা বলিযাছে যে, জ্ঞানবান ব্যক্তিকেও নিজেব প্রকৃতি অনুসাবে কর্ম কবিতে হয। যাহা অভিব্যক্তিতে গুণত্রয়ের প্রতিক্রিয়া অনুভব করা ও সহ্য কবা, কিন্তু পশ্চাতে সাক্ষিস্বরূপ

চেতনসত্তায় সেসব হইতে মুক্ত এবং তাহাদের অতীত থাকা—ইহাই যথেষ্ট নহে; কাবণ ইহাতে মুক্তি ও বন্ধনেব দ্বন্দ্ব থাকিয়া যায়, আমরা ভিতবে যাহা এবং বাহিবে যাহা উভযেব মধ্যে, আমাদেব আত্মা এবং আমাদেব শক্তি, আমরা নিজদিগকে যেরূপ জানি এবং আমরা যে সঙ্কল্প করি, কর্ম করি—ইহাদেব মধ্যে বিবোধ থাকিযা যায। এখানে মুক্তি কোথায, ঊর্ধ্বের অধ্যাত্ম প্রকৃতিতে পূর্ণ উন্নযন ও রূপান্তব কোথায, অমৃত ধর্ম, এক দিব্য সত্তাব অনন্ত নির্মলতা ও শক্তির স্বকীয ধর্ম কোথায? শরীর ত্যাগেব পূর্বেই যদি এই পরিবর্তন সাধিত না হয়, তাহা হইলে *বলিতেই হয যে, সমগ্র প্রকৃতিকে রূপান্তবিত করা সম্ভব নহে এবং* যতক্ষণ না এই মৃত্যুধর্মী জীবন পবিত্যক্ত নির্মোকের ন্যায আত্মা হইতে খসিযা পডিতেছে ততক্ষণ এক অমীমাংসিত দ্বন্দ্ব থাকিযাই যাইবে। কিন্তু তাহা হইলে কর্মযোগেব শিক্ষা সঙ্গত হইতে পাবে না, অন্তত ঐটিই চরম তত্ত্ব হইতে পারে না। পূর্ণ নিস্পন্দতা, অন্তত যতটা পূর্ণ হওয়া সম্ভব সেইরূপ নিস্পন্দতা, ক্রমবর্ধমান সন্ন্যাস এবং কর্মত্যাগ, ইহাই হইবে শ্রেষ্ঠ শিক্ষা—বস্তুত মাযাবাদীরা এইরূপ যুক্তিই দেখাইযা থাকেন, তাঁহারা বলেন যে, যতক্ষণ আমরা কর্মেব মধ্যে বহিয়াছি ততক্ষণ গীতাব পন্থা যে ঠিক সে বিষযে সন্দেহ নাই, তথাপি কর্ম হইতেছে মায়া এবং নৈষ্কর্ম্যই শ্রেষ্ঠ পন্থা। এই ভাব লইযা কর্ম কবা ভাল, কিন্তু ইহা হইবে কর্মত্যাগেব বিবতিতে, সম্পূর্ণ নিস্পন্দতায় পৌঁছিবাব পন্থা মাত্র।

গীতাকে এখনও এই সমস্যাটির সমাধান করিতে হইবে, তবেই অধ্যাত্ম সাধকেব পক্ষে কর্মেব উপযোগিতা সাব্যস্ত হইবে। নতুবা অর্জুনেব জন্য এই উপদেশ দিতে হইবে, "উপস্থিত এই ভাবেই কর্ম কর, কিন্তু পরে কর্মত্যাগের উচ্চতব পন্থা অনুসবণ কবিও।" কিন্তু তাহা না করিযা গীতা বলিযাছে, কর্মেব বিবতি নহে, বাসনা ত্যাগই শ্রেষ্ঠতব পন্থা, গীতা মুক্ত পুরুষেব কর্মের কথা বলিযাছে, মুক্তস্য কর্ম। এমনকি গীতা সকল প্রকার কর্ম কবিবাব উপরেই জোর দিযাছে, সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি, কৃৎস্নকৃৎ, বলিযাছে, সিদ্ধযোগী যেভাবেই থাকুন বা যাহাই করুন, তিনি ভগবানেব মধ্যেই বাস করেন ও কর্ম করেন, সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ত্ততে। ইহা কেবল তখনই হইতে পারে যখন প্রকৃতি তাহাব গতিশক্তি ও কর্মেও ভাগবত হইযা উঠে, এক অবিচল, অস্পৃষ্ট, অবিকার্য, শুদ্ধ এবং নীচেব প্রকৃতিব প্রতিক্রিযাসকলে অক্ষুব্ধ শক্তিতে পরিণত হয। এই দুরূহতম রূপান্তব সাধিত হইবে কিরূপে, কোন ক্রম অনুসরণে? জীবাত্মার পূর্ণ সিদ্ধিলাভেব শেষ রহস্যটি কি? আমাদের এই মানবীয় পার্থিব প্রকৃতির এই দিব্য রূপান্তব সাধনের তত্ত্ব প্রণালীটি কি?

সপ্তদশ অধ্যায়

দেব ও অসুর

গুণত্রয়ের নিগড়িত বিঘ্নসঙ্কুল ক্রিয়া হইতে গুণত্রয়ের অতীত মুক্ত পুরুষের অনন্ত কর্মে কেমন করিয়া পৌঁছান যাইতে পারে, এই প্রশ্ন যদি আমরা নিজদিগকে জিজ্ঞাসা করি তাহা হইলে আমাদের বোধগম্য হইবে যে, মানুষের অজ্ঞান ও বন্ধনময় সাধারণ প্রকৃতিকে এক ভাগবত ও অধ্যাত্ম সত্তার শক্তিপূর্ণ মুক্তিতে পরিবর্তিত করা কার্যত কত দুরূহ। এই পরিবর্তন অবশ্যপ্রয়োজনীয়, কারণ ইহা স্পষ্টই বলা হইয়াছে যে, তাহাকে গুণত্রয়ের ঊর্ধ্বে উঠিতে হইবে, ত্রিগুণাতীত অথবা গুণত্রয় হইতে মুক্ত হইতে হইবে, নিস্ত্রৈগুণ্যঃ। অন্যপক্ষে ইহাও সমান স্পষ্টতার সহিত, জোরের সহিত বলা হইয়াছে যে, এখানে পৃথিবীতে প্রত্যেক সত্তাতেই প্রকৃতিজাত এই তিন গুণ পরস্পরের সহিত অচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত থাকিয়া কর্ম করিতেছে—এমন পর্যন্তও বলা হইয়াছে যে, মানব বা প্রাণী বা শক্তির সকল কর্ম এই তিন গুণের পরস্পরের উপর ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া ভিন্ন আর কিছুই নহে, কোন একটি গুণ প্রবল হইতেছে, অন্য দুই গুণ তাহার ক্রিয়া ও ফলকে প্রভাবিত করিতেছে, গুণা গুণেষু বর্ত্তন্তে। তাহা হইলে আবার আর একটি শক্তিময় গতিময় প্রকৃতি, আর এক প্রকার কর্ম কেমন করিয়া থাকিবে? কর্ম করার অর্থই হইতেছে প্রকৃতির গুণত্রয়ের অধীন হওয়া; কর্মের এই বিধানের অতীত হওয়ার অর্থ হইতেছে আত্মার মধ্যে নীরব হওয়া। অবশ্য ঈশ্বর, পরম পুরুষ, যিনি প্রকৃতির সকল কর্ম ও প্রক্রিয়ার অধীশ্বর এবং তাঁহার ভাগবত ইচ্ছা দ্বারা সে সবকে চালিত ও নিয়ন্ত্রিত করেন, তিনি এই যন্ত্রবৎ গুণক্রিয়ার অতীত, প্রকৃতির গুণসকল তাঁহাকে স্পর্শ করে না বা সীমাবদ্ধ করে না; তথাপি মনে হয় তিনি সর্বদা তাহাদের ভিতর দিয়াই কর্ম করেন, সর্বদাই স্বভাবের শক্তি দ্বারা এবং গুণক্রিয়াময় অন্তঃকরণের ভিতর দিয়া গঠন করেন। এই তিনটি হইতেছে প্রকৃতির মৌলিক ধর্ম যে কার্যনির্বাহিকা প্রাকৃত শক্তি এখানে আমাদের মধ্যে গড়িয়া উঠিতেছে তাহার অবশ্যম্ভাবী প্রক্রিয়া, এবং জীব নিজে এই প্রকৃতিতে ভগবানের অংশ ভিন্ন আর কিছুই নহে। অতএব মুক্তিলাভের পরও যদি মানুষ কর্ম করে, সক্রিয় অবস্থায় বিচরণ করে, তাহা হইলে তাহাকে প্রকৃতির মধ্যে থাকিয়া এবং গুণসকলের দ্বারা সীমাবদ্ধ হইয়া এই কর্ম করিতে হইবে, এইরূপ বিচরণ করিতে হইবে, তাহাদের প্রতিক্রিয়ার অধীন হইতে হইবে, পরন্তু তাহার মধ্যে প্রাকৃত অংশ যতটুকু থাকিয়া যাইবে ততটুকু সে ভাগবত মুক্তির মধ্যে কর্ম করিতে সক্ষম হইবে না। কিন্তু গীতা বলিয়াছে ইহার ঠিক বিপরীত, বলিয়াছে যে, মুক্ত যোগী গুণসকলের প্রতিক্রিয়া হইতে মুক্ত হন এবং তিনি যাহাই করুন এবং যে ভাবেই

থাকুন, তিনি বিচরণ করেন, কর্ম করেন, ভগবানেরই মধ্যে, তাঁহারই মুক্তি ও অমৃতত্বের শক্তিতে, পরম শাশ্বত অনন্তের ধর্মে, সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ত্ততে। এখানে একটি বিরোধ, একটি অসমাধেয় সমস্যা রহিয়াছে বলিয়াই মনে হয়।

কিন্তু এইরূপ হয় তখনই যখন আমরা বিশ্লেষণপর মনের বিপরীত সিদ্ধান্তসকলের মধ্যে নিজদিগকে আবদ্ধ করিয়া রাখি, আত্মার দিকে এবং প্রকৃতির মধ্যে অবস্থিত অধ্যাত্ম সত্তার দিকে মুক্ত ও সূক্ষ্ম দৃষ্টি লইয়া চাহিয়া দেখি না। বস্তুত প্রকৃতির গুণসকলই এই জগৎকে চালিত করিতেছে না, ইহারা কেবল নিম্নতন প্রকাশ, আমাদের সাধারণ প্রকৃতির কর্মযন্ত্র। প্রকৃত পরিচালক শক্তি হইতেছে এক ভাগবত অধ্যাত্ম ইচ্ছা, তাহা বর্তমানে এই অধস্তন বিধানগুলি ব্যবহার করিতেছে, কিন্তু নিজে মানবীয় ইচ্ছার ন্যায় গুণসকলের দ্বারা সীমাবদ্ধ, প্রভাবিত বা যন্ত্ররূপে পরিণত হয় না। অবশ্য যখন এই গুণসকল তাহাদের ক্রিয়ায় এইরূপ বিশ্বব্যাপী, তখন তাহারা যে আত্মার শক্তির মধ্যেই অন্তর্নিহিত কোন বস্তু হইতে উদ্ভূত হইয়াছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই। কারণ নিম্নতন সাধারণ প্রকৃতির প্রত্যেক জিনিসই পুরুষোত্তমের সত্তার ঊর্ধ্বতন অধ্যাত্মশক্তি হইতে উদ্ভূত, মত্তঃ প্রবর্ত্ততে, তাহা অধ্যাত্ম কারণহীন বা নরোদ্ভূত কিছু নহে। আত্মার মূল শক্তির মধ্যে এমন কোন জিনিস নিশ্চয়ই আছে যাহা হইতে আমাদের প্রকৃতির সাত্ত্বিক জ্যোতি ও তৃপ্তি, রাজসিক প্রবৃত্তি এবং তামসিক জাড্য উদ্ভূত হইয়াছে, এসব হইতেছে তাহারই অপূর্ণ এবং বিকৃত রূপ। কিন্তু আমরা এই যে তাহার অপূর্ণতা ও বিকৃতির মধ্যে বাস করিতেছি, যখন আমরা ইহার ঊর্ধ্বে ঐ সকল মূল উৎসের শুদ্ধ স্বরূপে ফিরিয়া যাই, তখন আমরা দেখিতে পাই যে, আমরা আত্মার মধ্যে বাস করিতে আরম্ভ করিবামাত্রই এইসকল ক্রিয়া সম্পূর্ণ বিভিন্ন রূপ গ্রহণ করে। সত্তা ও কর্ম এবং সত্তা ও কর্মের বৃত্তিগুলি তাহাদের বর্তমান সীমাবদ্ধ রূপের বহু ঊর্ধ্বে সম্পূর্ণ বিভিন্ন বস্তু হইয়া উঠে।

কারণ সংঘর্ষময় ও দ্বন্দ্বময় বিশ্বের এই বিক্ষুব্ধ কর্মধারার পশ্চাতে কি রহিয়াছে? সেই বস্তুটি কি যাহা মনকে স্পর্শ করিলে, মানস সত্তায় প্রকট হইলে, বাসনা, চেষ্টা, কষ্টকর প্রয়াস, ভ্রান্ত সঙ্কল্প, দুঃখ, পাপ, যন্ত্রণা প্রভৃতি প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে? তাহা হইতেছে গতিতে প্রবৃত্ত আত্মার সঙ্কল্প, তাহা হইতেছে কর্মে প্রবৃত্ত এক উদার ভাগবত ইচ্ছা, এই সব জিনিস তাহাকে স্পর্শ করে না; তাহা হইতেছে মুক্ত ও অনন্ত চৈতন্যময় ভগবানের তপঃ, চিৎশক্তি, তাহার বাসনা নাই কারণ তাহার অধিকার হইতেছে বিশ্বব্যাপী, তাহা আপন গতিতে আপনি আনন্দময়। তাহা কষ্টকর প্রয়াস ও উৎকট শ্রমের দ্বারা ক্লান্ত হয় না, পরন্তু নিজের লক্ষ্য ও উপায়ের উপর তাহার অবাধ প্রভুত্ব; তাহা সঙ্কল্পের কোন ভ্রান্তির দ্বারা বিপথগ্রস্ত হয় না, পরন্তু আত্মা ও বস্তুসকল সম্বন্ধে তাহার জ্ঞান আছে, সেই জ্ঞান তাহার প্রভুত্ব ও আনন্দের উৎস, তাহা কোন দুঃখ, পাপ বা বেদনা দ্বারা অভিভূত

হয় না, পরন্তু তাহাব আছে নিজ সত্তার সুখ ও নির্মলতা এবং নিজ শক্তিব সুখ ও নির্মলতা। যে জীব ভগবানের মধ্যে বাস কবে সে অধ্যাত্ম সঙ্কল্প লইযা কর্ম কবে, অমুক্ত মনের সাধারণ সঙ্কল্প লইয়া নহে; তাহার কর্মপ্রবৃত্তি সংঘটিত হয এই অধ্যাত্ম শক্তি দ্বারা, প্রকৃতির রজোগুণের দ্বাবা নহে এবং তাহাব হেতু ঠিক এই যে, যেখানে ঐ বিকৃতি আছে সেই নিম্নতন ক্রিযার মধ্যে আর সে বাস কবে না, পরন্তু দিব্যপ্রকৃতিব মধ্যে প্রবৃত্তির যে শুদ্ধ ও সিদ্ধ স্বরূপ তাহাতে সে ফিবিযা গিয়াছে।

আবার এই যে প্রকৃতির জাড্য, এই তমঃ, যাহাব মাত্রা পূর্ণ হইলে প্রকৃতিব কর্মকে যন্ত্রের অন্ধ ক্রিয়াব ন্যায় করিয়া তোলে, তাহা হয় যন্ত্রবৎ প্রেরণা, যে বাঁধা গণ্ডীর মধ্যে তাহাকে ঘুরিতে ছাড়িযা দেওযা হইয়াছে তাহা ছাডা সে আর কিছুই দেখিতে পায় না, এমনকি সেই গতির নিযমটি সম্বন্ধেও সচেতন থাকে না—এই তমঃ যাহা অভ্যস্ত কর্মেব বিরতিকে মৃত্যু ও ধ্বংসে পবিণত কবে এবং মনেব মধ্যে অপ্রবৃত্তি ও অজ্ঞানের শক্তি হইযা দাঁড়ায, ইহার পশ্চাতে কি বহিযাছে? এই তমঃ হইতেছে একটা মোহ, বলিতে পাবা যায় যে তাহা আত্মাব শান্তি ও স্থিবতাব চিরন্তন তত্ত্বকে শক্তিব অপ্রবৃত্তি ও জ্ঞানেব অপ্রবৃত্তি রূপে বিকৃত কবিযা প্রকট কবে—ভগবান সে শান্তি কখনও হারান না, এমনকি কর্ম কবিবাব সময়েও নহে, সেই শাশ্বত শান্তি তাঁহার জ্ঞানের সমগ্র কর্মকে এবং তাঁহার সৃজনাত্মক সঙ্কল্পেব শক্তিকে যেমন ঊর্ধ্বে তাঁহাব নিজের যাবতীয় আনন্ত্যেব মধ্যে তেমনই এখানে তাঁহার কর্ম ও আত্মচেতনার আপাতদৃশ্য অপূর্ণতাব মধ্যেও ধারণ কবিয়া থাকে। ভগবানের যে শান্তি তাহা শক্তিব ধ্বংস নহে অথবা শূন্যগর্ভ জডতা নহে, যদি ভাগবত শক্তি কিছুকালের জন্য সর্বত্র সক্রিযভাবে জানিতে ও সৃষ্টি কবিতে বিবত হয় তাহা হইলেও সেই শান্তি অনন্ত পুরুষ যাহাকিছু জানিযাছেন বা কবিযাছেন সেসবকে এক সর্বশক্তিময নীববতাব মধ্যে সংগৃহীত ও নিবিড় চৈতন্যময কবিযা রাখে। শাশ্বত পুরুষেব নিদ্রা বা বিশ্রামেব প্রয়োজন নাই; তিনি ক্লান্ত বা অবসন্ন হন না, তাঁহার নিঃশেষিত শক্তিসকলকে পুনরুজ্জীবিত বা পুনর্গঠিত কবিবাব জন্য তাঁহার বিরতি আবশ্যক হয় না; কাবণ তাঁহাব শক্তি চিরকাল একইভাবে অফুবন্ত, অপরিশ্রান্ত, অনন্ত। ভগবান তাঁহার কর্মের মধ্যেও শান্ত এবং সুস্থিব, অন্যপক্ষে তাঁহাব কর্মবিরতির মধ্যেও তাঁহাব সক্রিযতাব পরিপূর্ণ শক্তি এবং সকল সম্ভাবনীয়তা বর্তমান থাকে। মুক্ত পুরুষ এই শান্তিব মধ্যে প্রবেশ করেন এবং আত্মার এই চির বিশ্রান্তির অংশভাগী হন। মুক্তিব আনন্দেব কোনরূপ আস্বাদন যিনি পাইয়াছেন, তিনিই জানেন যে, ইহার মধ্যে শান্তিবই এক চিবন্তন শক্তি নিহিত আছে। আব সেই গভীর প্রশান্তি কর্মেব মর্মস্থলেও থাকিতে পাবে, শক্তিসকলের প্রচণ্ডতম গতিব মধ্যেও অব্যাহত থাকিতে পাবে। চিন্তা, কর্ম, সঙ্কল্প, গতিব প্রবল বন্যা, প্রেমেব উচ্ছ্বসিত আবেগ, স্বপ্রতিষ্ঠ অধ্যাত্ম আনন্দেব তীব্রতম উল্লাস থাকিতে পারে এবং সেই উল্লাস প্রসারিত হইয়া প্রকৃতিব ধাবায জগতেব

বস্তু ও সত্তাসকলেব দীপ্ত ও শক্তিময অধ্যাত্ম উপভোগে ব্যাপ্ত হইতে পাবে, অথচ এই প্রশান্তি ও স্থিবতা ঐ আবেগেব পশ্চাতে এবং উহার মধ্যে থাকিবে, নিজ গভীবতা সম্বন্ধে সর্বদা সচেতন থাকিবে, সর্বদা একই থাকিবে। মুক্ত ব্যক্তির যে স্থিরতা তাহা আলস্য, অক্ষমতা, অসাডতা, জাড্য নহে; ইহা অমর শক্তিতে পূর্ণ, সকল কর্মে সক্ষম, গভীবতম আনন্দেব সহিত এক সুরে বাঁধা, পূর্ণতম প্রেম ও করুণা এবং সকলপ্রকাব তীব্রতম আনন্দের দিকে উন্মুক্ত।

প্রকৃতিব যে শুদ্ধতম গুণ, সত্ত্বগুণ, যে শক্তি স্বায়ত্তীকবণ ও সামঞ্জস্য সাধনের দিকে, যথার্থ জ্ঞান ও যথার্থ ব্যবহাবেব দিকে সুষ্ঠু সুসঙ্গতি, দৃঢ সাম্য, যথার্থ কর্মনীতি ও যথার্থ পবিগ্রহের দিকে অগ্রসর হয এবং মনে এইরূপ পূর্ণ পরিতৃপ্তি আনযন করে, এই সত্ত্বগুণের নিম্নতন জ্যোতি ও প্রসন্নতার ঊর্ধ্বে, সাধারণ প্রকৃতিব মধ্যে এই যে উচ্চতম বস্তু, যাহা আপনাব গণ্ডীতে এবং স্থিতিকালে খুবই সুন্দব কিন্তু অনিশ্চিত, সীমাব দ্বাবা পরিচ্ছিন্ন, বিধি ও বিধান সাপেক্ষ—ইহার ঊর্ধ্বে ইহাব উচ্চ ও সুদূব উৎসে বহিযাছে এক মহত্তর জ্যোতি ও আনন্দ, তাহা মুক্ত আত্মাব মধ্যে মুক্ত। তাহা সীমাবদ্ধ নহে, তাহা কোন সীমা, বিধি বা বিধানেব উপব নির্ভব কবে না পরন্তু আপনাতে আপনি প্রতিষ্ঠিত এবং অপবিবর্তনীয, আমাদেব প্রকৃতিব বিবোধসকলেব মধ্যে কোন একটি বিশেষ সুসঙ্গতিব ফল নহে, পবন্তু তাহা নিজেই সুসঙ্গতিব উৎস এবং ইচ্ছামত যেকোন সুসঙ্গতি সৃষ্টি করিতে সক্ষম। তাহা হইতেছে জ্যোতি—জ্ঞানের ভাস্বব অধ্যাত্মশক্তি এবং নিজস্ব ক্রিয়ায় তাহা জ্ঞানেব সাক্ষাৎ অতিমানস শক্তি, তাহা আমাদের বিকৃত ও পবোক্ষ মানস জ্ঞান বা প্রকাশ নহে। তাহা হইতেছে প্রশস্ততম আত্মসত্তাব জ্যোতি ও সুখ, স্বতঃস্ফূর্ত আত্মজ্ঞান, অন্তবঙ্গ বিশ্বগত তাদাত্ম্য, গভীরতম আত্মবিনিময়, তাহা অর্জন, স্বাযত্তীকবণ, সামঞ্জস্যসাধন বা কষ্টসাধ্য সাম্যস্থাপনের বস্তু নহে। সেই জ্যোতি এক ভাস্বব অধ্যাত্ম সঙ্কল্পে পূর্ণ এবং তাহার জ্ঞান ও কর্মেব মধ্যে কোন ব্যবধান বা অসামঞ্জস্য নাই। সেই আনন্দ আমাদের মলিনতব মানসিক সুখ নহে, পবন্তু তাহা হইতেছে এক গভীব ঘনীভূত তীব্র স্বযংপ্রতিষ্ঠ আনন্দ, আমাদের সত্তা যাহা অনুষ্ঠান কবে, যাহা অবধাবণ করে এবং যাহা সৃষ্টি কবে সেসবে পরিব্যাপ্ত, তাহা এক স্থাযী দিব্য উল্লাস। মুক্ত পুরুষ গভীব হইতে গভীরতবভাবে এই জ্যোতি ও আনন্দেব অংশ গ্রহণ কবেন এবং তিনি যতই নিজেকে সমগ্রভাবে ভগবানেব সহিত যুক্ত কবেন ততই পূর্ণতবভাবে ইহাতে বিকশিত হইয়া উঠেন। আবার নীচেব প্রকৃতিব গুণসকলেব মধ্যে অবশ্যম্ভাবীরূপে বহিয়াছে একটা অসাম্যাবস্থা, মাত্রাব পবিবর্তনশীল অনবস্থিততা এবং প্রাধান্যেব জন্য অবিরত দ্বন্দ্ব, অন্যপক্ষে আত্মার যে মহত্তব জ্যোতি ও আনন্দ, স্থিরতা এবং প্রবৃত্তিমূলক সঙ্কল্প তাহারা পবস্পবকে বর্জন কবে না, দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হয না, এমনকি কেবলমাত্র সাম্যাবস্থাতেই থাকে না, পবন্তু প্রত্যেকটিই হইতেছে অপব দুইটির একটি রূপ এবং তাহাদের পূর্ণ অবস্থায তাহাবা সকলে হইতেছে অবিচ্ছেদ্য এবং এক। আমাদের মন যখন

ভগবানের দিকে অগ্রসর হয় তখন হয়ত একটিকে বর্জন করিয়া আর একটিতে প্রবেশ করিতেছে বলিয়া মনে হয়, হয়ত কর্মের প্রবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া শান্তি লাভ করিতে চাহিতেছে বলিয়া মনে হয়, কিন্তু এরূপ যে হয় তাহার কারণ মনের মধ্যে নির্বাচন করিবার যে ভাব রহিয়াছে আমরা প্রথমে সেইটিকে ধরিয়াই ভগবানের দিকে অগ্রসর হই। পরে যখন আমরা অধ্যাত্ম ভাবাপন্ন মনেরও উপরে উঠিতে সক্ষম হই, তখন আমরা দেখিতে পাই যে প্রত্যেক দিব্য শক্তিটির মধ্যেই বাকী সবগুলি নিহিত রহিয়াছে এবং প্রথম অবস্থার এই ভ্রান্তি হইতে মুক্ত হইতে পারি।[১]

তাহা হইলে আমরা দেখিতেছি যে, প্রকৃতির গুণসকলের সাধারণ অপকৃষ্ট ক্রিয়ার অধীন না হইয়াও কর্ম করা সম্ভব; যে মন প্রাণ দেহে আমরা গঠিত তাহাদের অপূর্ণতার উপরেই ঐ ক্রিয়া নির্ভর করে, ইহা হইতেছে একটা বিকৃতি, একটা অক্ষমতা, একটা ভ্রষ্ট ও মন্দীভূত অবস্থা, জড়াশ্রয়ী মন ও প্রাণ এইটিকেই আমাদের উপর চাপাইয়া দিয়াছে। যখন আমরা অধ্যাত্ম সত্তায় বিকশিত হই, তখন প্রকৃতির এই ধর্ম বা নিম্নতন ধারার পরিবর্তে আসে আত্মার অমৃত ধর্ম, সেখানে উপলব্ধ হয় এক মুক্ত অমৃতময় ক্রিয়া, এক অপরিসীম জ্ঞান, এক লোকোত্তর শক্তি, এক অতলস্পর্শ শান্তি। তথাপি কেমন করিয়া এই পরিবর্তন সাধিত হইবে সে প্রশ্নটি থাকিয়া যায়; কারণ একটা মধ্যবর্তী অবস্থা এবং ক্রমে ক্রমে পরিবর্তন অপরিহার্য, কেননা জগতে ভগবানের কার্যপরম্পরায় কোন জিনিসই একটা পদ্ধতি ও প্রতিষ্ঠা ব্যতীত হঠাৎ সম্পন্ন হয় না। আমরা যে জিনিসটি খুঁজিতেছি সেটি আমাদের মধ্যেই রহিয়াছে, কিন্তু কার্যত আমাদের পক্ষে সেইটিকে আমাদের প্রকৃতির নীচের রূপসকল হইতে বিকাশ করিয়া লইতে হইবে।[২] অতএব গুণসকলের ক্রিয়ার মধ্যেই এমন কোন উপায় থাকা আবশ্যক, এমন কোন সুবিধাজনক যন্ত্র, যাহা দ্বারা আমরা এই পরিবর্তন সাধন করিতে পারি। গীতা এই উপায় পাইয়াছে সত্ত্বগুণের পূর্ণ বিকাশে, সত্ত্বগুণ শক্তিময় আত্মবিস্তারের দ্বারা এমন স্থলে উপনীত হয় যখন সে নিজেকে অতিক্রম করিয়া

[১] ঊর্ধ্বতম প্রকৃতির ক্রিয়ার যেসব পরম অধ্যাত্ম ও অতিমানস রূপ নীচের প্রকৃতির গুণসকলের অনুরূপ তাহাদের যে বর্ণনা এখানে দেওয়া হইল তাহা গীতা হইতে গৃহীত নহে, পরন্তু অধ্যাত্ম অনুভূতি হইতেই লওয়া হইয়াছে। ঊর্ধ্বতম প্রকৃতির যে ক্রিয়া, উত্তমম্ রহস্যম, গীতা তাহার কোন বিস্তৃত বর্ণনা দেয় নাই, সাধককে তাহার নিজের অধ্যাত্ম অনুভূতির দ্বারাই তাহা আবিষ্কার করিয়া লইতে হইবে। যে উচ্চ সাত্ত্বিক প্রকৃতি ও ক্রিয়ার ভিতর দিয়া পরম রহস্যে পৌঁছিতে হইবে, গীতা শুধু তাহার স্বরূপটি নির্দেশ করিয়াছে এবং সেই সঙ্গেই সত্ত্বকে অতিক্রম করিবার এবং গুণত্রয়ের অতীত হইবার উপরে জোর দিয়াছে।

[২] আমাদের প্রকৃতি যে আত্মজয়, প্রয়াস ও সংযমের দ্বারা ঊর্ধ্বদিকে উঠে, সেইদিক হইতে বিবেচনা করিয়াই একথা বলা হইল। ইহা ছাড়াও সত্তাকে রূপান্তরিত করিবার জন্য তাহার মধ্যে ভাগবত জ্যোতি প্রতিষ্ঠা ও শক্তির ক্রমশ বেশী অবতরণ আবশ্যক হয়, নতুবা সন্ধিস্থলে পৌঁছিলে এবং তাহার ঊর্ধ্বে রূপান্তরটি সংসাধিত হইতে পারে না। সেইজন্যই রহিয়াছে শেষ ক্রিয়াস্বরূপ সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণের আবশ্যকতা।

নিজের উৎসে বিলীন হইতে পারে। ইহার কারণ স্পষ্ট, কেননা সত্ত্ব হইতেছে জ্যোতি ও প্রসন্নতার শক্তি, এই শক্তি স্থিরতা ও জ্ঞানের দিকে অগ্রসর হয় এবং তাহার উচ্চতম শিখরে, সে যাহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে সেই অধ্যাত্ম জ্যোতি ও আনন্দকে কতকটা প্রতিফলিত করিতে পারে, প্রায় তাহার সহিত মানস ঐক্য লাভ করিতে পারে। অন্য দুইটি গুণ এই রূপান্তর লাভ করিতে পারে না, রজঃ দিব্য সঙ্কল্পের প্রবৃত্তিতে এবং তমঃ দিব্য স্থিরতা ও শান্তিতে পরিণত হইতে পারে না যদি প্রকৃতিতে যে সাত্ত্বিক শক্তি রহিয়াছে তাহার সাহায্য না পাওয়া যায়। জাড্যের তত্ত্বটি চিরকালই শক্তির জড় নিষ্ক্রিয়তা এবং জ্ঞানের অক্ষমতা হইয়া থাকিবে যতক্ষণ না জ্যোতির মধ্যে তাহার অজ্ঞান লয় পাইতেছে এবং তাহার অসাড় অক্ষমতা শান্তিময় সর্বশক্তিমান ভাগবত সঙ্কল্পের দীপ্তি ও শক্তির মধ্যে লুপ্ত হইতেছে। কেবল তাহা হইলেই আমরা পরম শান্তি পাইতে পারি। অতএব তমঃকে সত্ত্বের দ্বারা অনুশাসিত হইতে হইবে। ঐ একই কারণে রজঃ-গুণ চিরকালই থাকিবে অস্থির বিক্ষুব্ধ উগ্র বা দুঃখময় ক্রিয়া কারণ ইহার যথার্থ জ্ঞান নাই, ইহার স্বাভাবিক গতিটি হইতেছে ভ্রান্ত ও বিকৃত ক্রিয়া, অজ্ঞানের দ্বারা বিকৃত। অতএব আমাদের সঙ্কল্পকে জ্ঞানের দ্বারা পরিশুদ্ধ হইতে হইবে, ইহাকে ক্রমশ বেশী বেশী যথার্থ ও জ্ঞানদীপ্ত ক্রিয়ায় পরিণত হইতে হইবে, তবেই ইহা সক্রিয় ভাগবত সঙ্কল্পে রূপান্তরিত হইতে পারিবে। ইহারও অর্থ হইতেছে এই যে, সত্ত্বের সাহায্য প্রয়োজন। সত্ত্বগুণই হইতেছে ঊর্ধ্বের প্রকৃতির ও নিম্নের প্রকৃতির মধ্যে প্রথম যোগসূত্র। অবশ্য ইহাকে এক স্থানে গিয়া রূপান্তরিত হইতে হইবে অথবা নিজেকে অতিক্রম করিতে হইবে এবং ভাঙ্গিয়া গিয়া নিজের উৎসের মধ্যে বিলীন হইতে হইবে; ইহার আপেক্ষিক, পরোক্ষ, অনুসন্ধানপরায়ণ জ্ঞানকে এবং যত্ন সহকারে বিরচিত কর্মকে আত্মার মুক্ত সাক্ষাৎ কর্মশক্তি ও স্বতঃস্ফূর্ত জ্যোতিতে পরিণত হইতে হইবে। কিন্তু ইতিমধ্যে সত্ত্বশক্তির সমুচ্চ বৃদ্ধি আমাদিগকে তামসিক ও রাজসিক অযোগ্যতা হইতে উদ্ধার করে; আর ইহার নিজের যে অযোগ্যতা তাহা অধিকতর সহজে অতিক্রম করা যায় যদি আমরা রজঃ ও তমঃ গুণের দ্বারা অত্যধিকভাবে নীচের দিকে আকর্ষিত না হই। সত্ত্বকে এমনভাবে বিকাশ করা যাহাতে তাহা অধ্যাত্ম জ্যোতি ও শান্তি ও প্রসন্নতায় পূর্ণ হইয়া উঠে, ইহাই হইতেছে প্রকৃতিকে রূপান্তরিত করিবার সাধনায় প্রথম বিধান।

আমরা দেখিব যে, এইটিই গীতার অবশিষ্ট অধ্যায়গুলিতে পরিস্ফুট করা হইয়াছে। কিন্তু এই দীপ্তিময় ক্রিয়াটি বিবেচনা করিবার পূর্বে গীতা উপক্রমণিকা স্বরূপ দেব ও অসুর এই দুইপ্রকার সত্তার প্রভেদ করিতেছে; কারণ দেব মহান আত্মরূপান্তর-সাধক সাত্ত্বিক ক্রিয়ায় সমর্থ, অসুর অসমর্থ। আমাদিগকে দেখিতে হইবে এই উপক্রমণিকার উদ্দেশ্য কি এবং এই প্রভেদের যথার্থ উপযোগিতা কি। সকল মানুষেরই সাধারণ প্রকৃতি এক, ইহা গুণত্রয়ের মিশ্রণ; ইহা হইতেই মনে হয় যে, সাত্ত্বিক অংশটিকে বিকশিত ও সুদৃঢ় করিবার এবং ইহাকে ঊর্ধ্বে দিব্য

রূপান্তরের শিখরের দিকে উন্নীত করিবার সামর্থ্য সকলের মধ্যেই রহিয়াছে। আমাদের সাধারণ প্রবৃত্তি হইতেছে আমাদের বুদ্ধি ও সঙ্কল্পকে আমাদের রাজসিক ও তামসিক অহমিকার অনুবর্তী করা, আমাদের অস্থির ও অব্যবস্থিত কর্মৈষণা বা আত্মবিলাসী আলস্য বা নিষ্ক্রিয় জাড্যের অনুবর্তী করা—ইহাকে কেবল আমাদের অপরিণত অধ্যাত্ম সত্তার একটা সাময়িক লক্ষণ বলিয়া মনে করা যাইতে পারে, ইহা আমাদের অসম্পূর্ণ বিকাশের অপরিপক্কতা, যখন আমাদের চৈতন্য অধ্যাত্ম ক্রমবিকাশে ঊর্ধ্বে উঠিবে তখন ইহা থাকিতে পারে না। কিন্তু কার্যত আমরা দেখিতে পাই যে, মানুষ, অন্তত একটা বিশেষ স্তরের উপরে মানুষ, প্রধানত দুই শ্রেণীর মধ্যে পড়ে—যাহাদের আছে জ্ঞান, আত্মসংযম, পরিপূর্ণতার দিকে সাত্ত্বিক প্রবৃত্তির প্রাবল্য, আর যাহাদের মধ্যে আছে রাজসিক প্রবৃত্তির প্রাবল্য, তাহারা চায় অহংমন্য প্রতিষ্ঠা, ভোগবাসনার পরিতৃপ্তি, নিজেদের প্রবল ইচ্ছা ও ব্যক্তিত্বের চরিতার্থতা, তাহা তাহারা মানুষের বা ভগবানের সেবার জন্য নহে পরন্তু নিজেদেরই গর্ব, যশ ও সুখের জন্য জগতের উপর আরোপ করিতে চায়। ইহারা হইতেছে মানুষের মধ্যে দেবতা ও দানব বা অসুরের প্রতিনিধি। ভারতের ধর্মসম্বন্ধীয় প্রতীকতন্ত্রে এই প্রভেদ অতি প্রাচীন। ঋগ্বেদের মূলগত পরিকল্পনা হইতেছে দেবগণ এবং তাঁহাদের তমোময় প্রতিদ্বন্দ্বীগণের মধ্যে যুদ্ধ, একদিকে সব জ্যোতির অধিপতি অনন্তের সন্তান, অন্যদিকে ভেদ ও রাত্রির সন্তানসকল, এই যুদ্ধে মানবও যোগদান করে এবং তাহা তাহার সকল আভ্যন্তরীণ জীবনে ও কর্মে প্রতিফলিত হয়। জোরোস্টারের ধর্মেও এইটিই ছিল মূল নীতি। পরবর্তী সাহিত্যে ঐ একই পরিকল্পনা সুস্পষ্ট। নৈতিক অর্থের দিক দিয়া রামায়ণ হইতেছে নররূপী দেব এবং মূর্তিমান রাক্ষসের মধ্যে, ধর্ম ও উচ্চসংস্কৃতির প্রতিনিধি এবং অতিবর্ধিত অহমিকার উচ্ছৃঙ্খল শক্তি ও দানবীয় সভ্যতার মধ্যে বিরাট দ্বন্দ্বের রূপকাত্মক কাহিনী। গীতা যে মহাভারতের অংশ, সেই মহাভারতের বিষয়বস্তু হইতেছে নররূপী দেব ও অসুরগণের মধ্যে আজীবন দ্বন্দ্ব, একপক্ষে শক্তিমান পুরুষগণ, তাঁহারা দেবতার সন্তান, তাঁহারা এক উচ্চ নৈতিক ধর্মের জ্যোতির দ্বারা অনুপ্রাণিত, অন্যপক্ষে মূর্তিমান দানবগণ, এই সব শক্তিমান পুরুষ মানসিক, প্রাণিক, দৈহিক অহমিকার সেবা করিতে অগ্রসর। প্রাচীন মানবের মন জড়-আবরণের পশ্চাতে বস্তুসকলের সত্য দর্শন করিতে আমাদের অপেক্ষা অধিক উন্মুক্ত ছিল, তাহা মানবজীবনের পশ্চাতে অসামান্য জাগতিক শক্তিসকলের সন্ধান পাইয়াছিল, তাহারা বিশ্বময়ী মহাশক্তির বিশিষ্ট ভাব বা ক্রমের প্রতিভূ দেব, অসুর, রাক্ষস, পিশাচ; আর যেসকল মনুষ্যের মধ্যে ইহাদের গুণ বিশেষভাবে দেখা যাইত তাহাদিগকেও দেব, অসুর, রাক্ষস, পিশাচ বলিয়া অভিহিত করা হইত। গীতা নিজের উদ্দেশ্য অনুসারে এই প্রভেদটি গ্রহণ করিয়াছে এবং এই দুই প্রকারের সত্তার মধ্যে, দ্বৌ ভূতসর্গৌ, পার্থক্যটি বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছে। গীতা ইতিপূর্বেই আসুরী ও রাক্ষসী প্রকৃতির কথা

বলিয়াছে, তাহা ভগবদ্ জ্ঞান, মুক্তি ও সিদ্ধির পরিপন্থী, যে দৈবী প্রকৃতি এই সবের অভিমুখী, গীতা এখন তাহার পার্থক্য দেখাইতেছে।

গুরু বলিলেন যে, অর্জুন হইতেছেন দৈবী প্রকৃতির, যুদ্ধ ও হত্যাকাণ্ড করিলে তিনি আসুরিক প্রেরণার অধীন হইয়া পড়িবেন এইরূপ আশঙ্কায় তাঁহার শোক করিবার কারণ নাই, মা শুচঃ সম্পদং দৈবীমভিজাতোঽসি পাণ্ডব![১] যে কর্মটির উপর সমুদয় নির্ভর করিতেছে, কালপুরুষরূপে প্রকট জগৎপ্রভুর আজ্ঞায় অর্জুনকে দেহধারী ভগবানকে সারথিরূপে লইয়া যে যুদ্ধ করিতে হইবে তাহা হইতেছে ধর্মরাজ্য স্থাপনের জন্য, সত্য ও ন্যায়ের রাজ্য স্থাপনের জন্য সংগ্রাম। তিনি নিজে দেব শ্রেণীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন; নিজের মধ্যে তিনি সাত্ত্বিক সত্তার বিকাশ করিয়াছেন, এখন তিনি এমন অবস্থায় পৌঁছিয়াছেন যেখানে তিনি এক উচ্চ রূপান্তরে সমর্থ এবং ত্রৈগুণ্য হইতে মুক্তিলাভে, অতএব সাত্ত্বিক প্রকৃতি হইতেও মুক্তিলাভে সমর্থ। দেব ও অসুর এই বিভাগ সমগ্র মানবজাতিতে ব্যাপ্ত নহে, সকল ব্যক্তির পক্ষেই নির্বিশেষে প্রযোজ্য নহে, মানবজাতির নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশের সকল স্তরে কিংবা ব্যষ্টিসত্তার বিকাশেরও সকল অবস্থায় এই বিভাগ খুব স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট নহে। সমগ্র জাতির অনেকখানি অংশ হইল তামসিক মনুষ্য, কিন্তু সে এখানে যে বিভাগ করা হইয়াছে তাহার কোনটির মধ্যেই পড়ে না, যদিও তাহার মধ্যে স্বল্প মাত্রায় উভয়েরই ধর্ম থাকিতে পারে এবং প্রধানত সে ক্ষীণভাবে নিম্নতর গুণগুলিরই অনুবর্তন করে। সাধারণ মানুষ সচরাচর একটি মিশ্র বস্তু, কিন্তু দুইটি প্রবৃত্তির মধ্যে কোন একটি তাহার মধ্যে অধিকতর প্রবল হয়, তাহাকে প্রধানত রজো-তামসিক কিংবা সত্ত্ব-রাজসিক করিয়া দিতে চায় এবং তাহাকে দিব্য অনাবিলতা বা আসুরিক বিক্ষুব্ধতা এই দুইটি পরিণতির কোন একটির জন্য প্রস্তুত করিয়া তুলিতেছে, এমনও বলিতে পারা যায়। কারণ এখানে গুণাত্মিকা প্রকৃতির ক্রমবিবর্তনে একটা পরিণতিকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে, এখানে গীতায় যেসকল বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে তাহা হইতেই ইহা বুঝা যায়। একদিকে হইতে পারে সত্ত্বগুণের উন্নয়ন, অজাত দেবতার আবির্ভাব বা প্রকাশ, অন্যদিকে হইতে পারে প্রকৃতিস্থ জীবের মধ্যে রজোগুণের উন্নয়ন, অসুরের পূর্ণ আবির্ভাব। একটি লইয়া যায় মুক্তির সাধনার দিকে, গীতা এইটির উপরেই জোর দিতে যাইতেছে; ইহার দ্বারা সত্ত্বগুণের পক্ষে নিজেকে অতিক্রম করা, ভাগবত সত্তার সাধর্ম্যে রূপান্তরিত হওয়া সম্ভব হয়, বিমোক্ষায়। অপরটি সেই বিশ্বগত সম্ভাবনা হইতে দূরে লইয়া যায় এবং আমাদের অহং-বন্ধনের অতিবৃদ্ধি দ্রুততর করিয়া তোলে। এইটিই হইতেছে পার্থক্যটির মূল সূত্র।

দৈবী প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য হইতেছে সাত্ত্বিক সংস্কার ও গুণসকলের পরাকাষ্ঠা;[২]

[১] অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধির্জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ।
দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়স্তপ আর্জবম্॥১৬।১

আত্মসংযম, যজ্ঞ, ধর্মভাব, শুচিতা ও নির্মলতা, সাবল্য ও অকপটতা, সত্য, শান্তি, আত্মত্যাগ, সর্বভূতে দযা, নিবভিমানতা, কোমলতা, ক্ষমা, ধৈর্য, নিষ্ঠা, সকলবকম চাঞ্চল্য, লঘুতা ও অস্থিবচিত্ততা হইতে গভীর ও মধুব ও গম্ভীব মুক্তি, এই সব হইতেছে তাহার স্বাভাবিক লক্ষণ, তাহাব গঠনে ক্রোধ, লোভ, ধূর্ততা, বিশ্বাসঘাতকতা, স্বেচ্ছাকৃত হিংসা, দম্ভ, দর্প এবং অত্যধিক স্বাভিমানতা স্থান পায না। কিন্তু ইহাব যে কোমলতা ও আত্মত্যাগ ও আত্মসংযম সেসবও দুর্বলতা হইতে মুক্ত; ইহাব আছে তেজ ও আত্মশক্তি, দৃঢ সঙ্কল্প, ন্যায ও সত্য অনুসারে জীবনযাপনের নির্ভয়তা এবং অহিংসা। সমগ্র সত্তা সমগ্র প্রকৃতি সম্পূর্ণভাবে শুদ্ধ; আছে জ্ঞানেব সন্ধান এবং জ্ঞানযোগে স্থিব ও দৃঢ প্রতিষ্ঠা, জ্ঞানযোগ-ব্যবস্থিতিঃ। যে ব্যক্তি দৈবী প্রকৃতিতে জন্মগ্রহণ কবিযাছে, ইহাই তাহাব সম্পদ, তাহার সমৃদ্ধি।

আসুবী প্রকৃতিবও সম্পদ আছে, শক্তিব সমৃদ্ধি আছে, কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ বিভিন্ন, তাহা বলশালী ও অশুভ। আসুরিক মনুষ্যদেব কর্মে প্রবৃত্তি বা কর্মেব নিবৃত্তি সম্বন্ধে, প্রকৃতির পরিপূরণ বা প্রত্যাহাব সম্বন্ধে কোন সত্য জ্ঞান নাই। তাহাদের সত্য, শৌচ, আচার কিছুই নাই।[১] তাহারা স্বভাবত দেখে যে, জগৎ আত্মতৃপ্তিব এক বিরাট খেলা ভিন্ন আর কিছুই নহে, তাহাদেব যে জগৎ তাহাব হেতু এবং বীজ এবং নিয়ামক শক্তি হইতেছে কামনা, তাহা অনিযমেব জগৎ, সে জগতের কোন সঙ্গত বিধান নাই, নির্দিষ্ট কার্যকাবণ শৃঙ্খলা নাই, সে জগৎ ঈশ্বরহীন, সত্যহীন, প্রতিষ্ঠাহীন।[২] তাহাদেব বুদ্ধিসম্মত বা ধর্মসম্বন্ধীয অন্য উৎকৃষ্টতর বা উচ্চতর মতবাদ যাহাই থাকুক না কেন, কর্মক্ষেত্রে তাহাদেব মন-বুদ্ধির এইটিই হয় যথার্থ নীতি, তাহারা সর্বদা কামনা ও অহং-এবই উপাসনা কবে। বাস্তব জীবনকে এই দৃষ্টিতে দেখাব উপরেই তাহাবা নির্ভর কবে এবং এই মিথ্যা দৃষ্টিব দ্বারা তাহাবা তাহাদের আত্মা ও বুদ্ধিব সর্বনাশ সাধন কবে।[৩] আসুবিক

অহিংসা সত্যমক্রোধস্ত্যাগঃ শান্তিরপৈশুনম্।
দযা ভূতেষ্বলোলুপ্ত্বংমার্দ্দবং হ্রীরচাপলম্॥
তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচমদ্রোহো নাতিমানিতা।
ভবন্তি সম্পদং দৈবীমভিজাতস্য ভাবত॥
দম্ভো দর্পোঽভিমানশ্চ ক্রোধঃ পাক্ষ্যমেব চ।
অজ্ঞানং চাভিজাতস্য পার্থ সম্পদমাসুবীম্॥১৬।২-৪

[১] প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ জনা ন বিদুবাসুবাঃ।
ন শৌচং নাপি চাচাবো ন সত্যং তেষু বিদ্যতে॥১৬।৭

[২] অসত্যমপ্রতিষ্ঠং তে জগদাহুবনীশ্বম্।
অপবস্পবসম্ভূতং কিমন্যৎ কামহৈতুকম্॥১৬।৮

[৩] এতাং দৃষ্টিমবষ্টভ্য নষ্টাত্মানোঽল্পবুদ্ধযঃ।
প্রভবন্ত্যুগ্রকর্ম্মাণঃ ক্ষযায জগতোঽহিতাঃ॥১৬।৯

মানব প্রচণ্ড, আসুবিক, ঘোব হিংসাত্মক কর্মেব কেন্দ্র বা যন্ত্র হয়, জগতে ধ্বংসশক্তিরূপে আবির্ভূত হয, অনিষ্ট ও অশুভের উৎস হইযা উঠে। এইসকল দম্ভমানমদান্বিত পথভ্রষ্ট জীব নিজদিগকে মোহগ্রস্ত করিযা তোলে, মিথ্যা ও অন্ধ লক্ষ্যসকলে লাগিযা থাকে, নিজেদেব কামনাতৃপ্তিব অশুচি সঙ্কল্প দৃঢ়তার সহিত অনুসবণ কবে।[১] কামোপভোগ ব্যতীত জীবনেব যে আব অন্য কোন লক্ষ্য আছে তাহা তাহাবা ধাবণা কবিতে পাবে না এবং দুষ্পূবণীয কামনার অনুসরণ করিয়া তাহাবা মৃত্যুকাল পর্যন্ত সর্বগ্রাসী অপরিমেয চিন্তা ও উৎকণ্ঠা ও প্রয়াসেব কবলিত হইযা থাকে।[২] শত বন্ধনে বদ্ধ হইযা, কাম ও ক্রোধে দগ্ধ হইযা, নিজেদের ভোগ, নিজেদেব লালসা তৃপ্তিব জন্য অন্যাযভাবে অর্থ সঞ্চয়ে লিপ্ত থাকিয়া তাহাবা মনে কবে—"অদ্য আমাব এই লাভ হইল, পবে আমার এই মনোবথ পূর্ণ হইবে আজ আমাব এত ধন আছে, কাল আমি আবও পাইব।[৩] আমি এই শত্রুকে নিহত কবিযাছি, অবশিষ্টগুলিকেও আমি নিহত কবিব।[৪] আমিই মানুষেব রাজা ও বিধাতা, আমি শুদ্ধ, পূর্ণ, বলবান, সুখী, ভাগ্যবান, সকল ভোগের আমিই অধিকাবী, আমি ধনবান, আমি কুলীন, আমাব তুল্য আর কে আছে? আমি যজ্ঞ কবিব, দান কবিব, উপভোগ কবিব।"[৫] এইরূপে বহু অহঙ্কৃতভাবের দ্বারা বিভ্রান্ত, মোহগ্রস্ত হইযা, কর্ম কবিযা কিন্তু অসঙ্গতভাবে কর্ম কবিয়া, তাহাদেব নিজেদেব মধ্যে এবং মানুষেব মধ্যে যে ভগবান রহিযাছেন তাঁহাব উদ্দেশে নহে পবন্তু নিজেদেব জন্য, বাসনাতৃপ্তিব জন্য, ভোগের জন্য বিরাট কর্ম করিয়া, তাহাবা নিজেদেবই পাপেব অশুচি নরকে পতিত হয়।[৬] তাহারা যজ্ঞ করে, দান কবে কিন্তু আত্মশ্লাঘাব বশে, ধনমানের গর্বে, অনম্র ও অবোধ দম্ভ লইয়া। তাহাদেব শক্তি ও বলেব অহঙ্কারে, তাহাদেব ক্রোধ ও দম্ভেব প্রচণ্ডতায়, তাহারা তাহাদেব মধ্যে অবস্থিত ভগবানকে, মানুষের মধ্যে অবস্থিত ভগবানকে দ্বেষ ও

কামমাশ্রিত্য দুষ্পূবং দম্ভমানমদান্বিতাঃ।
মোহাদ্ গৃহীত্বাঽসদ্গ্রাহান্ প্রবর্ত্তন্তেঽশুচিব্রতাঃ॥১৬।১০
চিন্তামপবিমেয্যঞ্চ প্রলযান্তামুপাশ্রিতাঃ।
কামোপভোগপবমা এতাবদিতি নিশ্চিতাঃ॥১৬।১১
আশাপাশশতৈর্ব্বদ্ধাঃ কামক্রোধপবাযণাঃ।
ঈহন্তে কামভোগার্থমন্যাযেনার্থসঞ্চযান্॥
ইদমদ্য মযা লব্ধমিমং প্রাপ্স্যে মনোবথম্।
ইদমস্তীদমপি মে ভবিষ্যতি পুনর্ধনম্॥১৬।১২-১৩

[১] অসৌ মযা হতঃ শত্রুর্হনিষ্যে চাপবানপি।
ঈশ্বরোঽহমহং ভোগী সিদ্ধোঽহং বলবান্ সুখী॥১৬।১৪

[২] আঢ্যোঽভিজনবানস্মি কোঽন্যোঽস্তি সদৃশো মযা।
যক্ষ্যে দাস্যামি মোদিষ্য ইত্যজ্ঞানবিমোহিতাঃ॥১৬।১৫

[৩] অনেকচিত্তবিভ্রান্তা মোহজালসমাবৃতাঃ।
প্রসক্তাঃ কামভোগেষু পতন্তি নবকেঽশুচৌ॥১৬।১৬

তাচ্ছিল্য করে।[১] আর যেহেতু শুভের প্রতি, ভগবানের প্রতি, তাহাদের এইরূপ গর্বিত দ্বেষ ও অবজ্ঞা আছে, যেহেতু তাহারা ক্রূর ও পাপময়, সেইজন্য ভগবান তাহাদিগকে পুনঃপুনঃ আসুর যোনিতে নিক্ষেপ করেন।[২] তাঁহাকে ভজনা না করায় তাঁহাকে তাহারা পায় না এবং অবশেষে তাঁহাকে পাইবার পথ সম্পূর্ণভাবে হারাইয়া অন্তঃপ্রকৃতির নিম্নতম স্তরে পতিত হয়, যান্ত্যধমাং গতিং।[৩]

এই যে জীবতত্ত্ববর্ণনা, ইহার দ্বারা যে পার্থক্যটি সূচিত হইতেছে তাহার পূর্ণ উপযোগিতা স্বীকার করিয়া লইলেও ইহার মধ্যে যে অর্থ নাই তাহা টানিয়া বাহির করিলে চলিবে না। যখন বলা হয় যে, এই জড়জগতে দুই প্রকারের সৃষ্ট জীব আছে, দ্বৌ ভূতসর্গৌ, দেব ও অসুর,[৪] তাহার অর্থ ইহা নহে যে, প্রকৃতিতে প্রত্যেক মানুষের অবশ্যম্ভাবী জীবনগতি কোন্‌টি হইবে ভগবান তাহা প্রথম হইতেই নির্দিষ্ট করিয়া তাহাকে সৃজন করিয়াছেন, আর ইহাও ঠিক নহে যে, এক অপরিবর্তনীয় আধ্যাত্মিক ভবিতব্য আছে এবং ভগবান প্রথম হইতেই যাহাদিগকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন তাহাদিগকে এমনভাবে অন্ধ করিয়া দিয়াছেন যেন তাহারা অনন্ত শাস্তি ও অশুচি নরকে পতিত হয়। সকল জীবই ভগবানের সনাতন অংশ, যেমন দেব তেমনই অসুরও, সকলেই উদ্ধার লাভ করিতে পারে, অধমতম পাপীও ভগবানের দিকে ফিরিতে পারে। কিন্তু প্রকৃতিতে জীবের যে ক্রমবিবর্তন তাহা হইতেছে একটা সঙ্কটসঙ্কুল অভিযান, তাহাতে সর্বদা স্বভাব এবং স্বভাবের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত কর্মই হইতেছে দুইটি প্রধান শক্তি, আর যদি স্বভাবের প্রকটনে, জীবের আত্ম-অভিব্যক্তিতে, কোন আতিশয্য, ইহার লীলায় কোন বিশৃঙ্খলা সত্তার ধর্মকে কুটিল পথে চালিত করে, যদি রাজসিক গুণসকলকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়, সত্ত্বকে হ্রাস করা হয়, তাহা হইলে কর্ম ও তাহার ফলসকলের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হয় মুক্তির অনুকূল সত্ত্বের উৎকর্ষ নহে, পরন্তু নীচের প্রকৃতির বিকৃতিসকলের অত্যধিক আতিশয্য। মানুষটি যদি তখনও বিরত না হয়, তাহার ভ্রান্ত পথ

[১] আত্মসম্ভাবিতাঃ স্তব্ধা ধনমানমদান্বিতাঃ।
যজন্তে নামযজ্ঞৈস্তে দম্ভেনাবিধিপূর্ব্বকম্॥
অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং চ সংশ্রিতাঃ।
মামাত্মপরদেহেষু প্রদ্বিষন্তোঽভ্যসূয়কাঃ॥১৬।১৭-১৮

[২] তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু॥১৬।১৯

[৩] আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢা জন্মনি জন্মনি।
মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো যান্ত্যধমাং গতিম্॥১৬।২০

[৪] দুই প্রকার সৃষ্ট জীবের পার্থক্যটি সম্পূর্ণভাবে সত্য জড়াতীত লোকসকলে, সেখানকার গতিধারা অধ্যাত্ম ক্রমবিবর্তনের নীতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না। যেমন দেবতাদের জগৎ আছে, তেমনি অসুরদেরও জগৎ আছে, আর আমাদের পশ্চাতের এই সব জগতে এমন সব অপরিবর্তনীয় রূপের জীব আছে যাহারা বিশ্বের প্রগতির জন্য অপরিহার্য পূর্ণ দিব্য সৃষ্টিক্রিয়ায় সহায়তা করে এবং পৃথিবীর উপরে এবং ভৌতিক স্তরে অবস্থিত মানুষের জীবন ও প্রকৃতির উপরেও তাহাদের প্রভাব বিস্তার করে।

পরিত্যাগ না করে তাহা হইলে তাহার মধ্যে অসুরের পূর্ণ জন্ম হয় এবং একবার যদি সে জ্যোতি ও সত্যের বিপরীত দিকে ঐরূপ অত্যধিকভাবে ঝুঁকিয়া পড়ে তাহা হইলে তাহার মধ্যে যে ভাগবত শক্তির অপপ্রয়োগ হইতেছে তাহার বিপুলতার জন্যই সে আর তাহার ধ্বংসমুখী গতিবেগকে ফিরাইতে সক্ষম হয় না যতক্ষণ না সে অধঃপতনের গভীরতার শেষ সীমায় উপনীত হয় এবং তল স্পর্শ করে এবং দেখে যে সেই পথ তাহাকে কোথায় আনিয়া ফেলিয়াছে, শক্তিটি অপব্যবহারে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে, সে নিজে জীবপ্রকৃতির অধস্তন স্তরে নামিয়াছে, তাহাই নরক। যখন সে বুঝিতে পারে এবং জ্যোতির দিকে ফিরিয়া দাঁড়ায় তখনই গীতার অন্য সত্যটি আসে যে, অধমতম পাপী, অশুদ্ধতম ও প্রচণ্ডতম দুরাচারী ব্যক্তিও যদি অন্তরস্থ ভগবানকে ভজনা করিতে ও অনুসরণ করিতে প্রবৃত্ত হয় তাহা হইলে সেই মুহূর্তেই সে রক্ষা পায়। তখন কেবল সেই ফিরিয়া দাঁড়ানোর জন্যই সে শীঘ্র সাত্ত্বিক পথটি ধরিতে পারে এবং তাহা সিদ্ধি ও মুক্তির দিকে লইয়া যায়।

আসুরিক প্রকৃতি হইতেছে রাজসিক প্রকৃতিরই চরম মাত্রা; ইহা জীবকে প্রকৃতির দাসত্বের মধ্যে লইয়া যায়, কাম ক্রোধ ও লোভের মধ্যে লইয়া যায়, এই তিনটি হইতেছে রাজসিক অহং-এর তিনটি শক্তি এবং ইহারাই নরকের দ্বার। এই নরকের মধ্যেই প্রাকৃত জীব পতিত হয় যখন সে তাহার নিম্নতর ও বিকৃত সংস্কারসকলের অশুচিতা, অশুভ ও ভ্রান্তিকে প্রশ্রয় দেয়। এই তিনটিই অন্যদিকে আবার এক বিশাল তমিস্রার দ্বার, তাহারা আদি অজ্ঞানের স্বভাবসিদ্ধ যে তামস তাহার মধ্যে লইয়া যায়, কারণ রাজসিক প্রকৃতির উদ্দাম শক্তি যখন শ্রান্ত হইয়া পড়ে তখন তাহা পুনরায় আত্মার অধমতম তামসিক পরিস্থিতির দৌর্বল্য, অবসাদ, অন্ধকার, অক্ষমতার মধ্যে পতিত হয়। এই অধঃপতন হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে, মানুষকে এই তিনটি অশুভ শক্তি পরিহার করিতে হইবে এবং সত্ত্বগুণের জ্যোতির দিকে ফিরিতে হইবে, যথাযথভাবে, যথার্থ সম্বন্ধে, সত্য ও ধর্ম অনুসরণ করিয়া জীবনযাপন করিতে হইবে, তাহা হইলেই সে তাহার মহত্তর কল্যাণের অনুসরণ করিবে এবং মহত্তম আত্মস্থিতিতে উপনীত হইতে পারিবে। কামনার ধর্ম অনুসরণ করা আমাদের প্রকৃতির সত্য নীতি নহে, ইহার কর্মের এক উচ্চতর ও যোগ্যতর আদর্শ আছে। কিন্তু কোথায় তাহা নিহিত, কিরূপে তাহা পাওয়া যায়? প্রথমত মানবজাতি সর্বদাই এই ন্যায্য ও মহতী নীতির সন্ধান করিয়াছে এবং যাহা কিছু সে আবিষ্কার করিতে পারিয়াছে সেসব তাহার শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ করিয়াছে, ঐ শাস্ত্র হইতেছে বিদ্যা ও জ্ঞানের বিধান, নৈতিকতার বিধান, ধর্মের বিধান, শ্রেষ্ঠ সামাজিক আচারের বিধান, মানুষের সহিত, ভগবানের সহিত ও প্রকৃতির সহিত আমাদের যথাযথ সম্বন্ধ স্থাপনের বিধান। তামসিক মানবের গতানুগতিক অভ্যাসের বশে মন অজ্ঞভাবে যেসব প্রথা অনুসরণ করে, তাহাদের কোনটি হয়ত ভাল, কোনটি মন্দ—এসবের সমষ্টিই শাস্ত্র নহে। অন্তর্বোধ, অভিজ্ঞতা ও প্রজ্ঞার

দ্বারা যে জ্ঞান ও শিক্ষা লিপিবদ্ধ হয তাহাই শাস্ত্র, তাহা হইতেছে জীবনেব বিজ্ঞান, জীবনের শিল্প, জীবনের নৈতিক বিধান, জাতিব পক্ষে যাহা তাৎকালিক শ্রেষ্ঠতম আদর্শ তাহাই শাস্ত্র। অর্ধ-প্রবুদ্ধ যে মানুষ শাস্ত্রেব বিধি পবিত্যাগ কবিযা তাহার কামনা ও সহজাত সংস্কাবেব অনুসবণ করে, সে ইন্দ্রিযতৃপ্তি পাইতে পাবে কিন্তু সুখ পাইবে না, কারণ আভ্যন্তরীণ যে সুখ তাহা কেবল যথাযথভাবে জীবনযাপন কবিযাই লাভ কবা যায়।[১] সে সিদ্ধির দিকে অগ্রসব হইতে পাবে না, উচ্চতম আধ্যাত্মিক গতি লাভ কবিতে সক্ষম হয না। সংস্কাব ও কামনা পাশব জগতেই সর্বপ্রথম নীতি বলিযা মনে হয কিন্তু মানুষেব মনুষ্যত্ব বিকশিত হয সত্য ও ধর্ম ও জ্ঞান ও যথাযথ জীবনধাবাব অনুসবণে। অতএব মানুষ তাহাব সত্তাব নিম্নতর অঙ্গসকলকে যুক্তি ও বুদ্ধিব দ্বাবা নিয়ন্ত্রিত কবিবাব জন্য যে শাস্ত্র যে সর্বসম্মত বিধি দাঁড় করাইযাছে প্রথমত তাহাব অনুসবণ কবিতেই হইবে, তাহাকেই আচরণ ও কর্মেব, কর্তব্যাকর্তব্যেব প্রামাণ্য কবিতে হইবে যতক্ষণ না সংস্কাবমূলক বাসনাময়ী প্রকৃতি নিযমিত ও প্রশমিত হইতেছে, আত্মসংযমেব অভ্যাসের দ্বারা বশীভূত হইতেছে এবং মানুষ প্রথমে আবও মুক্ততব বুদ্ধিসম্মত আত্মপরিচালনাব জন্য এবং পরে অধ্যাত্ম প্রকৃতিব উচ্চতম নীতি ও পবম মুক্তিব জন্য যোগ্য হইয়া উঠিতেছে।

কাবণ শাস্ত্র বলিতে সাধাবণত যাহা বুঝায তাহা সেই অধ্যাত্ম নীতি নহে, যদিও ইহাব উচ্চতম স্তরে যেখানে ইহা অধ্যাত্মভাবে জীবনযাপন কবিবাব বিদ্যা ও প্রযোগনীতি (গীতা নিজের শিক্ষাকেই উচ্চতম ও গুহ্যতম শাস্ত্র বলিযাছে, ১৫।২০) সেখানে ইহা সাত্ত্বিক প্রকৃতি কেমন কবিযা নিজেকে অতিক্রম কবিতে পারে তাহাব বিধি নিরূপণ করিয়া দেয এবং যে সাধনাব দ্বাবা অধ্যাত্ম রূপান্তব সাধিত হইবে তাহার বিকাশ করে। তথাপি সকল শাস্ত্রই কতকগুলি শিক্ষামূলক ব্যবস্থা বা ধর্ম লইয়া গঠিত, উহা উপায মাত্র, লক্ষ্য নহে। পবম লক্ষ্য হইতেছে আত্মার মুক্তি, তখন জীব সর্বধর্ম পরিত্যাগ কবিযা তাহাব কর্মেব একমাত্র নীতিব জন্য ভগবানের অভিমুখী হয, সাক্ষাৎভাবে ভগবৎ ইচ্ছা হইতেই কর্ম কবে, ধর্মেব মধ্যে নহে, আত্মাব মধ্যেই বাস কবে। অর্জুনেব পববর্তী প্রশ্নে শিক্ষাটিব এইরূপ বিকাশই সূচিত হইতেছে।

[১] যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ততে কামকাবতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পবাং গতিম্॥১৬।২৩

অষ্টাদশ অধ্যায

গুণ, শ্রদ্ধা ও কর্ম

গীতা দুই প্রকাব কর্মেব প্রভেদ করিযাছে, ব্যক্তিগত কামনাব স্বৈবতা অনুসবণে কর্ম, কামচাবতঃ এবং শাস্ত্রেব অনুসবণে কর্ম। শাস্ত্র বলিতে আমাদিগকে বুঝিতে হইবে জীবনযাত্রার সর্বসম্মত বিদ্যা এবং প্রয়োগকৌশল, তাহা মানবজাতিব সমষ্টিগত জীবনেব ফল, তাহার সংস্কৃতি, তাহার কর্ম, তাহাব বিজ্ঞান, জীবনেব শ্রেষ্ঠ বিধি সম্বন্ধে তাহাব প্রগতিশীল আবিষ্কাব—কিন্তু সে মানবজাতি এখনও অজ্ঞানেব মধ্যে চলিতেছে এবং অর্ধালোকে জ্ঞানেব অভিমুখে অগ্রসব হইতেছে। ব্যক্তিগত কামনাব বশে কর্ম আমাদেব প্রকৃতির অসংস্কৃত অবস্থাব জিনিস, তাহা অজ্ঞান ও মিথ্যাজ্ঞানেব দ্বারা এবং অনিয়ন্ত্রিত বা কুনিযন্ত্রিত বাজসিক অহমিকাব দ্বাবা অনুপ্রেবিত। শাস্ত্রের দ্বাবা নিযন্ত্রিত কর্ম হইতেছে বুদ্ধিগত, নীতিগত, সৌন্দর্যবোধগত, সমাজগত, ধর্মগত কৃষ্টিব ফল; ইহাতে আছে কোনরূপ যথাযথ জীবনধাবণ, সুসঙ্গতি এবং যথাযথ ব্যবস্থাব প্রযাস এবং সে প্রযাস স্পষ্টতই হইতেছে মানুষেব সাত্ত্বিক অংশের পক্ষে তাহার রাজসিক ও তামসিক অহমিকাকে অতিক্রম কবা, সংযত ও নিযন্ত্রিত কবা অথবা যেখানে তাহাদিগকে স্বীকাব কবিযা লইতেই হইবে সেখানে তাহাদিগকে পবিচালিত করার প্রযাস, সে প্রযাস কতটা অগ্রসব হইবে তাহা ঘটনাচক্রেব উপবই নির্ভব করে। সম্মুখে অগ্রসব হইবাব পক্ষে এইটি উপায় স্বরূপ, অতএব মানুষকে প্রথমত ইহাব ভিতব দিযা যাইতেই হইবে এবং তাহার ব্যক্তিগত কামনাব প্রেবণা অনুসরণ না কবিযা এই শাস্ত্রকেই তাহাব কর্মেব বিধান বলিয়া গ্রহণ কবিতে হইবে। যেখানেই মানবজাতি কোন সুপ্রতিষ্ঠিত ও বিকশিত সমাজ ব্যবস্থায় উপনীত হইয়াছে সেইখানেই সে এই সাধাবণ নীতিটি সর্বদাই স্বীকার কবিযা লইয়াছে; শৃঙ্খলা সম্বন্ধে একটা ধাবণা, একটা নীতি, নিজেব পূর্ণতাব একটা আদর্শ তাহার আছে, তাহা তাহাব কামনাব নির্দেশ বা অসংস্কৃত প্রেবণাসকলেব স্থূল নির্দেশ হইতে বিভিন্ন। এই মহত্তব নীতিটি মানুষ সাধাবণত পায় নিজের বাহিরে জাতিব ভূযোদর্শিতা ও অভিজ্ঞতাব কোন অল্পাধিক নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে, সেইটি সে গ্রহণ কবে, তাহাতেই তাহাব মন এবং তাহাব সত্তাব প্রধান প্রধান অংশগুলি সম্মতি দেয অথবা অনুমতি দেয এবং তাহার মন, সঙ্কল্প ও কর্মে তদনুসাবে জীবনযাপন কবিযা সেইটিকেই সে নিজেব কবিযা লয়। আর সত্তাব এই যে সম্মতি, বিশ্বাস কবিবাব, সংসিদ্ধ করিবাব এই যে সজ্ঞান স্বীকৃতি ও সঙ্কল্প, ইহাকে তাহার শ্রদ্ধা বলা যাইতে পাবে, গীতা এই নামটি ব্যবহাব করিযাছে। যে ধর্ম, দর্শনশাস্ত্র, সামাজিক আদর্শ বা কৃষ্টিগত আদর্শে আমি শ্রদ্ধাবান, তাহা আমাকে আমাব

প্রকৃতির জন্য এবং ইহার কর্মের জন্য একটা নীতি দেয়, আপেক্ষিক যাথার্থ্যের, আপেক্ষিক বা পূর্ণতম সিদ্ধির একটা ধারণা দেয় এবং তাহাতে আমার শ্রদ্ধা যে অনুপাতে ঐকান্তিক ও সম্পূর্ণ হয়, সেই শ্রদ্ধা অনুসারে জীবনযাপন করিবার সঙ্কল্প যে অনুপাতে প্রগাঢ় হয়, সেই অনুপাতে আমি উহার অনুরূপ হইতে পারি; আমি নিজেকে সেই যাথার্থ্যের প্রতিমূর্তিরূপে, সেই সিদ্ধির আদর্শ দৃষ্টান্তরূপে গড়িয়া তুলিতে পারি।

কিন্তু আবার আমরা ইহাও দেখিতে পাই যে, মানুষের মধ্যে তাহার বাসনার নির্দেশ ছাড়া এবং ধর্ম, নির্দিষ্ট আদর্শ, শাস্ত্রের নিরাপদ নিয়ামক বিধি অনুসরণ করিবার ইচ্ছা ছাড়াও একটা মুক্ততর প্রবৃত্তি রহিয়াছে। দেখা যায় যে, ব্যক্তি অনেক সময়েই এবং সমাজও তাহার জীবনের যেকোন মুহূর্তে শাস্ত্রকে পরিহার করিতেছে, তাহাতে অধীর হইয়া উঠিতেছে, তাহার সঙ্কল্প ও শ্রদ্ধার সেই রূপটিকে হারাইতেছে এবং অন্য কোন নীতির সন্ধানে অগ্রসর হইতেছে, সেইটিকেই সে এখন কর্মের যথার্থ বিধান বলিয়া গ্রহণ করিতে এবং জীবনের অধিকতর প্রাণবন্ত ও উচ্চতর সত্য বলিয়া মান্য করিতে বেশী ইচ্ছুক হইতেছে। এইরূপ ঘটিতে পারে যখন প্রচলিত শাস্ত্র আর জীবন্ত বস্তু থাকে না, পরন্তু অপকৃষ্ট ও আড়ষ্ট হইয়া কেবল গতানুগতিক প্রথা ও আচারের স্তূপে পরিণত হয়। অথবা ইহা আসিতে পারে যদি দেখা যায় যে, শাস্ত্র অসম্পূর্ণ অথবা প্রয়োজনীয় প্রগতির পক্ষে আর উপযোগী নহে; একটা নূতন সত্য, জীবনের একটা পূর্ণতর ধর্ম অবশ্যপ্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে। যদি তাহা বর্তমান না থাকে, তাহা হইলে তাহাকে আবিষ্কার করিতে হইবে জাতির চেষ্টার দ্বারা অথবা জাতির আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতিভূ স্বরূপ কোন মহৎ ও জ্ঞানালোকিত ব্যক্তিগত মনীষা দ্বারা। বৈদিক ধর্ম লোকাচারে পরিণত হইল, তখন এক বুদ্ধ আবির্ভূত হইলেন তাঁহার অষ্টাঙ্গ মার্গের নূতন বিধান এবং নির্বাণের আদর্শ লইয়া, আর এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, তিনি ইহাকে তাঁহার ব্যক্তিগত সৃষ্টি বলিয়া প্রচার করিলেন না, বলিলেন যে, ইহা আর্য জীবনের সত্য নীতি, জ্ঞানোদ্ভাসিত মনীষা ও প্রবুদ্ধ আত্মার দ্বারা, বুদ্ধের দ্বারা ইহা বার বার পুনরাবিষ্কৃত হইয়াছে। কিন্তু কার্যত ইহার অর্থ হইতেছে এই যে, একটি আদর্শ, একটি শাশ্বত ধর্ম আছে যাহাকে ধর্ম, দর্শন, নীতিশাস্ত্র এবং মানুষের মধ্যে আর যেসব শক্তি সত্য ও পূর্ণতার জন্য প্রয়াস করে সকলেই আভ্যন্তরীণ ও বাহ্য জীবনের বিদ্যা ও প্রয়োগনীতির নবতম বিবৃতিতে, নূতন শাস্ত্রে বিধিবদ্ধ করিতে নিরন্তর চেষ্টা করিতেছে। মুশা-প্রবর্তিত ধর্ম, নীতি, সামাজিক সদাচারের বিধান সঙ্কীর্ণ ও অপূর্ণ বলিয়া নিন্দিত হইল, তাহা ছাড়া এখন উহা লোকাচার মাত্র হইয়া দাঁড়াইল; এখন খ্রীষ্টের ধর্ম উহার স্থান গ্রহণ করিতে আসিল, একই সঙ্গে উহাকে উচ্ছেদ ও সার্থক করিতে চাহিল, তাহার অসম্পূর্ণ বাহ্য রূপকে উচ্ছেদ করিতে চাহিল এবং জীবনের যে দিব্য বিধান উহার লক্ষ্য ছিল সেইটিকে আত্মার গভীরতর ও প্রশস্ততর জ্যোতি ও শক্তিতে সার্থক করিতে চাহিল। আর মানুষের

অনুসন্ধান ঐখানেই থামিয়া যায় নাই, পরন্তু এই সকল বিধানকেও পরিহার করিয়াছে, যে সত্যকে সে এককালে বর্জন করিয়াছিল তাহাতেই পুনরায় ফিরিয়া গিয়াছে অথবা কোন নূতন সত্য ও শক্তির দিকে অগ্রসর হইয়াছে, কিন্তু সকল সময়ে সে একটি জিনিসই সন্ধান করিয়াছে, তাহার সর্বাঙ্গসিদ্ধির নীতি, তাহার যথাযথ জীবন যাপনের বিধান, তাহার পূর্ণ, উচ্চতম ও মূলগত আত্মা ও প্রকৃতি।

এই প্রয়াসটি ব্যক্তি হইতেই আরম্ভ হয়, সে আর প্রচলিত ধর্মে সন্তুষ্ট থাকে না। কারণ সে দেখিতে পায় যে, তাহার নিজের এবং জীবনের সম্বন্ধে তাহার যে ধারণা, তাহার যে উদারতম ও গভীরতম অনুভূতি তাহার সহিত ঐ ধর্মের আর সঙ্গতি নাই, অতএব তাহার উপর আস্থা স্থাপন করিবার, তাহার অনুষ্ঠান করিবার সঙ্কল্প সে আর আনিতে পারে না। ইহা আর তাহার সত্তার আভ্যন্তরীণ ধারার অনুযায়ী হয় না, তাহার পক্ষে আর সৎ নহে, যথার্থ নহে, উচ্চতম বা উৎকৃষ্টতম বা বাস্তব কল্যাণ নহে, ইহা তাহার নিজের সত্তার বা বিশ্বসত্তার সত্য বা ধর্ম নহে। ব্যক্তির পক্ষে শাস্ত্র হইতেছে একটা নৈর্ব্যক্তিক জিনিস এবং সেই জন্যই তাহা তাহার দেহ, প্রাণ, মনের সঙ্কীর্ণ ব্যক্তিগত ধর্ম অপেক্ষা অধিকতর মান্য; কিন্তু সেই সঙ্গেই সমষ্টির পক্ষে উহা হইতেছে ব্যক্তিক জিনিস, উহা তাহার অভিজ্ঞতার, তাহার কৃষ্টির, তাহার প্রকৃতির পরিণাম। শাস্ত্র তাহার সকল রূপ ও আভ্যন্তরীণ ভাবে আত্মার পরিপূর্ণতার আদর্শ বিধি নহে, আমাদের প্রকৃতির অধীশ্বরের শাশ্বত বিধান নহে, যদিও ইহার মধ্যে অল্পাধিক পরিমাণে সেই অতি-মহত্তর বস্তুর ইঙ্গিত, সূচনা, দীপ্তিপ্রদ আভাসসকল নিহিত রহিয়াছে। আর ব্যক্তিটি সমষ্টিকে ছাড়াইয়া অগ্রগামী হইয়া থাকিতে পারে, এক মহত্তর সত্য, প্রশস্ততর পন্থার, প্রাণপুরুষের এক গভীরতর উদ্দেশ্যের জন্য প্রস্তুত হইতে পারে। তাহার মধ্যে যে নির্দেশ শাস্ত্রকে ছাড়াইয়া যায় তাহা অবশ্য সকলসময়েই একটা উচ্চতর জিনিস না হইতে পারে, তাহা অহংভাবাপন্ন বা রাজসিক প্রকৃতির বিদ্রোহের রূপ গ্রহণ করিতে পারে, সে প্রকৃতি আত্মচরিতার্থতা ও আত্মপ্রতিষ্ঠার স্বাধীনতার সঙ্কোচক বলিয়া অনুভূত কোন কিছুর অনুশাসন হইতে মুক্তিলাভের প্রয়াস করিতে পারে। কিন্তু তাহা হইলেও শাস্ত্রের সঙ্কীর্ণতা বা ত্রুটির জন্য অথবা জীবনযাত্রার প্রচলিত বিধান কেবল বাধাপ্রদ বা প্রাণহীন লোকাচারে পরিণত হওয়ার জন্য ঐরূপ বিদ্রোহ অনেক সময়েই ন্যায়সঙ্গত হয়। আর এই পর্যন্ত ইহা বৈধ, ইহার মধ্যে একটা সত্য থাকে, ইহার অস্তিত্বের উপযুক্ত ন্যায্য কারণ থাকে, কারণ যদিও ইহা যথাযথ পন্থাটিকে ধরিতে পারে না তথাপি রাজসিক অহং-এর যে অবাধ ক্রিয়া, তাহাতে অধিকতর স্বাধীনতা ও প্রাণ থাকায়, তাহা লোকাচারের প্রাণহীন ও গতানুগতিক তামসিক অনুসরণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। রাজসিক প্রকৃতি সকল সময়েই তামসিক প্রকৃতি অপেক্ষা প্রবল, সকল সময়েই অধিকতর শক্তিতে অনুপ্রাণিত, তাহার মধ্যে অধিকতর সম্ভাবনাসকল নিহিত থাকে। কিন্তু এই নির্দেশ মূলত সাত্ত্বিকও

হইতে পাবে; ইহা এক বৃহত্তব ও মহত্তব আদর্শেব অভিমুখ হইতে পাবে, সে আদর্শ আমাদিগকে আমাদেব আত্মাব এবং বিশ্বজীবনেব অধিকতব পূর্ণ ও সমৃদ্ধ সত্যের দিকে লইযা যায় এবং সেই জন্যই যে উচ্চতম ধর্ম ভাগবত মুক্তিব সহিত এক, তাহাব দিকে লইযা যায। আব কার্যত এই গতি হইতেছে সাধাবণত এক বিস্মৃত সত্যকে ধবিবার প্রযাস অথবা আমাদেব সত্তাব কোন অনাবিষ্কৃত বা অনধিগত সত্যেব দিকে অগ্রগমন। ইহা অনিযন্ত্রিত প্রকৃতিব স্বৈবাচাব মাত্র নহে, ইহাব আধ্যাত্মিক উপযোগিতা আছে, ইহা আমাদেব আধ্যাত্মিক প্রগতিব জন্যই প্রযোজনীয। আব যদি বা শাস্ত্রটি এখনও একটা জীবন্ত বস্তু এবং সাধাবণ মানুষেব পক্ষে শ্রেষ্ঠ বিধান হয়, তথাপি যাঁহাবা অসাধাবণ মানব, আধ্যাত্মিক, যাঁহাদেব অন্তর্জীবন বিকশিত হইযাছে, তাঁহাবা ঐ আদর্শেব দ্বাবা বাধ্য নহেন। তাঁহাকে শাস্ত্রের নির্দিষ্ট সীমানা অতিক্রম কবিযা যাইতে হইবে। কাবণ এই বিধান হইতেছে সাধারণ অপূর্ণ মানবের জন্য, তাহার পবিচালন, নিযন্ত্রণ ও আপেক্ষিক পূর্ণতাব জন্য, কিন্তু তাঁহাকে এক পূর্ণতব পূর্ণতাব দিকে অগ্রসব হইতে হইবে, ইহা হইতেছে কতকগুলি স্থিবনির্দিষ্ট ধর্মেব সংবিধান, কিন্তু তাঁহাকে শিখিতে হইবে আত্মার মুক্তিব মধ্যে বাস কবিতে।

কিন্তু কর্ম যদি বাসনাব নির্দেশ এবং প্রচলিত শাস্ত্র এই দুইটিই বর্জন কবে, তাহা হইলে তাহাব দৃঢ ভিত্তিটি কি হইবে? কারণ বাসনাব যে নীতি তাহাব একটা নিজস্ব সার্থকতা আছে, তাহা যেমন পশুর পক্ষে এবং হযতো মানবজাতিবও আদিম অবস্থাতে নিবাপদ ও উপযোগী ছিল, আমাদেব পক্ষে সেরূপ উপযোগী না হইতে পারে, তথাপি তাহার সীমানাব মধ্যে উহা আমাদেব প্রকৃতিব এক অতি জীবন্ত অংশের উপব প্রতিষ্ঠিত এবং তাহাব সুস্পষ্ট নির্দেশেব দ্বাবা সমর্থিত, আব শাস্ত্রেরও পিছনে বহিয়াছে বহুদিনেব প্রতিষ্ঠিত বিধানেব প্রামাণিকতা, প্রাচীন সাফল্যেব সমর্থন এবং অতীতেব নিশ্চিত অভিজ্ঞতা। কিন্তু এই নূতন প্রযাস হইতেছে অজানা বা আংশিক জানা দেশে শক্তিময অভিযানেব ন্যায, ইহা একটি দুঃসাহসিক বিকাশ, এক নূতন বিজয, এখানে কোন্ মূল সূত্র ধবিযা চলিতে হইবে, কোন্ দিশাবী আলোকেব উপব নির্ভর কবিতে হইবে, আমাদেব সত্তাব মধ্যে ইহাব কি দৃঢ় ভিত্তি পাওযা যাইবে? উত্তর হইতেছে এই যে, এই সূত্র এই ভিত্তি মিলিবে মানুষের শ্রদ্ধায, তাহার বিশ্বাস করিবাব সঙ্কল্পে, সে নিজেব এবং জীবনেব সত্য বলিয়া যেটিকে দেখিতেছে বা মনে কবিতেছে তদনুসাবে জীবনকে পবিচালিত কবিবার সঙ্কল্পে। অন্য কথায় এই প্রযাস হইতেছে মানুষেব পক্ষে তাহাব সত্য, তাহার জীবনের ধর্ম, তাহাব পূর্ণতা ও সিদ্ধিলাভেব পন্থা আবিষ্কাবেব জন্য তাহাব নিজের নিকটেই আবেদন, অথবা তাহাব মধ্যে বা বিশ্বসৃষ্টিব মধ্যে কোন শক্তিময অবশ্যমান্য বস্তুব নিকটে আবেদন। আব সবকিছু নির্ভব কবে তাহাব শ্রদ্ধাব স্বরূপেব উপর, তাহাব নিজের মধ্যে (অথবা যে বিশ্বগত সত্তাব সে অংশ বা অভিব্যক্তি তাহাব মধ্যে) যে বস্তুটিকে সে শ্রদ্ধা কবিতেছে তাহাব উপব এবং

ইহাব দ্বাবা সে তাহার প্রকৃত আত্মাব দিকে এবং বিশ্বের আত্মা বা প্রকৃত সত্তার দিকে কতখানি অগ্রসব হইতেছে তাহাব উপর। যদি সে হয় তামসিক, মূঢ, মোহাচ্ছন্ন, যদি তাহার শ্রদ্ধা হয জ্ঞানহীন, তাহার সঙ্কল্প হয় অনুপযোগী, তাহা হইলে সে কোন সত্য বস্তুতে পৌঁছিতে পাবিবে না এবং তাহাব নীচের প্রকৃতির মধ্যেই পতিত হইবে। যদি সে বাজসিক মিথ্যা দীপ্তির দ্বারা প্রলুব্ধ হয়, সে স্বৈর সঙ্কল্পেব দ্বারা অপথে পবিচালিত হইতে পারে এবং তাহা তাহাকে দুর্গম জলাভূমি বা গিবিপ্রপাতে লইযা যাইতে পারে। উভয়ক্ষেত্রেই তাহাব মুক্তির একমাত্র উপায় হইতেছে তাহাব উপব পুনরায় সত্ত্বেব প্রভাব, সত্ত্ব তাহার অঙ্গসকলের উপব এক নূতন দীপ্ত শৃঙ্খলা আনিযা দিবে, তাহা তাহাব স্বৈর ইচ্ছার বিক্ষোভময় ভ্রান্তি হইতে অথবা তাহাব মোহাচ্ছন্ন অজ্ঞানেব জডতাময় ভ্রান্তি হইতে তাহাকে উদ্ধার কবিবে। অন্যপক্ষে যদি তাহাব সাত্ত্বিক প্রকৃতি থাকে, তাহার অগ্রগমনের জন্য সাত্ত্বিক শ্রদ্ধা ও নির্দেশ থাকে, তাহা হইলে এক মহত্তর এবং এখনও অনধিগত আদর্শ বিধান তাহাব দৃষ্টিগোচব হইবে, তাহা তাহাকে ক্বচিৎ কখনও সাত্ত্বিক জ্যোতিব ঊর্ধ্বে সত্তা ও জীবনেব এক উচ্চতম দিব্য আলোক দিব্য ধর্মের দিকে অন্তত কতকদূর পর্যন্ত লইয়া যাইতে পারে। কারণ তাহার মধ্যে সাত্ত্বিক জ্যোতিটি যদি এমন প্রবল হয যে নিজেব চূডান্ত পবিণতিতে তাহাকে লইযা যাইতে পারে, তাহা হইলে সে সেই স্থান হইতেই অগ্রসব হইযা ভাগবত লোকোত্তর কৈবল্যাত্মক সত্তাব কোন প্রথম আভাব মধ্যে প্রবেশ কবিবার মত একটা পথ করিয়া লইতে পাবে। আত্মলাভেব সকল প্রযাসে এই সব সম্ভাবনাই বহিযাছে; এই আধ্যাত্মিক অভিযানেব এই সবই হইতেছে বিভিন্ন বিধান।

এখন আমাদিগকে দেখিতে হইবে যে, গীতা নিজস্ব অধ্যাত্ম শিক্ষা ও আত্মনিযন্ত্রণেব ধাবায় এই সমস্যাটির কিরূপ সমাধান করিয়াছে। কারণ অর্জুন তখনই এক ইঙ্গিতপূর্ণ প্রশ্ন কবিলেন, তাহা হইতেই সমস্যাটি কিংবা তাহার একটা দিক প্রকাশ পায। তিনি বলিলেন' যাহাবা শ্রদ্ধার সহিত ভগবান বা দেবগণের উদ্দেশ্যে যজ্ঞ কবে, কিন্তু শাস্ত্রবিধি পবিত্যাগ করে, তাহাদের সেই নিষ্ঠা, সেই অনুবাগেব একাগ্র সঙ্কল্প কি যাহা তাহাদিগকে এই শ্রদ্ধা প্রদান করে এবং এই প্রকাব কর্মে চালিত কবে? তাহা কি সাত্ত্বিক রাজসিক না তামসিক? তাহা আমাদেব প্রকৃতিব কোন্ স্তরের অন্তর্গত? গীতার উত্তর প্রথমেই এই নীতিটি বিবৃত কবিতেছে যে, সকল বস্তুব ন্যায় আমাদের শ্রদ্ধা হইতেছে ত্রিবিধ, আমাদের প্রকৃতিব প্রধান গুণ অনুযায়ী তাহা বিভিন্ন প্রকারেব হয। কোন মানুষের সত্তার মূল উপাদান, তাহাব ধাতুগত প্রকৃতি, তাহার স্বভাবজাত শক্তি যেরূপ, তদনুযায়ী

যে শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য যজন্তে শ্রদ্ধযান্বিতাঃ।
তেষাং নিষ্ঠা তু কা কৃষ্ণ সত্ত্বমাহো বজস্তমঃ॥
ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধা দেহিনাং সা স্বভাবজা।
সাত্ত্বিকী বাজসী চৈব তামসী চেতি তাং শৃণু॥১৭।১-২

তাহার শ্রদ্ধাব রূপ বং ও গুণ নির্ধাবিত হয়, সত্ত্বানুরূপা সর্ব্বস্য শ্রদ্ধা।[১] আব তাহাব পরেই আসিতেছে একটি বিশিষ্ট ছত্র, তাহাতে গীতা বলিতেছে যে, এই পুরুষ, এই যে মানুষের অন্তরাত্মা, ইনি যেন শ্রদ্ধাব দ্বাবাই গঠিত, শ্রদ্ধা অর্থাৎ একটা কিছু হইবার সঙ্কল্প, নিজের উপব, জীবনেব উপব একটা বিশ্বাস, আব তাঁহাব ঐ সঙ্কল্প, শ্রদ্ধা বা সত্তাগত বিশ্বাস যাহাই হউক না কেন, তিনি তাহাই এবং তাহাই তিনি, শ্রদ্ধাময়োঽয়ং পুরুষো যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ। এই অর্থপূর্ণ বাক্যটিব মধ্যে যদি আমরা একটুখানি নিবেশ সহকারে দৃষ্টিপাত করি, তাহা হইলে দেখিতে পাইব যে এই একটি ছত্রে কযেকটি ওজঃপূর্ণ শব্দেব মধ্যে আধুনিক প্রযোগবাদেব (Pragmatism) সমগ্র পবিকল্পনাটি নিহিত বহিযাছে। কাবণ যদি মানুষ বা তাহার অন্তরাত্মা তাহার অন্তঃস্থিত শ্রদ্ধার দ্বাবা গঠিত হয়, তাহা হইলে সে যে সত্যকে দর্শন কবে, যে সত্যকে জীবনে অনুসবণ করিতে চায়, তাহাব পক্ষে সেইটিই হইতেছে তাহাব সত্তাব সত্য। তাহাব সেই সত্য সে নিজে সৃষ্টি কবিযাছে বা কবিতেছে এবং তাহার পক্ষে আর কোনও বাস্তব সত্য থাকিতে পাবে না। এই সত্য হইতেছে তাহার আভ্যন্তবীণ ও বাহ্য কর্মের জিনিস, তাহাব বিবর্তনেব, আত্মাব ক্রিযাশীলতার জিনিস, তাহাব মধ্যে যাহা কখনও পবিবর্তিত হয় না তাহাব জিনিস নহে। তাহার জানিবার, বিশ্বাস কবিবাব, বুদ্ধি ও প্রাণশক্তিতে হইযা উঠিবার জন্য যে একটা বর্তমান সঙ্কল্প তাহাব কোন অতীত সঙ্কল্পকে সমর্থন করিতেছে, বর্তাইয়া রাখিযাছে, তাহাব দ্বাবাই সে আজ যাহা তাহা নির্ণীত হইযাছে, আর তাহার মূল সত্তার মধ্যে সক্রিয এই সঙ্কল্প ও শ্রদ্ধা যে নূতন দিকেই ফিরুক না কেন, সে ভবিষ্যতে তাহাতেই পবিণত হইবাব দিকে অগ্রসব হইবে। আমাদেব নিজেদের মন ও প্রাণেব কর্মেব দ্বাবাই আমবা নিজেদেব জীবনেব সত্য সৃষ্টি কবি, অন্য কথায় আমরা নিজেবাই নিজদিগকে সৃষ্টি কবি, নিজেবাই নিজেদেব বিধাতা।

কিন্তু ইহা যে কেবল সত্যের একটা দিক মাত্র, তাহা খুবই স্পষ্ট, আব চিন্তাশীল ব্যক্তির নিকট সকল একদেশদর্শী উক্তিই সন্দেহেব বিষয। আমাদেব নিজেদেব ব্যক্তিক সত্তা যাহা বা সে যাহা কিছু সৃষ্টি কবে, সত্য কেবল তাহাই নহে, তাহা কেবল আমাদেব বিবর্তনেব সত্য, এক বৃহত্তম আযতনব্যাপী ক্রিযাব একটি বিশিষ্ট বিন্দু বা রেখা। আমাদের ব্যক্তিকতাব ঊর্ধ্বে প্রথমেই বহিযাছে এক বিশ্ব সত্তা এবং এক বিশ্ব বিবর্তন, আমাদেব বিবর্তন তাহারই অন্তর্গত একটি ক্ষুদ্র ক্রিযা। এবং তাহারও ঊর্ধ্বে বহিয়াছে শাশ্বত পুরুষ, তাঁহা হইতেই সকল বিবর্তন উৎপন্ন, ইহাব সমস্ত সম্ভাবনা, উপাদান, মূল প্রেবণা ও শেষ উদ্দেশ্য সবই তাঁহা হইতে প্রাপ্ত। আমরা অবশ্য বলিতে পাবি যে, সকল বিবর্তনই হইতেছে বিশ্বচৈতন্যেব একটি ক্রিয়া, সবই মায়া, বিবর্তিত হইবাব সঙ্কল্পেব দ্বাবা সৃষ্ট, আব অপব একমাত্র

[১] সত্ত্বানুরূপা সর্ব্বস্য শ্রদ্ধা ভবতি ভাবত।
শ্রদ্ধাময়োঽযং পুরুষো যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ॥১৭।৩

সত্য বস্তু (যদি তেমন কিছু থাকে) হইতেছে এক শুদ্ধ শাশ্বত সত্তা, তাহা চৈতন্যেব ঊর্ধ্বে নির্বিশেষ, অপ্রকটিত এবং অনির্বচনীয়। কার্যত এইটিই হইতেছে মাযাবাদীগণেব অদ্বৈত মত; তাঁহারা ব্যবহারিক সত্য এবং সৃজনাত্মিকা মাযাব অন্যদিকে যে অনির্দেশ্য ও অনির্বচনীয় একক কৈবল্যাত্মক সত্তা বহিযাছে—এই দুযেব মধ্যে প্রভেদটি এইভাবেই বুঝিযাছেন; তাঁহাদের মনেব কাছে ঐ ব্যবহাবিক সত্য হইতেছে বিভ্রমাত্মক, অন্তত কেবল সাময়িক এবং আংশিকভাবেই সত্য, অন্য পক্ষে আধুনিক প্রযোগবাদ (Pragmatism) এইটিকেই প্রকৃত সত্য বলিয়া গ্রহণ কবে, অন্তত এইটিই তাহাব মতে একমাত্র অভিজ্ঞেয সত্য, কারণ কেবলমাত্র এই সত্যটিই আমবা কার্যত অনুসবণ করিতে পারি। কিন্তু গীতার পক্ষে কৈবল্যাত্মক ব্রহ্মই পবম পুরুষ, এবং পুরুষ সকল সময়েই হইতেছেন চৈতন্যময় আত্মা, যদিও তাঁহাব যে ঊর্ধ্বতম চৈতন্য, অতিচৈতন্য বলা যাইতে পারে (তাঁহার নিম্নতন চৈতন্যও, সেটিকে আমবা অচেতন নামে অভিহিত করিযা থাকি), তাহা আমবা যে মানসিক চৈতন্যকে চেতনা নাম দিতে অভ্যস্ত, তাহা হইতে অতিশয় বিভিন্ন বস্তু। ঊর্ধ্বতম অতিচৈতন্যে আছে অমৃতত্বের এক ঊর্ধ্বতম সত্য ও ধর্ম, সত্তার মহত্তম দিব্য ধাবা, শাশ্বত ও অনন্তেব ধাবা। সত্তাব সেই শাশ্বত ধাবা ও দিব্যভাব ইতিপূর্বেই পুরুষোত্তমেব মধ্যে বহিযাছে, কিন্তু আমবা এখন চেষ্টা কবিতেছি সেইটিকে যোগেব দ্বারা এখানে আমাদেব বিবর্তনের মধ্যেই সৃষ্টি কবিতে, আমাদেব প্রযাস হইতেছে ভাগবত হওয়া, তাঁহার সদৃশ হওয়া, মদ্ভাব। তাহাও নির্ভর কবে শ্রদ্ধাব উপর। আমাদেব সচেতন মূল সত্তাব একটা ক্রিযার দ্বাবা এবং ইহাব সত্যে বিশ্বাসেব দ্বারা, জীবনে ইহাব অনুসবণ করিবার, ইহাই হইযা উঠিবাব একটা অন্তবতম সঙ্কল্পেব দ্বাবা আমবা ইহাকে প্রাপ্ত হই, কিন্তু ইহাব দ্বাবা বুঝায না যে, পূর্ব হইতেই ইহা আমাদেব ঊর্ধ্বে বিদ্যমান নাই। যতক্ষণ না আমবা ইহাকে দেখিতেছি, নূতন কবিয়া ইহার সত্তায় গড়িয়া উঠিতেছি, ততক্ষণ আমাদেব বহির্মুখী মনের পক্ষে ইহা বর্তমান না থাকিলেও, ইহা শাশ্বতেব মধ্যে আছেই, আব আমবা এমনও বলিতে পাবি যে, ইহা পূর্ব হইতেই আমাদের নিজেদেব নিগূঢ় সত্তাব মধ্যে রহিয়াছে; কারণ আমাদেবও মধ্যে, আমাদেরও গভীবে পুরুষোত্তম সকল সময়েই বহিযাছেন। আমাদের পক্ষে সেই দিব্য ধর্মে গড়িযা উঠা, আমাদেব দ্বাবা ইহাব সৃষ্টিব অর্থ হইতেছে আমাদের মধ্যে তাঁহার ও ইহাব প্রকটন। সকল সৃষ্টিই শাশ্বত পুরুষেব সচেতন মূল সত্তা হইতে উদ্ভূত বলিয়া বস্তুত তাঁহাবই প্রকটন; মূল সৃজনী চৈতন্য চিৎশক্তিতে একটা শ্রদ্ধা, একটা সম্মতি, বিবর্তিত হইবার একটা সঙ্কল্প হইতেই ইহা উদ্ভূত হয়।

তবে দার্শনিক প্রশ্নটিই উপস্থিত আমাদের আলোচ্য বিষয় নহে। আমাদেব সত্তাব মধ্যে এই যে সঙ্কল্প বা শ্রদ্ধা, ইহার সহিত ভাগবত প্রকৃতির সিদ্ধিতে গড়িযা উঠিবাব আমাদেব যে সম্ভাবনা তাহার কি সম্বন্ধ তাহাই আমাদিগকে এখানে দেখিতে হইবে। যাহাই হউক না কেন, এই শক্তি, এই শ্রদ্ধাই আমাদের

ভিত্তি, যখন আমরা আমাদের কামনা অনুযায়ী জীবনযাপন করি, তাহার অনুযায়ী হই, তদনুসারে কর্ম করি, তাহা হইতেছে যে শ্রদ্ধার নির্বন্ধপর ক্রিয়া, তাহা প্রধানত আমাদের প্রাণিক ও দৈহিক, আমাদের তামসিক ও রাজসিক প্রকৃতির অন্তর্গত। আর যখন আমরা শাস্ত্রানুযায়ী হইতে, তদনুযায়ী জীবনযাপন করিতে চেষ্টা করি, তখন আমরা যে শ্রদ্ধার নির্বন্ধপর ক্রিয়ার দ্বারা অগ্রসর হই তাহা (যদি তাহা গতানুগতিক বিশ্বাসমাত্র না হয়) সাত্ত্বিক প্রবৃত্তির অন্তর্গত, সেই প্রবৃত্তি সর্বদা আমাদের রাজসিক ও তামসিক অংশের উপর প্রভাব বিস্তার করিবার প্রয়াস করিতেছে। যখন আমরা এই দুইটিকেই বর্জন করি এবং আমাদের নিজেদের আবিষ্কৃত বা ব্যক্তিগতভাবে গৃহীত কোন আদর্শ বা সত্যের কোন নূতন পরিকল্পনা অনুযায়ী হই, তদনুযায়ী জীবনযাপন করি, কর্ম করি, সেইটিও শ্রদ্ধার এক নির্বন্ধপর ক্রিয়া, আমাদের প্রত্যেক চিন্তা, সঙ্কল্প, অনুভব ও কর্মকে যে তিনটি গুণ সর্বদা নিয়ন্ত্রিত করিতেছে, ঐ শ্রদ্ধা তাহাদের কোন একটির অধীন হইতে পারে। আবার যখন আমরা দিব্য প্রকৃতির অনুযায়ী হইতে, তদনুযায়ী জীবনযাপন করিতে, কর্ম করিতে চেষ্টা করি, তখনও আমাদিগকে শ্রদ্ধার কোন নির্বন্ধপর ক্রিয়া লইয়াই অগ্রসর হইতে হইবে, গীতার মতে সে শ্রদ্ধা হইবে সাত্ত্বিক প্রকৃতির সেই অবস্থার যখন সে প্রকৃতি তাহার চূড়ান্ত পরিণতি লাভ করিতেছে এবং নিজের সুনির্দিষ্ট সীমানা অতিক্রম করিতে প্রস্তুত হইতেছে। কিন্তু এই সব জিনিসের সবগুলি এবং প্রত্যেকটিই বুঝায় প্রকৃতির কোন গতি বা অবস্থান্তর, সকলগুলিরই অর্থ হইতেছে একটা আভ্যন্তরীণ বা বাহ্য ক্রিয়া অথবা সাধারণত আভ্যন্তরীণ ও বাহ্য উভয়প্রকার ক্রিয়া। আর তাহা হইলে এই ক্রিয়ার স্বরূপ কি হইবে? আমাদিগকে যে কর্ম করিতে হইবে, কর্ত্তব্যম্ কর্ম, গীতা তাহার তিনটি অঙ্গ উল্লেখ করিয়াছে, এই তিনটি হইতেছে যজ্ঞ, দান ও তপঃ। কারণ অর্জুন যখন "সন্ন্যাস" (বাহ্য ত্যাগ) ও "ত্যাগ" (আভ্যন্তরীণ ত্যাগ) এই দুইটির প্রভেদ বিষয়ে প্রশ্ন করিলেন (১৮।১), কৃষ্ণ দৃঢ়তার সহিত বলিলেন যে এই তিনটি আদৌ বর্জন করা চলিবে না, এইগুলি সম্পাদন করিতেই হইবে, কারণ এইগুলি হইতেছে আমাদের "কর্তব্য কর্ম" এবং ইহারা মনীষীগণকে শুদ্ধ করিয়া তোলে। অন্য কথায় এইসকল কর্ম হইতেছে আমাদের সিদ্ধিলাভের উপায়। কিন্তু আবার এই সব কাজই অজ্ঞানীদের দ্বারা অজ্ঞানে কিংবা অসম্পূর্ণ জ্ঞানে সম্পাদিত হইতে পারে। সকল গতিময় ক্রিয়াকে মূলত এই তিনটি অঙ্গে বিশ্লেষণ করা যাইতে পারে। কারণ সকল গতিময় ক্রিয়া, প্রকৃতির সকল গতিশীলতার মধ্যে রহিয়াছে একটা ঐচ্ছিক বা অনৈচ্ছিক তপস্যা, আমাদের শক্তি ও সামর্থ্যসমূহের অথবা কোন বিশেষ সামর্থ্যের তেজস্বিতা ও একাগ্রতা, তাহা আমাদিগকে কোন কিছু সিদ্ধ করিতে অথবা অর্জন করিতে অথবা কোন কিছুতে বিবর্তিত হইতে সাহায্য করে এবং ইহাই "তপঃ"। সকল কর্মের মধ্যেই রহিয়াছে ঐ সিদ্ধি, অর্জন বা বিবর্তনের মূল্য স্বরূপ একটা ব্যয়, আমরা যাহা, আমাদের যাহা কিছু আছে, তাহা অর্পণ করা এবং

ইহাই "দান"। সকল কর্মের মধ্যে আরও রহিয়াছে আধিভৌতিক শক্তি বা বিশ্বশক্তিসকলের উদ্দেশ্যে অথবা আমাদের সকল কর্মের পরম অধীশ্বরের উদ্দেশ্যে যজ্ঞ। প্রশ্ন হইতেছে, আমরা এই সকল কর্ম কি অচেতনভাবে, জড়ভাবে বা বড়জোর একটা অবোধ, অজ্ঞান, অর্ধচেতন সঙ্কল্প লইয়া করি, না অবিজ্ঞ বা বিকৃতভাবে চেতনশক্তির সহিত করি, না জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞভাবে চেতন-সঙ্কল্প লইয়া করি, অন্য কথায় আমাদের যজ্ঞ, দান ও তপস্যা কি তামসিক, রাজসিক না সাত্ত্বিক?

কারণ এখানে প্রত্যেক বস্তু, স্থূল জিনিসসকলও হইতেছে ত্রিবিধ।[১] দৃষ্টান্তস্বরূপ, গীতা বলিতেছে, আমাদের আহার তাহার প্রকৃতি অনুযায়ী এবং দেহের উপর তাহার ক্রিয়া অনুযায়ী সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক হয়। মানসিক ও স্থূল শরীরে যে সাত্ত্বিক প্রকৃতি তাহা স্বভাবত সেইরূপ জিনিস চায় যাহা আয়ু বৃদ্ধি করে, আভ্যন্তরীণ ও বাহ্য শক্তি বৃদ্ধি করে, এক সঙ্গেই মানসিক, প্রাণিক, দৈহিক বল বৃদ্ধি করে এবং মন, প্রাণ, দেহের সুখ, প্রীতি ও আরোগ্য বর্ধন করে, সেসব জিনিস রসাল, স্নিগ্ধ, স্থির ও তৃপ্তিকর। রাজসিক প্রকৃতি স্বভাবত এমন খাদ্য চায় যাহা অম্ল, ঝাল, উষ্ণ, কটু, রুক্ষ, তীক্ষ্ণ ও প্রদাহকারী, সেসব খাদ্য অস্বাস্থ্য বৃদ্ধি করে, শরীর ও মনের দুঃস্থতা বৃদ্ধি করে। তামসিক প্রকৃতি ঠাণ্ডা, অশুদ্ধ, বাসি পচা বা স্বাদহীন খাদ্যে একরকম বিকৃত তৃপ্তি লাভ করে, এমনকি, পশুর ন্যায় অপরের অর্ধভুক্ত খাদ্যও গ্রহণ করে। গুণত্রয়ের ক্রিয়া সর্বব্যাপী। অন্য প্রান্তে মন ও আত্মার জিনিসসকলেও, যজ্ঞ, দান, তপস্যাতেও গুণত্রয় এইভাবেই কার্যকরী হয়। প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতীকতন্ত্রে এইসকলের যেরূপ বিভাগ প্রচলিত ছিল তদনুসারে গীতা প্রত্যেকটিরই তিনপ্রকার বিভাগ করিয়াছে। কিন্তু গীতা নিজেই যজ্ঞতত্ত্বের যে অতি ব্যাপক অর্থ প্রদান করিয়াছে, তাহা স্মরণ রাখিয়া আমরা এইসকল সঙ্কেতের বাহ্য অর্থটিকে প্রসারিত করিতে পারি এবং তাহাদের মধ্য হইতে উদারতর অর্থ বাহির করিতে পারি। আর এইগুলিকে বিপরীত ক্রমে গ্রহণ করা, তমঃ হইতে আরম্ভ করিয়া সত্ত্বে যাওয়াই সুবিধাজনক, কারণ আমরা আলোচনা করিতেছি যে, কেমন করিয়া আমরা আমাদের নিম্নতর প্রকৃতি হইতে একটা সাত্ত্বিক পরিণতি ও আত্মসীমালঙ্ঘনের ভিতর দিয়া ত্রিগুণের অতীত এক দিব্য প্রকৃতি ও কর্মের দিকে উঠিতে পারি।

শ্রদ্ধাবিরহিত[২] হইয়া যে কর্ম করা যায়, অর্থাৎ, যে জিনিস সম্বন্ধে আমাদের

১ আহারস্ত্বপি সর্ব্বস্য ত্রিবিধো ভবতি প্রিয়ঃ।
যজ্ঞস্তপস্তথা দানং তেষাং ভেদমিমং শৃণু॥
আয়ুঃসত্ত্ববলারোগ্যসুখপ্রীতিবিবর্ধনাঃ।
রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ॥১৭।৭-৮

২ বিধিহীনমসৃষ্টান্নং মন্ত্রহীনমদক্ষিণম্।
শ্রদ্ধাবিরহিতং যজ্ঞং তামসং পরিচক্ষতে॥১৭।১৩

সম্পূর্ণভাবে সচেতন ধাবণা নাই, সম্মতি নাই, ইচ্ছা নাই, অথচ প্রকৃতিব দ্বাবা বাধ্য হইয়া কবিতে হয়, তাহাই হইতেছে তামসিক যজ্ঞ। তাহা যন্ত্রবৎ সম্পন্ন কবা হয়, কাবণ বাঁচিতে হইলে উহা করিতেই হয়, কাবণ উহা আমাদেব সম্মুখে আসিযা পড়ে, কারণ অন্য লোকে উহা কবে, উহা না কবিলে অন্য কোন বৃহত্তব অসুবিধা হইতে পারে, কিংবা এইরকম অন্য কোন তামসিক প্রেবণাব বশে কবা হয। আব যদি আমাদেব প্রকৃতি পূর্ণভাবে তমোগ্রস্ত হয, তাহা হইলে উহা কবা হয অযত্নেব সহিত, অবহেলাপূর্বক, ভ্রান্ত পদ্ধতিতে। তাহা বিধি অনুসাবে অর্থাৎ শাস্ত্রেব যথাযথ নিয়মানুসারে সম্পন্ন হইবে না, জীবনের ব্যবহাব ও তত্ত্ব অনুযাযী এবং যে জিনিসটি কবা হইতেছে তাহার সত্য তত্ত্ব অনুযাযী যথার্থ পদ্ধতি অনুসারে পরিচালিত হইবে না। সেই যজ্ঞে অন্নদান করা হইবে না—ভাবতীয ক্রিয়াকাণ্ডে এই অন্নদান হইতেছে সাহায্যপ্রদ দানেব প্রতীক, প্রকৃত যজ্ঞস্বরূপ প্রত্যেক ক্রিয়াতেই উহা অন্তর্নিহিত থাকে, অপবকে এই দান অপবিহার্য, অপবকে জগৎকে ফলপ্রদ দান, ইহা ব্যতীত আমাদেব কর্ম হয় সম্পূর্ণভাবে স্বার্থপব এবং যে সংহতি ও আদানপ্রদান বিশ্বের সত্য নীতি, ঐরূপ কর্ম হয তাহাব উল্লঙ্ঘন। আমাদেব কর্মের বাহ্য দিশারী বা সাহায্যদাতাকেই হউক বা আমাদেব অন্তবস্থিত অপ্রকট বা প্রকট ভগবানকেই হউক, যজ্ঞীয় কর্মেব নেতৃবৃন্দকে যে দক্ষিণা দেওযা, দান বা আত্মদান কবা অতি প্রয়োজনীয়, এই কর্ম সেই দক্ষিণা বিনা কবা হইবে। উহা মন্ত্র বিনা করা হইবে, আমবা যজ্ঞেব দ্বাবা যে দেবগণেব সেবা কবি, তাঁহাদেব অভিমুখে উন্নীত আমাদের সঙ্কল্প ও জ্ঞানের পূত দেহস্বরূপ যে নিবেদনপবাযণ চিন্তা, তাহাই মন্ত্র। তামসিক মানব দেবতাগণেব উদ্দেশে তাহার যজ্ঞ অর্পণ কবে না, পবন্তু ভূত ও প্রেতগণের উদ্দেশে অথবা যে সকল অশুদ্ধ শক্তি অন্তবালে থাকিযা তাহার কর্ম নিজেদেব ভোগে লাগায এবং তাহাদেব অন্ধকাবেব দ্বাবা তাহার জীবনকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে তাহাদেব উদ্দেশ্যে যজ্ঞ কবে।[১]

রাজসিক মানব তাহার যজ্ঞ অর্পণ কবে নিম্নতব দেবগণের উদ্দেশে অথবা ধনের বক্ষক যক্ষগণ কিংবা অসুব ও বাক্ষস প্রভৃতি বিভ্রষ্ট শক্তিসকলের উদ্দেশে। তাহার যজ্ঞ বাহ্যত শাস্ত্রানুসারে সম্পন্ন হইতে পাবে, কিন্তু তাহাব প্রেবণা হয আড়ম্ববব প্রদর্শন বা দম্ভ অথবা তাহার কর্মেব ফলেব জন্য তীব্র কামনা, পুবস্কাবেব জন্য প্রচণ্ড দাবি।[২] অতএব যে কর্ম প্রচণ্ড অহংভাবপূর্ণ ব্যক্তিগত বাসনা হইতে উদ্ভূত হয় অথবা ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য সিদ্ধিব জন্য জগতেব উপব নিজ প্রভাব বিস্তার করিতে উদ্যত দাম্ভিক সঙ্কল্প হইতে উদ্ভূত হয়, সেসবই হইতেছে বাজসিক প্রকৃতির, যদিও তাহা জ্যোতির চিহ্ন ধাবণ করিযা আত্মগোপন কবে, যদিও তাহা

[১] যজন্তে সাত্ত্বিকা দেবান্ যক্ষবক্ষাংসি বাজসাঃ।
প্রেতান্ ভূতগণাংশ্চান্যে যজন্তে তামসা জনাঃ॥১৭।৪

[২] অভিসন্ধায তু ফলম্ দম্ভার্থমপি চৈব যৎ।
ইজ্যতে ভবতশ্রেষ্ঠ তং যজ্ঞং বিদ্ধি বাজসম্॥১৭।১২

বাহ্যত যজ্ঞরূপে সম্পাদিত হয, যদিও লোকদেখান ভাবে তাহা ভগবানকে বা দেবগণকে অর্পণ কবা হয, মূলত তাহা একটা আসুরিক ক্রিযাই থাকিয়া যায়। আমাদেব কর্মেব যে দৃশ্যমান অভিসন্ধান, যে দেবতার নাম লইয়া আমরা সে কর্ম সমর্থন কবি, এমনকি যে বুদ্ধিগত ঐকান্তিক বিশ্বাসেব দ্বারা তাহা সমর্থিত হইতেছে বলিয়া মনে হয, সেসবেব দ্বাবা আমাদের কর্মের যথার্থ মূল্য নির্ধারিত হয না, সে মূল্য নির্ধাবিত হয় কেবল আভ্যন্তবীণ ভাব, প্রেবণা ও অভিসন্ধানের দ্বাবা। যেখানেই আমাদেব কর্মে অহংভাবের প্রাধান্য থাকে সেখানেই তাহা হয় বাজসিক যজ্ঞ। অন্যপক্ষে প্রকৃত সাত্ত্বিক যজ্ঞ তিনটি বিশিষ্ট লক্ষণের দ্বারা চেনা যায।[১] প্রথমত উহা সাফল্যপ্রদ সত্যেব দ্বাবা প্রেবিত যথার্থ নীতি, সঠিক পদ্ধতি ও নিযম, আমাদেব কর্মেব যথাযথ ছন্দ ও ধাবা অনুসাবে, তাহাদের সত্য পদ্ধতি অনুসাবে, ধর্ম অনুসাবে অনুষ্ঠিত, বিধিদৃষ্টঃ, ইহাব অর্থ এই যে, বুদ্ধি ও প্রবুদ্ধ সঙ্কল্প ঐ সকল কর্মেব গতিক্রম ও উদ্দেশ্যকে নিয়ন্ত্রিত করে। দ্বিতীয়ত, যে দিব্য নিযম আমাদেব জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে, তাহার দ্বাবাই নির্ধাবিত প্রকৃত যজ্ঞরূপে উহা আমাদেব কর্তব্য, যষ্টব্যম্, এই চিন্তায মনকে একাগ্র ও নিবদ্ধ কবিযা ঐ কর্ম অনুষ্ঠিত হয এবং সেই জন্যই তাহা এক সমুচ্চ আভ্যন্তরীণ বাধ্যতা ও অবশ্যপালনীয সত্য অনুসাবে কবা হয, তাহাতে ব্যক্তিগত ফললাভেব কোন আকাঙ্ক্ষা থাকে না—কর্মটির প্রেবণা এবং যে শক্তি উহাতে নিয়োজিত হয তাহাব ভাব যত নৈর্ব্যক্তিক হয ততই উহা সাত্ত্বিক প্রকৃতিব হয়। আব শেষত, উহা সম্পূর্ণভাবে দেবগণকে উৎসর্গ কবা হয, বিশ্বের অধীশ্বর যে দেবশক্তি-সকলেব দ্বাবা বিশ্ব পবিচালন কবিতেছেন, যাঁহাবা তাঁহারই ছদ্মবেশ ও বিভিন্ন রূপ, তাঁহাদেব দ্বাবা উহা পবিগৃহীত হয।

অতএব গীতা যেবকম কর্ম চায সাত্ত্বিক যজ্ঞ হইতেছে সেই আদর্শেব খুবই নিকটবর্তী এবং সাক্ষাৎভাবে সেইদিকেই লইযা যায; এইটি চরম বা উচ্চতম আদর্শ নহে, এইটি এখনও সেই সিদ্ধপুরুষের কর্ম নহে যিনি দিব্য প্রকৃতির মধ্যে বাস কবেন। কাবণ ইহা একটি স্থিবনির্দিষ্ট ধর্মরূপে অনুষ্ঠিত হয এবং ইহা সেবা বা যজ্ঞরূপে দেবগণেব উদ্দেশে অর্পিত হয, যজন্তে সাত্ত্বিকা দেবান্, আমাদেব মধ্যে, জগতেব মধ্যে প্রকট ভগবানেব কোন আংশিক শক্তি বা বিভাবেব উদ্দেশে অর্পিত হয। নিঃস্বার্থ ধর্মবিশ্বাস অনুসাবে অনুষ্ঠিত কর্ম, মানবজাতিব জন্য অনুষ্ঠিত স্বার্থহীন কর্ম, ন্যায বা সত্যেব প্রতি নিষ্ঠাব জন্য নৈর্ব্যক্তিকভাবে সম্পন্ন কর্ম—এই সব হইতেছে এইরূপ কর্ম এবং এইরূপ কর্ম আমাদের পূর্ণতা সিদ্ধির জন্য প্রযোজনীয; কাবণ ইহা আমাদের চিন্তা, সঙ্কল্প ও প্রাকৃত মূল সত্তাকে বিশুদ্ধ কবে। সাত্ত্বিক কর্মেব যে চূড়ান্ত পবিণতিতে আমাদিগকে উপস্থিত হইতে হইবে

[১] অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যজ্ঞো বিধিদৃষ্টো য ইজ্যতে।
যষ্টব্যমেবেতি মনঃ সমাধায় স সাত্ত্বিকঃ॥১৭।১১

তাহা আরও উদারতর ও মুক্ততর, তাহা হইতেছে সমুচ্চ শেষ যজ্ঞ, আমাদের দ্বারা পরম সমগ্র ভগবানের উদ্দেশে নিবেদিত, তাহার সহিত থাকে পুরুষোত্তমকে লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষা অথবা যাহা কিছু আছে সকলের মধ্যে বাসুদেব দর্শন, সে কর্ম অনুষ্ঠিত হয় নৈর্ব্যক্তিকভাবে, বিশ্বজনীনভাবে, জগতের হিতের জন্য বিশ্বমাঝে ভগবদ্ ইচ্ছা পরিপূরণের জন্য। ঐ পরিণতি উহাকে নিজের ঊর্ধ্বে, অমৃত ধর্মে লইয়া যায়। কারণ তখন আসে একটা মুক্তি, সেখানে কোন ব্যক্তিগত কর্মই নাই, কোন সাত্ত্বিক ধর্মবিধি, কোন শাস্ত্রবিধানের গণ্ডি নাই, নীচের বুদ্ধি ও সঙ্কল্পকেও ছাড়াইয়া উঠা হয়, তাহাদের পরিবর্তে এক উচ্চতর প্রজ্ঞা কর্মটিকে নির্দেশ করে, পরিচালন করে এবং নিশ্চিতভাবে উহার লক্ষ্যে লইয়া যায়। সেখানে ব্যক্তিগত ফলের কোন কথাই নাই; কারণ যে সঙ্কল্পটি কার্য করে তাহা আমাদের নিজেদের নহে, তাহা হইতেছে এক পরমতম সঙ্কল্প, জীব তাহার যন্ত্রস্বরূপ। সেখানে আত্মপরতা বা আত্মত্যাগ কিছুই নাই, কারণ জীব ভগবানের সনাতন অংশ, জীব তাহার অস্তিত্বের উচ্চতম সত্তার সহিত যুক্ত হয়, আর সেই সত্তায়, সেই আত্মায় সে এবং সকলে এক। সেখানে কোন ব্যক্তিগত কর্ম নাই কারণ সকল কর্মই আমাদের কর্মের অধীশ্বরকে সমর্পিত হয় এবং তিনি নিজেই রূপান্তরিত প্রকৃতির ভিতর দিয়া কর্মটি সম্পাদন করেন। সেখানে কোন যজ্ঞ নাই—অবশ্য আমরা বলিতে পারি যে, যজ্ঞের অধীশ্বর জীবের মধ্যে তাঁহার শক্তির কর্মকে তাঁহার নিজেরই বিশ্বরূপের উদ্দেশে অর্পণ করিতেছেন। যজ্ঞরূপে কর্ম নিজেকে অতিক্রম করিয়া এই উচ্চতম স্তরেই উপনীত হয়। যে জীব ভাগবত প্রকৃতির মধ্যে তাহার পূর্ণ চৈতন্য লাভ করিয়াছে ইহাই তাহার সিদ্ধ অবস্থা।

তামসিক[১] তপস্যা অনুসৃত হয় অজ্ঞানাচ্ছন্ন ও ভ্রান্ত ধারণার বশে, নিজের ভ্রান্তিতে তাহা দৃঢ় ও অবিচল, কোন আদৃত মিথ্যার অজ্ঞান বিশ্বাসের দ্বারা তাহা সমর্থিত, কোন সত্য বা মহান লক্ষ্যের সহিত সম্বন্ধশূন্য একটা ক্ষুদ্র ও নীচ স্বার্থপর উদ্দেশ্য লইয়া ও আত্মপীড়নের দ্বারা তাহা সম্পাদিত হয় অথবা তাহা অপরের অনিষ্ট সাধনের সঙ্কল্পে শক্তিকে একাগ্র করিয়া সম্পাদিত হয়। এইপ্রকার শক্তি প্রয়োগ তামসিক হয় কোন জড়তার ধর্মের দ্বারা নহে, কারণ তপস্যার সহিত জড়তার সম্বন্ধ নাই, কিন্তু মন ও প্রকৃতিতে একটা তমিস্রা, ক্রিয়াটিতে একটা নীচ সঙ্কীর্ণতা ও কদর্যতা অথবা লক্ষ্য বা প্রেরণায় একটা পাশব প্রবৃত্তি বা বাসনার জন্যই ঐ তপস্যা তামসিক হয়। রাজসিক তপস্যা[২] হইতেছে সেইসব প্রক্রিয়া যাহা মানুষের নিকট হইতে মান ও পূজা লাভ করিবার নিমিত্ত, ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠা ও বাহ্যিক যশ ও মহত্ত্ব লাভের নিমিত্ত অথবা ঐরূপ অন্য কোন অহংভাবময় সঙ্কল্প

[১] মূঢ়গ্রাহেণাত্মনো যৎ পীড়য়া ক্রিয়তে তপঃ।
পরস্যোৎসাদনার্থং বা তত্তামসমুদাহৃতম্॥১৭।১৯

[২] সৎকারমানপূজার্থং তপো দম্ভেন চৈব যৎ।
ক্রিয়তে তদিহ প্রোক্তং রাজসং চলমধ্রুবম্॥১৭।১৮

ও গর্বের প্রেরণায় অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রকার তপস্যা ক্ষণস্থায়ী বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হয়। এসবের দ্বারা আত্মার ঊর্ধ্বমুখী বিকাশ ও সর্বাঙ্গসিদ্ধিতে কোনই সহায়তা হয় না, ইহার কোন নির্দিষ্ট শ্রেয়স্কর নীতি নাই, ইহা পরিবর্তনশীল ও ক্ষণস্থায়ী উপলক্ষ্যের সহিত জড়িত এবং ইহার নিজেরও ঐ রূপ, চলমধ্রুবম্। আর যদিও বা দৃশ্যত কোন অধিকতর অন্তর্মুখী ও মহৎ উদ্দেশ্য থাকে এবং শ্রদ্ধা ও সঙ্কল্পটি উচ্চতর ধরনের হয়, তথাপি যদি কোনরূপ ঔদ্ধত্য বা গর্ব বা প্রচণ্ড স্বৈরসঙ্কল্পের বা বাসনার তীব্রবেগ ঐ তপস্যায় প্রবেশ করে অথবা যদি উহা অশাস্ত্রবিহিত জীবন ও কর্মের যথাযথ নীতির বিরোধী নিজের ও অপরের অনিষ্টকারক কোন প্রচণ্ড, উচ্ছৃঙ্খল বা ঘোর কর্মে প্রবৃত্ত করায় অথবা যদি উহা আত্মপীড়নমূলক হয় এবং মন প্রাণ ও শরীরকে ক্লিষ্ট করে অথবা আমাদের মধ্যে আভ্যন্তরীণ সূক্ষ্ম শরীরে অবস্থিত ভগবানকে উৎপীড়ন করে তাহা হইলেও ইহা হয় অবিমৃষ্য রাজসিক বা রজোতামসিক তপস্যা।[১]

সাত্ত্বিক তপস্যা অনুষ্ঠিত হয় উচ্চতম সম্বুদ্ধ শ্রদ্ধার সহিত, গভীরতমভাবে গৃহীত কর্তব্যরূপে অথবা কোন নৈতিক বা আধ্যাত্মিক বা অন্য উচ্চতর কারণের জন্য, সেখানে কোন বাহ্যিক বা সঙ্কীর্ণভাবে ব্যক্তিগত কর্মফলের আকাঙ্ক্ষা থাকে না। তাহার স্বরূপ হইতেছে আত্মসংযম, তাহার জন্য চাই আত্মনিয়ন্ত্রণ এবং নিজের প্রকৃতিতে একটা সুসামঞ্জস্য। গীতা তিন প্রকার সাত্ত্বিক তপস্যা বর্ণনা করিয়াছে।[২] প্রথমটি হইতেছে শারীরিক, তাহা বাহ্য কর্মের তপস্যা, এই সম্পর্কে বিশেষভাবে উল্লিখিত হইয়াছে—সম্মানার্হ ব্যক্তিগণের সম্মান ও পূজা, দেহ, কর্ম ও জীবনের শুচিতা, সরল ব্যবহার, ব্রহ্মচর্য ও অহিংসা। তাহার পর হইতেছে বাঙ্ময় তপস্যা—শাস্ত্রপাঠ, সত্য প্রিয় ও হিতজনক বাক্য এবং যত্ন সহকারে সেইসকল বাক্য পরিহার যাহা অপরের ভয়, দুঃখ বা উদ্বেগ জন্মায়। শেষত হইতেছে মানসিক ও নৈতিক সিদ্ধির তপস্যা—ভাবসংশুদ্ধি অর্থাৎ সমস্ত প্রকৃতিকে নির্মল করা, মৃদুতা এবং মনের স্বচ্ছ ও শান্ত প্রসন্নতা, আত্মসংযম ও মৌন। যাহা কিছু রাজসিক ও অহঙ্কৃত প্রকৃতিকে স্থির ও সংযত করে এবং ইহার

[১] অশাস্ত্রবিহিতং ঘোরং তপ্যন্তে যে তপো জনাঃ।
দম্ভাহঙ্কারসংযুক্তাঃ কামরাগবলান্বিতাঃ॥
কর্শয়ন্তঃ শরীরস্থং ভূতগ্রামমচেতসঃ।
মাং চৈবান্তঃশরীরস্থং তান বিদ্ধ্যাসুরনিশ্চয়ান্॥১৭।৫-৬

[২] দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞপূজনং শৌচমার্জবম্।
ব্রহ্মচর্যমহিংসা চ শারীরং তপ উচ্যতে॥
অনুদ্বেগকরং বাক্যং সত্যং প্রিয়হিতঞ্চ যৎ।
স্বাধ্যায়াভ্যসনং চৈব বাঙ্ময়ং তপ উচ্যতে॥
মনঃপ্রসাদঃ সৌম্যত্বং মৌনমাত্মবিনিগ্রহঃ।
ভাবসংশুদ্ধিরিত্যেতত্তপো মানসমুচ্যতে॥১৭।১৪-১৬

পরিবর্তে শুভ ও পুণ্যেব প্রসন্ন ও শান্ত নীতি প্রতিষ্ঠিত কবে সেই সবই এখানে রহিয়াছে। ইহাই সেই সাত্ত্বিক ধর্মের তপস্যা যাহাকে প্রাচীন ভাবতীয় সংস্কৃতিতে এত উচ্চ স্থান দেওয়া হইত। ইহার মহত্তর পরিণতি হইবে বুদ্ধি ও সঙ্কল্পেব সমুচ্চ বিশুদ্ধি, আত্মাব সমতা, গভীর শান্তি ও অচঞ্চলতা, উদার সহানুভূতি এবং একত্বের সাধনা, মন প্রাণ ও দেহের মধ্যে অন্তঃপুরুষেব দিব্য প্রসন্নতাব প্রতিচ্ছায়া। সেই সমুচ্চ শিখবে নৈতিক রূপ ও প্রকৃতি ইতিমধ্যেই আধ্যাত্মিক রূপ ও প্রকৃতিতে পরিণত হইযা যাইতেছে। আব এই পবিণতিটি নিজেকে অতিক্রম করিতে পারে, এক উচ্চতর ও মুক্ততর জ্যোতির মধ্যে ইহাকে উন্নীত কবা যাইতে পারে, ইহা পরমা প্রকৃতির সুপ্রতিষ্ঠিত দিব্য শক্তিতে পবিণত হইযা যাইতে পাবে। আর তখন যাহা থাকিবে তাহা হইবে আত্মাবই নিষ্কলুষ তপঃ, সকল অঙ্গে এক উচ্চতম সঙ্কল্প ও জ্যোতির্ময় শক্তি, তাহাবা কর্ম কবিবে এক উদাব ও জমাট শান্তি এবং এক গভীব ও বিশুদ্ধ অধ্যাত্ম আনন্দেব মধ্যে। অতএব তখন আব তপস্যাব কোন প্রয়োজন থাকিবে না, তপস্যা থাকিবে না, কাবণ তখন সবই স্বাভাবিক ও সহজভাবে হইবে দিব্য, সবই হইবে সেই তপঃ। সেখানে নীচেব শক্তিব কোন স্বতন্ত্র প্রচেষ্টা থাকিবে না, কাবণ প্রকৃতিব শক্তি পুরুষোত্তমেব লোকোত্তব সঙ্কল্পেব মধ্যে তাহার প্রকৃত উৎস ও ভিত্তির সন্ধান পাইবে। তখন এই শক্তির ক্রিয়াগুলি এইভাবে উচ্চস্তব হইতে প্রবর্তিত হওয়ায় নিম্নতর স্তবসকলেও তাহাবা এক অন্তর্নিহিত সিদ্ধতম সঙ্কল্প হইতে এবং এক অন্তর্নিহিত সিদ্ধতম পবিচালনায স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে চলিতে থাকিবে। বর্তমান ধর্মসকলেব কোন বাধাই আর তখন থাকিবে না, কাবণ তখন কর্ম হইবে মুক্ত, তাহা রাজসিক ও তামসিক প্রকৃতির বহু উর্ধ্বে, কিন্তু সাত্ত্বিক কর্মবিধিব অতি-সতর্ক ও সঙ্কীর্ণ গণ্ডিবও বহু উর্ধ্বে।

যেমন তপস্যা সম্বন্ধে তেমনই সকল দানও হইতেছে জ্ঞানহীন তামসিক অথবা বাহ্যাড়ম্ববপূর্ণ বাজসিক অথবা নিঃস্বার্থ ও জ্ঞানোদ্ভাসিত সাত্ত্বিক প্রকৃতিব।[১] তামসিক দান অর্পিত হয় অজ্ঞভাবে, তাহাতে যথাযথ দেশ কাল ও পাত্রেব কোন বিবেচনা থাকে না; ইহা নির্বোধ ও বিবেচনাশূন্য এবং বস্তুত স্বার্থপব ক্রিয়া, অনুদার ও হেয় বদান্যতা, সে দানে সহানুভূতি থাকে না, প্রকৃত ঔদার্য থাকে না, গ্রহীতার হৃদ্‌গত ভাবের কোন হিসাব লওযা হয না, তাহা গৃহীত হইলেও অবজ্ঞাব সহিত গৃহীত হয়। রাজসিক দান হইতেছে যাহা অপ্রসন্নচিত্তে অনিচ্ছাব

[১] দাতব্যমিতি যদ্দানং দীযতেঽনুপকাবিণে।
দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্দানং সাত্ত্বিকং স্মৃতম্॥
যত্তু প্রত্যুপকাবার্থং ফলমুদ্দিশ্য বা পুনঃ।
দীয়তে চ পবিক্লিষ্টং তদ্দানং রাজসং স্মৃতম্॥
অদেশকালে যদ্দানমপাত্রেভ্যশ্চ দীযতে।
অসৎকৃতমবজ্ঞাতম্ তত্তামসমুদাহৃতম্॥১৭।২০-২২

সহিত অথবা নিজেকে পবিক্লিষ্ট কবিয়া অথবা ব্যক্তিগত বা অহংমন্য উদ্দেশ্য লইযা অথবা কোন দিক হইতে কোনরূপ প্রত্যুপকাবেব আশা বা গ্রহীতার নিকট হইতে অনুরূপ বা অধিকতব লাভেব আশা লইযা সম্পাদিত হয়। সাত্ত্বিক দান হইতেছে যথাযথ যুক্তি ও সদিচ্ছা ও সহানুভূতির সহিত যথাযথ দেশ ও কালে এমন যথাযথ পাত্রকে দান কবা যে যোগ্য অথবা যাহাব পক্ষে দানটি প্রকৃতই সাহায্যপ্রদ হয। কর্তব্যবোধে ঐ দান ও উপকার করা হয়, গ্রহীতাব নিকট হইতে কোন পূর্বকৃত উপকাব বা ভবিষ্যৎ উপকারেব জন্য নহে, সে কর্মের কোনরূপ ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য থাকে না। সাত্ত্বিক দানের পবিণতি কর্মের মধ্যে ক্রমশ বেশী বেশী লইযা আসিবে অপরেব প্রতি, জগতেব প্রতি এবং ভগবানের প্রতি উদার আত্মদান, আত্মসমর্পণ—কর্মযজ্ঞের এই সমুচ্চ উৎসর্গই গীতার বিধান। আর দিব্য প্রকৃতিব মধ্যে উন্নযন হইবে আত্মনিবেদনেব মহত্তম পরিপূর্ণতা, জীবনের উদাবতম অর্থেব উপরেই তাহার প্রতিষ্ঠা। ভগবান নিজেকে এবং নিজের শক্তিসকলকে দান কবিতেছেন, এই সর্বভূতেব মধ্যে তাঁহার সত্তা ও আত্মাকে অমিতভাবে ঢালিযা দিতেছেন, ইহার দ্বারাই এই সমগ্র বিচিত্র জগৎ উদ্ভূত হইযাছে এবং নিবন্তব সংবক্ষিত হইতেছে; বেদ বলিযাছে, বিশ্বজীবন হইতেছে পুরুষেব আত্মবলিদান, পুরুষযজ্ঞ। সিদ্ধ জীবেরও সকল কর্ম হইবে ঠিক এইরূপই নিজেকে এবং নিজেব শক্তিসকলকে নিরন্তব দিব্যভাবে দান করা, ভগবানেব মধ্যে থাকিযা তাঁহাব প্রভাব ও প্রেবণা হইতে সে যে জ্ঞান, জ্যোতি, বল, প্রেম, আনন্দ, সাহায্যপ্রদ শক্তি লাভ কবিযাছে সেই সমুদয তাহাব চতুর্দিকে সকলের উপরে তাহাদেব সামর্থ্য অনুযাযী অথবা এই সমগ্র জগৎ ও ইহার জীবসমুদয়েব উপর ঢালিযা দেওযা। আমাদেব জীবনের যিনি অধীশ্বব, তাঁহার নিকট জীবেব সমগ্র আত্মদানেব উহাই হইবে সমগ্র ফল।

গীতা যে কথা বলিযা এই অধ্যায সমাপ্ত করিয়াছে, প্রথম দৃষ্টিতে সেটি দুর্বোধ্য বলিযাই মনে হয।[১] গীতা বলিয়াছে ওঁ তৎ সৎ এই বাক্যটি হইতেছে ব্রহ্মের ত্রিবৃৎ সংজ্ঞা, পুবাকালে ব্রহ্মেরই দ্বাবা ব্রাহ্মণ, বেদ যজ্ঞ সৃষ্টি হইয়াছিল এবং এই বাক্যের মধ্যেই তাহাদেব সমস্ত অর্থ নিহিত রহিযাছে। তৎ শব্দে বুঝায কৈবল্যাত্মক সত্তা (The Absolute), সৎ শব্দে বুঝায পবম বিশ্বময় সত্তাব মূল তত্ত্ব। ওঁ হইতেছে ত্রিবৃৎ ব্রহ্মের প্রতীক, বহির্মুখী, অন্তর্মুখী বা সূক্ষ্ম এবং অতিচেতন কারণ পুরুষ। এই তিনটি যথাক্রমে অ, উ, ম এই তিনটি অক্ষরের দ্বারা বুঝায এবং সমগ্র ওঁ শব্দটিব দ্বাবা চতুর্থ অবস্থা তুবীয় বুঝায়, তাহাই কৈবল্যাত্মক সত্তায উঠিয়া যায। প্রাবম্ভে প্রশস্তি স্বরূপ ওঁ এই শব্দটি উচ্চারণ কবিয়া সকল যজ্ঞ দান ও

[১] ওঁ তৎসদিতি নির্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ।
ব্রাহ্মণাস্তেন বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বিহিতাঃ পুবা॥
তস্মাদোমিত্যুদাহৃত্য যজ্ঞদানতপঃক্রিযাঃ।
প্রবর্তন্তে বিধানোক্তাঃ সততং ব্রহ্মবাদিনাম্॥১৭।২৩-২৪

তপস্যা ক্রিয়া প্রবর্তন কবা হয, ইহার দ্বাবা স্মবণ করাইয়া দেওযা হয যে, আমাদেব কর্মকে কবিতে হইবে আমাদেব আভ্যন্তবীণ সত্তায ব্রিবৃৎ ভগবানেব প্রকাশ এবং পরিকল্পনা ও লক্ষ্যে তাহাকে ভগবদ্‌মুখী কবিতে হইবে। মোক্ষাভিলাষী ব্যক্তিগণ ফলকামনারহিত হইযা এবং কেবল তাঁহাদেব প্রকৃতিব অন্তরালে অবস্থিত পবম ভগবানের ধাবণা অনুভূতি ও আনন্দ লইযা এইসকল কর্ম অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন।[১]

তাঁহারা তাঁহাদেব কর্মে এই বিশুদ্ধতা ও নৈর্ব্যক্তিকতাব দ্বাবা, এই সমুচ্চ নিষ্কামতা, এই উদাব অহমিকাশূন্যতা ও অধ্যাত্ম সমৃদ্ধিব দ্বাবা ঐ ভগবানেবই সন্ধান করেন। সৎ শব্দে শ্রেয় বুঝায়, অস্তিত্বও বুঝায়। শ্রেযেব নীতি এবং সত্যেব নীতি এই দুইটিই ঐ তিন প্রকার কর্মেব মধ্যে থাকা চাই। সকল শুভকর্মই সৎ, কারণ তাহাবা জীবাত্মাকে আমাদেব জীবনেব উচ্চতব সত্তাব জন্য প্রস্তুত কবিযা তোলে; যজ্ঞ, তপস্যা ও দানে সুদৃঢ় নিষ্ঠা এবং উহাকেই মূল লক্ষ্য কবিযা যজ্ঞরূপে, দানরূপে, তপস্যারূপে যেসব কর্ম করা যায সে সমুদযই হইতেছে সৎ, কাবণ তাহারা আমাদের আত্মাব উচ্চতম সত্যেব ভিত্তি গডিযা দেয। আব যেহেতু শ্রদ্ধাই হইতেছে আমাদেব জীবনের মূল নীতি, এই সবেব যেকোনটি অশ্রদ্ধাপূর্বক সম্পাদন করা যায় সেইটিই হয মিথ্যা, পৃথিবীতে বা পবকালে তাহাব কোন প্রকৃত অর্থ বা সত্য সারবত্তা থাকে না, ইহজীবনে অথবা মবজীবনের পরে আমাদেব চেতন আত্মাব মহত্তব লোকসমূহে কোন বাস্তব সত্তা থাকে না, স্থিতি বা সৃষ্টিব কোন শক্তিই থাকে না। অন্তঃপুকষেব যে শ্রদ্ধা, কেবল বুদ্ধিগত বিশ্বাস নহে, পবন্তু জানিবার দেখিবাব, বিশ্বাস কবিবাব এবং নিজ দৃষ্টি ও জ্ঞান অনুসাবে কর্ম করিবার, নিজেকে গড়িয়া তুলিবাব যে একাগ্র সঙ্কল্প তাহাই তাহাব শক্তিব দ্বাবা আমাদের বিবর্তনের সম্ভাবনাসকল নির্দেশ কবিযা দেয, আব আমাদেব সকল আভ্যন্তরীণ ও বাহ্য সত্তা, প্রকৃতি ও কর্মে এই শ্রদ্ধা ও সঙ্কল্পকে যাহা কিছু উচ্চতম, দিব্যতম ও শাশ্বত, সেই সমুদয়েব অভিমুখী কবিযাই আমবা পবমতম সিদ্ধিতে উপনীত হইতে পাবি।

[১] তদিত্যনভিসন্ধায় ফলং যজ্ঞতপঃক্রিযাঃ।
দানক্রিযাশ্চ বিবিধাঃ ক্রিযন্তে মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ॥
সদ্ভাবে সাধুভাবে চ সদিত্যেতৎ প্রযুজ্যতে।
প্রশস্তে কর্ম্মণি তথা সচ্ছব্দঃ পার্থ যুজ্যতে॥
যজ্ঞে তপসি দানে চ স্থিতিঃ সদিতি চোচ্যতে।
কর্ম্ম চৈব তদর্থীযং সদিত্যেবাভিধীযতে॥
অশ্রদ্ধযা হুতং দত্তং তপস্তপ্তং কৃতঞ্চ যৎ।
অসদিত্যুচ্যতে পার্থ ন চ তৎ প্রেত্য নো ইহ॥১৭।২৫-২৮

ঊনবিংশ অধ্যায়

গুণ, মন ও কর্ম

গুণত্রয সম্বন্ধে এবং উচ্চতম সাত্ত্বিক সাধনা তাহাব পরিণতিতে যে নিজেকে অতিক্রম কবিযা গুণত্রযের অতীতে লইয়া যায় সেই সম্বন্ধে এই মূল পবিকল্পনার আলোকে গীতা কর্মের যে বিশ্লেষণ দিযাছে তাহা এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। আত্মবিকাশশীল কর্মেব পশ্চাতে, বিশেষত জীবের পক্ষে কর্মের দ্বারা তাহার পূর্ণ অধ্যাত্মবিকাশ সাধনেব পশ্চাতে প্রধান ও অপরিহার্য শক্তি হইতেছে শ্রদ্ধা—যে সত্য আমবা দর্শন কবিযাছি তাহা বিশ্বাস কবিবাব এবং সেই সত্য হইবাব, জানিবাব, জীবনে ও কর্মে বাস্তবে পরিণত করিবার সঙ্কল্প। কিন্তু মানসিক শক্তিগুলিও বহিযাছে, তাহাবা যন্ত্র ও আবশ্যকীয় বিধানরূপে কর্মেব বেগ, গতি ও স্বরূপ নির্ণয়ে সহায়তা করে এবং সেই হেতু এই আভ্যন্তরীণ সাধনা সম্পূর্ণভাবে বুঝিবাব জন্য তাহাবাও প্রযোজনীয। গীতা তাহার মহান চবম সিদ্ধান্ত দিবাব পূর্বে ইহাদেব সংক্ষিপ্ত তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ দিতে অগ্রসব হইতেছে, সেই সিদ্ধান্তেই তাহার সকল শিক্ষাব পরিণতি, তাহাই হইতেছে উচ্চতম রহস্য, অধ্যাত্মভাবে সকল ধর্মেব উপবে উঠিযা যাওযা, দিব্য ঊর্ধ্বাযন। প্রধান ভাবটিকে পূর্ণভাবে ধরিবাব জন্য যতটুকু প্রযোজন কেবল ততটুকু বিস্তার করিযা আমাদিগকে সংক্ষেপে এই সংক্ষিপ্ত বর্ণনা অনুসবণ করিতে হইবে; কারণ এইগুলি হইতেছে গৌণ জিনিস অথচ প্রত্যেকেই আপন বিশিষ্ট স্থানে এবং বিশিষ্ট উদ্দেশ্যে বিশেষভাবেই প্রযোজনীয। গুণত্রযেব বৈশিষ্ট্যেব মধ্যে তাহাদেব যে নির্দিষ্ট ক্রিয়া তাহাই আমবা গীতাব সংক্ষিপ্ত বর্ণনা হইতে প্রকট করিব; গুণত্রয়ের অতীতে তাহাদের প্রত্যেকেব পরিণতির যাহা স্বরূপ তাহা ঊর্ধ্বাযনের সাধারণ স্বরূপ হইতেই আসিবে।

অর্জুনেব এক শেষ প্রশ্নেব দ্বারা বিষযটিব এই অংশটি আরম্ভ কবা হইয়াছে, সে প্রশ্ন হইতেছে সন্ন্যাসেব তত্ত্ব, ত্যাগেব তত্ত্ব এবং তাহাদের প্রভেদ সম্বন্ধে।[১] গীতা এই বিশিষ্ট প্রভেদটি পুনঃপুনঃ উল্লেখ করিয়াছে, ইহার উপর জোর দিয়াছে এবং একরূপ কবা যে ঠিকই হইযাছিল ভাবতীয মনেব পববর্তী ইতিহাসই তাহার যথেষ্ট প্রমাণ; পববর্তী চিন্তাধাবায এই দুইটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন জিনিসকে কেবলই গোলমাল কবা হইযাছে এবং গীতা যে কর্মেব শিক্ষা দিয়াছে সেরূপ কর্মকে তুচ্ছ কবা হইযাছে, বড জোব সন্ন্যাসের পবম নিষ্ক্রিয়তার উপক্রমণিকারূপেই তাহাব

[১] সন্ন্যাসস্য মহাবাহো তত্ত্বমিচ্ছামি বেদিতুম্।
ত্যাগস্য চ হৃষীকেশ পৃথক্ কেশিনিসূদন॥১৮।১

উপযোগিতা স্বীকাব কবা হইযাছে। বস্তুত লোকে যখন ত্যাগেব কথা, বৈবাগ্যেব কথা বলে তখন এই কথাব দ্বাবা তাহাবা সংসাবত্যাগই বুঝে, অন্তত ইহাবই উপবে তাহারা জোর দেয; কিন্তু গীতাব মত ইহার সম্পূর্ণ বিপবীত, তদনুসাবে ত্যাগের ভিত্তি হইতেছে কর্ম এবং সাংসাবিক জীবন, মঠে, গুহায় বা শৈলশিখবে পলাযন করা নহে। প্রকৃত ত্যাগ হইতেছে কামনাশূন্য হইযা কর্ম কবা এবং তাহাই প্রকৃত সন্ন্যাস।

সাত্ত্বিক আত্মনিয়ন্ত্রণেব যে মুক্তিপ্রদ ক্রিয়া সেটিকে ত্যাগেব ভাবেব দ্বাবা অনুপ্রাণিত হইতে হইবে সন্দেহ নাই—ঐটি হইতেছে অপবিহার্য, কিন্তু কি ত্যাগ এবং কিরূপ ভাবে? সংসারের কর্ম ত্যাগ নহে, কোন বাহ্যিক কৃচ্ছ্রতা বা ভোগবর্জনের বাহ্য আড়ম্বব নহে, পবন্তু বাজসিক বাসনা ও অহং-এব ত্যাগ, বর্জন, বাসনাত্মক আত্মাব, অহংমন্য মনেব এবং বাজসিক প্রাণপ্রকৃতিব স্বতন্ত্র ব্যক্তিগত জীবনের সন্ন্যাস বা সম্যক্ পরিত্যাগ। যোগশিখরে আবোহণ কবিবাব পক্ষে ঐটিই হইতেছে সত্য প্রযোজন, সে আবোহণ নৈর্ব্যক্তিক আত্মা ও ব্রাহ্মী একত্বের ভিতর দিযাই হউক অথবা বিশ্বগত বাসুদেবেব ভিতব দিযাই হউক অথবা আভ্যন্তরীণভাবে পবম পুরুষোত্তমের মধ্যেই হউক। আর শাস্ত্রীয সংজ্ঞা হিসাবে, পণ্ডিতদের প্রচলিত ভাষায় সন্ন্যাস হইতেছে কাম্যকর্মসমূহেব বাহ্যিক ন্যাস বা পবিহার; জ্ঞানীগণ মানসিক ও আধ্যাত্মিক ত্যাগকেই ত্যাগ নামে অভিহিত করিয়া থাকেন আমাদেব কর্মসকলের ফলেব প্রতি, কর্মটিবই প্রতি অথবা ইহাব ব্যক্তিগত প্রবর্তনা বা বাজসিক প্রেবণাব প্রতি সকল আসক্তি সম্পূর্ণভাবে বর্জন কবা—ইহাই ত্যাগ এবং গীতা সন্ন্যাস ও ত্যাগেব মধ্যে এই প্রভেদই করিযাছে।[১] ঐ অর্থে ত্যাগই উৎকৃষ্টতব পন্থা, সন্ন্যাস নহে। কাম্য কর্মসকলকে যে বর্জন করিতে হইবে তাহা নহে, পবন্তু যে কামনাব জন্য উহাবা কাম্য কর্ম হয় সেইটিকেই আমাদেব মধ্য হইতে দূব কবিতে হইবে। কর্মেব অধীশ্বরেব বিধানে কর্মের ফল আসিতে পাবে কিন্তু কর্ম কবিযা পুবস্কাব স্বরূপ বা শর্ত স্বরূপ ঐ ফলের কোনরূপ অহমিকাপূর্ণ দাবি থাকিলে চলিবে না। অথবা ফলটি আদৌ না আসিতে পাবে তথাপি কর্মটি কবিতে হইবে এইজন্য যে উহা কর্তব্য, আমাদেব অন্তর্যামী ভগবান ঐ কর্ম আমাদেব নিকট হইতে দাবি কবিতেছেন। সফলতা বা বিফলতা তাঁহারই হস্তে এবং তিনি তাঁহাব সর্বদর্শী সঙ্কল্প ও দুর্জ্ঞেয উদ্দেশ্য অনুসাবেই তাহা নির্ধারিত কবিবেন। অবশ্য কর্ম, সকল প্রকাব কর্মই শেষ পর্যন্ত সংন্যস্ত কবিতে হইবে, বাহ্যিকভাবে কর্ম হইতে বিবত থাকিযা নহে, নিশ্চলতা বা নিষ্ক্রিয়তাব দ্বাবা নহে, পবন্তু সকল কর্ম অধ্যাত্মভাবে সমর্পণ করিতে হইবে আমাদের জীবনেব অধীশ্বরকে যাঁহাব শক্তি ভিন্ন কোন কর্মই

[১] কাম্যানাং কর্ম্মণাং ন্যাসং সন্ন্যাসং কবযো বিদুঃ।
সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ॥১৮।২

সম্পাদিত হইতে পাবে না। নিজদিগকে কর্তা বলিয়া আমাদের যে মিথ্যা ধারণা আছে তাহা ত্যাগ করা চাই, কাবণ বস্তুত বিশ্বশক্তিই আমাদের ব্যক্তিত্ব ও আমাদেব অহং-এব মধ্য দিযা কর্ম করে। আমাদেব সকল কর্ম ঈশ্বর ও তাঁহার শক্তিব নিকটে অধ্যাত্মভাবে অর্পণ কবা, গীতাব শিক্ষায় ইহাই হইতেছে প্রকৃত সন্ন্যাস।

কোন্ কোন্ কর্ম কবিতে হইবে, এই প্রশ্নটি তখনও উঠে। যাঁহাবা বলেন বাহ্যিক কর্ম পবিত্যাগই চবম লক্ষ্য তাঁহাবাও এই দুরূহ বিষযটিতে একমত নহেন। কেহ কেহ বলেন আমাদেব জীবন হইতে সকল কর্ম ছাঁটিয়া ফেলিতে হইবে, যেন তাহা আদৌ সম্ভব। কিন্তু যতক্ষণ আমবা এই দেহে জীবিত রহিয়াছি ততক্ষণ ইহা সম্ভব নহে;[১] আব আমাদেব কর্মশীল সত্তাকে সমাধিব দ্বাবা মৃৎপিণ্ড বা পাথরের প্রাণহীন নিশ্চলতায পবিণত কবাই মোক্ষেব অর্থ হইতে পারে না। সমাধিব যে নিশ্চল নীববতা তাহাতেও সমস্যাটিব সমাধান হয না, কাবণ যখনই দেহের মধ্যে আবাব শ্বাসপ্রশ্বাস ফিবিযা আসিবে তখনই আবার আমাদেব কর্ম আরম্ভ হইবে, আধ্যাত্মিক নিদ্রাব দ্বাবা আমবা যে মুক্তি লাভ কবিয়াছিলাম তাহার শিখর হইতে আমবা পডিয়া যাইব। কিন্তু প্রকৃত যে মোক্ষ, আভ্যন্তরীণভাবে অহং বর্জনের দ্বারা মুক্তি এবং পুরুষোত্তমের সহিত যোগ, তাহা সকল অবস্থাতেই স্থিরপ্রতিষ্ঠ থাকে, এই জগতে বা ইহাব বাহিবে যে জগতেই হউক বা সকল জগতের বাহিবেই হউক, তাহা স্বপ্রতিষ্ঠ থাকে, সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি এবং তাহা নিষ্ক্রিয়তা বা সক্রিযতাব উপব নির্ভব কবে না। তাহা হইলে কোন্ কোন্ কর্ম করিতে হইবে? পূর্ণ সন্ন্যাসমতাবলম্বীদেব উত্তব (গীতা ইহার উল্লেখ কবে নাই, সম্ভবত গীতার যুগে ইহা তেমন প্রচলিত হয় নাই) এইরূপ হইতে পারে যে, ইচ্ছাকৃত কর্মের মধ্যে কেবল ভিক্ষা, আহাব এবং ধ্যান এই সবই কবা চলিবে, তাহা ছাড়া কেবল শবীবেব অবশ্যম্ভাবী ক্রিযাগুলি চলিবে। কিন্তু ইহা সুস্পষ্ট যে, অধিকতর উদার ও ব্যাপক সমাধান হইতেছে যজ্ঞ, দান ও তপস্যা এই তিনটি সর্বাপেক্ষা সাত্ত্বিক কর্ম কবিযা যাওযা। আব গীতা বলিয়াছে, এইগুলি অবশ্যকর্তব্য, কাবণ ইহারা মনীষীগণকে শুদ্ধ কবে।[২] কিন্তু আরও সাধাবণভাবে এবং এই তিনটি কর্মকে ব্যাপকতম অর্থে গ্রহণ করিযা বলা যায় যে, নিয়তং কর্মই কবিতে হইবে, শাস্ত্র অর্থাৎ যথাযথ জ্ঞান, যথাযথ কর্ম, যথাযথ জীবনপ্রণালীব বিদ্যা ও প্রযোগনীতির দ্বাবা নিযন্ত্রিত কর্ম, অথবা মূল প্রকৃতিব দ্বাবা নিয়ন্ত্রিত কর্ম, স্বভাব-নিয়তং কর্ম, অথবা শেষত ও শ্রেষ্ঠত হইতেছে আমাদেব মধ্যে ও ঊর্ধ্বে যে ভগবান রহিয়াছেন তাঁহাবই ইচ্ছাব দ্বাবা নিয়ন্ত্রিত কর্ম। শেষোক্তটি হইতেছে মুক্তপুরুষের যথার্থ এবং

[১] ন হি দেহভৃতা শক্যং ত্যক্তুং কর্ম্মাণ্যশেষতঃ।
যস্তুকর্ম্মফলত্যাগী স ত্যাগীত্যভিধীযতে॥১৮।১১
[২] যজ্ঞদানতপঃকর্ম্ম ন ত্যাজ্যং কার্য্যমেব তৎ।
যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্॥১৮।৫

একমাত্র কর্ম, মুক্তস্য কর্ম্ম। এই সকল কর্ম পরিত্যাগ কবা সঙ্গত নহে, গীতা ইহা অতি স্পষ্ট ও অসন্দিগ্ধভাবে নির্দেশ করিয়াছে, নিযতস্য তু সংন্যাসঃ কর্ম্মণো নোপপদ্যতে।[১] মুক্তিব জন্য ঐরূপ পরিত্যাগই যথেষ্ট এই অজ্ঞান বিশ্বাসেব বশে ঐ সকল কর্ম ত্যাগ করা হইতেছে তামসিক ত্যাগ। আমবা দেখিতে পাই যে, যেমন কর্মের মধ্যে তেমনই কর্মত্যাগেব মধ্যেও গুণসকল আমাদিগকে অনুসবণ করে। নিষ্ক্রিয়তার প্রতি আসক্তির বশে, সঙ্গ অকর্ম্মণি, কর্ম পবিত্যাগ কবিলে তাহা সমানভাবেই তামসিক ত্যাগ হইবে। আর তাহাবা দুঃখ আনযন কবে, অথবা দেহের পক্ষে পীডাদায়ক হয, মনেব পক্ষে ক্লান্তিকব হয বলিয়া কর্ম পবিত্যাগ কবা অথবা সবই তুচ্ছ এবং আত্মার পক্ষে বিবক্তিকব এইরূপ ভাব লইযা কর্ম পরিত্যাগ কবা হইতেছে রাজসিক[২] এবং তাহা উচ্চ অধ্যাত্ম ফল আনযন কবিতে পারে না, নৈব ত্যাগফলং লভেৎ; সেইটিও প্রকৃত ত্যাগ নহে। ইহা মানসিক দুঃখবাদ বা প্রাণিক ক্লান্তি হইতে উদ্ভূত, অহং-এব মধ্যেই ইহাব মূল। এই অহংমুখী নীতিব দ্বাবা নিযন্ত্রিত ত্যাগ হইতে কোনরূপ মুক্তি লাভ হয না।

ত্যাগেব সাত্ত্বিক নীতি হইতেছে কর্ম হইতে সবিযা থাকা নহে, পবন্তু ব্যক্তিগত দাবি হইতে, কর্মের পিছনে যে অহং থাকে তাহা হইতে নিবৃত্ত হওয়া।[৩] ইহা হইতেছে এমন কর্ম করা যাহা কামনার দ্বাবা প্রবোচিত নহে পবন্তু যথাযথ জীবনধারার বিধানেব দ্বাবা প্ররোচিত অথবা মূল প্রকৃতি, তাহার জ্ঞান, তাহাব আদর্শ, নিজের উপব এবং যে সত্য সে দর্শন কবে তাহাব উপব তাহাব বিশ্বাস, তাহার শ্রদ্ধার দ্বাবা প্রবোচিত। অথবা, উচ্চতব অধ্যাত্ম স্তবে, সেসব কর্ম আদিষ্ট হয় ভগবানেব ইচ্ছার দ্বাবা এবং যোগস্থ মনেব দ্বারা তাহাবা সম্পাদিত হয, কর্মটিতে বা কর্মেব ফলটিতে কোনও ব্যক্তিগত আসক্তি থাকে না। সম্পূর্ণভাবেই বর্জন করিতে হইবে সমস্ত কামনা, সকল আত্ম-পব অহংমুখী মনোনযন ও প্রেবণা এবং শেষ পর্যন্ত সঙ্কল্পের সেই সূক্ষ্ম অহংভাব যাহা বলে, "কর্মটি আমাব, আমিই কর্মী।" অথবা "কর্মটি ভগবানেব, কিন্তু আমিই কর্মী।" সুখকব, বাঞ্ছনীয, লাভজনক বা সাফল্যময় কর্মে কোনরূপ আসক্তি বাখা চলিবে না অথবা কোন কর্ম এইরূপ বলিয়াই করা চলিবে না, কিন্তু ঐরূপ কর্মও কবিতে হইবে—সমগ্রভাবে, নিঃস্বার্থভাবে, অন্তরাত্মার সম্মতিব সহিত—যখন সে কর্ম ঊর্ধ্ব হইতে এবং আমাদের মধ্য হইতে আদিষ্ট হইবে, কর্ত্তব্যম্ কর্ম্ম। অসুখকব, অবাঞ্ছনীয় বা অতৃপ্তিকর কর্ম অথবা যে কর্ম ক্লেশ, বিপদ, কঠোব অবস্থা বা

[১] নিযতস্য তু সংন্যাসঃ কর্ম্মণো নোপপদ্যতে।
মোহাত্তস্য পবিত্যাগস্তামসঃ পবিকীর্তিতঃ॥১৮।৭

[২] দুঃখমিত্যেব যৎ কর্ম্ম কাযক্লেশভযাত্ত্যজেৎ।
স কৃত্বা বাজসং ত্যাগং নৈব ত্যাগফলং লভেৎ॥১৮।৮

[৩] কার্য্যমিত্যেব যৎ কর্ম্ম নিযতং ক্রিযতেঽর্জ্জুন।
সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলং চৈব স ত্যাগঃ সাত্ত্বিকো মতঃ॥১৮।৯

অশুভ পবিণাম আনে বা আনিতে পারে, সেরূপ কর্মেব প্রতি কোন বিরাগ থাকিলে চলিবে না, কারণ সেরূপ কর্মও যখন কর্ত্তব্যম্ হইবে তখন তাহাকে স্বীকাব কবিতে হইবে সমগ্রভাবে, নিঃস্বার্থভাবে, তাহাব প্রযোজন ও সার্থকতাব গভীব উপলব্ধিব সহিত। জ্ঞানী ব্যক্তি কামনাত্মক সত্তার বিরাগ ও কুণ্ঠাসকল বর্জন কবেন এবং যে সাধাবণ মানবীয বুদ্ধি ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত, সংস্কারগত অথবা অন্যভাবে সীমাবদ্ধ আদর্শসকলেব দ্বাবাই বিচাব করে তাহাব সংশযসকলকে বর্জন কবেন। তিনি পবিপূর্ণ সাত্ত্বিক মনেব জ্যোতিতে এবং যে আভ্যন্তরীণ ত্যাগ আত্মাকে নৈর্ব্যক্তিকতায, ভগবানেব দিকে, বিশ্বময় ও শাশ্বতময় সত্তার দিকে উন্নীত করে তাহাব শক্তি লইযা তাঁহাব প্রকৃতিব উচ্চতম আদর্শ নীতি অনুসরণ করেন অথবা তাঁহাব নিগূঢ় অন্তবাত্মায কর্মেব অধীশ্বরেব সঙ্কল্প অনুসবণ করেন। কোন ব্যক্তিগত ফলেব জন্য অথবা ইহজীবনে কোন পুবস্কারের জন্য অথবা সাফল্য, লাভ বা পবিণামেব প্রতি কোনরূপ আসক্তি লইযা তিনি কর্ম কবিবেন না, অদৃশ্য পবলোকে কোন ফলের জন্যও তিনি কর্মে ব্রতী হইবেন না অথবা অন্য জন্মে বা আমাদেব ঊর্ধ্বে কোন জগতে যে পুরস্কারেব জন্য অপরিপক্ক ধর্মবুদ্ধি লালাযিত হয তিনি সেসবও চাহিবেন না। এ জগতে বা অন্য কোন জগতে, এই জীবনে বা পববর্তী জীবনে অনিষ্ট, ইষ্ট ও মিশ্র এই যে ত্রিবিধ কর্মফল, এসব হইতেছে যাহাবা কামনা ও অহং-এব দাস কেবল তাহাদেবই জন্য, এসব জিনিস মুক্ত আত্মাকে স্পর্শ কবে না।[১] যে মুক্ত কর্মী আভ্যন্তবীণ সন্ন্যাসের দ্বারা তাঁহাব কর্মসকল এক মহত্তব শক্তিকে অর্পণ কবিযাছেন তিনি কর্ম হইতে মুক্ত। কর্ম তিনি করিবেন, কাবণ অল্প বা অধিক, ক্ষুদ্র বা বৃহৎ, কোন না কোন কর্ম কবা দেহধাবী জীবের পক্ষে অবশ্যম্ভাবী, স্বাভাবিক, সমীচীন—কর্ম হইতেছে জীবনেব দিব্য ধর্মের অঙ্গ, ইহা আত্মাব সমুচ্চ শক্তিব দিক। ত্যাগেব যাহা মূল তত্ত্ব, সত্য ত্যাগ, সত্য সন্ন্যাস তাহা কোন গতানুগতিক নীতি অনুযায়ী কর্মত্যাগ নহে। পরন্তু তাহা হইতেছে নিঃস্বার্থ আত্মা, অহংশূন্য মন, অহংভাব ছাডাইযা মুক্ত নৈর্ব্যক্তিক ও অধ্যাত্ম প্রকৃতিতে প্রতিষ্ঠিত হওয়া। এই যে আভ্যন্তবীণ ত্যাগেব ভাব, ইহাই হইতেছে সাত্ত্বিক সাধনাব উচ্চতম পবিণতির জন্য প্রথম মানসিক প্রযোজন।

গীতা তাহাব পব সাংখ্যদর্শন অনুসাবে কর্ম সিদ্ধির পাঁচটি কাবণ বা অপরিহার্য প্রযোজন বর্ণনা কবিযাছে।[২] এই পাঁচটি হইতেছে, প্রথম, অধিষ্ঠান অর্থাৎ দেহ, প্রাণ ও মনেব কাঠামো, এইটিই হইতেছে প্রকৃতিস্থ আত্মার আধাব বা

[১] অনিষ্টমিষ্টং মিশ্রং চ ত্রিবিধং কর্ম্মণঃ ফলম্।
ভবত্যত্যাগিনাং প্রেত্য ন তু সংন্যাসিনাং ক্বচিৎ॥১৮।১২

[২] পঞ্চৈতানি মহাবাহো কাবণানি নিবোধ মে।
সাংখ্যে কৃতান্তে প্রোক্তানি সিদ্ধযে সর্ব্বকর্ম্মণাম্॥
অধিষ্ঠানং তথা কর্ত্তা কবণং চ পৃথগ্বিধম্।
বিবিধাশ্চ পৃথক চেষ্টা দৈবং চৈবাত্র পঞ্চমম্॥১৮।১৩-১৪

অবস্থানভূমি; তাহার পর, কর্তা, তৃতীয়, প্রকৃতিব চক্ষু আদি বিবিধ কবণ বা যন্ত্রসকল; চতুর্থ, নানাপ্রকাব পৃথক পৃথক চেষ্টা, তাহাবই কর্মেব শক্তি, এবং শেষত, দৈব (Fate) অদৃষ্ট অর্থাৎ মানুষেব কর্তৃত্ব ছাড়া, প্রকৃতির দৃষ্ট কর্মপদ্ধতি ছাড়া যে শক্তি বা শক্তিসকল এই সবেব পশ্চাতে থাকিযা কর্মটিকে পবিবর্তিত কবিয়া দেয় এবং কর্ম ও কর্মফলের নীতি অনুসারে ফলাফল বিধান কবে তাহাদেব প্রভাব। এই পাঁচটিকে লইয়াই কর্মের নিমিত্ত কাবণ গঠিত, মানুষ কায, মন বা বাক্যের দ্বারা যেকোন কর্মই করুক না কেন, তাহার গঠন ও ফল ইহাদেব দ্বাবাই নির্ধারিত হয়।[১]

আমাদেব বহির্ভাগস্থ ব্যক্তিগত অহংকেই সাধাবণত কর্তা বলিয়া মনে কবা হয কিন্তু ইহা হইতেছে যে-বুদ্ধি এখনও জ্ঞানলাভ কবে নাই তাহাবই মিথ্যা ধাবণা।[২] দৃশ্যত অহংই কর্তা, কিন্তু অহং এবং ইহার সঙ্কল্প হইতেছে প্রকৃতিব সৃষ্টি ও যন্ত্র, অজ্ঞ বুদ্ধি ইহাদেব সহিতই আমাদেব আত্মাকে ভ্রান্তভাবে এক কবিযা দেখে, এমনকি মানবীয় কর্মও কেবল ইহাদের দ্বাবাই নির্ধাবিত হয না, ঐ কর্মেব গতি ও ফল তো দূরের কথা। যখন আমবা অহং হইতে মুক্ত হই তখন আমাদেব প্রকৃত আত্মা, নৈর্ব্যক্তিক ও বিশ্বগত আত্মা, পশ্চাৎ হইতে সম্মুখে আসে এবং যে আত্মদৃষ্টিতে সে বিশ্বপুরুষেব সহিত ঐক্য উপলব্ধি কবে তাহাতে সে দেখিতে পায়, বিশ্বপ্রকৃতিই কর্মটির কর্তা এবং তাহার পিছনে ভগবানেব ইচ্ছাই হইতেছে বিশ্বপ্রকৃতির অধীশ্বর। কেবল যতক্ষণ আমাদের এই জ্ঞান না হইতেছে ততক্ষণই আমরা অহং-এর এবং অহং-এর সঙ্কল্পের কর্তৃত্বভাবে আবদ্ধ থাকি, যত শুভাশুভ কর্ম কবি এবং আমাদের তামসিক, রাজসিক ও সাত্ত্বিক প্রকৃতিব তৃপ্তি লাভ কবি। কিন্তু একবার এই মহত্তর জ্ঞানের মধ্যে বাস কবিলে, কর্মের স্বরূপ বা ফল আত্মাব মুক্তির কোনই ব্যতিক্রম ঘটায় না। বাহ্যিকভাবে কর্মটি এই কুরুক্ষেত্রেব মহাযুদ্ধ ও রক্তপাতেব ন্যায়ই ভীষণ কর্ম হইতে পারে; কিন্তু মুক্ত পুরুষ যদিও এই সংগ্রামে যোগদান করেন এবং যদিও তিনি এই সমস্ত লোককে হনন কবেন, তথাপি তিনি কাহাকেও হনন করেন না, কারণ কর্মটি হইতেছে জগৎসমূহেব অধীশ্বরেব এবং তিনিই তাঁহার অদৃশ্য সর্বশক্তিমান ইচ্ছায় এই সব সৈন্যকে ইতিপূর্বেই নিহত করিয়াছেন। মানবজাতি যাহাতে নূতন সৃষ্টি, নূতন উদ্দেশ্যেব দিকে অগ্রসব হইতে পারে, তাহার অতীতের অন্যায়, অত্যাচার, অধর্ম কর্মেব ফল যেন অগ্নিতে দগ্ধ কবিয়া মুক্ত হইতে পারে সেই জন্যই এই ধ্বংসকাণ্ড প্রযোজন হইযাছিল।

[১] শরীববাঙ্মনোভির্যৎ কর্ম প্রাবভতে নবঃ।
ন্যায্যং বা বিপরীতং বা পঞ্চৈতে তস্য হেতবঃ॥১৮।১৫

[২] তত্রৈবং সতি কর্তাবমাত্মানং কেবলং তু যঃ।
পশ্যত্যকৃতবুদ্ধিত্বান্ন স পশ্যতি দুর্মতিঃ॥
যস্য নাহংকৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে।
হত্বাপি স ইমাঁল্লোকান্ ন হন্তি ন নিবধ্যতে॥১৮।১৬-১৭

মুক্তপুরুষেব উপব যে কর্মেব ভাব অর্পিত হয, তিনি বিশ্বপুরুষের সহিত আত্মায় এক হইযা জীবন্ত যন্ত্ররূপে তাহা সম্পাদন কবেন। আর এইসব যে অবশ্যম্ভাবী তাহা জানিযা এবং বাহ্য দৃশ্যেব ঊর্ধ্বে দৃষ্টিপাত কবিযা তিনি কর্ম কবেন নিজের জন্য নহে পবন্তু ভগবানেব জন্য, মানবেব জন্য এবং মানবীয় ও বিশ্বগত শৃঙ্খলার জন্য;[১] বস্তুত তিনি নিজে কর্ম করেন না পবন্তু তাঁহার কর্মসকল এবং তাহাদের পবিণতিতে ভাগবত শক্তিরই আবির্ভাব ও প্রভাব সম্বন্ধে সচেতন হন। তিনি জানেন যে, তাঁহাব মানসিক, প্রাণিক, ভৌতিক শবীরে—তাঁহার অধিষ্ঠানে—পবাশক্তিই একমাত্র কর্তারূপে অদৃষ্ট কর্তৃক নির্ধারিত কর্ম সম্পাদন করিতেছেন, সে অদৃষ্ট বস্তুত অদৃষ্ট নহে, তাহা একটা অন্ধ যন্ত্রবৎ বিধান নহে, পরন্তু তাহা হইতেছে মানুষেব কর্মচক্রেব পশ্চাতে ক্রিযমাণ জ্ঞানময় ও সর্বদর্শী ইচ্ছা। এই যে ঘোব কর্ম গীতাব সমগ্র শিক্ষাব কেন্দ্রস্বরূপ, ইহা হইতেছে এমন এক কর্মের চরম দৃষ্টান্ত যাহা দৃশ্যত অশুভ কিন্তু সেই দৃশ্যেব অতীতে এক পরম শুভ নিহিত বহিযাছে। ভগবান কর্তৃক নিযুক্ত মনুষ্যটিকে সেই কর্ম করিতে হইবে নৈর্ব্যক্তিকভাবে, লোকসংগ্রহার্থম্, জগৎকে তাহাব লক্ষ্যের দিকে ঠিক রাখিবার জন্য, কোন ব্যক্তিগত লক্ষ্য বা কামনা লইযা নহে পরন্তু এই জন্য যে, কর্মটি ভগবৎ নির্দিষ্ট।

অতএব ইহা স্পষ্ট যে, কর্মটিই একমাত্র বিবেচ্য বিষয় নহে, যে জ্ঞান লইয়া আমবা কর্ম কবি তাহাই আধ্যাত্মিকতার দিক দিয়া একটা বিপুল পার্থক্য আনিয়া দেয। গীতা বলিযাছে, তিনটি জিনিস লইযা কর্মেব মানসিক প্রবর্তনা গঠিত, সেইগুলি হইতেছে, আমাদের সঙ্কল্পেব মধ্যে যে জ্ঞান, জ্ঞানের বিষয় এবং জ্ঞাতা; আব জ্ঞানেব মধ্যে সকল সময়েই আসে গুণত্রয়ের ক্রিযা।[২] এই গুণত্রয়েব ক্রিয়ার জন্যই আমাদেব দৃষ্টিতে জ্ঞাত জিনিসেব পার্থক্য হয় এবং জ্ঞাতা যে ভাব লইয়া কর্ম কবে তাহারও পার্থক্য হয।

তামসিক জ্ঞানহীন জ্ঞান[৩] হইতেছে বস্তুসকলকে দেখিবার এমন ক্ষুদ্র ও সঙ্কীর্ণ, এমন একটা অলস ও মূঢ় আসক্তিময় ধারা যাহা জগতেব বা কৃত কর্মটিব বা ইহাব ক্ষেত্রটিব অথবা কর্ম বা ইহাব পরিস্থিতিসকলেব প্রকৃত স্বরূপ দেখিতে পায় না। তামসিক মন প্রকৃত কার্য ও কাবণ খুঁজিয়া দেখে না, পরন্তু একটি ক্রিয়ায় বা

বিশ্বগত শৃঙ্খলাব কথা উঠিতেছে, কাবণ মানবসমাজেব মধ্যে অসুরের জযেব অর্থ হইতেছে বিশ্বশক্তি সমূহের দ্বন্দ্বে ততখানি অসুবের জয।

[২] জ্ঞানং জ্ঞেযং পবিজ্ঞাতা ত্রিবিধা কর্মচোদনা।
কবণং কর্ম কর্তেতি ত্রিবিধঃ কর্মসংগ্রহঃ॥
জ্ঞানং কর্ম চ কর্তা চ ত্রিধৈব গুণভেদতঃ।
প্রোচ্যতে গুণসংখ্যানে যথাবচ্ছৃণু তান্যপি॥১৮।১৮-১৯

[৩] যত্তু কৃৎস্নবদেকস্মিন্ কার্যে সক্তমহৈতুকম্।
অতত্ত্বার্থবদল্পং চ তত্তামসমুদাহৃতম্॥১৮।২২

একটি গতানুগতিক কর্মধারায় তীব্র আসক্তিব সহিত মগ্ন হইয়া থাকে, তাহাব চক্ষুর সম্মুখে ব্যক্তিগত কর্মটিব সামান্য অংশটুকু ভিন্ন আব কিছুই দেখিতে পায না, বস্তুত সে কি করিতেছে তাহা জানে না পবন্তু অন্ধভাবে প্রাকৃত প্রেবণাকেই তাহার কর্মের ভিতব দিয়া এমন সব ফল উৎপাদন কবিতে দেয যেসব সম্বন্ধে তাহার কোন ধারণা, ভবিষ্যৎ-দৃষ্টি বা ব্যাপক জ্ঞান নাই। বাজসিক জ্ঞান[১] হইতেছে তাহাই যাহা এই সর্বভূতের মধ্যে বস্তুসকলকে কেবল তাহাদেব পার্থক্য ও কর্মবৈচিত্র্যেব দিক দিয়াই দর্শন করে, ঐক্যের সত্য নীতি আবিষ্কাব কবিতে পাবে না বা আপন সঙ্কল্প ও কর্মের যথাযথ সমন্বয করিতে পাবে না, পবন্তু অহং ও কামনাব নির্দেশই অনুসরণ কবে, আভ্যন্তবীণ ও পাবিপার্শ্বিক প্রবোচনা ও শক্তিসকলেব আহ্বানে সাডা দিযা বহুমুখী অহংমূলক সঙ্কল্প এবং বিচিত্র ও মিশ্র প্রেরণার ক্রিযা অনুসরণ করে। এই জ্ঞান হইতেছে খণ্ড খণ্ড জ্ঞানেব, অনেক সময়ে পরস্পরবিবোধী জ্ঞানেবই মিশ্রণ, আমাদেব অর্ধ-জ্ঞান অর্ধ-অজ্ঞানেব বিভ্রান্তির ভিতর দিযা কোন বকম একটা পথ কবিবাব জন্য মন সেসবকে জোব কবিযা একত্র জুডিযা দেয়। অথবা তাহা একটি অস্থিব চঞ্চল নানামুখী ক্রিযা, তাহার মধ্যে কোন সুদৃঢ় নিযামক উচ্চতব আদর্শ ও সত্য জ্যোতি ও শক্তিব স্বপ্রতিষ্ঠ নীতি থাকে না। অন্যপক্ষে সাত্ত্বিক জ্ঞান[২] এই সব বিভাগেব মধ্যে জগৎকে এক অবিভাজ্য সমগ্রতা রূপে দেখে, সকল বিবর্তনেব মধ্যে এক অব্যয সত্তা দেখে; তাহা আপন কর্মের নীতিকে এবং জীবনেব সমগ্র লক্ষ্যেব সহিত বিশেষ বিশেষ কর্মের সম্বন্ধকে আযত্তাধীন কবে, তাহা সমগ্র প্রক্রিযাব প্রত্যেক পৈঠাকে যথাস্থানে সন্নিবেশিত করে। জ্ঞানের উচ্চতম শিখবে এই দৃষ্টি হয জগতের মধ্যে যে এক আত্মা রহিয়াছে, এই সব বিচিত্র সৃষ্টিব এক আত্মা, তাহার জ্ঞান, সে দৃষ্টি হয় সকল কর্মেব এক অধীশ্বব সম্বন্ধে জ্ঞান, বিশ্বেব সকল শক্তি ভগবানেব অভিব্যক্তি বলিযা এবং কর্মটিও মানুষেব মধ্যে এবং তাহার জীবন ও মূল স্বভাবেব মধ্যে ভগবানেবই পরম সঙ্কল্প ও প্রজ্ঞাব ক্রিয়া বলিয়া জ্ঞান। ব্যক্তিগত ইচ্ছাটি হয সম্পূর্ণভাবে সচেতন, জ্ঞানময, অধ্যাত্মভাবে জাগ্রত এবং তাহা অদ্বিতীয একেব মধ্যে বাস কবে, কর্ম কবে, তাঁহাব পরমতম আদেশ অধিকতর সম্পূর্ণতাব সহিত পালন কবে এবং মানবীয ব্যক্তির মধ্যে তাঁহার জ্যোতি ও শক্তিব ক্রমশ অধিকতব নিখুঁত যন্ত্র হইযা উঠে। সাত্ত্বিক জ্ঞানের এই চবম পবিণতিব ভিতব দিযাই আসে শ্রেষ্ঠতম মুক্ত কর্ম।

[১] পৃথক্ত্বেন তু যজ্‌জ্ঞানং নানাভাবান্ পৃথগ্বিধান্।
বেত্তি সর্বেষু ভূতেষু তজ্‌জ্ঞানং বিদ্ধি বাজসম্॥১৮।২১

[২] সর্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষতে।
অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্‌জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকম্॥১৮।২০

আবাব কর্মকে ধাবণ কবিযা আছে, সম্ভব কবিতেছে তিনটি জিনিস, কর্তা, কবণ এবং অনুষ্ঠিত কর্ম।[১] আব এখানেও গুণগুলির পার্থক্যই ইহাদের প্রত্যেকটির স্বরূপ নির্ণয কবিয়া দেয়। যে সাত্ত্বিক মন সর্বদাই চায যথাযথ সুসঙ্গতি এবং যথাযথ জ্ঞান তাহাই হইতেছে সাত্ত্বিক মানবেব মধ্যে নিয়ামক করণ এবং তাহাই যন্ত্রটিব অন্যান্য অংশকে চালিত কবে। কামনাময আত্মার দ্বারা সমর্থিত অহংমূলক কামসঙ্কল্প হইতেছে বাজসিক কর্মীব মধ্যে প্রধান কবণ। দেহগত মন ও অসংস্কৃত প্রাণ-প্রকৃতিব অজ্ঞান প্রবৃত্তি বা মোহান্ধ প্রেরণা—ইহাই হইতেছে তামসিক কর্মীব প্রধান কবণ শক্তি। মুক্ত পুরুষেব কবণ হইতেছে একটা মহত্তর অধ্যাত্ম জ্যোতি ও শক্তি, তাহা উচ্চতম সাত্ত্বিক বুদ্ধি হইতেও অনেক উচ্চতর, তাহা এক অতিভৌতিক কেন্দ্র হইতে ব্যাপক অবতবণের দ্বারা তাঁহার মধ্যে কার্য কবে এবং তাহাব শক্তিব স্বচ্ছ আধাবরূপে শুদ্ধ ও গ্রহণসমর্থ মন, প্রাণ ও দেহকে ব্যবহাব কবে।

সহজাত প্রবৃত্তি, আকস্মিক প্রেবণা এবং দৃষ্টিহীন পরিকল্পনাসকলকে যন্ত্রবৎ অনুসবণ কবিযা যে কর্ম বিভ্রান্ত মূঢ় অজ্ঞান মনেব সহিত করা হয, যাহাতে শক্তি বা সামর্থ্যেব বিচার কবা হয না, অন্ধ অপপ্রযুক্ত চেষ্টাব ফলে যে ক্ষতি ও অপব্যয় হয তাহাব হিসাব কবা হয না, প্রেবণা, প্রযাস বা পরিশ্রমটির পূর্ববর্তী অবস্থা, ভাবী ফল এবং যথাযথ বিধানের বিবেচনা করা হয না তাহাই তামসিক কর্ম।[২] মানুষ কামনাব বশ্যতায় যে কর্মে প্রবৃত্ত হয, তাহার দৃষ্টি কর্মটিব উপব এবং আকাঙ্ক্ষিত ফলটিব উপব নিবদ্ধ থাকে, আব কিছুরই উপর নহে, অথবা কর্মের মধ্যে নিজ ব্যক্তিত্বেব অহংবোধ থাকে এবং সে কর্ম কবা হয় অনুচিত ক্লেশ ও তীব্র পবিশ্রম সহকাবে, আকাঙ্ক্ষিত ফলটি লাভেব জন্য ব্যক্তিগত ইচ্ছাশক্তিকে অতিমাত্রায উদ্বেলিত ও উৎপীডিত কবা হয, তাহাই বাজসিক কর্ম।[৩] মানুষ যে কর্ম শান্তভাবে বুদ্ধি ও জ্ঞানেব স্বচ্ছ আলোকে এবং ন্যায্যতা বা কর্তব্য বা কোন আদর্শেব দাবি সম্বন্ধে নৈর্ব্যক্তিক অনুভূতি লইয়া সম্পন্ন করে, ইহলোকে বা পবলোকে নিজেব উপব যে ফলই আসুক তাহা বিবেচনা না করিয়া এই কর্মটি কবা উচিত শুধু এই বোধ লইযা যে কর্ম সম্পন্ন কবে, আসক্তিশূন্য হইয়া, কর্মটিব উৎসাহজনকতা বা বিবক্তিজনকতার প্রতি রাগদ্বেষশূন্য হইযা, কেবলমাত্র তাহাব যুক্তি ও ন্যাযবোধেব তৃপ্তির জন্য, স্বচ্ছ বুদ্ধি ও সম্বুদ্ধ সঙ্কল্প ও শুদ্ধ নিঃস্বার্থ মন ও সমুচ্চ সন্তুষ্ট আত্মাব তৃপ্তির জন্য যে কর্ম করে তাহাই সাত্ত্বিক

[১] কবণং কর্ম কর্তেতি ত্রিবিধঃ কর্মসংগ্রহঃ॥
জ্ঞানং কর্ম চ কর্তা চ ত্রিধৈব গুণভেদতঃ।১৮।১৮-১৯

[২] অনুবন্ধং ক্ষযং হিংসামনবেক্ষ্য চ পৌরুষম্।
মোহাদাবভ্যতে কর্ম যৎ তৎ তামসমুচ্যতে॥১৮।২৫

[৩] যত্ত কামেপ্সুনা কর্ম সাহঙ্কাবেণ বা পুনঃ।
ক্রিয়তে বহুলায়াসং তদ্‌বাজসমুদাহৃতম্॥১৮।২৪

কর্ম।[১] সত্ত্বে চূড়ান্ত পবিণতিব সীমায় ইহা রূপান্তবিত হইবে এবং উচ্চতম নৈর্ব্যক্তিক কর্মে পবিণত হইবে, তখন আব তাহা বুদ্ধিব দ্বাবা আদিষ্ট না হইযা আমাদের অন্তরস্থিত আত্মাব দ্বাবা আদিষ্ট হইবে, সে কর্ম হইবে প্রকৃতিব উচ্চতম ধর্মের দ্বাবা পরিচালিত, নিম্নতন অহংভাব হইতে এবং তাহাব গুরু বা লঘু বোঝা হইতে মুক্ত, এমনকি শ্রেষ্ঠতম অভিমত, উদাবতম আকাঙ্ক্ষা, শুদ্ধতম ব্যক্তিগত ইচ্ছা এবং উচ্চতম মানসিক আদর্শবাদেবও সীমাবন্ধন হইতে মুক্ত, এই সকল প্রতিবন্ধকতার কোন্‌টিই আব থাকিবে না, তাহাদেব পবিবর্তে বহিবে এক স্বচ্ছ অধ্যাত্ম আত্মজ্ঞান ও জ্যোতিঃপ্রকাশ এবং যে অমোঘ শক্তি কর্ম কবে ও জগতেব জন্য, জগতের অধীশ্বরের জন্য যে কর্ম কবিতে হয় এতদুভয় সম্বন্ধে এক অলঙ্ঘ্য অন্তরতম অনুভূতি।

তামসিক কর্তা বস্তুত নিজেকে কর্মেব মধ্যে দেয় না পবন্তু যান্ত্রিক মনের দ্বাবা কর্ম কবে অথবা দলের ইতরতম মনোবৃত্তি অনুসবণ কবে, সাধাবণ গতানুগতিক ধাবা অনুসরণ কবে অথবা ভ্রান্তি বা কুসংস্কাবেব বশবর্তী হয। সে তাহাব নির্বুদ্ধিতা ছাড়িতে পাবে না, ভ্রান্তিকে দৃঢভাবে ধরিয়া থাকে এবং নিজেব অজ্ঞান কর্মে মূঢ গর্ব অনুভব করে; সঙ্কীর্ণ ও কুটিল শঠতা প্রকৃত বুদ্ধির স্থান গ্রহণ কবে, যাহাদেব সহিত তাহার ব্যবহাব তাহাদেব প্রতি, বিশেষত তাহা অপেক্ষা জ্ঞানী ও শ্রেষ্ঠতব ব্যক্তিগণেব প্রতি তাহার নির্বোধ ও উদ্ধত তাচ্ছিল্য থাকে। তাহাব কর্মেব লক্ষণ হয় জড়তাময় আলস্য, মন্দগতি, দীর্ঘসূত্রতা, শৈথিল্য এবং উৎসাহ ও আন্তবিকতার অভাব। তামসিক মানুষ সাধাবণত হয় কর্মে মন্থব, চলনে শ্লথ, সহজেই অবসন্ন, তাহার শক্তিব, তাহাব শ্রম বা ধৈর্যেব উপব চাপ পডিলে শীঘ্রই কর্মভার ত্যাগ করিতে তৎপব। অন্যপক্ষে বাজসিক কর্তা হয কর্মেব উপর ব্যগ্রতার সহিত আসক্ত, তাহার দ্রুত সম্পাদনেব জন্য উৎসুক, ফল ও পুবস্কাবেব জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষাপবায়ণ, হৃদয়ে লোভী, মনে অশুচি, সে কর্ম সম্পন্ন কবিবাব জন্য অনেক সময়ে এমন সব উপায অবলম্বন কবে যাহা হয় হিংসাত্মক, নিষ্ঠুব, পাশবিক; যদি সে যাহা চায় তাহা পায, নিজের রিপু ও সঙ্কল্পসকলকে তৃপ্ত কবিতে পারে, নিজেব অহং-এর দাবিসকলকে পূর্ণ কবিতে পারে তাহা হইলে কাহার অনিষ্ট কবা হইল, অপবের কত ক্ষতি হইল সেসব সে গ্রাহ্যই কবে না। সাফল্যে সে অতিমাত্রায হর্ষান্বিত হইযা উঠে অসাফল্যে তীব্রভাবে শোকাচ্ছন্ন ও অভিভূত হইযা পড়ে।[২] সাত্ত্বিক কর্মী এই সকল আসক্তি, অহংপবতা হইতে মুক্ত, তাহার মন ও ইচ্ছাশক্তি সাফল্যে স্ফীত হইয়া উঠে না, অসাফল্যে অবসন্ন হইযা পড়ে না, তাহারা নৈর্ব্যক্তিক দৃঢ সঙ্কল্প, শান্ত ঐকান্তিক উদ্যম অথবা যে কর্মটি

[১] নিয়তং সঙ্গবহিতমবাগদ্বেষতঃ কৃতম্।
অফলপ্রেপ্সুনা কর্ম্ম যৎ তৎ সাত্ত্বিকমুচ্যতে॥১৮।২৩

[২] বাগী কর্ম্মফলপ্রেপ্সুর্লুব্ধো হিংসাত্মকোঽশুচিঃ।
হর্ষশোকান্বিতঃ কর্ত্তা বাজসঃ পবিকীর্ত্তিতঃ॥১৮।২৭

কবিতে হইবে তাহাতে সমুদ্ধ ও শুদ্ধ ও নিঃস্বার্থ উৎসাহে পবিপূর্ণ।[১] সত্ত্ব যেখানে চবম পবিণতি লাভ কবে সেখানে এবং তাহাব উর্ধ্বে এই দৃঢ সঙ্কল্প, উদ্যম ও উৎসাহ হয অধ্যাত্ম তপঃশক্তিব স্বতঃস্ফূর্ত ক্রিয়া এবং শেষকালে হয় উচ্চতম আত্মশক্তি, সাক্ষাৎ ভগবদ্ শক্তি, মানবীয যন্ত্রেব মধ্যে এক দিব্য তেজের মহান ও অবিচল ধাবা, সত্যসন্ধ সুনিশ্চিত পদক্ষেপ, দিব্যজ্ঞানময বুদ্ধি এবং তাহার সহিত মুক্ত প্রকৃতিব কর্মে মুক্ত আত্মাব উদাব আনন্দ।

সজ্ঞান সঙ্কল্প সহ বুদ্ধি হইতেছে মানবীয় সম্পদ, ইহাবা মানুষেব মধ্যে যেরূপ এবং যে পবিমাণে থাকে তদনুযাযী তাহাব মধ্যে কাজ কবে এবং তদনুযায়ী তাহাবা ঐ মানুষেব মনেরই ন্যায় যথাযথ কিংবা বিকৃত, আচ্ছন্ন কিংবা প্রোজ্জ্বল, সঙ্কীর্ণ ও ক্ষুদ্র কিংবা বৃহৎ ও উদাব হয। মানুষেব প্রকৃতিতে যে বুদ্ধি বা বুঝিবার শক্তি বহিযাছে তাহাই তাহাব কর্ম নির্বাচন করে অথবা, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যেরূপ হয, তাহাব জটিল সহজাত প্রবৃত্তি, আকস্মিক প্রেবণা, পরিকল্পনা ও বাসনাসমূহ যে বহু প্রবোচনা উপস্থিত কবিতেছে তাহাদের মধ্য হইতেই কোন একটিকে অনুমোদন কবে, তাহাতেই তাহারা সায় দেয। তাহাব পক্ষে কোন্‌টা ন্যায় বা অন্যায, কর্তব্য বা অকর্তব্য, ধর্ম বা অধর্ম, উহাই তাহা নির্ণয করিযা দেয়। আব সঙ্কল্পেব স্থৈর্য (ধৃতি) হইতেছে মানস প্রকৃতিব সেই নিরবচ্ছিন্ন শক্তি যাহা কর্মটিকে ধবিযা থাকে, তাহাকে সঙ্গতি ও স্থিতি প্রদান করে। এখানেও আবার গুণত্রযেব প্রভাব বহিযাছে।[২] তামসিক বুদ্ধি হইতেছে মিথ্যা, অজ্ঞান এবং তমসাচ্ছন্ন যন্ত্র, তাহা আমাদিগকে মলিন ও ভ্রান্ত আলোকে, বিকৃত ধারণাসমূহের কুহেলিকায় সকল জিনিস দেখিতে বাধ্য কবে, বস্তু ও ব্যক্তিসকলের মর্যাদা মূঢের ন্যায় অগ্রাহ্য করে।[৩] এই বুদ্ধি আলোককে বলে অন্ধকাব, অন্ধকারকে বলে আলো, যাহা অধর্ম সেইটিকেই ধর্ম বলিযা মনে কবে, যে জিনিসটি কবা উচিত নয সেইটিতেই লাগিযা থাকে এবং সেইটিকেই একমাত্র যথাকর্তব্য জিনিস বলিয়া আমাদেব সম্মুখে ধবে। তাহাব অজ্ঞান অপবাজেয়, আর তাহাব সঙ্কল্পে স্থৈর্য বা ধৃতি হইতেছে তাহাব সেই অজ্ঞানেই যে তৃপ্তি ও নির্বোধ গর্ব সেইটিকেই দৃঢভাবে ধবিযা থাকা। ঐটি হইতেছে উহাব অন্ধ কর্মেব দিক, কিন্তু অন্যদিকেও ইহার সঙ্গে আসে জডতা ও অক্ষমতাব গুরুভাব, নির্জীবতা ও নিদ্রায আসক্তি, মানসিক পবিবর্তন ও উন্নতিতে বিতৃষ্ণা, মনেব সেই সকল ভয় ও শোক ও বিষাদের বিষয় চিন্তা কবা যাহাবা আমাদেব গতি রুদ্ধ কবে অথবা আমাদিগকে হীন, দুর্বল,

মুক্তসঙ্গোঽনহংবাদী ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতঃ।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোর্নির্বিকাবঃ কর্ত্তা সাত্ত্বিক উচ্যতে॥১৮।২৬
বুদ্ধের্ভেদং ধৃতেশ্চৈব গুণতস্ত্রিবিধং শৃণু।
প্রোচ্যমানমশেষেণ পৃথক্ত্বেন ধনঞ্জয॥১৮।২৯
অধর্ম্মং ধর্ম্মমিতি যা মন্যতে তমসাবৃতা।
সর্ব্বার্থান বিপরীতাংশ্চ বুদ্ধিঃ সা পার্থ তামসী॥১৮।৩২

কাপুরুষোচিত ব্যবহারে প্রবৃত্ত করিয়া রাখে।[১] ভীরুতা, ওজর, ফাঁকি, আলস্য, মনের ভয় ও মিথ্যা সংশয় ও সাবধানতা ও কর্তব্যে পরাঙ্মুখতাকে, আমাদের ঊর্ধ্বতন প্রকৃতির দাবি হইতে চ্যুতি ও বিমুখতাকে মনের দ্বারা সমর্থন করা, সর্বাপেক্ষা নিরুপদ্রব পথ ধরিয়া নিরাপদে চলা যেন সর্বাপেক্ষা কম কষ্ট ও প্রয়াস ও বিপদেই আমাদের পরিশ্রমের ফল লাভ করা যায়—সে বলে যে, বরং কোন ফলই না হউক কিংবা অতি সামান্যই ফল লাভ হউক তাহাই ভাল তবু কোন বৃহৎ ও মহান প্রয়াস বা বিপজ্জনক ও কঠোর প্রযত্ন ও ভাগ্যপরীক্ষা নয়—এই সমুদয়ই হইতেছে তামসিক সঙ্কল্প ও বুদ্ধির লক্ষণ।

রাজসিক বুদ্ধি যখন ইচ্ছা করিয়া ভুল ও অশুভের জন্যই ভুল ও অশুভকে বরণ করিয়া না লয়, তখন ন্যায় ও অন্যায়ের মধ্যে, কোন্‌টা করা উচিত আর কোন্‌টা করা উচিত নয় এতদুভয়ের মধ্যে প্রভেদ করিতে পারে, কিন্তু যথাযথ-ভাবে নহে, তাহাদের যথাযথ পরিমাপকে ক্ষুণ্ণ করা হয়, যথার্থ মূল্যকে অনবরত বিকৃত করা হয়।[২] আর এরকম যে হয় তাহার কারণ ইহার বুদ্ধি ও সঙ্কল্প হইতেছে অহং-এর বুদ্ধি এবং কামনার সঙ্কল্প, আর এই সকল শক্তি নিজেদের অহংমূলক উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য সত্যকে ও ধর্মকে ভ্রান্তভাবে দেখায় এবং বিকৃত করিয়া দেয়। যখন আমরা অহং ও কামনা হইতে মুক্ত হই এবং শুধু সত্য এবং তাহার পরিণাম দেখিতে উৎসুক শান্ত, শুদ্ধ, নিঃস্বার্থ মন লইয়া ধীরভাবে পর্যবেক্ষণ করি, কেবল তখনই আমরা বস্তুসকলকে যথাযথভাবে দেখিবার এবং তাহাদের যথার্থ মূল্য নির্ধারণ করিবার আশা করিতে পারি। কিন্তু রাজসিক সঙ্কল্প স্বার্থ ও সুখের সন্ধানে এবং নিজে যেটিকে ন্যায় ও ধর্ম বলিয়া মনে করে বা মনে করিতে চায় তাহার সন্ধানে নিজের আসক্তিপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা ও কামনাসকলের তৃপ্তির উপরেই মনোযোগ দৃঢ়সন্নিবিষ্ট করে।[৩] সকল সময়েই সে এইসব জিনিসের এমন ব্যাখ্যা গ্রহণ করে যাহা তাহার কামনাসকলকেই সর্বাপেক্ষা অধিক প্রোৎসাহিত করিবে, সমর্থন করিবে, অথবা তাহার কর্ম ও প্রয়াসসকলের আকাঙ্ক্ষিত ফল লাভ করিতে যেসকল পন্থা সর্বাপেক্ষা অধিক উপযোগী সেইগুলিকেই ন্যায়সঙ্গত ও যুক্তিসঙ্গত বলিয়া প্রতিপন্ন করিবে। মানবীয় বুদ্ধি ও সঙ্কল্পের যত মিথ্যা ও অনাচার তাহার চার ভাগের এক ভাগ এইভাবেই উৎপন্ন হয়। প্রাণিক অহং-এর উপর প্রচণ্ড আধিপত্য লইয়া রজোগুণ হয় মূর্ত মহাপাপ এবং সাক্ষাৎ বিপথচালক।

[১] যয়া স্বপ্নং ভয়ং শোকং বিষাদং মদমেব চ।
ন বিমুঞ্চতি দুর্মেধা ধৃতিঃ সা পার্থ তামসী॥১৮।৩৫

[২] যয়া ধর্ম্মমধর্ম্মঞ্চ কার্য্যঞ্চাকার্য্যমেব চ।
অযথাবৎ প্রজানাতি বুদ্ধিঃ সা পার্থ রাজসী॥১৮।৩১

[৩] যয়া তু ধর্ম্মকামার্থান্ ধৃত্যা ধারয়তেঽর্জ্জুন।
প্রসঙ্গেন ফলাকাঙ্ক্ষী ধৃতিঃ সা পার্থ রাজসী॥১৮।৩৪

জগতের গতি, কর্ম ও কর্মত্যাগের নীতি, কোন্ জিনিসটি করিতে হইবে, কোন্‌টি করিতে হইবে না, আত্মার পক্ষে কোন্‌টি নিরাপদ কোন্‌টি বিপজ্জনক, কোন্ জিনিসকে ভয় করিতে হইবে, দূরে রাখিতে হইবে, কোন্ জিনিসকে সঙ্কল্পের দ্বারা আলিঙ্গন করিতে হইবে, কোন্ জিনিস মানবাত্মাকে বন্ধন করে, কোন্ জিনিস তাহাকে মুক্তি দেয়—এই সবকে সাত্ত্বিক বুদ্ধি দেখে তাহাদের যথাস্থানে, যথারূপে এবং যথামাত্রায়।[১] উচ্চতম আত্মা ও অধ্যাত্ম সত্তার দিকে ঊর্ধ্বমুখী আরোহণে তাহার জাগ্রত সঙ্কল্পের ধৃতি দ্বারা সে এই সব জিনিসই গ্রহণ করে অথবা বর্জন করে তাহার জ্ঞানের পরিমাণ অনুসারে, ক্রমবিকাশের যে স্তরে সে উঠিয়াছে তদনুসারে। ঊর্ধ্বাকাঙ্ক্ষী বুদ্ধি যখন সাধারণ যৌক্তিক বুদ্ধি ও মানস সঙ্কল্পের ঊর্ধ্বে যে সত্য রহিয়াছে তাহাতে নিবদ্ধ হয়, উত্তুঙ্গ শিখর সকলের দিকে উন্মুখ হয়, ইন্দ্রিয় ও প্রাণকে দৃঢ়ভাবে সংযত করিতে এবং মানুষের উচ্চতম সত্তা, বিশ্বগত ভাগবত সত্তা ও বিশ্বাতীত পুরুষের সহিত যোগের দ্বারা যুক্ত হইতে প্রবৃত্ত হয় তখন ইহার সমুচ্চ ধৃতির দ্বারাই এই সাত্ত্বিক বুদ্ধি চরম পরিণতি লাভ করে।[২] সাত্ত্বিক গুণের ভিতর দিয়া সেইখানে উপস্থিত হইয়াই মানুষ গুণসকলের ঊর্ধ্বে চলিয়া যাইতে পারে, মন এবং তাহার সঙ্কল্প ও বুদ্ধির অক্ষমতাসকলের ঊর্ধ্বে উঠিতে পারে এবং সত্ত্ব নিজেই সেই সত্তার মধ্যে বিলীন হইতে পারে যাহা গুণসকলের অতীত এবং এই যন্ত্রস্বরূপ প্রকৃতির ঊর্ধ্বে। সেখানে জীব জ্যোতির মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং আত্মার সহিত ভগবানের সহিত অবিচলিত যোগে অধিরূঢ় হয়। সেই শিখরে সমুপস্থিত হইয়া আমরা আমাদের আধারে দিব্য কর্মের মুক্ত স্বাচ্ছন্দ্যে প্রকৃতিকে পরিচালিত করিবার ভার পরমতমের উপরেই ছাড়িয়া দিতে পারি, কারণ সেখানে কোন ভ্রান্ত বা বিশৃঙ্খল ক্রিয়া নাই, আত্মার জ্যোতির্ময় সিদ্ধি ও শক্তিকে আচ্ছন্ন বা বিকৃত করিবার মত কোন ভুল বা অক্ষমতা নাই। নিম্নতর স্তরের এই সব বিধান, নীতি, ধর্মের আর কোনও প্রভাব আমাদের উপর থাকে না; মুক্ত মানবের মধ্যে অনন্ত পুরুষ কর্ম করেন, সেখানে মুক্ত আত্মার অবিনাশী সত্য ও ধর্ম ব্যতীত আর কোনও ধর্ম নাই, কর্ম নাই, কোন প্রকারেরই বন্ধন নাই।

সুসঙ্গতি ও শৃঙ্খলা হইতেছে সাত্ত্বিক মন ও প্রকৃতির বিশিষ্ট গুণ—অচঞ্চল সুখ, স্বচ্ছ ও স্থির সন্তোষ এবং একটা আভ্যন্তরীণ স্বাচ্ছন্দ্য ও শান্তি। বস্তুত সুখই হইতেছে একটি মাত্র জিনিস যাহা প্রকাশ্যেই হউক বা গৌণভাবেই হউক আমাদের মানবীয় প্রকৃতির সার্বজনীন লক্ষ্য—সুখ, অথবা সুখের আভাস অথবা তাহার কোনরূপ নকল, কোন বিলাস, কোন ভোগ, মন, সঙ্কল্প, প্রাণিক বাসনা বা

[১] প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ কার্য্যাকার্য্যে ভয়াভয়ে।
বন্ধং মোক্ষঞ্চ যা বেত্তি বুদ্ধিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী॥১৮।৩০

[২] ধৃত্যা যয়া ধারয়তে মনঃ প্রাণেন্দ্রিয়ক্রিয়াঃ।
যোগেনাব্যভিচারিণ্যা ধৃতিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী॥১৮।৩৩

দেহের কোনরূপ তৃপ্তি। দুঃখ হইতেছে এমন অনুভূতি যাহা আমাদেব প্রকৃতি অনিচ্ছার সহিত, বিশ্বপ্রকৃতিব একটা প্রয়োজন, একটা অপবিহার্য ঘটনা হিসাবে স্বীকার কবিয়া লইতে বাধ্য হয়, অথবা আমরা যাহা চাই তাহাব উপাযস্বরূপ স্বেচ্ছায আমরা দুঃখকে বরণ করিয়া লই, কিন্তু শুধু দুঃখেব জন্যই দুঃখ কেহ চাহে না—যদি না চিত্তবিকারে তাহা চাওযা হয় অথবা দুঃখেব মধ্যেই যে একটা ভীষণ সুখের স্পর্শ আছে বা তাহা হইতে যে সুতীব্র শক্তির উদ্ভব হয তাহাব জন্যই উৎসাহেব আবেগে তাহা চাওযা হয। কিন্তু আমাদেব প্রকৃতিতে যে গুণেব প্রাধান্য হয় তদনুযায়ী আমাদেব সুখ ও ভোগবিলাসও বিভিন্ন প্রকাবেব হয। এইভাবে তামসিক মন তাহাব আলস্য ও জডতায়, নিদ্রা ও তন্দ্রায, অন্ধতা ও প্রমাদে বেশ সন্তুষ্ট থাকিতে পারে।[১] প্রকৃতি তাহাকে তাহাব নির্বুদ্ধিতা ও অজ্ঞানে, তাহাব গুহাগত ম্লান আলোকে, তাহাব জডতাময তৃপ্তিতে, তাহাব ক্ষুদ্র ও নীচ সুখে এবং তাহার ইতর ভোগবিলাসে পবিতৃপ্ত থাকিবাব বিশেষ ক্ষমতা দিযাছে। এই তৃপ্তিব অগ্রে মোহ, পরিণামেও মোহ; তথাপি গুহাব অধিবাসীকে তাহাব মোহসকলেই একটা তামসিক সুখ দেওয়া হইয়াছে, সে সুখ খুব প্রশংসনীয় না হইলেও তাহার পক্ষে যথেষ্ট। জডতা ও অজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত একটা তামসিক সুখও আছে।

রাজসিক মানুষেব মন অধিকতব উগ্র ও উন্মাদনাময পাত্র হইতে পান কবে, ইন্দ্রিযেব, শরীরেব, ইন্দ্রিয়জালে বদ্ধ অথবা প্রচণ্ডভাবে কর্মময সঙ্কল্প ও বুদ্ধিব যে তীব্র, চঞ্চল, সক্রিয় উপভোগ সেইটিকেই সে জীবনেব সব আনন্দ বলিযা, জীবনেব নিগূঢ় অর্থ বলিযা গ্রহণ কবে।[২] এই সুখ প্রথম স্পর্শে অমৃতোপম, কিন্তু পাত্রেব তলদেশে থাকে প্রচ্ছন্ন বিষ এবং পবে আসে আশাভঙ্গেব তিক্ততা, ভোগক্লান্তি, অবসন্নতা, বিদ্রোহ, বিবাগ, পাপ, যন্ত্রণা, হানি, অনিত্যতা। আব এইরূপ হইবেই কারণ আমাদের আত্মা যেসব জিনিস জীবন হইতে সত্যসত্যই দাবি করে এইসব ভোগ তাহাদেব বাহ্যরূপে সেই জিনিস নহে, রূপেব অনিত্যতার পশ্চাতে ও ঊর্ধ্বে একটা জিনিস আছে যাহা স্থায়ী, তৃপ্তিকব, আপনাতেই আপনি পূর্ণ। অতএব সাত্ত্বিক প্রকৃতি যাহা চায় তাহা হইতেছে ঊর্ধ্বতম মানস ও আত্মার পবিতৃপ্তি এবং যখন সে তাহাব এই সুবৃহৎ কাম্যটি লাভ করে তখন আসে আত্মার এক স্বচ্ছ শুদ্ধ সুখ, এক পূর্ণতার অবস্থা, এক স্থায়ী স্বাচ্ছন্দ্য ও শান্তি।[৩] এই সুখ কোন বাহ্যিক জিনিসেব উপব নির্ভব কবে না,

[১] যদগ্রে চানুবন্ধে চ সুখং মোহনমাত্মনঃ।
নিদ্রালস্যপ্রমাদোত্থং তত্তামসমুদাহৃতম্॥১৮।৩৯

[২] বিষযেন্দ্রিযসংযোগাদ্‌যত্তদগ্রেঽমৃতোপমম্।
পবিণামে বিষমিব তৎ সুখং বাজসং স্মৃতম্॥১৮।৩৮

[৩] অভ্যাসাদ্ বমতে যত্র দুঃখান্তঞ্চ নিগচ্ছতি॥
যত্তদগ্রে বিষমিব পবিণামেঽমৃতোপমম্।
তৎ সুখং সাত্ত্বিকং প্রোক্তমাত্মবুদ্ধিপ্রসাদজম্॥১৮।৩৬-৩৭

আমাদেব মধ্যে যাহাকিছু উৎকৃষ্টতম আছে, নিগূঢ়তম আছে, তাহাবই স্ফুরণের উপব নির্ভব কবে। কিন্তু প্রথম হইতেই ইহা আমাদের স্বাভাবিক অধিকার নহে, ইহাকে জয কবিতে হয় আত্মসংযমের দ্বারা, আত্মাব প্রয়াসের দ্বাবা, সমুচ্চ ও কঠোর অভ্যাসেব দ্বাবা। ইহার অর্থ প্রথমে অভ্যস্ত ভোগ অনেক হাবানো, অনেক দুঃখ ও দ্বন্দ্ব, আমাদেব প্রকৃতির মন্থন হইতে, শক্তিসকলেব বেদনাপূর্ণ সংঘর্ষ হইতে সমুত্থিত হলাহল, আধাবেব বিভিন্ন অংশের দুষ্প্রবৃত্তিব জন্য অথবা প্রাণিক প্রবৃত্তিসকলের আপন পথেই চলিবার জিদের জন্য অনেক বিদ্রোহ ও বাধা, কিন্তু পবিণামে এই তিক্ততাব স্থলে উত্থিত হয় অমৃত, আব আমরা যেমন ঊর্ধ্বতন অধ্যাত্ম প্রকৃতিব মধ্যে উঠিতে থাকি তেমনিই হয় সকল দুঃখের অন্ত, সকল শোক ও বেদনার সহজ অবসান। এইটিই হইতেছে সেই সর্বোত্তম সুখ যাহা সাত্ত্বিক সাধনাব চবম সীমায় আমাদের মধ্যে নামিয়া আসে।

সাত্ত্বিক প্রকৃতিব আত্ম-অতিক্রমণ তখনই হয যখন মহান হইলেও নিম্নতব যে সাত্ত্বিক সুখ, আমবা তাহাব ঊর্ধ্বে যাই, মানসিক জ্ঞান ও পুণ্য ও শান্তিতে যে সুখ তাহাব ঊর্ধ্বে যাই, আত্মার চিবন্তন শান্তি ও ভাগবত ঐক্যের অধ্যাত্ম পরমানন্দে প্রতিষ্ঠিত হই। সেই অধ্যাত্ম সুখ তখন আর শুধুই সাত্ত্বিক সুখ নহে, তাহা পূর্ণতম আনন্দ। প্রচ্ছন্ন আনন্দ হইতেই সর্বভূত উৎপন্ন হয, সেই আনন্দের দ্বারাই সকলে জীবিত থাকে এবং অধ্যাত্ম সিদ্ধির দ্বাবা সকলেই সেই আনন্দের মধ্যে উঠিতে পাবে। কেবল তখনই তাহা অধিকাব করা যায় যখন মুক্ত পুরুষ অহং ও ইহার কামনাসমূহ হইতে মুক্ত হইযা অবশেষে তাঁহাব ঊর্ধ্বতম আত্মার সহিত ঐক্যে, সর্বভূতেব সহিত ঐক্যে এবং ভগবানেব সহিত ঐক্যে অধ্যাত্ম সত্তার পূর্ণতম আনন্দের মধ্যে বাস করেন।

বিংশ অধ্যায়

স্বভাব ও স্বধর্ম

অতএব ত্রিগুণাত্মিকা নিম্নতন প্রকৃতিব মধ্য হইতে গুণত্রযেব অতীত পবম দিব্য প্রকৃতিতে আত্মার যে মুক্তিপ্রদ বিকাশ তাহাই হইতেছে আমাদেব অধ্যাত্ম সিদ্ধি ও মুক্তিতে উপনীত হইবাব শ্রেষ্ঠ পন্থা। ইহাও উৎকৃষ্টভাবে সংসাধিত হইতে পারে যদি ইতিপূর্বে উচ্চতম সাত্ত্বিক গুণের প্রাধান্যেব এমন বিকাশ হয় যাহা দ্বারা সত্ত্বও অতিক্রান্ত হয়, নিজেব অপূর্ণতাসকলেব ঊর্ধ্বে চলিয়া যায এবং গুণত্রয়ের দ্বন্দ্বের অতীত এক ঊর্ধ্বতম মুক্তি, পবমতম জ্যোতি, আত্মাব শান্ত শক্তিব মধ্যে নিজেকে হাবাইয়া ফেলে। মুক্ত বুদ্ধিতে আমবা আমাদেব আভ্যন্তরীণ সম্ভাবনাসকল সম্বন্ধে যে উচ্চতম মানসিক ধাবণা কবিতে পাবি তদনুযায়ী এক উচ্চতম সাত্ত্বিক শ্রদ্ধা ও লক্ষ্য আমাদেব সত্তাকে নূতনভাবে গঠন করিযা দেয় এবং সেই শ্রদ্ধাই উক্ত পরিবর্তনেব দ্বাবা আমাদেব নিজ সত্য সত্তা সম্বন্ধে দৃষ্টিতে, অধ্যাত্ম আত্মজ্ঞানে পবিণত হয। ধর্মেব আদর্শ ও নীতি, আমাদেব প্রাকৃত জীবনের যথাযথ বিধির অনুসবণ এক মুক্ত সুদৃঢ় স্বপ্রতিষ্ঠ সিদ্ধিতে রূপান্তরিত হয়, সেখানে সকল নীতিব আবশ্যকতাকে অতিক্রম কবা হয এবং অমৃত আত্মার স্বতঃস্ফূর্ত ধর্ম দেহ প্রাণ মনেব নিম্নতন নীতিব স্থান গ্রহণ কবে। সাত্ত্বিক মন ও সঙ্কল্প সেই ঐক্যাত্মক জীবনের জ্ঞান ও তপঃ শক্তিতে পবিবর্তিত হইবে যেখানে সমগ্র প্রকৃতি তাহার ছদ্মবেশ পবিহার কবে এবং তাহাব অন্তবস্থিত ভগবানের মুক্ত আত্ম-অভিব্যক্তিতে পবিণত হয। সাত্ত্বিক কর্মী তাহার উৎসেব সহিত মিলিত, পুরুষোত্তমেব সহিত যুক্ত জীবাত্মা হইযা উঠে, সে নিজে আব কর্মটির কর্তা থাকে না, পরন্তু বিশ্বাতীত ও বিশ্বময় পুরুষেব কর্মেব অধ্যাত্ম যন্ত্রস্বরূপ হয়। তাহার রূপান্তরিত ও জ্ঞানালোকিত প্রাকৃত সত্তা এক বিশ্বগত ও নৈর্ব্যক্তিক কর্মের নিমিত্তস্বরূপ দিব্য যোদ্ধাব ধনুস্বরূপ ব্যবহৃত হইবার জন্য বর্তিযা থাকে। যাহা ছিল সাত্ত্বিক কর্ম তাহাই হয় সিদ্ধ প্রকৃতিব মুক্ত ক্রিযা, সেখানে আব ব্যক্তিগত কোন খণ্ডতা থাকিতে পায় না, এই গুণ বা ঐ গুণটিতে কোনরূপ আসক্তি থাকে না, থাকে শুধু এক পবমতম অধ্যাত্ম আত্মরূপাযণ। ভগবৎ-সন্ধানী ও অধ্যাত্ম জ্ঞানেব দ্বারা একমাত্র দিব্য কর্মী ভগবানে সমর্পিত কর্মসকলের ইহাই হয় চরম পবিণতি।

এখনও একটি আনুষঙ্গিক প্রশ্ন আছে, প্রাচীন ভাবতীয সংস্কৃতিতে সেটিব খুবই গুরুত্ব ছিল, আর সেই প্রাচীন মতের কথা ছাড়িযা দিলেও তাহাব সাধাবণ প্রয়োজনীয়তাও খুব বেশী, গীতা ইতিপূর্বে প্রসঙ্গক্রমে এই বিষযে দুই এক কথা বলিয়াছে, এখন তাহা যথাস্থানে উত্থাপিত হইতেছে। সাধাবণ স্তবে সকল কর্মই

গুণত্রযেব দ্বাবা নির্ধাবিত হয, যে কর্মটি করিতে হইবে, কর্ত্তব্যম্ কর্ম্ম, তাহার তিনটি রূপ—দান, তপঃ ও যজ্ঞ এবং ইহাদের প্রত্যেকটি কিংবা সবগুলিই যেকোন একটি গুণেব প্রকৃতি অনুযাযী হইতে পারে। অতএব এইগুলিকে তাহাদেব সামর্থ্য অনুযাযী উচ্চতম সাত্ত্বিক স্তবে তুলিয়াই আমাদিগকে অগ্রসর হইতে হইবে এবং তাহাব পব আবও অগ্রসর হইযা এমন এক প্রসাবতায় উপনীত হইতে হইবে যেখানে সকল কর্মই হইবে অবাধ আত্মদান, দিব্য তপের শক্তি, অধ্যাত্ম জীবনেব নিত্য যজ্ঞ। কিন্তু ইহা হইতেছে একটি সাধারণ নিয়ম, আর এইসকল আলোচনা দ্বাবা কেবল সাধাবণ তত্ত্বগুলিই বিবৃত হইযাছে, সেগুলি নির্বিশেষে সকল কর্ম এবং সকল মনুষ্যের পক্ষেই প্রযোজ্য। সকলেই কালক্রমে অধ্যাত্মবিকাশেব দ্বাবা এই দৃঢ় সংযম, এই উদাব সিদ্ধি, এই উচ্চতম অধ্যাত্ম অবস্থায উপনীত হইতে পাবে। কিন্তু যদিও মন ও কর্মের সাধারণ বিধিসকল মনুষ্যেব পক্ষে সমান তথাপি আমরা দেখিতে পাই যে, সর্বদা বৈচিত্র্যেরও একটা নীতি বহিযাছে এবং প্রত্যেক ব্যক্তি যে কেবল মানবীয আত্মা, মন, সঙ্কল্প, প্রাণের সাধাবণ নীতিগুলি অনুসবণ করিযা কর্ম কবে তাহাই নহে, পবন্তু নিজের বিশিষ্ট প্রকৃতিবও অনুসবণ করে, প্রত্যেক মনুষ্য তাহার নিজের পরিস্থিতি, সামর্থ্য, বৈশিষ্ট্য, চবিত্র, শক্তি অনুসাবে বিভিন্নপ্রকার কর্ম সম্পাদন কবে অথবা বিভিন্ন ধাবাব অনুসবণ করিযা চলে। এই যে বৈচিত্র্য, প্রকৃতিব এই ব্যষ্টিগত নীতি, ইহাকে অধ্যাত্ম সাধনায কোন্ স্থান দিতে হইবে?

এই জিনিসটাব উপব গীতা কতকটা জোব দিযাছে, এমনকি প্রারম্ভে যে ইহার খুবই প্রযোজনীযতা রহিযাছে তাহা বিশেষভাবে দেখাইয়া দিয়াছে। প্রথমেই গীতা অর্জুনেব স্বধর্মেব কথা, ক্ষত্রিয হিসাবে তাহাব প্রকৃতি, নীতি ও কর্মের কথা বলিযাছে, বিশেষ জোবেব সহিতই বিধান দিয়াছে যে, যাহাব যাহা নিজস্ব প্রকৃতি, নীতি, কর্ম, তাহা পালন ও অনুসবণ কবা কর্তব্য—ইহা দোষযুক্ত হইলেও সম্যকভাবে অনুষ্ঠিত পবধর্ম অপেক্ষা শ্রেয;[১] পবের ধর্ম অনুসরণ করিযা বিজয লাভ কবা অপেক্ষা নিজের ধর্মে মৃত্যুও শ্রেয। পরের ধর্ম অনুসরণ করা আত্মার পক্ষে বিপজ্জনক, অর্থাৎ তাহার বিবর্তনের স্বাভাবিক ধারার বিরোধী, সেটি হয় যন্ত্রবৎ আরোপিত অতএব বাহির হইতে আরোপিত, কৃত্রিম এবং আত্মার প্রকৃত মহত্ত্ব সেইদিকে ক্রমবর্ধনেব পক্ষে বিনষ্টিকর। সত্তাব ভিতব হইতে যাহা আসে তাহাই যথাযথ ও স্বাস্থ্যকর জিনিস, তাহাই অকৃত্রিম কর্মধারা, বাহিব হইতে ইহাব উপব যাহা জোব কবিযা আবোপ কবা হয় অথবা প্রাণের তাডনা বা মনের ভ্রান্তির দ্বাবা চাপাইযা দেওযা হয সেইটি নহে। প্রাচীন ভারতীয সামাজিক সংস্কৃতির চাতুর্বর্ণ্যেব কর্মে এই স্বধর্মেব বাহ্যিক মোটামুটি চাবি বিভাগ কবা হইয়াছে। গীতা

[১] শ্রেযান্ স্বধর্মো বিগুণঃ পবধর্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্মে নিধনং শ্রেযঃ পবধর্মো ভযাবহঃ॥৩।৩৫

বলিয়াছে, সেই প্রথা একটি ভগবৎ বিধানেব অনুযায়ী, ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্ম-বিভাগশঃ, "গুণ ও কর্মের বিভাগ অনুসাবে আমাব দ্বাবা সৃষ্ট হইযাছে, বিশ্ববিধাতা কর্তৃক প্রথম হইতেই সৃষ্ট হইযাছে। অন্য কথায, সক্রিয প্রকৃতিব চাবিটি সুস্পষ্ট শ্রেণী আছে, অথবা প্রকৃতি-অধিষ্ঠিত পুরুষেব চাবিটি মূল রূপ বা স্বভাব আছে, আর প্রত্যেক মানুষেব উপযোগী কর্ম হইতেছে তাহাব প্রকৃতিব বিশিষ্ট রূপেব অনুযায়ী। এইটিই এখন আবও পুঙ্ক্ষানুপুঙ্ক্ষভাবে ব্যাখ্যা কবা হইতেছে। গীতা বলিতেছে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয, বৈশ্য ও শূদ্রগণেব নিজ নিজ আভ্যন্তবীণ প্রকৃতি, আধ্যাত্মিক ভাব, মূলস্বরূপ (স্বভাব) হইতে জাত গুণানুসাবে তাহাদেব কর্মসকল ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে।[১] শম, দম, তপস্যা, শুচিতা, ক্ষমা, সবলতা, জ্ঞান, বিজ্ঞান, আস্তিক্য—এইসকল ব্রাহ্মণেব কর্ম তাঁহাব স্বভাব হইতে জাত। শৌর্য, তেজ, দৃঢ় সঙ্কল্প, দক্ষতা, যুদ্ধে অপবাঙ্মুখতা, দান এবং ঈশ্ববভাব (শাসনকর্তা ও নেতাব ভাব), এই সকল ক্ষত্রিযের স্বাভাবিক কর্ম। কৃষিকর্ম, গোপালন, বাণিজ্য ও *শিল্পকর্ম, এইসকল বৈশ্যের স্বাভাবিক কর্ম।*[২] সকলপ্রকাব পবিচর্যাত্মক কর্ম শূদ্রেব স্বাভাবিক কর্মেব অন্তর্ভুক্ত। তাহাব পব গীতা বলিতেছে, যে ব্যক্তি জীবনে আপন স্বভাবানুরূপ কর্ম করে *সে অধ্যাত্ম সংসিদ্ধি লাভ কবে,*[৩] অবশ্য ঐ সিদ্ধিলাভ কেবল কর্মটির দ্বাবাই হয় না পরন্তু যদি সে যথাযথ জ্ঞান ও যথাযথ প্রবোচনা লইয়া ঐ কর্ম কবে, বিশ্বসৃষ্টির মূলে যে ভগবান রহিযাছেন তাঁহাব অর্চনারূপে যদি সে ঐ কর্ম করিতে পাবে, যে বিশ্বেশ্বর হইতে জীবগণেব সকল কর্মপ্রচেষ্টা উৎপন্ন হয় তাঁহাকেই যদি ঐকান্তিকভাবে ঐ কর্ম নিবেদন কবিতে পাবে, কেবল তাহা *হইলেই সে সিদ্ধিলাভ করে।* যে প্রচেষ্টা, যে ক্রিয়া ও কর্মই হউক না কেন, সবই এইরূপ কর্মার্পণের দ্বাবা উৎসর্গীকৃত কবা যায়, তাহাব দ্বাবা সমস্ত জীবন আমাদের ভিতরে ও বাহিবে যে ভগবান রহিযাছেন তাঁহাব উদ্দেশে আত্মনিবেদনে পবিণত হইতে পারে এবং তাহাই অধ্যাত্মসিদ্ধিলাভের উপাযে পবিণত হয। কিন্তু যে কর্ম কোন ব্যক্তির নিজ স্বভাবেব অনুযায়ী নহে, যদিও তাহা উত্তমরূপে

[১] ব্রাহ্মণক্ষত্রিযবিশাং শূদ্রাণাঞ্চ পবন্তপ।
কর্ম্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈঃ॥
শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিবার্জ্জবমেব চ।
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম্ম স্বভাবজম্॥
শৌর্য্যং তেজো ধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলাযনম্।
দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষাত্রং কর্ম্ম স্বভাবজম্॥১৮।৪১-৪৩

[২] কৃষিগৌরক্ষ্যবাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম্ম স্বভাবজম্।
পবিচর্য্যাত্মকং কর্ম্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজম্॥১৮।৪৪

[৩] স্বে স্বে কর্ম্মণ্যভিবতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নবঃ।
স্বকর্ম্মনিবতঃ সিদ্ধিং যথা বিন্দতি তচ্ছৃণু॥
যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্ব্বমিদং ততম্।
স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ॥১৮।৪৫-৪৬

অনুষ্ঠিত হয, কোন বাহ্যিক ও কৃত্রিম নীতি অনুসাবে বিচার করিলে যদিও তাহা উৎকৃষ্টতব বলিযা প্রতীত হয অথবা জীবনে অধিকতর সাফল্য আনিযা দেয়, তাহা হইলেও তাহা আভ্যন্তবীণ বিকাশেব পক্ষে নিকৃষ্টতর[১] ঠিক এই কাবণেই যে তাহাব প্রবোচনা বাহ্যিক, তাহাব প্রেরণা যন্ত্রবৎ। নিজেব স্বভাব অনুযায়ী কর্মই শ্রেয, *যদিও অন্য কোন দিক দিযা দেখিলে সেইটি দোষযুক্ত বলিয়া মনে হইতে* পাবে। মানুষ যখন সত্য অভিসন্ধি লইয়া এবং নিজেব প্রকৃতির ধর্ম অনুসবণ কবিযা কর্ম কবে তখন সে কোনরূপ পাপ বা মালিন্যের ভাগী হয না। গুণত্রয়েব ক্ষেত্রে সকল ক্রিযাই ত্রুটিযুক্ত, সকল মানবীয কর্মই দোষ, চ্যুতি ও অপূর্ণতাব অধীন, কিন্তু সেজন্য আমাদেব নিজ নিজ কর্ম এবং স্বাভাবিক কর্তব্য পরিত্যাগ কবা উচিত হয না।[২] কর্ম হওয়া চাই সুনিযন্ত্রিত, নিয়তং কর্ম্ম, কিন্তু তাহা হওয়া চাই মানুষেব স্বরূপত নিজস্ব, ভিতব হইতেই বিবর্তিত, তাহার সত্তার সত্যের সহিত সুসমঞ্জস, স্বভাবেব দ্বাবা নিয়ন্ত্রিত, স্বভাবনিযতং কর্ম্ম।

গীতাব সঠিক তাৎপর্যটি এখানে কি? ইহাব যে বাহ্যিক অর্থ সেইটিকেই প্রথমে ধবা যাউক, গীতা যে নীতিটি বিবৃত করিযাছে ভাবতীয জাতি ও সেই যুগেব ধ্যানধাবণার দ্বাবা ইহা কিরূপ অনুরঞ্জিত হইয়াছিল, প্রাচীন সংস্কৃতিতে ইহাব কি অর্থ ছিল প্রথমে সেইটিই বিবেচনা কবা যাউক। এই শ্লোকগুলি এবং এই বিষযে গীতা পূর্বে যাহা বলিযাছে, জাতিভেদ সম্বন্ধে বর্তমান বাক্‌বিতণ্ডায তাহা প্রমাণস্বরূপ উদ্ধৃত হইতেছে, কেহ কেহ ইহাব ব্যাখ্যা কবিয়া প্রচলিত প্রথাব সমর্থন কবিতেছে আবাব কেহ কেহ জাতিভেদেব বংশানুক্রমিকতা অপ্রমাণ কবিতেই ইহাব সাহায্য লইতেছে। বস্তুত গীতাব শ্লোকগুলি প্রচলিত জাতিভেদ সম্বন্ধে প্রযোজ্য নহে, কারণ ইহা প্রাচীন সামাজিক চাতুর্বর্ণ্যেব আদর্শ আর্য সমাজেব চাবিটি সুনির্দিষ্ট শ্রেণীবিভাগ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন জিনিস এবং গীতার বর্ণনাব সহিত ইহাব কোন মিলই নাই। কৃষি, গোবক্ষা এবং সকলপ্রকার বাণিজ্যকে এখানে বৈশ্যেব কর্ম বলা হইয়াছে; কিন্তু পববর্তী জাতিভেদ প্রথায যাহাবা কৃষি এবং গোরক্ষায ব্যাপৃত, শিল্পী, ক্ষুদ্র কারিগব এবং অন্যান্য অনেকেই বস্তুত শূদ্রশ্রেণীভুক্ত হইযাছে, কোথাও বা তাহাবা সমাজের গণ্ডির বাহিবে পঞ্চম শ্রেণীতেই পড়িযাছে, আব কযেকটি ক্ষেত্র ব্যতীত কেবল বণিক শ্রেণীই বৈশ্য বলিযা পবিগণিত হইযাছে, তাহাও সর্বত্র নহে। কৃষি, রাজকার্য, চাকুবী, এইসব বৃত্তি ব্রাহ্মণ হইতে শূদ্র পর্যন্ত সকল শ্রেণীর লোকই অবলম্বন করিতেছে। এইভাবে অর্থনীতিক কর্মবিভাগ এমন গোলমাল হইয়া গিয়াছে যে তাহাব আব সংশোধনেব কোন সম্ভাবনাই নাই, আব গুণানুসাবে কর্মের নীতির স্থান তো

[১] শ্রেযান স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পবধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বভাবনিযতং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্॥১৮।৪৭
সহজং কর্ম্ম কৌন্তেয সদোষমপি ন ত্যজেৎ।
সর্ব্বাবম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিবিবাবৃতাঃ॥১৮।৪৮

জাতিভেদ প্রথায় আরও কম। এখানে আছে শুধু আচারের দৃঢ় বন্ধন, ব্যষ্টিগত প্রকৃতির প্রয়োজনের কোন হিসাবই লওয়া হয় না। আর জাতিভেদ প্রথার সমর্থকগণ ধর্মের দিক হইতে যে তর্ক উত্থাপন করেন তাহা বিবেচনা করিলেও আমরা নিশ্চয়ই গীতার কথাগুলির উপর এমন অদ্ভুত অর্থ আরোপ করিতে পারি না যে, মানুষ তাহার ব্যক্তিগত প্রবৃত্তি ও সামর্থ্যের কোন হিসাব না লইয়াই তাহার পিতামাতার বা নিকট বা দূর পূর্বপুরুষগণের বৃত্তি অনুসরণ করিবে, গোয়ালার ছেলে গোয়ালা হইবে, ডাক্তারের ছেলে ডাক্তার হইবে, মুচির বংশধরগণ আবহমান কাল পর্যন্ত বরাবর জুতাই তৈয়ারী করিবে—এইটিই হইতেছে তাহার স্বধর্ম, আর নিজের ব্যক্তিগত প্রেরণা বা গুণাগুণের হিসাব না লইয়া এইরূপ নির্বোধ ও গতানুগতিকভাবে পরধর্মের পুনরাবৃত্তি করিলে আপনা হইতেই সে বিকাশের পথে অগ্রসর হইবে এবং অধ্যাত্ম মুক্তিলাভ করিবে—গীতার শিক্ষার এরূপ ব্যাখ্যা করা তো আরও অসমীচীন। প্রাচীন চাতুর্বর্ণ্য প্রথা আদর্শ বিশুদ্ধ অবস্থায় যেমনটি ছিল অথবা ছিল বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয় (কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, ইহা কখনই একটা আদর্শ ভিন্ন আর কিছুই ছিল না অথবা ইহা ছিল একটা সাধারণ নিয়ম, বাস্তবজীবনে লোকে অল্পাধিক শৈথিল্যের সহিতই ইহার অনুসরণ করিত) সেইটিই হইতেছে এখানে গীতার কথাগুলির প্রকৃত লক্ষ্য এবং কেবল সেই প্রথার সম্বন্ধেই গীতার কথাগুলি বিবেচনা করিতে হইবে। আবার এখানেও বাহ্যিক অর্থটি যে ঠিক কি ছিল তাহা নির্ণয় করা খুবই কঠিন।

প্রাচীন চাতুর্বর্ণ্য প্রথার তিনটি দিক ছিল, সামাজিক ও অর্থনৈতিক, সংস্কৃতিগত এবং আধ্যাত্মিক। অর্থনীতির দিক দিয়া ইহা সমষ্টিজীবনে সামাজিক মানুষের চারিপ্রকার কর্ম ঠিক করিয়াছিল, ধর্মসম্বন্ধীয় ও বুদ্ধিবিষয়ক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং পরিচর্যাত্মক কর্ম। অতএব কর্ম চারি প্রকারের—পৌরোহিত্য, সাহিত্য, শিক্ষা ও জ্ঞানচর্চার কর্ম, রাজ্যশাসন, রাজনীতি, রাষ্ট্রপরিচালন ও যুদ্ধের কর্ম, উৎপাদন, অর্থোপার্জন এবং বাণিজ্যের কর্ম, মজুর ও পরিচারকের কর্ম। চারিটি সুনির্দিষ্ট শ্রেণীর মধ্যে এই চারি প্রকার কর্ম বিভাগ করিয়া দেওয়ার উপর সমগ্র সমাজব্যবস্থা সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা হইয়াছিল। এই প্রথা শুধু যে ভারতেরই বৈশিষ্ট্য ছিল তাহা নহে সামাজিক ক্রমবিবর্তনের একটা বিশেষ অবস্থায় কিছু বৈষম্যের সহিত এই প্রথা অন্যান্য প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় সমাজেরও প্রধান লক্ষণ ছিল। এখনও সাধারণত সকল সমাজের জীবনেই এই চারি প্রকার কর্ম অন্তর্নিহিত রহিয়াছে, কিন্তু সুস্পষ্ট শ্রেণীবিভাগ আর কোথাও নাই। প্রাচীন প্রথাটি সর্বত্রই ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল এবং তাহার পরিবর্তে আসিয়াছিল একটা অধিকতর শিথিল ব্যবস্থা, অথবা যেমন ভারতে হইয়াছে একটা বিশৃঙ্খল ও জটিল সামাজিক আড়ষ্টতা ও অর্থনৈতিক অচলতার উদ্ভব এবং তাহা শেষ পর্যন্ত জাতিভেদের বিষম গোলমালে পর্যবসিত হইয়াছে। এই অর্থনৈতিক কর্মবিভাগের সঙ্গে সঙ্গে ছিল একটা কৃষ্টিগত আদর্শ, তাহা প্রত্যেক শ্রেণীর জন্য তাহার ধর্মবিষয়ক আচার,

তাহার মর্যাদার ধারা, নৈতিক বিধিবিধান, উপযোগী শিক্ষা ও অনুশীলন, বিশিষ্ট চরিত্র, বংশগত আদর্শ ও সাধনা নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিল। বাস্তবজীবনের সত্য সকল সময়েই যে পরিকল্পনাটির অনুরূপ ছিল তাহা নহে (মানসিক আদর্শ এবং প্রাণ ও দেহের ক্ষেত্রে ব্যবহার, এই দুয়ের মধ্যে সকল সময়েই কতকটা ব্যবধান থাকে), কিন্তু যতদূর সম্ভব আদর্শের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার একটা অবিশ্রান্ত ও অদম্য প্রয়াস চলিয়াছিল। এই প্রয়াসের এবং অতীতে সামাজিক মানুষের শিক্ষা ও সাধনায় ইহা যে কৃষ্টিগত আদর্শ ও পরিবেষ্টন সৃষ্টি করিয়াছিল তাহার গুরুত্ব খুবই বেশী ছিল; কিন্তু অতীতের সমাজ-বিবর্তনের ইতিহাসে ইহার যে মূল্য আছে তাহা ছাড়া আজিকার দিনে ইহার আর কোন সার্থকতাই নাই। শেষত, যেখানেই এই প্রথা প্রচলিত ছিল সেখানেই ইহা ধর্মভাবের দ্বারা অল্পাধিক সমর্থিত হইয়াছিল (প্রাচ্যদেশে অধিক, ইউরোপে খুবই অল্প) এবং ভারতে ইহাকে এক গভীরতর আধ্যাত্মিক উপযোগিতা ও অর্থ দেওয়া হইয়াছিল। এই আধ্যাত্মিক অর্থটিই হইতেছে গীতার শিক্ষার যথার্থ মর্মকথা।

গীতা যখন রচিত হয় তখনই এই প্রথাটি প্রচলিত ছিল এবং ইহার আদর্শটি ভারতীয় মনকে অধিকার করিয়াছিল; গীতা এই আদর্শ এবং ইহার আধ্যাত্মিক ভিত্তি দুইটিই স্বীকার করিয়া লইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, "গুণ ও কর্মের বিভাগ অনুসারে চারি বর্ণ আমার দ্বারাই সৃষ্ট হইয়াছে।" (৪।১৩) কেবল এই উক্তিটির উপর নির্ভর করিয়াই বলিতে পারা যায় না যে, গীতা এই প্রথাটিকে শাশ্বত ও সার্বজনীন সামাজিক ব্যবস্থা বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছে। অন্যান্য প্রাচীন প্রামাণিক গ্রন্থ এইরূপ স্বীকার করে নাই; বরং তাহারা স্পষ্টই বলিয়াছে যে, আদিতে ইহা ছিল না এবং যুগবিবর্তনে পরবর্তীকালেও ইহা থাকিবে না। তথাপি এই উক্তিটি হইতে এমন বুঝা যাইতে পারে যে সামাজিক মানুষের যে চতুর্বিধ কর্মবিভাগ ইহা সাধারণত প্রত্যেক সমাজেরই মানসিক ও অর্থনৈতিক প্রয়োজনের অন্তর্নিহিত, অতএব যে বিশ্বপুরুষ সমষ্টিগত ও ব্যষ্টিগত মানবজীবনে নিজেকে অভিব্যক্ত করিতেছেন এইটি তাঁহারই একটি দিব্য বিধান। বস্তুত গীতার এই পদটি হইতেছে সাধারণ বুদ্ধির ভাষায় বেদের পুরুষসূক্তের বিখ্যাত রূপকটিরই[১] বিবৃতি। কিন্তু তাহা হইলে এইসকল কর্মবিভাগের স্বাভাবিক ভিত্তি এবং ব্যবহারিক রূপ কি হইবে? প্রাচীনকালে বংশানুক্রমিক নীতিটিই কার্যত ভিত্তি হইয়া পড়িয়াছিল। প্রথম প্রথম মানুষের সামাজিক কর্ম ও পদমর্যাদা যে পারিপার্শ্বিক অবস্থা, সুযোগ, জন্ম ও সামর্থ্যের দ্বারাই নির্ধারিত হইত সে বিষয়ে সন্দেহ নাই; এখনও মুক্ততর এবং অপেক্ষাকৃত শিথিলবদ্ধ সমাজে এইরূপই হইয়া থাকে; কিন্তু সামাজিক স্তরবিভাগ যেমন বেশী বেশী বাঁধাধরা হইয়া পড়িল, মানুষের পদমর্যাদাও কার্যত

১ ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্ বাহূ রাজন্যকঃ কৃতঃ।
উরূ তদস্য যদ্ বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রোঽজায়ত॥

জন্মের দ্বারাই প্রধানত কিংবা কেবল তাহাবই দ্বাবা নির্ধাবিত হইল এবং পববর্তী জাতিভেদ প্রথায জন্মই পদমর্যাদার একমাত্র বিধি হইয়া দাঁড়াইল। ব্রাহ্মণেব ছেলে পদমর্যাদায় সকল সময়েই ব্রাহ্মণ, যদিও ব্রাহ্মণোচিত গুণ ও চবিত্রেব কিছুই তাহার মধ্যে না থাকে, বুদ্ধিগত শিক্ষা বা অধ্যাত্ম অভিজ্ঞতা বা ধর্মসম্বন্ধীয যোগ্যতা বা জ্ঞান না থাকে, তাহার আপন শ্রেণীব যথার্থ কর্মেব সহিত কোন সম্বন্ধই না থাকে, তাহার কর্মে বা তাহাব প্রকৃতিতে ব্রাহ্মণত্বেব কিছুই থাকে না।

এইরূপ পবিণতি অবশ্যম্ভাবী ছিল, কাবণ কেবল বাহ্যিক লক্ষণগুলিই সহজে এবং সুবিধামত নির্ণয় কবা সম্ভব এবং ক্রমশ বেশী বেশী যন্ত্রভাবাপন্ন জটিল ও গতানুগতিক সমাজব্যবস্থায় জন্মই ছিল সর্বাপেক্ষা সহজ ও সুবিধাজনক লক্ষণ। কল্পিত বংশানুক্রমিক গুণেব সহিত মানুষেব প্রকৃত সহজাত চবিত্র ও সামর্থ্যেব যে পার্থক্য হওযা সম্ভব তাহা শিক্ষা ও অনুশীলনেব দ্বাবা পূরণ কবিবাব বা যথাসম্ভব কম করিবার চেষ্টা কিছুকাল হইযাছিল, কিন্তু কালক্রমে এই প্রযাস বন্ধ হইযা যায এবং বংশানুক্রমিক প্রথাই অনতিক্রমণীয় বিধান হইয়া পড়ে। প্রাচীন স্মৃতিশাস্ত্রকাবগণ বংশানুক্রমিক প্রথা স্বীকাব কবিলেও বিশেষ জোব দিযা বলিয়াছেন যে, গুণ, চবিত্র এবং সামর্থ্যই হইতেছে একমাত্র সুদৃঢ় ও যথার্থ ভিত্তি, এইগুলি না থাকিলে বংশগত সামাজিক পদমর্যাদা আধ্যাত্মিক মিথ্যা হইযা দাঁড়ায কারণ তাহার প্রকৃত সার্থকতা নষ্ট হইযা যায। গীতাও যেমন সর্বত্র তেমনিই এখানে আভ্যন্তবীণ সত্যটিব উপবেই তাহাব শিক্ষা প্রতিষ্ঠিত করিযাছে। গীতা একটি শ্লোকে মানুষের জন্মের সহিত জাত কর্মেব কথা বলিযাছে বটে, সহজম্ কর্ম্ম, কিন্তু কেবল ইহা হইতেই বংশানুক্রমিক ভিত্তি বুঝায না। পুনর্জন্ম সম্বন্ধে ভাবতীয তত্ত্বটিই গীতা গ্রহণ কবিয়াছে এবং তদনুসাবে মানুষেব সহজাত প্রকৃতি এবং জীবনেব ধারা মূলত তাহার অতীত জন্মসকলেব দ্বাবা নির্ধাবিত হয, এসব হইতেছে তাহার অতীতেব কর্ম এবং মানসিক ও আধ্যাত্মিক বিবর্তনেব দ্বাবা ইতিপূর্বেই সম্পাদিত আত্মবিকাশ, এসব কেবল তাহাব বংশ, পিতামাতা, শাবীবিক জন্মরূপ স্থূল ব্যাপাবেব উপর নির্ভব কবে না, এইগুলি কেবল একটা পবিচাযক লক্ষণমাত্র হইতে পারে, কিন্তু মুখ্য শক্তি নহে। 'সহজ' শব্দটিব অর্থ যাহা আমাদেব সহিত জন্মিয়াছে, যাহাকিছু স্বাভাবিক, সহজাত, অন্তর্নিহিত, গীতা অন্য সকল স্থানে ইহার পবিবর্তে "স্বভাবজ" শব্দটি ব্যবহাব কবিযাছে। মানুষেব কর্ম বা বৃত্তি তাহার গুণেব দ্বারাই নির্ধাবিত; ইহা হইতেছে তাহাব স্বভাব হইতে জাত কর্ম, স্বভাবজম্ কর্ম্ম, এবং তাহাব স্বভাবের দ্বাবাই নিযন্ত্রিত, স্বভাবনিযতং কর্ম্ম। কর্ম ও বৃত্তির ভিতর দিয়া যে আভ্যন্তবীণ গুণ ও ধর্ম প্রকট হইতেছে তাহাব উপব জোব দেওয়াই হইতেছে গীতাব কর্মবাদেব সমগ্র তত্ত্ব।

আর গীতা স্বধর্মেব অনুসবণের যে আধ্যাত্মিক সার্থকতা ও শক্তি দেখাইযাছে, বাহ্যিক রূপটির উপর জোব না দিযা আভ্যন্তবীণ সত্যেব উপব এই জোব দেওযা হইতেই তাহার উৎপত্তি। এইটিই হইতেছে গীতাব এই অংশটিব বাস্তবিক

প্রযোজনীয মর্মকথা। বাহ্যিক সামাজিক ব্যবস্থাব সহিত ইহার সম্বন্ধের উপর সাধাবণত অত্যধিক ঝোঁক দেওয়া হইয়াছে, যেন ঐ বাহ্যিক ব্যবস্থাটিকে তাহার উৎকর্ষেব জন্যই সমর্থন কবা কিংবা দার্শনিক ধর্মতত্ত্বেব দ্বারা উহার ন্যায্যতা প্রতিপাদন কবাই ছিল গীতাব লক্ষ্য। বস্তুত বাহ্যিক ব্যবস্থাটিব উপর গীতা খুবই কম ঝোঁক দিযাছে, পবন্তু বর্ণব্যবস্থা যে আভ্যন্তরীণ নীতিকে বাহ্যিক ব্যবহারে সুনিযন্ত্রিত রূপ দিতে চেষ্টা কবিযাছিল গীতা তাহারই উপব খুব বেশী ঝোঁক দিযাছে। আব ব্যষ্টিগত ও আধ্যাত্মিক জীবনে এই নীতিটিব যে উপযোগিতা এখানে সেইটিবই উপবে বহিযাছে গীতাব দৃষ্টি, সমষ্টিগত ও অর্থনৈতিক জীবনে অথবা অন্য কোন সামাজিক ও কৃষ্টিগত প্রযোজনে ইহাব যে উপযোগিতা আছে তাহাব উপবে নহে। গীতা বৈদিক যজ্ঞেব পরিকল্পনাটি গ্রহণ কবিযাছে, কিন্তু ইহাকে গভীবভাবে রূপান্তবিত কবিয়াছে, ইহাব এমন এক আভ্যন্তবীণ অন্তর্মুখী ও সার্বজনীন অর্থ, এমন একটা আধ্যাত্মিক অভিপ্রায় ও লক্ষ্য দিয়াছে যাহাতে ইহার সমস্ত মূল্যেব পবিবর্তন হইযা গিযাছে। এখানেও ঠিক ঐভাবে গীতা মানুষের চাবি বর্ণবিভাগকে গ্রহণ কবিযাছে, তবে ইহাকে গভীরভাবে রূপান্তবিত করিয়াছে, ইহাব এক আভ্যন্তবীণ, অন্তর্মুখী ও সার্বজনীন অর্থ, একটা আধ্যাত্মিক অভিপ্রায ও লক্ষ্য প্রদান কবিয়াছে। আব সঙ্গে সঙ্গেই এই পবিকল্পনার অন্তর্নিহিত ভাবটির মূল্য অনুরূপ হইযাছে এবং তাহা এক স্থাযী ও জীবন্ত সত্য হইয়া উঠিয়াছে, তাহা আব কোন বিশেষ অস্থাযী সামাজিক প্রতিষ্ঠান বা ব্যবস্থার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নহে। যে আর্য-সমাজব্যবস্থা এখন লুপ্ত হইয়া গিয়াছে অথবা মুমূর্ষু অবস্থায় বহিয়াছে তাহাব বৈধতা প্রতিপাদন কবাই গীতার লক্ষ্য নহে—যদি শুধু তাহাই হইত তাহা হইলে গীতাব স্বভাব ও স্বধর্মেব নীতিতে কোন চিবন্তন সত্য বা মূল্য থাকিত না—গীতাব লক্ষ্য হইতেছে মানুষের বাহিবেব জীবনের সহিত তাহাব অন্তর্জীবনেব সম্বন্ধ, তাহাব অন্তবাত্মা হইতে, তাহার প্রকৃতির আভ্যন্তরীণ ধারা হইতে তাহাব কর্মেব বিবর্তন।

আব আমবা বস্তুত দেখি যে, গীতা নিজেই তাহার উদ্দেশ্যটি খুবই স্পষ্ট কবিযাছে, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়েব কর্ম বাহ্যিক বৃত্তির দিক দিয়া বর্ণনা না কবিয়া, অর্থাৎ শিক্ষা, পৌবোহিত্য এবং শাস্ত্রচর্চা বা শাসনকার্য, যুদ্ধ এবং রাজনীতি এইরূপ নির্দেশ না কবিযা সম্পূর্ণভাবে আভ্যন্তরীণ প্রকৃতিব দিক দিযাই বর্ণনা কবিযাছে। এখানে গীতাব ভাষাটি আমাদেব কাছে কেমন একটু বিচিত্রই লাগে। শান্তি, আত্মসংযম, তপস্যা, শুচিতা, ক্ষমাশীলতা, সবলতা, জ্ঞান, অধ্যাত্মসত্য গ্রহণ ও অনুশীলন—সাধাবণত এইগুলি মানুষেব বৃত্তি, কর্ম বা পেশা বলিয়া কথিত হয না। অথচ গীতা ঠিক এইটিই বুঝিয়াছে এবং বলিযাছে—বলিয়াছে যে, এই সব জিনিস, ইহাদেব বিকাশ, ব্যবহাবেব ভিতব দিয়া ইহাদেব অভিব্যক্তি, সাত্ত্বিক প্রকৃতিব ধর্মকে রূপ দিবাব পক্ষে ইহাদেব ক্ষমতা—এই সবই হইতেছে ব্রাহ্মণেব প্রকৃত কর্ম, শিক্ষা, পৌরোহিত্য এবং অন্যান্য বাহ্যিক কর্মগুলি হইতেছে

কেবল ইহার সর্বাপেক্ষা উপযোগী ক্ষেত্র, এই আভ্যন্তরীণ বিকাশের অনুকূল উপায়স্বরূপ, ইহার যথাযথ আত্ম-অভিব্যক্তি, সুনির্দিষ্ট বর্ণগত আদর্শে এবং বাহ্যিক চরিত্রের সুদৃঢ়তায় ইহার স্থায়ী রূপলাভের পন্থাস্বরূপ। যুদ্ধ, রাজধর্ম, রাষ্ট্রনীতি, নেতৃত্ব ও শাসন হইতেছে ক্ষত্রিয়ের পক্ষে অনুরূপ ক্ষেত্র এবং উপায়; কিন্তু তাহার প্রকৃত কর্ম হইতেছে সক্রিয় যুযুধান রাজোচিত বা বীরোচিত প্রকৃতির ধর্মকে বিকাশ করা, ব্যবহারে অভিব্যক্ত করা, বাহ্য রূপে এবং গতির ওজস্বান ছন্দে প্রকট করা। বৈশ্য এবং শূদ্রের কর্ম বাহ্যবৃত্তির দিক দিয়াই বর্ণিত হইয়াছে, আর এই যে বৈপরীত্য ইহারও কিছু অর্থ থাকিতে পারে। কারণ যে প্রকৃতি উৎপাদন ও উপার্জনের দিকে চলে কিংবা শ্রম ও পরিচর্যার গণ্ডির মধ্যেই আবদ্ধ থাকে, বণিকের ও দাসের মনোবৃত্তি—ইহারা সাধারণত হয় বহির্মুখী, কর্মের চরিত্রগঠন করিবার ক্ষমতা অপেক্ষা ইহার বাহ্যিক মূল্য লইয়াই অধিক ব্যাপৃত থাকে; আর প্রকৃতির সাত্ত্বিক ও আধ্যাত্মিক ক্রিয়ার পক্ষে এই প্রবৃত্তি তেমন অনুকূল নহে। আর এই কারণেই ব্যবসা ও যন্ত্রশিল্পের যুগ অথবা কর্ম ও উৎপাদনের চিন্তায় ব্যাপৃত সমাজ নিজের চারিদিকে এমন একটা আবেষ্টনের সৃষ্টি করে যাহা অধ্যাত্ম জীবন অপেক্ষা ঐহিক জীবনেরই অনুকূল, ঊর্ধ্বগামী মন ও আত্মার সূক্ষ্মতর সিদ্ধি অপেক্ষা স্থূল জীবনে দক্ষতার পক্ষেই অধিকতর উপযোগী। তথাপি এই ধরনের প্রকৃতি এবং ইহার কর্মেরও আভ্যন্তরীণ অর্থ আছে এবং তাহাদিগকেও সিদ্ধিলাভের উপায় ও শক্তিতে পরিণত করিতে পারা যায়। অন্যত্র যেরূপ বলা হইয়াছে, আধ্যাত্মিকতা, নৈতিক পবিত্রতা ও জ্ঞানের আদর্শ লইয়া ব্রাহ্মণ এবং মহানুভবতা, শৌর্য ও মহৎ চরিত্রশক্তির আদর্শ লইয়া ক্ষত্রিয়, শুধু ইহারাই নহে পরন্তু ধনোপার্জনে ব্রতী বৈশ্য, শ্রমপাশে বদ্ধ শূদ্র, সঙ্কীর্ণ গণ্ডিবদ্ধ ও পরাধীন জীবন লইয়া নারী, এমনকি পাপযোনিসম্ভূত চণ্ডাল, ইহারাও এই পথ ধরিয়া অচিরাৎ উচ্চতম আভ্যন্তরীণ মহত্ত্ব ও অধ্যাত্ম স্বাধীনতার দিকে, সিদ্ধির দিকে, মানুষের মধ্যে যে দিব্য সত্তা রহিয়াছে তাহার মুক্তি ও পূর্ণ বিকাশের দিকে অগ্রসর হইতে পারে।

তিনটি কথা প্রথমেই মনে উঠে, গীতা এই স্থলে যাহা বলিয়াছে সেই সবের মধ্যেই ঐ তিনটি নিহিত রহিয়াছে। প্রথমত, সকল কর্মই ভিতর হইতে নির্ধারিত হওয়া চাই কারণ প্রত্যেক মনুষ্যের মধ্যেই তাহার নিজস্ব কিছু রহিয়াছে, তাহার প্রকৃতির একটা বিশিষ্ট ধর্ম ও সহজাত শক্তি রহিয়াছে। সেইটিই হইতেছে তাহার আত্মার সিদ্ধিপ্রদ শক্তি, সেইটিই প্রকৃতিতে তাহার অন্তঃপুরুষকে ক্রিয়াত্মক রূপ সৃষ্টি করিয়া দেয় এবং কার্যের ভিতর দিয়া সেইটিকে বিকশিত ও সিদ্ধ করিয়া তোলা, সামর্থ্যে ও ব্যবহারে ও জীবনে সেইটিকে কার্যকরী করিয়া তোলাই হইতেছে তাহার প্রকৃত কর্ম; সেইটিই তাহাকে তাহার আভ্যন্তরীণ ও বাহ্য জীবনের সত্য ধারাটি নির্দেশ করিয়া দেয়, সেইটিকে ধরিয়াই তাহার উচ্চতর বিকাশের সূচনা হয়। দ্বিতীয়ত, মোটামুটি চারি শ্রেণীর প্রকৃতি আছে, প্রত্যেক

শ্রেণীরই আছে বিশিষ্ট কর্মধারা এবং কর্ম ও চরিত্রের আদর্শ বিধি, শ্রেণীই মানুষের উপযোগী ক্ষেত্র নির্দেশ করিয়া দেয়, এবং তাহার বাহ্য সামাজিক জীবনে তাহার কর্মের যথাযথ সীমারেখা তাহার শ্রেণী অনুসারেই নির্ধারিত হওয়া উচিত। শেষত, মানুষ যেকোন কর্মই করুক না কেন, যদি তাহা তাহার সত্তার ধর্ম অনুযায়ী, তাহার প্রকৃতির সত্য অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হয়, সেইটিকেই ভগবদ্‌মুখী করা যায়, অধ্যাত্মমুক্তি ও সংসিদ্ধিলাভের সাফল্যপ্রদ উপায়ে পরিণত করা যায়। এই তিনটি মন্তব্যের মধ্যে প্রথম ও তৃতীয়টি যে সত্য ও ন্যায়সঙ্গত তাহা সুস্পষ্ট। মানুষের ব্যষ্টিগত ও সামাজিক জীবনের যে সাধারণ ধারা তাহা এই সকল নীতির বিরোধী বলিয়াই মনে হয়, কারণ আমাদিগকে যে বাহ্য প্রয়োজন, বিধান ও আইনের ভীষণ বোঝা বহন করিতে হয় সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই, আর আমাদের আত্মপ্রকাশের যে প্রয়োজন, আমাদের সত্য ব্যক্তিত্ব, আমাদের সত্য আত্মা, আমাদের অন্তরতম স্বভাবগত জীবনধারার বিকাশের যে প্রয়োজন তাহা পারিপার্শ্বিক অবস্থাসমূহের দ্বারা প্রতি পদে বাধাপ্রাপ্ত হয়, ব্যাহত হয়, আপন গতিপথ হইতে চ্যুত হইতে বাধ্য হয়, যৎসামান্যই সুযোগ বা ক্ষেত্র লাভ করে। জীবন, রাষ্ট্র, সমাজ, পরিবার, সমস্ত পারিপার্শ্বিক শক্তি যেন ষড়যন্ত্র করিয়াছে আমাদের আত্মার উপর তাহাদের শৃঙ্খল পরাইয়া দিতে, আমাদিগকে বলপূর্বক তাহাদের ছাঁচে গড়িয়া তুলিতে, তাহাদের গতানুগতিক স্বার্থ এবং স্থূল সাময়িক সুবিধার বাহন করিতে। আমরা একটা যন্ত্রের অংশ হইয়া পড়ি, আমরা যে মনুষ্য, পুরুষ, আত্মা, মন, আমরা যে অমৃতের পুত্র, আমাদের সত্তার বিশিষ্ট সিদ্ধির পূর্ণতম বিকাশ করিতে এবং ইহাকে সমস্ত জাতির সেবায় নিয়োগ করিতে সমর্থ, আমরা আর প্রকৃতপক্ষে তাহা থাকি না, আমাদিগকে থাকিতে দেওয়া হয় না। মনে হয় যেন আমরা নিজদিগকে গড়িয়া তুলি না, আমাদিগকে গড়িয়া দেওয়া হয়। অথচ যতই আমরা জ্ঞানে অগ্রসর হইব ততই গীতার সূত্রটির সত্যতা প্রকট হইতে বাধ্য। শিশুর শিক্ষা এমন হওয়া চাই যেন তাহার প্রকৃতির মধ্যে সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট সর্বাপেক্ষা শক্তিমান, সর্বাপেক্ষা নিগূঢ় ও প্রাণময় যাহা কিছু আছে তাহা প্রকট হইতে পারে, মানুষের কর্ম ও বিকাশধারা যে ছাঁচে গঠিত হইবে তাহা যেন হয় তাহার সহজাত গুণ ও শক্তিরই ছাঁচ। তাহাকে নূতন জিনিস অর্জন করিতেই হইবে, কিন্তু তাহার নিজস্ব বিকশিত স্বরূপ ও সহজাত শক্তির ভিত্তিতেই উৎকৃষ্টভাবে, জীবন্তভাবে সেসব জিনিস সে অর্জন করিতে পারিবে। আর সেইভাবেই মানুষের কর্মও তাহার স্বভাবের গতি ও শক্তির দ্বারাই নির্ণীত হওয়া উচিত। যে ব্যক্তি এইরূপ স্বাধীনভাবে বিকাশলাভ করিতে পাইবে সেই জীবন্ত "পুরুষ" ও "মনুষ্য" হইয়া উঠিবে এবং জাতির সেবার জন্য অনেক বেশী শক্তিশালী হইবে। আর এখন আমরা আরও স্পষ্টভাবে দেখিতে পাইতেছি যে, এই নীতি কেবল ব্যষ্টি বা ব্যক্তির পক্ষেই নহে পরন্তু সমাজ ও জাতির পক্ষে, সমষ্টিগত আত্মা, সমষ্টিগত মানবের পক্ষেও সত্য। চারি শ্রেণী এবং তাহাদের

কর্মধাবা সম্বন্ধে দ্বিতীয় মন্তব্যটি আবও বেশী তর্কেব বিষয। বলা যাইতে পাবে যে, ইহা অতিমাত্রায সবল ও নিঃসন্দিগ্ধ, জীবনেব বহুমুখীনতা এবং মানবপ্রকৃতিব নমনীয়তার যথেষ্ট হিসাব ইহাতে লওয়া হয নাই, আব ইহাব তত্ত্ব বা অন্তর্নিহিত উৎকর্ষ যাহাই হউক না কেন, বাহ্যিক সমাজব্যবস্থায ইহা স্বধর্মেব সমুদয নীতিবই যাহা বিরোধী ঠিক সেই গতানুগতিক আচাবেব অত্যাচাবে পবিণত হইবে। কিন্তু বাহিবে যতটুকু দেখা যায তাহাব অন্তবালে ইহাব এমন একটা গভীবতব অর্থ রহিযাছে যাহাতে ইহার উপযোগিতা আব ততটা সন্দেহেব বিষয থাকে না। আব যদি আমবা এইটি বর্জন করি, তৃতীয মন্তব্যটিব সাধাবণ সার্থকতা অক্ষুণ্ণই থাকিযা যায। জীবনে মানুষের কর্ম ও বৃত্তি যাহাই হউক না কেন, যদি তাহা ভিতব হইতে নির্ধাবিত হয অথবা যদি সেইটিকে সে তাহাব প্রকৃতিব আত্ম-অভিব্যক্তি কবিতে পায়, তাহা হইলে সেইটিকে সে বিকাশ ও মহত্তব আভ্যন্তবীণ সিদ্ধিব উপাযে পবিণত কবিতে পাবে। আর ইহা যাহাই হউক না কেন, যদি সে তাহাব স্বাভাবিক কর্ম যথাযথ মনোভাব লইযা সম্পাদন কবে, যদি ইহাকে সে জ্ঞানদীপ্ত মনেব দ্বাবা পরিচালিত কবে, ইহার ক্রিযাকে অন্তবস্থিত ভগবানেব উদ্দেশ্যসাধনে নিযোজিত করে, বিশ্বমাঝে অভিব্যক্ত ব্রহ্মকে ইহাব দ্বাবা সেবা করে, অথবা ইহাকে মানবসমাজের মধ্যে ভগবানেব অভিপ্রাযেব সজ্ঞান যন্ত্রে পবিণত কবে, তাহা হইলে সে ইহাকে উচ্চতম অধ্যাত্ম সিদ্ধি ও মুক্তিব দিকে অগ্রসব হইবাব উপাযে রূপান্তবিত কবিতে পাবে।

কিন্তু যদি আমরা এইটিকে আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ একটি বিচ্ছিন্ন কথা বলিযা না লই (অধিকাংশ ক্ষেত্রে এইরূপই কবা হয) পবন্তু, যেরূপ কবা উচিত, সমস্ত গ্রন্থটিতে বিশেষত শেষ দ্বাদশ অধ্যাযে যাহা বলা হইযাছে তাহাব সহিত মিলাইয়া ইহাকে গ্রহণ করি তাহা হইলে এখানে গীতাব শিক্ষাব আবও গভীবতব অর্থ দেখিতে পাওয়া যায়। জীবন ও কর্ম সম্বন্ধে গীতাব দার্শনিক মত হইতেছে এই যে, সমস্তই ভাগবত সত্তা হইতে, বিশ্বাতীত ও বিশ্বময অধ্যাত্ম সত্তা হইতে আবির্ভূত হইযাছে। সবই হইতেছে ভগবানেব, বাসুদেবেব, প্রচ্ছন্ন অভিব্যক্তি, যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্ব্বমিদং ততম্, আব অন্তবে ও জগতে যে অবিনশ্বব রহিযাছে তাহাকে প্রকট করা, বিশ্বের আত্মাব সহিত ঐক্যে বাস কবা, চৈতন্যে, জ্ঞানে, সঙ্কল্পে, প্রেমে, অধ্যাত্ম আনন্দে উন্নীত হইয়া পবমতম ভগবানেব সহিত একত্ব লাভ কবা, ব্যষ্টিগত ও প্রাকৃত সত্তাকে অপূর্ণতা ও অজ্ঞান হইতে মুক্ত কবিযা এবং ভাগবত শক্তির কর্মসাধনেব সচেতন যন্ত্রে পবিণত কবিযা উচ্চতম অধ্যাত্ম প্রকৃতিব মধ্যে বাস করা—এই সিদ্ধিটিই মানুষেব অধিগম্য এবং অমৃতত্ব ও মুক্তিলাভের জন্য এইটিই হইতেছে প্রযোজনীয বিধান। কিন্তু যতক্ষণ আমবা বস্তুত প্রাকৃত অজ্ঞানে সমাবৃত বহিযাছি, আত্মা অহং-এব কাবাগাবে বন্দী, পারিপার্শ্বিকেব দ্বারা অভিভূত, অবরুদ্ধ, মথিত এবং গঠিত হইতেছে, প্রকৃতিব যন্ত্রবৎ ক্রিযার দ্বারা অবশে চালিত হইতেছে, আমাদেব নিজ নিগূঢ় অধ্যাত্মশক্তিব

সত্তায আমাদেব যে প্রতিষ্ঠা তাহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইযা বহিয়াছে—ততক্ষণ ইহা কেমন কবিযা সম্ভব হইতে পারে? ইহাব উত্তব এই যে, এইসব প্রাকৃত ক্রিয়া এখন সমাচ্ছন্ন ও বিপবীত ক্রিয়া-পবম্পরায যতই পবিবৃত থাকুক না কেন, তথাপি ইহা নিজেব বিকাশশীল মুক্তি ও সিদ্ধিব তত্ত্বটি নিজের মধ্যেই ধবিযা বহিযাছে। প্রত্যেক মানুষেব হৃদয়েব মধ্যেই ভগবান অধিষ্ঠিত বহিয়াছেন এবং তিনিই প্রকৃতির এই আশ্চর্য কর্মধাবাব অধীশ্বব। আব এই বিশ্ব-আত্মা, এই যে অদ্বিতীয সত্তা এক হইযাও সব, যদিও ইহা মাযাশক্তিব দ্বাবা যন্ত্রাবূঢ়ের ন্যায আমাদিগকে জগৎচক্রে ঘুরাইতেছে, কুম্ভকার যেমন কুম্ভ তৈয়াবী করে, তন্তুবায যেমন তন্তু বয়ন কবে সেইরূপ এক যান্ত্রিক কৌশলের দ্বারা আমাদেব অজ্ঞানে আমাদিগকে গডিযা তুলিতেছে, তথাপি এই আত্মা হইতেছে আমাদের নিজেদেবই মহত্তম সত্তা, আব আমাদেব যাহা প্রকৃত তত্ত্ব, আমাদেব সত্তার সত্য, যাহা জন্মে জন্মে পশুজীবন, মানবজীবন ও দিব্যজীবনে, আমরা যাহা ছিলাম যাহা হইয়াছি এবং যাহা হইব তাহা আমাদেব মধ্যে বিকশিত হইয়া উঠিতেছে এবং সর্বদা নূতন ও অধিকতর উপযোগী রূপ গ্রহণ কবিতেছে—এই আভ্যন্তরীণ অধ্যাত্ম সত্য অনুসাবেই আমাদেব এই অন্তর্বাসী সর্বদর্শী সর্বশক্তিমান পুরুষ আমাদিগকে ক্রমশ গডিযা তুলিতেছেন, যখন আমাদের জ্ঞানচক্ষু খুলিবে তখনই আমবা ইহা দেখিতে পাইব। এই যে যন্ত্রস্বরূপ অহং, গুণত্রয, মন, দেহ, প্রাণ, ভাবাবেগ, বাসনা, দ্বন্দ্ব, চিন্তা, অভীপ্সা, প্রচেষ্টাব গ্রন্থিল জটিলতা, দুঃখ ও সুখের, পুণ্য ও পাপেব, চেষ্টা ও সাফল্য ও বিফলতাব, আত্মা ও পাবিপার্শ্বিকের, আমি ও অপরের পাবস্পরিক বিজড়িত ক্রিযা প্রতিক্রিযা—ইহা হইতেছে আমাব মধ্যে এক উচ্চতব অধ্যাত্ম শক্তি কর্তৃক গৃহীত বাহ্য, অপূর্ণ রূপ মাত্র, আমি আমাব আত্মার নিগূঢ়তায যে দিব্য ও মহান সত্তা এবং প্রকৃতিতে প্রকাশ্যভাবে আমাকে যাহা হইতে হইবে, ঐ অধ্যাত্ম শক্তি তাহাব সকল বিপর্যযেব মধ্য দিযা ক্রমবর্ধমান ভাবে সেই সত্তারই আত্ম-অভিব্যক্তিকে সিদ্ধ কবিযা তুলিতেছে। এই ক্রিযার মধ্যেই ইহার নিজের সাফল্যেব নীতি নিহিত বহিযাছে, তাহাই হইতেছে স্বভাব ও স্বধর্মের নীতি।

জীব আত্ম-অভিব্যক্তিতে পুরুষোত্তমেবই একটি অংশবিশেষ। প্রকৃতিতে সে পবমাত্মাব শক্তিব প্রতিভূস্বরূপ, তাহাব ব্যক্তিত্বে সে সেই শক্তিই; সে ব্যষ্টিগত জীবনে বিশ্বপুরুষেব সম্ভবনাগুলিকেই প্রকট কবে। এই জীব নিজেও আত্মা, প্রাকৃত অহং নহে; অহংরূপ নহে পবন্তু আত্মাই আমাদের প্রকৃত সত্তা এবং আভ্যন্তবীণ অধ্যাত্ম তত্ত্ব। আমবা বস্তুত যাহা এবং আমবা যাহা হইতে পারি তাহাব প্রকৃত শক্তি বহিযাছে ঐ উর্ধ্বতন অধ্যাত্ম শক্তিব মধ্যে আব ইহার কর্মধাবাব যে অন্তবতম ও মূলগত সত্য তাহা ত্রিগুণময়ী মায়ার যন্ত্রবৎ ক্রিয়া নহে, এই মাযা হইতেছে কেবল বর্তমান কার্যকবী শক্তি, নীচের স্তরে সুবিধাব জন্য একটা সবঞ্জাম, বাহ্যিক অনুশীলন ও অভ্যাসের একটা ব্যবস্থা। যে অধ্যাত্ম প্রকৃতি বিশ্বমাঝে এই বহু রূপ গ্রহণ করিয়াছে, পবা প্রকৃতির্জীবভূতা, তাহাই

হইতেছে আমাদের জীবনেব মূল উপাদান; বাকী আব সবকিছুই হইতেছে অধ্যাত্মের এক উচ্চতম প্রচ্ছন্ন ক্রিয়া হইতে নিম্নতব সৃষ্টি এবং বাহ্যতব রূপ। আব প্রকৃতিতে আমাদেব প্রত্যেকেরই আছে নিজ নিজ বিবর্তনেব একটা মূল নীতি ও সঙ্কল্প; প্রত্যেক জীবই হইতেছে একটি আত্মচৈতন্যের শক্তি, সে নিজেব মধ্যে ভাগবতের একটি পরিকল্পনা নির্ধাবণ কবে এবং তাহাব দ্বাবা নিজেব কর্ম ও ক্রমবিকাশ, নিজের ক্রমবর্ধমান আত্মোপলব্ধি, নিজেব নিত্য বৈচিত্র্যময আত্মপ্রকাশ, পূর্ণ সংসিদ্ধির দিকে নিজেব দৃশ্যত অনিশ্চিত কিন্তু নিগূঢ়ভাবে অবশ্যম্ভাবী প্রগতিকে নিয়ন্ত্রিত কবে। সেইটিই হইতেছে আমাদের স্বভাব, *আমাদের নিজ সত্য প্রকৃতি, সেইটিই হইতেছে আমাদেব সত্তাব সত্য*, তাহা জগতে আমাদেব বিচিত্র বিবর্তনে এখন কেবল নিবন্তব আংশিকভাবেই প্রকট হইতেছে। কর্মেব যে নীতি এই স্বভাবেব দ্বাবা নির্ধাবিত হয় তাহাই হইতেছে আমাদেব আত্ম-সংগঠন, কর্তব্য ও কর্মধাবাব যথার্থ ধর্ম, আমাদেব স্বধর্ম।

সমস্ত বিশ্বেই এই নীতি পবিব্যপ্ত, সর্বত্রই কাজ করিতেছে এক অদ্বিতীয় দিব্য শক্তি, এক সাধারণ বিশ্ব প্রকৃতি, কিন্তু প্রত্যেক স্তব, রূপ, শক্তি, গণ, জাতি, ব্যষ্টিগত জীবের মধ্যে সে একটি প্রধান ভাব এবং নিত্য ও জটিল পবিবর্তনেব কয়েকটি অপ্রধান ভাব ও নীতি অনুসবণ কবিতেছে, প্রত্যেকেব স্থাযী ধর্ম এবং অস্থায়ী ধর্ম দুই-ই ইহাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহারাই নির্দিষ্ট করিযা দেয বিবর্তনেব মধ্যে প্রত্যেকের সত্তার ধারা, তাহার উদ্ভব, স্থিতি ও পবিবর্তনেব মার্গ, তাহাব আত্মরক্ষা ও আত্মবিবর্ধনের শক্তি, তাহাব সুপ্রতিষ্ঠ ও ক্রমবিকাশশীল আত্মপ্রকাশ ও আত্মোপলব্ধির গতি, বিশ্বমাঝে ব্রহ্মেব অভিব্যক্তিব অবশিষ্ট অংশেব সহিত তাহার সম্বন্ধের বিধি। নিজ সত্তার ধর্ম, স্বধর্ম, অনুসরণ কবা, নিজ সত্তায নিহিত ভাবের, স্বভাবের, বিকাশ করা—ইহাই হইতেছে তাহার নির্বিঘ্ন প্রতিষ্ঠা, তাহাব যথাযথ পন্থা ও পদ্ধতি। পবিশেষে তাহা জীবকে কোন বর্তমান রূপাযণেব মধ্যে আবদ্ধ করিয়া বাখে না, পবন্তু বিকাশেব এই পথ অনুসবণ কবিযা জীব নিজ ধর্ম ও নীতির সহিত সমঞ্জসীভূত নূতন নূতন অভিজ্ঞতায নিজেকে সর্বাপেক্ষা নিশ্চিতভাবে সমৃদ্ধ করিয়া তোলে এবং প্রবলতম শক্তিতে বর্ধিত হইযা যথাসময়ে বর্তমান অবযবসকলকে ভেদ কবিযা উচ্চতর আত্মপ্রকাশে উপনীত হইতে পাবে। নিজ ধর্ম ও নীতিকে বক্ষা করিতে অসমর্থ হওয়া, যাহাতে পারিপার্শ্বিককে নিজেব সহিত মিলাইয়া লইতে পারা যায এবং তাহাকে নিজ প্রকৃতিব উপযোগী কবিযা তোলা যায এইভাবে পারিপার্শ্বিকেব সহিত নিজেকে মিলাইতে না পাবা—ইহা হইতেছে *নিজেকে হারাইয়া ফেলা*, আত্ম-অধিকাবে বঞ্চিত হওযা, আত্মাব পথ হইতে বিচ্যুত হওয়া, বিনষ্টি, মিথ্যা, মৃত্যু, ক্ষয ও ধ্বংসেব বেদনা, অনেক সময়েই এইভাবে নির্বাণ ও বিলুপ্তির পব আত্মাকে পুনরুদ্ধার কবিবাব কষ্টকর সাধনা আবশ্যক হয়, ইহা ভ্রান্ত পথে বৃথা পবিভ্রমণ, আমাদেব প্রকৃত প্রগতিব পবিপন্থী। এই নীতি প্রকৃতিব সর্বত্র কোন-না-কোন আকাবে প্রচলিত বহিয়াছে, যে

সাধাবণত্বেব নীতি ও বৈচিত্র্যেব নীতিব ক্রিযা বিজ্ঞান আমাদিগকে দেখাইয়া দিতেছে সেসবেবই মূলে ইহা বহিয়াছে। মানুষেব জীবনে, তাহার বহু মানবীয শবীবে বহু জন্মে ঐ একই নীতি কার্য কবিতেছে। এখানে ইহাব একটি বাহ্যিক ক্রিযা বহিযাছে এবং একটি আভ্যন্তবীণ অধ্যাত্ম সত্য বহিয়াছে, আর যখন আমরা ঐ আভ্যন্তবীণ অধ্যাত্ম সত্যটি লাভ কবি এবং আমাদের সমুদয় কর্মকে আধ্যাত্মিক সার্থকতায উদ্ভাসিত কবি তখনই ঐ বাহ্যিক ক্রিয়া তাহার পূর্ণ ও সমগ্র অর্থ লাভ কবিতে পাবে। আত্মজ্ঞানে আমাদেব প্রগতিব অনুপাতে এই মহান ও বাঞ্ছনীয় রূপান্তব দ্রুত ও বলিষ্ঠভাবে সম্পাদিত হইতে পারে।

আব প্রথমেই আমাদিগকে লক্ষ্য কবিতে হইবে যে, স্বভাব বলিতে উচ্চতম অধ্যাত্ম প্রকৃতিতে এক জিনিস বুঝায, আব ত্রিগুণাত্মিকা নিম্নতন প্রকৃতিতে উহা সম্পূর্ণ ভিন্ন রূপ ও অর্থ গ্রহণ কবে। এখানেও উহা কর্ম কবে, কিন্তু সম্পূর্ণভাবে নিজেকে পায না, যেন অর্ধ আলোকে বা অন্ধকাবে তাহাব নিজস্ব সত্য ধর্মটির সন্ধান কবে এবং বহু নিম্নতন রূপ, বহু মিথ্যা রূপ, অন্তহীন ত্রুটি, বিকৃতি, আত্মহানি, আত্মলাভেব ভিতব দিযা নিজের পথে চলিতে থাকে, অবশেষে সে আত্মদর্শন ও সিদ্ধিতে উপনীত হয়। এখানে আমাদের প্রকৃতি হইতেছে জ্ঞান ও অজ্ঞানেব, সত্য ও মিথ্যার, সফলতা ও বিফলতার, ন্যায ও অন্যায়ের, লাভ ও ক্ষতিব, পাপ ও পুণ্যেব মিশ্রিত বচনা। এইসবের ভিতব দিযা স্বভাবই আত্মপ্রকাশ ও আত্মপ্রাপ্তিব অনুসন্ধান কবিতেছে, স্বভাবস্ত প্রবর্ত্ততে—এই সত্য হইতে আমাদেব সর্বতোমুখী ঔদার্য এবং সমদৃষ্টি শিক্ষা করা উচিত, কারণ আমরা সকলে ঐ একই বিভ্রান্তি ও দ্বন্দ্বের অধীন। এইসব ক্রিয়া আত্মার নহে, প্রকৃতির। পুরুষোত্তম এই অজ্ঞানেব দ্বাবা সীমাবদ্ধ নহেন তিনি ঊর্ধ্ব হইতে ইহাকে নিয়ন্ত্রণ কবেন এবং জীবকে তাহাব সকল পবিবর্তনের ভিতর দিযা পবিচালিত কবেন। শুদ্ধ অক্ষব আত্মা এইসকল ক্রিযাব দ্বারা সংস্পৃষ্ট হয় না, সে তাহার অলক্ষ্য শাশ্বত প্রতিষ্ঠা হইতে ক্ষব প্রকৃতিকে তাহার বিপর্যয়সকলের মধ্যে দর্শন করে, ধবিযা থাকে। ব্যষ্টিগত জীবেব যাবা প্রকৃত আত্মা, আমাদেব মধ্যে যাহা কেন্দ্রীয় সত্তা, তাহা এইসকল জিনিস হইতে মহত্তব, কিন্তু প্রকৃতিতে তাহার বাহ্যিক ক্রমবিকাশে এই সকলকে স্বীকার কবিয়া লয়। আব যখন আমরা এই প্রকৃত আত্মাকে লাভ কবি, যে অপবিবর্তনীয সর্বগত আত্মা আমাদিগকে ধবিয়া রহিযাছে তাহাকে লাভ কবি এবং যে পুরুযোত্তম—আমাদেব যে হৃদিস্থিত ঈশ্বর—প্রকৃতির সমুদয কর্মেব উপব অধ্যক্ষরূপে বিবাজ কবিয়া সবকিছু পরিচালন করিতেছেন তাঁহাকে লাভ কবি তখনই আমবা আমাদেব জীবনেব ধর্মের সমগ্র অধ্যাত্ম অর্থটির সন্ধান পাই। কাবণ যে জগদীশ্বর অনন্ত কাল ধবিয়া তাঁহাব অনন্ত গুণে সর্বভূতের মধ্যে নিজেকে প্রকট করিতেছেন, আমরা তাঁহাকে অবগত হই। আমরা ভগবানের চতুর্ব্যূহ সত্তা সম্বন্ধে সজ্ঞান হই—আত্মজ্ঞান ও বিশ্ব-জ্ঞানের সত্তা; বল ও শক্তিব যে সত্তা নিজেব শক্তিসকলেব সন্ধান কবিতেছে, আবিষ্কার করিতেছে, প্রয়োগ

কবিতেছে; অন্যোন্যাশ্রয় ও সৃষ্টি ও সম্বন্ধ ও জীবে জীবে আদানপ্রদানের সত্তা, কর্মের যে সত্তা বিশ্বে শ্রম করিতেছে, প্রত্যেকের মধ্যে সকলের সেবা করিতেছে এবং প্রত্যেকের শ্রমকে অন্য সকলের সেবায় প্রযুক্ত করিতেছে। আবার আমাদের মধ্যে ভগবানের যে ব্যষ্টিগত শক্তি রহিয়াছে সে সম্বন্ধেও আমরা সজ্ঞান হইয়া উঠি, তাহা এই চতুর্বিধ শক্তিকে সাক্ষাৎভাবে ব্যবহারে করিতেছে, আমাদের আত্ম-অভিব্যক্তির ধারা নির্দেশ করিতেছে, আমাদের দিব্য কর্ম ও দিব্য পদ নির্ধারণ করিতেছে এবং এইসবের ভিতর দিয়াই তাঁহার বৈচিত্র্যময় সার্বিকতার মধ্যে আমাদিগকে উত্তোলন করিতেছে যেন ইহার দ্বারা শেষপর্যন্ত আমরা তাঁহার সহিত এবং বিশ্বমাঝে তিনি যাহাকিছু হইয়াছেন সেই সবের সহিত আমাদের আধ্যাত্মিক একত্ব লাভ করি।

মানুষের মধ্যে চারি বর্ণের যে বাহ্যিক পরিকল্পনা তাহা দিব্য কর্মধারার এই সত্যের কেবল অপেক্ষাকৃত বাহ্যিক ক্রিয়ার সহিতই সংশ্লিষ্ট, গুণত্রয়ের ক্রিয়ার মধ্যে ইহার কার্যপ্রণালীর কেবল একটিমাত্র দিকেই উহা সীমাবদ্ধ। ইহা সত্য যে, এই জীবনে মানুষ মোটামুটি চারি শ্রেণীর মধ্যে পড়ে—জ্ঞানের মানুষ, কর্মের মানুষ, উৎপাদনশীল প্রাণিক (vital) মানুষ এবং কায় শ্রম ও সেবার মানুষ। এই শ্রেণীবিভাগগুলি মূলপ্রকৃতিগত নহে, পরন্তু ইহারা আমাদের মানবত্বের আত্মবিকাশে বিভিন্ন স্তর। মানুষ যখেষ্ট অজ্ঞান ও অপ্রবৃত্তির বোঝা লইয়া যাত্রারম্ভ করে, তাহার প্রথম দশা হইতেছে কায় শ্রমের, শরীরের প্রয়োজন, প্রাণের সম্প্রেরণা, প্রকৃতির অলঙ্ঘ্য নিয়ম তাহার পশুসুলভ আলস্যকে এই শ্রমে বাধ্য করে, আর প্রয়োজনের একটা সীমা ছাড়াইয়াও সমাজ সাক্ষাৎভাবে অথবা গৌণভাবে তাহাকে এই শ্রমে বাধ্য করে যাহারা এখনও এই তামসিকতার অধীনে তাহারাই শূদ্র, সমাজের দাসশ্রেণী, তাহারা সমাজকে তাহাদের শারীরিক শ্রম দেয়, তাহা ছাড়া সামাজিক জীবনের বহুমুখী খেলায় তাহারা অন্যান্য অধিকতর উন্নত মানুষের তুলনায় আর কিছুই দিতে পারে না অথবা খুব কমই দিয়া থাকে। ক্রিয়াশীলতার দ্বারা মানুষ নিজের মধ্যে রজোগুণের বিকাশ করে এবং আমরা দ্বিতীয় শ্রেণীর মানুষ পাই, সে প্রয়োজনীয় সৃষ্টি, উৎপাদন, সঞ্চয়, অর্জন, অধিকার ও ভোগের নিরন্তর প্রেরণার দ্বারা পরিচালিত হয়, সে হইতেছে মধ্যবিত্ত আর্থিক ও প্রাণিক মানব, বৈশ্য। আমাদের সাধারণ প্রকৃতির রাজসিকতা বা সক্রিয়তার আরও উচ্চতর স্তরে আমরা পাই এমন কর্মশীল মানব যাহার আছে অধিকতর প্রবল ইচ্ছাশক্তি, স্পর্ধিততর উচ্চাশা, কর্ম করিবার, যুদ্ধ করিবার, নিজের ইচ্ছাকে জয়ী করিবার স্বাভাবিক প্রেরণা এবং উচ্চতম স্তরে নেতৃত্ব করিবার, প্রভুত্ব করিবার, শাসন করিবার, নিজের পথে জনমণ্ডলীকে চালিত করিবার প্রেরণা—সে যোদ্ধা, নেতা, শাসক, সামন্ত, রাজা, সে-ই ক্ষত্রিয়। আর যেখানে সাত্ত্বিক মনেরই প্রাধান্য সেখানে আমরা পাই ব্রাহ্মণ, তাহার প্রবৃত্তি জ্ঞানের দিকে, সে জীবনে লইয়া আসে চিন্তা, বিচার, সত্যের অনুসন্ধিৎসা এবং

একটা বুদ্ধিসঙ্গত বিধান, অথবা উচ্চতম স্তরে একটা আধ্যাত্মিক বিধান এবং ইহার আলোকে সে জীবনের পরিকল্পনা ও পদ্ধতি নির্ণয় করে।

মানবপ্রকৃতিতে সকল সময়েই বিকশিত অবস্থাতেই হউক কিংবা অবিকশিত অবস্থাতেই হউক, উদার হউক কিংবা সঙ্কীর্ণ হউক, দমিত থাকুক কিংবা বাহিরে প্রকট হউক, এই চারিটি চরিত্রেরই কিছু না কিছু রহিয়াছে; কিন্তু অধিকাংশ মানুষে এই চারিটির কোন একটিই প্রাধান্য লাভ করিতে চায় এবং কখনও কখনও প্রকৃতির ক্রিয়ার সমস্ত ক্ষেত্রটিকেই অধিকার করিয়া লইয়াছে বলিয়া মনে হয়। আর, সকল সমাজেই আমরা এই চারি শ্রেণী পাইব—এমনকি বর্তমান যুগে যেমন চেষ্টা করা হইয়াছে, আমরা যদি সমাজকে কেবলই উৎপাদনশীল ও ব্যবসামূলক করিয়া গড়িয়া তুলিতে পারি, অথবা আধুনিকতম মন যে দিকে আকৃষ্ট হইয়াছে এবং ইউরোপের এক অংশে যে বিষয়ে এখন পরীক্ষা চলিতেছে এবং অন্যত্র সমর্থিত হইতেছে, যদি একটা শ্রমিক সমাজ, জনসাধারণকে লইয়া একটা শূদ্র সমাজই গড়িয়া তুলি, তাহা হইলেও সেখানে এই চারি শ্রেণী থাকিবে। তখনও বুদ্ধিজীবী শ্রেণী থাকিবে, তাহারা সমস্ত প্রয়াসটির নীতি, সত্য ও নিয়ামক বিধির অনুসন্ধান করিতে ব্রতী হইবে; শ্রমশিল্পের অধ্যক্ষ ও নেতা থাকিবে, তাহারা এইসব উৎপাদনমূলক ক্রিয়াকে নিমিত্ত করিয়া নিজেদের সাহসিকতা ও সংগ্রাম ও নেতৃত্ব ও প্রাধান্যের প্রবৃত্তিকে পরিতৃপ্ত করিবে, শুধুই উৎপাদন ও ধনোপার্জনে যাহারা ব্রতী এইরূপ সাধারণ ধরনের বহু লোক থাকিবে, আবার সাধারণ শ্রমিক শ্রেণী থাকিবে, তাহারা সামান্য কিছু শ্রমমূলক কর্ম এবং তাহাদের শ্রমের পুরস্কার পাইয়াই পরিতৃপ্ত থাকিবে। কিন্তু এ সমস্তই হইতেছে বাহিরের জিনিস, আর ইহাই যদি সব হইত, তাহা হইলে মানবজাতির এই অর্থনৈতিক শ্রেণীবিভাগের কোনই আধ্যাত্মিক উপযোগিতা থাকিত না। বড় জোর ইহার কেবল এই অর্থ হইতে পারে যে, আমাদিগকে জন্মে জন্মে ক্রমবিকাশের এইসকল স্তরের ভিতর দিয়া অগ্রসর হইতে হয়, ভারতে কখনও কখনও এইরূপ মতই দেখা গিয়াছে; কারণ আমাদিগকে ক্রমে ক্রমে তামসিক, রজঃ-তামসিক, রাজসিক বা রজঃ-সাত্ত্বিক প্রকৃতির ভিতর দিয়া সাত্ত্বিক প্রকৃতির দিকে অগ্রসর হইতে হয়, আভ্যন্তরীণ ব্রাহ্মণ্যের মধ্যে উঠিতে ও প্রতিষ্ঠিত হইতে হয় এবং তাহার পর সেই ভিত্তি হইতে মোক্ষলাভের জন্য সাধনা করিতে হয়। কিন্তু তাহা হইলে গীতা যে বলিয়াছে, শূদ্র ও চণ্ডালও তাহার জীবনকে ভগবদ্‌মুখী করিয়া সোজা অধ্যাত্ম মুক্তি ও সিদ্ধির মধ্যে উঠিতে পারে, এই কথার আর কোনই যৌক্তিকতা থাকে না।

মূল যে সত্য সেটি এই বাহিরের জিনিস নহে, তাহা হইতেছে আমাদের সকল আভ্যন্তরীণ সত্তার শক্তি, অধ্যাত্ম প্রকৃতির চতুর্বিধ সক্রিয় শক্তির সত্য। প্রত্যেক জীব তাহার অধ্যাত্ম প্রকৃতিতে এই চারিটি দিক লইয়া আছে, সে হইতেছে জ্ঞানের সত্তা, বল ও শক্তির সত্তা, পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ ও আদানপ্রদানের সত্তা এবং

কর্ম ও সেবার সত্তা, কিন্তু কর্মে এবং অভিব্যক্তিব ধাবায কোন একটি দিকই প্রাধান্য লাভ করে এবং জীবাত্মার সহিত তাহাব আধারভূত প্রকৃতিব সম্বন্ধকে বিশিষ্টতা প্রদান করে, সেইটিই পথ দেখায এবং অন্য শক্তিগুলির উপব নিজেব ছাপ মারিয়া দেয়, সেসবকে কর্ম, প্রবৃত্তি ও অনুভূতিব প্রধান ধাবাটিব প্রযোজনে নিয়োগ করে। তখন স্বভাব এই ধাবাটিব ধর্মই অনুসবণ কবে, সামাজিক শ্রেণীবিভাগ অনুযায়ী স্থূল ও বাঁধাধবা ভাবে নহে, পবন্তু সূক্ষ্মভাবে, নমনীযভাবে এবং ইহাকে বিকশিত করিতে গিযাই অন্য তিনটি শক্তিকেও বিকশিত কবিযা তোলে। এইরূপে কর্ম ও সেবার প্রেরণাকে যথাযথভাবে অনুসবণ করিলে তাহা জ্ঞানকে পুষ্ট করে, শক্তিকে বর্ধিত কবে, অন্যোন্যপরতাব ঘনিষ্ঠতা ও সামঞ্জস্যকে এবং সম্বন্ধেব কৌশল ও পারম্পর্যকে সুষ্ঠু কবিযা তোলে। চতুর্মুখী দেবতাব প্রত্যেকটি দিকের মুখ্য স্বাভাবিক তত্ত্বটি অন্য তিনটির দ্বাবা প্রসাবিত ও সমৃদ্ধ হয, এইভাবেই তাহা সমগ্র সিদ্ধিব অভিমুখে অগ্রসব হয়। এই যে ক্রমবিকাশ, ইহা গুণত্রয়ের ধর্ম অনুসরণ করে। জ্ঞানময় সত্তাব যে ধর্ম সেইটিকেও তামসিকভাবে অথবা বাজসিকভাবে অনুসরণ কবা যায়। শক্তিব যে ধর্ম সেইটিকেও পাশবিক ও তামসিকভাবে অথবা সমুচ্চ সাত্ত্বিকভাবে অনুসবণ কবা যায, সেইরূপ কর্ম ও সেবার ধর্মকেও প্রবল রাজসিকভাবে অথবা সুন্দর ও উদাব সাত্ত্বিকভাবে অনুসবণ করা যায়। আভ্যন্তরীণ ব্যষ্টিগত স্বধর্মেব যে ধারা তাহাতে উপনীত হওয়া এবং জীবনের পথে সেই ধারা আমাদিগকে যে কর্মে অনুপ্রাণিত কবে তাহাতে প্রবৃত্ত হওয়া—ইহাই হইতেছে সিদ্ধিলাভের জন্য প্রথম প্রয়োজন। আব এখানে ইহাও উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ঐ আভ্যন্তরীণ স্বধর্ম কোন বাহ্য সামাজিক বা অন্যপ্রকার কর্ম, বৃত্তি বা অনুষ্ঠানে সীমাবদ্ধ নহে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে, যে কর্মশীল সত্তা সেবাতেই তৃপ্তি পায অথবা আমাদের মধ্যে এইরূপ যে কর্মীব ভাব রহিয়াছে তাহা তাহার শ্রমের দিকে, সেবাব দিকে ভাগবত প্রেবণাকে পরিতৃপ্ত করিবার উপায়রূপে জ্ঞানচর্চাব জীবন, সংঘর্ষ ও শক্তিব জীবন অথবা অন্যোন্যপরতা, উৎপাদন ও আদানপ্রদানের জীবন গ্রহণ কবিতে পাবে। আব পরিশেষে এই চতুর্বিধ ক্রিয়ার দিব্যতম রূপাযণে এবং সর্বাপেক্ষা ওজস্বান অধ্যাত্ম শক্তিতে উপনীত হওয়াই হইতেছে সর্বাপেক্ষা সমুচ্চ অধ্যাত্ম সিদ্ধিব দ্রুততম ও উদারতম সত্যে প্রবেশ করিবাব প্রশস্ত দ্বাব। আমবা ইহা কবিতে পাবি যদি আমবা স্বধর্মের ক্রিযাকে আভ্যন্তরীণ ভগবানের, বিশ্বপুরুষেব এবং বিশ্বাতীত পুরুষোত্তমেব পূজায় পরিণত করি এবং শেষপর্যন্ত সমগ্র কর্মটিকেই তাঁহাব হস্তে সমর্পণ কবি, ময়ি সংন্যস্য কর্ম্মাণি। তখন যেমন আমবা গুণত্রযেব গণ্ডি অতিক্রম কবিয়া যাই, তেমনিই আমরা চাতুর্বর্ণ্যের বিভাগ এবং সকল বিশেষ বিশেষ ধর্মেব সীমাও অতিক্রম করিয়া যাই, সর্ব্বধর্ম্মান্ পবিত্যজ্য। তখন বিশ্বপুরুষ ব্যষ্টিগত জীবকে বিশ্বগত স্বভাবের মধ্যে তুলিয়া লন, আমাদেব মধ্যে প্রকৃতিব যে চতুর্মুখী সত্তা রহিয়াছে সেইটিকে সর্বাঙ্গসিদ্ধ ও একীভূত কবিযা দেন এবং তাহাব

স্বনিয়ন্ত্রিত কার্যাবলী ভাগবত ইচ্ছা অনুসাবে এবং জীবেব মধ্যে ভাগবতের যে শক্তি সিদ্ধ হইযা উঠিয়াছে তদনুসারে সম্পন্ন করিয়া দেন।

গীতাব আদেশ হইতেছে আমাদেব নিজ কর্মের দ্বারা, স্ব-কর্ম্মণা, ভগবানের উপাসনা কবা, আমাদের অর্পণ যেন হয় আমাদের সত্তা ও প্রকৃতির নিজস্ব ধর্মের দ্বাবা নির্ধাবিত কর্ম।[১] কাবণ ভগবান হইতেই সকল সৃষ্টির ধারা ও কর্মেব প্রেরণা উৎপন্ন হয এবং তাঁহার দ্বারাই এই সমুদয বিশ্ব বিস্তৃত হইয়াছে এবং জগৎসমূহকে সংগ্রথিত বাখিবাব জন্য তিনি স্বভাবের ভিতর দিয়া সকল কর্ম পরিচালন কবিতেছেন, তাহাদেব রূপ গড়িযা দিতেছেন। আমাদের আন্তর ও বাহ্য কার্যাবলীব দ্বাবা তাঁহাকে উপাসনা করা, আমাদের সমগ্র জীবনকে পবমতমের উদ্দেশে কর্মযজ্ঞে পরিণত কবা—ইহা হইতেছে আমাদের সকল সঙ্কল্প ও সত্তা ও প্রকৃতিতে তাঁহার সহিত এক হইযা উঠিবার জন্য নিজদিগকে প্রস্তুত করিবাব সাধনা। আমাদের কর্ম হওয়া চাই আমাদের ভিতরের সত্য অনুযায়ী, তাহা যেন কোন বাহ্যিক ও কৃত্রিম আদর্শের সহিত আপোষ না হয়, তাহা যেন হয় অন্তবাত্মার ও তাহার সহজাত শক্তিসকলের জীবন্ত ও যথার্থ অভিব্যক্তি। কারণ আমাদেব বর্তমান প্রকৃতিতে এই অন্তঃপুরুষের যে জীবন্ত অন্তরতম সত্য তাহার অনুসবণ কবিলে তাহা যথাকালে আপাত অতিচেতন পবা প্রকৃতির মধ্যে ঐ অন্তঃপুরুষেবই যে অমৃত সত্য তাহাতে উপনীত হইতে সাহায্য করে। সেখানে আমবা ভগবানের সহিত এবং আমাদের সত্য সত্তার সহিত এবং সর্বভূতের সহিত একত্বে বাস কবিতে পাবি এবং সর্বাঙ্গসিদ্ধ হইয়া অমৃতধর্মের মুক্তির মধ্যে দিব্য কর্মের অনবদ্য যন্ত্র হইয়া উঠি।

[১] যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্ব্বমিদং ততম্।
স্বকর্ম্মণা তমভার্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ॥১৮।৪৬

একবিংশ অধ্যায়

পরম রহস্যের পথে

আর যাহা কিছু বলিবার ছিল গুরু সে সমুদয়ই শেষ করিয়াছেন, তিনি তাঁহার বাণীর সকল মূল তত্ত্ব এবং তাহাদের পরিপোষক ইঙ্গিত ও ব্যঞ্জনাসমূহ পরিস্ফুট করিয়াছেন এবং তাঁহার বাণী সম্বন্ধে যেসব সন্দেহ ও প্রশ্ন উঠিতে পারে সেসবেরও সমাধান করিয়াছেন, এখন শুধু বাকী রহিয়াছে একমাত্র শেষ কথাটিকে, বাণীর অন্তরতম মর্মটিকে, তাঁহার শিক্ষার সার তত্ত্বটিকে অসন্দিগ্ধ এবং অন্তর্ভেদী সূত্রের মধ্যে ধরিয়া দেওয়া। আর আমরা দেখিতে পাই যে, এই অসন্দিগ্ধ, শেষ ও চূড়ান্ত কথাটি এ বিষয়ে ইতিপূর্বে যাহা বলা হইয়াছে কেবল তাহারই সারসংগ্রহ নহে, কেবলমাত্র প্রয়োজনীয় সাধনাটির এবং এই সমস্ত প্রযত্ন ও তপস্যার ফলে যে মহত্তর অধ্যাত্ম চৈতন্য অধিগত হইবে তাহার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নহে; ইহা যেন আরও দূরে প্রসারিত হইয়া যায়, প্রত্যেক সীমা ও বিধি, নীতি সূত্র লঙ্ঘন করে এবং এমন এক উদার ও সীমাহীন অধ্যাত্ম সত্যের দ্বার খুলিয়া দেয় যাহার মধ্যে অনন্ত অর্থ নিহিত রহিয়াছে। আর এইটি হইতেছে গীতার শিক্ষার গভীরতার, সুদূরপ্রসারতার এবং ভাব-মহত্ত্বের লক্ষণ। সত্যের কতকগুলি মহান ও প্রয়োজনীয় দিককে ধরিতে পারিলে এবং সেসবকে ব্যবহারোপযোগী মতবাদ ও উপদেশ, পদ্ধতি ও সাধনায় পরিণত করিয়া মানুষের আভ্যন্তরীণ জীবন পরিচালনায় সাহায্য করিতে পারিলে এবং তাহার কর্মের নীতি ও স্বরূপ নির্ধারণ করিয়া দিতে পারিলেই সাধারণ ধর্মশিক্ষা বা দর্শনশাস্ত্র সন্তুষ্ট হয়, তাহা আর বেশীদূর অগ্রসর হয় না, নিজের পদ্ধতির বাহিরে কোন দ্বার খুলিয়া দেয় না, আমাদিগকে কোন প্রশস্ততম মুক্তি এবং উন্মুক্ত প্রসারতার মধ্যে লইয়া যায় না। এইরূপ সীমাবধারণ লাভজনক, বস্তুত কিছুকাল পর্যন্ত ইহা অপরিহার্য। মানুষ তাহার মন ও ইচ্ছার দ্বারা আবদ্ধ, তাহার চিন্তা ও কর্ম নির্বাচনের জন্য তাহার পক্ষে একটা নীতি ও বিধান, একটা বাঁধাধরা পদ্ধতি, একটা নির্দিষ্ট অভ্যাসক্রমের প্রয়োজন আছে, সে চায় একটিমাত্র অভ্রান্ত সুনির্মিত পথ, বেড়া দিয়া ঘেরা, সুদৃঢ়, তাহার উপর যেন নিরাপদে পা ফেলিয়া চলা যায়, সে চায় সীমাবদ্ধ দিক্‌চক্র এবং পরিবৃত বিশ্রামস্থল। অতি অল্পসংখ্যক শক্তিমান ব্যক্তিই মুক্তির ভিতর দিয়া মুক্তির দিকে অগ্রসর হইতে পারে। অথচ মন যেসব ধারণা ও সংস্কার, বিধি ও ব্যবস্থা লইয়া তৃপ্ত রহিয়াছে, পরিচ্ছিন্ন সুখলাভ করিতেছে, মুক্ত জীবকে পরিশেষে তাহাদের বাহিরে যাইতেই হইবে। যে সরণী বাহিয়া আমরা ঊর্ধ্ব দিকে উঠিতেছি সেইটিকে ছাড়াইয়া উঠা, উচ্চতম ধাপে গিয়াও থামিয়া না যাওয়া, পরন্তু আত্মার উদার প্রসারতার মধ্যে মুক্ত পদে অবাধে বিচরণ করা—আমাদের সংসিদ্ধি

লাভের জন্য এইরূপ বিমুক্তির প্রয়োজনীয়তা আছে; আত্মার পূর্ণতম স্বাধীনতাই হইতেছে আমাদের সিদ্ধতম অবস্থা। আর গীতা এইভাবেই আমাদিগকে পথ দেখাইয়াছে, উহা এক মহান ধর্ম দিয়াছে, ঊর্ধ্বে উঠিবার এক সুদৃঢ় ও নিশ্চিত অথচ সেই সঙ্গেই অতিপ্রশস্ত সিঁড়ি পাতিয়া দিয়াছে এবং তাহার পর আমাদিগকে সকল ধর্মের উপরে, যাহা কিছু নির্ধারিত করা হইয়াছে সেসবের উপরে অসীম উন্মুক্ত ক্ষেত্রের মধ্যে লইয়া গিয়াছে, আমাদের সম্মুখে পরমতম অধ্যাত্ম মুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এক পরমতম সিদ্ধির আশা প্রকট করিয়াছে, তাহার রহস্যের দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া দিয়াছে এবং সেই রহস্যই হইতেছে গীতা যাহাকে তাহার পরমতম বাক্য বলিয়াছে, তাহার সারবস্তু, সেইটিই হইতেছে গুহ্যতমম্, সেইটিই অন্তরতম জ্ঞান।

প্রথমেই গীতা তাহার বাণীটি মোটামুটি পুনরায় বিবৃত করিয়াছে। পনেরটি শ্লোকের স্বল্প পরিসরের মধ্যে সমগ্র পরিকল্পনা ও মর্মটি সংক্ষেপে ধরিয়া দিয়াছে, এই ছত্রগুলির বাক্য ও অর্থ হইতেছে সংক্ষিপ্ত ও সংহত, বিষয়বস্তুর কোন সার অংশ এখানে বাদ যায় নাই, সবই অতি স্বচ্ছ যাথার্থ্য ও প্রাঞ্জলতার ভাষায় ব্যক্ত হইয়াছে। অতএব সেগুলিকে যত্নের সহিত অনুধাবন করিতে হইবে, পূর্বে যাহাকিছু বলা হইয়াছে সেইসবের আলোকে গভীরভাবে অধ্যয়ন করিতে হইবে, কারণ ইহা সুস্পষ্ট যে, গীতার নিজের মতে যেটি হইতেছে তাহার শিক্ষার মূল অর্থ এখানে সেইটিরই সারোদ্ধার করা হইয়াছে। যে কথাটি লইয়া গীতা প্রথমেই আরম্ভ করিয়াছে, মানুষের কর্মের প্রহেলিকা, সংসারে কাজ করিতে থাকা অথচ সেই সমযেই উচ্চতম সত্তায় প্রতিষ্ঠিত থাকা যে অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়—এখানেও সেই সমস্যাটি লইয়াই বিবৃতিটি আরম্ভ হইয়াছে। সহজতম পন্থা হইতেছে ঐ সমস্যাটিকে অসাধ্য বলিয়া ছাড়িয়া দেওয়া এবং যখনই আমরা সংসারকূপ ফাঁদের মধ্য হইতে অধ্যাত্ম সত্তার সত্যের মধ্যে উঠিতে পারি তখনই জীবন ও কর্মকে মিথ্যা মায়া বলিয়া অথবা সৃষ্টির একটা নিম্নতন প্রক্রিয়া বলিয়া পরিত্যাগ করা। এইটিই হইতেছে সন্ন্যাসীদের সমাধান, তবে ইহাকে সমাধান বলা যায় কিনা তাহা বিবেচ্য; যাহাই হউক এইটিই ঐ প্রহেলিকা হইতে উদ্ধার হইবার একটি নিশ্চিত ও সফল পন্থা, প্রাচীন ভারতীয় চিন্তার যেটি উচ্চতম ও সমধিক ধ্যানশীল ধারা সেইটি যখন তাহার প্রথম উদার ও মুক্ত সমন্বয় ছাড়িয়া একদিকে তীব্রভাবে ঝুঁকিতে আরম্ভ করিয়াছে তখন হইতে উহা এই পন্থাটির দিকেই অগ্রসর হইয়াছে এবং সর্বদা উত্তরোত্তর এইটিকেই প্রাধান্য দিয়াছে। গীতা তন্ত্র এবং কোন কোন দিকে পরবর্তী ধর্ম আন্দোলনগুলির মত প্রাচীন সমন্বয়টি বজায় রাখিতে চেষ্টা করিয়াছে, সেই আদি সমন্বয়ের সার ও ভিত্তিটি গীতা বজায় রাখিয়াছে, কিন্তু তাহার বাহ্য আকার পরিবর্তিত হইয়াছে, ক্রমবিকশিত অধ্যাত্ম উপলব্ধির আলোকে নূতন করিয়া গঠিত হইয়াছে। উচ্চতম সত্তা ও আত্মায় মানুষের যে আভ্যন্তরীণ জীবন তাহার সহিত পূর্ণ কর্মজীবনের সামঞ্জস্য করার কঠিন সমস্যা

গীতার শিক্ষা এড়াইয়া যায় নাই; ইহাব মতে যেটি প্রকৃত সমাধান সেইটিই উপস্থাপিত করিয়াছে। জীবনসন্ন্যাসের দ্বারা সন্ন্যাসের নিজ উদ্দেশ্যটি যে বেশ সাধিত হইতে পারে, গীতা তাহা আদৌ অস্বীকাব কবে নাই, কিন্তু গীতা দেখিযাছে যে, উহা সমস্যাটির গ্রন্থিটিকে খুলিযা না দিযা কাটিয়া ফেলে, অতএব গীতা এই প্রণালীটিকে নিকৃষ্ট বিবেচনা করিযাছে এবং নিজেরটিকেই উৎকৃষ্টতর পন্থা বলিয়াছে। দুইটি পন্থাই আমাদিগকে মানুষেব নিম্নতন অজ্ঞান সাধাবণ প্রকৃতি হইতে তুলিয়া শুদ্ধ অধ্যাত্ম চৈতন্যের মধ্যে লইযা যায এবং এই পর্যন্ত দুইটিকেই ন্যায়সঙ্গত, এমনকি মূলত এক বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু যেখানে একটি থামিয়া গিয়াছে, পশ্চাদ্বর্তন কবিযাছে, অপরটি সেখানে অবিচল সূক্ষ্ম দৃষ্টি ও সমুচ্চ সাহসের সহিত অগ্রসর হইযাছে, অজ্ঞাত বাজ্যের দিকে একটা দ্বাব খুলিযা দিয়াছে, মানুষের মধ্যে ভগবানকে পূর্ণ কবিয়া তুলিয়াছে এবং আত্মাব মধ্যে পুরুষ ও প্রকৃতির সমন্বয় সাধন কবিযাছে।

আর সেইজন্যই প্রথম পাঁচটি শ্লোকে গীতা তাহাব বক্তব্যটিকে এমন ভাষায প্রকাশ করিয়াছে যাহা আভ্যন্তরীণ ত্যাগেব পন্থা এবং বাহ্য ত্যাগের পন্থা উভযেব প্রতিই প্রযুক্ত হইতে পারে, অথচ এমনভাবে উহা করিয়াছে যে, উহাদেব কযেকটি সাধারণ কথার একটা গভীরতর এবং অধিকতর অন্তর্মুখী অর্থ গ্রহণ করিলেই গীতা যে প্রণালীটি অনুমোদন করিয়াছে তাহাবই ভাব ও মর্মটি পাওযা যায। মানবীয় কর্মের সমস্যাটি হইতেছে এই যে, মনে হয মানুষেব অন্তঃপুরুষ ও প্রকৃতির নিয়তিই হইতেছে নানাপ্রকাব বন্ধনের অধীন থাকা—অজ্ঞানেব কাবা, অহং-এর জটিল পাশ, রিপুগণেব শৃঙ্খল, উপস্থিত জীবনেব নির্বন্ধপব দাবি, এমন একটা অন্ধকাব ও সীমাবদ্ধ গণ্ডি যাহা হইতে বাহির হইবাব কোন পথই নাই। কর্মের এই গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ জীবেব কোনই স্বাধীনতা নাই, তাহাব আত্মাকে আবিষ্কার করিবার এবং জীবনেব প্রকৃত মূল্য, সংসারেব প্রকৃত অর্থ আবিষ্কাব করিবার উপযোগী কোন অবসর বা আত্মজ্ঞানের আলোক নাই। তাহাব কর্মপব ব্যক্তিত্ব ও ক্রিয়াত্মিকা প্রকৃতি হইতে সে তাহার সত্তা সম্বন্ধে কিছু কিছু ইঙ্গিত পাইতে পারে বটে, কিন্তু সেখানে সে পূর্ণতার যেসব আদর্শ দাঁড় কবাইতে পাবে সেসব এত বেশী সাময়িক, সীমাবদ্ধ ও আপেক্ষিক যে তাহাদেব সাহায্যে তাহাব নিজস্ব সমস্যার কোন সন্তোষজনক সমাধানেব সূত্র পাওযা যায় না। তাহাব সক্রিয প্রকৃতির সনির্বন্ধ আহ্বানে তন্ময হইযা যখন সে পুনঃপুনঃ বাহিবেব দিকেই যাইতে বাধ্য হইবে তখন সে কেমন করিয়া তাহাব প্রকৃত সত্তা ও অধ্যাত্ম জীবনে ফিবিযা যাইবে? সন্ন্যাসীর ত্যাগের পন্থা এবং গীতাব পন্থা উভয়েই এ বিষযে এক যে, প্রথমেই তাহাকে এই তন্ময়তা ত্যাগ করিতে হইবে, তাহাব বাহ্য জিনিসেব জন্য বহির্মুখী আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিতে হইবে এবং নীবব নিষ্ক্রিয পুরুষকে সক্রিয প্রকৃতি হইতে পৃথক করিতে হইবে; তাহাকে নিশ্চল আত্মার সহিত একাত্ম হইতে হইবে এবং নীরবতার মধ্যে বাস করিতে হইবে। তাহাকে এক আভ্যন্তবীণ

কর্মশূন্যতায় নৈষ্কর্ম্যে উপনীত হইতে হইবে। এই জন্য এই যে মুক্তিপ্রদ আভ্যন্তবীণ নিষ্ক্রিয়তা এইটিকেই গীতা এখানে তাহার যোগের প্রথম লক্ষ্য বলিয়া উপস্থিত কবিয়াছে, এইটিই হইতেছে সেই যোগের প্রথম প্রয়োজনীয় সিদ্ধি। "যাহাব বুদ্ধি সকল বিষযে আসক্তিবহিত, আত্মা স্ববশ এবং বাসনাশূন্য, তিনি সন্ন্যাসেব দ্বাবা পবম নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি লাভ করেন।"[১]

এই যে সন্ন্যাসের আদর্শ, আত্মজয় হইতে লব্ধ নীববতা, অধ্যাত্ম নিশ্চেষ্টতা এবং কামনাশূন্যতাব আদর্শ—ইহা সকল প্রাচীন জ্ঞানেই স্বীকৃত হইয়াছে। গীতা আমাদিগকে ইহাব মনস্তত্ত্বমূলক ভিত্তিটি অতুলনীয় পূর্ণতা ও স্পষ্টতার সহিত প্রদান কবিযাছে। আর ইহা নির্ভর কবিতেছে আত্মজ্ঞানসন্ধিৎসু সকল সাধকের এই সাধারণ অনুভূতিব উপব যে, আমাদের মধ্যে দুইটি বিভিন্ন প্রকৃতি রহিয়াছে, যেন দুইটি বিভিন্ন আত্মাই রহিয়াছে। অজ্ঞানাচ্ছন্ন মানসিক, প্রাণিক ও ভৌতিক প্রকৃতি লইযাই নিম্নতন আত্মা, ইহার চৈতন্যের মূল উপাদান, বিশেষত জড়পদার্থ লইযা ইহাব যে আধাব তাহা অজ্ঞান ও জড়তার অধীন; জীবনের শক্তিতে ইহা অবশ্য কর্মিষ্ঠ ও প্রাণময়, কিন্তু ইহাব কর্মে স্বাভাবিক আত্মবশ্যতা ও আত্মজ্ঞান নাই, মনেব মধ্যে আসিয়া ইহা কিছু জ্ঞান ও সুসঙ্গতি লাভ করিয়াছে, কিন্তু তাহাও কষ্টকর প্রযাসেব দ্বাবা, নিজেবই অক্ষমতাসমূহেব সহিত নিত্য দ্বন্দ্বের দ্বারা। আর বহিযাছে আমাদেব অধ্যাত্ম সত্তা লইয়া উচ্চতর প্রকৃতি ও আত্মা, তাহা আত্মবশ এবং স্বপ্রকাশ, কিন্তু আমাদের সাধারণ মানসক্ষেত্রে তাহা আমাদেব অনুভূতির অতীত। কখনও কখনও আমবা আমাদের অন্তরস্থিত এই মহত্তর বস্তুটিব ইঙ্গিত পাই, কিন্তু আমবা সজ্ঞানে ইহাব মধ্যে বাস করি না, ইহার জ্ঞান এবং শান্ত ও অপবিচ্ছিন্ন জ্যোতিব মধ্যে আমবা জীবনযাপন করি না। এই দুইটি অতি বিভিন্ন বস্তুব মধ্যে প্রথমটি হইতেছে গীতার ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি। ইহা নিজেকে দেখে অহংভাবেব কেন্দ্র হইতে, ইহার কর্মের নীতি হইতেছে অহং হইতে জাত বাসনা এবং অহং-এর গ্রন্থি হইতেছে মনের ও ইন্দ্রিয়ের বিষয়সমূহের প্রতি আসক্তি এবং প্রাণেব বাসনাব প্রতি আসক্তি। এই সকল জিনিসের অপরিহার্য পরিণাম হইতেছে বন্ধন, নীচের প্রকৃতিব স্থাযী দাসত্ব, আত্মজয়ের অভাব, আত্মজ্ঞানের অভাব। অন্য মহত্তর শক্তি ও সত্তাটি হইতেছে অহং-এব অতীত শুদ্ধ আত্মাব প্রকৃতি ও সত্তা, ভাবতীয় দর্শনশাস্ত্রে এই শুদ্ধ আত্মাকেই নির্গুণ নৈর্ব্যক্তিক ব্রহ্ম বলা হইয়াছে। মূলত ইহা হইতেছে এক অনন্ত ও নৈর্ব্যক্তিক সত্তা, তাহা সকলেব মধ্যেই এক ও অভিন্ন; আর যেহেতু এই নৈর্ব্যক্তিক সত্তা অহংবর্জিত, গুণ-উপাধিবর্জিত, বাসনা, প্রযোজন ও অনুপ্রেরণা বর্জিত, সেহেতু ইহা নিশ্চল ও অক্ষর; চিরকাল একই—ইহা বিশ্বকর্মেব উপদ্রষ্টা, অনুমন্তা ও ভর্তা, কিন্তু তাহাতে যোগ দেয় না,

[১] অসক্তবুদ্ধিঃ সর্ব্বত্র জিতাত্মা বিগতস্পৃহঃ।
নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধিং পবমাং সংন্যাসেনাধিগচ্ছতি॥১৮।৪৯

প্রবর্তক হয না। জীব যখন নিজেকে সক্রিয় প্রকৃতিব মধ্যে ছাডিযা দেয তখন সে হয় গীতার ক্ষর, গীতার সচল ও পবিবর্তনশীল পুরুষ, সেই একই জীব যখন নিজেকে সংবৃত কবিয়া শুদ্ধ নীবব নিশ্চল আত্মা ও মূল সত্তায় প্রতিষ্ঠিত হয় তখন সে হয় গীতাব অক্ষব, গীতার নিশ্চল ও অপরিবর্তনীয পুরুষ।

তাহা হইলে ইহা সুস্পষ্ট যে, সক্রিয় প্রকৃতিব নিবিড বন্ধন হইতে উদ্ধাব হইবাব অধ্যাত্ম মুক্তিতে ফিরিয়া যাইবার সবল ও সহজতম পন্থা হইতেছে অজ্ঞানেব কর্মপরতার সহিত যাহাকিছুর সম্বন্ধ রহিয়াছে সেসবকে বর্জন কবা এবং অন্তঃপুরুষকে শুদ্ধ অধ্যাত্ম সত্তায় পবিণত করা। এইটিকে বলা হয, ব্রহ্ম হওযা, ব্রহ্ম ভূয়[১]। ইহা হইতেছে, মন, প্রাণ ও দেহ লইযা যে নিম্নতন জীবন তাহা বর্জন কবা এবং শুদ্ধ অধ্যাত্ম সত্তা হইযা উঠা। ইহা সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্টভাবে সম্পন্ন হইতে পারে বুদ্ধির দ্বারা, এই বুদ্ধিই হইতেছে বর্তমানে আমাদের উচ্চতম তত্ত্ব। ইহাকে নিম্নতন জীবনের সকল জিনিস হইতে এবং প্রথমে ও মুখ্যত জীবনেব মূল গ্রন্থিস্বরূপ বাসনা হইতে মন ইন্দ্রিয় যেসকল বিষযেব দিকে ধাবিত হয তাহাদেব প্রতি আসক্তি হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইতে হইবে।[২] মানুষকে হইতে হইবে সর্বত্র অসক্তবুদ্ধি।[৩] তখন নৈঃশব্দ্যে প্রতিষ্ঠিত আত্মা হইতে সমস্ত বাসনা দূব হইযা যায, আত্মা হয় বিগতস্পৃহ। তাহাব ফলে আমাদেব নিম্নতন সত্তাব উপব আধিপত্য আত্মা হয় বিগতস্পৃহ। তাহাব ফলে আমাদেব নিম্নতন সত্তাব উপব আধিপত্য এবং আমাদের ঊর্ধতন সত্তায প্রতিষ্ঠা আসে বা সম্ভব হয। সে প্রতিষ্ঠা নির্ভব কবে সম্পূর্ণ আত্মজয়ের উপর, তাহা সুদৃঢ় হয আমাদের সচল প্রকৃতিব উপব পূর্ণ জয ও আধিপত্য হইতে। আর এই সবেরই অর্থ হইতেছে, অন্তব হইতে বিষযবাসনা নিঃশেষে বর্জন, সন্ন্যাস। বর্জন হইতেছে এই সিদ্ধিলাভেব পন্থা, আব যে মানব এইরূপ আভ্যন্তরীণভাবে সবকিছু বর্জন কবিযাছে, গীতা তাহাকেই প্রকৃত সন্ন্যাসী বলিয়া অভিহিত কবিযাছে। কিন্তু যেহেতু ঐ কথাটি সাধাবণত বাহ্য সন্ন্যাসও বুঝায়, অথবা কখনো কখনো শুধু তাহাই বুঝায, সেই জন্য গুরু আভ্যন্তবীণ বর্জনের সহিত বাহ্য বর্জনের প্রভেদ করিতে "ত্যাগ" শব্দটি ব্যবহার কবিযাছেন এবং বলিয়াছেন যে, সন্ন্যাস অপেক্ষা ত্যাগ উৎকৃষ্টতব। সন্ন্যাসমার্গ ক্রিযাত্মিকা প্রকৃতি হইতে প্রত্যাহারে আরও অনেক বেশী দূর অগ্রসব হয। ইহা বর্জনেব জন্যই বর্জন কবিতে আনন্দ পায় এবং বাহ্যভাবে জীবন ও কর্মত্যাগেব উপব জোর দেয, আত্মা ও প্রকৃতিব সম্পূর্ণ নিস্তব্ধতাব উপব জোব দেয। ইহাব উত্তরে গীতা বলিয়াছে যে, যতদিন আমরা শরীরেব মধ্যে বাস কবিতেছি ততদিন ইহা

[১] অহঙ্কাবং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্।
বিমুচ্য নির্মমঃ শান্তো ব্রহ্মভূযায কল্পতে॥১৮।৫৩

[২] বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধযা যুক্তো ধৃত্যাত্মানং নিযম্য চ।
শব্দাদীন্ বিষযাংস্ত্যক্ত্বা বাগদ্বেষৌ ব্যুদস্য চ॥১৮।৫১

[৩] অসক্তবুদ্ধিঃ সর্ব্বত্র জিতাত্মা বিগতস্পৃহঃ।
নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধিং পবমাং সংন্যাসেনাধিগচ্ছতি॥১৮।৪৯

সম্পূর্ণভাবে কবা সম্ভব নহে। যতদূব সম্ভব ইহা করা যাইতে পারে, কিন্তু এইভাবে জোব কবিযা কর্মকে খুব কমাইযা দেওয়া অপরিহার্য নহে, এমনকি ইহা বস্তুতপক্ষে, অন্তত সাধাবণত, সমীচীনও নহে। একমাত্র প্রয়োজনীয় জিনিস হইতেছে সম্পূর্ণ আভ্যন্তরীণ নিস্তব্ধতা, গীতা নৈষ্কর্ম্য বলিতে ইহার অধিক আর কিছুই বুঝে নাই।

যদি আমবা জিজ্ঞাসা কবি, কেন এই অবশেষ বাখা, যখন শুদ্ধ আত্মা হওযাই আমাদেব লক্ষ্য এবং শুদ্ধ আত্মাকে নিষ্ক্রিয় অকর্তা বলিযাই বর্ণনা কবা হইযাছে তখন সক্রিযতাব উপব এই পক্ষপাতিত্ব কিসেব জন্য, তাহার উত্তব হইতেছে এই যে, নিষ্ক্রিযতা এবং প্রকৃতি হইতে পুরুষেব বিচ্ছেদই আমাদের অধ্যাত্মমুক্তির সমগ্র তত্ত্ব নহে। পুরুষ এবং প্রকৃতি পবিশেষে একই বস্তু; পূর্ণ ও সিদ্ধ আধ্যাত্মিকতা আমাদিগকে পুরুষেব মধ্যে ভগবান এবং প্রকৃতিব মধ্যে ভগবান—সবেবই সহিত এক কবিয়া দেয। বস্তুত এই যে ব্রহ্ম হওয়া, চিব নৈঃশব্দ্যময আত্মাব মধ্যে গৃহীত হওয়া, ব্রহ্মভূয—ইহাই আমাদের সমগ্র লক্ষ্য নহে, পরন্তু ইহা হইতেছে কেবল আবও মহত্তর ও আশ্চর্যতর ভাগবত জীবনের (মদ্‌ভাব) জন্য প্রযোজনীয বিশাল ভিত্তি। আর সেই মহত্তম অধ্যাত্ম সিদ্ধি লাভ করিতে হইলে আমাদিগকে আত্মায নিশ্চল হইতে হইবে, আমাদেব সকল অংশে নিস্তব্ধ হইতে হইবে সন্দেহ নাই, কিন্তু সেই সঙ্গেই আমাদিগকে প্রকৃতিতে, আত্মার সত্য ও সমুচ্চ শক্তিতে কর্ম কবিতে হইবে। আব যদি আমবা জিজ্ঞাসা করি যে, বিপবীত বলিযা মনে হয় এমন দুইটি জিনিস যুগপৎ কেমন কবিয়া সম্ভব, তাহাব উত্তব হইতেছে এই যে, পবিপূর্ণ অধ্যাত্ম সত্তাব ঐটিই হইতেছে প্রকৃত স্বরূপ; সকল সময়ে তাহাব মধ্যে অনন্তের এই দুইমুখী ভাব বহিয়াছে। নৈর্ব্যক্তিক সত্তা নিঃশব্দ, আমাদিগকেও হইতে হইবে আভ্যন্তবীণভাবে নিঃশব্দ, নৈর্ব্যক্তিক—আত্মাব মধ্যে সমাহিত। নৈর্ব্যক্তিক সত্তা সকল কর্মকে দেখে তাহার দ্বারা কৃত নহে পবন্তু প্রকৃতিব দ্বাবা কৃত; প্রকৃতিব সকল গুণ ও শক্তির ক্রিয়াকে সে শুদ্ধ সমতাব সহিত দেখে; যে জীব আত্মায নৈর্ব্যক্তিক ভাব লাভ করিয়াছে তাহাকেও সেইরূপ দেখিতে হইবে যে, আমাদের সকল কর্মই প্রকৃতির গুণসকলের দ্বাবা সম্পন্ন হইতেছে, তাহাব নিজের দ্বাবা নহে, তাহাকে সর্বত্র সমবুদ্ধিসম্পন্ন হইতে হইবে।[১] আব সেই সঙ্গেই যাহাতে আমবা এইখানেই থামিয়া না যাই, যাহাতে আমবা যথাকালে সম্মুখে অগ্রসব হই এবং আমাদেব কর্মের একটা আধ্যাত্মিক নীতি ও নির্দেশ লাভ করি, শুধু আভ্যন্তবীণ নিশ্চলতা ও নৈঃশব্দ্যেরই নীতি নহে, সেই জন্য আমাদিগকে বলা হইয়াছে আমাদেব বুদ্ধি ও সঙ্কল্পের উপব যজ্ঞের ভাব আবোপ করিতে, যেন আমদেব সমস্ত কর্ম আভ্যন্তরীণ ভাবে প্রকৃতির অধীশ্বরেব

[১] ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পবাম্॥১৮।৫৪

উদ্দেশে, যে পরম পুরুষের সে আত্মশক্তি, স্বা প্রকৃতি, তাঁহাব উদ্দেশে উৎসর্গে পরিণত হয়। এমনকি আমাদিগকে যথাকালে তাঁহাব হস্তে সব সংন্যস্ত কবিতে হইবে, সমস্ত ব্যক্তিগত কর্মেব প্রবর্তন সর্ব্বাবস্তাঃ, বর্জন করিতে হইবে, আমাদেব প্রাকৃত সত্তাকে কেবল তাঁহাব কর্মেব এবং তাঁহার উদ্দেশ্যেব যন্ত্র কবিযা বাখিতে হইবে। এইসব জিনিস ইতিপূর্বে পূর্ণভাবে ব্যাখ্যা কবা হইযাছে, এখানে গীতা আব এসবের উপব জোব দেয় নাই, কেবল দুইটি সাধাবণ শব্দ, "সন্ন্যাস" ও "নৈষ্কর্ম্য", অন্য কোন বিশেষণ না দিয়াই প্রয়োগ করিযাছে।

শুদ্ধ নৈর্ব্যক্তিক আত্মার মধ্যে বাস কবিবাব জন্য আবশ্যকীয সাধনা হইতেছে পূর্ণতম আভ্যন্তবীণ স্তব্ধতা—ইহা একবাব স্বীকৃত হইলে তাহাব পবই প্রশ্ন উঠে, কেমন কবিযা কার্যত ঐ সাধনার দ্বারা ঐ ফলটি লাভ কবা যাইতে পাবে। "এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া কেমন কবিযা মানুষ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয, হে কুন্তিনন্দন, তাহা শ্রবণ কর—সেইটিই হইতেছে জ্ঞানের পরম নিষ্ঠা।"[১] এখানে যে জ্ঞানেব কথা বলা হইল তাহা হইতেছে সাংখ্যযোগ, গীতাব নিজেব যোগেব সহিত ইহাব যতখানি মিল আছে ততখানিই গীতা এই শুদ্ধ জ্ঞানযোগকে মানিয়া লইযাছে, জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাম্; গীতাব যোগেব মধ্যে কর্মের পন্থাও বহিযাছে, কর্ম্মযোগেন যোগিনাম্। কিন্তু এখানে আপাতত কর্মের সমস্ত কথা উহ্য বাখা হইয়াছে। কারণ এখানে ব্রহ্ম বলিতে প্রথমত নিঃশব্দ, নৈর্ব্যক্তিক, অক্ষর সত্তাকেই বুঝাইতেছে। অবশ্য উপনিষদের ন্যায গীতাব মতেও যাহাকিছু আছে, যাহাকিছু জীবন্ত ও গতিশীল সবই হইতেছে ব্রহ্ম, ইহা কেবলই নৈর্ব্যক্তিক অনন্ত নহে, কেবলই এক অচিন্ত্য অব্যবহার্য কৈবল্যাত্মক সত্তা নহে। উপনিষদ বলিযাছে, সর্ব্বং খলু ইদং ব্রহ্ম; গীতা বলিয়াছে, বাসুদেবঃ সর্ব্বম্—স্থাবব জঙ্গম যাহাকিছু আছে পবম ব্রহ্মই সেইসব এবং তাঁহার হস্ত, পদ, চক্ষু, মস্তক এবং মুখ আমাদেব সর্বদিকে রহিয়াছে।[২] তথাপি এই "সর্বেব" দুইটি দিক আছে, তাঁহাব অক্ষব শাশ্বত সত্তা যাহা সৃষ্টিকে ধরিয়া রহিযাছে এবং তাঁহাব সক্রিয শক্তির সত্তা তাহা জগতেব কর্মের মধ্যে কর্ম কবিতে বাহিব হইযাছে। যখন আমবা আমাদেব ক্ষুদ্র অহং-এব ব্যক্তিত্বকে আত্মার নৈর্ব্যক্তিকতার মধ্যে লয কবিযা দিই, কেবল তখনই আমবা শান্ত ও মুক্ত একত্বে উপনীত হই এবং তাহাব দ্বাবা আমবা ভগবানেব জগৎরূপ কর্মধারায় যে বিশ্বশক্তি ক্রিয়া করিতেছে তাহাব সহিত সত্য ঐক্যে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারি। নৈর্ব্যক্তিকতা হইতেছে সীমা ও ভেদেব খণ্ডন এবং নৈর্ব্যক্তিকতাব সাধনা হইতেছে সত্য সত্তাব স্বাভাবিক অবস্থা, সত্য জ্ঞানেব অপবিহার্য উপক্রমণিকা এবং সেই হেতু সত্য কর্মের পক্ষে প্রথম প্রযোজন। ইহা খুবই স্পষ্ট

[১] সিদ্ধিং প্রাপ্তো যথা ব্রহ্ম তথাপ্নোতি নিবোধ মে।
সমাসেনৈব কৌন্তেয নিষ্ঠা জ্ঞানস্য যা পবা॥১৮।৫০

[২] সর্ব্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিবোমুখম্।
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি॥১৩।১৩

যে, আমাদেব সীমাবদ্ধ অহং-এর ব্যক্তিত্বকে ধরিয়া থাকিলে আমরা সকলেব সহিত এক আত্মা হইতে পাবি না অথবা বিশ্বপুরুষেব সহিত এবং তাঁহার বিশাল আত্মজ্ঞান, তাঁহার বহুমুখী ইচ্ছা ও তাঁহার সুদূরপ্রসাবী বিশ্ব-উদ্দেশ্যের সহিত এক হইতে পারি না। কাবণ উহা আমাদিগকে অন্যের সহিত পৃথক করিয়া দেয় এবং আমাদিগকে আমাদেব দৃষ্টিতে ও আমাদের কর্ম-প্রবৃত্তিতে সীমাবদ্ধ ও অহংমুখী কবিয়া তোলে। ব্যক্তিত্বের মধ্যে আবদ্ধ থাকিলে আমরা সহানুভূতির দ্বারা অথবা অন্যেব দৃষ্টি ও অনুভব ও সঙ্কল্পের সহিত কোনরকম একটা আপেক্ষিক সামঞ্জস্য কবিযা কেবল একটা সীমাবদ্ধ ঐক্যেই উপনীত হইতে পারি। সকলের সহিত এক হইতে হইলে এবং ভগবান ও তাঁহার বিশ্বগত ইচ্ছার সহিত এক হইতে হইলে আমাদিগকে প্রথমেই নৈর্ব্যক্তিক হইতে হইবে, অহং ও তাহার দাবিসকল হইতে এবং নিজেদের সম্বন্ধে, জগৎ সম্বন্ধে ও অন্যের সম্বন্ধে অহংভাবমূলক দৃষ্টি হইতে মুক্ত হইতে হইবে। আব আমরা ইহা করিতে পারি না যদি না আমাদের সত্তায় এমন একটা কিছু থাকে যাহা ব্যক্তিত্ব হইতে ভিন্ন, অহং হইতে ভিন্ন, যাহা সর্বভূতেব সহিত এক নৈর্ব্যক্তিক আত্মা। অতএব অহংকে লয় করিয়া এই নৈর্ব্যক্তিক আত্মা হওযা, আমাদেব চৈতন্যে এই নৈর্ব্যক্তিক ব্রহ্ম হইয়া উঠা—ইহাই হইতেছে এই যোগেব প্রথম সাধনা।

তাহা হইলে ইহা কেমন করিযা কবিতে হইবে? গীতা বলিয়াছে, প্রথমত বুদ্ধিযোগেব দ্বাবা আমাদেব বিশুদ্ধীকৃত বুদ্ধিকে বিশুদ্ধ অধ্যাত্ম সত্তার সহিত যুক্ত কবিতে হইবে।[১] এই যে বুদ্ধিকে বহির্মুখী ও নিম্নমুখী দৃষ্টি হইতে ফিবাইয়া অন্তর্মুখী ও ঊর্ধ্বমুখী করা, বুদ্ধিব এই আধ্যাত্মিক প্রত্যাবর্তনই হইতেছে জ্ঞানযোগের সাবতত্ত্ব। বিশুদ্ধ বুদ্ধিব দ্বারা সমগ্র সত্তাকেই নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে, আত্মানং নিযম্য, বুদ্ধি দৃঢ় ও অবিচল সঙ্কল্পেব দ্বাবা, ধৃত্যা, আমাদিগকে নিম্নতন প্রকৃতির বহির্মুখী বাসনাব প্রতি আসক্তি হইতে ফিরাইয়া লইবে, সেই সঙ্কল্প একাগ্র হইয়া শুদ্ধ আত্মাব নৈর্ব্যক্তিকতাব সম্পূর্ণ অভিমুখী হইবে। ইন্দ্রিয়গণ শব্দাদি বিষয়সমূহ পবিত্যাগ করিবে, এই সকল বিষয় আমাদেব মনের মধ্যে যে রাগ ও দ্বেষের সৃষ্টি কবে মন তাহা পবিহার করিবে—কারণ নৈর্ব্যক্তিক আত্মার কোন বাসনা নাই, কোন বিদ্বেষ নাই; এই সব হইতেছে বস্তুসকলের স্পর্শে আমাদের প্রাকৃত ব্যক্তিত্বের প্রাণগত প্রতিক্রিয়া, আর বিষয়ের সংস্পর্শে মন ও ইন্দ্রিযের যে উদ্দীপনা তাহাই হইতেছে ঐ সকল প্রতিক্রিয়ার অবলম্বন ও তাহাদের ভিত্তি। মন, বাক্য ও শবীবেব উপব, এমনকি ক্ষুধা, শীত ও উষ্ণবোধ এবং শাবীরিক সুখ-দুঃখ প্রভৃতি প্রাণিক ও শাবীরিক প্রতিক্রিযার উপবেও পূর্ণ কর্তৃত্ব অর্জন করিতে হইবে; আমাদেব সমগ্র সত্তা হওযা চাই উদাসীন, এই সকল জিনিসে অবিচলিত, সকল

[১] বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধযা যুক্তো ধৃত্যাত্মানং নিয়ম্য চ।
শব্দাদীন্ বিষযাংস্ত্যক্ত্বা বাগদ্বেষৌ ব্যুদস্য চ॥১৮।৫১

বাহ্যস্পর্শে এবং তাহাদের আভ্যন্তরীণ প্রতিক্রিয়ায় সমভাবাপন্ন। এইটিই হইতেছে সর্বাপেক্ষা প্রত্যক্ষ ও শক্তিশালী প্রণালী, যোগের সোজা ও খাড়া পথ। চাই বাসনা ও আসক্তির সম্পূর্ণ বিরতি, বৈরাগ্য, সাধককে দৃঢ়তার সহিত নৈর্ব্যক্তিক নির্জনতায় বাস করিতে হইবে, ধ্যানের দ্বারা সর্বদা অন্তরতম আত্মার সহিত যুক্ত হইয়া থাকিতে হইবে।[১] অথচ এই কঠোর তপস্যার উদ্দেশ্য জাগতিক কর্মে যোগ দিবার, দুঃখ সহনে বিমুখ মুনি বা দার্শনিকের ন্যায় একান্তভাবে নিজেকে লইয়াই নির্জনতা ও নিরুদ্বেগের মধ্যে বাস করা নহে; ইহার উদ্দেশ্য হইতেছে সকলপ্রকার অহং দূর করা। প্রথমেই রাজসিক অহংভাব, অহঙ্কারপূর্ণ তেজ ও উগ্রতা, দর্প, বাসনা, ক্রোধ, পরিগ্রহ, বিপুসমূহের উদ্দীপনা এবং জীবনের প্রচণ্ড ভোগ-লালসাসকল সম্পূর্ণভাবে বর্জন করিতে হইবে।[২] কিন্তু তাহার পর সকলপ্রকার অহংভাব, এমনকি সাত্ত্বিক অহংভাবও ত্যাগ করিতে হইবে; কারণ লক্ষ্য হইতেছে আত্মা ও মন ও প্রাণকে শেষ পর্যন্ত সকলপ্রকার সীমাবদ্ধকর "আমি", "আমার" ভাব হইতে মুক্ত করা, নির্ম্মমঃ। অহং এবং অহং-এর সকলপ্রকার দাবি নির্মূল করা—আমাদের সম্মুখে এই সাধনপদ্ধতিই দেওয়া হইয়াছে। কারণ যে শুদ্ধ নৈর্ব্যক্তিক আত্মা অবিচল থাকিয়া এই বিশ্বকে ধরিয়া রহিয়াছে তাহার কোনরূপ অহংভাব নাই, তাহা কোন বস্তু বা কোন ব্যক্তির নিকট কোন কিছু কামনা করে না; তাহা শান্ত, জ্যোতিঃপূর্ণ, নিষ্ক্রিয়, তাহা নিঃশব্দে সকল বস্তু, সকল ব্যক্তিকে দেখে আত্মজ্ঞান ও বিশ্বজ্ঞানের সমতাপূর্ণ ও নিরপেক্ষ দৃষ্টি লইয়া। তাহা হইলে ইহা সুস্পষ্ট যে, অন্তরে অনুরূপ কিংবা ঐ একই নৈর্ব্যক্তিকতার মধ্যে বাস করিয়াই অন্তর্বাসী আত্মা বস্তুসকলের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া সুষ্ঠুভাবে সেই অক্ষর ব্রহ্মের সহিত একত্বলাভে সমর্থ হইতে পারে যাহা বিশ্বের নামরূপ ও পরিবর্তনসকলের দ্রষ্টা ও জ্ঞাতা, কিন্তু সেসব তাহাকে স্পর্শ বা বিচলিত করিতে পারে না।

গীতা এই যে প্রথমেই নৈর্ব্যক্তিকতার সাধনা করিতে উপদেশ দিয়াছে, ইহা স্পষ্টত একটা পূর্ণতম আভ্যন্তরীণ নিস্তব্ধতা লইয়া আসে এবং ইহা ইহার গূঢ়তম অংশে এবং সাধন তত্ত্বে সন্ন্যাসের প্রণালীর সহিত অভিন্ন। তত্রাচ এমন একটা স্থান আছে যেখানে ক্রিয়াত্মিকা প্রকৃতি এবং বাহ্য জগতের দাবি পরিত্যাগ করিবার প্রবৃত্তিকে রোধ করা হইয়াছে এবং যাহাতে আভন্তরীণ নিস্তব্ধতা নিবিড় হইয়া কর্মত্যাগ ও বাহ্য সন্ন্যাসে পরিণত না হয় সেজন্য একটা সীমারেখা টানিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইন্দ্রিয়গণ কর্তৃক তাহাদের বিষয়সমূহের যে পরিবর্জন তাহার স্বরূপ যেন

[১] বিবিক্তসেবী লঘ্বাশী যতবাক্কায়মানসঃ।
ধ্যানযোগপরো নিত্যং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ॥১৮।৫২

[২] অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্।
বিমুচ্য নির্ম্মমঃ শান্তো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥১৮।৫৩

হয় ত্যাগ, ইহা হইবে সকল রস বা ভোগাসক্তি ত্যাগ, কিন্তু ইন্দ্রিয়গণের যে মূল প্রকৃতিগত প্রয়োজনীয় ক্রিয়া তাহার বর্জন নহে। মানুষকে চতুষ্পার্শ্বস্থ বস্তুসকলের মধ্যে বিচরণ করিতে হইবে এবং ইন্দ্রিয়ক্ষেত্রের বিষয়সমূহের উপর শুদ্ধ, সত্য ও প্রগাঢ়, সহজ ও নিরালম্ব ইন্দ্রিয়-ক্রিয়া লইয়া কর্ম করিতে হইবে দিব্য কর্মে আত্মার প্রয়োজন মিটাইতে তাহাদের উপযোগিতার জন্য, আদৌ বাসনা চরিতার্থতার জন্য নহে। বৈরাগ্য চাই, সাধারণ অর্থে জীবনের প্রতি বিরাগ বা সাংসারিক কর্মের উপর বিতৃষ্ণা নহে, পরন্তু "রাগ" বর্জন এবং তাহার বিপরীত "দ্বেষ" বর্জন। মন ও প্রাণের সকলপ্রকার অনুরাগ বর্জন করিতে হইবে, তেমনি মন ও প্রাণের সকলপ্রকার বিদ্বেষও বর্জন করিতে হইবে। আর এইরূপ করিতে বলা হইতেছে নির্বাণের জন্য নহে পরন্তু এমন সিদ্ধতম ও সামর্থ্যপ্রদ সমতার জন্য যাহাতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া আত্মা বস্তুসকল সম্বন্ধে সমগ্র ও ব্যাপক দৃষ্টি এবং প্রকৃতির মধ্যে সমগ্র দিব্য কর্ম উভয়েরই প্রতি অবাধ ও অপরিমেয় সম্মতি প্রদান করিতে পারে। ধ্যানযোগপরায়ণতা, সর্বদা ধ্যানে রত থাকা হইতেছে সুদৃঢ় পন্থা যাহার দ্বারা মানুষের অন্তঃপুরুষ তাহার শক্তিময় সত্তা এবং তাহার নৈঃশব্দ্যময় সত্তা সিদ্ধ করিতে পারে। অথচ শুধুই ধ্যানে মগ্ন হইয়া থাকিবার জন্য কর্মময় জীবন পরিত্যাগ করা চলিবে না, পরম পুরুষের উদ্দেশে যজ্ঞরূপে সকল কর্মই করিতে হইবে। সন্ন্যাস মার্গে এই বৈরাগ্যের সাধনা ব্যষ্টিগত জীবকে শাশ্বত সত্তার মধ্যে মগ্ন হইয়া নিজেকে লয় করিয়া দিবার জন্য প্রস্তুত করিয়া তোলে, আর সাংসারিক জীবন ও কর্মের পরিত্যাগ হইতেছে এই প্রণালীতে একটি অপরিহার্য সোপান। কিন্তু গীতার যে ত্যাগ-পন্থা তাহাতে এইটি হইতেছে আমাদের সমস্ত জীবন ও সত্তাকে এবং সমস্ত কর্মকে ভগবানের শাশ্বততম ও অপরিমেয় সত্তা ও চৈতন্য ও ইচ্ছার সহিত সর্বতোমুখী ঐক্যে পরিণত করার আয়োজন এবং ইহার দ্বারা প্রস্তুত হইয়া জীবের পক্ষে নীচের অহং হইতে পরমা অধ্যাত্ম প্রকৃতি পরা প্রকৃতির অনির্বচনীয় সিদ্ধির মধ্যে প্রশস্ত ও সমগ্রভাবে উঠিয়া যাওয়া সম্ভব হয়।

গীতার চিন্তার এই সুস্পষ্ট নূতন ধারাটি পরের দুইটি শ্লোকে ব্যক্ত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে প্রথমটির পারম্পর্য বিশেষ অর্থসূচক। "যিনি ব্রহ্ম হইয়াছেন, যিনি শোক করেন না, আকাঙ্ক্ষাও করেন না, যিনি সর্বভূতে সমভাবাপন্ন, আমার উপর তাঁহার হয় পরম প্রেম ও ভক্তি।"[১] কিন্তু জ্ঞানযোগের যে সঙ্কীর্ণ পন্থা তাহাতে সগুণ ঈশ্বরের উপর ভক্তি কেবল একটি নিম্নতন ও প্রথম প্রক্রিয়া হইতে পারে; শেষ, চূড়ান্ত পরিণতি হইতেছে নির্গুণ নৈর্ব্যক্তিক ব্রহ্মের সহিত নির্বিশেষ ঐক্যে ব্যক্তিক সত্তার বিলয়, সেখানে ভক্তির কোন স্থান থাকিতে পারে না; কারণ

[১] ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্॥১৮।৫৪

সেখানে কাহাকে ভক্তি কবিতে হইবে, কেই বা ভক্তি কবিবে? সেখানে আব সব কিছুই আত্মাব সহিত জীবের নীবব নিশ্চল তাদাত্ম্যেব মধ্যে বিলুপ্ত হইযা গিযাছে। গীতায আমাদিগকে নৈর্ব্যক্তিক ব্রহ্ম হইতেও বড় কিছু দেওযা হইযাছে—এখানে রহিয়াছেন পবম আত্মা, তিনিই পবম ঈশ্বর, এখানে বহিযাছেন পবম পুরুষ এবং তাঁহাব পবমা প্রকৃতি, এখানে বহিযাছেন পুরুষোত্তম, তিনি সগুণ ও নির্গুণ উভয়েরই উর্ধ্বে এবং তাঁহাব শাশ্বত সমুচ্চ পদে তাহাদেব সমন্বয কবিযাছেন। অহং সত্তা এখানেও নৈর্ব্যক্তিক নীরবতার মধ্যে বিলুপ্ত হইয়া যায, কিন্তু সেই সঙ্গে পশ্চাতে এই নিশ্চল নীরবতাকে আশ্রয কবিযাই থাকে পবম পুরুষেব কর্ম, তিনি নৈর্ব্যক্তিক ব্রহ্ম অপেক্ষা মহত্তব। তখন আর অহং এবং গুণত্রযেব নিম্নতন অন্ধ ও পঙ্গু ক্রিয়া থাকে না, পরন্তু তাহাব পবিবর্তে আসে এক অনন্ত অধ্যাত্ম শক্তিব, এক মুক্ত অপরিমেয় শক্তিব বিশাল স্বনিয়ন্ত্রণশীল ক্রিয়া। সকল প্রকৃতি হয এক অদ্বিতীয় ভগবানের শক্তি, সকল কর্ম হয আধাব ও নিমিত্তস্বরূপ ব্যষ্টিসত্তাব ভিতর দিযা ভগবানের কর্ম। অহং-এব স্থলে সত্য অধ্যাত্ম ব্যক্তি সত্তাটি সচেতন ও প্রকট হইযা সম্মুখে আসে তাহাব প্রকৃত স্বরূপেব স্বাধীনতায, তাহাব স্থিতিব শক্তিতে, ভগবানের সহিত তাহার চিবন্তন সম্বন্ধেব মহিমা ও জ্যোতিতে, তাহা পরম ঈশ্বরের অক্ষয অংশ, পবা প্রকৃতিব অবিনশ্বব শক্তি, মমৈবাংশঃ সনাতনঃ, পরাপ্রকৃতিজীবভূতা। মানুষের অন্তঃপুরুষ তখন এক পবম আধ্যাত্মিক নৈর্ব্যক্তিকতায নিজেকে পুরুষোত্তমের সহিত এক বলিযা অনুভব কবে এবং তাহাব বিশ্বপ্রসাবিত ব্যক্তিত্বে নিজেকে ভগবানেব একটি প্রকট শক্তিরূপে অনুভব করে। তাহার জ্ঞান হয় ভগবানেবই জ্ঞানেব একটা জ্যোতি, তাহাব ইচ্ছা হয ভগবানেরই ইচ্ছাব একটা শক্তি, বিশ্বেব সব কিছুব সহিত তাহাব ঐক্য হয ভগবানেরই শাশ্বত ঐক্যেব একটি লীলা। এই যে যুগ্ম সিদ্ধি, এই যে এক অনির্বচনীয় সত্যেব দুইটি দিকের মিলন (এই দুইটিব যে-কোনটি অথবা দুইটিবই দ্বারা মানুষ তাহার নিজ অনন্ত সত্তাব দিকে অগ্রসব হইতে পাবে, তাহাব ভিতবে প্রবেশ কবিতে পারে)—ইহার মধ্যেই মুক্ত মানবকে বাস কবিতে হইবে, কর্ম করিতে হইবে, অনুভব কবিতে হইবে, সকলেব সহিত এবং তাহাব আত্মাব আভ্যন্তরীণ ও বাহ্য ক্রিয়াসমূহের সহিত তাহাব সম্বন্ধ নির্ধাবিত কবিতে হইবে অথবা তাহাব হইযা তাহাব শ্রেষ্ঠতম সত্তাব মহত্তম শক্তিই তাহা নির্ধাবিত কবিযা দিবে। আব সেই ঐক্যসাধক সিদ্ধিতে উপাসনা, প্রেম, ভক্তি যে তখনও সম্ভব হয শুধু তাহাই নহে পবন্তু তাহারা হয় উচ্চতম উপলব্ধিব উদাব, অবশাম্ভাবী ও কিবীটস্বরূপ অংশ। এক অদ্বিতীয় সত্তা অনন্তকাল ধবিয়া বহু হইতেছে, বহু তাহাদের দৃশ্য বিভেদেব মধ্যেও চিবকাল এক, পবমতম পুরুষ আমাদেব মধ্যে জগতের এই নিগূঢ় তত্ত্ব ও বহস্য প্রকট কবিতেছেন, তিনি তাঁহাব বহুত্বেব দ্বারা বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়েন না, তাঁহাব একত্বেব দ্বাবাও সীমাবদ্ধ নহেন—এই যে সমগ্র জ্ঞান, এই যে সমন্বয-সাধক উপলব্ধি, ইহাই মানুষকে মুক্তস্য কর্ম্ম,

মুক্ত কর্মে সমর্থ কবিযা তোলে।

গীতা বলিযাছে, এই জ্ঞান আসে পরমতম ভক্তি হইতে। ইহা লব্ধ হয় যখন মন বস্তুসকল সম্বন্ধে অতিমানস ও সমুচ্চ অধ্যাত্ম দৃষ্টিব দ্বাবা নিজেকে অতিক্রম কবে, যখন সেই সঙ্গে হৃদযও আমাদেব প্রেম ও ভক্তির অপেক্ষাকৃত অজ্ঞান ও মানসিক রূপকে ছাড়াইযা এমন প্রেমে উন্নীত হয় যাহা শান্ত গভীব এবং প্রশান্ততম জ্ঞানে জ্যোতির্ময, ভগবানে পরম প্রীতি এবং অপবিমেয় ভক্তি লাভ কবে, অবিচল পুলক, অধ্যাত্ম আনন্দ লাভ কবে। জীব যখন তাহার ভেদাত্মক ব্যক্তিকতাকে লয় কবিযাছে, ব্রহ্ম হইযাছে, তখনই সে সত্য পুরুষের মধ্যে বাস কবিতে পাবে এবং পুরুষোত্তমেব প্রতি পরম দৃষ্টিপ্রদ ভক্তি লাভ করিতে পারে এবং তাহাব গভীব ভক্তিব, তাহাব হৃদয়ের জ্ঞানেব শক্তি দ্বাবা পুরুষোত্তমকে পূর্ণতমভাবে জানিতে পাবে। সেইটিই হইতেছে সমগ্র জ্ঞান, যখন হৃদয়েব অতলস্পর্শ দৃষ্টি মনেব চবমতম উপলব্ধিকে পূর্ণ করিয়া তোলে—সমগ্রং মাং জ্ঞাত্বা। গীতা বলিযাছে, "আমি কি এবং কতখানি তাহা তিনি জানিতে পারেন, আমাব সত্তাব সকল সত্যে ও তত্ত্বে তিনি আমাকে জানিতে পারেন, যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ"।[১] এই যে সমগ্র জ্ঞান, ইহা হইতেছে ব্যষ্টিব মধ্যে অবস্থিত ভগবানেব জ্ঞান; ইহা মানুষেব হৃদযে গুপ্তভাবে অধিষ্ঠিত ঈশ্বরের সম্পূর্ণ উপলব্ধি, তিনি এখন প্রকাশিত হন তাহার জীবনের পবমতম সত্তারূপে, তাহার সকল জ্ঞানালোকিত চৈতন্যেব সূর্যরূপে, তাহাব সকল কর্মেব অধীশ্বর ও শক্তি রূপে, তাহাব অন্তবাত্মাব সকল প্রেম ও প্রীতির দিব্য উৎসরূপে, তাহার পূজা ও উপাসনাব দিব্য প্রেমিক ও প্রিযরূপে। এই জ্ঞান বিশ্বমাঝে ব্যাপ্ত ভগবানেরও জ্ঞান, এই জ্ঞান সেই শাশ্বত পুরুষেব যাঁহা হইতে সবকিছুব প্রবৃত্তি এবং যাঁহার মধ্যে সবকিছু বাস কবিতেছে, সকলেব সত্তা বিধৃত বহিয়াছে, এই জ্ঞান বিশ্বের অন্তঃপুরুষ ও আত্মাব, এই জ্ঞান বাসুদেবের যিনি যাহাকিছু আছে সবই হইয়াছেন, এই জ্ঞান বিশ্বেব অধীশ্ববেব যিনি প্রকৃতিব সকল কর্মের উপর অধ্যক্ষতা কবিতেছেন। এই জ্ঞান আপন বিশ্বাতীত শাশ্বত পদে জ্যোতিষ্মান দিব্য পুরুষের জ্ঞান, তাঁহাব সত্তাব রূপ মনের চিন্তাব অগোচব কিন্তু মনেব নৈঃশব্দ্যের অগোচর নহে, ইহা হইতেছে কৈবল্যাত্মক সত্তারূপে, পবম ব্রহ্ম, পরম পুরুষ, পবম ভগবান রূপে পূর্ণভাবে, জীবন্তভাবে তাঁহাকে উপলব্ধি করা; কাবণ সেই আপাত-অজ্ঞেয় কৈবল্যাত্মক সত্তা সেই সঙ্গেই এবং সেই উচ্চতম পদেই হইতেছেন বিশ্বকর্মধারার উৎপত্তিস্বরূপ আত্মা এবং এই সর্বভূতেব ঈশ্বব। মুক্ত পুরুষেব অন্তরাত্মা এইভাবে পুরুষোত্তমেব মধ্যে প্রবেশ কবে সমন্বযসাধক জ্ঞানেব দ্বারা এবং তাঁহাব অন্তঃস্থলে স্থান পায বিশ্বাতীত ভগবানে, ব্যষ্টিগত ভগবানে এবং বিশ্বগত ভগবানে পূর্ণতম

১ ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্॥১৮।৫৫

যুগপৎ প্রীতির দ্বারা। সে তাহার আত্মজ্ঞানে এবং আত্মোপলব্ধিতে তাঁহার সহিত এক হয়, তাহার সত্তায়, চৈতন্যে, ইচ্ছায়, জগৎ-জ্ঞানে ও জগৎ-প্রেরণায় তাঁহার সহিত এক হয়, বিশ্বে এবং বিশ্ববাসী সকল জীবের সহিত তাহার ঐক্যে সে তাঁহার সহিত এক হয় এবং জগতের ও ব্যষ্টির অতীতে অব্যয় শাশ্বত পদে তাঁহার সহিত এক হয়। যে পরম ভক্তি পরম জ্ঞানের অন্তরতম, ইহাই হইতেছে তাহার চরম পরিণতি।

আর এখন ইহা সুস্পষ্ট বুঝা যায় কেমন করিয়া কর্ম, জীবনের কর্মরাজির কোন অংশের হ্রাস বা বর্জন না করিয়া নিরবচ্ছিন্ন ও অবিরাম ও সকলপ্রকার কর্ম পরমতম আধ্যাত্মিক উপলব্ধির সম্পূর্ণ অবিরুদ্ধ হইতে পারে শুধু তাহাই নহে, পরন্তু ভক্তি বা জ্ঞানের ন্যায়ই এই উচ্চতম অধ্যাত্ম স্থিতিতে পৌঁছিবার একটি শক্তিশালী সাধন হইতে পারে। এ বিষয়ে গীতার উক্তি অতিশয় সুস্পষ্ট। "আর আমাকে আশ্রয় করিয়া সর্বদা সর্ব কর্ম করিয়াও তিনি আমার প্রসাদে শাশ্বত অব্যয় পদ প্রাপ্ত হন।"[১] এই যে মুক্তিপ্রদ কর্ম ইহা স্বরূপত হইতেছে আমাদের মধ্যে এবং বিশ্বের মধ্যে যে ভগবান রহিয়াছেন তাঁহার সহিত আমাদের সঙ্কল্পের এবং আমাদের প্রকৃতির সকল কর্মপ্রবণ অংশের গভীরতম যোগে সম্পাদিত কর্ম। প্রথমে ইহা করা হয় যজ্ঞরূপে, তখন আমাদের "আমি কর্তা" এইরূপ ভাব থাকে। তাহার পর ইহা করা হয় ঐ ভাব হইতে মুক্ত হইয়া এবং প্রকৃতিই সব করিতেছে এই উপলব্ধি লইয়া। শেষকালে প্রকৃতি ভগবানের পরা শক্তি এই জ্ঞান লইয়া এবং আমাদের সকল কর্ম তাঁহাতে সন্ন্যাস করিয়া, সমর্পণ করিয়া, ব্যক্তিগত সত্তাকে কেবলমাত্র যন্ত্র করিয়া, আধার করিয়া কর্ম করা হয়। আমাদের কর্ম তখন সাক্ষাৎভাবে আমাদের অন্তরস্থ আত্মা ও ভগবান হইতে প্রবর্তিত হয়, তাহা হয় অবিভক্ত বিশ্বকর্মেরই একটি অংশ, তাহা আরব্ধ হয়, সম্পাদিত হয় আমাদের দ্বারা নহে পরন্তু এক বিশাল বিশ্বাতীত শক্তির দ্বারা। আমরা যাহা কিছু করি সেসবই করা হয় আমাদের হৃদ্দেশে অধিষ্ঠিত ঈশ্বরের জন্য, ব্যষ্টির মধ্যে ভগবানের জন্য, আমাদের মধ্যে তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য, জগতের মধ্যে ভগবানের জন্য, সর্বভূতের কল্যাণের জন্য, বিশ্ব-কর্ম এবং বিশ্ব-উদ্দেশ্য সম্পন্ন করিবার জন্য, অথবা এক কথায় পুরুষোত্তমের জন্য এবং তাহা বস্তুত তাঁহারই দ্বারা তাঁহার বিশ্ব-শক্তির ভিতর দিয়া সম্পাদিত হয়। এইসকল দিব্য কর্ম, তাহাদের রূপ বা বাহ্য স্বরূপ যাহাই হউক না কেন, বদ্ধ করিতে পারে না, পরন্তু তাহারাই হয় এই ত্রিগুণাত্মিকা নিম্নতন প্রকৃতি হইতে পরমা, দিব্য ও অধ্যাত্ম প্রকৃতির পূর্ণতার মধ্যে উঠিবার শক্তিশালী সাধন। এই সকল মিশ্রিত ও সঙ্কীর্ণ ধর্ম হইতে বিমুক্ত হইয়া আমরা অমৃত ধর্মে উত্তীর্ণ হইতে পারি, তাহা আমাদিগকে অধিকার করে

[১] সর্ব্বকর্ম্মাণ্যপি সদা কুর্ব্বাণো মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ।
মৎপ্রসাদাদবাপ্নোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ম্॥১৮।৫৬

যখন আমরা আমাদের সকল চৈতন্যে ও কর্মে নিজদিগকে পুরুষোত্তমের সহিত এক করিয়া দিই। এখানে সেই ঐক্য যেখানে কালের অতীতে অমৃতত্বের মধ্যে উঠিবার শক্তি লইয়া আসে সেখানে আমরা তাঁহার শাশ্বত অব্যয় পদে বাস করিব।

অতএব গুরু ইতিপূর্বেই যে জ্ঞান দিয়াছেন তাহার আলোকে এই সাতটি শ্লোক অভিনিবেশ সহকারে পঠিত হইলে এইগুলির মধ্যেই আমরা গীতার যোগের সমগ্র তত্ত্বটি, সম্পূর্ণ মূল পদ্ধতিটি, সমস্ত সারমর্মটি সংক্ষেপে অথচ ব্যাপকভাবে প্রাপ্ত হই।

দ্বাবিংশ অধ্যায়

পরম রহস্য

দিব্য গুরু শিষ্যকে তাহার কর্ম ও যুদ্ধেব ক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে তাঁহাব শিক্ষা ও যোগের সার তত্ত্বটি এইভাবে প্রদান কবিযাছেন, এখন তিনি সেইটি তাহাব কর্ম সমস্যার মীমাংসায প্রযোগ কবিতে অগ্রসব হইলেন, কিন্তু এমনভাবে যেন উহা সকল কর্মেব মীমাংসাতেই প্রযুক্ত হইতে পাবে। একটি বিশিষ্ট দৃষ্টান্তেব সহিত সংশ্লিষ্ট, কুরুক্ষেত্রেব নাযকের প্রতি উক্ত এই কথাগুলিব সার্থকতা অনেক বেশি ব্যাপক এবং যাহারা সাধারণ মানসপ্রকৃতিব উর্ধ্বে উঠিতে এবং উচ্চতম অধ্যাত্ম চৈতন্যেব মধ্যে বাস কবিতে, কর্ম কবিতে প্রস্তুত হইযাছে তাহাদের পক্ষে এইগুলি হইতেছে একটি সার্বভৌমিক সাধাবণ বিধান। অহং এবং ব্যক্তিগত মনেব গণ্ডি ভাঙিয়া ফেলা এবং সবকিছুকেই আত্মার প্রসাবতাব মধ্যে দর্শন কবা, ভগবানকে জানা এবং তাঁহাকে তাঁহার সমগ্র সত্যে এবং তাঁহাব সকল ভাবে উপাসনা কবা, প্রকৃতি ও বিশ্বসত্তার বিশ্বাতীত অন্তঃপুরুষেব নিকট নিজেকে সমগ্রভাবে সমর্পণ কবা, দিব্য চৈতন্যকে অধিকাব করা এবং তাহাব দ্বারা অধিকৃত হওযা, প্রেম, আনন্দ, সঙ্কল্প ও জ্ঞানেব সর্বব্যাপকতায অদ্বিতীয একেব সহিত এক হওযা, তাঁহার মধ্যে সকল জীবের সহিত এক হওয়া, যেখানে সবই ভগবান সেই জগতের দিব্য ভিত্তিব উপর দাঁড়াইয়া এবং মুক্ত আত্মাব দিব্য স্থিতি লাভ কবিযা উপাসনা ও যজ্ঞরূপে কর্ম করা—ইহাই হইতেছে গীতাব যোগেব মর্মকথা। ইহা হইতেছে আমাদেব সত্তার আপাতদৃষ্ট সত্য হইতে পরম অধ্যাত্ম ও প্রকৃত সত্যে সংক্রমণ এবং সাধক ইহার মধ্যে প্রবেশ কবে ভেদাত্মক চৈতন্যেব বহু খণ্ডতা বর্জন করিযা এবং বিপুর বিক্ষোভ ও অস্থিবতা ও অজ্ঞানেব প্রতি, ন্যূনতব জ্যোতি ও জ্ঞানের প্রতি, পাপ ও পুণ্যেব প্রতি, নিম্নতন প্রকৃতিব দ্বৈধ ধর্ম ও আদর্শেব প্রতি মনের আসক্তি বর্জন কবিয়া। অতএব গুরু বলিলেন, "নিজেকে সম্পূর্ণভাবে আমাতে অভিনিবিষ্ট কবিযা, তোমাব সচেতন মনে তোমাব সকল কর্ম আমাতে অর্পণ কবিয়া এবং বুদ্ধিযোগ আশ্রয় করিয়া সর্বদা হৃদয়ে ও চৈতন্যে আমাব সহিত এক হইযা থাক।[১] যদি তুমি সকল সময়ে ঐ ভাবে থাক, তাহা হইলে আমাব

[১] চেতসা সর্ব্বকর্ম্মাণি মযি সংন্যস্য মৎপবঃ।
বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য মচ্চিত্তঃ সততং ভব॥
মচ্চিত্তঃ সর্ব্বদুর্গাণি মৎপ্রসাদাৎ তবিষ্যসি।
অথ চেৎ ত্বমহঙ্কাবান্ন শ্রোষ্যসি বিনঙ্ক্ষ্যসি॥
যদহঙ্কাবমাশ্রিত্য ন যোৎস্য ইতি মন্যসে।
মিথ্যেষ ব্যবসাযস্তে প্রকৃতিস্ত্বাং নিযোক্ষ্যতি॥১৮।৫৭-৫৯

প্রসাদে তুমি সকল দুর্গম ও সঙ্কটময পথ নিবাপদে অতিক্রম করিবে; কিন্তু অহংভাবেব বশে যদি না শুন, তুমি বিনষ্ট হইবে। অহংভাবের বশে তুমি যে মনে কবিতেছ 'আমি যুদ্ধ কবিব না', তোমার এ সঙ্কল্প বৃথা, তোমার প্রকৃতি তোমাকে তোমাব কর্মে নিযুক্ত কবিবেই। মোহেব বশে তুমি যাহা না করিতে ইচ্ছা করিতেছ, তোমাব স্বভাবজাত নিজ কর্মেব দ্বাবা বদ্ধ হইয়া অবশভাবে তোমাকে তাহা কবিতেই হইবে। হে অর্জুন, ঈশ্বব সর্বভূতের হৃদ্দেশে অধিষ্ঠিত বহিয়াছেন এবং মাযা দ্বাবা যন্ত্রাকাঢ সর্বভূতকে ঘুবাইতেছেন। তোমাব সত্তাব সকল ভাবে তাঁহারই শবণাগত হও, তাঁহাব অনুগ্রহে তুমি পবম শান্তি ও শাশ্বতপদ প্রাপ্ত হইবে।"[১]

এই পংক্তিগুলিব মধ্যেই এই যোগের অন্তরতম মর্মটি নিহিত বহিযাছে এবং ইহাব চূড়ান্ত উপলব্ধিব নির্দেশও এখানে রহিযাছে এবং আমাদিগকে এইগুলিকে ইহাদেব অন্তবতম অর্থে ও সেই সমুচ্চ উপলব্ধিব সমগ্র ব্যাপকতায় হৃদযঙ্গম কবিতে হইবে। এই কথাগুলিব দ্বাবা ভগবানেব সহিত মানবের পূর্ণতম, ঘনিষ্ঠতম ও জীবন্ত সম্বন্ধটি অভিব্যক্ত হইযাছে; এইগুলি সেই হৃদ্‌গত ধর্মভাবের সংহত শক্তিতে নিবিডভাবে অনুপ্রাণিত যাহা মানুষেব পরা অনুরক্তি হইতে—যে বিশ্বাতীত ও বিশ্বময ভগবান হইতে সে আসিয়াছে এবং যাঁহার মধ্যে সে বাস কবিতেছে তাঁহাব প্রতি তাহাব সমগ্র জীবনের ঊর্ধ্বমুখী সমর্পণ ও পূর্ণতম আত্মনিবেদন হইতে উদ্ভূত হয়। গীতা শ্রেষ্ঠতম কর্মেব অন্তরতম ভাব ও প্রেবণাকপে এবং শ্রেষ্ঠতম জ্ঞানেব চূড়া ও সাববস্তুকপে ভক্তিকে, ভগবানের প্রতি প্রেমকে, পবমতমেব উপাসনাকে যে সমুচ্চ ও স্থাযী স্থান দিয়াছে তাহাব সহিত এই হৃদযাবেগেব সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য বহিযাছে। যে সকল বাক্য ব্যবহৃত হইয়াছে এবং সেগুলি যে অধ্যাত্ম ভাবাবেগে স্পন্দিত তাহাবা ভগবানের ব্যক্তিগত সম্বন্ধের সত্য এবং ব্যক্তিগত সত্তাকেই প্রগাঢতম ভাবে পরিস্ফুট কবিযাছে এবং উচ্চতম সার্থকতা দিযাছে বলিযা মনে হয। দার্শনিকদেব পরিকল্পিত কোন নির্বিশেষ ব্রহ্ম অথবা কোন উদাসীন নৈর্ব্যক্তিক সত্তা অথবা সকলপ্রকার সম্বন্ধ অগ্রাহ্য করে এমন কোন অনির্বচনীয নৈঃশব্দ্যেব নিকট আমাদেব সকল কর্মের এইরূপ পরিপূর্ণ সমর্পণ কবা যায না এবং আমাদেব সচেতন সত্তার সকল অংশে তাহার সহিত এইরূপ ঘনিষ্ঠতা এবং একত্বের অন্তবঙ্গতাকে আমাদেব পূর্ণতালাভেব শর্ত ও বিধান কবা যায না অথবা তাহাব নিকট হইতে এইরূপ দিব্য সাহায্য ও অভযদান ও উদ্ধাবসাধনেব প্রতিজ্ঞাবাণী আশা কবা যায় না। যিনি আমাদের সকল কর্মের

[১] স্বভাবজেন কৌন্তেয নিবদ্ধঃ স্বেন কর্ম্মণা।
কর্ত্তুং নেচ্ছসি যন্মোহাৎ কবিষ্যস্যবশোঽপি তৎ॥
ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রাকাঢানি মাযযা॥
তমেব শবণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভাবত।
তৎপ্রসাদাৎ পবাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্॥১৮।৬০-৬২

অধিনেতা, আমাদেব অন্তরাত্মাব সুহৃদ্ ও প্রিয়, আমাদেব জীবনেব অন্তবস্থ অধ্যাত্ম সত্তা ও প্রকৃতির অন্তর্বাসী ও ঊর্ধ্ববাসী অধীশ্বর কেবল তিনিই আমাদিগকে এই অন্তবঙ্গ ও মর্মস্পর্শী আশাব বাণী শুনাইতে পাবেন। অথচ সাত্ত্বিক কিংবা অন্যরূপে অহংভাবাপন্ন মনের মধ্যে যে মানুষ বহিযাছে তাহাব সহিত ইষ্টদেবতাব যে সম্বন্ধ লৌকিক ধর্মসকল স্থাপন কবে ইহা সেই সাধাবণ সম্বন্ধ হইতে বিভিন্ন বস্তু; ভগবানেব কোন বিশেষ রূপ ও ভাবকে ইষ্টদেবতারূপে ঐ মনের দ্বারাই সৃষ্ট করা হয অথবা তাহার সীমাবদ্ধ আদর্শ, অভীপ্সা বা বাসনাকে তৃপ্ত করিবার জন্য তাহাকে দেওয়া হয। সাধাবণ মানসধর্মী মানবেব যে ভগবদ্‌ভক্তি ইহাই হইতেছে তাহাব সাধাবণ অর্থ ও বাস্তব রূপ, কিন্তু এখানে রহিয়াছে একটি ব্যাপকতর জিনিস, তাহা মন এবং তাহাব সীমা ও ধর্মসকলেব অতীত। যে মন অর্পণ কবে তাহা অপেক্ষা ইহা গভীবতর এবং যে ইষ্ট দেবতা এই সমর্পণ গ্রহণ করে তাহা অপেক্ষাও ইহা মহত্তব।

এখানে আত্মসমর্পণ করে জীব, মানুষের মূল আত্মা, তাহাব আদি, কেন্দ্রীয ও অধ্যাত্ম সত্তা, ব্যষ্টি পুরুষ। খণ্ডতাসাধক ও অজ্ঞান অহংভাব হইতে মুক্ত জীবই এই আত্মসমর্পণ করে, সে নিজেকে জানিতে পাবে পৃথক ব্যক্তিসত্তারূপে নহে পরন্তু ভগবানের সনাতন অংশ ও শক্তি ও অধ্যাত্ম বিবর্তন, অংশঃ সনাতনঃ, এইরূপ জীব অজ্ঞানের অপসারণেব ফলে মুক্ত ও উন্নীত, তাহাব যে নিজ সত্য ও পরম প্রকৃতি শাশ্বতেব প্রকৃতির সহিত এক তাহাবই জ্যোতি ও স্বাধীনতায প্রতিষ্ঠিত। আমাদের মধ্যে এই কেন্দ্রীয অধ্যাত্ম সত্তাই এইভাবে আমাদেব জীবনের মূল ও আধার ও নিযন্তা আত্মা ও শক্তিব সহিত আনন্দ ও মিলনেব পূর্ণ ও নিবিড়ভাবে সত্য সম্বন্ধে আবদ্ধ হয। আর যিনি আমাদেব আত্মসমর্পণ গ্রহণ করেন তিনি কোন খণ্ড দেবতা নহেন, পবন্তু তিনি পুরুষোত্তম, এক অদ্বিতীয শাশ্বত ভগবান, যাহাকিছু আছে সেসবেব এবং সকল প্রকৃতিব পবাৎপব আত্মা, জগতের আদি, বিশ্বাতীত অধ্যাত্ম সত্তা। আমাদেব বিমুক্ত জ্ঞানের উপলব্ধিব সম্মুখে তাঁহাব প্রথম স্পষ্ট অধ্যাত্ম প্রকটন হইতেছে এক অক্ষব নৈর্ব্যক্তিক স্বপ্রতিষ্ঠ সত্তা, ইহাই তাঁহার উপস্থিতিব প্রথম লক্ষণ, তাঁহাব সাবসত্তাব প্রথম স্পর্শ ও চিহ্ন। তাঁহার নিজ সত্তাব দুর্জ্ঞেয় গুপ্ত বহস্য হইতেছে এক বিশ্বময় ও বিশ্বাতীত অনন্ত ব্যক্তি বা পুরুষ, মনের সৃষ্ট রূপে তাঁহাকে চিন্তা কবা যায না, অচিন্ত্য-রূপ, কিন্তু তিনি আমাদেব চৈতন্যেব শক্তিবাজি, ভাবাবেগ, সঙ্কল্প ও জ্ঞানের নিকট অন্তবঙ্গ ও প্রত্যক্ষ হন যখন এইগুলি নিজদিগকে অতিক্রম কবিযা, তাহাদের অন্ধ ও ক্ষুদ্র রূপসকলকে অতিক্রম করিযা এক ভাস্বব অধ্যাত্ম, এক অপরিমেয় অতিমানস আনন্দ ও শক্তি ও দৃষ্টিব মধ্যে উন্নীত হয। যিনি অনির্বচনীয় কৈবল্যাত্মক সত্তা, অথচ সুহৃদ, ঈশ্বব, জ্ঞানদাতা, প্রেমিক, তিনিই এই পূর্ণতম ভক্তি ও উপাসনার, এই ঘনিষ্ঠতম আভ্যন্তবীণ বিবর্তন ও সমর্পণেব পাত্র। এই মিলন, এই সম্বন্ধ—ইহা খণ্ডতাসাধক মনেব রূপ ও নিযমসকলেব ঊর্ধ্বে

উন্নীত বস্তু, এই সব নিম্নতন ধর্মের অতি উচ্চে; ইহা হইতেছে আমাদের আত্মা ও অধ্যাত্ম সত্তাব সত্য। অথচ, সেই জন্যই, যাহাকিছু মন এবং প্রাণেব লক্ষ্যেব বিষয, যাহাকিছু তাহাবা নিজেদেব মধ্যে প্রচ্ছন্ন এবং অপূর্ণ সার্থকতারূপে বহন কবে, এই সত্য সেসবেব বিবোধী নহে, পবন্তু এইটিই হইতেছে তাহাদেব সংসিদ্ধি, কাবণ ইহা আমাদেব আত্মা ও অধ্যাত্ম সত্তার সত্য, যে পবমাত্মা হইতে সবকিছু আসিযাছে, যাঁহাব দ্বাবা এবং যাঁহাব সম্ভূতি ও আভাসরূপে সবকিছু বর্তিয়া বহিযাছে, কর্ম ও আয়াস কবিতেছে তাঁহাব সহিত ইহার একত্বের সত্য। অতএব আমবা এখন যাহাকিছু হইযাছি সেসবেব নির্বাণের দ্বারা নহে, বর্জন ও প্রত্যাখ্যানেব দ্বাবা নহে, পবন্তু অজ্ঞান ও অহং-এরই নির্বাণের দ্বারা, বর্জন ও প্রত্যাখ্যানেব দ্বাবা এবং তাহাবই পবিণাম স্বরূপ আমাদের জ্ঞান ও সঙ্কল্প ও হৃদযাকাঙ্ক্ষার অনির্বচনীয সংসিদ্ধিব দ্বারা আমাদেব সবকিছু লইয়া ভগবানের মধ্যে, শাশ্বতেব মধ্যে উন্নত ও সীমাহীন ভাবে বাস করিযা, নিবসিষ্যসি ময্যেব, এক মহত্তব আভ্যন্তরীণ স্থিতিতে আমাদের সকল চৈতন্যের রূপান্তর ও প্রতিষ্ঠা কবিযাই এই পবম সিদ্ধি এবং আত্মাব মধ্যে এই বিমুক্তি প্রাপ্ত হওযা যায।

নিম্নতন প্রকৃতিতে অহং-এব যে অজ্ঞান জীবন এবং বিমুক্ত জীবের তাহার নিজ সত্য অধ্যাত্ম প্রকৃতিতে যে উদাব ও জ্যোতির্ময় জীবন, এতদুভযের মধ্যে নিবতিশয পার্থক্যটিকে ধবিযাই হইতেছে অধ্যাত্ম সমস্যাটির নিগূঢ়তা এবং ইহার জন্যই এই রূপান্তবেব প্রকৃত স্বরূপটি সাধাবণ মানবমনের পক্ষে ধারণা করা এত কঠিন হয। প্রথমটিব পবিবর্জন সম্পূর্ণ হওয়া চাই। দ্বিতীয়টিতে উত্তরণ চূড়ান্ত হওযা চাই। এই পার্থক্যটিব উপবেই গীতা এখানে যতদূর সম্ভব জোর দিয়াছে। একদিকে বহিযাছে চৈতন্যেব এই ক্ষুদ্র ভ্রান্ত দাম্ভিক অহমিকা, অহঙ্কৃত ভাব, এই ক্ষুদ্র নিঃসহায ভেদাত্মক ব্যক্তিসত্তাব পঙ্গুকব সঙ্কীর্ণতা, ইহাবই দৃষ্টি লইয়া আমবা সাধাবণত চিন্তা করি, কর্ম কবি, অনুভব করি, জীবনের স্পর্শসমূহে সাড়া দিই। আব অপব দিকে বহিয়াছে মৃত্যুহীন পূর্ণতা, আনন্দ ও জ্ঞানেব বিশাল অধ্যাত্ম ভূমি, সেখানে আমবা প্রবেশলাভ কবিতে পাই ভগবানেব সহিত মিলনের ভিতর দিযা, তখন আমবা হই শাশ্বত জ্যোতির মধ্যে তাঁহাবই প্রকটন ও অভিব্যক্তি, তখন আব আমবা অহং-প্রকৃতিব অন্ধকাবেব মধ্যে প্রচ্ছন্ন নহি। গীতায সততম্ মচ্চিত্তঃ বলিতে এই মিলনেব সম্পূর্ণতাই বুঝান হইয়াছে। অহং-এর জীবনের প্রতিষ্ঠা হইতেছে মন প্রাণ দেহ লইযা গঠিত বাহ্য সত্যের উপব, প্রকৃতিব সহিত ব্যষ্টিগত আত্মাব ব্যবহাবিক সম্বন্ধসমূহের গ্রন্থিব উপর, আমাদের মধ্যে ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ "আমি" বিশ্বেব বিবাট কর্মধারাব মধ্যে তাহার সঙ্কীর্ণ স্বতন্ত্র ব্যক্তিসত্তার ধাবণা ও বাসনাসকলকে বক্ষা কবিবাব জন্য, তৃপ্ত কবিবার জন্য বস্তুসকলের যে বুদ্ধিগত, ভাবগত ও ইন্দ্রিয়ানুভূতিগত অর্থ করে তাহারই উপর। আমাদের সকল ধর্মবাজি, যেসব সাধাবণ প্রতিমানের দ্বাবা আমরা বস্তু সম্বন্ধে আমাদেব দৃষ্টি এবং আমাদেব জ্ঞান এবং আমাদেব কর্ম নির্ধারণ কবি, সেসবই চলে এই সঙ্কীর্ণ ও

সীমাবদ্ধ ভিত্তিব উপর, আর তাহাদেব অনুসরণে আমাদেব অহংকে কেন্দ্র কবিযা আমবা যত বিস্তৃতভাবেই ঘুরি না কেন, আমবা কিছুতেই এই ক্ষুদ্র গণ্ডিব বাহিবে যাইতে পাবি না। এই গণ্ডিব মধ্যেই জীবাত্মা হইতেছে চিবকাল প্রকৃতিব মিশ্র প্রেরণাসমূহেব অধীন, সে সন্তুষ্টভাবে বন্দী হইযা থাকে অথবা মুক্তিব জন্য সংগ্রাম কবে।

কারণ এই চক্রে পুরুষ নিজেকে আবৃত বাখে, নিজেব দিব্য ও অমৃত সত্তাকে অজ্ঞানে আবৃত বাখে, এক নির্বন্ধপরা সীমাবদ্ধকবণী প্রকৃতিব নিযমেব বশবর্তী হয়। সেই নিয়ম হইতেছে গুণত্রযেব দুর্লঙ্ঘ্য নীতি। ইহা হইতেছে ত্রিধা সোপান, দিব্য জ্যোতিব দিকে উঠিতে অক্ষম প্রযাস কবে কিন্তু সেখানে পৌঁছিতে পাবে না। ইহার ভিত্তিতে বহিয়াছে জডত্বেব নিযম বা ধর্ম, তামসিক মানব আচাবমূলক গতানুগতিক ক্রিয়ায় তাহাব জড প্রকৃতির এবং তাহাব আংশিক মানস-ধর্মী প্রাণিক ও ঐন্দ্রিয় প্রকৃতির ইঙ্গিত ও প্রেরণাসকল এবং প্রবৃত্তি-চক্র জডেব মত অনুসবণ করে। মধ্যস্থলে গতিব ধর্ম আসিয়া কাজ কবে, বাজসিক মানব হইতেছে প্রাণগত, বেগময, সক্রিয—সে নিজেকে তাহাব জগৎ ও পরিবেষ্টনীব উপব চাপাইযা দিতে প্রয়াস কবে, পবন্তু কেবল তাহাব দুবন্ত বিপু, বাসনা এবং অহমিকাসকলেব পীড়াদাযক ভাব এবং দুঃসহ প্রভুত্ব বাডাইযা তোলে, তাহাব অস্থির স্বৈব ইচ্ছাব বোঝা, তাহাব রাজসিক প্রকৃতির প্রভুত্ব বাডাইযা তোলে। ঊর্ধ্বস্তবে সুসমঞ্জস নিয়ন্ত্রণেব ধর্ম জীবনেব উপব চাপ দেয, সাত্ত্বিক মানব তাহাব যুক্তিমূলক জ্ঞান, উদাব হিতকারিতা বা গতানুগতিক পুণ্যেব আদর্শসকল স্থাপন কবিতে ও অনুসবণ কবিতে চেষ্টা কবে, তাহার ধর্মশাস্ত্র দর্শনশাস্ত্র ও নীতিশাস্ত্র, মনেব দ্বাবা সৃষ্ট বিধিবিধান, চিন্তা ও আচরণেব বাঁধাধবা পথ অনুসবণ কবিতে চেষ্টা কবে—জীবনের সমগ্র অর্থের সহিত এসবেব মিল হয না, সেজন্য বৃহত্তব বিশ্ব উদ্দেশ্যের গতিধাবায তাহাবা পুনঃপুনঃ ভাঙ্গিযা পডে। গুণত্রযেব পবিধিব মধ্যে সাত্ত্বিক মানবের ধর্মই হইতেছে শ্রেষ্ঠতম, কিন্তু উহাও হইতেছে একটা সঙ্কীর্ণ দৃষ্টি, একটা খর্বিত আদর্শ। ইহাব অপূর্ণ ইঙ্গিতগুলি কেবল একটা ক্ষুদ্র ও আপেক্ষিক পূর্ণতার দিকেই লইয়া যাইতে পাবে, উদাবভাবাপন্ন ব্যক্তিগত অহং সাময়িকভাবে ইহাতে তৃপ্তিলাভ করিতে পাবে, কিন্তু ইহা আত্মাব সমগ্র সত্যেব উপব প্রতিষ্ঠিত নহে, প্রকৃতিবও সমগ্র সত্যেব উপব প্রতিষ্ঠিত নহে।

আর প্রকৃতপক্ষে মানুষের যে বাস্তব জীবন তাহা কখনও এই জিনিসগুলিব কেবল কোন একটিই নহে, তাহা প্রকৃতিব প্রথম স্থূল নিযমেব যন্ত্রবৎ গতানুগতিক অনুসরণ নহে, অথবা কর্মিষ্ঠ সত্তার দ্বন্দ্বময প্রযাসও নহে অথবা সচেতন জ্যোতি, বুদ্ধি, শুভ ও জ্ঞানেব বিজযী অভ্যুদযও নহে। সেখানে বহিযাছে এই সব ধর্মগুলিরই একটা মিশ্রণ, ইহার মধ্য হইতে আমাদেব সঙ্কল্প ও বুদ্ধি অল্পাধিক যথেচ্ছভাবেই একটা আদর্শ বচনা করিয়া সেইটিকে কার্যত সিদ্ধ কবিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করে, কিন্তু বিশ্বপ্রকৃতিব অন্যান্য অনিবার্য জিনিসসকলেব সহিত একটা

আপোস না কবিলে তাহা বস্তুত কখনও সিদ্ধ হয না। আমাদের জ্ঞানদীপ্ত সঙ্কল্প ও বুদ্ধিব যেসব সাত্ত্বিক আদর্শ সেগুলি হয়ত নিজেবাই অসম্পূর্ণ, বড় জোব ক্রমশ সম্পূর্ণতাব দিকে অগ্রসব হয়, অনবরত তাহাদেব ত্রুটি বাহির হয়, তাহাদিগকে পবিবর্তিত কবিযা চলিতে হয, নতুবা যদি তাহাবা স্বরূপত পূর্ণ হয়, সেগুলিকে কেবল অনধিগম্য আদর্শরূপেই অনুসবণ কবা যায়, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কার্যত তাহাবা অবহেলিত হয় অথবা কেবলমাত্র আংশিক প্রভাব বিস্তাব কবিতেই কৃতকার্য হয। আব কখনো কখনো আমরা যে মনে করি আমবা সেসব সম্পূর্ণভাবেই অধিগত কবিযাছি, তাহার কাবণ আমরা আমাদের মধ্যে অন্যান্য শক্তি ও প্রেবণাসকলের অবচেতন ও অর্ধচেতন মিশ্রণকে দেখি না, আমাদের কার্যেব পশ্চাতে এইগুলি হইতেছে আদর্শেবই সমান বাস্তব শক্তি, অথবা তাহা অপেক্ষাও অধিক। সেই আত্ম-অজ্ঞান হইতেই আসে মানবীয বুদ্ধি ও পুণ্যাভিমানেব ব্যর্থতা, মানুষেব সাধুতাব নিষ্কলঙ্ক শুভ্রবেশের পশ্চাতে থাকে এই প্রচ্ছন্ন কৃষ্ণ আববণ এবং ইহাব দ্বাবাই জ্ঞান ও সুকৃতিব ভ্রান্ত অহমিকা সম্ভব হয়। মানুষেব যে সর্বোত্তম জ্ঞান তাহাও অর্ধজ্ঞান ভিন্ন আব কিছুই নহে, আব মানুষের যে উচ্চতম সুকৃতি তাহাও হয একটি মিশ্রিত জিনিস, এমনকি আদর্শ হিসাবে যখন তাহাতে কোন ত্রুটিই বাখা হয না তখনও কার্যত ব্যবহাবে তাহা হয় খুবই আপেক্ষিক ও অপূর্ণ। জীবনেব সাধারণ নীতি হিসাবে চরম সাত্ত্বিক আদর্শসকল কার্যত ব্যবহাবে অনুসৃত হইতে পাবে না, ব্যক্তিগত অভীপ্সা ও আচরণেব সংস্কার ও উন্নতিব জন্য তাহাবা অপবিহার্য হইলেও তাহাদেব প্রতি নিষ্ঠা জীবনকে কেবল কতকটা পবিবর্তিত কবিতে পাবে কিন্তু সম্পূর্ণ রূপান্তরিত করিতে পারে না, আর তাহাদেব পূর্ণতম সিদ্ধি কেবল ভবিষ্যতের স্বপ্নরূপেই থাকিয়া যায অথবা তাহাব কল্পনা কবা যায এমন এক স্বর্গীয প্রকৃতিব জগতে যাহা আমাদেব এই পার্থিব প্রকৃতিব মিশ্রিত ধাবা হইতে মুক্ত। আব এইরূপ না হইয়াই পারে না কারণ, কি এই জগতেব প্রকৃতি আব কি মানুষের প্রকৃতি কিছুই বিশুদ্ধ সত্ত্বের উপাদানে এক অখণ্ড সত্তা রূপে গঠিত নহে, হইতেও পাবে না।

আমাদেব সম্ভাবনাসকলেব এই প্রতিবন্ধক হইতে, ধর্মসকলেব এই বিশৃঙ্খল মিশ্রণ হইতে মুক্তি পাইবার প্রথম পথ আমরা দেখিতে পাই নৈর্ব্যক্তিকতার দিকে একটা সমুচ্চ প্রবৃত্তিরূপে, যে একটি উদাব, বিশ্বগত শান্ত, মুক্ত, সত্য ও শুদ্ধ সত্তা এখন অহং-এব সীমাবদ্ধ মনের দ্বাবা প্রচ্ছন্ন রহিযাছে তাহার দিকে অন্তর্মুখী গতিরূপে। সমস্যা হইতেছে এইটিই যে, যদিও আমবা আমাদের সত্তাব স্থিবতা ও নৈঃশব্দ্যেব মুহূর্তে এই নৈর্ব্যক্তিকতার মুক্তি প্রত্যক্ষ অনুভব কবিতে পারি, তথাপি নৈর্ব্যক্তিক সক্রিযতা আদৌ সহজে আয়ত্ত কবা যায় না। নৈর্ব্যক্তিক সত্যের অনুসবণ বা আমাদেব কর্মে নৈর্ব্যক্তিক সঙ্কল্পের অনুসরণ ততক্ষণ খাঁটি হয না যতক্ষণ আমবা আদৌ সাধারণ মনেব মধ্যে বাস কবি এবং সেই মনের পক্ষে যাহা স্বাভাবিক ও অনিবার্য—আমাদেব ব্যক্তিকতাব নীতি, আমাদেব প্রাণিক প্রকৃতির

সূক্ষ্ম প্রেরণা, অহং-এর বঙ, এই সমুদযের অধীন থাকি। নৈর্ব্যক্তিক সত্যেব অনুসরণ ঐ সকল প্রভাবের দ্বারা একটা ছলনায পবিণত হয, তাহাব অন্তবালে আমরা আমাদের বুদ্ধিব প্রিয় ধারণাগুলিকেই পোষণ করি, আমাদেব মনেব সঙ্কীর্ণ নির্বন্ধপরতা দ্বারা সেসব সমর্থিত হয, নিঃস্বার্থ নৈর্ব্যক্তিক কর্ম অনুসবণেব সমুচ্চ দোহাই দিয়া আমবা আমাদেব ব্যক্তিগত ইচ্ছাব স্বার্থপব নির্বাচন ও অন্ধ খেয়ালসকলই সমর্থন করি। অন্যপক্ষে পূর্ণতম নৈর্ব্যক্তিকতা পূর্ণতম নিষ্ক্রিয়তাকেই অবশ্যম্ভাবী কবে বলিযা মনে হয় এবং ইহাব অর্থ হয এই যে, সকল কর্মই হইতেছে অহং এবং গুণত্রয়েব শৃঙ্খলে আবদ্ধ, আব এই চক্র হইতে মুক্তি পাইবার একটি মাত্র পন্থা হইতেছে জীবন ও তাহাব কর্ম হইতে সবিযা যাওয়া। কিন্তু এই নৈর্ব্যক্তিক নীরবতাই এ বিষযে জ্ঞানেব চবম কথা নহে, কাবণ আমাদের সাধনার অধিগম্য আত্মসিদ্ধির এইটিই একমাত্র পথ ও চূড়া নহে অথবা সব পথ এবং শেষ চূড়া নহে। ইহা অপেক্ষা মহত্তব, পূর্ণতব এবং অধিকতব প্রত্যক্ষ অধ্যাত্ম অনুভূতি আছে, তাহাতে আমাদেব অহংভাবাত্মক ব্যক্তিত্বেব গণ্ডি এবং মনের অপূর্ণতাসকলের চক্র মহত্তম আত্মা ও অধ্যাত্মসত্তাব বাধাহীন আনন্ত্যের মধ্যে বিলুপ্ত হইয়া যায় অথচ জীবন ও কর্ম যে তখনও গ্রহণীয় ও সম্ভাব্য থাকে শুধু তাহাই নহে পরন্তু তাহাদেব প্রশস্ততম অধ্যাত্ম পবিপূর্ণতায উপনীত ও প্রসারিত হয় এবং এক সুমহান ঊর্ধ্বমুখী সার্থকতা লাভ কবে।

পূর্ণতম নৈর্ব্যক্তিকতা এবং আমাদের প্রকৃতিব ক্রিযাত্মক সম্ভাবনাসমূহ—এই দুইযের সামঞ্জস্য স্তরে স্তরে সাধিত হইযাছে। চিন্তায ও ব্যবহাবে মহাযান এই দুরূহ সামঞ্জস্য সাধনের প্রয়াস এইভাবে করিযাছে—একদিকে গভীব নিষ্কামতা এবং মানসিক ও প্রাণিক আসক্তি ও সংস্কাবসমূহ হইতে উদাব বিলযকাবী মুক্তি এবং অন্যদিকে জগৎ ও তাহাব জীবনসমূহেব প্রতি বিশ্বজনীন হিতকাবিতা এবং অতলস্পর্শ করুণা, ইহা যেন জীবন ও কর্মেব উপব সমুচ্চ নির্বাণেব উচ্ছ্বসিত পরিপ্লাবন। ঐরূপ সামঞ্জস্যসাধন আবও একটি আধ্যাত্মিক উপলব্ধিব নিগূঢ় অর্থ ছিল, তাহা বিশ্বলীলার সার্থকতাব সম্বন্ধে অধিকতব সজ্ঞান ছিল, তাহা অধিকতব গভীর, প্রেরণাময়, কর্মে বহুমুখী ও ব্যাপক ছিল, গীতাব চিন্তাধাবার আরও এক পদ নিকটবর্তী ছিল। এই উপলব্ধির পবিচয আমবা তাওপন্থী (Taoist) মনীষীগণের বাক্যে পাই, অন্তত তাহাদেব বাক্যেব এইরূপ অর্থ করা যাইতে পারে। সেখানে দেখা যায়—এক নৈর্ব্যক্তিক অনির্বচনীয় শাশ্বত, তাহা আত্মা এবং সেই সঙ্গে তাহাই বিশ্বের প্রাণ, তাহা নিরপেক্ষভাবে সকল জিনিসকে ধবিযা রহিয়াছে, সকলের মধ্যে ব্যাপ্ত রহিয়াছে, সমম্ ব্রহ্ম, তাহা অদ্বিতীয এক, তাহা অসৎ, কারণ আমরা যাহাকিছু প্রত্যক্ষ কবি তাহা সে-সমুদয হইতে ভিন্ন অথচ তাহা হইতেছে এই সর্বভূতেব সমষ্টি। এই অনন্তের উপব ফেনেব ন্যায সৃষ্ট হইয়াছে যে অন্ধ ব্যক্তিত্ব, যে পরিবর্তনশীল অহং তাহা হইতেছে তাহার আসক্তি ও বিতৃষ্ণা তাহার রাগ ও দ্বেষ, তাহার বদ্ধমূল মানসিক ভেদজ্ঞানসমূহকে লইয়া

একটি শক্তিশালী রূপায়ণ—ইহা আমাদের নিকট একমাত্র সত্য বস্তুটিকে আবৃত কবিযা বাখে, বিকৃত কবিয়া দেখায, সেই সত্য বস্তু হইতেছে "তাও" (Tao), তাহা পবম সর্ব এবং পবম শূন্য। তাহাকে স্পর্শ কবিতে পারা যায় কেবল অনধিগম্য বিশ্বব্যাপী ও শাশ্বত সত্তার মধ্যে ব্যক্তিত্ব এবং ইহার ক্ষুদ্র রূপাযণগুলিকে বিলীন করিযা এবং একবার এইটি সিদ্ধ হইলে আমবা তাহাব মধ্যে সত্য জীবন যাপন কবি এবং অন্য এক মহত্তব চৈতন্য লাভ করি, তাহা আমাদিগকে সর্বভূতেব মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট করায়, আমাদিগকে সকল শাশ্বত প্রভাবেব দিকে উন্মুক্ত কবিযা ধরে। গীতাব ন্যায এখানেও মনে হয যে, উচ্চতম পন্থা হইতেছে শাশ্বতেব নিকট সম্পূর্ণ উন্মুক্ততা ও আত্মসমর্পণ। তাও-পন্থী মনীষী বলেন, তোমাব শবীব নিজের নহে, ইহা হইতেছে ভগবান হইতে প্রাপ্ত ভাগবত বিগ্রহ, তোমাব প্রাণ তোমাব নিজেব নহে, ইহা হইতেছে ভগবান হইতে প্রাপ্ত ভাগবত সুসঙ্গতি, তোমাব ব্যক্তিত্ব তোমার নহে, ইহা হইতেছে ভগবান হইতে প্রাপ্ত ভাগবত বৈচিত্র্য। আর এই শিক্ষাতেও এক বিরাট সংসিদ্ধি ও মুক্ত কর্ম হইতেছে জীবেব আত্মসমর্পণেব ওজস্বান পরিণতি। অহংময় ব্যক্তিত্বের কর্ম হইতেছে বিশ্বপ্রকৃতিব বিপবীত দিকে বিচ্ছেদের অভিযান। এই মিথ্যার খেলাকে বন্ধ কবিযা ইহাব স্থানে প্রতিষ্ঠিত কবিতে হইবে বিশ্বগত ও শাশ্বত শক্তির অধীনে জ্ঞানময ও শান্ত নিশ্চেষ্টতা—এমন নিশ্চেষ্টতা যাহা আমাদিগকে অনন্ত কর্মধাবার সহিত মিলনক্ষম কবিবে, ইহাব সত্যেব সহিত সুসঙ্গত কবিবে, ভগবানের সংগঠনী ক্রিযাব নিকট নমনীয করিয়া দিবে। এই সুসঙ্গতি যে-মানুষের আছে, তিনি ভিতবে নিশ্চল এবং নৈঃশব্দ্যে নিমগ্ন হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহার আত্মা সকল ছদ্মবেশ হইতে মুক্ত হইযা প্রকট হইবে, তাঁহার মধ্যে ভাগবত প্রভাব কার্য কবিবে এবং তিনি স্থিবতা ও আভ্যন্তবীণ নৈষ্কর্ম্যের মধ্যে বাস করিয়াও অদম্য শক্তিতে কর্ম কবিবেন এবং লক্ষ লক্ষ বস্তু ও জীব তাঁহার প্রভাবেব অধীনে চালিত হইবে, সম্মিলিত হইবে। আত্মাব নৈর্ব্যক্তিক শক্তি তাঁহাব সকল কর্মের ভাব গ্রহণ কবিবে (সেসব আব তখন অহং-এর বিকৃত ক্রিয়া থাকিবে না) এবং তাঁহাব ভিতব দিযা অপ্রতিহতভাবে কার্য কবিবে জগত ও তাহার লোকসকলকে সংহত বাখিবাব জন্য, নিযন্ত্রিত কবিবার জন্য, লোক সংগ্রহার্থায়।

গীতা যে প্রথম নৈর্ব্যক্তিক কর্মেব শিক্ষা দিয়াছে তাহার সহিত এই সকল অনুভূতিব প্রভেদ খুবই কম। গীতাও আমাদিগকে বলে, আসক্তি ও অহং ত্যাগ কবিতে হইবে, নিম্নতন প্রকৃতিকে ছাড়াইয়া ঊর্ধ্বে উঠিতে হইবে এবং আমাদের ব্যক্তিত্ব ও তাহাব ক্ষুদ্র ব্যাপারগুলিকে ভাঙ্গিযা দিতে হইবে। গীতাও আমাদিগকে বলে, আত্মা ও ব্রহ্মেব মধ্যে বাস করিতে হইবে, সকলের মধ্যে আত্মা ও ব্রহ্মকে এবং আত্মা ও ব্রহ্মের মধ্যে সকলকে দেখিতে হইবে এবং সকলকেই আত্মা ও ব্রহ্ম বলিযা দেখিতে হইবে। তাওপন্থী মনীষীব ন্যাযই গীতা আমাদিগকে বলে আত্মার মধ্যে, ব্রহ্মেব মধ্যে, শাশ্বতেব মধ্যে আমাদের প্রাকৃত ব্যক্তিত্ব ও তাহার কর্মসমূহ

সন্ন্যাস করিতে হইবে, আত্মনি সন্নস্য ব্রহ্মণি। আব এইরূপ মিল রহিয়াছে তাহাব কারণ হইতেছে এই যে, গতিময, ক্রিযাময জীবনেব সহিত অবিবোধী শান্তিময আভ্যন্তরীণ উদারতা ও নীববতাব এইটিই হইতেছে মানুষের পক্ষে যথাসম্ভব উচ্চতম ও মুক্ততম উপলব্ধি—এক অব্যয শক্তি ও অদ্বিতীয শাশ্বত সত্তাব নৈর্ব্যক্তিক অনন্ত সত্য ও অপরিমেয কর্মেব মধ্যে দুইটিই যুগপৎ অবস্থিত অথবা একত্র মিশ্রিত। কিন্তু গীতা ইহাব সহিত এমন আর একটি অতীব অর্থপূর্ণ কথা যোগ কবিয়া দিয়াছে যাহাতে সবই পবিবর্তিত হইযা গিযাছে—আত্মনি অথো ময়ি। গীতা চায, সকল জিনিসকে আত্মাব মধ্যে, তাহাব পব "আমাব" মধ্যে, ঈশ্বরের মধ্যে দেখিতে হইবে, সকল কর্ম আত্মাব মধ্যে, ব্রহ্মের মধ্যে সমর্পণ করিতে হইবে এবং সেখান হইতে পবম পুরুষ পুরুষোত্তমেব মধ্যে সমর্পণ কবিতে হইবে। এখানে রহিয়াছে অধ্যাত্ম অনুভূতিব আবও মহত্তব ও গভীরতব পূর্ণতা, মানবজীবনের অর্থের এক বৃহত্তর রূপান্তর, সমুদ্রেব মধ্যে স্রোতস্বতীব প্রত্যাবর্তনেব ন্যায় এক বহস্যময় ও প্রগাঢ আবেগ, অনাদি শাশ্বত কর্মীব নিকট সকল ব্যক্তিগত কর্ম ও বিশ্বকর্মেব প্রত্যর্পণ। স্তব্ধ নৈর্ব্যক্তিকতাব উপবেই জোব দিলে আমাদের পক্ষে এই সঙ্কট ও ত্রুটি হয় যে, ইহা অন্তঃপুরুষটিকে, অধ্যাত্ম ব্যক্তিটিকে আমাদের আশ্চর্যরূপে চিরস্থাযী অন্তবতম সত্তাটিকে অনন্তেব মধ্যে একটি ক্ষণস্থায়ী, ভ্রান্তিময় এবং পবিবর্তনশীল রূপে পবিণত করে। একমাত্র অনন্তই রহিয়াছে, আর সাময়িক একটা খেলা ব্যতীত জীবেব অন্তবাত্মাব অন্য কোন মূল্যই তাহার নিকটে নাই। মানুষেব অন্তবাত্মাব সহিত শাশ্বতেব কোন সত্য ও স্থাযী সম্বন্ধ হইতে পাবে না, যদি সেই আত্মা পুনঃপুনঃ পবিবর্তনশীল দেহেবই ন্যায অনন্তের মধ্যে কেবল একটি ক্ষণস্থাযী ব্যাপাবমাত্র হয।

ইহা সত্য যে অহং এবং তাহাব সীমাবদ্ধ ব্যক্তিত্ব হইতেছে প্রকৃতিব এইরূপই একটি ক্ষণস্থাযী ও পরিবর্তনশীল রূপ এবং সেইজন্য ইহাকে ভাঙ্গিযা ফেলিতেই হইবে এবং আমাদিগকে সকলের সহিত এবং অনন্তের সহিত ঐক্য উপলব্ধি করিতেই হইবে। কিন্তু অহংই প্রকৃত ব্যক্তি নহে; যখন ইহা লযপ্রাপ্ত হইবে তখনও অধ্যাত্ম ব্যক্তিটি থাকিবে, তখনও সনাতন জীবটি থাকিবে। অহং-এব সীমাবন্ধন লুপ্ত হইবে এবং জীবাত্মা অদ্বিতীয একেব সহিত গভীব ঐক্যে বাস কবিবে এবং সর্বভূতের সহিত তাহাব বিশ্বগত ঐক্য উপলব্ধি কবিবে। অথচ এই বিস্তাবতা ও ঐক্য যে উপভোগ কবিবে সে হইতেছে আমাদেব নিজেদেবই অন্তঃপুরুষ। যদিও বিশ্ব কর্মধাবা সকলের মধ্যে একই শক্তিব ক্রিযা বলিয়া অনুভূত হয, উহা ঈশ্বরেবই প্রবর্তন ও গতি বলিয়া উপলব্ধি হয, তথাপি উহা বিভিন্ন মানবাত্মায (অংশঃ সনাতনঃ) বিভিন্ন রূপ গ্রহণ করে, তাহাদেব প্রকৃতিতে বিভিন্ন ধাবা অনুসরণ কবে। অধ্যাত্ম জ্ঞানেব জ্যোতি, বিচিত্র বিশ্বশক্তি, সত্তাব শাশ্বত আনন্দ আমাদের মধ্যে এবং চতুর্দিকে প্রবাহিত হইযা আসে, অন্তবাত্মায় কেন্দ্রীভূত হয এবং প্রত্যেকের মধ্য হইতে চতুর্পার্শ্বস্থ জগতে ছড়াইযা পড়ে, যেন প্রত্যেকেই

জীবন্ত অধ্যাত্মচৈতন্যেব কেন্দ্র—তাহার পরিধি অনন্তেব মধ্যে বিলুপ্ত হইয়া গিযাছে। তাহা ছাড়া অধ্যাত্ম ব্যক্তিটি থাকে দিব্য জীবনেব একটি ক্ষুদ্র জগৎ স্বরূপ, তাহা একই সঙ্গে স্বতন্ত্র অথচ ভাগবত আত্ম-অভিব্যক্তির যে সমগ্র অনন্ত জগতেব ক্ষুদ্র অংশ আমরা আমাদেব চতুর্দিকে দেখিতে পাই তাহা হইতেও অচ্ছেদ্য। বিশ্বাতীত সত্তাব একটি অংশ সে, সে সৃজনশীল, সে নিজেই নিজের চতুষ্পার্শ্বস্থ জগৎ সৃষ্টি করে অথচ এই যে বিশ্বচৈতন্যের মধ্যে অন্য সকলেই বহিযাছে সে চেতনাও তাহাব থাকে। আপত্তি করা যাইতে পাবে যে, ইহা একটা ভ্রান্তি মাত্র, যখন আমবা বিশ্বাতীত কৈবল্যাত্মক সত্তায ফিবিযা যাইব তখন ইহা বিলুপ্ত হইয়া যাইবেই; কিন্তু এ বিষয়েও যে বেশী নিশ্চিত নিশ্চয়তা আছে তাহা নহে। কাবণ তখনও মানুষেব অন্তবাত্মাই সেই মুক্তি উপভোগ কবে, যে-অন্তরাত্মা ভাগবত কর্ম ও অভিব্যক্তিব জীবন্ত কেন্দ্র ছিল সে-ই ঐ মুক্তিব ভোক্তা হয়। উহা শুধুই একরূপ নহে যে ব্যক্তিত্ব-রূপ একটা মিথ্যা আকার অনন্তের মধ্যে আপনি ভাঙ্গিযা বিলুপ্ত হইযা গেল—উহা আরও কিছু বেশী। আমাদেব জীবনের এই বহস্যের অর্থ হইতেছে এই যে, আমবা যাহা হইযাছি তাহা একমেবাদ্বিতীযং সত্তার কেবল একটা ক্ষণিক নামরূপ মাত্র নহে, পরন্তু বলিতে পাবা যায় যে, আমরা ভাগবত অদ্বৈত সত্তাবই এক একটি বিশিষ্ট সত্তা ও চেতনা। অহং হইতেছে অজ্ঞানেব মধ্যে আমাদের অধ্যাত্ম ব্যষ্টিসত্তার ভ্রান্তিজনক ছায়া ও প্রতিরূপ, কিন্তু সেই ব্যষ্টিসত্তা হইতেছে এমন একটি সত্য অথবা তাহার মধ্যে এমন একটি সত্য বহিযাছে যাহা অজ্ঞানেব ঊর্ধ্বেও বর্তমান থাকে; আমাদেব মধ্যে এমন কিছু আছে যাহা পুরুষোত্তমের পরম প্রকৃতির মধ্যে চিরকাল বাস কবে, নিবসিষ্যসি মষ্যেব। গীতাব শিক্ষাব গভীব ব্যাপকতা এইখানেই যে, ইহা যেমন একদিকে বিশ্বভাবাপন্ন নৈর্ব্যক্তিকতার সত্য স্বীকাব কবে—অহং-এব নির্বাণ করিয়া আমরা ইহার মধ্যেই প্রবেশ কবি, ব্রহ্ম-নির্বাণ, বস্তুত ইহা ভিন্ন মুক্তি নাই, অন্তত পূর্ণতম মুক্তি নাই—তেমনই অন্যদিকে ইহা উচ্চতম উপলব্ধির অঙ্গরূপে আমাদের ব্যক্তিত্বের স্থাযী অধ্যাত্ম সত্যকেও স্বীকাব করে। এই প্রাকৃত সত্তাটি নহে পরন্তু আমাদের মধ্যে সেই ভাগবত কেন্দ্রীয় সত্তাটিই হইতেছে সনাতন জীব। ঈশ্বর, বাসুদেব, যিনি সব—বাসুদেবঃ সর্ব্বম্, তিনিই আমাদের মন, প্রাণ ও দেহ স্বীকার করেন নীচেব প্রকৃতিকে ভোগ করিবার জন্য; যে পরমা প্রকৃতি হইতেছে পরম পুরুষের আদ্যা অধ্যাত্ম প্রকৃতি তাহাই এই জগতকে ধারণ করিয়া আছে এবং তাহাব মধ্যে জীবরূপে আবির্ভূত হইয়াছে। তাহা হইলে জীব হইতেছে পুরুষোত্তমের আদ্য ভাগবত অধ্যাত্ম সত্তাবই অংশ, জীবন্ত শাশ্বতের একটি জীবন্ত শক্তি। সে নিম্নতন প্রকৃতিব কেবল একটি ক্ষণস্থায়ী রূপ নহে পরন্তু পবমতমের পরমা প্রকৃতিরই শাশ্বত অংশ, ভাগবত সত্তাব একটি শাশ্বত চৈতন্যময় রশ্মি এবং সেই পরম প্রকৃতিব ন্যাযই তুল্যরূপে চিবস্থাযী। তাহা হইলে আমাদের বিমুক্ত চৈতন্যের উচ্চতম সিদ্ধি ও স্থিতির একটা দিক অবশ্যই হইবে পরমা অধ্যাত্ম প্রকৃতির মধ্যে

জীবের সত্য স্থানটি গ্রহণ করা, সেখানে পরম পুরুষের মহিমার মধ্যে বাস করা এবং সেখানে শাশ্বত অধ্যাত্ম ঐক্যের আনন্দ লাভ করা।

আমাদের সত্তার এই যে রহস্য ইহার মূলে রহিয়াছে পুরুষোত্তমের সত্তার এইরূপই এক পরম রহস্য, উত্তমম্ রহস্যম্। পরব্রহ্মের শুদ্ধ নৈর্ব্যক্তিকতাই উচ্চতম নিগূঢ় তত্ত্ব নহে। উচ্চতম তত্ত্ব হইতেছে এই অত্যাশ্চর্য রহস্য যে, পরম পুরুষ এবং প্রতীয়মান বিরাট নৈর্ব্যক্তিক সত্তা—এই দুইই এক, সর্বভূতের এক অক্ষর বিশ্বাতীত আত্মা এবং সেই পুরুষ যিনি এখানে বিশ্বের মূলেই নিজেকে অনন্ত ও বহুল ব্যক্তিরূপে প্রকট করিতেছেন, সর্বত্র কর্ম করিতেছেন—আত্মা ও পুরুষ আমাদের চরমতম, অন্তরতম, গভীরতম অনুভূতিতে একই অপরিমেয় সত্তারূপে প্রতিভাত, তিনি আমাদিগকে গ্রহণ করিতেছেন, নিজের সান্নিধ্যে লইতেছেন, নিরাকারের শূন্য গর্ভে নহে, পরন্তু তাঁহার ও আমাদের সচেতন জীবনের সকল ধারায় আমাদিগকে প্রত্যক্ষতমভাবে, গভীরতমভাবে, অত্যাশ্চর্য-ভাবে তাঁহার নিজের সমগ্রতার মধ্যে লইতেছেন। এই উচ্চতম অনুভূতি এবং দেখিবার এই উদারতম ধারা আমাদের প্রকৃতির বিভিন্ন অংশের, আমাদের জ্ঞানের, সঙ্কল্পের, হৃদ্‌গত প্রেম ও ভক্তির গভীর, মর্মস্পর্শী, সীমাহীন সার্থকতা প্রকট করিয়া দেয়—কিন্তু যদি আমরা নৈর্ব্যক্তিকের উপরেই সম্পূর্ণ ঝোঁক দিই তাহা হইলে এই সার্থকতা লুপ্ত হয় অথবা তাহা হ্রাস পায়, কারণ ঐ ঝোঁকের যেসব বৃত্তি ও শক্তি হইতেছে আমাদের গভীরতম প্রকৃতির অংশ, যেসব আবেগ ও দীপ্তি হইতেছে আমাদের আত্ম-অনুভূতির নিবিড়তম, মুখ্যতম তন্ত্রীসকলের সহিত জড়িত সেসবকে অবদমিত বা ক্ষীণ করিয়া দেয় অথবা তাহাদের প্রগাঢ়তম বিকাশ হইতে দেয় না। শুধু জ্ঞানের কঠোরতা আমাদিগকে সাহায্য করিতে পারে না, জ্ঞানের দ্বারা উদ্ভাসিত ও সমুন্নত হৃদ্‌গত প্রেম ও অভীপ্সারও স্থান আছে, অসীম স্থান আছে—সে জ্ঞান আরও নিগূঢ়ভাবে স্বচ্ছ, আরও প্রশান্ত আবেগে পূর্ণ। আমাদের হৃদয়-চৈতন্য, মানস-চৈতন্য, সকল চৈতন্যের নিরন্তর সম্মিলিত অন্তরঙ্গতার দ্বারাই, সততং মচ্চিত্তঃ, আমরা শাশ্বত পুরুষের সহিত আমাদের একত্বের উদারতম, গভীরতম, পূর্ণতম উপলব্ধি লাভ করি। সকল সত্তায় ঘনিষ্ঠতম একত্ব, বিশ্বভাবের মধ্যে এমনকি বিশ্বাতীতভাবের শিখরেও তাহা দিব্য প্রেমাবেগে গভীরভাবে ব্যক্তিগত, মানবাত্মাকে এখানে সমুচ্চতমে পৌঁছিবার এই পথই দেখান হইয়াছে, অধ্যাত্ম সত্তারূপে যে সিদ্ধি ও দিব্য চৈতন্য লাভ তাহার প্রকৃতির নির্দেশ, এই পথেই সে তাহার অধিকারী হইবে। বুদ্ধি ও সঙ্কল্প সমগ্র সত্তাকে সমগ্র সত্তার যিনি ভাগবত আত্মা ও ঈশ্বর তাঁহার অভিমুখ করিয়া দিবে, বুদ্ধিযোগম্ উপাশ্রিত্য। হৃদয় আর সব আবেগকেই তাঁহার সহিত ঐক্যের আনন্দে পরিণত করিবে, সর্বভূতে অবস্থিত তাঁহার প্রতি প্রেমে পরিণত করিবে। অধ্যাত্মভাবাপন্ন ইন্দ্রিয় সর্বত্র তাঁহাকেই দর্শন করিবে, শ্রবণ করিবে, অনুভব করিবে। জীবন হইবে জীবের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে তাঁহারই জীবন। সঙ্কল্পে, জ্ঞানে,

কর্মেন্দ্রিয়ে, জ্ঞানেন্দ্রিয়ে, প্রাণে, শরীরে সকল ক্রিয়াই উৎসারিত হইবে একমাত্র তাঁহারই শক্তি হইতে, একমাত্র তাঁহারই প্রবর্তনা হইতে। এই পন্থা গভীরভাবেই নৈর্ব্যক্তিক কারণ বিশ্বভাবাপন্ন এবং বিশ্বাতীত সত্তায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত জীবাত্মার পক্ষে অহং-এর স্বাতন্ত্র্য লুপ্ত হইয়া যায়। অথচ ইহা হইতেছে নিবিড়ভাবেই ব্যক্তিগত কারণ ইহা সালোক্য ও একাত্মতার পরমতম আবেগ ও শক্তিতে উত্তীর্ণ হয়। মনের যুক্তি অনুসারে নির্বিশেষ লয়ই আত্মনির্বাণের একমাত্র যথাসঙ্গত পরিণতি হইতে পারে, কিন্তু উহাই উত্তম রহস্যের চরম কথা নহে।

অর্জুন যে ভগবৎ-নিয়োজিত কর্মে উদ্‌যোগী হইতে অস্বীকার করিয়াছিলেন, সেটি আসিয়াছিল তাঁহার অহংভাব হইতে, অহঙ্কারং আশ্রিত্য। সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক অহং-এর ধারণা ও প্রেরণাসকল, পাপ ও তাহার ব্যক্তিগত ফলভোগে প্রাণ-প্রকৃতির ভীতি, ব্যক্তিগত শোক ও দুঃখের প্রতি হৃদয়ের বিমুখতা, অহংমুখী প্রবৃত্তিগুলিকে পুণ্য ও ন্যায়ের দোহাই দিয়া সমর্থন করিতে মোহাচ্ছন্ন বুদ্ধির আত্মপ্রবঞ্চনাময় চেষ্টা, ভগবানের কর্মধারাসমূহ মানুষের ধারা হইতে বিভিন্ন মনে হয় বলিয়া এবং উহারা তাহার স্নায়ুমণ্ডলী, তাহার হৃদয়, তাহার বুদ্ধির উপর ভীষণ ও অপ্রীতিকর জিনিসসকলের দুর্বহ ভার আনিয়া দেয় বলিয়া সেসবের প্রতি আমাদের প্রকৃতির বিরাগ—এই সকলের মিশ্রণ, বিশৃঙ্খলা ও জটিল ভ্রান্তি অর্জুনের ঐ অহঙ্কারের পিছনে ছিল। এখন অর্জুনের নিকট এক উচ্চতর সত্য, কর্মের এক মহত্তর ধারা প্রকট করা হইল, এখনও যদি সে তাহার অহংভাবকেই ধরিয়া থাকে, যুদ্ধ না করিবার বৃথা ও অসম্ভব সঙ্কল্পেই রত থাকে—তাহা হইলে তাহার আধ্যাত্মিক পরিণাম পূর্বাপেক্ষা অনন্তগুণে অধিক অশুভ হইবে। কারণ এই সঙ্কল্প বৃথা, এই বৈরাগ্য নিষ্ফল, যেহেতু এইটির উদ্ভব হইয়াছে সাময়িক শক্তিহীনতা হইতে, ইহা তাহার অন্তরতম চরিত্রের বীরত্ব হইতে প্রবল কিন্তু ক্ষণস্থায়ী বিচ্যুতি, ইহা তাহার প্রকৃতির সত্য সঙ্কল্প ও ধারা নহে। এখন যদি সে অস্ত্র পরিত্যাগ করে, তথাপি সেই প্রকৃতির দ্বারাই সে আবার অস্ত্র গ্রহণ করিতে বাধ্য হইবে যখন সে দেখিতে পাইবে যে, তাহার অভাবেও যুদ্ধ ও হত্যাকাণ্ড চলিতেছে, তাহার বিরতির ফলে তাহার জীবনের সকল আশা আকাঙ্ক্ষার পরাজয় ঘটিতেছে, যে ব্রত সাধন করিতে সে জন্মগ্রহণ করিয়াছে প্রধান কর্মীর অনুপস্থিতি বা নিষ্ক্রিয়তার জন্য তাহা দুর্বল ও বিভ্রান্ত হইয়া পড়িতেছে, অহংমন্য অধর্ম ও অন্যায়ের সমর্থকগণের বিদ্বেষপূর্ণ ও কুণ্ঠাহীন শক্তি দ্বারা পরাজিত ও বিধ্বস্ত হইতেছে। আর এইভাবে ফিরিলে তাহার কোন আধ্যাত্মিক মূল্যই থাকিবে না। অহঙ্কৃত মনের ধারণা ও অনুভবসমূহের বিশৃঙ্খলাই তাহাকে যুদ্ধে বিমুখ করিয়াছিল, প্রকৃতি ঐ অহঙ্কৃত মনেরই স্বভাবসিদ্ধ ধারণা ও অনুভবগুলিকে ফিরাইয়া আনিয়া তাহাকে তাহার যুদ্ধে অসম্মতি পরিত্যাগ করিতে বাধ্য করিবে। কিন্তু যেভাবেই হউক না কেন, অবিরত এইরূপ অহং-এর বশে থাকার অর্থ হইবে আরও খারাপ, আরও সাঙ্ঘাতিক অধ্যাত্ম প্রত্যাখ্যান, বিনষ্টি; কারণ তিনি তাঁহার

নীচেব প্রকৃতির অজ্ঞানে এতদিন তাঁহাব সত্তাব যে সত্য অনুসবণ কবিযাছেন এখন তাহা অপেক্ষা এক মহত্তব সত্য হইতে নিশ্চিত স্খলন হইবে। তাঁহাকে এক উচ্চতর চৈতন্যে, এক নূতন আত্ম-অনুভূতিতে প্রবেশাধিকার দেওয়া হইয়াছে. তাঁহাকে অহংমন্য কর্মের পরিবর্তে দিব্য কর্মেব সম্ভাবনা দেখাইয়া দেওযা হইযাছে; তাঁহাব সম্মুখে কেবলমাত্র বুদ্ধিগত, ভাবগত, ইন্দ্রিয়গত ও প্রাণগত জীবনেব পরিবর্তে এক দিব্য ও অধ্যাত্ম জীবনেব দ্বাব খুলিযা দেওযা হইযাছে। এখন আর তাঁহাকে একটি শক্তিমান অন্ধ যন্ত্র হইতে হইবে না. পবন্তু সচেতন পুরুষ হইতে হইবে, ভগবানেব জ্ঞানদীপ্ত শক্তি ও আধাব হইতে হইবে।

কারণ আমাদেব মধ্যে এই সম্ভাবনা বহিযাছে: আমাদেব মানবতাব যাহা উচ্চতম শিখব সেখানেও এই পরিণতি ও সমুত্তবণ আমাদের পক্ষে উন্মুক্ত রহিয়াছে। মানুষেব যে সাধারণ মন ও জীবন তাহা হইতেছে অর্ধ-সজ্ঞান এবং প্রধানত অজ্ঞান অভিবিকাশ, তাহাব মধ্যে লুক্কাযিত কোন বস্তুব আংশিক অসম্পূর্ণ অভিব্যক্তি। সেখানে তাহার চেতনাব অন্তবালে এক গুপ্ত দেবতা বহিযাছেন, তিনি এমন একটি প্রক্রিয়াব গাঢ় আবরণেব পিছনে নিশ্চলভাবে অবস্থিত যাহা সম্পূর্ণভাবে তাহার নিজেব নহে, তাহাব নিগূঢ় তত্ত্ব এখনও সে আযত্ত কবিতে পারে নাই। সে দেখে এই জগতে সে চিন্তা কবিতেছে, সঙ্কল্প কবিতেছে, সুখ দুঃখ বোধ করিতেছে, কর্ম করিতেছে, আব সে সহজাত সংস্কাবেব বশে অথবা বুদ্ধিবিচারেব দ্বারা ধবিযা লয যে, সে হইতেছে একটি স্বতন্ত্র স্বপ্রতিষ্ঠ জীব, তাহাব আছে চিন্তায, সঙ্কল্পে, অনুভবে ও কর্মে স্বাধীনতা—অন্তত এইভাব লইযাই সে জীবনযাপন করে। সে তাহার পাপ ও ভ্রান্তি ও দুঃখেব বোঝা নিজেই বহিযা চলে এবং সে তাহার জ্ঞান ও পুণ্যেব দাযিত্ব ও কৃতিত্ব নিজেবই বলিযা গ্রহণ কবে, সে তাহার সাত্ত্বিক বা রাজসিক বা তামসিক অহংকে তৃপ্ত কবিবাব অধিকাব দাবি কবে এবং আত্মম্ভবিতার বশে মনে করে যে নিজেব শক্তিতেই সে তাহার ভাগ্য গডিযা তুলিবে এবং জগৎকে নিজেব কাজে লাগাইবে। তাহাব নিজেব এই অহংবোধেব ভিতব দিযাই প্রকৃতি তাহাব মধ্যে কাজ কবে এবং তাহাব নিজ ধাবণা অনুসবণ করিযাই প্রকৃতি তাহাকে পরিচালিত কবে, কিন্তু প্রকৃতিব নিজেব মধ্যে যে মহত্তব ভাগবত সত্তা রহিয়াছে, সকল সময়ে প্রকৃতি তাহারই ইচ্ছা পূর্ণ কবে। মানুষেব আত্মদৃষ্টিব এই যে ভ্রান্তি ইহা হইতেছে তাহাব অধিকাংশ ভ্রান্তিবই ন্যায একটি সত্যের বিকৃতি, এই বিকৃতি হইতে এক সমগ্র পর্যাযেব প্রতিমান (Values) সৃষ্টি হয, সেগুলি ভ্রান্ত হইলেও কার্যকবী। যাহা তাহাব আত্মাব পক্ষে সত্য সেইটিকে সে তাহার অহংরূপ ব্যক্তিত্বের সত্য বলিযা মনে করে এবং তাহাব মিথ্যা প্রযোগ করে, তাহাকে মিথ্যা রূপ প্রদান করে, তাহা হইতে বহু অজ্ঞান সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। অজ্ঞানটি হইতেছে তাহার বহিশ্চৈতন্যেব এই ত্রুটি যে, তাহাব যে বাহ্য যন্ত্রবৎ অংশটুকু প্রকৃতিবই একটি কৌশল তাহাব সহিত এবং এই বাহ্য প্রক্রিয়াসকল আত্মায় যেরূপ প্রতিফলিত হয় এবং তাহাবা আত্মাকে যতটুকু

প্রতিফলিত কবে আত্মাব কেবল ততটুকুব সহিত সে নিজেকে এক করিয়া দেখে। ভিতরে যে মহত্তব আভ্যন্তবীণ অধ্যাত্ম সত্তা তাহার সকল মন, প্রাণ, সৃষ্টি ও কর্মকে এক অনাগত সিদ্ধিব আশা ও প্রচ্ছন্ন সার্থকতা প্রদান করিতেছে তাহাব সন্ধান সে পায না। এখানে বিশ্বপ্রকৃতি বিশ্বেব অধীশ্বব পুরুষেব শক্তি অনুসরণ কবিতেছে, প্রত্যেক জীবকে তাহার নিজ প্রকৃতিব ধর্ম অনুযায়ী গঠন করিতেছে, তাহাব কর্ম নিরূপিত কবিয়া দিতেছে, মানুষকেও তাহাব মানবতার সাধারণ ধর্ম অনুযাযী গঠন কবিতেছে, তাহাব কর্ম নিরূপিত হইতেছে—সে ধর্ম হইতেছে প্রাণ ও দেহে আবদ্ধ অজ্ঞান মনোময সত্তাব ধর্ম—আবাব প্রত্যেক ব্যষ্টিগত মানুষকেও তাহাব বিশেষ শ্রেণীব ধর্ম অনুযাযী এবং তাহাব নিজ মূল স্বভাবের বিভিন্ন বৈচিত্র্য অনুযাযী গঠন কবিতেছে এবং তাহাব ব্যষ্টিগত কর্ম নিরূপিত কবিযা দিতেছে। এই বিশ্বপ্রকৃতিই শবীবের যান্ত্রিক ক্রিয়াসকল এবং আমাদেব প্রাণিক ও স্নাযবীয অংশসমূহেব সহজাত প্রক্রিযাসকল গড়িযা তোলে, পরিচালিত করে, আব সেখানে যে আমবা তাহাব অধীন তাহা খুবই সুস্পষ্ট। আর আমাদের ইন্দ্রিয়ানুগ-মন, সঙ্কল্প ও বুদ্ধিব যে ক্রিযা বর্তমানে ঐরূপই যন্ত্রবৎ তাহাকেও সে গডিয়া তুলিযাছে এবং পবিচালিত কবিতেছে। কেবল প্রভেদ এই যে, পশুতে মনের ক্রিযাসকল হইতেছে সম্পূর্ণভাবেই প্রকৃতিব যন্ত্রবৎ অনুসরণ, কিন্তু মানুষেব এই বিশেষত্ব—তাহাব আধাবে যে সচেতন বিকাশ হইতেছে তাহাতে তাহার অন্তবাত্মাব অধিকতব সক্রিয সহযোগ বহিযাছে এবং তাহার ফলে তাহার বাহ্য মনে কতকটা স্বাধীনতাব অনুভূতি এবং তাহাব যান্ত্রিক প্রকৃতির উপর ক্রমবর্ধমান প্রভুত্বেব বোধ উৎপন্ন হয—সে বোধ তাহার পক্ষে প্রযোজনীয, অপবিহার্য, কিন্তু সেটি হইতেছে অধিকাংশই একটি ভ্রান্ত বোধ। আর ইহা বিশেষভাবে ভ্রান্তিজনক এই জন্য যে ইহা তাহাব বন্ধনরূপ কঠোব সত্যের প্রতি তাহাকে অন্ধ করিয়া বাখে এবং তাহাব স্বাধীনতা সম্বন্ধে মিথ্যা ধাবণা তাহাকে সত্য স্বাধীনতা ও প্রভুত্বেব সন্ধান কবিতে দেয না। কাবণ মানুষের যে স্বাধীনতা এবং তাহার প্রকৃতিব উপব প্রভুত্ব, তাহাকে বাস্তব সত্য বলা যায না এবং তাহা সম্পূর্ণ হইতে পারে না যতক্ষণ না সে তাহাব অন্তবস্থ ভাগবত সত্তা সম্বন্ধে সজ্ঞান হয় এবং তাহাব অহং হইতে ভিন্ন তাহার যে নিজ প্রকৃত সত্তা ও আত্মা বহিযাছে তাহাকে লাভ করে, আত্মবান হয। সেইটিকেই প্রকৃতি মন, প্রাণ ও দেহে প্রকট কবিবার প্রয়াস কবিতেছে, সেইটিই তাহাব স্বভাব ও স্বধর্ম নির্দিষ্ট করিযা দেয়, সেইটিই আমাদের অন্তবস্থ চৈত্যপুরুষেব বাহ্য নিযতি ও ক্রমবিকাশ গঠন কবিয়া দেয। অতএব যখন সে তাহাব প্রকৃত আত্মা ও সত্তাকে লাভ করে কেবল তখনই তাহাব প্রকৃতি ভগবানেব সচেতন যন্ত্র এবং জ্ঞানদীপ্ত শক্তি হইতে পারে।

যখন আমবা আমাদের অন্তরতম সত্তার মধ্যে প্রবেশ করি তখন আমরা অবগত হই যে, আমাদেব মধ্যে এবং সকলেরই মধ্যে বহিয়াছে এক আত্মা ও ভগবান, সমগ্র প্রকৃতি তাহাবই কাজ করে, তাহাকেই প্রকট করে, আমরা

নিজেবাও হইতেছি এই আত্মাবই আত্মা, এই সত্তাবই সত্তা, আমাদেব শবীব তাহাব প্রতিভূস্বরূপ প্রতিমা, আমাদেব জীবন তাহাব জীবনছন্দেব একটি গতি, আমদেব মন তাহারই চৈতন্যের একটি কোষ, আমাদেব ইন্দ্রিযসকল তাহাবই যন্ত্র, আমাদের ভাবাবেগ ও ইন্দ্রিয়ানুভূতিসকল তাহাবই আত্ম-আনন্দেব অন্বেষণ, আমাদের কর্ম তাহারই উদ্দেশ্যসাধনের উপায়, যতক্ষণ আমরা অজ্ঞান ততক্ষণ আমাদেব স্বাধীনতা হইতেছে কেবল একটা ছায়া, একটা ইঙ্গিত বা আভাস, কিন্তু যখন আমরা তাহাকে এবং নিজদিগকে জানিতে পারি তখন তাহা হয তাহারই অমব স্বাধীনতাব বিস্তাব ও কার্যকাবী যন্ত্র। আমাদেব প্রভুত্বসকল হইতেছে তাহারই কর্মরত শক্তির প্রতিচ্ছাযা, আমাদের সর্বোত্তম জ্ঞান তাহাবই আংশিক জ্যোতি, আমাদের আত্মার উচ্চতম ও প্রবলতম ইচ্ছাশক্তি বিশ্বেব প্রভু ও প্রাণস্বরূপ, সর্বভূতে অবস্থিত সেই পবমাত্মাবই ইচ্ছাশক্তিব অবতীর্ণ অংশ ও প্রতিভূ। ঈশ্বর সর্বভূতের হৃদযে অবস্থিত থাকিযা আমাদিগকে অজ্ঞানেব অবস্থায আমাদেব সকল বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ কর্মে এই নিম্নতন প্রকৃতিব মাযা দ্বাবা পরিচালিত করিতেছেন।[১] আব অজ্ঞানেব অন্ধকাবেই হউক অথবা জ্ঞানেব জ্যোতিতেই হউক আমবা আমাদেব মধ্যে অবস্থিত এবং জগতেব মধ্যে অবস্থিত সেই ঈশ্বরের জন্যই জীবন ধাবণ কবি। এই জ্ঞানে এবং এই সত্যে সচেতনভাবে বাস কবা—ইহাই হইতেছে অহং হইতে মুক্তি এবং মাযাব গণ্ডি ভাঙ্গিযা বাহিব হওযা। অন্য সকল শ্রেষ্ঠতম ধর্ম হইতেছে কেবল এই "ধর্মেব"ই আযোজন এবং সকল যোগসাধনা হইতেছে কেবল একটি উপায যাহা দ্বাবা আমবা আমাদেব সত্তার ঈশ্বরের সহিত, আমাদেব সত্তার অন্তঃপুরুষ ও আত্মাব সহিত প্রথমে কোনরূপ মিলনে উপনীত হই এবং শেষে পূর্ণ জ্যোতি লাভ কবিতে পাবিলে তাঁহাব সহিত সমগ্রভাবেই যুক্ত হই। সর্বশ্রেষ্ঠ যোগ হইতেছে আমাদেব প্রকৃতিব সকল বিভ্রান্তি, সকল সমস্যায় সকল প্রকৃতিব অন্তর্বাসী এই ঈশ্ববেবই শবণাপন্ন হওযা, আমাদের সমগ্র সত্তা লইযা, প্রাণ, দেহ, ইন্দ্রিয, মন ও হৃদয লইযা, আমাদের সকল উৎসর্গীকৃত জ্ঞান ও সঙ্কল্প ও কর্ম লইযা, সর্ব্বভাবেন, আমাদেব সচেতন আত্মার এবং আমাদের কবণভূতা প্রকৃতির সকল ধাবায তাঁহাব অভিমুখ হওয়া। আর যখন আমরা সকল সময়ে এবং সম্পূর্ণভাবে ইহা কবিতে পাবি তখন ভাগবত জ্যোতি ও প্রেম ও শক্তি আমাদিগকে অধিকাব কবিয়া লয, আত্মা ও কবণ উভয়কেই পূর্ণ কবিযা দেয, আমাদেব অন্তঃপুরুষ ও আমাদেব জীবন যেসকল সংশয, সমস্যা, ভ্রান্তি ও বিপদেব দ্বাবা আক্রান্ত হয় সেসবেব ভিতব দিযা আমাদিগকে নির্বিঘ্নে লইয়া যায়, আমাদেব অবিনাশী ও শাশ্বত পদেব পবম শান্তি ও অধ্যাত্ম মুক্তির মধ্যে লইয়া যায, পবাং শান্তিম্, স্থানম্ শাশ্বতম্।

[১] ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢানি মাযযা॥১৮।৬১

কাবণ গীতা নিজ যোগেব সকল নিযম ও ধর্ম এবং গভীরতম মর্ম দিবার পর, অধ্যাত্ম জ্ঞানেব রূপান্তবকাবী জ্যোতিব দ্বারা মানুষের মনের নিকট যেসকল প্রথম বহস্য প্রকট হয তাহাদেব উর্ধ্বে একটি আরও গভীরতর গুহ্যতর সত্য আছে ইহা বলিবাব পব সহসা বলিযা উঠিল, আরও একটি পরম বাক্য, পবমম্ বচঃ এবং সর্বগুহ্যতম সত্য এখনও বলিতে বাকী রহিয়াছে। এই গুহ্য হইতেও গুহ্য সত্যটি গুরু অর্জুনকে তাহাব পবম শ্রেযের জন্য ব্যক্ত করিবেন, কারণ সে হইতেছে নির্বাচিত ও প্রিয, ইষ্টোঽসি মে। কারণ ইহা সুস্পষ্ট যে, উপনিষদে যেমন বলা হইযাছে, ভগবান তাঁহার নির্বাচিত যে মহাত্মাব নিকট নিজের শরীরকেই প্রকট কবেন কেবল তাঁহাকেই এই রহস্য ব্যক্ত করা যায়, কারণ কেবল তিনিই হৃদয়ে, মনে ও প্রাণে ভগবানেব এত নিকটবর্তী যে তিনি তাঁহার সকল সত্তায় ইহাতে যথার্থভাবে সাডা দিতে পারেন এবং ইহাকে বাস্তব জীবনে সত্য করিযা তুলিতে পাবেন। গীতাব শেষ কথা, যে পবম বাক্যে শ্রেষ্ঠতম রহস্যটি প্রকাশ করিয়া গীতাব শিক্ষা সমাপ্ত কবা হইয়াছে, তাহা দুইটিমাত্র সংক্ষিপ্ত, সুস্পষ্ট, সরল শ্লোকে কথিত হইযাছে এবং তাহাদের আর কোন টীকা বা ব্যাখ্যা করা হয় নাই যেন তাহাবা আপনা হইতেই মনেব গভীরে প্রবেশ করে এবং অন্তরাত্মার প্রত্যক্ষ অনুভূতিতে নিজেদের অর্থের পূর্ণতা প্রকট করে। কারণ দৃশ্যত এত সামান্য ও সহজ এই কথাগুলি যে অসীম অর্থগৌরবে নিত্য পূর্ণ তাহা কেবলমাত্র এই আভ্যন্তরীণ সদা-প্রসাবমান অনুভূতিব দ্বাবাই সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতে পারে। আর এই কথাগুলি উচ্চাবিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা অনুভব করি যে, এইটির জন্যই শিষ্যেব অন্তবাত্মাকে এতক্ষণ ধবিয়া প্রস্তুত করা হইতেছিল, আর বাকী যাহাকিছু তাহা ছিল কেবল উদ্বুদ্ধ ও সমর্থ করিবার সাধনা ও শিক্ষা। ঈশ্বরের সেই গুহ্য হইতেও গুহ্য বাণীটি হইতেছে এই, "আমাতে মন দাও, আমার ভক্ত হও, আমার উদ্দেশে যজ্ঞ কব, আমাকে নমস্কার কর, তুমি আমাকে পাইবে, তোমাব নিকট ইহা আমার প্রতিজ্ঞা ও প্রতিশ্রুতি, কারণ তুমি আমার প্রিয়। সর্বধর্ম পবিত্যাগ কবিয়া একমাত্র আমার শবণ লও। আমি তোমাকে সকল পাপ ও অশুভ হইতে মুক্ত কবিব, শোক কবিও না।"[১]

গীতা ববাবব যোগেব একটি মহৎ এবং সুনির্দিষ্ট সাধনপ্রণালী, একটি উদার ও সুস্পষ্ট দার্শনিক মত দিতে চাহিয়াছে, স্বভাব ও স্বধর্মের উপর জোর দিয়াছে, সাত্ত্বিক ধর্ম কেমন কবিযা আত্ম-অতিক্রমণের দ্বারা নিজেকে ছাডাইয়া এই উচ্চতম গুণেবও সীমাব উর্ধ্বে সমুন্নীত এবং পরম উদাব অমৃতময জীবনের মুক্ত অধ্যাত্ম ধর্মে লইযা যায তাহা দেখাইয়া দিযাছে, সিদ্ধিলাভেব বহু নিয়ম, সাধন, বিধি ও

[১] মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥
সর্ব্বধর্ম্মান পবিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বা সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষযিষ্যামি মা শুচঃ॥১৮।৬৫-৬৬

বিধান দিয়াছে, আব এখন সহসা যেন নিজেবই সেই কাঠামোটি ভাঙ্গিযা দিযা মানবাত্মাকে কহিল, "সকল ধর্ম পরিত্যাগ কর, কেবল ভগবানেব নিকট, তোমাব ঊর্ধ্বে, তোমাব চতুর্পার্শ্বে, তোমার মধ্যে যে ঈশ্বর বহিয়াছেন তাঁহাব নিকট নিজেকে সমর্পণ কব, তোমার পক্ষে আব কিছুরই প্রযোজন নাই, ঐটিই হইতেছে সত্যতম, মহত্তম পন্থা, ঐটিই হইতেছে প্রকৃত মুক্তি।" জগতেব অধীশ্বব কুরুক্ষেত্রের দিব্য সারথিরূপে দিব্য গুরুরূপে মানুষের নিকট ভগবান ও পুরুষ ও আত্মা সম্বন্ধে মহান সত্যসমূহ ব্যক্ত কবিযাছেন, বহুল বৈচিত্র্যময জগতেব স্বরূপ ব্যক্ত কবিয়াছেন, ভগবানের সহিত মানুষেব মন, প্রাণ, হৃদয ও ইন্দ্রিযনিচযেব সম্বন্ধ ব্যক্ত করিয়াছেন এবং যে সর্বজয়ী সাধনাব দ্বারা মানুষ তাহাব নিজ অধ্যাত্ম আত্মসংযম ও প্রয়াসের ভিতর দিয়া মবজীবন হইতে অমৃতত্বেব মধ্যে উঠিতে পারে, তাহার সীমাবদ্ধ মানসিক জীবন হইতে অনন্ত অধ্যাত্ম জীবনেব মধ্যে উঠিতে পারে তাহা ব্যক্ত করিয়াছেন। আর এখন মানুষের মধ্যে, সর্বভূতেব মধ্যে অবস্থিত আত্মা ও ভগবান রূপে তিনি তাহাকে বলিলেন, "পবিশেষে এই সব ব্যক্তিগত প্রয়াস ও আত্মসংযমের কোন প্রয়োজন হইবে না, নিযম ও ধর্মেব সর্ববিধ অনুসরণ, সর্ববিধ গণ্ডিকে প্রতিবন্ধক ও ভাব বলিযা অবশেষে বর্জন করিতে পারিবে যদি তুমি আমার নিকট নিজেকে সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ কবিতে পার, তোমার মধ্যে ও সর্বভূতেব মধ্যে অবস্থিত আত্মা ও ভগবানেব উপবেই নির্ভর করিতে পাব। তোমাব সমগ্র মনকে আমাব দিকে ফিবাও, ইহাকে আমাব চিন্তায় এবং আমার সান্নিধ্যের অনুভূতিতে পূর্ণ কবিয়া তোল। তোমাব সমগ্র হৃদয়কে আমার দিকে ফিবাও, তুমি যেকোন কর্মই কব না কেন সবকে আমাব প্রতি যজ্ঞ ও নিবেদনে পবিণত কব। তাহা কবা হইলে তোমার জীবন ও অন্তবাত্মা ও কর্ম লইয়া আমাকে আমার ইচ্ছা সম্পাদন করিতে দাও, তোমাব মন, হৃদয, প্রাণ ও কার্যাবলী লইযা আমি যাহাই করি না কেন তাহাতে তুমি ব্যথিত বা বিভ্রান্ত হইও না যদিও তাহা মানুষ নিজেব সীমাবদ্ধ ইচ্ছা ও বুদ্ধিকে নিযন্ত্রিত কবিবাব জন্য নিজের উপর যেসব নীতি ও ধর্ম আবোপ করে সেসবেব অনুযাযী নহে বলিয়াই মনে হয়। আমার ধারাসকল হইতেছে পূর্ণতম জ্ঞান, শক্তি ও প্রেমেব ধারা, তাহা সব জিনিস জানে এবং সব জিনিসের এমন যোগাযোগ কবে যেন পবিণামফলটি হয সর্বাঙ্গসুন্দর, কাবণ তাহা সর্বাঙ্গসম্পন্ন পূর্ণতার বহুল সূত্রগুলিকে শোধন কবিতেছে, একত্র বয়ন করিতেছে। তোমাব সহিত এখানে তোমার যুদ্ধরথে অবস্থিত আমিই তোমার ভিতবে ও বাহিবে জগতেব অধীশ্বররূপে প্রকট হইয়াছি, আমি পুনরায় তোমাকে অমোঘ আশ্বাস, অব্যর্থ প্রতিশ্রুতি দিতেছি যে, আমি তোমাকে সকল দুঃখ, সকল অশুভেব ভিতব দিযা আমার নিকটেই লইযা আসিব। যত বাধা বা বিভ্রান্তিই আসুক না কেন, এ বিষযে নিশ্চিন্ত থাকিও যে, আমি তোমাকে বিশ্বসত্তাব মধ্যে এক পবিপূর্ণ দিব্যজীবনে এবং বিশ্বাতীত পুরুষেব মধ্যে এক অমৃতময প্রতিষ্ঠায লইযা যাইতেছি।

সকল গভীব অধ্যাত্ম বিদ্যা যে গুহ্য তত্ত্ব প্রকাশ কবে, যাহা বিভিন্ন শিক্ষায় প্রতিফলিত হয এবং অন্তঃপুরুষেব অভিজ্ঞতায় সমর্থিত হয, গীতাব পক্ষে সেইটি হইতেছে আমাদের মধ্যে লুক্কাযিত অধ্যাত্ম সত্তার তত্ত্ব, মন ও বাহ্য প্রকৃতি হইতেছে কেবল তাহাব প্রকাশ বা রূপ। এইটি হইতেছে পুরুষেব সহিত প্রকৃতিব নিত্য সম্বন্ধেব তত্ত্ব, যে অন্তর্যামী ভগবান হইতেছেন সকল জগতের অধীশ্বব এবং জগতেব রূপ ও গতিসমূহেব মধ্যে আমাদেব নিকট অদৃশ্য বহিয়াছেন তাঁহার তত্ত্ব। বেদান্ত, সাংখ্য ও যোগ নানাভাবে এই সকল সত্যই শিক্ষা দিয়াছে, গীতার প্রথম অধ্যাযগুলিতে ইহাদেবই সমন্বয কবা হইযাছে। আর তাহাদের সকল বাহ্যদৃষ্ট বিভিন্নতাব মধ্যে তাহাবা হইতেছে একই সত্য, আর যোগের সকল বিভিন্ন পন্থা হইতেছে অধ্যাত্ম অনুশীলনেব বিভিন্ন সাধনা, তাহাদের দ্বারা আমাদেব চঞ্চল মন ও অন্ধ প্রাণ প্রশান্ত হয, এই বহুমুখী অদ্বিতীয় একের দিকে ফিবিতে পারে এবং আত্মা ও ভগবানেব নিগূঢ় সত্য আমাদের নিকট এতই বাস্তব ও অন্তবঙ্গ হইযা উঠে যে আমবা হয তাহাদেব মধ্যে সজ্ঞানে বাস করিতে পারি, অথবা অনন্তেব মধ্যে আমাদেব স্বতন্ত্র সত্তাকে বিলুপ্ত কবিযা দিতে পাবি, তখন আর মনেব অজ্ঞান আদৌ আমাদিগকে অভিভূত করিতে পারে না।

গীতা যে গুহ্যতব তত্ত্বটি প্রকাশ কবিযাছে সেইটি হইতেছে দিব্য পুরুষোত্তমেব গভীব সামঞ্জস্যকাবী সত্য, তিনি একই সঙ্গে আত্মা এবং পুরুষ, পরব্রহ্ম এবং একমাত্র, অন্তবতম, বহস্যময, অনির্বচনীয় ভগবান। উহা চিন্তাতে আনিযা দেয চূড়ান্ত জ্ঞানেব জন্য বিশালতব ও গভীবতব ভিত্তি এবং অধ্যাত্ম অনুভূতিকে আনিযা দেয এক মহত্তব যোগ, যাহা পূর্ণতবভাবে সমন্বযকারী ও ব্যাপক। এই গভীবতব বহস্যটি হইতেছে পবা অধ্যাত্ম প্রকৃতি ও জীবের নিগূঢ় তত্ত্বেব উপব প্রতিষ্ঠিত, জীব হইতেছে সেই শাশ্বত এবং এই ব্যক্ত প্রকৃতি উভয়ত্র ভগবানেব অংশ এবং তাঁহাব অক্ষর আত্মপ্রতিষ্ঠাতে তাঁহাব সহিত অধ্যাত্ম সত্তায় এবং মূলত এক। অধ্যাত্ম অনুভূতিব গোড়ায ইহসংসাব ও বিশ্বাতীত সত্যের মধ্যে যে প্রভেদ কবা হয তাহাতে এই গভীবতব জ্ঞানটি ধবা পড়ে না, কারণ যিনি বিশ্বেব অতীত সত্তা তিনিই আবাব বাসুদেবঃ সর্ব্বম্, সর্বজীবেব হৃদযে অধিষ্ঠিত ঈশ্বর, সর্বভূতেব আত্মা, তিনি তাঁহাব প্রকৃতিতে যেসকল বস্তু অভিব্যক্ত কবিয়াছেন সেসবের তিনিই আদি, তিনিই পবম অর্থ। তিনি তাঁহাব বিভূতিসকলের মধ্যে প্রকট হইযাছেন, তিনি সেই কালপুরুষ যাঁহাব বশে জগতেব সকল ক্রিয়া চলিতেছে, তিনি সকল জ্ঞানেব সূর্য, জীবাত্মাব প্রেমিক ও প্রিয় এবং সকল কর্ম ও যজ্ঞেব অধীশ্বব। এই গভীবতর, সত্যতর, গুহ্যতব রহস্যেব অন্তরতম অনুভবের ফল হইতেছে গীতাব সমগ্র জ্ঞান, সমগ্র কর্ম, সমগ্র ভক্তিব যোগ। ইহা হইতেছে একই সঙ্গে অধ্যাত্ম বিশ্বভাবেব এবং মুক্ত ও সর্বাঙ্গসিদ্ধ অধ্যাত্ম ব্যক্তিত্বেব উপলব্ধি, ইহা হইতেছে ভগবানেব সহিত পূর্ণভাবে সংযুক্ত হওয়াব এবং তাঁহাব মধ্যে সমগ্রভাবে বাস কবাব উপলব্ধি—তাহাই জীবেব অমৃতত্বেব আশ্রয আবাব সেই সঙ্গেই

জগতে এবং শরীরে আমাদেব মুক্ত কর্মের আধাব ও শক্তি।

আর এখন বলা হইল পরম বাক্যটি, সর্বাপেক্ষা গুহ্য, গুহ্যতমম্—তাহা এই যে, পরমাত্মা ও ভগবান হইতেছেন সকল ধর্ম হইতে মুক্ত এক অসীম অনন্ত, আব যদিও তিনি নির্দিষ্ট বিধান অনুযায়ী জগৎ পরিচালনা কবেন এবং মানুষকে তাহাব জ্ঞান ও অজ্ঞান, পাপ ও পুণ্য, ন্যায ও অন্যায, বাগ, দ্বেষ ও উদাসীনতা, সুখ ও দুঃখ, হর্ষ, শোক ও বৈরাগ্য—এই সব ধর্মেব ভিতব দিয়া, তাহাব দেহগত, প্রাণগত, বুদ্ধিগত, হৃদয়গত, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বীতি, নীতি ও আদর্শেব ভিতর দিয়া লইয়া চলিয়াছেন, তথাপি পরমাত্মা ও ভগবান হইতেছেন এই সবেবই বহু ঊর্ধ্বে, আর আমবাও যদি ধর্মসকলের উপব নির্ভবতা বর্জন করিযা এই মুক্ত ও শাশ্বত পুরুষের নিকট আত্মসমর্পণ কবিতে পারি এবং যাহাতে আমবা পূর্ণতমভাবে, অনন্যভাবে তাঁহাব দিকে নিজদিগকে উন্মুক্ত বাখি শুধু সেই বিষযে যত্নবান হই এবং আমাদের অন্তরস্থ ভগবানের জ্যোতি ও শক্তি ও আনন্দেব উপব নির্ভব করি, ভয়শূন্য ও শোকশূন্য হইযা কেবলমাত্র তাঁহাবই পথনির্দেশ মানিযা চলি, তাহা হইলে সেইটিই হইবে সত্যতম, মহত্তম মুক্তি এবং তাহাই লইযা আসিবে আমাদেব সত্তাব ও প্রকৃতিব পূর্ণতম ও অবশ্যম্ভাবী সিদ্ধি। যাহাবা ভগবানের নির্বাচিত তাহাদিগকে এই পথই দেখান হয়, কেবল তাহাদিগকে যাহাবা তাঁহার প্রিয়তম, কারণ তাহারাই হইতেছে তাঁহাব নিকটতম এবং তাহাবাই তাঁহাব সহিত এক হইতে সর্বাপেক্ষা সমর্থ এবং তাঁহাবই ন্যায প্রকৃতিব উচ্চতম শক্তি ও ক্রিয়ায় স্বাধীনভাবে সম্মত ও সম্মিলিত হইযা জীবচৈতন্যে বিশ্বপ্রসাবী এবং অধ্যাত্ম সত্তায় বিশ্বাতীত হইতে সর্বাপেক্ষা অধিক সমর্থ।

কারণ অধ্যাত্ম অভিবিকাশে এমন এক সময আসে যখন আমবা জ্ঞাত হই যে, আমাদেব মধ্যে ও চতুর্দিকে যে মহত্তব সত্তা বিরাজ কবিতেছে তাহাবই নীবব ও নিগূঢ় প্রেরণার ফলে আমাদের মনে ও প্রাণে যে প্রতিক্রিযাব উদ্ভব হয, আমাদেব সকল চেষ্টা ও কর্ম হইতেছে তাহাই। আমাদেব উপলব্ধি হয যে, আমাদেব সকল যোগ, আমাদের অভীপ্সা ও প্রযাস হইতেছে অপূর্ণ বা সঙ্কীর্ণ কাবণ সেসবই মনের সংস্কাব, দাবি, বদ্ধ ধারণা, পক্ষপাতিত্ব দ্বাবা এবং বৃহত্তব সত্যেব ভ্রান্ত বা অসম্পূর্ণ অর্থের দ্বাবা বিকৃত হয়, অন্তত সীমাবদ্ধ হইযা পড়ে। আমাদেব ধাবণা ও অভিজ্ঞতা ও প্রয়াস হইতেছে মহত্তম জিনিসেব কেবল মানসিক প্রতিরূপ মাত্র, সে সমুদয অধিকতর পূর্ণভাবে, সাক্ষাৎভাবে, মুক্তভাবে, উদারভাবে বিশ্বগত ও শাশ্বত ইচ্ছার সহিত অধিকতব সামঞ্জস্যে সম্পাদিত হইবে কেবল যদি আমবা পবমতম ও পূর্ণতম শক্তি ও প্রজ্ঞাব হস্তে নিজদিগকে নির্বিবোধে অর্পণ কবিযা দিতে পারি। সেই শক্তি আমাদের হইতে পৃথক নহে, তাহা হইতেছে অন্য সকলেব আত্মার সহিত এক আমাদের নিজেদেবই আত্মা এবং সেই সঙ্গেই তাহা বিশ্বাতীত সত্তা এবং বিশ্বগত পুরুষ। আমাদের সত্তা, আমাদের কর্ম এই মহত্তম সত্তাব মধ্যে গৃহীত হইলে তখন আর তাহা এখন যেমন মনে হইতেছে এইরূপ মানসিক ভেদে

ব্যষ্টিগতভাবে আমাদের নিজেদের থাকিবে না। তাহা হইবে এক অনন্তের, এক অন্তবঙ্গ অনির্বচনীয ভাগবত সত্তার বিরাট ক্রিয়া; তাহা হইবে আমাদের মধ্যে এই গভীব বিশ্বগত আত্মা এবং এই বিশ্বাতীত পুরুষের নিত্য স্বতঃস্ফূর্ত রূপায়ণ ও অভিব্যক্তি। গীতাব শিক্ষা হইতেছে এই যে, উহা সমগ্রভাবে হইতে পারে কেবল যদি কোনকিছু অবশেষ না বাখিয়া আত্মসমর্পণ করা হয়; আমাদের যোগ, আমাদেব জীবন, আমাদের আভ্যন্তবীণ সত্তার অবস্থা সবকেই এই জাগ্রত অনন্তেব দ্বাবা অবাধে নির্ধাবিত হইতে হইবে, এই ধর্ম বা ঐ ধর্ম বা অন্য কোন ধর্মেব দিকে আমাদেব মনের আগ্রহেব দ্বারা যেন তাহা পূর্ব হইতেই নির্ধারিত না হয়। তখন যোগেশ্বর কৃষ্ণ স্বয়ং আমাদের যোগ গ্রহণ করিবেন, আমাদিগকে আমাদের পবমতম সিদ্ধিতে তুলিযা লইবেন, তাহা কোন বাহ্য বা মানসিক আদর্শ বা সঙ্কীর্ণ বিধির সিদ্ধি নহে, পবন্তু তাহা বিশাল ও ব্যাপক, মনের নিকট অপবিমেয। সে সিদ্ধি এক সর্বদর্শী প্রজ্ঞা দ্বারা সমগ্র সত্যের অনুসরণে বিকশিত হইবে, প্রথমে অবশ্য তাহা হইবে আমাদেব মানবীয় স্বভাবেবই সত্য, কিন্তু পরে এক মহত্তব জিনিসেব সত্য, তাহাতে আমাদেব স্বভাব রূপান্তরিত হইবে—সেই মহত্তব সত্য হইতেছে এক অপবিমেয়, অমর, মুক্ত ও সর্বরূপান্তরসাধক সত্তা ও শক্তি, তাহা ভাগবত ও অনন্ত প্রকৃতির জ্যোতি ও দীপ্তি।

সেই রূপান্তবের উপাদানরূপে সবকিছুকেই অর্পণ করিয়া দিতে হইবে। এক সর্বদর্শী চৈতন্য আমাদেব জ্ঞানকেও লইবে, আমাদের অজ্ঞানকেও লইবে, আমাদেব সত্যকেও লইবে, আমাদের ভ্রান্তিকেও লইবে, তাহাদের অসম্পূর্ণ রূপগুলি পবিহাব কবিবে, সর্ব্বধর্ম্মান্ পবিত্যজ্য, এবং সবকে তাহার অনন্ত জ্যোতিতে রূপান্তবিত করিযা লইবে। এক সর্বজয়ী শক্তি আমাদের পাপ পুণ্য, আমাদেব সৎ অসৎ, আমাদেব শক্তি এবং দুর্বলতা গ্রহণ কবিবে, তাহাদের জটিল রূপগুলি পবিহাব করিবে, সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য, এবং সবকে তাহার লোকোত্তব শুচিতা ও সার্বভৌম শুভ ও অব্যর্থ শক্তিতে রূপান্তরিত করিবে। এক অনির্বচনীয় আনন্দ আমাদেব ক্ষুদ্র সুখ-দুঃখ, আমাদের দ্বন্দ্বসঙ্কুল হর্ষ ও ব্যথা গ্রহণ করিবে, তাহাদেব অসঙ্গতি ও অপূর্ণ ছন্দসকল পবিহাব করিবে, সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য, এবং সবকে তাহার বিশ্বাতীত ও বিশ্বগত অকল্পনীয় আনন্দে রূপান্তরিত করিবে। সমস্ত যোগ মিলিযা যাহাকিছু কবিতে পারে সে-সমুদয় এবং তাহা অপেক্ষাও অধিক সম্পাদিত হইবে, কিন্তু কোন মানবীয় গুরু, সাধু বা জ্ঞানী ব্যক্তি আমাদিগকে যাহা দিতে পাবে তাহা অপেক্ষা এক মহত্তর দৃষ্টিসম্পন্ন ধারায়, এক মহত্তব জ্ঞান ও সত্যেব আলোকে তাহা সম্পাদিত হইবে। এই পরমতম যোগ আমাদিগকে যে আভ্যন্তবীণ অধ্যাত্ম অবস্থায লইয়া যাইবে তাহা এখানকাব সব কিছুবই ঊর্ধ্বে হইবে অথচ এখানকাব এবং অন্য জগৎসকলেব সকল জিনিসই তাহাব অন্তর্ভুক্ত হইবে, কিন্তু সবেবই হইবে অধ্যাত্ম রূপান্তর, কোন বাধা থাকিবে না, কোন বন্ধন থাকিবে না, সর্ব্বধর্ম্মান্ পবিত্যজ্য। ভগবানের অনন্ত সত্তা, চৈতন্য

ও আনন্দ নিজ স্থির নীরবতায় এবং উজ্জ্বল সীমাহীন ক্রিয়ায় সেখানে থাকিবে, সেইটিই হইবে তাহার মূলগত, ভিত্তিগত, সর্বগত উপাদান, রূপায়ণ ও স্বরূপ। অনন্তের সেই রূপায়ণের মধ্যে ভগবান প্রকটিত হইয়া প্রকাশ্যভাবে বাস করিবেন, আর তাঁহার যোগমায়ার দ্বারা সমাবৃত থাকিবেন না, এবং তাঁহার যখন যেমন ইচ্ছা হইবে তিনি আমাদের মধ্যে অনন্তের যেকোন আকার গড়িয়া তুলিবেন, তাঁহার স্বয়ংসিদ্ধ সঙ্কল্প ও অবিনশ্বর আনন্দ অনুসারে জ্ঞান, চিন্তা, প্রেম, অধ্যাত্ম আনন্দ, শক্তি ও কর্মের জ্যোতির্ময় রূপসমূহ সৃষ্টি করিবেন। আর মুক্ত আত্মা ও অবিকৃত প্রকৃতির উপর কোন বাধা বন্ধনের সৃষ্টি হইবে না, কোনও একটা নিম্নতন রূপায়ণে তাহা চিরবদ্ধ হইয়া পড়িবে না। কারণ সমগ্র ক্রিয়াটি আত্মার শক্তিতে দিব্য স্বাধীনতায় সম্পাদিত হইবে, সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য। পরম আত্মায়, পরম ধামে বিচ্যুতিহীন নিবাসই হইবে সেই অধ্যাত্ম অবস্থার ভিত্তি এবং দৃঢ় প্রতিষ্ঠা। সিদ্ধিপ্রদ শক্তি হইবে বিশ্বসত্তা এবং সকল জীবের সহিত এমন অন্তরঙ্গ জ্ঞানময় একত্ব যাহা ভেদাত্মক মনের অশুভ ও দুঃখ হইতে মুক্ত হইবে অথচ সকল সত্য প্রভেদকে যথাযথভাবে স্বীকার করিয়া লইবে। এই পূর্ণাঙ্গ মুক্তির ফল হইবে নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ এবং এখানে ভগবানের সহিত এবং ভগবান যাহা কিছু হইয়াছেন সেসবের সহিত সনাতন জীবের একত্ব ও সুসঙ্গতি। আমাদের মানবজীবনের যেসকল সমস্যার সমাধান খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, অর্জুনের সমস্যা হইতেছে যাহাদের একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত, সে সমুদয়ই সৃষ্ট হইয়াছে অজ্ঞানের মধ্যে আমাদের ভেদাত্মক ব্যক্তিত্বের দ্বারা। এই যোগ মানুষের আত্মাকে ভগবানের সহিত এবং বিশ্বজীবনের সহিত তাহার যথার্থ সম্বন্ধে প্রতিষ্ঠিত করে, আমাদের কর্ম হয় ভগবানের কর্ম, তাঁহারই জ্ঞান ও ইচ্ছা দ্বারা গঠিত ও প্রযোচিত, আমাদের জীবন হয় ভাগবত আত্ম-অভিব্যক্তির সুসঙ্গতি—সেই জন্যই ইহা হইতেছে ঐ সকল সমস্যার সম্পূর্ণ নিরসনের প্রকৃত পন্থা।

সমগ্র যোগটি প্রকাশ করা হইল, শিক্ষার পরম বাক্যটি কথিত হইল এবং ভগবৎ-নির্বাচিত মানব অর্জুন পুনরায় দিব্য কর্মটিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তবে আর তাঁহার অহংভাবপূর্ণ মন লইয়া নহে পরন্তু শ্রেষ্ঠতম আত্মজ্ঞান লইয়া। ভগবানের বিভূতি এখন মানবজীবনের মধ্যেই দিব্যজীবনের জন্য প্রস্তুত হইলেন, তাঁহার সচেতন আত্মা মুক্তপুরুষের কর্মের জন্য প্রস্তুত হইল, মুক্তস্য কর্ম্ম। মনের মোহ বিনষ্ট হইল, নিজ আত্মা ও নিজ সত্য সম্বন্ধে জীবের যে স্মৃতি আমাদের জীবনের ভ্রান্তিকর দৃশ্য ও রূপসকলের দ্বারা এযাবৎ প্রচ্ছন্ন ছিল তাহা ফিরিয়া আসিল এবং সেই স্মৃতিই হইল তাঁহার সাধারণ চৈতন্য, সকল সংশয় ও বিভ্রান্তি বিদূরিত হইল, এখন তিনি ভগবদ্ আজ্ঞা পালন করিতে অগ্রসর হইতে পারেন, আমাদের এবং আমাদের সত্তার ঈশ্বর, দেশ ও কালে প্রকট বিশ্বপুরুষ তাঁহাকে যেকোন কর্মে নিযুক্ত করুন, তাঁহার উপর যেকোন কর্মের ভার অর্পণ করুন তিনি এখন নিষ্ঠার সহিত ভগবানের জন্য জগতের জন্য সেই কর্ম করিতে অগ্রসর হইতে পারেন।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

গীতা-শিক্ষার সারমর্ম

তাহা হইলে গীতার বাণীটি কি, ইহা যখন লিখিত হইয়াছিল তাহার পর বহু দীর্ঘ যুগ অতীত হইয়া গিয়াছে, মানুষের চিন্তার ও অভিজ্ঞতার বিপুল রূপান্তর ঘটিয়া গিয়াছে, আজিকার মানবীয় মনের পক্ষে ইহার ব্যবহারিক মূল্য কি? মানুষের মন সর্বদাই সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইতেছে। তাহার দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তিত করিতেছে, আর ঐ সকল পরিবর্তনের ফল হইতেছে এই যে, প্রাক্তন চিন্তাধারাসকল অচল হইয়া পড়িতেছে, অথবা যখন তাহারা সংরক্ষিত হইতেছে তখনও তাহারা প্রসারিত, সংশোধিত হইতেছে এবং সূক্ষ্মভাবেই হউক আর প্রকাশ্যভাবেই হউক তাহাদের মূলের পরিবর্তন হইয়া যাইতেছে। কোন প্রাচীন শিক্ষা স্বভাবত এইরূপ পরিবর্তনের কতখানি উপযোগী তাহাতেই তাহার জীবনী-শক্তির পরিচয়, কারণ তাহার অর্থ হয় এই যে, তাহার চিন্তার বাহ্যরূপে যতই অপূর্ণতা বা অনুপযোগিতা থাকুক না কেন, সারবস্তুর যে সত্য, জীবন্ত দৃষ্টির ও উপলব্ধির যে সত্য তাহার ভিত্তিস্বরূপ ছিল তাহা এখনও অক্ষত রহিয়াছে, স্থায়ী উপযোগিতা ও সার্থকতা বজায় রাখিয়াছে। গীতা-গ্রন্থখানি আশ্চর্যভাবে টিকিয়া আছে, ইহা যখন প্রথমে মহাভারতে প্রকাশিত হইয়াছিল অথবা মহাভারতের মধ্যে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছিল প্রায় তখনকার ন্যায়ই ইহা এখনও তেমনিই অম্লান রহিয়াছে, ইহার প্রকৃত সারবস্তু তেমনই নূতন রহিয়াছে, কারণ সকল সময়েই অনুভূতি উপলব্ধি দ্বারা ইহাকে নূতন করিয়া পাওয়া যায়। ভারতে যেসকল মহান শাস্ত্র ধর্মবিষয়ে সর্বাপেক্ষা প্রামাণ্য বলিয়া পরিগণিত, গীতা এখনও তাহাদের মধ্যেই গণ্য হয় এবং প্রায় সকল ধর্মমত ও পথই ইহাকে সমগ্রভাবে গ্রহণ করিতে না পারিলেও গীতার শিক্ষাকে পরম মূল্যবান বলিয়া স্বীকার করে। ইহার প্রভাব যে শুধু দর্শন ও বিদ্যার অনুশীলনেই সীমাবদ্ধ তাহা নহে, চিন্তা ও কর্ম উভয় ক্ষেত্রেই ইহার প্রভাব সাক্ষাৎ ও জীবন্ত, একটা জাতির, একটা সভ্যতার পুনরুজ্জীবনে ইহার ভাবগুলি প্রবল গঠনশক্তিরূপে বাস্তবিক কার্য করিতেছে। একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি সম্প্রতি এমন পর্যন্ত বলিয়াছেন যে, আমাদের পক্ষে অধ্যাত্মজীবনের জন্য যাহা কিছু অধ্যাত্ম সত্য প্রয়োজন সেসবই গীতার মধ্যে পাওয়া যাইবে। এই কথাটি বর্ণে বর্ণে গ্রহণ করিলে গীতা সম্বন্ধে অন্ধ বিশ্বাসকেই প্রশ্রয় দেওয়া হয়। তত্রাচ ইহা বলা যাইতে পারে যে, মূল সূত্রগুলির অধিকাংশই উহার মধ্যে রহিয়াছে, আর পরবর্তী অধ্যাত্ম উপলব্ধি ও আবিষ্কারের সকল অভিবিকাশের পরও আমরা উদার অনুপ্রেরণা ও পথনির্দেশের জন্য গীতাকেই অবলম্বন করিতে পারি। তাহা হইলে গীতার শিক্ষার, গীতার

সত্যের এই যে প্রাণশক্তি ইহা কোথা হইতে আসিল?

গীতার দর্শন ও যোগের প্রধান লক্ষ্য হইতেছে আভ্যন্তরীণ অধ্যাত্ম সত্যের পূর্ণতম ও সমগ্রতম উপলব্ধির সহিত মানবীয় জীবন ও কর্মের বাহ্য বাস্তবতার সামঞ্জস্য সাধন, এমনকি একপ্রকার ঐক্য সাধন—এই পরিকল্পনা লইয়াই গীতার আরম্ভ, মধ্য ও শেষ। এই দুইয়ের মধ্যে সাধারণত একটা আপোস করা হইয়া থাকে, কিন্তু তাহা কখনই চরম এবং সন্তোষজনক সমাধান হইতে পারে না। আধ্যাত্মিকতাকে নৈতিক রূপও সাধারণত দেওয়া হয় এবং সদাচারের নীতি হিসাবে ইহার মূল্য আছে; কিন্তু উহা হইতেছে একটা মানসিক সমাধান, উহাতে আত্মার সমগ্র সত্যের সহিত জীবনের সমগ্র সত্যের পূর্ণ ব্যবহারিক সামঞ্জস্য হয় না, আর উহাতে যত সমস্যার সমাধান হয় তত নূতন সমস্যারও উদ্ভব হয়। বস্তুত এইরূপ একটি সমাধান লইয়াই গীতার আরম্ভ, যে দ্বন্দ্ব হইতে উত্থিত একটি সমস্যা লইয়া গীতা-শিক্ষার সূত্রপাত হইয়াছে তাহার এক দিকে রহিয়াছে কর্মীর ধর্ম, ক্ষত্রিয়ের ধর্ম, রাজপুত্র, যোদ্ধা ও নেতার ধর্ম, এক যুগসন্ধির প্রধান নায়কের ধর্ম, বাহ্য জগতের বাস্তবজীবনের ক্ষেত্রে ন্যায় ও ধর্মের শক্তিসকলের সহিত অন্যায় অধর্মের শক্তিসকলের সংগ্রামে প্রধান নায়কের ধর্ম, তিনি বাধা দিবেন, যুদ্ধ করিবেন, ভীষণ বাহ্য সংগ্রাম ও বিরাট হত্যাকাণ্ডের ভিতর দিয়াও জগতে সত্য, ন্যায় ও ধর্মের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিবেন—তাঁহার প্রতি মানবজাতির ভাগ্যনির্ণয়ের এই মহান আহ্বান, আর অন্য দিকে রহিয়াছে নৈতিক বোধ, তাহা এই পন্থা ও কর্মকে পাপ বলিয়া নিন্দা করিতেছে, ব্যক্তিগত দুঃখ ও সামাজিক দ্বন্দ্ব, বিশৃঙ্খলা, বিক্ষোভরূপ মূল্য দিতে পশ্চাৎপদ হইতেছে এবং যুদ্ধ ও হিংসা হইতে নিবৃত্তিকেই একমাত্র পন্থা ও প্রকৃত নৈতিক ও ন্যায়সঙ্গত আচরণ বলিয়া নির্দেশ করিতেছে। অধ্যাত্মভাবাপন্ন নৈতিকতা অধ্যাত্ম আচরণের সর্বশ্রেষ্ঠ বিধিস্বরূপ অহিংসার উপর, অনিষ্ট না করা এবং হত্যা না করার উপরই জোর দেয়। যদি যুদ্ধ করিতেই হয় তাহা হইলে অধ্যাত্ম স্তরেই যুদ্ধ করিতে হইবে এবং তাহা করিতে হইবে কোন রকমের অপ্রতিরোধ বা অসহযোগের দ্বারা, আর যদি ইহার দ্বারা বাহ্য ক্ষেত্রে ফল না পাওয়া যায়, যদি অন্যায়ের শক্তি জয়লাভই করে তাহা হইলেও ব্যক্তিবিশেষ নিজের ধর্ম বজায় রাখিতে পারিবে এবং নিজ দৃষ্টান্তের দ্বারা উচ্চতম আদর্শটিকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিবে। অন্যপক্ষে আধ্যাত্মিক অন্তর্মুখীনতার দাবি যদি আরও চরমে উঠে, সামাজিক কর্তব্য এবং অলঙ্ঘ্য নৈতিক আদর্শের এই দ্বন্দ্বকে ছাড়াইয়া যাইতে চায় তাহা হইলে তাহা বৈরাগ্যের দিকে ঝুঁকিতে পারে, জীবন ও তাহার কর্মের আদর্শ ও নীতিসকলকে দূরে রাখিয়া অন্য এক স্বর্গীয় অথবা বিশ্বাতীত অবস্থার দিকে নির্দেশ করিতে পারে, কেবল সেইখানেই মানুষের জন্ম, জীবন ও মৃত্যুর বিভ্রান্তিকর অসারতা ও মিথ্যার ঊর্ধ্বে শুদ্ধ অধ্যাত্মজীবন সম্ভব হয়। গীতা ইহাদের প্রত্যেকটিকেই যথাস্থানে গ্রহণ করিয়াছে, কারণ উহা সামাজিক কর্তব্য পালনের উপর জোর দিয়াছে, যে

মানুষকে সার্বজনীন কর্মে যোগদান করিতে হইবে তাহার পক্ষে ধর্ম অনুসরণ করার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়াছে, উচ্চতম অধ্যাত্ম-নৈতিক আদর্শের অঙ্গস্বরূপ অহিংসাকে স্বীকার করিয়াছে এবং অধ্যাত্মমুক্তির পন্থাস্বরূপ সন্ন্যাসের উপযোগিতা স্বীকার করিয়াছে। অথচ গীতা নিঃসঙ্কোচে এই সকল পরস্পর-বিরোধী আদর্শের ঊর্ধ্বে চলিয়া গিয়াছে; বিপুল সাহসের সহিত সমস্ত জীবনকেই এক অদ্বিতীয় ভগবানের অর্থপূর্ণ অভিব্যক্তি বলিয়া তাহার সহিত আত্মার সামঞ্জস্য করিয়াছে এবং অনন্তের সহিত যোগে, পরমতম আত্মার সহিত সামঞ্জস্যে, সিদ্ধতম ভগবানের অভিব্যক্তিরূপে যে পরিপূর্ণ অধ্যাত্ম-জীবনযাপন করা যায় তাহার সহিত পরিপূর্ণ মানবীয় কর্মের সামঞ্জস্য দেখাইয়া দিয়াছে।

মানবজীবনের সকল সমস্যার উদ্ভব হইতেছে আমাদের সত্তার বহুলাঙ্গতা হইতে, ইহার মূল তত্ত্বের দুর্জ্ঞেয়তা হইতে, আর যে অন্তরতম শক্তি ইহার রূপসকল নির্ধারণ করিতেছে, উহার উদ্দেশ্য ও পদ্ধতিসমূহ নিয়ন্ত্রণ করিতেছে তাহার গুহ্যতা হইতে। যদি আমাদের সত্তা হইত একই উপাদানে গঠিত, শুধুই জড়গত প্রাণ বা শুধুই মন বা শুধুই আত্মা, এমনকি যদি ইহাদের একটিরই মধ্যে অন্যগুলি সম্পূর্ণভাবে কিংবা প্রধানত নিহিত থাকিত অথবা আমাদের অবচেতন বা অতিচেতন অংশে সম্পূর্ণ সুপ্ত থাকিত, তাহা হইলে আমাদিগকে কিছুতে আদৌ বিভ্রান্ত হইতে হইত না, জড় ও প্রাণের ধর্মই একান্ত প্রবল হইত অথবা মনের ধর্ম তাহার নিজ শুদ্ধ ও বিবোধশূন্য সত্তার নিকট সুস্পষ্ট হইত অথবা অধ্যাত্ম ধর্ম আত্মার নিকট স্বপ্রতিষ্ঠ ও স্বতঃসিদ্ধ হইত। পশুরা কোন সমস্যার খবর রাখে না, শুদ্ধ মনের জগতের কোন মনোময় দেবতা কোন সমস্যাকেই আমল দিবে না অথবা বিশুদ্ধ মানসিক নীতির দ্বারাই সকল সমস্যার সমাধান করিয়া ফেলিবে কিংবা বুদ্ধিগত সুসঙ্গতি পাইলেই তৃপ্ত হইবে। শুদ্ধ আত্মা এসকল সমস্যার ঊর্ধ্বে থাকিবে, অনন্তের মধ্যে আত্মতুষ্ট হইয়া থাকিবে। কিন্তু মানুষের জীবন হইতেছে তিন জিনিসের মিশ্রণ, উহা একই সঙ্গে ভৌতিক-প্রাণময়, মনোময় এবং আধ্যাত্মিক এক রহস্যপূর্ণ জিনিস, আর মানুষ জানে না যে, এই সকল জিনিসের মধ্যে সত্যিকারের সম্বন্ধ কি, তাহার জীবনের এবং তাহার প্রকৃতির প্রকৃত সত্য কোন্‌টি, তাহার ভাগ্যের আকর্ষণ কোন্ দিকে, তাহার সিদ্ধির ক্ষেত্র কোথায়।

জড় এবং প্রাণ হইতেছে তাহার বাস্তব ভিত্তি, ঐটি লইয়াই সে আরম্ভ করে, ঐটির উপরেই তাহার প্রতিষ্ঠা, তাহাকে যদি আদৌ এই পৃথিবীতে এবং এই শরীরের মধ্যে টিকিয়া থাকিতে হয় তাহা হইলে তাহাকে উহার প্রয়োজন মিটাইতেই হইবে, উহার বিধান পালন করিতে হইবে। জড় ও প্রাণের ধর্ম হইতেছে উদ্বর্তনের নীতি, দ্বন্দ্বের নীতি, বাসনা ও পরিগ্রহের নীতি, শরীর, প্রাণ ও অহং-এর আত্মপ্রতিষ্ঠা ও তৃপ্তির নীতি। যত যুক্তি, যত নৈতিক আদর্শবাদ এবং চরম আধ্যাত্মিকতা মানুষের উচ্চতর বৃত্তিগুলির পক্ষে সম্ভব সেসব দিয়াও আমাদের ভিত্তিস্বরূপ প্রাণ ও দেহের সত্য ও দাবিকে উড়াইয়া দেওয়া যায় না,

মানবজাতি প্রকৃতিব অলঙ্ঘ্য প্রেরণায় যে উহাদের লক্ষ্যসকল অনুসরণ কবিতে, উহাদের প্রয়োজনসকল মিটাইতে চায, উহাদেব গুরুতব সমস্যাগুলিকে মানবীয় ভবিষ্যতের, মানবীয় আকিঞ্চন ও প্রচেষ্টাব গুরুত্বপূর্ণ ও বৈধ অংশ করিতে চায তাহা নিবারণ করা যায় না। এমনকি যেসব আধ্যাত্মিক ও আদর্শবাদমূলক সমাধান আব সবকিছুরই সমাধান কবে, কেবল আমাদের বাস্তব মানবজীবনেব আসন্ন প্রয়োজনীয় সমস্যাগুলিব কোন সমাধান করিতে পারে না মানুষেব বুদ্ধি সেসব সমাধানে তৃপ্তি না পাইয়া প্রায়ই তাহাদের প্রতি বিমুখ হয, একান্তভাবে প্রাণ ও দেহের জীবনকেই গ্রহণ কবে এবং যুক্তি অথবা সহজাত প্রেবণাব অনুসবণে তাহাবই যতদূর সম্ভব সাফল্য, স্বাচ্ছন্দ্য ও সুব্যবস্থিত পবিতৃপ্তি চায। জীবনকে বরণ করিতে হইবে অথবা বুদ্ধি-অনুগত প্রাণ ও জড়দেহেব সিদ্ধি-শক্তিলাভ করিতে হইবে—এইরূপ মতবাদই মানবজাতিব সাধারণসম্মত ধর্ম হইযা পড়ে, আব অন্য যাহা কিছু সেসবই মিথ্যা আডম্বব বলিযা অথবা একান্ত অপ্রধান বস্তু বলিয়া, সামান্য ও আপেক্ষিক ভাবে উপযোগী গৌণ বিষয বলিযা বিবেচিত হয।

কিন্তু জড়দেহ ও প্রাণের দাবি যতই তীব্র হউক এবং তাহাদেব প্রযোজনীযতা যতই বড় হউক তাহারাই মানুষেব সব নহে, আব ইহাও সে পুবাপুবি মানিয়া লইতে পারে না যে, মন কেবল প্রাণ ও দেহেব ভৃত্য মাত্র, তাহাকে যে নিজস্ব শুদ্ধ ভোগ কিছু দেওয়া হয় সেটা কেবল তাহার কাজেব পুবস্কাবস্বরূপ, অথবা ভাবিতে পাবে না যে, মন কেবল প্রাণশক্তিব প্রসাবণ বা স্ফুবণ মাত্র, দৈহিক জীবনের তৃপ্তিসাধন করিবাব পর উহা কেবল একটা আদর্শ-বিলাস মাত্র। দেহ ও প্রাণ অপেক্ষাও অনেক বেশী অন্তবঙ্গভাবে মনই হইতেছে মানুষ, আব এই মন যত বিকশিত হয তত সে নিজেব ধর্মানুযাযী তৃপ্তি ও আত্মবিকাশেব জন্য দেহ ও প্রাণকে একটা যন্ত্ররূপে ব্যবহাব কবিতে চায—সে যন্ত্র অপবিহার্য অথচ প্রবল বাধাস্বরূপ, নতুবা কোন সমস্যাই থাকিত না। মানুষেব মন কেবলই প্রাণগত ও দেহগত বুদ্ধি নহে, তাহা হইতেছে যুক্তিশীল, বসাশ্রয়ী, নৈতিক, আত্মিক, ভাবাবেগময় ও কর্মময় বুদ্ধি, এইসকল প্রবৃত্তিব প্রতিক্ষেত্রেই ইহাব ঊর্ধ্বতম ও বলবত্তম প্রকৃতি হইতেছে তাহাদের এমন কোনরূপ চবম বিকাশেব জন্য তীব্র প্রয়াস করা যাহাকে প্রাণেব কাঠামোর মধ্যে সম্পূর্ণভাবে ধবা যায় না, যাহাকে এখানে রূপ দিয়া সম্পূর্ণভাবে সত্য কবিযা তোলা যায় না। মনের এই যে চবম আদর্শ আমাদেব আকাঙ্ক্ষাব বস্তু তাহা আংশিকভাবে উপলব্ধ প্রোজ্জ্বল বা জ্বলন্ত আদর্শরূপেই থাকিয়া যায, মন সেটিকে অন্তবেব মধ্যে বেশ প্রত্যক্ষ কবিতে পাবে, তাহার জন্য প্রযাস করিবাব তাগিদ অন্তবের মধ্যে অনিবার্য কবিতে পাবে, এমনকি আংশিকভাবে সেটিকে সিদ্ধ করিয়া তুলিতে পাবে, কিন্তু জীবনেব সকল বাস্তব অংশকে তাহার অনুযাযী হইতে বাধ্য করিতে পারে না। এইরূপ একটি চবম আদর্শ হইতেছে বুদ্ধিগত সত্য ও যুক্তির অলঙ্ঘ্য নীতি, আমাদেব তর্কবুদ্ধি ইহাবই সন্ধান করে; আব একটি চবম আদর্শ হইতেছে ন্যায ও আচরণেব অলঙ্ঘ্য নীতি,

এইটি হইতেছে নৈতিক বোধেব লক্ষ্য; আব একটি চবম আদর্শ হইতেছে প্রেম, সহানুভূতি, করুণা, ঐক্যেব অলঙ্ঘ্য নীতি, এইটি হইতেছে আমাদের হৃদয় ও অন্তঃপুরুষেব আকাঙ্ক্ষাব বস্তু, আর একটি চরম আদর্শ হইতেছে আনন্দ ও সৌন্দর্যেব অলঙ্ঘ্য নীতি, বসগ্রাহী সত্তা ইহাতেই স্পন্দিত হয়; আব একটি চরম আদর্শ হইতেছে আভ্যন্তবীণ আত্মসংযম এবং জীবন-জয়ের অলঙ্ঘ্য নীতি, কর্মময়ী ইচ্ছাশক্তি ইহাব জন্য প্রযাস কবে, এই সবই একসঙ্গে রহিয়াছে, আমাদেব প্রাণগত ও দেহগত মন যে স্বাধিকাব, ভোগ ও নির্বিঘ্ন দৈহিক জীবনযাত্রাকেই চবম আদর্শ, অলঙ্ঘ্য নীতি বলিযা ধরিয়া থাকে, পূর্বোক্ত আদর্শগুলি ইহাব মধ্যে আসিযা প্রতিষ্ঠার দাবি কবিতেছে। মানুষের বুদ্ধি ইহাদেব কোন একটিকেও পূর্ণভাবে সিদ্ধ করিতে পাবে না, সবগুলিকে তো দূরের কথা, সেই হেতু উহা প্রতি ক্ষেত্রে নানা আদর্শ ও ধর্ম খাডা কবে, সত্য ও যুক্তিব আদর্শ, ন্যায ও সদাচাবেব আদর্শ, আনন্দ ও সৌন্দর্যেব আদর্শ, প্রেম, সহানুভূতি ও ঐক্যেব আদর্শ, আত্মজয ও সংযমেব আদর্শ, আত্মরক্ষা ও স্বাধিকার ও প্রাণিক দক্ষতা ও ভোগের আদর্শ—এবং এইসব দিযা জীবনকে নিযন্ত্রিত করিতে চায়। চবম সমুজ্জ্বল আদর্শগুলি বহু ঊর্ধ্বে আমাদেব সামর্থ্যেব অতীত থাকিযা যায, ক্বচিৎ কেহ যথাসাধ্য তাহাদেব নিকটবর্তী হয, জনসাধাবণ কোন অপেক্ষাকৃত কম গৌববময প্রতিমান, কোন গতানুগতিক সুসাধ্য ও সীমাবদ্ধ নীতিই অনুসবণ কবে। মানবজীবন মোটেব উপর আদর্শটিব আকর্ষণ অনুভব করে, অথচ উহাকে প্রত্যাখ্যান কবে। প্রাণেব আছে তাহাব নিজস্ব একটি অস্পষ্ট অনন্ত সত্তা, তাহারই শক্তিতে সে সকল প্রতিষ্ঠিত মানসিক বা নৈতিক বিধিবিধানকে বাধা দেয়, তাহাদিগকে ক্ষয কবিযা দেয বা ভাঙ্গিয়া দেয। আব এইরূপই হইতে বাধ্য, কাবণ মন ও প্রাণ দুইটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন ও বিসদৃশ তত্ত্ব হইয়াও পবস্পরেব সংস্পর্শে আসিযা পবস্পবেব উপব ক্রিযা কবে অথবা প্রাণেব যে সমগ্র সত্য মন তাহার প্রকৃত সূত্রেব সন্ধান জানে না। সে সূত্রেব সন্ধান করিতে হইবে মহত্তব কোন বস্তুর মধ্যে, মানুষেব মন ও নৈতিকতাব ঊর্ধ্বে কোন অজ্ঞাত তত্ত্বেব মধ্যে।

এইরূপ কোন একটি ঊর্ধ্বতন তত্ত্ব সম্বন্ধে মনেব একটা অস্পষ্ট অনুভূতি আছে, মন তাহাব বিভিন্ন চবম আদর্শসকলেব অনুসবণ কবিতে গিযা প্রায়ই ইহাব সংস্পর্শে আসিয়া পড়ে। সে এমন এক অবস্থা, এক শক্তি, এক প্রভাবেব আভাস পায যাহা তাহাব সন্নিকট, তাহাব অন্তরস্থিত ও অন্ততরতম, অথচ তাহা অপেক্ষা অমিতভাবে মহত্তব এবং বিশেষভাবে তাহা হইতে দূববর্তী ও তাহাব ঊর্ধ্বে স্থিত; সে এমন একটি জিনিস দেখিতে পায় যাহা তাহার নিজের পূর্ণতম আদর্শসকল অপেক্ষাও অধিকতব সাবভূত, অধিকতর পূর্ণ, অন্তবতম, অনন্ত, অদ্বিতীয় এবং সেইটিকেই আমবা ভগবান, আত্মা বা ব্রহ্ম বলিয়া অভিহিত কবি। তখন মন এইটিকে জানিতে, ইহাব মধ্যে প্রবেশ কবিতে, ইহাকে স্পর্শ করিতে এবং সমগ্রভাবে ধবিতে প্রযাস কবে, ইহাব সন্নিকটবর্তী হইতে অথবা ইহাই হইয়া

উঠিতে প্রযাস করে, সেই আশ্চর্যময বস্তুব সহিত কোনরূপ ঐক্যে উপস্থিত হইতে অথবা তাহার সহিত সম্পূর্ণ একাত্মতায় সম্পূর্ণভাবে নিজেকে বিলীন কবিতে প্রয়াস করে। সমস্যা হইতেছে এই যে, মনেব চরম আদর্শগুলি অপেক্ষাও এই আত্মা নিজ বিশুদ্ধ সত্তায জীবনেব বাস্তব পবিস্থিতিসকল হইতে অধিকতব দূরবর্তী বলিয়া মনে হয, মন তাহাকে নিজেব ভাবে প্রকট কবিতে পাবে না, জীবন ও কর্মের মধ্যে প্রকট কবা তো দূবের কথা। সেই জন্যই আমবা দেখিতে পাই, চরম অধ্যাত্মবাদীগণ মানসিক সত্তাকে প্রত্যাখ্যান কবেন, শাবীবিক সত্তাকে ধিক্কৃত করেন এবং প্রাণ ও মন লইযা আমবা যাহা কিছু হইযাছি সেসবকে লয করিয়া বিনিময়ে যে শুদ্ধ অধ্যাত্ম সত্তা লাভ কবা যায়, নির্বাণ লাভ কবা যায, তাহাবই জন্য আকাঙ্ক্ষা কবেন। এইসব গোঁড়া অধ্যাত্মবাদীব নিকট অধ্যাত্ম সাধনাব আর সবকিছু হইতেছে মনকে প্রস্তুত কবা অথবা একটা আপোস কবা, প্রাণ ও মনকে যতদূর সম্ভব অধ্যাত্মভাবাপন্ন কবিযা তোলা। আব কার্যত যে সমস্যাটি মানুষের মনকে সর্বাপেক্ষা বেশী বিব্রত করে সেটি হইতেছে তাহার প্রাণসত্তার বিভিন্ন দাবি, তাহাব জীবন ও আচবণ ও কর্মেব সমস্যা, সেইজন্য ঐরূপ প্রস্তুত হইয়া উঠিবার সাধনায প্রধান লক্ষ্য হয হৃদযবৃত্তির দ্বাবা সমর্থিত নৈতিক মনকে অধ্যাত্মভাবাপন্ন কবিয়া তোলা—অথবা উহা আধ্যাত্মিক শক্তি ও শুচিতা আনিয়া নৈতিক মনকে ও হৃদযকে তাহাদেব নিজ নিজ চরম আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিতে সাহায্য কবে, ন্যায় ও সত্য আচরণের নৈতিক আদর্শকে অথবা প্রেম ও সহানুভূতি ও ঐক্যেব হৃদ্‌গত আদর্শকে জীবন যে মর্যাদা দেয তাহা অপেক্ষা এক মহত্তর মর্যাদা আনিযা দেয। এইগুলিকে এক উচ্চতম অভিব্যক্তি দেওয়া যায়, তাহাদের এক প্রশস্ততম জ্ঞানময ভিত্তি পাওয়া যায যখন বুদ্ধি ও সঙ্কল্প ইহাদের অন্তরতম সত্যরূপে আত্মাব চবম একত্বকে স্বীকার কবিযা লয এবং সেইজন্য সকল জীবের মূলগত একত্বকে স্বীকাব কবিযা লয। এই বকমেব আধ্যাত্মিকতাকে মানুষের সাধারণ মনের দাবিব সহিত কোনরূপে যুক্ত কবা হয, তাহা হিতকব সামাজিক কর্তব্য এবং সামাজিক আচাব ব্যবহারের প্রচলিত বিধিবিধানকে স্বীকাব করিযা লয, বিশিষ্ট মতবাদ ও অনুষ্ঠান ও রূপকেব সাহায্যে তাহাকে জনপ্রিয় কবা হয়, এইরূপ আধ্যাত্মিকতা এই ভাবেই জগতেব মহত্তব ধর্মগুলির বাহ্য তত্ত্ব হইয়াছে। এই সকল ধর্ম ব্যক্তিবিশেষেব পক্ষে সিদ্ধিপ্রদ হয, এক উচ্চতর জ্যোতির আভাস আনিযা দেয, এক বৃহত্তব আধ্যাত্মিক বা অর্ধ-আধ্যাত্মিক বিধানের প্রতিচ্ছাযা লইযা আসে, কিন্তু তাহা কখনও সম্পূর্ণভাবে সিদ্ধিপ্রদ হয় না, শেষ পর্যন্ত কোনরূপ একটা আপোসেই পবিণত হয এবং সেইরূপ আপোস করিতে গিয়া জীবনের নিকট পবাজিত হয। জীবনেব সমস্যাগুলি থাকিয়াই যায়, এমনকি তীব্রতম রূপ লইয়া পুনঃপুনঃ আবির্ভূত হয়—কুরুক্ষেত্রের ঘোব সমস্যা ইহাবই একটি দৃষ্টান্ত। আদর্শবাদী বুদ্ধি এবং নৈতিক মন সকল সময়েই আশা করে এই সমস্ত সমস্যা দূব করিযা দিবে,

তাহাদেব নিজ অভীপ্সা হইতে উদ্ভূত কোন শুভ কৌশল আবিষ্কার কবিবে এবং তাহাদেব নির্বন্ধাতিশযতার দ্বারা তাহাকে কার্যে পরিণত করিবে, তাহাই জীবনেব এই নিম্নতন অশুভ দিকটাকে বিনষ্ট কবিযা দিবে; কিন্তু এইটি থাকিযাই যায, বিদূবিত হয না। অন্যপক্ষে অধ্যাত্মভাবাপন্ন বুদ্ধি ধর্মেব ভিতব দিযা পবকালে এক পবম সুখময জীবনেব আশা দেয বটে, কিন্তু ইতিমধ্যে পার্থিব জীবনেব অক্ষমতা সম্বন্ধে একবকম নিশ্চিত হইযা, জীব পৃথিবীতে পথ ভুলিয়া আসিযা পড়িয়াছে, এখানে তাহাব স্থান নহে এইরূপ বিশ্বাসেব বশবর্তী হইযা ঘোষণা করে যে, বস্তুত পক্ষে এখানে এই দেহেব জীবনে বা মবমানবেব সমষ্টিগত জীবনে নহে, পরন্তু ইহজগতেব ঊর্ধ্বে কোন অমবলোকেই স্বর্গ বা নির্বাণ রহিয়াছে, কেবল সেইখানেই প্রকৃত অধ্যাত্ম জীবন লাভ কবা যাইতে পারে।

এইখানে গীতা ভগবান সম্বন্ধে, আত্মা সম্বন্ধে, ঈশ্বব ও জগৎ ও প্রকৃতি সম্বন্ধে সত্যেব এক নূতন পবিকল্পনা আনিযা দিযাছে। প্রাচীন উপনিষদ হইতে পরবর্তী দার্শনিক চিন্তা যে সত্যেব বিকাশ করিয়াছিল গীতা তাহাকে প্রসারিত করিয়াছে, নূতন রূপ দিযাছে এবং তাহার আলোকে জীবন ও কর্মের সমস্যার সমাধান কবিতে নিশ্চিত পদক্ষেপে অগ্রসব হইযাছে। গীতা যে সমাধান উপস্থিত করিয়াছে তাহাতে আধুনিক মানবেব সম্মুখে সমস্যাটি যেভাবে উঠে তাহার সমগ্র মীমাংসা হয না, গীতাব শিক্ষা অপেক্ষাকৃত প্রাচীন মনের জন্য কথিত হইযাছিল, অতএব সমষ্টিগত প্রগতিব জন্য আধুনিক মনের যে প্রবল দাবি গীতায তাহার কোন সমাধান কবা হয নাই; এখন এক মহত্তব বুদ্ধিগত ও নৈতিক আদর্শকে এবং সম্ভব হইলে এক জীবন্ত অধ্যাত্ম আদর্শকে সমষ্টিগত জীবনের মধ্যে মূর্ত করিয়া তুলিবাব জন্য আধুনিক মানবমন যে আন্দোলন করিতেছে গীতা তাহাতে কোন সাড়া দেয় নাই। গীতাব আবেদন হইতেছে ব্যক্তির প্রতি, পূর্ণ অধ্যাত্মজীবন লাভ কবিতে সমর্থ হইযা উঠিযাছে এমন ব্যক্তির প্রতি, পবন্তু মানবজাতিব অবশিষ্ট অংশের জন্য গীতাব ব্যবস্থা—ক্রমিক প্রগতি, নিষ্ঠার সহিত ক্রমবর্ধমান বুদ্ধির আলোক ও নৈতিক প্রেবণা লইযা এবং পরিশেষে আধ্যাত্মিকতাব দিকে অগ্রসর হইয়া নিজ নিজ স্বভাবেব অনুসবণ কবিলে ইহা সুসঙ্গতভাবে সিদ্ধ হইবে। গীতাব বাণী অন্যান্য ক্ষুদ্রতব সমাধানকেও স্পর্শ করিয়াছে, কিন্তু তাহাদিগকে যখন আংশিকভাবে গ্রহণও কবা হইয়াছে তখনও তাহা করা হইয়াছে তাহাদেব ঊর্ধ্বে যে উচ্চতব ও অধিকতব সমগ্র বহস্য বহিযাছে তাহা নির্দেশ করিবার জন্য—সেই গূঢ় সত্যেব মধ্যে প্রবেশ কবিবাব যোগ্যতা এখনও খুব কম লোকেই অর্জন কবিযাছে।

যে বুদ্ধি প্রাণ ও দেহেব জীবন অনুসরণ করিতে চায তাহার প্রতি গীতার বাণী হইতেছে এই যে, সত্য বটে সকল জীবনই হইতেছে ব্যষ্টির মধ্যে বিশ্বশক্তির প্রকাশ তাহা আত্মা হইতে সমুদ্ভূত, ভগবানেব একটি স্ফুলিঙ্গ, কিন্তু বস্তুত তাহার মধ্যে আত্মাব ও ভগবানেব প্রকাশ হইতেছে আববণকারী মায়া দ্বাবা সমাচ্ছন্ন, আব

শুধুই নীচের জীবন অনুসরণ করার অর্থ হইতেছে বিপথে বিচরণ করা এবং আমাদের প্রকৃতির তমোময় অজ্ঞানকেই প্রাধান্য দেওয়া, পরন্তু তাহাতে জীবনের সত্যিকারের সত্যকে এবং পরিপূর্ণ ধর্মকে আবিষ্কার করা হয় না। জীবনের স্পৃহা, ক্ষমতার স্পৃহা, বাসনার পরিতৃপ্তি, কেবল তেজ ও বিক্রমকেই গৌরব দেওয়া, অহং-এর উপাসনা করা এবং ইহার দুর্বার স্বেচ্ছাচারী অর্জনপ্রবৃত্তি ও অক্লান্ত অহংমুখী বুদ্ধির উপাসনা করা—ইহা হইতেছে অসুরের ধর্ম, ইহা মানুষকে মহত্তী বিনষ্টির দিকেই লইয়া যায়। প্রাণ ও দেহের বশ মানবকে নিজের নিয়ন্ত্রণের জন্য কোন শাস্ত্রের অনুসরণ করিতে হইবে, ধর্মগত, সমাজগত, আদর্শগত নীতির অনুসরণ করিতে হইবে, এইভাবে সে বিধিনিষেধের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত অর্থ ও কাম উপভোগ করিয়া তাহার নীচের প্রকৃতিকে সংস্কৃত ও সংযত করিতে পারিবে এবং তাহাকে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনের এক উচ্চতর ধর্মের সহিত নিখুঁতভাবে সুসঙ্গত করিতে পারিবে।

যে বুদ্ধি যুক্তিগত নীতিগত ও সামাজিক আদর্শের অনুসরণেই ব্যাপৃত, যে বুদ্ধি প্রচলিত ধর্ম, নীতিশাস্ত্র, সামাজিক কর্তব্য ও অনুষ্ঠানের দ্বারা অথবা বিমুক্ত বুদ্ধি যেসব সমাধান দেয় সেই সবের দ্বারাই পরমার্থ লাভ করিতে চায় তাহার প্রতি গীতার বাণী হইতেছে—এইটি যে এক অবস্থায় অতি প্রয়োজনীয় সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, ধর্মকে পালন করিতে হইবে এবং যথাযথভাবে পালিত হইলে উহা আন্তর সত্তাকে সমুন্নত করিতে পারে এবং অধ্যাত্ম জীবনকে প্রস্তুত করিতে ও সাহায্য করিতে পারে, তথাপি এইটিই জীবনের সমগ্র ও চরম সত্য নহে। মানবীয় আত্মাকে উহা ছাড়াইয়া মানবের অধ্যাত্ম ও অমৃতময় প্রকৃতির এক পূর্ণতর ধর্মের মধ্যে উঠিতে হইবে। আর ইহা সাধিত হইতে পারে কেবল যদি আমরা নিম্নতন মনের অজ্ঞান সৃষ্টিসকলকে এবং অহমাত্মক মিথ্যা ব্যক্তিত্বকে দমিত করি, বর্জন করি, বুদ্ধি ও সঙ্কল্পের ক্রিয়াকে নৈর্ব্যক্তিকভাবাপন্ন করি, সর্বভূতের মধ্যে যে এক আত্মা রহিয়াছে তাহার সহিত এক হইয়া বাস করি, অহং-এর সকল গণ্ডিকে ভাঙ্গিয়া নৈর্ব্যক্তিক আত্মার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হই। মনকে ত্রিগুণাত্মিকা নীচের প্রকৃতির সীমাবদ্ধকারী প্রভাবের অধীনে চলিতে হয়, সে তাহার আদর্শসকল তমোগুণ কিংবা রজোগুণ অথবা উচ্চতম অবস্থায় সত্ত্বগুণের অনুসরণে গঠন করে, কিন্তু মানবাত্মার ভবিতব্য হইতেছে এক দিব্য সিদ্ধি ও মুক্তি এবং তাহা কেবল আমাদের ঊর্ধ্বতম আত্মার স্বাধীনতার মধ্যেই প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, কেবল ইহার বিশাল নৈর্ব্যক্তিকতা ও সর্বব্যাপকতার ভিতর দিয়া মনের ঊর্ধ্বে যাইয়া অপরিমেয়, সর্বধর্মের অতীত ভগবান ও পরম অনন্তের সমগ্র জ্যোতির মধ্যেই তাহা লাভ করা যাইতে পারে।

অনন্তের যেসব চরমপন্থী উপাসক নৈর্ব্যক্তিকতাকে চূড়ান্ত সীমায় লইয়া যায়, জীবন ও কর্মকে নির্মূল করিবার জন্য অসহিষ্ণু আবেগ পোষণ করে, অনির্বচনীয় পরমাত্মার শুদ্ধ নীরবতায় সকল ব্যষ্টিগত সত্তার লয় করার প্রয়াসকেই একমাত্র

চরম লক্ষ্য ও আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করে তাহাদের প্রতি গীতার বাণী হইতেছে এই যে, অবশ্য এইটিও হইতেছে একটি পন্থা এবং অনন্তের মধ্যে প্রবেশের দ্বার, কিন্তু এইটি হইতেছে সর্বাপেক্ষা দুরূহ, উপদেশ বা দৃষ্টান্তের দ্বারা জগতের সম্মুখে নিষ্ক্রিয়তার আদর্শ ধরা বিপজ্জনক, এই পন্থা মহৎ হইলেও এইটিই শ্রেষ্ঠ পন্থা নহে, এই জ্ঞান সত্য হইলেও এইটি সমগ্র সত্য নহে। পরম সদ্বস্তু, সর্বচৈতন্যময় আত্মা, ভগবান, অনন্ত কেবল দূরবর্তী ও অনির্বচনীয় অধ্যাত্ম সত্তা নহেন, তিনি এইখানে এই বিশ্বমাঝেই বিরাজিত রহিয়াছেন মানুষের মধ্যে, দেবতার মধ্যে, সকল জীবের মধ্যে, যাহাকিছু আছে সকলের মধ্যে তিনি যুগপৎ প্রকট ও অপ্রকট। তাঁহাকে শুধু কোন অক্ষর নীরবতার মধ্যেই নহে পরন্তু জগতের মধ্যে, জগতের সকল জীবের মধ্যে, সকল আত্মা ও সকল প্রকৃতির মধ্যেই তাঁহাকে লাভ করিয়া বুদ্ধি, হৃদয়, সঙ্কল্প, প্রাণের সকল ক্রিয়াকে উন্নীত করিয়া, তাঁহার সহিত সর্বাঙ্গীণ ও সর্বোচ্চ যোগে যুক্ত করিয়াই মানুষ একই সঙ্গে আত্মা ও ভগবানের আন্তর রহস্যের এবং নিজ সক্রিয় মানবজীবনের বাহ্য সমস্যার সমাধান করিতে পারে। ভগবত্তুল্য হইয়া, ভগবানের সাধর্ম্যলাভ করিয়া সে যে পরম অধ্যাত্ম চৈতন্যের অনন্ত প্রসারতা উপভোগ করিতে পারে তাহা যেমন প্রেম ও জ্ঞানের ভিতর দিয়া তেমনই সমানভাবে কর্মের ভিতর দিয়া লব্ধ হয়। এইভাবে অমৃত ও মুক্ত হইয়া সেই উচ্চতম ভূমি হইতে সে তাহার মানবীয় কর্মে রত থাকিতে পারে এবং ইহাকে পরম ও সর্বতোমুখী দিব্যকর্মে পরিণত করিতে পারে—বস্তুত সেইটিই হইতেছে ইহলোকে সকল কর্ম, জীবনযাত্রা ও আত্মত্যাগের, সংসারের সকল প্রয়াসের চরম পরিণতি ও সার্থকতা।

এই উচ্চতম বাণী প্রথমত হইতেছে তাঁহাদের জন্য যাঁহাদের ইহা অনুসরণ করিবার শক্তি আছে, যাঁহারা শ্রেষ্ঠ মানব, যাঁহারা মহাত্মা, ভগবদ্-জ্ঞানী, ভগবদ্-কর্মী, ভগবদ্-প্রেমী, যাঁহারা ভগবানের মধ্যে এবং ভগবানের জন্য জীবনধারণ করিতে এবং জগতে সানন্দে তাঁহার জন্য কর্ম করিতে পারেন—সে কর্ম মানবমনের অশান্ত অন্ধকার এবং অহং-এর মিথ্যা বন্ধনসকলের ঊর্ধ্বে উন্নীত দিব্য কর্ম। সেই সঙ্গেই গীতা বলিয়াছে যে, ইচ্ছা করিলে সকল মানুষই, মানুষের মধ্যে যাহারা সর্বাপেক্ষা অধম ও পাপী তাহারাও এই যোগের পথে প্রবেশ করিতে পারে, এইখানেই আমরা একটি উদারতর আশ্বাসের ইঙ্গিত পাই, সেটিকে আমরা সমষ্টিগত সিদ্ধির আশ্বাস বলিয়াও গ্রহণ করিতে পারি—কারণ যদি মানবের আশা থাকে তবে মানবজাতিরই বা আশা থাকিবে না কেন? আর আত্মসমর্পণ যদি যথার্থ হয় এবং অন্তর্যামী ভগবানের উপর যদি একান্ত অহংশূন্য বিশ্বাস থাকে তাহা হইলে এই পথে সফলতা অবশ্যম্ভাবী। সুনিশ্চিত পরিবর্তনটি প্রয়োজন, অধ্যাত্মের উপর অটল বিশ্বাস চাই, ভগবানের মধ্যে বাস করিবার, আত্মায় তাঁহার সহিত এক হইবার এবং প্রকৃতিতে (এখানেও আমরা তাঁহার সত্তার অংশ, মমৈবাংশঃ) তাঁহার মহত্তর অধ্যাত্ম প্রকৃতির সহিত এক হইবার, আমাদের সত্তার

সকল স্তরে ভগবান কর্তৃক অধিকৃত এবং ভগবত্তুল্য হইবার আন্তরিক ও অব্যভিচারী সঙ্কল্প চাই।

গীতা তাহার মতটির বিকাশ করিবার জন্য প্রসঙ্গক্রমে প্রকৃতির নিয়ন্তৃত্ব, বিশ্বলীলার অর্থ, মুক্ত পুরুষের চরম গতি প্রভৃতি সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন তুলিয়াছে—এই সব প্রশ্ন লইয়া অন্তহীন বাদানুবাদ হইয়া গিয়াছে, তাহাদের কোন শেষ মীমাংসা হয় নাই। এই প্রবন্ধমালায় সেসব প্রশ্নের আলোচনায় বেশী দূর অগ্রসর হইবার আবশ্যকতা নাই, এখানে আমাদের উদ্দেশ্য হইতেছে গীতার সারশিক্ষার অনুসন্ধান করা এবং সেইটিকে সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা, আর মানবজাতির সনাতন অধ্যাত্ম চিন্তাধারায় ও জীবন্ত সাধনায় গীতার অবদান কি সেইটি দেখাইয়া দেওয়া। গীতার দৃষ্টিভঙ্গী, গীতার সিদ্ধান্তের সহিত আমাদের মতভেদ কোনখানে, কোনখানে আমরা গীতার মতে সায় দিতে পারি না, এমনকি পরবর্তী অনুভূতি উপলব্ধির জোরে কোনখানে আমরা গীতার দার্শনিক মত বা গীতার যোগকেও ছাড়াইয়া যাইতে পারি—সেসবের আলোচনারও এখানে প্রয়োজন নাই। চির-সন্ধানী চির-আবিষ্কারক মানবকে তাহার বর্তমান পরিক্রমণে এবং তাহার আত্মার জ্যোতির্ময় শিখরে তাহার জীবনকে উন্নীত করিবার যে সম্ভাবনা রহিয়াছে সেই দুরূহতর ঊর্ধ্ব অভিযানে পথ দেখাইবার জন্য গীতা এখনও যে জীবন্ত বাণী বহন করিয়া আনিতেছে সেইটি বিবৃত করিয়াই এই গ্রন্থ সমাপ্ত করা যথেষ্ট হইবে।

চতুর্বিংশ অধ্যায়

গীতার বাণী

গীতার বাণীটি, গীতার দিব্যগুরুর কথাটি আমরা এইভাবে সংক্ষেপে বিবৃত করিতে পারি—"কর্মের রহস্য এবং সমস্ত জীবন ও জগতের রহস্য একই। জগৎ প্রকৃতির কেবল একটা যন্ত্রমাত্র নহে, এমন একটা নিয়মের চক্র নহে যাহার মধ্যে জীব ক্ষণিকের জন্য অথবা যুগ যুগান্তের জন্য বাঁধা পড়িয়াছে, ইহা হইতেছে অধ্যাত্মের নিরন্তর অভিব্যক্তি। জীবন শুধু জীবনের জন্যই নহে, পরন্তু ভগবানের জন্য, আর মানুষের জীবাত্মা হইতেছে ভগবানেরই সনাতন অংশ। কর্মের উদ্দেশ্য হইতেছে আত্ম-সন্ধান, আত্ম-পূর্তি, আত্ম-সংসিদ্ধি; বর্তমান মুহূর্তে বা ভবিষ্যতে কর্মের যে বাহ্য ও দৃশ্য ফল শুধু তাহার জন্যই কর্ম নহে। সকল জিনিসেরই একটি আভ্যন্তরীণ ধর্ম আছে, অর্থ আছে—তাহা অধ্যাত্ম সত্তার পরমা প্রকৃতি ও ব্যক্ত প্রকৃতি উভয়েরই উপর নির্ভর করে; কর্মের প্রকৃত সত্য রহিয়াছে সেইখানে, মন ও কর্মের বাহ্যরূপে সেটি কেবল গৌণভাবে, অপূর্ণভাবে এবং অজ্ঞানের দ্বারা প্রচ্ছন্ন হইয়া প্রতিফলিত হইতে পারে। অতএব কর্মের পরম নির্দোষ উদারতম নীতি হইতেছে তোমার নিজের সত্তার উচ্চতম ও অন্তরতম সত্যটি আবিষ্কার করা এবং সেই সত্যেই জীবনযাপন করা, পরন্তু কোন বাহ্যিক আদর্শ বা ধর্ম অনুসরণ করা নহে। যতক্ষণ না তাহা হইতেছে ততক্ষণ পর্যন্ত সকল জীবন, সকল কর্ম ত্রুটিযুক্ত ও অসম্পূর্ণ থাকিবে, একটা দুরূহতা, একটা দ্বন্দ্ব, একটা সমস্যাস্বরূপ হইয়া থাকিবে। কেবলমাত্র তোমার প্রকৃত সত্তাকে আবিষ্কার করিয়া এবং তাহার প্রকৃত সত্য অনুসারে জীবনযাপন করিয়াই সমস্যাটি চূড়ান্তভাবে মীমাংসিত হইতে পারে, দুরূহতা ও দ্বন্দ্ব অতিক্রান্ত হইতে পারে এবং তোমার কর্মাবলী আবিষ্কৃত আত্ম ও অধ্যাত্ম সত্তার নির্বিঘ্ন প্রতিষ্ঠায় সর্বাঙ্গসিদ্ধ হইয়া প্রকৃত দিব্য কর্মে পরিণত হইতে পারে। অতএব তোমার আত্মাকে জান; তোমার প্রকৃত আত্মাকে ভগবান বলিয়া এবং অন্য সকলের আত্মার সহিত এক বলিয়া জান, তোমার ব্যষ্টিগত সত্তাকে, অন্তঃপুরুষকে ভগবানের অংশ বলিয়া জান। আর যাহা জান সেই জ্ঞানে জীবনযাপন কর; আত্মায় জীবনযাপন কর, তোমার পরম অধ্যাত্ম প্রকৃতিতে জীবনযাপন কর, ভগবানের সহিত যুক্ত ও ভগবত্তুল্য হও। প্রথমে তোমার সকল কর্ম যজ্ঞরূপে উৎসর্গ করিয়া দাও তাঁহাকে যিনি তোমার অভ্যন্তরে সর্বোত্তম ও একমেব সত্তা, যিনি জগতের মধ্যেও সর্বোত্তম ও একমেব সত্তা; অবশেষে তুমি যাহা কিছু এবং তুমি যাহা কিছু কর সেসবকেই তাঁহার হস্তে অর্পণ করিয়া দাও যেন পরম ও বিশ্বপুরুষ তোমার ভিতর দিয়া জগতে তাঁহার ইচ্ছা, তাঁহার কর্ম সম্পন্ন করেন।

তোমাব সমস্যার এই সমাধানই আমি দিতেছি এবং তুমি দেখিবে যে ইহা ভিন্ন আব অন্য কোন সমাধানই নাই।"

যে মূলগত বিবোধ লইযা ভাবতেব সকল শিক্ষাব ন্যায গীতাবও আবম্ভ সেই সম্বন্ধে গীতার মতটি এখানে বিবৃত কবা আবশ্যক। এই যে সত্য আত্মাব সন্ধান লাভ, আমাদেব মধ্যে ও সকলের মধ্যে যে ভগবান বহিযাছেন তাঁহাব সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ ইহা সহজ জিনিস নহে, আব এই জ্ঞান যদিও বা মনেব দ্বাবা দেখা যায, ইহাকে আমাদেব চৈতন্যেব উপাদানে পবিণত করা, আমাদেব কর্মেব সমগ্র ভিত্তি করাও সহজ নহে। সকল কর্মই নির্ধাবিত হয় আমাদেব সত্তাব কার্যকবী অবস্থাব দ্বারা, আর আমাদের সত্তার কার্যকবী অবস্থা নির্ধাবিত হয আমাদেব নিত্য আত্মদর্শী সঙ্কল্প ও সক্রিয় চৈতন্যের অবস্থা দ্বাবা এবং তাহার কর্মশীলতাব ভিত্তি দ্বাবা। আমবা নিজেবা কি, জগতেব সহিত আমাদেব সম্বন্ধসমূহেব অর্থ কি তাহা আমবা আমাদের সমগ্র সক্রিয় চৈতন্য লইযা যেভাবে দেখি ও বিশ্বাস কবি, আমাদের শ্রদ্ধা যেরূপ হয় তাহাই আমাদেব স্বরূপ গঠিত কবিযা দেয়। কিন্তু মানুষের চৈতন্য হইতেছে দ্বিবিধ এবং জগতেব দ্বিবিধ সত্যের সহিত তাহাব সামঞ্জস্য আছে; এক হইতেছে আভ্যন্তবীণ সত্তাব সত্য এবং অপবটি হইতেছে বাহ্য দৃশ্যের সত্য। এই উভয সত্যেব যেটিব মধ্যে মানুষ বাস কবে তদনুসাবে সে হয মানবীয় অজ্ঞানের মধ্যে অধিবাসী মনোময সত্তা অথবা দিব্যজ্ঞানে সুপ্রতিষ্ঠিত অধ্যাত্ম সত্তা।

বাহ্যত দেখিলে মনে হয যে, জগতেব সত্য হইতেছে কেবলমাত্র তাহাই যাহাকে আমবা প্রকৃতি বলি, উহা সেই শক্তি যাহা সত্তাব সমগ্র ধাবা ও যন্ত্ররূপে কার্য কবে, আমাদের মন ও ইন্দ্রিযেব বিষযীভূত এই সমগ্র জগৎকে সৃষ্টি করে, আবার জীব যে বাহ্য জগতে বাস কবে তাহাব সহিত জীবেব সম্বন্ধ স্থাপনেব উপায়রূপে মন এবং ইন্দ্রিযগণকেও সৃষ্টি করে। এই বাহ্য দৃশ্যে মানুষ তাহাব আত্মা, তাহার মন, তাহাব প্রাণ, তাহাব শবীব লইযা মনে হয যেন প্রকৃতিবই সৃষ্টি, শরীব, প্রাণ এবং মনেব ভেদের দ্বাবা, বিশেষত তাহাব অহংবোধেব দ্বাবা সে অন্যান্য মানব হইতে ভিন্ন—এই অহংবোধ হইতেছে একটি সূক্ষ্ম যন্ত্র, মানুষেব জন্য প্রকৃতি এইটি গঠন কবিযা দিযাছে যেন সে এই সব প্রবল পার্থক্য ও বিভেদের চেতনাকে দৃঢ ও কেন্দ্রীভূত কবিতে পাবে। মানুষেব মধ্যে যাহা কিছু আছে, তাহার মনোময় সত্তা এবং ইহাব কর্ম, তাহাব প্রাণ ও শবীবেব ক্রিযা এসবই যে তাহার নিজ প্রকৃতিব ধর্মেব দ্বাবা নির্ধাবিত হয, ইহাব বাহিরে যাইতে পাবে না, অন্যভাবে কার্য কবিতে পাবে না তাহা খুবই সুস্পষ্ট। অবশ্য সে মনে করে যে, তাহার ব্যক্তিগত ইচ্ছাব, তাহাব অহং-এব ইচ্ছাব কতকটা স্বাধীনতা আছেই, কিন্তু বস্তুত ঐ স্বাধীনতার মূল্য বিশেষ কিছুই নহে, কাবণ তাহাব অহং হইতেছে কেবল একটা অনুভূতি যাহাব বশে সে প্রকৃতি তাহাকে যেরূপ সৃষ্টি কবিযাছে সেইটিব সহিত নিজেকে এক কবিযা দেখে, প্রকৃতি যে পবিবর্তনশীল মন, প্রাণ ও দেহ

বচনা কবিয়াছে তাহাদেব সহিত নিজেকে এক কবিয়া দেখে। তাহার অহংটিও প্রকৃতিব কর্মধাবা হইতে উৎপন্ন, আর তাহাব অহং-এব স্বরূপ যেমন, অহং-এর ইচ্ছাব স্বরূপও সেইপ্রকাব হইবে এবং তদনুযাযী সে কর্ম করিতে বাধ্য, অন্য কিছু সে করিতে পারে না।

তাহা হইলে মানুষেব নিজ সম্বন্ধে এইটি হইতেছে সাধারণ চেতনা, তাহার আপন সত্তা সম্বন্ধে এইটিই হইতেছে তাহার শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস যে, সে প্রকৃতিব সৃষ্ট একটি জীব, সে পৃথক অহং, অপরেব সহিত এবং জগতেব সহিত সে যেকোন সম্বন্ধ স্থাপন করে, নিজেব যেকোন বিকাশ সাধন করে, তাহার যেকোন সঙ্কল্প, বাসনা, মানসিক পবিকল্পনা প্রকৃতির গণ্ডিব মধ্যে সম্ভব এবং তাহার জীবনে প্রকৃতিব যে উদ্দেশ্য বা ধাবা তাহাব অনুগত সেসবকে সে চরিতার্থ করে।

তবে মানুষেব চৈতন্যেব মধ্যে এমন একটা জিনিস বহিয়াছে যাহা এই সূত্রের কঠিন নিগডে বাঁধা পডে না, জগতের অন্য এক তত্ত্বের উপব, এক আভ্যন্তরীণ তত্ত্বেব উপব তাহার শ্রদ্ধা আসে, তাহার অন্তবাত্মার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সেই শ্রদ্ধাও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। এই আভ্যন্তবীণ তত্ত্বে জগতের সত্য আব প্রকৃতি নহে, আত্মা—প্রকৃতি অপেক্ষা পুরুষই অধিকতর সত্য। প্রকৃতি নিজেই আত্মার শক্তি ভিন্ন আর কিছুই নহে, প্রকৃতি হইতেছে পুরুষেব শক্তি। আত্মা, পুরুষ, সর্বভূতের মধ্যে এক অদ্বিতীয সত্তাই হইতেছে জগতেব ঈশ্বর, জগৎ তাহারই কেবল আংশিক অভিব্যক্তি। সেই পুরুষই হইতেছে প্রকৃতির এবং তাহার কর্মের ধারক ও অনুমন্তা, পুরুষের অনুমতির কল্যাণেই প্রকৃতিব নিয়ম হয অলঙ্ঘনীয়, তাহার শক্তি ও শক্তির ধাবাসকল হয় কার্যকবী। প্রকৃতির অন্তঃস্থিত সেই পুরুষই হইতেছে জ্ঞাতা, ক্ষেত্রজ্ঞ, তিনিই প্রকৃতিকে আলোকিত করেন এবং আমাদেব মধ্যে তাহাকে সচেতন করেন, তাঁহারই অনুস্যূত ও অতিচেতন ইচ্ছা প্রকৃতির কর্মাবলীকে অনুপ্রাণিত করে, চালিত কবে। মানুষেব অন্তরাত্মা এই ভাগবত সত্তার অংশ এবং উহাবই স্বভাবযুক্ত। আমাদেব প্রকৃতি হইতেছে আমাদের অন্তরাত্মার অভিব্যক্তি, তাহাবই অনুমতি অনুযায়ী কর্ম করে, নিজ গতি ও রূপ ও পবিবর্তনসকলেব ভিতব দিয়া অন্তরাত্মাব নিগূঢ আত্মজ্ঞান, আত্মচেতনা ও জীবন-সঙ্কল্পকে স্থূলে প্রকট করে।

আমাদের প্রকৃত সত্তা ও আত্মা আমাদের বুদ্ধির নিকট লুক্কাযিত কারণ সে বুদ্ধি আভ্যন্তবীণ বস্তুসকল সম্বন্ধে অজ্ঞান, দেহ প্রাণ মনকেই আত্মা বলিয়া ভ্রম করে, আমাদেব এই সকল বাহ্য যন্ত্রেই অভিনিবিষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু যদি মানুষেব সক্রিয সত্তা নিজ প্রাকৃত যন্ত্রসকলের সহিত একাত্মবুদ্ধি প্রত্যাহার কবিতে পাবে এবং নিজ আভ্যন্তরীণ সদ্‌বস্তুকে দেখিতে পায, তাহার প্রতি পবিপূর্ণ শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস লইযা জীবনযাপন করিতে পারে তাহা হইলে তাহার নিকট সবই পবিবর্তিত হইযা যায, জীবন ও জগৎ এক নূতন রূপ লইয়া দেখা দেয, কর্মও এক অন্য অর্থ ও স্বরূপ প্রাপ্ত হয়। তখন আমাদের সত্তা আর

প্রকৃতির এই ক্ষুদ্র অহংময় সৃষ্টি থাকে না পবন্তু এক ভাগবত অবিনাশী অধ্যাত্ম শক্তির বৃহত্ত্ব প্রাপ্ত হয়। আমাদের চেতনা আর সীমাবদ্ধ ও পদে পদে বাধাপ্রাপ্ত মনোময় ও প্রাণময় জীবের চেতনা থাকে না, পবন্তু তাহা অনন্ত ভাগবত অধ্যাত্ম চেতনা হইয়া উঠে। আর আমাদেব সঙ্কল্প ও কর্মও আব এই সীমাবদ্ধ ব্যক্তিরূপ ও ইহার অহং-এর থাকে না, পবন্তু তাহা হইযা উঠে ভাগবত ও অধ্যাত্ম সঙ্কল্প ও কর্ম, মানবরূপের ভিতব দিয়া অবাধে ক্রিযমাণ বিশ্বাত্মক পবম সর্বময অধ্যাত্ম সত্তার সঙ্কল্প ও শক্তি।

মানবরূপী ভগবান অবতার দিব্যগুরুর বাণী—"এই মহান পবিবর্তন ও রূপান্তরের জন্য আমি প্রকৃত অধিকাবীদিগকে আহ্বান করিতেছি, আব সেই সকল লোকই অধিকাবী যাহাবা প্রাকৃত যন্ত্রসকলেব অজ্ঞান হইতে তাহাদেব সঙ্কল্পকে সরাইয়া লইতে পাবে, অন্তঃপুরুষেব গভীবতম অনুভবেব দিকে, আত্মা ও অধ্যাত্ম সত্তা সম্বন্ধে তাহাব জ্ঞানেব দিকে, ভগবানেব সহিত তাহাব সংস্পর্শেব দিকে, ভগবানের মধ্যে প্রবেশ কবিবাব তাহাদেব শক্তিব দিকে তাহাব সঙ্কল্পকে ফিরাইতে পারে। অবশ্য মানবীয বুদ্ধির পক্ষে এই পন্থা গ্রহণ করা কঠিন, কাবণ তাহা সর্বদা নিজের অজ্ঞানজাত ধোঁযাটে বচনা ও অর্ধ আলোকে আসক্ত এবং মানবীয় মন, প্রাণ, শরীবের অন্ধতর অভ্যাসসকলে আসক্ত, কিন্তু একবাব গ্রহণ করিতে পারিলে এইটিই হইতেছে মহান সুনিশ্চিত শ্রেযস্কব পন্থা, কাবণ এইটি হইতেছে মানুষেব সত্তার প্রকৃত সত্যেব সহিত এক এবং তাহাব অন্তবতম ও পরমতম প্রকৃতিব যথার্থ নিজস্ব প্রেবণা।

"কিন্তু এই পরিবর্তনটি হইতেছে অতিশয মহান, এক বিবাট রূপান্তব, তোমাব সমগ্র সত্তা ও প্রকৃতির সম্পূর্ণ পরিবর্তন ও ধর্মান্তব ব্যতীত ইহা সম্পন্ন হইতে পারে না। তোমার সত্তা, তোমার প্রকৃতি, তোমাব জীবন সম্পূর্ণভাবে নিবেদন করিয়া দিতে হইবে উর্ধ্বতমের নিকটে, উর্ধ্বতম ব্যতীত অন্য কাহাবও নিকটে নহে; কারণ সবকিছুকেই বাখিতে হইবে কেবল উর্ধ্বতমেব জন্য, যাহাকিছু গ্রহণ করিতে হইবে, ভগবানের মধ্যে তাহা যেভাবে আছে, ভগবানেবই একটি রূপ হিসাবে, ভগবানেরই নিমিত্ত গ্রহণ করিতে হইবে। এক নূতন সত্যকে স্বীকাব করিতে হইবে, আপন ও পব সম্বন্ধে, জগৎ ও ভগবান সম্বন্ধে, পুরুষ ও প্রকৃতি সম্বন্ধে এক নূতন জ্ঞানেব দিকে, একত্বেব জ্ঞানেব দিকে, বিশ্বাত্মক ভাগবত সত্তাব জ্ঞানের দিকে তোমার মনকে সম্পূর্ণভাবে ফিরাইতে হইবে, নিবিষ্ট করিতে হইবে, প্রথমে সে জ্ঞান বুদ্ধি দ্বারাই গৃহীত হইবে, পবন্তু শেষ পর্যন্ত তাহাকে হইতে হইবে আত্মার প্রত্যক্ষ দৃষ্টি, আত্মাব চৈতন্য ও স্থাযী অবস্থা এবং তাহাব ক্রিযাবলীব আধার।

"এমন সঙ্কল্প প্রযোজন যাহাতে এই নূতন জ্ঞান, দৃষ্টি, চেতনাই হয কর্মেব হেতু এবং একমাত্র হেতু। আব উহা যে কর্মের হেতু হইবে তাহা যেন কুণ্ঠিত, গণ্ডিবদ্ধ কর্ম না হয়, স্বাভাবিক প্রযোজনের কয়েকটি মাত্র প্রক্রিযা না হয অথবা যে

কয়েকটি ক্রিযা আনুষ্ঠানিক সিদ্ধিলাভের সহায বলিয়া মনে হয়, ধর্মভাবের অনুকূল বা ব্যক্তিগত মুক্তিলাভের উপযোগী মনে হয কেবল সেইগুলিই নহে, পবন্তু মানবজীবনেব সকল কর্মকেই সমতার সহিত গ্রহণ করিতে হইবে এবং ভগবদর্থে ও সর্বভূতেব হিতার্থে সম্পাদন করিতে হইবে। হৃদয়কে পরমতমের দিকে অনন্য আস্পৃহায, ভগবানের অনন্য প্রেমে, অনন্য ভগবদ্‌ভক্তিতে সমুন্নীত কবিতে হইবে। সেই সঙ্গেই চাই প্রশান্ত ও প্রবুদ্ধ হৃদযের প্রসাবণ যাহা সর্বভূতের মধ্যে ভগবানকে আলিঙ্গন কবিবে। মানুষ এখন যেমন রহিয়াছে তাহাব সেই অভ্যাসগত সাধাবণ প্রকৃতিকে পবিবর্তিত কবিযা এক পবম ও দিব্য অধ্যাত্ম প্রকৃতিতে পবিণত কবিতে হইবে। এক কথায চাই এমন যোগসাধনা যাহা হইবে একই সঙ্গে পূর্ণ জ্ঞানেব যোগ, পূর্ণ সঙ্কল্প ও কর্মেব যোগ, পূর্ণ প্রেম, উপাসনা ও ভক্তিব যোগ এবং সকল অংশ, অবস্থা, শক্তি ও গতি সহ সমগ্র সত্তাব পূর্ণ অধ্যাত্ম সিদ্ধিব যোগ।

"এই যে জ্ঞানকে বুদ্ধিব দ্বারা স্বীকার করিতে হইবে, অন্তবাত্মার শ্রদ্ধার দ্বাবা সমর্থন কবিতে হইবে এবং মন, হৃদয ও প্রাণে বাস্তব ও জীবন্ত কবিয়া তুলিতে হইবে, ইহা হইতেছে পবম পুরুষ ও পরমাত্মাকে তাঁহার ঐক্যে এবং তাঁহাব সমগ্রতায জানা। ইহা হইতেছে সেই একমেবাদ্বিতীয়মকে জানা যিনি শাশ্বত, যিনি কাল, দেশ, নাম, রূপ ও প্রপঞ্চেব অতীত, যিনি নিজের ব্যক্তিক ও নৈর্ব্যক্তিক উভয পদেবই বহু ঊর্ধ্বে অথচ যাহা হইতে এই সবকিছু প্রবর্তিত হইয়াছে—এই সব যাঁহাকে বৈচিত্র্যময়ী প্রকৃতি ও তাহাব অসংখ্য রূপের মধ্যে প্রকট কবিতেছে। ইহা হইতেছে তাঁহাকে নৈর্ব্যক্তিক শাশ্বত অক্ষব সত্তা বলিয়া জানা, এই শান্ত ও সীমাহীন বস্তুকেই আমরা আত্মা বলিযা অভিহিত করি, ইহা অনন্ত, সম এবং সর্বদা একইভাবে অবস্থিত, এই সব নিবন্তর পরিবর্তনের মধ্যে, এই সব বহুল ব্যক্তিক সত্তা, অধ্যাত্ম সত্তা, প্রাকৃত সত্তাব মধ্যে, এই অনিত্য ও আপাতদৃশ্য জগতের বহু রূপ, শক্তি ও ঘটনাপবম্পবাব মধ্যে সেই আত্মা বহিযাছে চির অবিকৃত ও অপবিবর্তনীয। সেই সঙ্গেই আবার এই জ্ঞান হইতেছে তাঁহাকে ক্ষর পুরুষ বলিয়া জানা, মনে হয প্রকৃতির মধ্যে তিনি নিত্য পরিবর্তনশীল, তিনি প্রকৃতি-স্থ পুরুষ, প্রত্যেক রূপে নিজেকে রূপাযিত করিতেছেন, তাঁহার শক্তিব প্রত্যেক ক্রম, প্রত্যেক মাত্রা এবং প্রত্যেক ক্রিযা অনুযায়ী নিজেকে পরিবর্তিত কবিতেছেন, তিনি যাহাকিছু আছে সেসব অপেক্ষা চিবকাল অনন্তগুণে অধিক হইয়াও নিজেই সেইসব হইতেছেন, মানুষের মধ্যে, জন্তুর মধ্যে, বস্তুর মধ্যে বাস করিতেছেন, তিনি বিষযী ও বিষয়, অন্তবাত্মা, মন, প্রাণ ও দেহ, তিনিই প্রত্যেক সত্ত্ব, প্রত্যেক শক্তি এবং প্রত্যেক জীব।

"সত্যেব কোন একটিমাত্র দিকেব উপরই ঝোঁক দিলে তুমি এই যোগ অভ্যাস কবিতে পাবিবে না। যে ভগবানকে তুমি লাভ করিতে চাও, যে আত্মাকে তুমি আবিষ্কাব কবিতে চাও, তোমার জীবাত্মা যে পবমপুরুষের অংশ তিনি একই সঙ্গে

এই সবকিছু হইযাছেন; এক পবম ঐক্যে এই সবকে যুগপৎ জানিতে হইবে, একই সঙ্গে সকলেব মধ্যে প্রবেশ কবিতে হইবে, সকল অবস্থায, সকল বস্তুব মধ্যে একমাত্র তাঁহাকেই দেখিতে হইবে। তিনি যদি কেবল প্রকৃতি-স্থ ক্ষব পুরুষই হইতেন তাহা হইলে থাকিত শুধু চিবন্তন ও বিশ্বব্যাপী সম্ভূতি (becoming), যদি তুমি তোমাব শ্রদ্ধা ও জ্ঞানকে ঐ একটি দিকেই নিবদ্ধ কব তাহা হইলে তুমি কখনই তোমাব ব্যক্তিরূপ ও ইহাব চিবপবিবর্তনশীল আকাবসকলেব ঊর্ধ্বে যাইতে পারিবে না, এইরূপ প্রতিষ্ঠায তুমি সম্পূর্ণভাবে প্রকৃতিব আবর্তনেব মধ্যে আবদ্ধ হইয়া থাকিবে। কিন্তু তুমি শুধুই কালস্রোতে চৈতন্যেব ক্ষণপবম্পবা (Soul moments) নহ। তোমাব মধ্যে এক নৈর্ব্যক্তিক আত্মা বহিযাছে, তাহা তোমাব পরিবর্তনশীল ব্যক্তিরূপেব প্রবাহকে আধাবরূপে ধবিযা বহিযাছে এবং সেইটি হইতেছে ভগবানেব বিশাল নৈর্ব্যক্তিক সত্তার সহিত অভিন্ন। আব এখানে তোমাব সত্তার সর্বদা এই যে দুইটি দিক, ব্যক্তিক ও নৈর্ব্যক্তিক, ইহাদিগকে অতিক্রম কবিয়া, ইহাদের ঊর্ধ্বে চিব বিশ্বাতীত সত্তায তুমি হইতেছ অপবিমেয শাশ্বত ও বিশ্বাতীত।

"আবার ইহাই যদি সত্য হয় যে, একমাত্র শাশ্বত নৈর্ব্যক্তিক সত্তাই আছে, তাহা কোন কর্ম কবে না, সৃষ্টিও কবে না, তাহা হইলে জগৎ ও তোমাব জীবাত্মা হয মিথ্যা মায়া, তাহাদের কোন বাস্তব ভিত্তি থাকে না। আব এই একমাত্র অদ্বৈতভাবেই যদি তুমি তোমাব শ্রদ্ধা ও জ্ঞানকে সীমাবদ্ধ কব, তাহা হইলে তোমার পক্ষে জীবন ও কর্ম পবিত্যাগ কবা ভিন্ন অন্য কোন গতি নাই। কিন্তু এই জগতেব মধ্যে ভগবান বাস্তব সত্য, জগতেব মধ্যে তুমিও বাস্তব সত্য; জগৎ ও তুমি সেই পবমতমের সত্য ও বাস্তব শক্তি ও অভিব্যক্তি। অতএব জীবন ও কর্মকে গ্রহণ কব, উহাদিগকে বর্জন কবিও না। তোমাব নৈর্ব্যক্তিক মূল সত্তায ভগবানের সহিত একত্ব উপলব্ধি করিয়া, তোমাব যে অধ্যাত্ম ব্যষ্টি সত্তা ভগবানেব সনাতন অংশ তাহাকে প্রেম ও ভক্তিতে ভগবানের দিকে, তাহাবই নিজ অনন্তেব দিকে অভিমুখী করিযা তোমার প্রাকৃত সত্তাকে ভগবদ্‌কর্মেব নিমিত্ত কবিযা দাও, ভগবানের একটি যন্ত্র, একটি শক্তি কবিযা দাও—প্রাকৃত সত্তাব সৃষ্টিই হইযাছে সেইজন্য। বস্তুতপক্ষে উহা সকল সময়েই ঐরূপ যন্ত্র, কিন্তু উহা যন্ত্র অজ্ঞানে ও অসম্পূর্ণভাবে, নীচেব প্রকৃতিব অধীনে, এই অবস্থায তোমাব অহং-এব দ্বাবা ভাগবতভাব বিকৃত হইয়া যায়। উহাকে অহংভাবেব বিকৃতি হইতে মুক্ত কবিযা সজ্ঞানে ও পূর্ণভাবে ভগবানেব পরম অধ্যাত্ম প্রকৃতিবই একটি শক্তি কবিযা দাও, তাঁহার ইচ্ছাব, তাঁহার কর্মের একটি যন্ত্র কবিযা দাও। এইভাবে তুমি তোমাব নিজেবই সত্তার সমগ্র সত্যে বাস কবিবে এবং তুমি পূর্ণ ভগবদ্ মিলন লাভ কবিবে, সমগ্র ও অনবদ্য যোগ লাভ করিবে।

"পরমতম হইতেছেন পুরুষোত্তম, তিনি সকল অভিব্যক্তিব ঊর্ধ্বে শাশ্বত সত্তা, তিনি অনন্ত—দেশ কাল নিমিত্তেব কিংবা তাঁহাব নিজ অসংখ্য গুণ, অসংখ্য

লক্ষণেব কোন একটিব মধ্যে তিনি সীমাবদ্ধ নহেন। কিন্তু ইহাব অর্থ এই নহে যে, এখানে যাহাকিছু ঘটিতেছে তাহাব সহিত তাঁহাব পরম শাশ্বত সত্তার কোনও সম্বন্ধ নাই, সেই সত্তায তিনি জগৎ ও প্রকৃতি হইতে বিচ্ছিন্ন, এই সব জীব হইতে পৃথক। তিনি পরম অনির্বচনীয ব্রহ্ম, তিনি নৈর্ব্যক্তিক আত্মা, তিনি সকল ব্যক্তিগত সত্তা। ইহা জগতে আত্মা, প্রাণ ও জড় সত্তা; অন্তঃপুরুষ, প্রকৃতি ও প্রকৃতিব কার্যাবলী—এসবই হইতেছে তাঁহার অনন্ত ও শাশ্বত সত্তার বিভিন্ন রূপ ও ক্রিয়া। তিনি বিশ্বাতীত পবমাত্মা, সবকিছু তাঁহা হইতেই আবির্ভূত হইয়াছে, সবই হইতেছে তাঁহাব রূপ, তাঁহাব আত্ম-বিভূতি। এক আত্মা রূপে তিনি ইহজগতে সর্বব্যাপী, মানব, পশু, স্থাবর, জঙ্গম, প্রকৃতিব প্রত্যেক শক্তি—সবকিছুব মধ্যেই তিনি সমান ও নৈর্ব্যক্তিকভাবে অধিষ্ঠিত। তিনি পবম পুরুষ, সকল পুরুষ হইতেছে সেই একই পুরুষেব অনির্বাণ শিখা। সকল প্রাণী তাহাদেব অধ্যাত্ম ব্যক্তিসত্তায সেই এক পুরুষেরই সনাতন অংশ। তিনি সর্বভূতেব চিবন্তন প্রভু, জগৎ ও জাগতিক জীবসকলেব অধীশ্বর। সকল কর্মেব তিনিই সর্বশক্তিমান উৎস, নিজেব কর্মেব দ্বাবা তিনি বদ্ধ নহেন, সকল কর্ম, সকল প্রয়াস, সকল যজ্ঞ তাঁহাবই নিকট যাইতেছে। তিনি সকলেব মধ্যে রহিয়াছেন, সকলে তাঁহার মধ্যে বহিযাছে, তিনিই এই সব হইয়াছেন, অথচ তিনি এই সবেরই ঊর্ধ্বে, নিজের সৃষ্টির মধ্যে তিনি সীমাবদ্ধ নহেন। তিনি বিশ্বাতীত ভগবান; অবতারূপে তিনি ভূতলে অবতীর্ণ হন, নিজ শক্তি দ্বাবা তিনি বিভূতিতে প্রকট হইয়াছেন; সকল মানুষের মধ্যে তিনি প্রচ্ছন্ন দেবতা। মানুষ যেসকল দেবতাব পূজা করে, সেসবই হইতেছে সেই এক ভগবানেব বিভিন্ন নাম ও রূপ ও মনোময শরীব।

"পবমতম তাঁহাব অধ্যাত্ম মূলতত্ত্ব হইতে জগৎকে নিজেব অনন্ত সত্তাব মধ্যে প্রকট কবিযাছেন এবং নিজেকেও নানাভাবে জগতের মধ্যে প্রকট করিয়াছেন। সব জিনিস হইতেছে তাঁহারই শক্তি, তাঁহাবই রূপ, আব তাঁহার শক্তি ও রূপের অন্ত নাই, কাবণ তিনি নিজে অনন্ত। সর্বব্যাপী ও সর্বাধার নৈর্ব্যক্তিক স্বপ্রতিষ্ঠ সত্তারূপে তিনি এই অনন্ত কালেব অভিব্যক্তিকে এবং বিশ্বকে সমভাবে ধরিযা বহিযাছেন, অনুপ্রাণিত কবিতেছেন, কোন ব্যক্তি বা বস্তু বা ঘটনা বা রূপের প্রতি তাঁহাব কোনরূপ পক্ষপাতিত্ব বা আসক্তি নাই, কেহ তাঁহার প্রিয় বা অপ্রিয নহে। এই শুদ্ধ ও সম আত্মন্ কর্ম করে না, পরন্তু নিরপেক্ষভাবে বস্তুসকলের ক্রিয়াকে ধবিযা থাকে। তথাপি পবমতমই বিশ্বপুরুষ ও কালপুরুষরূপে নিজ বহুমুখী সৃজনীশক্তিব ভিতব দিয়া জগতেব সকল ক্রিয়া পরিচালন ও নির্ধারণ করিতেছেন, বিশ্বপুরুষের সেই শক্তিকেই আমবা প্রকৃতি বলিযা অভিহিত কবি। তিনি সৃষ্টি কবিতেছেন, পালন কবিতেছেন আবাব নিজ সৃষ্ট বস্তুসকল ধ্বংস করিতেছেন। তিনি প্রত্যেক প্রাণীব হৃদযেও অধিষ্ঠিত রহিযাছেন, যেমন বিশ্বব্যাপী সত্তারূপে তেমনই ব্যষ্টিব মধ্যে নিগূঢ়ভাবে লুক্কায়িত সত্তারূপে প্রকৃতির শক্তি দ্বাবা উদ্ভব কবিতেছেন, তাঁহাব বহস্যের কোন ধারা প্রকৃতিব গুণ ও কর্মে প্রকট করিতেছেন,

প্রত্যেক বস্তু, প্রত্যেক জীবকে তাহার বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী গঠন করিতেছেন, সকল কর্মের সূচনা করিতেছেন, সকল কর্মকে ধরিয়া রহিয়াছেন। পরমতমই হইতেছেন এইরূপে জগতের বিশ্বাতীত আদি উৎপত্তিস্থল, সমষ্টিগত ও ব্যষ্টিগতভাবে তিনিই বস্তু ও জীবসকলের মধ্যে নিত্য প্রকট হইতেছেন—তাই দেখিতে পাই জগতের স্বরূপ এমন অনন্ত বৈচিত্র্যময়।

"সকল সময়েই ভগবানের এই তিনটি শাশ্বত স্থিতি রহিয়াছে—অক্ষর, ক্ষর ও পুরুষোত্তম। সর্বভূতের ভিত্তি ও আধাররূপে সর্বদা ও চিরকাল রহিয়াছে এই এক শাশ্বত অক্ষর স্বপ্রতিষ্ঠ সত্তা। প্রকৃতির দ্বারা সর্বভূতরূপে প্রকট সর্বদা ও চিরকাল রহিয়াছে এই এক প্রকৃতি-স্থ ক্ষরপুরুষ। আর একই সঙ্গে যিনি এই অক্ষর ও ক্ষর উভয়ই হইতে পারেন এমন এই বিশ্বাতীত পুরুষোত্তম সর্বদা ও চিরকাল রহিয়াছেন—তিনি শুদ্ধ নীরব আত্মা হইতে পারেন আবার সেই সঙ্গেই বিশ্বের বিবর্তনের সক্রিয় আত্মা ও প্রাণ হইতে পারেন, কারণ তিনি ক্ষরেরও অতীত, অক্ষরেরও অতীত, আবার ক্ষর অক্ষর উভয়েরই অতীত। আমাদের মধ্যে যে জীবাত্মা রহিয়াছে তাহা এই আত্মারই একটি সত্তা, এই পরমপুরুষেরই একটি চেতন শক্তি। তিনি তাঁহার গভীরতম সত্তায় অন্তঃস্থ ভগবানকে সমগ্রতায় বহন করিতেছেন, আবার প্রকৃতিতে বিশ্বগত ভাগবত সত্তার মধ্যে বাস করিতেছেন—এই সত্তা কোন সাময়িক সৃষ্টি নহে, ইহা শাশ্বত আত্মার মধ্যে, শাশ্বত অনন্তের মধ্যে চিরকাল কর্ম করিতেছে, বিহার করিতেছে।

"আমাদের মধ্যে রহিয়াছে এই যে চৈতন্যময় জীব ইহা আত্মার উল্লিখিত তিনটি স্থিতির যেকোন একটিকে অবলম্বন করিতে পারে। মানুষ এখানে প্রকৃতির ক্ষরভাবের মধ্যে এবং কেবল তাহাতেই বাস করিতে পারে, নিজের প্রকৃত আত্মা সম্বন্ধে অজ্ঞান, তাহার মধ্যে যে ভগবান রহিয়াছেন তাঁহার সম্বন্ধে অজ্ঞান—সে জানে শুধুই প্রকৃতিকে, সে দেখে প্রকৃতি একটা যন্ত্রবৎ কার্যকারিণী ও সৃজনকারিণী শক্তি এবং সে নিজেকে এবং অন্যান্য সকলকে প্রকৃতিরই সৃষ্ট বস্তু বলিয়া দেখে, তাহারা প্রকৃতির জগতেরই ভিন্ন ভিন্ন অহং। এখন সে এইরূপ স্থূল দৃষ্টি লইয়াই জীবনযাপন করিতেছে, আর যতক্ষণ এইরূপই চলিবে, যতক্ষণ না সে তাহার বহির্মুখী চৈতন্যকে অতিক্রম করিবে এবং তাহার ভিতরে কি রহিয়াছে দেখিতে পাইবে, ততক্ষণ তাহার সকল চিন্তা, সকল বিজ্ঞান হইবে কেবল পর্দার উপর বিকীর্ণ আলোর ছায়ামাত্র। এই অজ্ঞান সম্ভব হইয়াছে, এমনকি অবশ্যম্ভাবী হইয়াছে, কারণ তাহার অন্তরস্থ ভগবান নিজ শক্তির আবরণের দ্বারা নিজেকে লুক্কায়িত রাখিয়াছেন, যোগমায়াসমাবৃত। তাঁহার মহত্ত্বের বাস্তবতা আমাদের অগোচর থাকিয়া যায় কারণ তিনি তাঁহার আংশিক অভিব্যক্তিতে নিজেকে নিজের সৃষ্টি ও প্রতিকৃতিসমূহের সহিত সম্পূর্ণভাবে এক করিয়া দিয়াছেন এবং সৃষ্ট মনকে নিজের প্রকৃতির মায়াময় ক্রিয়াসকলের মধ্যে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। আর ইহা সম্ভব হইয়াছে আরও এইজন্য যে, যে সত্য শাশ্বত অধ্যাত্ম প্রকৃতি হইতেছে

বস্তুসকলের নিগূঢ় সত্তা তাহা তাহাদের বাহ্য রূপের মধ্যে প্রতীয়মান নহে। বহির্মুখী হইয়া আমরা যে প্রকৃতিকে দেখিতে পাই, যে প্রকৃতি আমাদের মনে, দেহে ও ইন্দ্রিয়ে ক্রিয়া করিতেছে, তাহা হইতেছে একটি নীচের শক্তি, অন্য বস্তু হইতে উদ্ভূত—যাদুকরের মত সে আত্মার নানা রূপ সৃষ্টি করিতেছে, কিন্তু আত্মাকে তাহার রূপসকলের মধ্যে লুকাইয়া রাখিতেছে, সত্যকে লুকাইয়া রাখিয়া লোককে শুধু মুখোশটি দেখাইতেছে—সে শক্তি দিতে পারে কেবল যাহা অপকৃষ্ট ও মন্দীভূত, পরন্তু ভাগবত অভিব্যক্তির পূর্ণ শক্তি ও মহিমা ও উল্লাস ও মাধুর্য তাহার সামর্থ্যের বাহিরে। আমাদের মধ্যে এই প্রকৃতি হইতেছে অহং-এর মায়া, দ্বন্দ্বের জট, অজ্ঞান ও গুণত্রয়ের জাল। আর যতদিন মানুষের অন্তঃপুরুষ মন, প্রাণ ও দেহের সত্তায় বাস করিবে, তাহার আত্মায় নহে, ততদিন সে ভগবানকে দেখিতে পাইবে না, সে নিজে ও এই জগৎ প্রকৃতপক্ষে যাহা তাহা সে দেখিতে পাইবে না, এই মায়াকেও জয় করিতে পারিবে না। পরন্তু এই মায়ার সৃষ্ট বস্তু ও রূপসকলকে লইয়াই যতদূর যাহা পারে করিতে হইবে।

"এই যে আলো প্রকৃতপক্ষে অন্ধকার ইহা হইতে জাগিয়া উঠিয়া শাশ্বত ও অক্ষর স্বপ্রতিষ্ঠ সত্তার জ্যোতির্ময় সত্যের মধ্যে বাস করা সম্ভব হইতে পারে, যদি মানুষ তাহার প্রকৃতির যে নীচের খেলার মধ্যে এখন বাস করিতেছে ইহা হইতে সে প্রতিনিবৃত্ত হয়। মানুষ আর তখন তাহার ব্যক্তিত্বের সঙ্কীর্ণ কারার মধ্যে আবদ্ধ থাকে না, এই যে ক্ষুদ্র "আমি" চিন্তা করিতেছে, কর্ম করিতেছে, অনুভব করিতেছে, সংগ্রাম করিতেছে, স্বল্পের জন্য কতই প্রয়াস করিতেছে, নিজেকে আর কেবল এই "আমি" বলিয়াই দেখে না। সে শুদ্ধ আত্মার বিশাল ও মুক্ত নৈর্ব্যক্তিকতার মধ্যে নিমজ্জিত হইয়া যায়, সে ব্রহ্ম হয়, সর্বভূতের যে এক আত্মা তাহার সহিত সে নিজেকে এক বলিয়াই জানিতে পারে। আর তার অহংজ্ঞান থাকে না, দ্বন্দ্বের দ্বারা আর সে ব্যথিত হয় না, দুঃখের বেদনা বা সুখের চাঞ্চল্য আর সে অনুভব করে না, আর কামনার বেগে সে আকর্ষিত হয় না, পাপের দ্বারা বিক্ষুব্ধ হয় না, পুণ্যের দ্বারাও সীমাবদ্ধ হয় না। আর যদিই বা এই সব জিনিসের আভাস বর্তমান থাকে, সে দেখে, সে জানে যে সেসব হইতেছে প্রকৃতির গুণত্রয়ের ক্রিয়া, সে নিজে যে সত্যের মধ্যে বাস করিতেছে ঐ সবকে আর তাহার অঙ্গ বলিয়া অনুভব করে না। প্রকৃতিই কর্ম করিতেছে এবং তাহার যন্ত্রবৎ রূপসকল সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে, কিন্তু শুদ্ধ আত্মা হইতেছে নীরব, নিষ্ক্রিয় ও মুক্ত। শান্ত, প্রকৃতির কার্যাবলীর দ্বারা অস্পৃষ্ট, সে সেসবকে পূর্ণ সমতার সহিত দেখে এবং নিজেকে সেসব জিনিস হইতে পৃথক বলিয়া জানে। এই অধ্যাত্ম স্থিতি লইয়া আসে এক নিখর শান্তি ও মুক্তি, ওজস্বান দিব্য জীবন নহে, পূর্ণ ও সমগ্র সিদ্ধি নহে, ইহা অনেক উচ্চ অবস্থা, তথাপি ইহা সমগ্র ভাগবত-জ্ঞান ও আত্মজ্ঞান নহে।

"পূর্ণতম পূর্ণতা আসিতে পারে কেবল পরমতম ও সমগ্র ভাগবতে বাস

করিয়া। তখন মানুষের অন্তঃপুরুষ যে ভগবানের সে একটি অংশ তাঁহার সহিত যুক্ত হয়, তখন সে আত্মায় ও অন্তরে সকল জীবের সহিত এক হয়, ভগবানে এবং প্রকৃতিতেও তাহাদের সহিত একত্ব উপলব্ধি করে। তখন সে আর শুধুই মুক্ত নহে, সে পূর্ণ, পরম আনন্দে নিমজ্জিত, চরম সিদ্ধির জন্য প্রস্তুত। তখনও সে আত্মাকে দেখে এক শাশ্বত ও অপরিবর্তনীয় সত্তা নীরবে সব বস্তুকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে, কিন্তু সে প্রকৃতিকেও একটা যান্ত্রিক শক্তি বলিয়া দেখে না, যন্ত্রবৎ গুণত্রয়ের দ্বারাই সবকিছু করিতেছে বলিয়া দেখে না, পরন্তু আত্মার শক্তি বলিয়া, আত্মপ্রকাশশীল ভগবানের শক্তি বলিয়া দেখে। সে দেখিতে পায় যে, এই নীচের প্রকৃতি আত্মার কর্মের আভ্যন্তরীণ সত্য নহে, এক উচ্চতম অধ্যাত্ম ভাগবত প্রকৃতি সম্বন্ধে সে সজ্ঞান হয়, এখন যাহাকিছু মনে, প্রাণে ও দেহে বিকলাঙ্গ রূপ গ্রহণ করিয়াছে তাহাদের মূল ও মহত্তর সত্য রহিয়াছে ঐ ভাগবত প্রকৃতির মধ্যে, সে সত্য এখনও পূর্ণভাবে প্রকট হয় নাই। নীচের মানস প্রকৃতি হইতে এই পরম অধ্যাত্ম প্রকৃতির মধ্যে উঠিয়া সে সমস্ত অহং হইতে মুক্তি লাভ করে। সে নিজেকে একটি অধ্যাত্ম সত্ত্ব বলিয়া জানিতে পারে, তাহার মূল সত্তায় সে সর্বভূতের সহিত এক এবং তাহার সক্রিয় প্রকৃতিতে সে ভগবানেরই একটি শক্তি, বিশ্বাতীত অনন্তেরই এক সনাতন অংশ। সে ভগবানের মধ্যে সবকিছুকে দেখে এবং সবকিছুর মধ্যে ভগবানকে দেখে, সে দেখে বাসুদেবঃ সর্ব্বম্। সে সুখ দুঃখের দ্বন্দ্ব হইতে মুক্ত হয়, প্রিয় ও অপ্রিয় হইতে, আশা ও নিরাশা হইতে, পাপ ও পুণ্য হইতে মুক্ত হয়। এখন হইতে তাহার জাগ্রত দৃষ্টি ও বোধের সম্মুখে সবকিছুই ভগবানের ইচ্ছা, ভগবানের কর্মধারা বলিয়া প্রতিভাত হয়। সে বিশ্বচৈতন্য ও বিশ্বশক্তিরই একটি শিখা ও অংশরূপে জীবনযাপন করে, কর্ম করে, সে পরম ভাগবত আনন্দে, অধ্যাত্ম আনন্দে পূর্ণ হইয়া উঠে। তাহার কর্ম হয় দিব্য কর্ম এবং তাহার পদ হয় উচ্চতম অধ্যাত্ম পদ।

"ইহাই সমাধান, ইহাই মুক্তি, ইহাই হইতেছে পরমোৎকর্ষ, যাহারা অন্তরের মধ্যে দিব্য বাণী শ্রবণ করিতে পারে এবং এই শ্রদ্ধা ও জ্ঞানলাভে সমর্থ তাহাদিগকে আমি ইহা প্রদান করি। কিন্তু এই সমুচ্চ অবস্থায় উঠিতে হইলে প্রথম প্রয়োজন, মূলীভূত প্রয়াস হইতেছে তোমার নিম্নতর প্রকৃতির যাহা কিছু সেসব হইতে প্রত্যাবৃত হওয়া এবং নিজেকে সঙ্কল্প ও বুদ্ধির একাগ্রতা দ্বারা সঙ্কল্প বা বুদ্ধির ঊর্ধ্বে যাহা রহিয়াছে, মন, হৃদয়, ইন্দ্রিয় ও দেহের ঊর্ধ্বে যাহা রহিয়াছে, তাহাতে স্থির নিবদ্ধ হওয়া। আর সর্বপ্রথমেই তোমাকে দেখিতে হইবে তোমার নিজের শাশ্বত ও অক্ষর আত্মাকে—তাহা নৈর্ব্যক্তিক এবং সর্বভূতের মধ্যে এক। যতক্ষণ তুমি অহং-এর মধ্যে, মানসিক ব্যক্তিত্বের মধ্যে বাস করিবে, তোমাকে অন্তহীনভাবে একই চক্রে ঘুরিতে হইবে, তুমি প্রকৃত মুক্তির পথ পাইবে না। তোমার সঙ্কল্পকে ভিতর দিকে হৃদয় ও হৃদয়ের কামনাসকলের অতীতে, ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ের আকর্ষণসকলের অতীতে ফিরাও; উহাকে ঊর্ধ্ব দিকে মন এবং মনের

সংস্কার ও আসক্তিসকলের অতীতে, মনের সঙ্কীর্ণ ইচ্ছা ও চিন্তা ও প্রেরণার অতীতে উত্তোলন কর। তোমার মধ্যে এমন একটা কিছুতে উপনীত হও যাহা শাশ্বত, চির-অপরিবর্তনীয়, শান্ত, অচঞ্চল, সর্বত্র সমভাবাপন্ন, সকল বস্তু, ব্যক্তি ও ঘটনার প্রতি পক্ষপাতশূন্য, কোন কর্ম তাহাকে ক্ষুণ্ণ করিতে পারে না, প্রকৃতির কোন রূপায়ণে তাহার কোন ইতরবিশেষ হয় না। সেইটিই হও, শাশ্বত আত্মা হও, ব্রহ্ম হও, ব্রহ্মভূতঃ। যদি তুমি স্থায়ী অধ্যাত্ম উপলব্ধিতে তাহা হইতে পার তাহা হইলে তুমি এক নিশ্চিত ভিত্তি পাইবে, তোমার মন-সৃষ্ট ব্যক্তিত্বের গণ্ডি হইতে মুক্ত হইয়া, অহং হইতে মুক্ত হইয়া সেখানে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে, শান্তি ও জ্ঞান হইতে বিচ্যুতির আর কোন আশঙ্কাই থাকিবে না।

"এইভাবে তোমার সত্তাকে নৈর্ব্যক্তিকভাবাপন্ন করা সম্ভব হইবে না যতক্ষণ তুমি তোমার অহং-এর প্রতি এবং অহং-এর সহিত যাহাকিছুর সম্বন্ধ আছে সেসবের প্রতি আসক্ত ও অনুরক্ত হইয়া থাকিবে। কামনা এবং যেসকল রিপুর আবেগ কামনা হইতে উদ্ভূত হয়—এইগুলিই হইতেছে অহং-এর প্রধান চিহ্ন ও গ্রন্থি। কামনাই তোমাকে "আমি" "আমার" করিয়া ঘুরাইয়া মারে, দৃঢ়ানুবদ্ধ অহংভাবের ভিতর দিয়া তোমাকে তৃপ্তি ও অতৃপ্তি, রাগ ও দ্বেষ, আশা ও নিরাশা, সুখ ও দুঃখ—এই সব দ্বন্দ্বের অধীন করিয়া রাখে, তোমাকে তুচ্ছ ভালবাসা ও ঘৃণার বশ করে, সাফল্য ও প্রিয় জিনিসে তোমাকে আসক্ত করে, অসাফল্য ও অপ্রিয় জিনিসে তোমাকে দুঃখ ও ব্যথার অধীন করে। কামনা সকল সময়েই মনে ভ্রান্তি আনিয়া দেয়, সঙ্কল্পে সঙ্কীর্ণতা আনিয়া দেয়, সকল জিনিসকে অহংভাবের বশে বিকৃত করিয়া দেখায়, জ্ঞানকে মোহাচ্ছন্ন ও বিফল করে। কামনা ও তাহার আনুষঙ্গিক আসক্তি ও উগ্রতা হইতেছে পাপ ও ভ্রান্তির প্রথম সুদৃঢ় মূল। যতক্ষণ তুমি কামনা পোষণ করিবে ততক্ষণ নিষ্কলুষ শান্তির নিশ্চয়তা নাই, জ্যোতির স্থিরতা নাই, স্থির বিশুদ্ধ জ্ঞান নাই। ততক্ষণ শুদ্ধ সত্তা নাই—কারণ কামনা হইতেছে আত্মার বিকৃতি—এবং শুদ্ধ চিন্তা, কর্ম ও অনুভবের কোন সুদৃঢ় ভিত্তি নাই। যেকোন রূপ ধরিয়াই কামনাকে থাকিতে দেওয়া হউক, অতি বড় জ্ঞানীদেরও তাহা হইতে সতত বিপদের কারণ, যেকোন মুহূর্তে তাহা মনকে সুদৃঢ়তম ও নিশ্চিততম লব্ধ ভূমি হইতে সূক্ষ্মভাবে কিংবা উগ্রভাবে বিচ্যুত করিতে পারে। কামনা হইতেছে অধ্যাত্ম সংসিদ্ধির প্রধান শত্রু।

"অতএব কামনাকে বধ কর, বাহ্যত জিনিসসকলকে অধিকার করিবার ও ভোগ করিবার আসক্তি বর্জন কর। যাহাকিছু তোমার কাছে বাহ্যস্পর্শ বা প্রলোভনরূপে আসিতেছে, মন বা ইন্দ্রিয়ের বিষয়রূপে আসিতেছে সে সমুদয় হইতে নিজেকে পৃথক কর। ষড়রিপুর সকল বেগকে সহ্য করিতে ও বর্জন করিতে অভ্যাস কর, যখন তাহারা তোমার আধারে বিক্ষোভ সৃষ্টি করিতেছে তখনও তোমার আভ্যন্তরীণ আত্মায় স্থিরপ্রতিষ্ঠ থাকা অভ্যাস কর, যতক্ষণ না তাহারা আর তোমার প্রকৃতির কোন অংশকেই ক্ষুব্ধ করিতে না পারে। ঠিক সেইভাবেই

সুখ-দুঃখেব প্রবল আক্রমণ সহ্য কর, এমনকি তাহাদেব সূক্ষ্মতম ইঙ্গিতমাত্র স্পর্শকেও সবাইযা দাও। বাগ ও দ্বেষ পবিত্যাগ কব, অনুবক্তি বা ঘৃণা বিনষ্ট কব, সঙ্কোচ ও বিতৃষ্ণা নির্মূল কর। তোমাব সমস্ত প্রকৃতিতে এই সব জিনিসেব প্রতি এবং সকল কাম্য বস্তুর প্রতি থাকুক শুধু শান্ত উপেক্ষা। নৈর্ব্যক্তিক আত্মাব নীবব ও শান্ত দৃষ্টি লইযা সেসবকে দেখ।

"ইহাব ফল হইবে সেই পূর্ণতম সমতা এবং অবিকম্প শান্তিব শক্তি যাহা বিশ্বাত্মা তাহার সৃষ্টির সম্মুখে, সর্বদা প্রকৃতিব বিচিত্র কার্যাবলীব সম্মুখে অটুট রাখে। সমদৃষ্টি লইয়া দেখ, সফলতা ও বিফলতা, মান ও অপমান, মানুষের প্রশংসা ও প্রেম এবং তাহাদেব ঘৃণা ও নির্যাতন, যেকোন ঘটনা অপবকে সুখ আনিযা দেয় এবং যেকোন ঘটনা অপবকে দুঃখ আনিযা দেয—সে সমুদযকে সমতাপূর্ণ মন ও হৃদযের সহিত গ্রহণ কব। সাধু ও অসাধু, জ্ঞানী ও মূর্খ, ব্রাহ্মণ ও চণ্ডাল, উচ্চতম মনুষ্য ও ক্ষুদ্রতম জীব—সকলকে সমান দৃষ্টি লইযা দেখ। তোমার সঙ্গে মানুষের যে সম্বন্ধই থাকুক, বন্ধু ও মিত্র, মধ্যস্থ ও উদাসীন, প্রতিদ্বন্দ্বী ও শত্রু, প্রেমিক ও দ্বেষ্টা—সমান ভাব লইয়া সকলের সম্মুখীন হও। এইসব জিনিস অহংকে স্পর্শ কবে, কিন্তু তোমাকে হইতে হইবে অহংশূন্য। এই-সব হইতেছে ব্যক্তিগত সম্বন্ধ, কিন্তু তোমাকে সবকিছুকেই নৈর্ব্যক্তিক আত্মাব গভীর ভাব লইয়া দেখিতে হইবে। এইসব হইতেছে সামযিক ও ব্যক্তিগত ভেদ বৈষম্য, এইসব তুমি লক্ষ্য কবিবে, কিন্তু এসবেব দ্বাবা তোমাব প্রভাবিত হওযা চলিবে না; কাবণ তোমাকে মন দিতে হইবে এইসব ভেদবৈষম্যেব উপবে নহে—পরন্তু সবের মধ্যে যাহা সমান সবকিছু হইতেছে যে এক আত্মা, প্রত্যেকেব মধ্যেই যে ভগবান রহিযাছেন সেই দিকেই তোমাব মন দিতে হইবে। সর্বত্র দেখিতে হইবে প্রকৃতির এক ক্রিযা, তাহা হইতেছে সকল মানুষ, বস্তু, শক্তি ও ঘটনায় ভগবানেবই সমান ইচ্ছার অভিব্যক্তি, দেখিতে হইবে যে, বিশ্বব্যাপী কর্মধারার সকল প্রযাসে, সকল ফলে, সকল পবিণতিতে একমাত্র ভগবানেব ইচ্ছাই পূর্ণ হইতেছে।

"তখনও তোমাব মধ্যে কর্ম চলিবে, কাবণ প্রকৃতি সকল সময়ই কাজ করিতেছে; কিন্তু তোমাকে শিখিতে হইবে এবং অনুভব কবিতে হইবে যে তোমাব আত্মা ঐ কর্মেব কর্তা নহে। শুধু দেখিযা যাও, অবিচলিত থাকিযা প্রকৃতিব ক্রিযা, তাহাব গুণত্রয়ের খেলা এবং তাহাদেব ভোজবাজি শুধু দেখিতে থাক। অবিচলিতভাবে নিজের মধ্যে এই ক্রিয়া দেখ; তোমার চাবিদিকে যাহা ঘটিতেছে তাহা দেখ এবং দেখ যে অপবেব মধ্যে সেই একই ক্রিযা চলিতেছে। লক্ষ্য কব যে, তোমাব বা তাহাদেব কাজের ফল তুমি বা তাহাবা যাহা ইচ্ছা কব প্রাযই তাহা হইতে ভিন্ন হইতেছে, সে ফল নির্ধারিত হইতেছে তোমাব ইচ্ছাব দ্বাবা নহে, তাহাদেব ইচ্ছাব দ্বাবা নহে, পবন্তু এক মহত্তব শক্তিব দ্বাবা—এই বিশ্বপ্রকৃতিতে সেই শক্তিই সঙ্কল্প কবিতেছে, কর্ম কবিতেছে। ইহাও লক্ষ্য কব যে, তোমাব

কর্মের মধ্যে যে সঙ্কল্প রহিয়াছে সেটাও তোমার নহে, পরন্তু প্রকৃতির। ঐ সঙ্কল্প হইতেছে তোমাব অহং-এর সঙ্কল্প, তোমার প্রকৃতিতে কোন গুণের প্রাধান্য বহিয়াছে তদনুসাবে উহা নির্ধারিত হয—প্রকৃতিই অতীতে ঐ গুণের বৃদ্ধি কবিযাছে অথবা বর্তমানে সেইটিকে সম্মুখে আনিযাছে। উহা তোমার প্রাকৃত ব্যক্তিরূপেব ক্রিযাব উপব নির্ভর করে—কিন্তু প্রকৃতি কর্তৃক সৃষ্ট ঐ রূপ তোমাব স্বরূপ নহে। এই বাহ্য রূপ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া তোমার আভ্যন্তবীণ নীরব আত্মাব দিকে এস, তুমি দেখিতে পাইবে তুমি পুরুষ, তুমি নিষ্ক্রিয়, পরন্তু প্রকৃতিই সর্বদা নিজ গুণাবলী অনুসাবে কাজ করিয়া চলিযাছে। এই আভ্যন্তরীণ নিষ্ক্রিয়তা ও নীববতায নিজেকে নিবিষ্ট কর, নিজেকে আর কর্তা বলিয়া দেখিও না। প্রকৃতিব খেলাব ঊর্ধ্বে নিজেব মধ্যে সমাসীন থাক, গুণত্রয়ের বিক্ষুব্ধ ক্রিযা হইতে বিমুক্ত থাক। নৈর্ব্যক্তিক আত্মাব শুদ্ধ সত্তায নিশ্চিতভাবে বাস কর, তোমার আধারে মবজীবনের যে তবঙ্গভঙ্গ চলে তাহাতে বিক্ষুব্ধ হইও না।

"যদি তুমি ইহা কবিতে পাব, তাহা হইলে নিজেকে এক মহান বিমুক্তিব মধ্যে, এক বিশাল স্বাধীনতা ও এক গভীব শান্তির মধ্যে উন্নীত দেখিতে পাইবে। তখন তুমি ভগবানকে জানিতে পারিবে এবং অমৃতত্ব লাভ করিবে, নিজের আদি-অন্তহীন স্বপ্রতিষ্ঠ সত্তাকে লাভ কবিবে, মন, প্রাণ ও দেহের অধীনতা হইতে মুক্ত হইবে, প্রকৃতির প্রতিক্রিয়ায় অবিচলিত থাকিবে, রিপুর আবেগ, পাপ, যন্ত্রণা ও দুঃখ আব তোমাকে স্পর্শও কবিতে পারিবে না। তখন তুমি তোমার সুখ ও কামনাব জন্য কোন মবণশীল বা বাহ্য বা পার্থিব বস্তুব উপর নির্ভব কবিবে না, পরন্তু এক শান্ত ও শাশ্বত আত্মায় আপনাতে আপনি পূর্ণ আনন্দ চিরকালের জন্য লাভ কবিবে। তখন আব তুমি একটি মনোময় জীব থাকিবে না, তখন তুমি হইবে অপবিমেয আত্মা, তুমি হইবে ব্রহ্ম। আব মন হইতে সমস্ত চিন্তাবীজ এবং সমস্ত বাসনা-মূল দূব করিযা দিযা প্রযাণকালে শুদ্ধ শাশ্বত সত্তায় চিত্তকে নিবিষ্ট করিয়া তুমি পুনর্জন্ম বর্জন কবিযা এই নীরব আত্মার শাশ্বততায প্রবেশ করিতে পার, তোমাব চৈতন্যকে অনন্ত কৈবল্যাত্মক সত্তাব মহান ভাবে উত্তোলিত কবিতে পাব।

*

"তবে এইটিই যোগসাধনাব সমগ্র তত্ত্ব নহে, আব এই পরিণতি, এইভাবে মহাপ্রযাণ, যদিও ইহা মহান পবিণতি, মহান পন্থা—আমি তোমাব নিকট ইহা প্রস্তাব কবিতেছি না। কাবণ আমি হইতেছি তোমার মধ্যে চিরন্তন কর্মী এবং আমি তোমাব কাছে কর্ম চাই। তোমার প্রকৃতির যন্ত্রবৎ ক্রিয়ায় তুমি নিষ্ক্রিয়ভাবে সায় দিবে, নিজেব আত্মায তুমি এই ক্রিয়া হইতে পৃথক থাকিবে, উদাসীন ও অনাসক্ত থাকিবে—তোমাব কাছে আমি ইহা চাহি না, আমি চাই পরিপূর্ণ ও দিব্য কর্ম, সে কর্ম ভগবানেব যন্ত্ররূপে স্বেচ্ছায় ও সজ্ঞানে করা হইবে, তোমার মধ্যে এবং অপবেব মধ্যে যে ভগবান বহিযাছেন তাঁহাব জন্য সেই কর্ম করা হইবে, জগতের

কল্যাণের জন্য সেই কর্ম করা হইবে। আমি তোমাকে এই কর্ম করিতে বলি প্রথমে অবশ্য পরম অধ্যাত্ম প্রকৃতিতে সংসিদ্ধিলাভের একটি উপায় হিসাবে, কিন্তু শেষপর্যন্ত উহা হইবে ঐ সংসিদ্ধিরই একটি অঙ্গ। কর্ম হইতেছে ভগবান সম্বন্ধে সমগ্র জ্ঞানের অঙ্গ, তাঁহার মহত্তর রহস্যময় সত্যের অঙ্গ, পূর্ণ ভাগবত জীবনের অঙ্গ, সিদ্ধি ও মুক্তি লাভের পরও কর্ম করা যায় এবং করা উচিত। আমি তোমার কাছ হইতে চাই জীবন্মুক্তের কর্ম, সিদ্ধ মহাপুরুষের কর্ম। ইতিপূর্বে যে যোগের কথা বলা হইয়াছে তাহাতে আরও কিছু যোগ করিতে হইবে—কারণ সেটি হইতেছে কেবল প্রাথমিক জ্ঞানযোগ। ভগবদ্-উপলব্ধিতে যে জ্ঞান লাভ করা যায় তাহার মধ্যেও কর্মযোগের স্থান আছে, কর্মই জ্ঞানস্বরূপ হইতে পারে। কারণ পূর্ণ আত্ম-জ্ঞানে ও ভগবদ্-জ্ঞানে যে কর্ম করা যায়, জগতের মধ্যে ভগবানকে দেখিয়া এবং ভগবানের মধ্যে জগৎকে দেখিয়া যে কর্ম করা যায়—তাহা একপ্রকার জ্ঞানই, তাহা জ্যোতির ক্রিয়া, তাহা অধ্যাত্ম সংসিদ্ধির অপরিহার্য উপায় এবং অন্তরঙ্গ অংশস্বরূপ।

"অতএব এক সমুচ্চ নৈর্ব্যক্তিকতার উপলব্ধির সহিত এখন এই জ্ঞানটিও যোগ করিয়া দাও যে, যে পরমতমকে আমরা শুদ্ধ নীরব আত্মারূপে পাই, তাহাকেই আবার এক বিরাট ওজস্বান পুরুষরূপে পাইতে পারি—তাহা হইতেই সকল কর্মের উৎপত্তি, তিনিই সর্বলোকমহেশ্বর, তিনিই মানুষের সকল যজ্ঞ ও তপস্যার ভোক্তা। এই যে প্রকৃতিকে একটি স্বয়ংচালিত যন্ত্র বলিয়া দেখা যায়, ইহার মধ্যেই প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে এক অন্তর্বাসী ভাগবত ইচ্ছাশক্তি, তাহাই প্রকৃতিকে চালাইতেছে, নিয়ন্ত্রিত করিতেছে, তাহার উদ্দেশ্যসকলকে রূপ দিতেছে। কিন্তু তুমি ঐ ভাগবত ইচ্ছাশক্তিকে উপলব্ধি করিতে বা জানিতে পারিবে না যতক্ষণ তুমি তোমার ব্যক্তিত্বের সঙ্কীর্ণ কোষের মধ্যে আবদ্ধ রহিয়াছ, অহং ও অহং-এর বাসনা কামনায় অন্ধ ও বন্দী হইয়া রহিয়াছ। কারণ তুমি কেবল তখনই উহাতে সম্পূর্ণভাবে সাড়া দিতে পারিবে যখন তুমি জ্ঞানের দ্বারা নৈর্ব্যক্তিকভাব লাভ করিবে, চৈতন্যের প্রসারের দ্বারা সব জিনিসকে আত্মা ও ভগবানের মধ্যে দেখিবে এবং আত্মা ও ভগবানকে সব জিনিসের মধ্যে দেখিবে। এখানে সবকিছুর উদ্ভব হইতেছে আত্মার শক্তি হইতে, ভগবান সর্বত্র অনুস্যূত রহিয়াছেন, প্রত্যেক জীবের হৃদ্দেশে তিনি বাস করিতেছেন, তাই সকলে আপন আপন কর্ম করিতে পারিতেছে। জগতের সৃষ্টিকর্তা নিজের সৃষ্টির দ্বারা সীমাবদ্ধ নহেন, কর্মের যিনি অধীশ্বর, তিনি নিজ কর্মের দ্বারা বদ্ধ হন না, ভাগবত ইচ্ছাশক্তি নিজ ক্রিয়ায় এবং নিজ ক্রিয়ার ফলে আসক্ত হয় না, কারণ তাহা সর্বশক্তিমান, সর্বেশ্বর এবং সর্বানন্দ। তথাপি ভগবান তাঁহার বিশ্বাতীত পদ হইতে নিজ সৃষ্টির উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন, তিনি অবতার রূপে নীচে নামিয়া আসিতেছেন, এখানে তোমার মধ্যে তিনি রহিয়াছেন, তিনি ভিতর হইতে সকল জিনিসকে তাহাদের প্রকৃতির ধারা অনুসারে নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন। আর তোমাকেও তাঁহার মধ্যে কর্ম

করিতে হইবে দিব্য প্রকৃতির ধারা ও ক্রম অনুসারে, সকল সঙ্কীর্ণতা ও আসক্তি ও বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া। সকলের শ্রেষ্ঠ কল্যাণের জন্য কর্ম কর, জগতের প্রগতিকে ঠিক রাখিবার জন্য কর্ম কর, লোকসকলকে তাহাদের লক্ষ্যের দিকে চলিতে সাহায্য কর, পথ দেখাও। তোমাকে যে কর্ম করিতে বলা হইতেছে তাহা মুক্ত যোগীর কর্ম; উহা হইতেছে ভগবদ্-অনুপ্রাণিত শক্তির স্বতঃস্ফূরণ, উহা সমতাযুক্ত মন লইয়া করা হয়, উহা নিঃস্বার্থ ও নিষ্কাম কর্ম।

"এই মুক্ত, সমভাবাপন্ন, দিব্য কর্মধারার প্রথম ধাপ হইতেছে তোমার মধ্য হইতে ফল ও প্রতিদানের প্রতি সকল রকম আসক্তি বর্জন করা, কাজটি করিতে হইবে বলিয়াই কাজটি করা। কারণ তোমাকে গভীরভাবেই অনুভব করিতে হইবে যে, ফলে অধিকার একমাত্র জগদীশ্বরের, তোমার তাহাতে কোন অধিকার নাই। তোমার সকল শ্রম উৎসর্গ করিয়া দাও, যে ভগবান নিজেকে এই বিশ্বলীলায় প্রকট করিতেছেন, নিজ ইচ্ছা পূর্ণ করিতেছেন, তাঁহারই হস্তে সব ফলাফল ছাড়িয়া দাও। তোমার কর্মের ফল কি হইবে তাহা একমাত্র তাঁহারই ইচ্ছার দ্বারা নির্ধারিত হইবে। আর তাহা শুভই হউক আর অশুভই হউক, সফলতাই হউক আর বিফলতাই হউক, তিনি সেইটিকে বিশ্বমাঝে নিজ উদ্দেশ্য সিদ্ধির সহায় করিয়া লইবেন। ব্যক্তিগত ইচ্ছা ও নিমিত্তস্বরূপ প্রকৃতির সম্পূর্ণ নিষ্কাম ও নিঃস্বার্থ ক্রিয়া—এইটিই হইতেছে কর্মযোগের প্রথম বিধি। কোনও ফল দাবি করিও না, যে ফলই তোমাকে দেওয়া হউক তাহাই স্বীকার করিয়া লও সমতার সহিত, শান্ত সন্তোষের সহিত; কৃতকার্য হও বা অকৃতকার্য হও, সম্পদ আসুক বা বিপদ আসুক, নির্ভীক, অবিক্ষুব্ধ, অবিকম্প হইয়া দিব্য কর্মের কঠিন পথে অগ্রসর হও।

"এই মার্গে এইটি হইতেছে কেবলমাত্র প্রথম ধাপ। কারণ শুধু ফলে অনাসক্ত হইলেই চলিবে না, তোমাকে কর্মেও অনাসক্ত হইতে হইবে। তোমার কাজকে তোমার বলিয়া ভাবা বর্জন কর, তুমি যেমন তোমার কর্মে ফলকামনা পরিত্যাগ করিয়াছ, তেমনই কর্মটিকেও সকল যজ্ঞ ও কর্মের অধীশ্বর ভগবানে সমর্পণ করিয়া দিতে হইবে। জান যে তোমার প্রকৃতিই তোমার কর্ম নির্ধারণ করে; এখনই তোমার স্বভাবের গতি কোন্ দিকে হইবে প্রকৃতিই তাহা নিয়ন্ত্রণ করে, প্রকৃতির কার্যনির্বাহিকা শক্তির ধারায় তোমার আত্মার বিকাশ কোন্ রূপ গ্রহণ করিবে তাহা নির্ধারণ করে। ভগবদ্মুখী পথে চলিতে তোমার ব্যক্তিগত ইচ্ছাকে আনিয়া তোমার মনে গোলমালের সৃষ্টি করিও না। তোমার প্রকৃতি অনুযায়ী যে কর্ম তাহাই স্বীকার করিয়া লও। তুমি যাহা কিছু কর, তাহা অতি মহান বা অসাধারণই হউক অথবা দৈনন্দিন কোন ক্ষুদ্রতম কর্মই হউক, তোমার মনের প্রত্যেকটি ক্রিয়া, তোমার হৃদয়ের প্রত্যেকটি ক্রিয়া, তোমার শরীরের প্রত্যেকটি ক্রিয়া, সব বাহ্যিক বা আভ্যন্তরীণ প্রয়াস, প্রত্যেক চিন্তা, সঙ্কল্প ও অনুভব, প্রত্যেক পদক্ষেপ, গতি ও বিরতি—সবকেই সকল যজ্ঞ ও তপস্যার ভোক্তা ভগবানের উদ্দেশে যজ্ঞরূপে অর্পণ কর।

"তাহাব পর জান যে, তুমি হইতেছ শাশ্বত পুরুষেবই অংশ, তাঁহাকে ছাড়িযা তোমাব প্রকৃতির শক্তিসকলের কোন অস্তিত্ব নাই, তাঁহাব আংশিক আত্ম-অভিব্যক্তি ভিন্ন সেসব আর কিছুই নহে। তোমাব প্রকৃতিব ভিতব দিযা অনন্ত ভগবানেব প্রকাশই ক্রমশ উত্তবোত্তব পূর্ণ হইতেছে। ভগবানেব পবম সৃজনীশক্তি তোমাব স্বভাবকে গডিয়া দিতেছে, তোমাব স্বভাবেব মধ্যে রূপ গ্রহণ কবিতেছে। অতএব তুমি কর্তা এই ধাবণা সম্পূর্ণভাবে বর্জন কব, একমাত্র ভগবানকেই কর্মেব কর্তা বলিযা দেখিতে শিক্ষা কব। তোমাব প্রাকৃত সত্তা হউক একটি নিমিত্ত, একটি যন্ত্র, শক্তির ক্রিযাব একটি আধাবস্বরূপ, অভিব্যক্তিব একটি উপকবণ। তোমাব সঙ্কল্প তাঁহাকে অর্পণ কবিযা দাও, তাঁহাব শাশ্বত সঙ্কল্পেব সহিত এক কবিযা দাও; তোমাব আত্মাব নীববতায তোমাব সকল কর্ম তোমাব প্রকৃতিব সর্বাতীত প্রভুকে সমর্পণ কব। ইহা বস্তুত কবা যায না অথবা পূর্ণভাবে কবা যায না যতক্ষণ তোমার এতটুকু অহংভাব থাকে, এতটুকু মানসিক দাবি বা প্রাণিক লালসা থাকে। লেশমাত্র অহং-এব জন্য যে কর্ম কবা যায, যে কর্মে কামনা বা ব্যক্তিগত ইচ্ছার বিন্দুমাত্র থাকে তাহা পূর্ণ যজ্ঞস্বরূপ হয না। আবাব কোথাও এতটুকু অসমতা থাকিলে অথবা অজ্ঞান রাগ বা দ্বেষেব ছাপ থাকিলেও এই মহান জিনিসটি যথাযথভাবে, প্রকৃষ্টভাবে সম্পন্ন কবা যায না। কিন্তু যেখানে সকল কর্ম, ফল, বস্তু ও ব্যক্তিব প্রতি পূর্ণতম সমতাব ভাব আছে, কামনা বা অহং-এব নিকটে নহে পরন্তু পরমতমেব নিকট আত্মসমর্পণ আছে, সেখানে ভগবদ্ ইচ্ছা তোমাব রূপান্তরিত প্রকৃতির শুদ্ধ ও নির্বিঘ্ন সত্তাব সকল কর্ম নির্ধাবণ কবিযা দেয, ত্রুটি-বিচ্যুতির আশঙ্কা থাকে না এবং ভগবৎশক্তি নিম্ন হইতে কোন বাধা না পাইযা, কোনরূপ প্রতিক্রিয়ায ব্যাহত না হইযা স্বচ্ছন্দে সকল কর্ম সম্পন্ন কবিযা দেব। ভাগবত ইচ্ছা নিখুঁত প্রাধান্যে তোমাব ভিতব দিযা তোমাব প্রত্যেক কর্ম গডিযা দিবে—কর্মযোগের এইটিই হইতেছে পবমতম সিদ্ধি। এইটি হইলে তোমাব প্রকৃতি এই বিশ্বমাঝে পবমতমেব সহিত পূর্ণ ও নিত্য যোগে নিজ পথে চলিতে পারিবে, উচ্চতম অধ্যাত্ম সত্তাকে প্রকট কবিতে পাবিবে, ঈশ্ববেব অনুবর্তী হইতে পারিবে।

"এই যে দিব্য কর্মেব পথ, ইহা জীবন ও কর্মেব বাহ্য ত্যাগ অপেক্ষা উৎকৃষ্টতব মুক্তি এবং মহত্তব পন্থা। বাহ্য ত্যাগ সম্পূর্ণভাবে কখনই সম্ভব নহে, আব উহা যতটা সম্ভব ততটা কবাও আত্মাব মুক্তিব পক্ষে অপবিহার্য নহে, তাহা ছাডা ইহা হইতেছে একটি বিপজ্জনক দৃষ্টান্ত, কাবণ ইহা সাধাবণ মানুষেব বুদ্ধিভেদ ঘটায। যাঁহাবা উত্তম, যাঁহাবা শ্রেষ্ঠ তাঁহাবা যে আদর্শ দেখান, অবশিষ্ট মানুষ তাহাই অনুসবণ কবিতে চেষ্টা কবে। অতএব, যখন কর্ম হইতেছে দেহধাবী জীবেব স্বভাব, যখন কর্ম হইতেছে চিরন্তন কর্মী ভগবানেবই ইচ্ছা, যাঁহাবা মহাত্মা, মহৎবুদ্ধিসম্পন্ন তাঁহাদেব কর্তব্য হইতেছে এই দৃষ্টান্তই দেখান। তাঁহাদিগকে হইতে হইবে বিশ্বকর্মী, কোনরূপ সঙ্কোচ না কবিযা সংসাবেব প্রযোজনীয যাবতীয কর্মই

তাঁহাদিগকে করিতে হইবে—তাঁহাদিগকে হইতে হইবে স্বাধীন, সানন্দ, নিষ্কাম ভগবদ্‌কর্মী, আত্মায় ও প্রকৃতিতে সকলপ্রকাব বন্ধন হইতে চিরমুক্ত।

*

"মন চায জ্ঞান, সঙ্কল্প চায কর্ম—কিন্তু ইহারাই সব নহে; তোমাব মধ্যে বহিযাছে হৃদয এবং তাহা চাহে আনন্দ। এখানেও হৃদযের শক্তি ও দীপ্তিতে, তাহাব আনন্দ আকাঙ্ক্ষায আত্মাকে তৃপ্ত করিতে হইলে তোমার প্রকৃতিকে ঘুবাইযা, রূপান্তবিত কবিযা ভগবানেব সহিত যোগেব সজ্ঞান আনন্দে উত্তোলিত করিতে হইবে। নৈর্ব্যক্তিক আত্মার যে জ্ঞান তাহাব নিজস্ব আনন্দ আছে। নৈর্ব্যক্তিকতার একটা আনন্দ আছে, শুদ্ধ আত্মাব ঐক্যরসেব একটা আনন্দ আছে। কিন্তু সমগ্র জ্ঞান লইযা আসে একটা মহত্তব ত্রিবৃত্ত আনন্দ। ইহা বিশ্বাতীত আনন্দের দ্বার খুলিযা দেয, ইহা বিশ্বগত নৈর্ব্যক্তিকতার অপরিসীম আনন্দেব ভিতব লইযা যায়, আব এই বহুবিচিত্র সৃষ্টির মধ্যে যে উল্লাস রহিয়াছে তাহাব সন্ধান আনিয়া দেয—কারণ প্রকৃতিব মধ্যেও শাশ্বতের আনন্দ রহিয়াছে। এখানে ভগবানেব অংশ যে জীব তাহার পক্ষে এই আনন্দেব স্বরূপ হয় তাহার মূল উৎস ভগবানে প্রতিষ্ঠিত আনন্দ, তাহার নিজ উচ্চতম সত্তায আনন্দ, তাহার জীবনেব যিনি অধীশ্বব তাঁহাতে আনন্দ। ভগবানেব প্রতি একাগ্র প্রেম ও ভক্তি জগতের প্রতি প্রেমে পবিণত হয়, জগতের মধ্যে সকল রূপ, সকল শক্তি, সকল জীবের প্রতি প্রেমে পবিণত হয়, সকলেব মধ্যেই ভগবানকে দেখা যায, পাওয়া যায়, ভালবাসা যায়, সেবা কবা যায, সকলের মধ্য দিয়াই ভগবানেব সহিত একত্ব উপলব্ধি কবা যায। জ্ঞান ও কর্মের উপর এই অনন্ত ত্রিবৃত্ত আনন্দের মুকুট পবাইযা দাও, এই প্রেমকে স্বীকার কর, এই উপাসনা শিক্ষা কব; কর্ম ও জ্ঞানের সহিত ইহাকে সত্তায এক কবিযা দাও। পূর্ণতম পূর্ণতার উহাই হইতেছে শিখব স্বরূপ।

"এই প্রেমযোগ তোমাকে আধ্যাত্মিক বিশালতা, ঐক্য ও মুক্তিলাভেব উচ্চতম শক্তি আনিযা দিবে। কিন্তু এই প্রেম ভগবদ্‌জ্ঞানের সহিত এক হওয়া চাই। একবকম ভক্তি আছে তাহা দুঃখ বিপদে পড়িযা ভগবানকে চায় সান্ত্বনার জন্য, সাহায্যেব জন্য, উদ্ধারের জন্য; একরকম ভক্তি আছে তাহা ভগবানকে চায—ভোগ্য বস্তুব জন্য, বিপদ হইতে নিবাপত্তাব জন্য, বাসনা-কামনার তৃপ্তির জন্য, একপ্রকাব ভক্তি আছে তাহা অজ্ঞানেব মধ্য হইতেই ভগবানকে চায—আলোক ও জ্ঞানেব জন্য। আর যতক্ষণ মানুষ এইরূপ সব ভক্তিব মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে ততক্ষণ তাহাদের উচ্চতম ও উদারতম ভগবদ্‌মুখী ভাবের মধ্যেও গুণত্রযেব খেলা চলিতে পাবে। কিন্তু যখন ভগবৎপ্রেমিক হন আবার ভগবদ্‌জ্ঞানী, তখনই প্রেমিক প্রেমপাত্রের সহিত এক হইয়া যান, জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্—কারণ তিনি হন পবমতমেব নির্বাচিত, ভগবানেব প্রিয়। ভগবানেব

প্রতি এই একনিষ্ঠ প্রেম তোমার মধ্যে বিকাশ কর; হৃদয অধ্যাত্মভাবাপন্ন হইযা এবং উহাব নিম্নতন স্বভাবেব ক্ষুদ্রতা হইতে উত্তোলিত হইযা তোমাব নিকট ভগবানেব অপবিমেয় সত্তাব বহস্যসকল অতি অন্তবঙ্গভাবে উদ্ঘাটিত কবিযা দিবে, তোমার মধ্যে তাঁহার দিব্য শক্তিব পূর্ণ স্পর্শ, প্রবাহ ও মহিমা আনিযা দিবে এবং তোমাব জন্য অনন্ত উল্লাসেব নিগূঢ় উৎস খুলিযা দিবে। পূর্ণতম প্রেমই হইতেছে পূর্ণতম জ্ঞানের চাবি।

"আবাব এই সমগ্র ভগবৎপ্রেমেব দাবি হইতেছে তোমাব মধ্যে এবং সর্বভূতেব মধ্যে যে ভগবান বহিয়াছেন তাঁহাব উদ্দেশ্যে সমগ্র কর্ম কবা। সাধাবণ মনুষ্য কর্ম করে কোন পাপময বা পুণ্যময বাসনার অনুসবণ কবিযা অথবা কোন নীচ বা উচ্চ প্রাণিক উত্তেজনায চালিত হইযা অথবা কোন সাধাবণ বা সমুচ্চ মানসিক মতেব অনুবর্তী হইয়া, অথবা কোন মিশ্রিত মন ও প্রাণেব প্রেবণা অনুসরণ কবিযা। কিন্তু তোমাকে যে কাজ কবিতে হইবে তাহা হওয়া চাই মুক্ত ও নিষ্কাম, কামনাশূন্য হইয়া যে কর্ম করা যায় তাহা কোন প্রতিক্রিযা সৃষ্টি কবে না, কোন বন্ধন চাপাইযা দেয় না। যখন পূর্ণতম সমতা ও অবিচল শান্তিতে কর্ম কবা যায, কিন্তু তাহাব মধ্যে দিব্য আবেগ থাকে না, তখন তাহা হয সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক বাধ্যতা, কর্ত্তব্যম কর্ম্ম, পরে তাহাই দিব্য যজ্ঞে পবিণত হয, ইহাবই উচ্চতম স্তবে ইহা হয কর্মেব ভিতব দিয়া ভগবানেব সহিত একত্বেব শান্ত ও প্রসন্ন অভিব্যক্তি। কিন্তু প্রেমেব ভিতর দিয়া একত্ব ইহা অপেক্ষাও বড, সেই প্রাথমিক আবেগহীন শান্তিব পরিবর্তে ইহা লইয়া আসে প্রবল ও গভীর উল্লাস—তাহা অহমাত্মক কামনাব ক্ষুদ্র উদ্দীপনা নহে, পরন্তু তাহা হইতেছে অনন্ত আনন্দেব সাগব। ইহা তোমাব কর্মের মধ্যে লইযা আসিবে প্রিয়তমেব সান্নিধ্যেব মর্মস্পর্শী অনুভূতি এবং শুদ্ধ ও দিব্য হৃদয়াবেগ। তোমাব মধ্যে এবং সর্বভূতেব মধ্যে যে ভগবান বহিযাছেন তাঁহার জন্য শ্রম কবিবার আনন্দ নিবন্তব জাগিযা থাকিবে। প্রেমই হইতেছে কর্মেব মুকুট এবং জ্ঞানেব মুকুট।

"এই যে প্রেম জ্ঞানের সহিত এক, এই যে প্রেম তোমার কর্মেবও সাবতত্ত্ব হইতে পাবে—ইহাব সার্থক শক্তিতেই তোমাব সমর্পণ হইবে সমগ্র, তোমাব সিদ্ধি হইবে পূর্ণতম। সর্বাঙ্গসিদ্ধ অধ্যাত্ম জীবনেব জন্য চাই ভগবানেব সহিত জীবেব পূর্ণ মিলন। অতএব সর্বতোভাবে ভগবানেব অভিমুখী হও; তোমাব প্রকৃতিকে জ্ঞানে, প্রেমে ও কর্মে তাঁহাব সহিত এক করিযা দাও। সম্পূর্ণভাবে তাঁহাব দিকে ফের, কোনরূপ কুণ্ঠা না কবিযা তাঁহাবই হস্তে তোমাব মনকে, তোমাব হৃদযকে, তোমার সঙ্কল্পকে তুলিয়া দাও, তোমার সমস্ত চেতনা, এমনকি তোমাব ইন্দ্রিয ও দেহ পর্যন্ত তাঁহাব হস্তে তুলিয়া দাও। তিনি পূর্ণতম শক্তিব সহিত তোমাব চৈতন্যকে তাঁহাব দিব্য চৈতন্যেব আধার রূপে গডিযা তুলুন। তোমাব হৃদয হইযা উঠুক ভগবানেবই দীপ্ত বা প্রেমময় হৃদয। তোমাব সঙ্কল্প হউক ভগবানেবই সঙ্কল্পেব অভ্রান্ত ক্রিয়া। এমনকি তোমাব ইন্দ্রিয ও শবীবও হইযা উঠুক

ভগবানেরই উল্লাসময ইন্দ্রিয় ও শরীব। তোমাব যাহা কিছু আছে সব লইয়া তাঁহাব উপাসনা কর, তাঁহার নিকট আত্মোৎসর্গ কব; প্রত্যেক চিন্তা ও অনুভবে তাঁহাকে স্মবণ কব, প্রত্যেক প্রেবণা ও কর্মে তাঁহাকে স্মবণ কর। লাগিয়া থাক, যতক্ষণ না এই সবই সম্পূর্ণভাবে তাঁহার হয়, যতক্ষণ না তিনি যেমন তোমাব অন্তবতম হৃদযমন্দিবে তেমনই তুচ্ছতম ও বাহ্যতম জিনিসেও নিজেকে নিত্য প্রতিষ্ঠিত কবিযা সবকিছুকে দিব্যভাবে রূপান্তরিত কবিয়া দেন।

*

"এই ত্রয়ী পন্থাই হইতেছে সাধন যাহা দ্বাবা তুমি তোমার নিম্ন প্রকৃতি হইতে সম্পূর্ণভাবে উঠিযা পবম অধ্যাত্ম প্রকৃতিতে প্রতিষ্ঠিত হইতে পাব। সেইটিই হইতেছে গুপ্ত অতিচেতন প্রকৃতি যেখানে জীব—অনন্ত ভগবানের অংশস্বরূপ এবং তাঁহারই সমধর্মী জীব—নিজ সত্যেব মধ্যে বাস করে, আব বাহ্য মায়ার মধ্যে নহে। এই যে সিদ্ধি, এই ঐক্য—পরম বিশ্বাতীত স্তবে ইহাব নিজ ধামে ইহা উপভোগ কবা যায, কিন্তু এখানে, এই মানবশবীর এবং জড়জগতেও তুমি ইহা লাভ কবিতে পার এবং কবা উচিত। তাহাব জন্য কেবল ইহাই যথেষ্ট নহে যে তুমি তোমাব আভ্যন্তরীণ আত্মায শান্ত, নিষ্ক্রিয়, গুণাতীত হইযাছ এবং বাহ্য আধাবে গুণসকলেব যন্ত্রবৎ ক্রিয়া চলিলেও তুমি উদাসীন বহিযাছ। কারণ শুধু অন্তবাত্মাকে নহে, বাহিরেব সক্রিয প্রকৃতিকেও ভগবানকে দিতে হইবে, ভাগবত কবিতে হইবে। তোমাব সকল সত্তা লইযা তোমাকে পুরুষোত্তমের সাধর্ম্য লাভ কবিতে হইবে, সব কিছুকেই রূপান্তরিত হইয়া আমার ভাব লাভ করিতে হইবে, মদ্ভাবমাগতাঃ। চাই পূর্ণতম আত্মসমর্পণ। তোমার প্রকৃতির সকল বিচিত্র ভাবে এবং সকল জীবন্ত ধাবায আমাব শরণ লও; কাবণ একমাত্র ইহার দ্বারাই তুমি এই মহান রূপান্তব ও পূর্ণসিদ্ধি লাভ কবিতে পাবিবে।

"যোগেব এই যে সমুচ্চ পবিণতি, ইহাই কর্মসমস্যাব সমাধান করিযা দিবে, এমনকি ঐ সমস্যাব মূল পর্যন্ত বিনষ্ট করিযা উহাকে সম্পূর্ণভাবে অপসারিত কবিবে। মানুষেব কর্ম হইতেছে বাধা ও সমস্যায় পূর্ণ, এমন গহন অবণ্যেব মত যেখানে কোনরকমে কয়েকটা পথ কাটা হইয়াছে কিন্তু সে পথ ধরিয়া অবণ্য অতিক্রম কবা যায না, কিন্তু এইসব বাধা ও জটিলতার উৎপত্তি হইতেছে কেবল এই একটি জিনিস হইতে যে মানুষ তাহার মানসিক, প্রাণিক ও দৈহিক প্রকৃতিব অজ্ঞানেব মধ্যে বন্দী হইযা রহিয়াছে। সে প্রকৃতির গুণসকলের দ্বারাই অবশে চালিত হয অথচ একটা দাযিত্বজ্ঞান তাহাকে পীড়িত কবে—কারণ তাহাব মধ্যে একটা বোধ বহিযাছে যে, সে আত্মা, তাহাব পক্ষে প্রকৃতিব প্রভু ও নিযন্তা হওয়া উচিত, কিন্তু বর্তমানে সে বস্তুত তাহা নহে অথবা খুব সামান্যই। এইরূপ পবিস্থিতিতে তাহাব জীবনেব সকল বিধান, তাহার সকল ধর্ম অসম্পূর্ণ ও সাময়িক হইতে বাধ্য, বডজোর সেসব হইতে পাবে কেবল আংশিকভাবে ঠিক ও সত্য।

মানুষের ত্রুটি ও অপূর্ণতাসকল কেবল তখনই দূব হইবে যখন সে নিজেকে জানিবে, যে জগতেব মধ্যে তাহাকে বাস কবিতে হইতেছে সেই জগতেব প্রকৃত স্বরূপটি জানিবে এবং সর্বাপেক্ষা অধিক প্রযোজনীয—যখন সে সেই শাশ্বতকে জানিবে যাহা হইতে সে উৎপন্ন হইযাছে এবং যাহাব মধ্যে, যাহাকে ধবিযা সে বিদ্যমান আছে। যখন সে একবাব সত্য চৈতন্য ও জ্ঞান লাভ কবিবে তখন আব কোন সমস্যাই থাকিবে না; কারণ তখন সে নিজের মধ্য হইতে স্বাধীনভাবে কর্ম করিবে এবং তাহাব আত্মা ও তাহাব উচ্চতম প্রকৃতির সত্য অনুসাবে স্বতঃস্ফূর্তভাবে জীবনযাপন কবিবে। এই জ্ঞানেব সম্যক পূর্ণতায এবং উচ্চতম উচ্চতায বস্তুত সে আর কর্ম কবে না পবন্তু ভগবানই কর্ম কবেন, তাহাব মুক্ত প্রজ্ঞা, শক্তি ও পূর্ণতায তাহাব মধ্যে এবং তাহাব ভিতব দিযা একমাত্র শাশ্বত অনন্ত ঈশ্বরই কর্ম কবেন।

"মানুষ তাহার প্রাকৃত সত্তায় হইতেছে প্রকৃতিসৃষ্ট সাত্ত্বিক, বাজসিক ও তামসিক জীব। প্রকৃতির যে গুণ যখন তাহাব মধ্যে প্রাধান্য লাভ কবে, তাহাব জীবন ও কর্মেব ধাবা হয় সেই গুণ অনুযাযী। তাহাব তামসিক জড়ানুগত ইন্দ্রিযানুগত মন জড়তা, ভয ও অজ্ঞানের অধীন, তাহা হয আংশিকভাবে পারিপার্শ্বিকের চাপ মানিয়া চলে, আংশিকভাবে কামনাব আকস্মিক আবেগে চালিত হয় অথবা মূঢ় গতানুগতিক বুদ্ধি অনুযাযী অভ্যস্ত কর্মধাবাব আশ্রয গ্রহণ কবে। রাজসিক মন কামনার অধীন, যে জগতে সে বাস কবিতেছে তাহাব সহিত সে সংগ্রাম কবে, সর্বদা নূতন জিনিস অধিকার করিতে চেষ্টা কবে, নেতৃত্ব করিতে, যুদ্ধ করিতে, সৃষ্টি কবিতে, ধ্বংস কবিতে, সঞ্চয কবিতে যত্নবান হয। সকল সময়েই সে সফলতা ও বিফলতাব মধ্যে, সুখ ও দুঃখেব মধ্যে, উল্লাস ও হতাশার মধ্যে আন্দোলিত হইতে হইতে অগ্রসর হয। কিন্তু বাহ্যত সে যেকোন নীতিই অনুসরণ করুক না কেন, বস্তুত সে সর্বত্র নিম্নতন সত্তা ও অহং-এব নীতিই অনুসরণ করে, আসুবিক ও বাক্ষসী প্রকৃতিব অশান্ত, অক্লান্ত, আত্মগ্রাসী এবং সর্বগ্রাসী মনকেই অনুসরণ করিযা থাকে। সাত্ত্বিক বুদ্ধি কতকটা এই অবস্থাব ঊর্ধ্বে উঠে, বুঝে যে কামনা ও অহং-এব নীতি অপেক্ষা একটা উচ্চতব নীতি অনুসরণ করিতে হইবে এবং নিজেকে সামাজিক, নৈতিক, আধ্যাত্মিক শাস্ত্রেব অনুগত কবে, ধর্মেব অনুসবণ করে। মানুষেব সাধাবণ মন এই পর্যন্তই উঠিতে পারে—মন ও সঙ্কল্পকে নিযন্ত্রিত করিবার জন্য একটা আদর্শ বা কার্যকবী বিধান দাঁড় করান এবং জীবনে ও কর্মে যতদূব সম্ভব নিষ্ঠাব সহিত তাহা অনুসবণ কবা। এই সাত্ত্বিক মনকে তাহার উচ্চতম স্তবে বিকশিত কবিযা তুলিতে হইবে, সেখানে সে অহংভাবেব মিশ্রণকে সম্পূর্ণভাবেই বর্জন কবিবে, ধর্মকে ধর্মের জন্যই নৈর্ব্যক্তিক, সামাজিক, নৈতিক বা ধর্মীয আদর্শরূপে পালন কবিবে, এটা কবা কর্তব্য এইরূপ জ্ঞানে নিঃস্বার্থভাবে কর্ম করিবে।

"তবে প্রকৃতির এইসব ক্রিয়ার যাহা প্রকৃত সত্য তাহা বাহ্য মানসিক সত্য মাত্র

নহে, তাহা বেশীরভাগই হইতেছে আভ্যন্তরীণ সত্য। তাহা এই যে, মানুষ হইতেছে দেহধাবী আত্মা, ভৌতিক ও মানসিক প্রকৃতির মধ্যে বদ্ধ হইয়াছে, সেখানে সে এক ক্রমবিকাশের ধারা অনুসবণ করিয়া চলিয়াছে—সে ধারা তাহার সত্তাব আভ্যন্তরীণ ধাবাব দ্বারাই নির্ধারিত হয়; তাহার আত্মার যাহা স্বরূপ তাহাই তাহাব মন ও প্রাণেব স্বরূপ গড়িয়া দেয়, তাহাব স্বভাব গড়িয়া দেয়। প্রত্যেক মানুষেবই একটি স্বধর্ম আছে, সেইটি তাহাকে সন্ধান করিতে হইবে, আবিষ্কার কবিতে হইবে, অনুসবণ কবিতে হইবে। যে কর্ম মানুষেব আভ্যন্তরীণ প্রকৃতির দ্বাবা নির্ধাবিত হয সেইটিই তাহার প্রকৃত ধর্ম। সেইটি অনুসবণ করাই তাহার আত্মবিকাশেব সত্য পন্থা, তাহা হইতে বিচ্যুত হইলেই আসিবে বিশৃঙ্খলা, গতিরোধ, ভ্রান্তি। তাহাব পক্ষে সেই সামাজিক, নৈতিক, ধর্মীয বা অন্য নীতি বা আদর্শ শ্রেষ্ঠ যাহা তাহাকে সর্বদা তাহার স্বধর্মের অনুসরণ করিতে সাহায্য করে।

"তবে এই সব কর্ম তাহাদেব শ্রেষ্ঠ স্বরূপেও হইতেছে মনের অজ্ঞানের অধীন, গুণত্রযেব খেলাব অধীন। কেবল যখন মানুষ নিজ আত্মার সন্ধান পায় তখনই সে এই অজ্ঞানকে এবং গুণত্রযেব বিভ্রান্তিকে অতিক্রম করিতে পারে, নিজ চৈতন্য হইতে মুছিযা ফেলিতে পাবে। ইহা সত্য যে, যখন তুমি নিজ আত্মার সন্ধান পাইযাছ এবং আত্মাব মধ্যেই বাস করিতেছ তখনও তোমাব প্রকৃতি তাহাব পুবাতন ধাবা অনুসবণ কবিয়াই চলিতে পাবে এবং কিছুকাল নিম্নতন গুণসকলের বশেই কর্ম কবিতে পারে। কিন্তু তখন তুমি পূর্ণ আত্মজ্ঞানে ঐ কর্ম লক্ষ্য কবিতে পাবিবে এবং তোমাব জীবনের যিনি প্রভু তাঁহার উদ্দেশ্যে যজ্ঞরূপে উহা অর্পণ কবিতে পাবিবে। অতএব তোমার স্বধর্মের ধারা অনুসরণ কর, তোমার স্বভাব যে কর্ম চায তাহাই কব, তাহা যাহাই হউক না কেন। বর্জন কর সকল অহমাত্মক প্রেবণা, সকল স্বার্থপব আবম্ভ, সকল কামনাব বিধান যতক্ষণ না তুমি তোমাব সমস্ত জীবনকে সমগ্রভাবে ভগবানের নিকট সমর্পণ কবিতে পার।

"আব যখন তুমি একবাব তাহা ঐকান্তিকভাবে করিতে পারিবে, তখনই নিঃশেষে তোমাব সকল কর্মেব আরম্ভ তোমাব মধ্যে যে পরম ভগবান রহিযাছেন তাঁহাব হস্তে অর্পণ কবিবাব সময হইবে। তখন তুমি কর্তব্যাকর্তব্যের সকল বিধি হইতে মুক্ত হইবে, সকল ধর্ম হইতে মুক্ত হইবে। তোমাব অন্তরস্থিত ভগবৎশক্তি ও ভগবৎসান্নিধ্য তোমাকে পাপ ও অশুভ হইতে মুক্ত করিয়া দিবে এবং পুণ্য সম্বন্ধে মানুষেব বিচারের অনেক ঊর্ধ্বে তুলিযা দিবে। কাবণ তুমি তখন অধ্যাত্ম সত্তা ও ভাগবত প্রকৃতির পূর্ণতম ও স্বতঃস্ফূর্ত ঋতম্ ও পবিত্রতাব মধ্যে বাস কবিবে, কর্ম করিবে। তুমি নহ, পবন্তু ভগবানই তখন তোমার মধ্য দিয়া তাঁহার ইচ্ছা ও কর্ম সম্পন্ন কবিবেন, তোমাব অধস্তন ব্যক্তিগত সুখ ও কামনাতৃপ্তির জন্য নহে, পবন্তু জগদ্ধিতায এবং তোমার দিব্য কল্যাণের জন্য এবং সকলেরই দৃষ্ট বা অ-দৃষ্ট কল্যাণেব জন্য। জ্যোতিব দ্বাবা উদ্ভাসিত হইয়া তুমি জগতে এবং কালেব কর্মধাবায় ভগবানেব রূপ দর্শন কবিবে, তাঁহাব উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিবে, তাঁহার

আদেশ শ্রবণ করিবে। ভগবানের ইচ্ছা যাহাই হউক না কেন তোমার প্রকৃতি যন্ত্ররূপে তাহা গ্রহণ করিবে এবং বিনা প্রশ্নে তাহা সম্পন্ন করিবে, কারণ ঊর্ধ্ব হইতে এবং তোমার ভিতর হইতে তোমার প্রত্যেকটি কর্মপ্রেরণার সহিত আসিবে একটা অবশ্যম্ভাবী জ্ঞান এবং ভাগবত প্রজ্ঞা ও তাহার সার্থকতাতে সজ্ঞান সম্মতি। যুদ্ধটি হইবে তাঁহার, বিজয়ও তাঁহার, সাম্রাজ্যও তাঁহার।

"ইহসংসারে এই দেহে ইহাই হইবে তোমার পরম সিদ্ধি, আর এই নশ্বরজগতের ঊর্ধ্বে তুমি লাভ করিবে পরম শাশ্বত অতিচেতনা এবং চিরকালের জন্য ভগবানের পরম ধামে বাস করিবে। পুনঃপুনঃ জন্মমৃত্যুর বাধা আর তোমার থাকিবে না; কারণ ইহজীবনে ভগবানের অভিব্যক্তি তুমি সম্পন্ন করিবে, আর তোমার আত্মা মন ও শরীরের মধ্যে অবতীর্ণ হইলেও এইখানেই আত্মার চিরন্তন অসীমতার মধ্যে বাস করিবে।

"তাহা হইলে এইটিই হইতেছে শ্রেষ্ঠ সাধনা—তোমার সকল সত্তা ও প্রকৃতির পূর্ণ সমর্পণ, যে ভগবান তোমার নিজেরই শ্রেষ্ঠ স্বরূপ তাঁহার জন্য সর্বধর্ম পরিত্যাগ, পরম অধ্যাত্ম প্রকৃতির দিকে তোমার সকল অঙ্গ ও অংশের অনন্য অভীপ্সা। একবার যদি তুমি এইটি করিতে পার, প্রথমেই হউক বা অনেক দূর গিয়াই হউক, তাহা হইলে তোমার বাহ্য প্রকৃতিতে অতীতে বা বর্তমানে যাহাই থাকুক না কেন, তোমার পথ নির্বিঘ্ন, তোমার পূর্ণসিদ্ধি অবশ্যম্ভাবী। পরম ভগবান তোমার ভিতরে অধিষ্ঠিত থাকিয়া স্বয়ং তোমার যোগসাধনাকে গ্রহণ করিবেন এবং তোমারই স্বভাবের ধারা অনুসরণ করিয়া দ্রুত চরম সিদ্ধির দিকে লইয়া যাইবেন। তাহার পর তোমার জীবনের ধারা, তোমার কর্মের রূপ যাহাই হউক না কেন, তুমি সজ্ঞানে ভগবানের মধ্যে বাস করিবে, কর্ম করিবে, বিচরণ করিবে এবং তোমার সকল বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ গতিতে ভাগবত শক্তিই তোমার মধ্য দিয়া কাজ করিবে। এইটিই হইতেছে সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা, কারণ এইটি হইতেছে উচ্চতম গুহ্য সত্য ও পরম রহস্য, অথচ ইহা হইতেছে একটি আভ্যন্তরীণ সাধনা যাহা সকলেই অনুসরণ করিতে পারে। তোমার বাস্তব অধ্যাত্ম সত্তার এইটিই হইতেছে গভীরতম অন্তরতম সত্য।"

সমাপ্ত

নির্দেশিকা

অক্ষর (অক্ষরপুরুষ) ৬৬, ৬৭ (পাদটীকা), ১০১, ১০২, ২১১, ২১৪, ৪১৭-১৮, ৫০৭
  ও ত্রিগুণাতীতত্ব ২১৩
  ও পুরুষোত্তম ৪২১
অক্ষর সত্তা ১০৯-১০
  এর সহিত মিলন ২১৫-১৬
  ও কর্ম ২৩৮-৩৯
  ও পুরুষোত্তমের অনুসন্ধান ৩৭৭-৮০
  সকল সম্বন্ধকে অস্বীকার করে না ৩২১
অগ্নি ১০৪
অচেতন ৪৬১
অজ্ঞান ১১০-১১, ১৪১
অতিচৈতন্য ৪৬১
অতিমানব ১২০
অদ্বৈত, গীতার ৪২৯
অদ্বৈতবাদ ও সর্বেশ্বরবাদ ৭৮ (পাদটীকা)
অধিদৈব ২৭০-৭১
অধিভূত ২৭০-৭১
অধিযজ্ঞ ২৭০-৭১
অধ্যাত্ম ২৭০, ২৭২
অনুস্মরণ, মৃত্যুকালীন ২৭৪-৭৬, ২৭৯-৮০, ৩৮১
অবতরণ ১৩১, ৪৪৭ (পাদটীকা)
  উদ্দেশ্য ১৪২-৪৩, ১৪৭-৪৮
  সম্ভাবনা ও প্রয়োজন ১২৮-৪০
  প্রণালী ১৪৩-১৪৯
অবতার ৪-১০, ১২৯-৪০, ১৪১-৪৯
  অর্থ ১৪০ (পাদটীকা)
  আংশিক ১৪৪
  এর কর্ম ১৫০-৫৭
  ও ধর্ম ১৩৫, ১৪২, ১৫১-৫৭
  ও বিভূতি ১৪৩-৪৫
অবরোহণ, মানবী সত্তার মধ্যে ভগবানের জন্ম ১৩১
অবিশ্বাস ১৮৭
অমৃত ১০৪
অমৃতত্ব ৪০২-০৩
  ও মৃত্যু ৫০-৫৩, ৪০২-০৩
অর্জুন ৪৫-৪৬
  দৈবী প্রকৃতি ৪৪৯
  বিভূতিরূপে ৩৫৩
  মানব শিষ্য ১৪-২২
অলৌকিক ক্রিয়া ও অবতার ১৪৭
অশ্বত্থ বৃক্ষ ৪২৩-২৪
অসীম ও সসীম ১৩৬
অসুর ২৫৯
  ও দেব ৪৪৭-৫২
অহং ও প্রকৃতির নিয়ন্তৃত্ব ১৯৪-২০৮
অহঙ্কার ৮৩, ৩৪৯, ৫২১, ৫৪০-৪১
  ও কর্মী ৪৭৫
  ও জীব ৫২৬-২৭
অহংবোধ ৬১-৬৩, ৫৫০
অহংভাব ৯৭
  বর্জন ৫১২
অহিংসা ৫৪০-৪১
আত্মদান, আত্মসমর্পণ ১৯১, ২৬৯, ৩১৩-১৪, ৪৬৯
আত্মনিবেদন ৫৫২
আত্ম-সংযম ৯৪
আত্মা ১৩৬, ২৩৮, ৫৪৩, ৫৪৫, ৫৪৯, ৫৫১
  আভাস বা বাসনাত্মক এবং প্রকৃত ১৯৭
  এর তপঃ ৪৬৮
  এর তিনটি সত্য ৩৯০-৯১
  এর বিকাশ সাধন ২৬৮
  ও ঈশ্বরের সত্যতা ৪৩৫-৩৬
  ও দেহ বা শরীর ২৫৫
  (পুরুষ) ও প্রকৃতি ১৯৭, ২৩৪, ২৪৪, ২৪৭, ৩৯৬-৯৮, ৪৩৩-৩৫, ৫৫১
  ও ভূতসকল ১০৯
  ও সর্বভূত ২৯৮-৯৯
  নিম্নতন ৫০৭
  নৈর্ব্যক্তিক (নৈর্ব্যক্তিক আত্মা দ্রষ্টব্য)
আধ্যাত্মিক শক্তি ৩৬
আনন্দ ৪৪৫, ৪৮৫, ৫৬৫
  আন্তরিক, দিব্য কর্মীর লক্ষণ ১৬৪

সত্ত্বগুণেরও অতীত ৪৪৫
আরোহণ, ভাগবত-ভাবে মানবের জন্ম ১৩১
আসুরিক প্রকৃতি ৩০৬, ৪৫০-৫১, ৪৫৩
ইচ্ছা, ভাগবত ৪৪৩-৪৪, ৫৬২
ইচ্ছাশক্তি ২৪৫
পবমাণুতে ৬১, ৮৩, ১৩৬, ২০১
ইন্দ্র ও কুৎস ১৩, ১৫
ইন্দ্রিয় ও যজ্ঞ ১০৬
ইন্দ্রিয়, জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয় ৬১, ৮৩
ইন্দ্রিযানুভূতি ২৫২
ইষ্টদেবতা ৩২২
ও গীতাব ভগবান ৫২০
ঈশ্বব ৬৪, ২৪৫, ৩২২, ৫১৯
কৃষ্ণ ৫৮
ঈশ্ববাদ ৩৩০
উত্তব মীমাংসা ৭৪
উৎসর্গ, (যজ্ঞ দ্রষ্টব্য) ৩০৫
উদাসীনতা ১৭১, ১৮৯, ১৯০
উদ্ভিদ ২০১
উপনিষদ ৭, ২৪৪
ও ক্ষব ও অক্ষব ৪১৯
ও গীতা ৩২০
ও পুকষ ৬৫
উপলব্ধি ২৯৩-৯৫
উপাদান, পঞ্চভূত ৬০-৬১, ৮৩, ২৪৭, ২৫১-৫২
ঋষি, সপ্ত ৩২৬
একত্ব, ভগবানের সহিত ১৯২
ওঁ ২৫২, ৩০৯, ৩০৯ (পাদটীকা), ৪৬৯
ওঁ তৎ সৎ ৪৬৯
কর্তব্য ৪৩১
ও গীতার শিক্ষা ২৫-৩০
কর্তৃত্বাভিমান ২৮৪, ৪৭৪, ৫৬০-৬১, ৫৬৪
কর্ম ৯১-৯৮, ২৭১-৭২, ২৮৮
অজ্ঞানে ও জ্ঞানে ২৮২
অবতাবেব ১৫০-৫৭
আত্মাব নির্দেশে ৪৮০
এবং জ্ঞান ও ভক্তি ৭৪, ৩০২, ৩১৬
এব কর্তা ৩০
এব কর্মী ৪৭৫-৭৬
এব কারণ পাঁচটি ৪৭৫-৭৬
এব ফল পবিত্যাগ ২৮৩-৮৪, ৩৮২, ৪১২ ১৩, ৪৭২, ৫৬৩
এব সমর্পণ ৪৩৮
এব সর্বোচ্চ ধর্ম ৫৪৯
এতে আসক্তি ত্যাগ ৪১২ ১৩, ৫৬৩
ও অক্ষব আত্মা ২৩৮
ও গুণসকল ৪৪১-৪৩
ও নির্বাণ ২১৫-২৮
ও প্রকৃতিব গুণসকলেব অতীতে যাওযা ৪১২
ও বুদ্ধিযোগ ৬৭-৭১ ৮২
ও সন্ন্যাসেব বিবোধ ৯৭-৯৮
কামনাব স্বৈবতা অনুসবণে ও শাস্ত্র অনুসবণে ৪৫৫
নিষ্কাম ৮৮, ৯৫-৯৬ ১১০
নৈর্ব্যক্তিক, ৫২৩-২৬
পতঞ্জলিব যোগে ও গীতায ৫৮-৫৯
বেদান্তিকদেব ভাষায ও যোগশাস্ত্রে ৭৬-৭৭
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয বৈশ্য ও শূদ্রেব ৪৮৮
ভগবানেব উদ্দেশ্যে ৫৬৬
মুক্তপুকষেব ১৬০-৬৮, ৪৩০-৪১ ৪৭৩-৭৪, ৫১৪-১৫, ৫৬১-৬৫
মুক্তিপ্রদ ৫১৫-১৬
যজ্ঞরূপে ২৬২, ৪৩৭, ৫৪৩
সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ২৩৬ ৪৮০-৮১
স্বভাব-নিযত ৪৭৩, ৪৮৭, ৪৮৯ ৪৯২
কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড ৭৪
কর্মত্যাগ ৯২-৯৩
কর্মফল, কামনা ও আসক্তি ত্যাগ ২৮৩-৮৪, ৩৮২, ৪১২, ৪৭২, ৫৬৩
কর্মমূলক ধর্ম ৩১৮
কর্মযোগ ৮৮-৮৯, ৯৪-৯৫
গীতাব প্রথম ধাপ ৩১
এব সাবতত্ত্ব ২২৯-২৪০
কর্মশীল মানব ১২৪-২৫
কর্মশূন্যতা ৯৪
কল্কি ১৪৯
কামনা বা বাসনা ২৩৭, ৫৫৯
ও কর্ম ৯৪-৯৭
কাল ও দেশ ২৯২ ৩৪০-৪১
কুরুক্ষেত্র ৩৩-৩৯

কূটস্থ ২২১, ৪১৪
কৃচ্ছ্র ১৭১
কৃষ্ণ, অবতাবরূপে ১৪৯-৫২
ঐতিহাসিক ১০-১১
ভগবদ্‌ওরূপে ১০-১৩
হবিবংশে, মহাভাবতে ও পুবাণে ১১
ক্ষত্রিয ৪১-৪৪, ৫৩-৫৫, ৫০০
এব কর্ম ৪৮৮-৮৯, ৪৯৩-৯৪
এব ধর্ম ৪৭-৫৬
ক্ষব ৬৬, ২১০, ২১৮, ২৭২, ৪১৬-১৮, ৫০৮
ও পুরুষোত্তম ৪২২, ৪২৫
ক্ষুধারূপী মৃত্যু ৩৪
ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ ৩৮৯-৪০১
খাদ্য ৮৫
সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক ৪৬৩
খৃষ্ট, যীশু, অবতাবরূপে ১৪৫, ১৪৭, ১৫১
ঐতিহাসিক এবং হৃদিস্থিত ১০
খৃষ্টধর্ম ১৫১, ১৫৪
গীতাব উপযোগিতা ১-৭
এব পবম বাক্য ৩২৪
এব বাণী ৫৩৯-৪৮, ৫৪৯-৭০
ও উপনিষদ ৩২০
ও 'তাও"-পন্থা ৫২৪-২৬
ও মহাভাবত ৮
কর্তব্য পালনেব শাস্ত্র নহে ২৫-৩০
মূলশিক্ষা ২৩-৩২
ধর্মপক নহে ১৪-১৫
গুণ ৬০, ৩৯৮, ৪০৬-১২, ৪৪০-৪১, ৫২২, ৫৬৮
ও আধ্যাত্মিক ও অতিমানসিক প্রকৃতিব কর্ম ৪৪৩-৪৬ ৪৪৬ (পাদটীকা)
ও কর্ম ২৩৬, ৪৭৯-৮০
ও কর্মী ৪৮০-৮১
ও কর্মের যন্ত্র ৪৭৯
ও জ্ঞান ৪৭৭-৭৮
ও তপস্যা ৪৬৬-৬৮
ও ত্যাগ ৪৭৪
ও ত্রিগুণাতীতত্ব ২১২-১৪
ও দান ৪৬৮-৬৯
ও পবিমাণ ৪০৬-০৭
ও প্রকৃতিব নিয়ন্তৃত্ব ২০১-০৫
ও বুদ্ধি ৪৭৯-৮৩
ও মানুষেব জীবন-যুদ্ধ ৪৪-৪৫
ও মুক্তপুরুষেব কর্ম ৪৪২-৪৩
ও যজ্ঞ ৪৬১-৬৬
ও সন্ন্যাস ৪৬
ও সমতাব পথ ১৭৩-৮০
ও সুখ ৪৮৪-৮৫
ও স্বভাব এবং স্বধর্ম ২৫১
পবস্পবেব সহিত সংগ্রথিত ৪০৭-০৮
সর্বোত্তম ২৫১
গুরু, ভগবান ১১-১৩
গুহ্যাদ্ গুহ্যতবং ২৮১-৩০১
চতুর্বর্ণ ৫, ৪৮৭-৫০৩
ও দিব্যপ্রকৃতির কর্মধাবা ৫০০-০১
চিন্তাব ইতিহাস, ভারতের ৭
চৈতন্যের আত্মসৃজনীশক্তি ২৭৪
জগৎ (existence) ২৮৩, ৪২০, ৫৪৯
ও ভগবান ৩৪৫-৪৭
দেবতাদেব ও অসুবদেব ৪৫২ (পাদটীকা)
জগৎচক্র ২৭৭-৭৮
জড় ১৩৬
জডবাদে ও অধ্যাত্মবাদে ২৫২
জনক ১১৮
জন্ম, দিব্য ও সাধারণ ১৩৮-৪১
জন্মান্তরবাদ ও অবতাব ১৪৮
জাতিভেদ ৪৮৯-৯০
জীব ২৪৯, ৩০২, ৪২৫-২৬, ৪৯৮, ৫২০, ৫৩৫, ৫৫৬
ও অহঙ্কাব ৫২৬-২৮
ও দিব্য-প্রকৃতি এবং নীচেব প্রকৃতি ৩৪৯-৫০
ও পবা-প্রকৃতি ২৪৯, ২৫৭-৫৮
জীবন, প্রকৃতিব অধীন ও আধ্যাত্মিক ২৩৪
জোবোস্টাবেব ধর্ম ৪৪৮
জ্ঞান ১৮৩-৮৪, ৩১৭-১৮, ৩৯৯, ৪৩৯-৪০, ৫৫৩
একমাত্র জ্ঞেয ৩৯৫-৯৬
এব জন্য কি-কি প্রযোজন ৩৯৪-৯৫
ও কর্ম এবং ভক্তিব সমন্বয় ৭৪, ৩০২-১৬
ও ভক্তি ২৬৩-৬৭, ৩০৪-০৫, ৩২৪

ও সমতা ১৬৯-৭০ ১৮২-৯৩
কর্মের জ্ঞানে সমাপ্তি ১০৭, ১৮২-৮৩
সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক ও আধ্যাত্মিক ৪৭৭-৭৮
দর্শনশাস্ত্রে, যোগশাস্ত্রে, বিজ্ঞানে, মনস্তত্ত্বে, নীতিশাস্ত্রে, সৌন্দর্যনীতিতে ১৮৫-৮৬
দিব্য-কর্মীর চিহ্ন ১৫৯-৬০
যজ্ঞ ১০৭, ১৮২, ৩০৮
সমগ্র ৫১৫
জ্ঞানকাণ্ড ও কর্মকাণ্ড ৭৪
জ্ঞানযোগ ৩১, ৭০, ৭২, ১১৩, ৩৭৬
ও কর্মযোগ ১৮২-৮৩
জ্যোতি, সত্ত্বগুণের ঊর্ধ্বে ৪৪৫
ডারউইনের মতাবলম্বন ৩৪
তৎ ৪৬৯
তত্ত্ব ৬১-৬২
তন্মাত্র (জড়শক্তির পাঁচটি সূক্ষ্ম গুণ) ৬১, ২৫২
তপঃ ৪৬২
আত্মার ৪৬৮
তপস্যা ৪৬৩
বাঙ্ময় ৪৬৭
সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ৪৬৬-৬৭
তমঃ ৬০, ৩৫০, ৪০৮, ৪৪৪
সত্ত্বের দ্বারা অনুশাসিত ৪৪৭
তাওপন্থা ও গীতা ৫২৪-২৫
তাত্ত্বিক বর্ণনা ও আধ্যাত্মিক সত্য ২৪৪
তান্ত্রিক সমন্বয় ৭
তামসিক মানব ৫২২
ও জীবন-যুদ্ধ ৪৪
তিতিক্ষা ১৭১, ১৮৯
তিনটি পথ ৩২
ত্যাগ ৪৭১-৭৫, ৫১৩
ও সন্ন্যাস ৪৫-৪৬, ৭২-৭৩, ৮৫, ১১৩, ১৬৫, ১৭৫, ২২০-২১, ৪৭১-৭২, ৫০৮
কর্ম ৯২
ও কর্মযোগ ৭০, ১৮৩
ও সন্ন্যাস ১৬৫, ৪৭১-৭২, ৫০৮, ৫১৩
সত্য ৪৭৫
সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ৪৭৪
ত্রিগুণাতীতত্ব ১৬৭-৬৮, ২১৩-১৪
ও সমতা ১৭০
ত্রিসত্তাবাদ, খৃষ্টানদের ১৪৫
দয়া ৪৮-৪৯
দর্শন ২৩৫
দান ৪৬৩
সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ৪৬৮-৬৯
দিব্য কর্ম ১৫৮-৬৮, ২৩২-৩৩ ৫১৬
এর নীতি ১১৭-২৬
এর স্বরূপ ১৩১
দিব্য জন্ম ২৩৩
ও সাধারণ জন্ম ১৩৮-৪১
দুইটি দিক ১৩১
দুঃখ ৪৮৪
দেবতা ও অসুর ৪৪৬-৫৩
বেদে, বেদান্তে ও গীতায় ৯৭-৯৮
ও যজ্ঞ ১০২-০৩
দেশ ও কাল ২৯২, ৩৪০-৪১
দেহ ও আত্মা ২৫৫
দেহের স্বরূপ ৩৯২
দৈব ৪৭৬
দ্বন্দ্ব, বিপরীতভাবের ৩৯৩
দ্বন্দ্বাতীতত্ব ১৬২-৬৩, ২৬১
দ্বৈতবাদ, সাংখ্যের ৫৯
ও অদ্বৈতবাদ ১৩৩
ধর্ম ২৫৪, ৩১০, ৩১২, ৩৪৭, ৩৮৪-৮৫, ৫৪৪
ও অধর্ম ১৫৪-৫৫
ও অদ্বৈতবাদ ১৩১-৩২, ১৪১, ১৫১-৫৬
কর্মমূলক ও ভক্তিমূলক ৩১৮
সর্বধর্ম পরিত্যাগ ৫৩৩-৩৮, ৫৬৯
সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক ৫২২
সাধারণ অর্থ, ৩৫৫ (পাদটীকা)
ধী-শক্তি বেদের সপ্ত ৩২৬
ধৃতরাষ্ট্র ১০
ধৃতি, সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ৪৮১-৪৮৩
ধ্যান, রাজযোগের পদ্ধতি ২২২
ধ্বংস ৩৪-৩৯, ৩৪০, ৩৫৮-৬৬
নতি ১৭১, ১৮৯, ১৯১
নর-নারায়ণ ৯, ১৩
নাইট, ইউরোপের ৪৩
নারায়ণ ৩৭২-৭৩

নিঃসঙ্গতা ২৮৪
নিগ্রহ ও সংযম ২০০
নিমিত্ত ২৭০-৭১
নিম্ন-প্রকৃতি ২৪৭-৪৮, ২৫৫, ২৫৮, ৩২৮, ৩৮৯, ৪১৬-১৭, ৫৫৭
সাংখ্যে ৩৯২-৯৩
নির্গুণ ও সগুণ ২১১
নির্বাণ ৯০
ও কর্ম ২১৫-২৮
ব্রহ্মে ২১৬-১৯
নিষ্কামতা ১৭০
ও সমতা ১৭০
ও দিব্যকর্মী ১৬০
ধর্মবিরুদ্ধ নয় ২৫৩-৫৪
নীটশে, ফ্রেড্রিক ৩৫
নৈর্ব্যক্তিক আত্মা ৪৩৩-৩৪, ৫০৯-১২, ৫৫৩, ৫৫৮-৫৯
নৈর্ব্যক্তিক ভাব ১১২-১৪, ৩৯৯, ৫১০-১১, ৫২৩-২৪, ৫২৬
ও সমতা ১৬৯
দিব্যকর্মীর চিহ্ন ১৬১
পরব্রহ্ম ৩০২, ৩৭৬
পরমাণু (অণু) ৬১, ৮৩, ১৩৬, ২০২
পরমাত্মা ৩০২, ৩৯৮
পরমেশ্বর ৩০২
পরশুরাম ১৪৮, ১৫২
পরা প্রকৃতি ১২২-২৩, ২৪৭-৪৯, ৩৪৭-৪৮, ৫৫৮
ও জীব ২৪৯, ২৫৭-৫৮
পরার্থপরতা ১১১
পশু ২০২-০৩
পাপ ১৬১, ২৫৮-৫৯
ও পুণ্য ১৬৩, ২৫৪
ও পুণ্যের ঊর্ধ্বে ১৯৯
পুণ্য ২৬০, ২৬০ (পাদটীকা)
ও পাপ ১৬৩, ২৫১
ও পাপের ঊর্ধ্বে ১৯৯
পতঞ্জলির যোগ ৫৮
পুরুষ, অক্ষর (অক্ষর দ্রষ্টব্য)
অনুমন্তারূপে ২০৯
এর মুক্তি ২০৫
উত্তম (উত্তম পুরুষ দ্রষ্টব্য)
উপনিষদে ৬৫-৬৬
ক্ষর ১০৯-১০, (ক্ষর দ্রষ্টব্য)
তিন ৬৬, ২১০-১২, ৪১৬-২৯
নৈর্ব্যক্তিক সত্তা ১০৯
বহু ৬২-৬৪
পুরুষ ও প্রকৃতি ১৫৯, ৫৫১
ও গীতা ২০৯
গীতোক্ত ৬৪-৭৩
সাংখ্যে ৬০-৬৫, ৮২, ১৯৭-৯৮
পুরুষোত্তম ৩০, ৬৬, ৭৮ (পাদটীকা), ১১২, ১১৭-১৮, ১২২-২৩, ২১২, ২২০, ২৬২-৬৩, ২৭৩, ২৭৫, ৩০২, ৪২১-২৯, ৪৩৪, ৫১৪, ৫২০, ৫২৮, ৫৩৫, ৫৫৪-৫৬
এর সন্ধান ৩৭৭-৩৮০
এর সহিত একত্ব ২১৫
ও ত্রিগুণাতীতত্ব ২১৪
ও পরা প্রকৃতি ২৪৭
বিশ্বাতীত ২৯৩
বিভিন্ন উপলব্ধি ২৯৩-৯৫
পূজা বা উপাসনা (বাহ্যিক) ৩১০-১৩
পূর্ব মীমাংসা ৭৪
প্রকৃতি ৪৩৩-৩৪
অষ্টধা ২৪৭
আধ্যাত্মিক ও প্রাতিভাসিক (উচ্চ ও নিম্ন প্রকৃতি দ্রষ্টব্য)
আসুরী বা আসুরিক ৩০৬, ৪৫০-৫৩
উচ্চ (দৈবী) এবং নিম্ন (ত্রিগুণময়ী) ৬৭, ২৪৬-৫৬, ২৮৭-৮৮, ৩৯১, ৫০৭-০৮, ৫২১
এর কর্তৃত্ব ২৯, ১৯৪-২০৬
এর নিয়ন্তৃত্ব ১৯৪-২০৫
এর রূপান্তর ৩৩৩, ৪৪০-৪১
ও খাদ্য ৪৬৩
ও জীব ৩৪৯-৫০
ও পুরুষ (পুরুষ ও প্রকৃতি দ্রষ্টব্য)
ও মায়া ৯২-৯৩, ১৩৭-৩৮
গীতা ও সাংখ্যে ৬৬-৬৭
গুণ (গুণ দ্রষ্টব্য)
দৈবী ৩০৭, ৪৪৯-৫০

পবা ২৪৭-৪৮, ৩৪৭-৪৮
বিশ্ব ৫৩১
বাক্ষসী ৩০৬
সাংখ্য ও গীতায় ৬৬-৬৭
প্রলয় ৪০২-০৩ (লয় দ্রষ্টব্য)
প্রেম ৩৭, ৫৬৬
প্রেমযোগ ৫৬৫-৬৭
ফরাসী বিপ্লব ১৫০
বঙ্কিমচন্দ্র ২৯
বামন ১৪৮, ১৫২
বায়ু ৪১৮
বাসনা (কামনা দ্রষ্টব্য)
বিজ্ঞান ৪০৬
বিভূতি ৯, ৩৩৯-৫৪
ও অবতাব ১৪৩-৪৪
তত্ত্ব ৩৪৪-৫৪
বিশিষ্টাদ্বৈত ৪২৬
বিশ্বজগৎ ২৯৩-৯৭
বিশ্বরূপ দর্শন (মহাকাল) ৩৫৫-৬৬
দুই ভাব ৩৬৭-৭৪
বিশ্বাস, ও জাগতিক মানুষ ৪০-৪১
বিষ্ণুর দশাবতাব ১৪৮-৪৯
বুদ্ধ ৪৫৬
অবতাবরূপে ১৪৫ (পাদটীকা) ১৪৭-৪৮, ১৫১
বুদ্ধত্ব ১৪৫
বুদ্ধি ৪৮১-৮৩
অর্থ ৮৩
ও কর্ম ৬৮-৬৯, ৮২
দুই প্রকাব ৮১
সাংখ্যে ৬০-৬১, ৮৩
বুদ্ধিযোগ ৮১-৯০, ৫১১
বেদ ও গীতা ৭৬, ৪২৩-২৪
বেদবাদ ও ব্রহ্মবাদ ৭৪-৭৬
বেদান্ত, গীতাব তাত্ত্বিক সমন্বয়ে ৩৩৪
এবং সাংখ্য ও যোগ (গীতায়) ৫৭-৫৮, ৬৭-৭৯
বৈদিক ধর্মেব বহিরঙ্গ ৩১২-১৩
বৈদিক সমন্বয় ৭
বৈবাগ্য ৫১২-১৩
বৈশ্য ৫০০
এব কর্ম ৪৮৮, ৪৯৪
ও জাতিভেদ ৪৮৯
বৈষ্ণব ধর্ম ১৫৫
বৌদ্ধ ধর্ম ১৫২-৫৪
এবং কর্ম ও ভক্তি ৩১৮-১৯
এবং সাংখ্য ও বেদান্ত ৭২
ও গীতা ৭৩ (পাদটীকা)
মহাযান ৫২৩
ব্যক্তি, আধ্যাত্মিক ৫২৬-২৭
ও সমাজ ১২০
ব্যক্তিত্ব ৪২৩
ও নৈর্ব্যক্তিক সত্তা ২১১ ২৮৭
ব্রহ্ম ২৭০-৭১, ৩৯৫-৯৭
দুইটি সত্তা ১০২
ও যজ্ঞ ১০৪
যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত ১০০ ০১
ব্রহ্মবাদ ৭৪
ও বেদবাদ ৭৪
ব্রাহ্মণ ৫০০
এব কর্ম ৪৮৮ ৪৯১-৯২
ব্রাহ্মীস্থিতি ৮৯
ভক্ত, চাবিপ্রকাব ২৬৩-৬৭
ভক্তি ২৫৯-৬৭ ২৭৮, ২৮৫ ৩৩২-৩৩, ৫১৩-১৪
উদাব ৩০৮
এবং জ্ঞান ও কর্মেব সমন্বয় ৭৪ ৩০২-১৬
ও জ্ঞান ২৬৪-৬৭, ৩০৪-০৫, ৩১৪ ৫১৫
চাবিপ্রকাব ৫৬৪-৬৫
বৈষ্ণব ৩৭২
যোগেব পবাকাষ্ঠা ২২৮
ভক্তিমূলক ধর্ম ৩১৮
ভক্তিযোগ, গীতাব শেষ ধাপ ৩২
ভগবান ৪০, ১৩৫-৩৬, ৩২১-২৩ ৩২৫-২৬ ৩৭৬, ৪৯৫-৯৬ ৫৩১-৩২, ৫৪৩-৪৪
ও অসুব ১৫৬-৫৭
ও গীতা ৯৮
ও জগৎ ৩৪৫-৪৭
ও যজ্ঞ ১০১-০২
গুরু ৮-১৪

তিনটি শাশ্বত স্থিতি ৫৫৬
ভয, মহা ৪৮০
ভর্তা ৬৪, ৩২১
ভাব ২৫৩
ভাবতেব চিন্তাব ইতিহাস ৭
ভাবতেব সমাজ ব্যবস্থা ৪২
মন ৬১, ৮৩, ৫৪২
সাত্ত্বিক, বাজসিক, তামসিক ৫৬৮
মনু, চাব ৩২৬
মন্ত্র ৪৬৪
মহাকাল ৩৫৫-৬৬
মহাবাক্য ৩০
মহাভাবত ৪৪৮
ও গীতা ৮
মহাযান ৭৩ (পাদটীকা), ৫২৪
মানবজাতি ১৩৬
এব কল্যাণ ১১৯
মানুষ ২০৩
ও জীবনযুদ্ধ ৪৪-৪৫
ও মানবজাতি ১৩৬
কর্মশীল ১২৪
ত্রিগুণাধীন ১৬-২০
সাত্ত্বিক রাজসিক, তামসিক ৫২২
মায়া ২৫৬
ও প্রকৃতি ৭২-৭৩, ৯২-৯৩, ১৩৭-৩৮
ও শঙ্কব এবং গীতা ৭২-৭৩
মায়াবাদ ৩১৯
শঙ্কবেব ২৯৫ (পাদটীকা)
মিথ্যাচাব ৯৩ (পাদটীকা)
মিলন, অক্ষবপুরুষেব সহিত ও পুরুষোত্তমের সহিত ২১৫-১৬
মীমাংসা (উত্তব মীমাংসা ও পূর্ব মীমাংসা দ্রষ্টব্য)
মুক্তি ১১৪
ও পুরুষ ২০৯
ও প্রকৃতিব নিয়ন্তৃত্ব ১৯৫-৯৬, ২০৩-০৪, ২০৬-০৮
গীতাব ৩৭৭
সাংখ্যব ৬৩
মৃত্যু ও অমরত্ব ৫১-৫৩
মৃত্যুকালেব তাৎপর্য ২৭৪-৭৬
মৃত্যুকালীন অনুস্মবণ ২৭৪-৭৬, ২৭৯-৮০, ৩৮১
যজ্ঞ ৩-৪, ৩১, ৯৭, ৯৯-১১৬, ১১৮, ৩০৩, ৩০৮-০৯, ৪৩৭, ৪৬৪-৬৫, ৫০৯-১০
আত্ম-বলিদান ৩৭
এর অধীশ্বব ১১৫
ও জ্ঞান ১০৭-০৮, ১৮২, ৩০৬-০৭
গীতায ও বেদান্তে ৭৬-৭৭
সাত্ত্বিক, বাজসিক, তামসিক ৪৬৩-৬৬
বৈদিক ১০৪
যন্ত্র, সাত্ত্বিক, বাজসিক, তামসিক ও মুক্ত ৪৭৯
যোগ ৫৯, ১২৮, ৫১৮
ও কর্ম ৬৭-৬৯, ৮২
ও গীতাব দার্শনিক তত্ত্ব ৩৩৪
কর্মযোগ ও জ্ঞান ১৮২-৮৩
কর্মযোগ ও ত্যাগ ৭০, ১৮৩
জ্ঞানযোগ ৩২, ৭২, ১১৩, ৩৭৬
পতঞ্জলিব ও গীতাব ৫৭
ভক্তিযোগ ৫৬৫-৬৭
যোগের উদ্দেশ্য ১১৬, ১২০
যুদ্ধ ৩৪-৪০, ৪৩-৪৪
বর্তমান ও প্রাচীন ভারতে ৪২-৪৩
বজঃ ৬০, ৩৫০, ৪০৭-০৯
বাক্ষস ৩০৬
রাজযোগ ও গীতাব যোগ ৫৮-৫৯
এব প্রণালী ২১৯, ২২২
ও বেদান্ত ৫৭-৫৮, ৬৭-৭৯
বাজসিক মানুষ ৫২২
ও জীবনযুদ্ধ ৪৪-৪৫
কর্মশীল (মানুষ দ্রষ্টব্য)
বাম ১৪৮, ১৫২-৫৩
বামাযণ ৪৪৮
বিফর্মেশন (Reformation) ১৫০
লয ৪০৩ (পাদটীকা), ৪১৪, ৫৪৪
লোকসংগ্রহ ১০০-০৩, ১৯২-৯৩
শঙ্কব ৭২
শান্তভাব ১৬৯
ও তামস ৪৪৪
শাস্ত্র ১, ৪, ৭৪-৭৫, ৭৮-৭৯, ৪৫৩-৫৫
শাস্ত্র-পবিহাব ৪৫৬-৫৯
শিক্ষা ৪৯৪-৯৫

শিষ্য, মানব ১৪-২২
শূদ্র ৫০০
এব কর্ম ৪৮৮, ৪৯৪
জাতিভেদে ৪৮৯
শ্রদ্ধা ২৮৯-৯০, ৪৫৫, ৪৬০-৬২, ৪৭০-৭১
ও জ্ঞান ২৮৬-৮৭
ও শাস্ত্রবিধি ত্যাগ ৪৫৯-৬০
শ্রীচৈতন্য ১৪৫
সঙ্ঘ ১৫৪-৫৫
সংযম ও নিগ্রহ ২০০
সংশয় ১৮৭-৮৮
সগুণ ও নির্গুণ ২১১
সৎ ৩৭১, ৪৬৯
সত্ত্ব ৬০, ৩৫০, ৪০৭, ৪০৯, ৪৪৫
এব আশ্রয় ২৫৯
এর বিকাশসাধন ৪৪৬-৪৭, ৪৮৬-৮৭, ৫৬৮
বন্ধন ৪১১
সন্ন্যাস ৮৫, ১১৩, ২২০-২১, ৫০৫-০৬
ও গুণ ৪৬
ও ত্যাগ ৪৫-৪৬, ৭২-৭৩, ৮৫, ১১৩, ১৬৫, ১৭৫, ২২০-২১, ৪৭১-৭২, ৫০৮
সত্য ৪৭৫
সন্ন্যাসী ১২৫
সমতা ২৯-৩০, ১৬৯-৮১, ৩৮২-৮৩, ৪১৩, ৫৬০
অন্যেব কর্ম সম্বন্ধে ১৯২-৯৩
ও গীতাব ১৮১, ১৯০-৯২
ও জ্ঞান ১৮২-৯৩
তামসিক ১৭৪-৭৫
দার্শনিক ১৭১, ১৮১
দিব্য-কর্মীব চিহ্ন ১৬২-৬৪
ধর্মীয় ১৭১
বাজসিক ১৭৬
সাত্ত্বিক ১৮০
স্তোযিক ১৭১, ১৭৭-১৭৯
সমর্পণ ১৯২, ৩১৩-১৪
সকল কর্মেব ৪৩৮
সমাজ ও ব্যক্তি ১১০
সমাজব্যবস্থা ৪১-৪২
সমাধি, গীতায ও বাজযোগে ৫৮ ৮৯
সর্বেশ্ববাদ (Pantheism) ২৯২ ২৯৫
ও অদ্বৈতবাদ ৭৮, (পাদটীকা)
সর্বোত্তম গুণ ২৫১
সহযোগিতা ৩৭
সহিষ্ণুতা ১৮৯
সাংখ্য ৫৭-৬৪
ও কর্ম ৯৭-৯৮
ও বেদান্ত ৫৭ ৫৮, ৬৭-৭৯
ও যোগ ৭১-৭৯
কাবিকা ৫৮
গীতাব তাত্ত্বিক সমন্বয়ে ৩৩৪
পুবাতন ও গীতাব ৫৭-৫৮
বৈদান্তিক ৫৯
মনস্তত্ত্বেব পাবস্পর্য ৮২-৮৩
সাত্ত্বিক মানব ৫২১
ও জীবন-যুদ্ধ ৪৫
সাধর্ম্য ১২০ (পাদটীকা), ৪০২, ৪০৩
(পাদটীকা) ৪০৩-০৪ ৫৬৭
সামুবাই জাপানেব ৪৩
সুখ ১৭২-৭৩, ৪৮৩
সাত্ত্বিক, বাজসিক, তামসিক ৪৮৯-৯৫
সৃষ্টি ৪৬১
সোমবস ১০৪
স্বধর্ম ৫৩, ৪৮৬, ৪৯৮, ৫৬৯
স্বভাব ২৫১-৫২ ২৫৪, ২৫৭ ২৭১-৭২ ১৮৮ ৪৯৯, ৫৬৯
স্বভাব-নিযত কর্ম ৪৭৩, ৪৮৯, ৪৯২
সাক্ষী (দ্রষ্টা) ৬৪, ২৮৩, ৩২১
হিবাব্রিটাস ৩৪
হৃদ্দেশ ১৪৫ ৫১৯